সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সেই সময়



সেই সময়

(প্রথম খণ্ড)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সেই সময়



আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ ১ বৈশাখ ১৩৮৮ তৃতীয় মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৩৮৮

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এ[বং]
আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কী[ম]
নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৩০·০০

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্মরণে

এই লেখকের অন্যান্য বই

অরণ্যের দিনরাত্রি
আত্মপ্রকাশ
সরল সত্য
জীবন যেরকম
কালো রাস্তা সাদা বাড়ি
অর্জুন
কবি ও নর্তকী
স্বর্গের নীচে মানুষ
আমিই সে
একা এবং কয়েকজন
সংসারে এক সন্ন্যাসী
রাধাকৃষ্ণ
ছবির মানুষ
তুমি কে?
নবজাতক

এই উপন্যাসের পটভূমি, ঐতিহাসিক উপাদান, সমর-চরিত্র, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং ঘটনা পরম্পরা বিষয়ে লেখকের বক্তব্য, তথ্য এবং গ্রন্থপঞ্জী শেষ খণ্ডের শেষে যুক্ত হবে।

শিশুটির জন্ম মাত্র সাত মাস দশ দিন গর্ভবাসের পর। মাতৃজঠরেই তার চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছিল। সেই অন্ধকার জলধিতে সে বেশীদিন থাকতে চায়নি।

বাবু রামকমল সিংহ তখন উড়িষ্যায় মহাল পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। প্রাক্‌-সন্ধ্যেবেলা তিনি মহানদীর বুকে বজরার ওপর বসে সূর্যাস্তের শোভা দেখছেন। এমন সময় একটা ছোট ছিপনৌকো তীরবেগে ছুটে এলো বজরার দিকে। সেটা থেকে লাফিয়ে নামলো তাঁর গোমস্তা দিবাকর। অকস্মাৎ দিবাকরকে দেখেই রামকমলের হৃৎকম্প শুরু হয়ে গিয়েছিল। নদীবক্ষে পবিত্র নির্মল বাতাসের মধ্যে দিবাকর দুঃসংবাদের গন্ধ নিয়ে এসেছে। রামকমল ধরেই নিলেন বিম্ববতী আর নেই। দিবাকরেরও সেই রকম ধারণা, গৃহকর্ত্রীকে সে সংজ্ঞাহীন মুমূর্ষু দেখে এসেছে। প্রভুকে সে ঠিক মতন সান্ত্বনা দিতে পারলো না। শুধু বললো, হুজুর আজই ফেরার গতিক কত্তে হবে। উকিলবাবু আমাকে পাটালেন।

রামকমলের চক্ষু থেকে অবিরল অশ্রু বর্ষণ হতে লাগলো। বিম্ববতী তাঁর সংসারের সৌভাগ্যলক্ষ্মী।

বজরার ছাদ থেকে নীচের প্রকোষ্ঠে নেমে এসে রামকমল কমলাসুন্দরীকে বললেন, আজ হতে আমি নিঃস্ব হলেম! পৃথিবীর কোনো দ্রব্যেই আর আমার সুখ হবে না। এমনকি নারীতেও না।

কমলাসুন্দরী রামকমলকে শয্যায় শুইয়ে দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। বিম্ববতীর স্মরণে সেও চোখের জল ফেললো কয়েক ফোঁটা। গঙ্গার ঘাটে দূর থেকে সে বিম্ববতীকে দেখেছে দু' একবার। সাক্ষাৎ জগজ্জননী দুর্গার মতন রূপ! কমলাসুন্দরী তাঁর দাসী হবারও যোগ্য নয়। অমন রূপবতী স্ত্রী থাকতেও রামকমল কেন অপর নারীদের কাছে যান বা দু' তিন বছর অন্তর অন্তর রক্ষিতা বদল করেন, তা বোঝা ভার। কমলাসুন্দরীর গায়ের রঙ মসৃণ কষ্টি-পাথরের মতন। নিজের স্ত্রীর দুধে-আলতা মেশানো গাত্রবর্ণ বলেই বোধহয় রামকমল শুধু কৃষ্ণাঙ্গী মেয়েদের মধ্য থেকেই উপপত্নী নির্বাচন করেন। পুরুষ মানুষ এমনই অদ্ভুত হয়।

রৌপ্য পাত্রে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি ঢেলে এনে কমলাসুন্দরী বললো, এটুকু পান করে নিন, নইলে আরও দুর্বল হয়ে পড়বেন।

রামকমল বাঁ হাত দিয়ে সেই পাত্র ঠেলে দিয়ে বললেন, আমার আর কিছুতে রুচি নেই। আমাকে জ্বালাতন করিস নি, কমল। তুই আমার সম্মুখ থেকে এখন সরে যা—!

কমলাসুন্দরী ক্ষুদ্র গবাক্ষের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে চুল এল্লো করে দিল। বাইরে নদীর জলে লকলক করছে অস্ত সূর্যের লাল শিখা। সেদিকে তাকিয়ে সে ভাবলো, এবার বুঝি এ বাবুর কাছ থেকে পাট উঠলো। আবার নিয়তি তাকে কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে!

রামকমল কোমল শয্যায় শুয়ে প্রবল হুতাশের সঙ্গে আঃ আঃ শব্দ করতে লাগলেন। ততক্ষণে বজরা চলতে শুরু করেছে।

তিনদিন পর কলকাতার যোড়াসাঁকো পল্লীতে তাঁর অট্টালিকার সদর দেউড়িতে পা দিয়েই রামকমল শুনলেন নতুন শিশুর কান্না। তিনি ভুরু উত্তোলন করে তাকালেন দিবাকরের দিকে। দিবাকরও বিমূঢ়। বিম্ববতীর রোগ-যন্ত্রণা যে আসলে প্রসব-বেদনা, তা সে-ও জানতো না। তা ছাড়া, সাত মাস গর্ভের সন্তান জন্মের কথা কে-ই বা কখন শুনেছে। আট মাস পুরলেও না হয় কথা ছিল।

রামকমলের বয়েস এখন সাতচল্লিশ। পনেরো বছর আগে তিনি বিম্ববতীকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর তৃতীয় বিবাহ। এর আগে তাঁর দুই স্ত্রীই মারা গেছে নিতান্ত বালিকা বয়েসে। প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীমণিকে রামকমলের একটু একটু মনে আছে কিন্তু দ্বিতীয়া স্ত্রী হেমবালার মুখখানিও তাঁর মনে পড়ে না এখন। বিম্ববতী নতুন বধূ হয়ে এ বাড়িতে আসেন ন' বছর বয়েসে। তখন এ বাড়ির চেহারা অবশ্য অন্যরকম ছিল। বিম্ববতী আসার পর এই সিংহ পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। রামকমল যে ব্যবসায়ে হাত দেন, সেখানেই সোনা ফলে। বিম্ববতী এই সংসারে এত সমৃদ্ধি এনে দিলেও একটি সন্তাপ সর্বক্ষণ ছিল তাঁর মনে। তাঁর স্বামী অপুত্রক। কিন্তু বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়পরিজন এমনকি বিম্ববতীর অশ্রুসজল সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও রামকমল আর দার পরিগ্রহ করেননি।

রামকমল লাফিয়ে উঠতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে। দোতলায় সিঁড়ির মুখে তাঁর বাল্যবন্ধু ও আজীবন সুহৃদ বিধুশেখর দাঁড়িয়ে। কার্যোপলক্ষে রামকমল প্রবাসে গেলে বিধুশেখরই এ গৃহের রক্ষণাবেক্ষণের ভার নেন। বিধুশেখর একজন দক্ষ আইনজীবী, অতি সূক্ষ্ম তাঁর বুদ্ধি, হৃদয়খানি সমুদ্রের মতন বিশাল। এই বন্ধুর ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করে রামকমল নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন সব সময়।

রামকমল জিজ্ঞেস করলেন, সব শেষ?

বিধুশেখর বন্ধুকে আলিঙ্গন করে বললেন, তুই এসিচিস, আর কোনো চিন্তা নাই। আগে হাত মুখ ধো, পরে সব শুনবি!

রামকমল ব্যগ্রভাবে বিধুশেখরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আগে বল্, বিম্ববতীকে আর দেকতে পাব কি না।

প্রায় আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থাতেই দুই বন্ধু এসে দাঁড়ালেন বিম্ববতীর শয়ন-কক্ষের দরজার কাছে। বিরাট পালঙ্কের ওপর বিম্ববতী চোখ মুদে শুয়ে আছেন চিৎ হয়ে, করতল দুটি বুকের ওপর প্রণামের ভঙ্গিতে যুক্ত। মুখখানি অস্বাভাবিক পাণ্ডুর।

তিনজন সাহেব ডাক্তার পালঙ্কের ডান পাশে মখমলমোড়া কৌচে নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে। বাঁ পাশে বসে আছেন বিখ্যাত কবিরাজ দীনদয়াল ভেষগ্‌শাস্ত্রী। তাঁর চোখ দুটি বন্ধ, চিবুক ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর, তিনি ঘুমন্ত কিনা বোঝা যায় না। তবে এটাই তাঁর সুপরিচিত ভঙ্গি। একজন দক্ষিণ দেশীয় আয়ার কোলে একটি কাঁথার পুঁটুলি, সেই পুঁটুলি থেকে শব্দ আসছে কান্নার। বেশ জোর আছে গলায়। জন্মের পর যে শিশু কাঁদে, তার প্রাণশক্তি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

বিধুশেখর ব্যবস্থার কোন ত্রুটি রাখেননি। কিন্তু রামকমল পিতৃত্ব অর্জনের কোনোরকম সুখানুভূতি বোধ করলেন না। তাঁর মন উদ্বেল হয়ে আছে বিম্ববতীর জন্য। বিম্ববতী তাঁর হৃদয়মণি।

রামকমল ধরা গলায় আবার জিজ্ঞেস করলেন, সব শেষ?

বিধুশেখর বললেন, না। এখনো প্রাণ রয়েচে। সতীলক্ষ্মী তোর অপেক্ষাতেই আচে, তোকে শেষ দেখা না দেখে সে আমাদিগের ছেড়ে যাবে না!

বিচলিত পায়ে রামকমল ছুটে আসতে যাচ্ছিলেন, সাহেব ডাক্তারদের মধ্য থেকে সার্জেন গর্ডন উঠে এসে তাঁর সম্মুখে দাঁড়ালেন। গম্ভীর গলায় খানিকটা ধমকের সুরে তিনি বললেন, ডোণ্ট ডিস্টার্ব হার নাও...প্লীজ...দেয়ার আর এনাফ চান্সেস দ্যাট শী উইল সারভাইভ।

রামকমল উদ্‌ভ্রান্তের মতন বললেন, একবার শুধু পাশে গিয়ে বসি, একবার শুধু স্পর্শ করব...কতা কইবো না।

বিধুশেখর সাহেবকে অনুরোধ করলেন। সার্জেন গর্ডন সরে দাঁড়িয়ে তাঁর জেব থেকে সোনার ঘড়ি বার করে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন সেদিকে।

রামকমল পা থেকে নাগরা জোড়া খুলে ফেলে নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়ালেন স্ত্রীর পাশে। তাঁর বুক কাঁপছে। ঘরের মধ্যে একটা অদ্ভুত গন্ধ পাচ্ছেন তিনি, এটাই মৃত্যুর গন্ধ কিনা তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। বিম্ববতীর শয়নকক্ষে এরকম গন্ধ তিনি আগে পাননি।

বিম্ববতীর ললাটে তিনি হাত রেখে আরও চমকে উঠলেন। কী ঠাণ্ডা! প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে তিনি ধরা গলায় বলতে লাগলেন, বিম্ব, বিম্ব একবার চোখ তুলে চাও, দ্যাখো, আমি এসিচি।

বিম্ববতীর কানে সে ডাক পেঁছোলো না, শরীরে কোনো স্পন্দন দেখা দিল না।

সার্জেন গর্ডন প্লীজ প্লীজ করতে লাগলেন। কবিরাজ মশাই চোখ খুলে বললেন, সিংগিমশায়, ভগবানকে ডাকুন। বৌমাকে এখন ডাকবেন না। ভগবানের দয়া হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

নিজেকে সামলে নিয়ে রামকমল বিম্ববতীর শয্যার পাশ থেকে সরে এলেন। এতগুলি বাঘা বাঘা ডাক্তার কবিরাজ রয়েছেন, এখানে তাঁর শিশুপনা দেখানো শোভা পায় না।

তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলেন, এসময় বিধুশেখর বললেন, পুত্রমুখ দেক্‌লি না?

দক্ষিণ দেশীয়া আয়াটির দিকে তাকিয়ে তিনি ইংগিত করলেন। সে রামকমলের কাছে এসে কলকল করে কত কী যেন বললো, তার একটি অক্ষরও বোঝা যায় না।

কাঁথার পুঁটুলির মধ্যে ছোট্ট একটা বাচ্চা, সে এত ছোট্ট যে মানুষের ছানা বলে বোঝাই যায় না। মনে হয় যেন চোখ নেই, নাক নেই, শুধু মাংসের পুতুল। কিন্তু জীবন্ত যে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তারস্বরে কেঁদে যাচ্ছে আর ক্ষুদে ক্ষুদে দুটি হাত নাড়ছে।

রামকমল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এই শিশু তার জননীকে খেতে এসেছে। কোনো প্রয়োজন ছিল না এর আসার। রামকমল তো পুত্রের অভাব বোধ করেননি কখনো। বিম্ববতীর জীবনের বিনিময়ে তিনি কিছুই চান না।

আয়াটির হাতে দুটি মুদ্রা গুঁজে দিয়ে তিনি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

সাতদিন যমে-মানুষে লড়াই চললো। তারপর বিম্ববতী চোখ মেললেন। প্রথমেই তিনি বললেন, আমি কোতায়?

তখন মধ্যাহ্ন। রামকমল সবেমাত্র আহারে বসেছিলেন, খবর পেয়ে তিনি পাত্র ত্যাগ করে উঠে এলেন। বিম্ববতী বারবার একই প্রশ্ন করছেন শুনে রামকমল বললেন, এ তো তোমার ঘর, এ তোমার শয্যা, এই দ্যাখো আমি রয়িচি, তুমি

জানো, তোমার একটি পুত্র সন্তান হয়েচে?

বিম্ববতীর চক্ষে ঘোর। তিনি আবার বললেন, হ্যাঁগো, আমি কি মরে গিইচিলুম?

রামকমল বললেন, বালাই ষাট, তুমি মরবে কেন? তোমার...

বিম্ববতী বললেন, আমার যেন মনে হলো, আমি কত দেশ ঘুরে এলুম, কত পাহাড়, নদী, বন, বিরাট বিরাট অন্ধকার সুড়ঙ্গ, তার ওধারে আলো, সেই আলো, সেই আলোর এত জোর যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়...

হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসে বিম্ববতী বললেন, আমার ছেলে কই? আমার ছেলে—

আয়া কাঁথার পুঁটুলিটা তুলে দিল বিম্ববতীর কোলে। তিনি চমকে উঠে বললেন, এ কে? এ তো আমার ছেলে না? আমার ছেলে তো অনেক বড়।

রামকমল স্ত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, বিম্ব, তোমার মনে নাই, তুমি পোয়াতি হয়েছিলে, এই তো তোমার গর্ভের সন্তান।

শিশুটি এখন কাঁদছে না, ঘুমিয়ে আছে। বিম্ববতী এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন তার মুখের দিকে। ক্রমশ তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে এলো। তিনি কয়েক ফোঁটা চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেন সন্তানের মুখ। তারপর তার ললাট চুম্বন করলেন।

—গঙ্গা কোথায়? গঙ্গা? সে কেন আসেনি?

আত্মীয়পরিজন দাসদাসীরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। রামকমল বললেন, এই, কেউ গঙ্গাকে ডাক তো! সে কোথায়?

রামকমলের মনে পড়লো, গত দু' তিনদিন তিনি গঙ্গানারায়ণকে দেখেননি। সে এ ঘরে একবারও আসেনি। রামকমল একটু অনুতপ্ত বোধ করলেন।

একজন ভৃত্য এসে খবর দিল গঙ্গানারায়ণ ফিরিঙ্গি পাঠশালায় পড়তে গেছে।

বিম্ববতী উতলা হয়ে বললেন, ওগো, তাকে ডেকে আনো। আমি তাকে এক্ষুনি দেকবো।

রামকমল হুকুম দিলেন, এই, কেউ একজন যা, দৌড়ে গিয়ে তাকে ডেকে আনগে যা!

ফিরিঙ্গি পাঠশালা বেশী দূরে নয়। লোক ছুটে গেল সেখানে। রামকমল স্ত্রীকে বললেন, তুমি শোও। সে আসচে। এখুনি আসচে!

বিম্ববতী বললেন, তোমরা বুঝি ভেবেছিলে আমি মরে গ্যাচি। আমার কী এক মহানিদ্রা পেয়েচিল, তার মধ্যে আমি কত দেশ ঘুরে এলুম।

বিম্ববতীর বিধবা বড় জা হেমাঙ্গিনী এগিয়ে এসে বললেন, তোর কী খিদে পেয়েচে, কিছু খাবি? এ ক'টা দিন তো ওষুধ ছাড়া কিছু পেটে যায়নি।

যেন তাঁর কোলের সন্তানকে কেউ কেড়ে নেবে, এইভাবে পুঁটুলিটা আঁকড়ে ধরে বিম্ববতী বললেন, আমার একদম খিদে নেই গো, আমি যেন অমৃত খেয়িচি, আমার শরীর মন একেবারে ভরে আচে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গঙ্গানারায়ণকে নিয়ে আসা হলো ঘরের মধ্যে। চোদ্দ বছরের একটি সুদর্শন কিশোর। তার মুখখানি লাজুক ধরনের। সে বিম্ববতীর পালঙ্কের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। বিম্ববতী তাকে আরও কাছে ডাকলেন। তার মাথায় মুখে আদর করে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, আমার কাছে বসে থাক। তুই-ও কি ভেবেছিলি, তোর মা মরে গ্যাচে?

গঙ্গানারায়ণ মুখ নীচু করে নিঃশব্দ হয়ে রইলো।

হেমাঙ্গিনী বললেন, ওলো, এখন বেশী কতা ক'স নি। একটু বিশ্রাম নে। চোখ মুখ যা টেনে গ্যাচে, আবার ভির্মি খেয়ে পড়বি।

রামকমলও ভয় পেলেন। প্রদীপের সলতে নিভবার আগে একবার দপ করে জ্বলে ওঠে, পট পট শব্দ হয়, বিম্ববতীরও সেই অবস্থা নয় তো?

তিনি বললেন, বিম্ব, তুমি এখন শোও, কোবরেজ মশাইকে খপর দিইচি, উনি এসে একবার দেখুন।

বিম্ববতী বললেন, আর কোনো ভয় নেই গো! কতদিন তোমাদের দেখিনি, কতদিন গঙ্গাকে দেখিনি। আহা, গঙ্গার মুখ শুকিয়ে গ্যাচে। তুই আজ খেইচিস তো? কেউ তোকে খাবার দিয়েছেল?

গঙ্গানারায়ণ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

—আমাকে একবার মা বলে ডাক তো। কতদিন তোর মা ডাক শুনিনি।

গঙ্গানারায়ণ কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, মা—

—আয়, খাটের ওপর উঠে বোস। বাবা গঙ্গা, তোর একটি ছোট ভাই হয়েচে, তুই তাকে ভালোবাসবি তো?

গঙ্গানারায়ণের ক্ষুদ্র জীবনের কাহিনীটি এই প্রকার।

রামকমল সিংহের পৈতৃক ভিটে হুগলি জেলার বাকসা-গ্রামে। রামকমলের পিতামহ সেই গ্রাম ছেড়ে ভাগ্যান্বেষণে এসেছিলেন কলকাতায়, কালক্রমে নুনের দেওয়ানি লাভ করে এখানকার অভিজাত সমাজে স্থান করে নেন। পিতামহের অপর দুই ভাই থেকে যান সেই গ্রামেই। এই বংশের কলকাতা শাখাটির যতই উন্নতি হতে থাকে, গ্রামের শাখাটি ততই জীর্ণ হয়ে যায়। রামকমল ঐ গ্রামের সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্কই রাখেননি। একদিন রামকমল হঠাৎ লোকমুখে খবর পান যে বাকসা-গ্রামে শ্রীশ্রীরঘুনাথ জীউ'র যে সুবৃহৎ নবরত্নের মন্দির আছে, সেই মন্দিরের চত্বরে এক রমণী তার একবছরের শিশুপুত্রকে রাত্রিবেলা ফেলে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পুরোহিতদের নজরে পড়ে যায়। ধরা পড়ার পর রমণীটি স্বীকার করে যে, ক্ষুধার জ্বালাতেই সে উদ্যত হয়েছিল এমন নৃশংস কাজে। পুত্রকে আহার জোগাতে পারে না বলেই সে শ্রীশ্রীরঘুনাথ জীউ-এর চরণে পুত্রকে সমর্পণ করে নিজে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করা মনস্থ করেছিল। এই কাহিনী মুদ্রিতও হয়েছিল ইংরেজি সংবাদপত্রে।

রমণীটি বিধবা। রামকমল জানতে পারেন যে সেই রমণীটি তাঁরই এক সম্পর্কিত ভাইয়ের স্ত্রী। লোকাপবাদের ভয়ে পুত্রসমেত সেই রমণীটিকে আনিয়ে রামকমল ঠাঁই দিলেন তাঁর কলকাতার বাড়িতে। সব বড় মানুষের বাড়িতেই এরকম কিছু দুঃস্থ আত্মীয়স্বজন আশ্রয় নেয়। যোড়াসাঁকোর এই সিংহবাড়িতে প্রত্যেকবেলা অন্তত পঞ্চাশটি পাত পড়ে। গৃহকর্তা অনেকের নামই জানেন না। তাঁর জননী অতি দানশীলা। কেউ এসে আশ্রয় চাইলে তিনি ফেরান না। জননীর অনুমতি নিয়েই রামকমল বাকসা-গ্রামের সেই রমণীকে সন্তানসমেত এনেছিলেন এ বাড়িতে। অনেক দিন এ বাড়িতে কোনো শিশু ছিল না, তাই সকলেই সেই শিশুটিকে কাড়াকাড়ি করে আদর করতো। তার মা কিন্তু এ বাড়িতে এসেও খুব স্বচ্ছন্দে মনের সুখে থাকতে পারেনি। অন্যান্য আশ্রিতরা থাকে একতলায়, তাকে স্থান দেওয়া হয়েছিল ওপরে। বিম্ববতী দেখেছেন, প্রায়ই সে বিরলে বসে কাঁদে। তার মন-মরা রোগ হয়েছিল, বিশেষ কথা বলতো না, আর বোধহয় সেই রোগের

জন্যই সে বেশী দিন বাঁচলো না। মাত্র ছ' মাস পরেই সে চলে গেল পৃথিবী ছেড়ে, যাবার আগে সে তার ছেলেকে দিয়ে গেল বিম্ববতীর কোলে। সজল চক্ষে বলে গিয়েছিল, দিদি, তুমি ওকে দেখো।

সেই শিশুই গঙ্গানারায়ণ। বিম্ববতীর একেই দয়ার শরীর, তার ওপর হৃদয় ছিল সন্তান-তৃষিত, তিনি ছেলেটিকে আপন করে নিলেন। ছেলেটির দেহে তাঁদের পরিবারের রক্ত আছে, একথা নিশ্চিতভাবে জানার পর, রামকমল ঐ ছেলেটিকে দত্তক নেবার প্রস্তাব দিলেন বিম্ববতীর কাছে। ততদিনে ধরেই নেওয়া হয়েছিল, বিম্ববতীর সন্তান হবে না। বিম্ববতী তৎক্ষণাৎ রাজি হলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে গঙ্গানারায়ণকে দত্তকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করলেন রামকমল। সে প্রায় পাঁচ বছর আগেকার কথা।

বিস্ময়ের কথা এই যে বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গানারায়ণের মুখের গড়নে আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যেতে লাগলো রামকমলের সঙ্গে। যেন সে রামকমলেরই ঔরসজাত পুত্র। যে দেখে, সে-ই ঐ কথা বলে।

লোকে এমন কথাও বলে যে ঐ দত্তক নেবার ব্যাপারটা নিছকই ভড়ং! রামকমলের নারীলোলুপতার কথা সর্বজনবিদিত, তিনি নিশ্চয়ই নিজের গ্রামেও একটি উপপত্নী রেখেছিলেন, প্রতি বৎসর পূজোর সময় একবার সেখানে যান তিনি। ঐ গঙ্গানারায়ণ সেই উপপত্নীরই সন্তান, তাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করার জন্য দত্তক নেওয়া হলো। কেউ কেউ এ রটনা বিশ্বাস করে। রামকমলের ঘনিষ্ঠতম সুহৃদ বিধুশেখরের কানেও এই রটনা এসে পৌঁছেছে, তিনি শুনে উচ্চহাস্য করে উঠেছিলেন। আর যেই বিশ্বাস করুক, বিধুশেখর কিছুতেই এটা বিশ্বাস করতে পারেন না।

বিম্ববতীর ধারণা, শ্রীশ্রীরঘুনাথ জিউ-ই ছেলেটিকে পাঠিয়েছেন তাঁদের কাছে। এমন উপযুক্ত সন্তান মানুষ বহু ভাগ্যে পায়। ছেলেটি ধীর স্থির, বুদ্ধিমান। পড়াশুনোয় মতি আছে। সংস্কৃত, ফার্সী ও ইংরেজি শিখছে নিয়মিতভাবে। এই ছেলের হাতে যে বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা পাবে ও বৃদ্ধি পাবে, এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিলেন রামকমল।

কয়েকদিন পর বিম্ববতীর সঙ্গে দুই পুত্র বিষয়ে খানিক আলোচনা করলেন রামকমল।

তাঁর তখনও আশঙ্কা তাঁর নিজের সন্তানটি শেষ পর্যন্ত বাঁচবে কিনা। এত ক্ষুদ্র মানবশিশু তিনি কখনো দেখেননি। এর সব কিছুই যেন অদ্ভুত। জন্মের পর বেশ কিছুদিন বাচ্চারা অধিকাংশ সময় ঘুমিয়েই কাটায়। নিদারুণ অন্ধকার থেকে এসে এই পৃথিবীর আলো চক্ষে সইয়ে নিতে যথেষ্ট সময় লাগে। কিন্তু এ তেমন ঘুমোয় না, যখন তখন জাগে আর কান্না জুড়ে দেয়। হাসতেও শিখেছে এরই মধ্যে। মুখের সামনে একটা আঙুল নিয়ে গেলেই হেসে ওঠে খটখটিয়ে। দেড় দু' মাসের মধ্যে শিশুরা নাকি ভালো করে দেখতেই পায় না, কিন্তু যে-কেউ সামনে গেলেই এ দিব্যি তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে।

নিজের সন্তান সম্পর্কে রামকমলের মনোভাব প্রতিদিন বদলে যাচ্ছে। এখন দিনের মধ্যে বহুবার তিনি ছেলের মুখ দেখতে আসেন। প্রথম দু' একদিন তিনি নতুন শিশুটিকে বেশী মনে স্থান দেননি, বিম্ববতীর সঙ্গে দেখা করতে এসেও ছেলের দিকে তাকাতেন না। যেন বেশী মায়ায় বাঁধা পড়তে চান না, ও যদি চলে যায়, তাহলে যেন বিস্মৃতি আসে খুব দ্রুত। গঙ্গানারায়ণ তাঁর বংশধর, তাকে নিয়েই তিনি তৃপ্ত থাকবেন। তারপর একটা একটা দিন যেতে

লাগলো আর তাঁর নিজের সন্তান যেন তাঁকে টানতে লাগলো চুম্বকের মতন। মাত্র সাত মাস দশ দিন গর্ভবাসের পর জন্মেছে যে বাচ্চা, এতখানি জীবনীশক্তি দেখলে, বিশেষত তার খটখটে হাসি শুনলে যেন খানিকটা গা ছম ছম করে।

আর একটা বিস্ময়বোধও যেন আচ্ছন্ন করে ফেলছে রামকমলকে। এতদিনে তাঁর এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে তাঁর সন্তান উৎপাদনক্ষমতা নেই। বিম্ববতী অবশ্য নিজেকে বাঁজা ভাবতেন এতদিন। কিন্তু রামকমল আরও অনেক রমণীর গর্ভে বীর্য নিষেক করেছেন, তারা কেউই তাঁকে একটিও সন্তান উপহার দিতে পারেনি। যদি কেউ দিত, তাহলে সেই সন্তানকে তিনি নিজের বংশধর হিসেবে স্বীকৃতি না দিলেও তার ভরণপোষণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করে দিতেন নিশ্চিত। শেষ পর্যন্ত বিম্ববতীর কাছেই সার্থক হলো তাঁর পৌরুষ। এ কথা চিন্তা করলেই রামকমলের সারা শরীরে গুপ্ত খুশীর জোয়ার এসে যায়।

বিম্ববতীর শরীর এখনো দুর্বল, তবু তিনি পুত্র কোলে নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে বসে থাকেন। রাস্তার দিকের সব কটি জানলা বন্ধ। কাছেই এক জায়গায় চড়কের মেলা বসেছে। অনেক রাত পর্যন্ত পথ দিয়ে মানুষজন হল্লা করতে করতে যায়। গতকাল রাত্তিরেই একদল মাতাল এমন গান জুড়েছিল ঋষভরাগিণীতে যে আর একটু হলেই ধোপারা ছুটে আসতো দড়িদড়া নিয়ে। একজন পাহারাওয়ালা মজা দেখছিল সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। শেষ পর্যন্ত রামকমলই তাঁর পাইকদের পাঠিয়ে মাতালগুলোকে গলাধাক্কা দিয়ে বিদায় করে দেন।

রামকমল শুতে যাবার আগে এসে দাঁড়ালেন পত্নীর পাশে। চার চক্ষুর দৃষ্টি একসঙ্গে নিবদ্ধ হলো ঘুমন্ত শিশুটির ওপর। বিম্ববতী বললেন, চোখ দুটো দেকেচো? ঠিক তোমারই মতন হবে। ঠোঁটের কাচটাও তোমার মতন। শুধু কপালের এইটুকু জায়গায় আমার সঙ্গে মিল আচে।

রামকমল হাসলেন। স্ত্রীলোকেরা এসব কী করে বোঝে কে জানে। শিশুর মুখ চোখ কিছুই তো এখনো চেনা যায় না।

—তুমি কেমন আচো, বিম্ব?

বিম্ববতীর ঠোঁটে গাঢ় পরিতৃপ্তির হাসির আভাস পাওয়া গেল। তিনি বললেন, আমি ভালো আচি...তুমি তোমার শরীরের যত্ন নিও গো, আমি কিচু দেকতে পারি না।

—আমার জন্য চিন্তা করো না। মা রয়েচেন, বড় বৌঠান রয়েচেন।

—গঙ্গা শুয়ে পড়েচে? ওর খাওয়াদাওয়া ঠিকমতন হচ্চে তো?

—দেক্‌লুম তো শুয়ে আচে। তোমার কাচে আসেনি?

—এ বেলা আসেনি কো, একবার খপর নিয়ে শুনলুম পড়াশুনা কচ্চে!

—ও কি তোমার ঘরে বেশী আসে না?

—লজ্জা পায় বোধহয়। আমাকে এমনভাবে শুয়ে থাকতে তো কখনো দ্যাকেনি, বহু বচরের মধ্যে আমার কোনো রোগভোগ হয়নি।

—নতুন ভাইবোন জন্মালে ছেলেমেয়েদের এরকম একটু অভিমান হয়ই। কুসুমকুমারী যেবারে জন্মালো, আমার তখন ন' বচর বয়েস, আমি ভাবতুম মা বুঝি আমা অপেক্ষা কুসুমকুমারীকেই বেশী ভালোবাসেন। কুসুমের তখন কত আদর।

—গঙ্গার তো আর ন' বচর বয়েস নয়। সে বড় হয়েচে, সে বুজবে।

—কিন্তু বিম্ব, তুমি কি দু'জনকে সমান ভালোবাসতে পারবে?

—কেন পারবো না? গঙ্গাকে পেটে ধরিনি বটে, কিন্তু সে কি কিছু কম?

—বিধু আমার মনের মধ্যে একটা কথা ঢুক্যে দিয়েচে। দত্তক নেবার পর নিজের সন্তান জন্মালে সে বংশে নাকি একটা বড় রকম বিরোধ বাধে। আদালতে সে এমন অনেক দেকেচে।

—গঙ্গা অতি ভালো ছেলে, সে কক্ষনো তার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ করবে না।

—গঙ্গা না হয় না-ই করলো, কিন্তু তোমার এ ছেলে যদি বড় হয়ে গঙ্গাকে সহ্য করতে না পারে?

বিম্ববতী আহত হয়ে বললেন, তুমি আগে থেকেই এরকম গাইচো কেন? ওসব কিছু হবে না। আমি বলচি দেখো, ওদের দু' ভাইয়ের মধ্যে কখনো অসৈরণ হবে না।

রামকমল বললেন, না হয় তো মঙ্গল। আমার বিষয় সম্পত্তি যথেষ্ট আচে, আমি ওদের মধ্যে সমান ভাগ করে দিয়ে যাবো...লিখিত পড়িতভাবে...আগে থেকেই, তাতেও ওরা যা পাবে—

কথাটা বলতে বলতেই রামকমলের মনের মধ্যে একটা খটকা লাগলো। সমান? তাঁর নিজের রক্ত বইছে এই ছেলের শরীরে, সে গঙ্গানারায়ণের সমান পাবে? বড় হয়ে যখন সে সব জানবে, তখন বাপ মায়ের ওপর তার অভিমান জন্মাবে না?

রামকমল শব্দ করে হাসলেন।

—কী হলো?

—আমি নিজেই এর মধ্যে ভাবতে শুরু করিচি, ওদের সমান সমান সম্পত্তি দেওয়া হবে কিনা...আমার রক্ত বইচে এর শরীরে...রক্তের এত টান যে আমিও দুর্বল হয়ে পড়চি।

—আমি যতদিন বেঁচে থাকবো, আমি দু'জনকেই সমান করে দেকবো।

—ভালো। তুমি মা হয়ে যদি তা পারো, আমিই বা তাহলে পারবো না কেন?

আরও কয়েকদিন পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন বিম্ববতী। বাড়িতে এতদিন ডাক্তার কবিরাজের আনাগোনা লেগেই ছিল। তাঁরা কেউই বিশ্বাস করতে পারেন নি যে শেষ পর্যন্ত জননী ও সন্তান দু'জনেই বেঁচে থাকবে। এটা রীতিমতন একটা বিস্ময়ের ব্যাপারই বটে। রামকমলের মা সৌদামিনী ইতিমধ্যে বহু পুজোআচ্চা, ব্রাহ্মণ বিদায় ও কাঙালী ভোজন করিয়েছেন এই শিশুর মঙ্গল কামনায়।

কুলপুরোহিত এসে জাতকের জন্মলগ্নের রাশি নক্ষত্র বিচার করে কোষ্ঠি রচনা করে দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, এ শিশুর যশোভাগ্য সাঙ্ঘাতিক। একদিন সারা দেশ এরই জন্য এই বংশের সুনাম গাইবে। বিম্ববতী রত্নপ্রসবিনী।

শিশুর নাম রাখা হলো নবীনকুমার।

একুশ দিনের দিন বিম্ববতী নবীনকুমারকে কোলে নিয়ে সারাবাড়ি ঘুরে এলেন। তারপর শিশু ঘুরতে লাগলো এ কোল থেকে ও কোলে।

সন্ধ্যেবেলা বৈঠকখানা ঘর থেকে ওপরে এসে রামকমল দেখলেন বারান্দায় বিম্ববতী আসনপিঁড়ি হয়ে বসে স্তন্য পান করাচ্ছেন নবীনকুমারকে। আর গঙ্গানারায়ণ বসে আছে মায়ের পিঠে গাল ঠেকিয়ে। রামকমল মুগ্ধ হয়ে গিয়ে ভাবলেন, অহো, কী সুন্দর দৃশ্য!

তিনি তখনি আবার নীচে নেমে এসে দিবাকরকে নির্দেশ দিলেন যুড়িগাড়ি

বার করবার জন্য। আজ তাঁর মনে খুব আনন্দ। অনেক দিন পর আজ তিনি জানবাজারে কমলাসুন্দরীর বাড়িতে যাবেন।



দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, তবু ভেতরে বসে গুপী স্যাকরা দুর্গাপ্রদীপ জেবলে রাংঝালের কাজে মগ্ন। সেই সময় ঝাঁপ ঠেলে ঢুকলো রাইমোহন। সে এতই লম্বা যে ছোট দোকান ঘরটিতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, মাথা ঝুঁকিয়ে রইলো। তার পরণে সিমলের ফিনফিনে ধুতি, হলুদ রঙের বেনিয়ান, গলায় শান্তিপুরের ডুরে উড়ুনি আর পায়ে ইংলিশ জুতো। বাঁ হাতের মণিবন্ধে এক ছড়া গোরের মালা জড়ানো। সে মাঝে মাঝে এই রকম সময়েই দোকানে আসে, তাই গুপী স্যাকরা অবাক হলো না, একটা ছোট কাঠের টুল এগিয়ে দিয়ে বললো, বসুন ঘোষালমশাই।

রাইমোহন বসলো, হাঁটু দুটো উঁচু হয়ে রইলো। জেব থেকে পিতলের পানের কৌটো বার করে তার থেকে একটা পান মুখে পুরলো, একটা গুপীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, নিবি নাকি?

বহুক্ষণ আগুনের শিখার সামনে বসে থাকার জন্য গুপীর কপাল থেকে টপটপ করে ঘাম ঝরছে। বাঁ হাত দিয়ে ঘাম মুছে, ডান হাত বাড়িয়ে বললো, দেন একটা। আর কী সংবাদ বলেন। অনেকদিন আপনি ইদিকে আসেননি, তাই পাড়া-বেপাড়ার অনেক খবরও শুনিনি।

রাইমোহন বললো, সবচে জবর খবর হলো গে চূড়ো দত্তর রাঁড়কে কাল কে যেন ছুরি মেরে পালিয়েচে, আজ সকালে দেখা গেল সে মুখ ভেটকে পড়ে আচে।

গুপী বললো, চূড়োবাবুর কোন্ রাঁড়? তেনার তো একটি নয়, গণ্ডাখানেক।

—ইটি হলো গে বৌবাজারের। আমার হীরেমনির পাশের কোঠায় থাকতো।

—আহা হা, সে তো শুনিচি অপরূপ সুন্দরী ছেল।

—হ্যাঁ, কলকেতা থেকে একটা তারা খসে গেল। চূড়ো দত্তর কি ভেউ ভেউ করে কান্না! নিজের বাড়ির মাগ্ মলেও কেউ অমন কাঁদে না।

—কে মারলে? চূড়োবাবুর রাঁড়ের কাছ ঘেঁষা তো কম সাহসের কথা নয়।

—তুই কখনো ঘ্যাঁষবার চেষ্টা করিছিলি নাকি?

—আরে রাম রাম! আমি তো চুনোপুঁটিস্য চুনোপুঁটি! আপনার মুখেই শুনিচি এসব।

—চূড়োর কান্নার বহর দেখে মনে হচ্চে, সে-ই গুণ্ডা ভাড়া করে মারিয়েচে। পাখি নাকি উড়ু উড়ু কচ্চিল, রসিক দত্তরও চোখ পড়েচিল ঐ মেয়েছেলেটির ওপর। চূড়োবাবুর হাত ছাড়িয়ে কারুর পালাবার সাধ্য আচে?

—রাম কহো, রাম কহো! এসব নোংরা কথা শুনলেও পাপ। আর কী সংবাদ বলেন!

—চেতলাগঞ্জে আজ অনেকগুলো চালের নৌকো ভিড়েচে দেকলুম, চালের দর এবার একটু পড়বে মনে হয়।

—এয়েচে চালের নৌকো? দু'-তিন মাস ধরে যা অখাদ্য চাল জুটছিল।

—না রে, বাঙালদেশ থেকে বেশ ভালো চাল এয়েচে।

—আজ বিকেলে কেল্লা থেকে গ্দুম্ গ্দুম্ করে অনেকবার তোপ দাগলো। বিলেত থেকে কেউকেটা একজন এলো মনে হয়।

—কোম্পানির ডিরেক্‌টর বোর্ডের একজন জবর মেম্বর এয়েচে। কী নাম যেন, ভুলে গেলুম ছাই।

—আপনি কি এখন বেরুচ্চেন না বাড়ি ফিরচেন, ঘোষালমশাই?

—এই সন্ধেরাতে বাড়ি ফিরবো কি রে! আমার কি নোনা লেগেচে যে বাড়িতে বসে কাঁচা থোড় চিবুবো! একটা বাজনা শুনতে পাচ্চিস?

—হ্যাঁ, অনেকক্ষণ থেকে শুনচি। কিসের বাজনা বলুন তো!

—আজ যোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে খুব ধুমধাম। দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাতি হয়েচে, তাই গোড়াদের ব্যান্ড পার্টি আনিয়েচে।

—তা আপনার নেমন্তন্ন নেই?

—আজ শুধু সাহেবদের। বাঈ নাচ হবে। দিশি লোকদের নেমন্তন্ন হলো গে কাল। আমার তো নেমন্তন্ন লাগে না, খাওয়া-দাওয়া দেখলেই ঢুকে পড়ি।

—ছেলে হলো কার?

—দেবেন্দ্রবাবুর। দ্বারকানাথের বড় ছেলে। দেবেন্দ্রর এক মেয়ে হয়ে মারা গিইছিল। এবার প্রথম ছেলে জন্মালো। নতুন বংশধর এলো, খুব ধুমধাম তো হবেই।

—দেবেন্দ্রবাবু তো বড়মানুষীতে বাপকেও ছাড়িয়ে যাবেন বোধহয়।

—বাপকে টেক্কা না দিলে আর বড়মানুষী কী? মনে নেই, একবার শুধু সরস্বতী পুজো করেই এক লাখ টাকা ওড়ালো? খরচের বহর দেখে দ্বারকানাথ পর্যন্ত হাঁ!

—উনি তো আবার হীরে মুক্তো গলায় পরেন না, পায়ে।

—পায়ে কি বলচিস? জুতোয়। জুতোর ওপর হীরে মুক্তো বসিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেল!

—কালে কালে কত কী দেকবো!

—ওরা তো টাকার ওপর গড়াগড়ি দেয়। দ্বারকানাথের বাড়িতে টাকার গোনাগুণতি হয় না, দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে। দেবেন্দ্র হিঁদু কালেজে ভর্ত্তি হয়েছেন। ও কালেজটা তো একটা ম্লেচ্ছদের আড্ডা। কেউ জাত ধম্মো মানে না। দ্রুজো সাহেব মারা গেলেও তেনার চেলা-চামুণ্ডোগুলান রয়ে গ্যাচে। সেগুলো আবার এককাঠি বাড়া। দেবেন্দ্র যাতে বয়াটে হয়ে না যায়, তাই দ্বারকানাথ ছেলেকে কালেজ ছাড়িয়ে এনে বিষয়কম্মে লাগালেন, আর ছেলেও পুজো-আচ্চার নাম করে দু' হাতে দেদার টাকা উড়াচ্চে। বয়েস তো সবে তেইশ চব্বিশ, এর মধ্যেই দেবেন্দ্র যা খেল দেখাচ্চে, কাপ্তেনীতে সবাইকে ছাপিয়ে যাবে।

গুপী বললো, তাতে আপনাদেরই লাভ।

রাইমোহন বললো, এদিকে আমাদের রামকমল সিংগীরও এক ছেলে হলো। এতকাল তো পরের ধনে পোদ্দারি কচ্ছেল, এবার নাকি নিজের মুরদেই—

—নাকি বলছেন কেন?

—যা শুনবো, তাই বিশ্বেস করবো, এমন বান্দা আমি নই! রামকমল সিংগীর বোয়ের ছেলে হয়েচে কিন্তু সে ছেলে রামকমল সিংগীর না কার, তা কে জানে!

—আরে ছি ছি ছি ছি। রাম কহো। ও-কতা বলবেন না। পাড়াশুদ্ধু সকলে জানে, আর যেখানে যাই গণ্ডগোল থাক, রামকমল সিংগী মশায়ের পরিবার অতি

সতী সাধ্বী মেয়েছেলে।

—আরে রাখ রাখ। সতী! বেণ্টিঙ্ক সাহেব এমন কানুন করে গেলেন তা গোটা দেশটার পোঙা মারা গেল।

—কী করেচেন, সে সাহেব?

—ঐ যে খানাকুলের ম্লেচ্ছটি সাহেবদের জপালো আর সাহেবরাও তার কতা শুনে নেচে উঠলো। সতীদাহ রদ করে গেলেন বেণ্টিঙ্ক, তার ফলে দেশ থেকে সতীই উধাও হয়ে গেল। একটা সতী মেয়ে আমায় দেকা তো?

গুপী চুপ করে গেল। এ-সব কথা নিয়ে আলোচনা করতে সে ভয় পায়। রাইমোহন ঘোষালের না হয় জিভের আড় নেই। কিন্তু সে ছাপোষা মানুষ।

—এবার আপনার নিজের সংবাদ বলেন ঘোষালমশাই।

অন্য জেব থেকে এক ছড়া সোনার হার বার করে রাইমোহন বললো, এটা দ্যাক্ তো, এটার জন্য কত দিতে পারবি?

হার ছড়া হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে গুপী বললো, এটা আবার কোথ্ থেকে আনলেন? আপনার কি জিনিস ফুরোয় না?

—এটা আমার নাতির।

—নাতির জিনিসটে বিকিকিরি করবেন? আহা, সে বেচারি মনে দুঃখু পাবে না?

—সে দুঃখু পেল তো আমার বয়েই গেল। সে কি এখানে আচে, গত বছর সে স্বগ্গে গ্যাচে, সেখেনে সোনাদানার কত ছড়াছড়ি! নে, ওজন করে দ্যাক্!

এটা একটা খেলা। গুপী বেশ ভালোই জানে যে এটা রাইমোহনের নাতির গয়না নয়, আর রাইমোহনও জানে যে বিক্রির জন্য যে-সমস্ত গয়না সে আনে তা কোথা থেকে আসে, গুপীর জানতে বাকি নেই। তবু প্রত্যেকবারই একটু এ-রকম গল্প কথা হয়।

গুপী নিক্তি বার করলো। সেদিকে তীক্ষ্ম চোখে চেয়ে রইলো রাইমোহন। এই লোকটির বয়েসের গাছ-পাথর নেই। কেউ বয়েস জিজ্ঞেস করলে রাইমোহন হাসে। কিংবা রসিকতা করে বলে, এই ধরো না কেন বারো কি তেরো! দেকছো না, বগলে চুল গজায় নি এখনো?

রাইমোহন মাকুন্দ, শরীরখানা শুধু শক্ত হাড়ের ওপর চামড়া দিয়ে মোড়া, সেইজন্যই তার উচ্চতা যতখানি, তার চেয়েও ঢ্যাঙা দেখায়। খড়্গনাসা, অতিশয় ধূর্তের মতন চোখ, কথাবার্তায় দারুণ তুখোড়। রাইমোহন এ শহরে যজ্ঞের বিড়াল।

—আপনার সোনা আচে ডেড় ভরি টাক্!

রাইমোহন অমনি ধমক দিয়ে উঠলো, কতটা হাত ঝোলালি? অ্যাঁ?

গুপী বললে, হাত ঝুলিয়েচি? এই দেকুন না।

—আরে রাখ রাখ। কতায় আচে, স্যাকরার ওজন আর মামুদপুরের গাজন। মারামারি কাটাকাটি হবেই! ভালো করে দ্যাক!

—পুরো ডেড় ভরি! তা আপনার উনিশ টাকা দর ধরলে—

—উনিশ টাকা কি রে ব্যাটা? বিশ টাকা দর উঠেচে।

—সে হলো পাকা সোনার দর।

—আমি কি তোর কাচে কাঁচা সোনা এনেচি!

অনেকক্ষণ দরাদরি হলো। গুপী কিছুতেই সাড়ে আঠাশ টাকার বেশী দেবে

না, রাইমোহনও তিরিশ টাকা না নিয়ে ছাড়বে না, শেষ পর্যন্ত উনত্রিশে রফা হলো। টাকাগুলো গুণে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়েই রাইমোহন গুঁতো গেল ঘরের চালে। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বেরিয়ে পড়লো।

শনিবারের রাত, রাস্তায় বেশ ভিড়। জ্যোৎস্না রাত বলে অন্ধকার তেমন মিশমিশে নয়, কাছাকাছি বাড়িগুলো থেকেও আলোর রেশ এসে পড়েছে, অনেক পথচারীর হাতে লণ্ঠন। দুই গরুর গাড়ির মাঝখানে আটকা পড়েছে একটা ফিটন গাড়ি, তার ওপর থেকে চ্যাঁচাচ্ছে সহিস আর ভেতরে বসে এক সৌখিনবাবু বলছেন, আঃ সর না, কী আপদ! গরু এমন ল্যাজের ঝাপটা মারছে, তা প্রায় বাবুর মুখে এসে লাগে। গাড়োয়ানের জোর ছপটি খেয়ে হঠাৎ একটা বলদ এত জোরে ছুটলো যে গাড়িশুদ্ধু গিয়ে পড়লো রাস্তার ধারের পুকুরে। লোকেরা 'আরে মলো মলো, গ্যালো গ্যালো, ধর ধর' বলে চেঁচিয়ে উঠলো। সেই সুযোগে ফিটন গাড়ি বেরিয়ে গেল খপখপিয়ে। চিৎপুরের রাস্তার দু' পাশে বিরাট বিরাট নর্দমা। গাড়ি ঘোড়ার আওয়াজ ছাপিয়েও শোনা যায় মানুষের গলা। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় কেউ চুপচাপ হাঁটে না, কে কার কথা শুনছে ঠিক নেই, তবু সকলেই কিছু না কিছু বলছে।

এরই মধ্যে চলেছে একটা ছোট মিছিল, তাতে দু'জন ঢোল বাজাচ্ছে। একজনের হাতে একটা দাউ দাউ করা মশাল আর বাকি লোকরা গান জুড়েছে, 'ভোলা বোম্ ভোলা বড় রঙ্গিলা লেংটা ত্রিপুরারি শিরে জটাধারী ভোলার গলে দোলে হাড়ের মালা'।

রাইমোহনের ঠোঁটে সব সময় একটা বাঁকা হাসি থাকে। সে ভিড়ের মধ্য দিয়ে চলেছে পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে। হঠাৎ একজন লোকের সঙ্গে তার ধাক্কা লেগে গেল। সে রাইমোহনের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে স্খলিত গলায় বললো, আমি ছিকেষ্ট বাগানের পেয়ারা, না না, ভুল বল্লুম গো, আমি পেয়ারা বাগানের ছিকেষ্ট, তুমি কে বাবা, তাল গাছ?

লোকটির মুখ দিয়ে ভুরভুরিয়ে বেরুচ্ছে সরাবের গন্ধ। তার কথা শুনে খিল-খিল করে হেসে উঠলো অদূরে দাঁড়ানো তিনটি মেয়ে। তাদের তিনজনেরই হাতে লাল রঙের রুমাল।

রাইমোহন জিজ্ঞেস করলো, মশায়ের লেগেচে?

লোকটি বললো, না, না, লাগবে কেন? যেন গাদা বোটের গায়ে নদীর ঢেউ, একটু দুলে উঠিচি শুধু।

রাইমোহন ডিবেটা বার করে বললো, নিন একটা পান আজ্ঞা করুন।

অমনি মেয়ে তিনটি আমায় দাও, আমায় দাও বলে এগিয়ে এলো। খালি হয়ে গেল রাইমোহনের ডিবে। সে এক হাতে চেপে জেব সামলে রইলো যাতে টাকাগুলো না এই তালে-গোলে অদৃশ্য হয়ে যায়।

একটি মেয়ে বললো, হাতে গোরের মালা, কার গলায় পরাবে গো?

অন্য একটি মেয়ে তার হাত চেপে ধরে বললো, আমার ঘরে চলো।

আর একটি অন্য হাত চেপে ধরে বললো, না গো, আমার ঘরে এসো, আমার ঘর খুব কাচে।

মাতালটি বললো, যাব্ বাবা! আমি কি এঁটো কলাপাতা? আমায় কেউ দেকচে না।

মেয়েগুলোর কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, তাদের থুতনি ধরে একটু আদর করে আবার এগিয়ে গেল রাইমোহন।

হেদোর কোণে কুচকুচে কালো রঙের একটি দিশি খৃস্টান প্রভু যীশুর মহিমা কীর্তন করছে। তার পাশে হাতে বিলিতি লণ্ঠন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গোলগাল মুখ একজন সাহেব। কাছেই ভূর করে রাখা আছে অনেকগুলো বাইবেল। একটু পরেই যখন ঐ বাইবেল বিলি হবে, তখন এক অক্ষরও ইংরেজি পড়তে পারে না এমন লোকেরা ওগুলো নেবার জন্য কাড়াকাড়ি করবে। অনেক সময় রাস্তার ধারের নর্দমায় ডানা উল্টে পড়ে থাকতে দেখা যায় ভালো মরোক্কো চামড়ায় বাঁধানো বাইবেল। তবু পাদ্রীদের উৎসাহে ঘাটতি নেই।

বউবাজার পাড়ার একটি দোতলা বাড়িতে ঢুকে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রাইমোহন হাঁকলো, হীরেমনি, ও হীরেমনি! আসবো?

নীল রঙের জমকালো শাড়ি পরা একটি মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললো, তুমি আজ এয়েচো? তোমার কি ভয় ডর নেই গা?

রাইমোহন হাসতে হাসতে ওপরে উঠে এসে বললো, ভয় পেলে আর কোথায় নুকোবো? তোমার কাচে ছাড়া? কেন, কী হয়েচে? পাড়া একদম ফাঁকা দেকচি যে!

হীরেমনি বললো, কাল রেতে অমন কাণ্ড হলো, আজ আর কেউ এ পাড়ায় আসবে? এক তুমিই আচো ঘাটের মড়া।

রাইমোহন বললো, কেউ আসবে না, বা বা বা বা। শুনে প্রাণ জুড়িয়ে গেল, তা হলে আজ আমি একাই জমাবো।

ঘরের মধ্যে জাজিমের ওপর ফরাস পাতা। দরজার ঠিক সামনের দেয়ালে ঝুলছে একটি কালীঘাটের পট, একটা বেড়াল মাছ মুখে নিয়ে পালাচ্ছে। ফরাসের ওপর তিন চারটে লাল ভেলভেট মোড়া তাকিয়া, তার একটাতে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে একটি এক বছরের বাচ্চা ছেলে।

বেশ মৌরসীপাট্টা করে বসে রাইমোহন বললো, সকালে একবার উঁকি মারতে এয়েছিনু এদিকে। অনেক পাহারোলা দেকলুম। পাহারোলা পাহারোলায় ছয়লাপ একেবারে।

হীরেমনি বললো, দু'জন সাহেব পুলিশও এয়েছিল!

—তা আসবে না? একি তোর আমার মরণ, চুড়ো দত্তর রাঁড়, স্বয়ং গবর্ণর জেনারেল যে আসেননি...মোতিবিবির কত বড় ভাগ্য বল্, সাহেবরা পর্যন্ত তার লাশ দেখতে এয়েছেল!

—আহা গো, সে চোকে দেকা যায় না! কী নিন্দয়ের মত মেরেচে, শরীলটা একেবারে ফালা-ফালা করে দিয়েচে।

—ঐ জন্যই তো তোকে বলি, কখনো বাঁধা বাবু রাকবি না। ছাড়া পাখি হয়ে থাকবি, এ ডালে বসবি, ও ডালে ঠোকরাবি।

—আমি মোতিকে বলিচিলুম, চুড়োবাবু বড্ড বদরাগী লোক, ওঁয়াকে চটাতে যাসনি—তা তো শুনলো না, ফাঁট দেখিয়ে বললো, কোন্ পরোয়া করে তুহার চুড়োবাবুকা! এখন বোঝ্!

—যাক গে, গেচে তো গেচে। আচ্ছা হীরেমনি, তুই যে বললি আজ আর কেউ আসবে না ভয়ে, তা হলে তুই অ্যাত সেজেগুজে বসেছিলি কোন্ নাগরের জন্যে র‍্যা? আমার জন্যে বুঝি?

—আহা হা, সাজ করেচি, সে আমার অব্যেশ। ওনার জন্যে! ভারী মুরোদ! হাতে নেই কানাকড়ি দরজা খোলো বিদ্যেধরী।

রাইমোহন বেনিয়ানের ওপর হাতের থাবড়া মারতেই রূপোর টাকা ঝনঝনিয়ে উঠলো। এক গাল হেসে বললো, মুরোদ নেই! আজ একশো সিক্কা টাকা এনিচি। নোকরকে ডাক, বোতল আনা।

হীরেমনি বললো, আবগারির দোকান বন্ধ হয়ে গেচে, এখন আবার কোতায় বোতল পাবে?

রাইমোহন হেসে বললো, ওর কাচেই বোতল রাকা থাকে, একটু ঘুরে ঘেরে এসে নিজেরই নুকোনো বোতল বার করে দেবে। দুটো পয়সা বেশী নেবে, এই যা!

—দাঁড়াও বাপু, ছেলেটাকে রেখে আসি পাশের ঘরে। তুমি তো পেটে একটুখানি পড়লেই অমনি হল্লা শুরু করবে।

—হল্লা কি রে, গান শোনাবো। তোকে নিয়ে আমি নতুন গান বেঁধেছি!

—থাক, আর আমায় নিয়ে গান বাঁধতে হবে না। বড় বড় বাবুদের নিয়ে গান বাঁধো, তাই করো গে।

—বাবুদের নিয়ে গান বাঁধি তো রোজগারের জন্য, আর তোকে নিয়ে বাঁধবো রসের গান। তোকে শিকিয়ে দেবো, তুই গাইবি। তোর গলাটি এত মধুর।

হীরেমনি ঘুমন্ত ছেলেকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। রাইমোহন বললো, দিব্যি চাঁদপানা মুখখানি হচ্চে দিন দিন। হ্যাঁরে হীরেমনি, এ ছেলে কার রে?

—কার আবার, আমার!

—সে তো বুঝলুম। ওর বাপ কে?

—তা জেনে তোমার কী দরকার। ভগমান আমাকে দিয়েচেন ছেলে।

—ভগবান? কোন্ বাড়ির ভগবান? দত্তবাড়ি, ঠাকুরবাড়ি, শীলবাড়ি, দেবেদের বাড়ি, মল্লিকদের বাড়ি, কত ভগবান আচে। এর ওপর আবার আচে সাহেব-ভগবান! তা কোন্ ভগবান তোকে দিলে?

—তুমি চুপ মারো তো।

—ছেলে আমার নয় তো রে? আমি অবশ্য ভগবান নই, আমি ওনাদের পায়ের কুকুর।

—মুখে মারবো মুড়ো ঝ্যাঁটা!

ঘরের মাঝখানে একটা কাটা দরজা, সেখানে ঝুলছে ভারি মখমলের পর্দা। সেই পর্দা ঠেলে হীরেমনি ছেলেকে নিয়ে গেল পাশের ঘরে।

একটু পরেই এলো মদের বোতল। অন্য দিনের তুলনায় আজ এ পাড়া সত্যি বেশ নিস্তব্ধ। প্রত্যেক সন্ধ্যেতে এদিকে হাসির ফোয়ারা আর ঘুঙুরের ঝমঝমানিতে বাতাস কাঁপে।

রাইমোহন সাধারণত কোনো কাপ্তেনের স্যাঙাত হয়ে এ সব জায়গায় আসে। খরচ খর্চা সব সেই কাপ্তেনের। তাদের সঙ্গে থাকতে থাকতে রাইমোহনের এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে সন্ধ্যেরাতে আর কিছুতেই নিজের বাড়িতে মন টেঁকে না। একমাত্র হীরেমনির কাছেই সে মাঝে মাঝে একা আসে। হীরেমনি এ পাড়ায় এসেছে বছর চারেক, বয়েস মাত্র সতেরো-আঠারো।

আজ নিজেই কাপ্তেনের ভঙ্গিতে তাকিয়া হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে হাতের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে রাইমোহন বললো, একটা গান ধর না—

হীরেমনি বললো, তুমিই তো আজ গান শোনাবে বললে—

রাইমোহন চোখ বুজে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তান ধরলো, সোনার বৃক্ষে রুপোর পাতা, সেথা বসেছে এক হীরেমন পাখি—

হাতটা এগিয়ে এনে সে হীরামনির গাল টিপে আদর করলো।

কিন্তু এই আসর ভেঙে গেল অকস্মাৎ।

হীরেমনিকে সবে মাত্র দু'-এক লাইন গানের আখর শুনিয়েছে রাইমোহন, এই সময় বাড়ির সদরে একটা গাড়ি থামার আওয়াজ হলো। হীরেমনির নোকর রামদাস ছুটতে ছুটতে ওপরে এসে দরজায় ঘা দিয়ে বললো, সরকারবাবু আয়ে হেঁ, সরকারবাবু!

রাইমোহন শায়িত অবস্থা থেকে ধড়মড় করে উঠে বসে বললো, নিশ্চয়ই জগমোহন সরকার!

হীরেমনি ভুরু কুঁচকে বললো, তুমি উঠচো কেন, তুমি বসো!

রাইমোহন জিভ কেটে উত্তর দিল, মাতা খারাপ! আর এখানে আমার ঠাঁই আচে! জগমোহন সরকার এয়েচে, আমি তো তার তুলনায় একটা ছারপোকা।

হীরেমনি তার হাত চেপে ধরে বললো, না তুমি বসো। রামদাস, বাবুকে বলে দে, আজ দেকা হবে না। আজ আমার শরীল খারাপ।

—অমন করিস নি, হীরে! বাবু ফেরাতে নেই। বাবু হলো গে লক্ষ্মী, এমন হাতের লক্ষ্মী কি পায়ে ঠেলতে আচে?

—ওসব বাবু আজ ফিরে গেলে আবার কাল আসবে। তুমি সোন্দর গান শোনাচ্চিলে, আজ তুমিই থাকো।

—আরে আমি কি কখনো বাবু হতে পারি? আমার বাপ ঠাকুরদা তো আর নুনের দেওয়ানি করেনি বা সাহেবদের তল্পি বইতেও পারেনি। আমি তো তোর পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা। তুই টাকার খোঁটা দিচ্চিলি, আমি বল্লুম, এক শো টাকা এনিচি। আরে এক শো টাকা একসঙ্গে কি আমি চোখে দেকিচি কখনো? আমি বড়জোর বিশ-পঁচিশের খদ্দের!

—এই, নিমকহারামের মতন কতা বলো না। তোমার ঠেঙে কখনো আমি টাকা নিইচি? ভগমানের দয়ায় আমার টাকার অভাব নেই।

—কতার কতা বললুম। আমি পালাই, তুই বাবুকে ডাক। জুতো জোড়া আবার কোতায় গেল।

—তুমি পালাতে চাইচো কেন? আমার টাকার দরকার নেই। আমি বলচি তুমি থাকো।

—জগমোহন সরকারকে ফেরাসনি। উনি আবার ফিমেল উদ্ধারের ব্রত নিয়েচেন, মনে বড় দুঃখু পাবেন। মানী লোক!

—তবে যাও, বেরোও! দূর হও!

—আহা, তা বলে অমনভাবে ভাগিয়ে দিসনি। সবাই নাতি ঝ্যাঁটা মারে বলে কি তুইও মারবি? একটু আদর করে যেতে বল। এখন আমি যাই-ই বা কী করে। জগমোহন সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসচেন, নামতে গেলে ওঁর ঘাড়ে পড়বো।

সিঁড়িতে দুপদাপ শব্দ হচ্ছে। জগমোহনের বিশাল বপু, নেশার ঝোঁকে পা দুটিও এখন টলমল, রামদাসের কাঁধে হাত দিয়ে উঠছেন উনি। ওপরে

এসে হীরেমনির ঘরের বন্ধ দরজায় দুম দুম করে কিল মারতে লাগলেন।

হীরেমনি বললো, যাও, দরজা খুলে দাও গে?

রাইমোহন ফিসফিস করে বললো, বাবু আমাকে এখানে দেকলে মহা চটিতং হয়ে যাবেন রে! পক্ষী হলে জানলা দিয়ে উড়ে যেতুম। এখন কী করি।

—শালিক পাখির মতনই তো ভয়ে কাঁপচো।

রাইমোহন চোখ বুজে ঠোঁট ফাঁক করে নিঃশব্দে হাসলো একটুক্ষণ। তারপর কোমর দুলিয়ে নাচতে শুরু করলো।

—ভয়ে তোমার মাতাটাতা খারাপ হয়ে গেল নাকি গো?

—ভয়ে নয় রে, ভয়ে নয়, আনন্দে। আজ জগমোহন সরকারকে বাগে পেয়িচি। শোন, আমি পাশের ঘরে নুকিয়ে থাকবো, তুই যেন কিছু ফাঁস করে দিসনি।

জগমোহন হেঁড়ে গলায় বললো, কইগো হীরেমনি, দরজা খোলো!

হীরেমনি বললো, আজ আপনি ফিরে যান। আজ আমার শরীল ভালো নেই।

জগমোহন সরকার বললেন, আমি তোমার শরীর মন সব ভালো করে দোবো। আমার কাছে মোক্ষম দাওয়াই আছে।

হীরেমনিকে চোখ দিয়ে দরজা খোলার ইঙ্গিত করে রাইমোহন সুড়ুৎ করে চলে গেল পাশের ঘরে। ভেজিয়ে দিল দরজাটা।

জগমোহন সরকার ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে একটি মস্ত বড় ঢেঁকুর তুললেন। হাতের ছড়িটা মাটিতে ফেলে ভুঁড়ির ওপর দু' হাত রেখে পরম তৃপ্তির মুখভঙ্গি করে বললেন, কই হীরেমনি, তোমার শরীর তো কিছু খারাপ নয়। বদনকমলটি যেন আরও প্রস্ফুটিত হয়েছে, ইচ্ছে হয় ভ্রমর হয়ে গিয়ে আমি বসি। আমি অনেকদিন পর এলুম, অনেক দিন পর তোমায় দেকলুম।

হীরেমনি বললো, তাই তো ভাবচি। কলকেতা শহরে মেয়েমানুষ গিসগিস কচ্চে, হঠাৎ এই অধীনাকে আপনার মনে পড়লো?

জগমোহন সরকার বললেন, মনে তো সততই পড়ে। কিন্তু বড় বেশী কাজে জড়িয়ে পড়েছি এদানি। মুখ তুলবারও সময় পাই না। আজ তোমার সঙ্গে দুটি মনের কথা কইতে এলুম।

—বসুন। বাতাস করবো? একটু সরবৎ বানিয়ে এনে দোবো?

—সরবৎ! সুধাপান করতে এলুম, আর তুমি বলছো সরবতের কথা! শরীর খারাপের কথা তুলে আমাকে ফেরাতে চাইছিলে কেন, প্রিয়ে?

—অনেক রাত হয়েচে তো, শোবার উয্যুগ কচ্চিলুম!

-বেশী রাত না হলে আমি আবার বেরুতে পারি না। ছোঁড়ার দল ঘোরাঘুরি করে, কে কখন দেকে ফেলবে। মহৎ কাজে নামার অনেক বিপদ, বুঝলে হীরেমনি, সব সময় পেছনে ফেউ লেগে থাকে।

জগমোহন সরকার বসলেন। হীরেমনি তখনো দূরে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বললেন, এসো, কাছে এসো, একটু আলিঙ্গন দাও, বুকটা জুড়োক। বুকটা বড় খাঁ খাঁ করে আজকাল।

ভেজানো দরজাটা চুলের মতন ফাঁক করে সেখানে চোখ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো রাইমোহন।

শোনা যায় নবীনকুমারের যখন মাত্র পাঁচ মাস বয়েস, সেই সময়েই সে একটি বিস্ময়কর কাণ্ড করেছিল। একদিন সে খাট থেকে গড়িয়ে পড়ে যায় মাটিতে। বিম্ববতী সেদিন পাল্কি চেপে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলেন, পুত্রের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন অতি বিশ্বস্ত চিন্তামণি দাসীর ওপর। শিশুকে ঘুমন্ত ভেবে চিন্তামণি সবেমাত্র একবার ঘরের বার হয়েছে, অমনি শিশু সেই শয্যা থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল ভুঁয়ে।

শব্দ পেয়েই চিন্তামণি ছুটে এলো হাঁকুপাঁকু করে। এসে, ঐটুকু ছেলের কাণ্ড দেখে তার চোখ কপালে উঠলো। অত উঁচু থেকে পড়ে গিয়েও নবীনকুমার কাঁদেনি, বরং হামাগুড়ি দিয়ে সে পালঙ্কের নীচে লুকোবার চেষ্টা করলো যেন। হামাগুড়ি! ভয়ে বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল চিন্তামণির। পাঁচ মাসের শিশুকে হামাগুড়ি দিতে দেখেছে কেউ কখনো? পালঙ্কের নীচে হাত বাড়িয়ে চিন্তামণি ব্যাকুলভাবে ডাকতে লাগলো, অ ছোটবাবু! ছোটবাবু!

চিন্তামণি নবীনকুমারকে ধরে তুলতে সাহস পাচ্ছিল না। তার ধারণা হলো, এ ছেলের ওপর অপদেবতার দৃষ্টি পড়েছে নিশ্চিত। চ্যাঁচামেচি করে বাড়িশুদ্ধ লোককে সে ডেকে জড়ো করলো সেখানে।

নবীনকুমার গুটিসুটি মেরে বসে আছে পালঙ্কের নীচে। মুখ দেখলে মনে হয়, ঠিক যেন দুষ্টুমী করে হাসছে সে। তার কপালের বাঁদিক কেটে গেছে। সরু ধারায় রক্ত গড়াচ্ছে সেখান থেকে। পাঁচ মাসের শিশু হামাগুড়ি দেয় এবং কপাল কেটে রক্ত বেরুলেও না কেঁদে হাসে। এ দৃশ্য প্রায় অলৌকিকেরই মতন।

আট মাস বয়েসে নবীনকুমার একদিন আপনি আপনিই উঠে দাঁড়ায়। এবং দিব্যি গুড়গুড়িয়ে হেঁটে একলা একলা ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসে আবার চমকে দেয় সকলকে।

নবীনকুমারের পরবর্তী কীর্তিটি আরও চমকপ্রদ।

বিম্ববতীর পাখি পোষার শখ। বাড়িতে অনেকগুলি ময়না, চন্দনা, হিরামন ও কোকিল আছে। তিন দিকের বারান্দায় সার দিয়ে সেই সব পাখির দাঁড়গুলি সাজানো। অন্দর মহলের মধ্যখানে উঠোন। তিন মহলা বাড়ি। একতলার ঘরগুলি আশ্রিত-পোষ্য ও কর্মচারীদের জন্য বরাদ্দ। এছাড়া বাড়ির সংলগ্ন কয়েকটি গোলপাতার ঘরও আছে, সেখানে থাকে দাস-দাসীরা। দোতলার বারান্দাটির নীচের অর্ধেক রেলিং-এ ঘেরা, বাকি অর্ধেক অংশে গ্রীষ্মকালে খসখসের পর্দা ফেলা থাকে। বিম্ববতী এই বারান্দায় দাঁড়িয়েই দাস-দাসীদের প্রয়োজন মতন নির্দেশ দেন। সব দাস-দাসীর ওপরে আসার হুকুম নেই।

পাখিগুলির দাঁড়ে বসানো বাটিতে রোজ সকালে ছোলা আর জল দেন বিম্ববতী নিজে। পাখিগুলি নানা রকম সুরে ডাকে। কিন্তু কোনো পাখির মুখে বোল ফোটেনি, বিম্ববতীর শুধু এই একটা দুঃখ। তিনি প্রতিদিন তাঁর ঘরের সামনের ময়নাটির কাছে দাঁড়িয়ে পাখি পড়ান : ময়না, বল রাধেকৃষ্ণ! বল রাধেকৃষ্ণ! রাধেকৃষ্ণ!

বিম্ববতীর কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট। তাঁর মুখনিঃসৃত রাধাকৃষ্ণ নামে যেন এ বাড়ি পবিত্র হয়ে যায়। কিন্তু বোকা ময়নাটা কিছু বোঝে না। ঘাড় ঘুরিয়ে লাল লাল চোখ মেলে সে শুধু দেখে বিম্ববতীকে।

শিশু নবীনকুমারও মায়ের আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে থাকে সেই সময়। পাছে দুরন্তপনা করে সে কোনো পাখিকে ধরতে যায় কিংবা কোনো পাখি হঠাৎ ঠুকরে দেয় তাকে, তাই বিম্ববতী এক হাত দিয়ে ছেলের মাথা ঢেকে রাখেন।

ময়না বুলি শিখলো না। তার আগেই নবীনকুমার একদিন বলে উঠলো, রাধেকৃষ্ণ!

প্রায় পরিষ্কার উচ্চারণ। মায়ের দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে সে বারবার বলতে লাগলো ঐ কথা।

'মা' বললো না, দুধ বললো না, যাই বললো না, শিশুর মুখের প্রথম কথাই হলো রাধেকৃষ্ণ। তখন ঠিক আট মাস সতেরো দিন বয়েস। বিম্ববতীর সর্বাঙ্গে এক দারুণ শিহরন হলো। চিন্তামণির কথা শুনে তাঁরও মনে মনে একটু আশঙ্কা ছিল যে ছেলের ওপর অপদেবতার নজর পড়েছে হয়তো। অকালে ভূমিষ্ঠ সন্তানকে নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তা থাকেই। কিন্তু সেদিন তিনি আনন্দে কাঁপতে লাগলেন। রাধাকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করেছে যে শিশু, কোন্ অপদেবতার সাধ্য তার ধার ঘেঁষে।

ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে বিম্ববতী দৌড়োলেন তাঁর স্বামীর ঘরের দিকে।

রামকমল সিংহের ঘুম ভাঙে বেশ বেলায়। চোখ মেলে তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। বিম্ববতীর প্রায় পাগলিনীর মতন অবস্থা। হেসে কেঁদে তিনি একেবারে অস্থির। চুমোয় চুমোয় বালকের গাল সম্পূর্ণ ভিজিয়ে দিয়েছেন। বিম্ববতী যে স্বামীকে কী বলতে ছুটে এসেছেন, তা প্রথমে বুঝতেই পারলেন না রামকমল।

ছেলেই বুঝিয়ে দিল বাবাকে। সে আবার বললো, রাদে কিস্‌স-ও! ঠিক যেন যন্ত্র পুতুলের মতন আওয়াজ।

ক্রমে ক্রমে বহু জায়গায় রটে গেল যে, যোড়াসাঁকোর সিংহ বাড়িতে এক ক্ষণ-জন্মা শিশুর আবির্ভাব হয়েছে। এক বছর বয়েসেই সে নাচে, গায়, ছড়া বলে। বাড়িতে অতিথিরা এলে তাঁরা গোল হয়ে ঘিরে বসেন মজলিশ কক্ষে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে নবীনকুমার হাত পা নেড়ে, চোখ উল্টে নানা রকম কৌতুক দেখায়। সকলেই যে এ দৃশ্য উপভোগ করে, তা নয়। কেউ কেউ অস্বস্তিতে মুখ ফিরিয়ে রাখে। এ শিশুর কিছুই যেন স্বাভাবিক নয়। হাত-পায়ের গড়ন যেন কাঠ কাঠ, ঠোঁটে নাকে তীক্ষ্ণতা আছে কিন্তু লালিত্যের বেশ অভাব। তার চোখ দুটি বেশী উজ্জ্বল। তার ব্যবহারে এতখানি অকালপক্কতা দেখলে গা ছমছম করে। মনে হয়, এ শিশু বেশীদিন বাঁচবে না। প্রকৃতির খেয়ালে এ রকম একটি দুটি শিশু জন্মায় আবার হঠাৎ চলে যায়।

শ্রীরামপুরের মার্শম্যান সাহেবের সাপ্তাহিক পত্রিকা সমাচার দর্পণে ছাপাও হয়েছিল এই শিশুর খবর। 'যুগল সেতু নিবাসী প্রসিদ্ধ বাবু রামকমল সিংহের বহু সুকৃতির ফলে পরিপক্ক বয়সে এক পুত্রসন্তান লাভ হইয়াছে। ঐ পুত্রের নাম নবীনকুমার। সে তাহারদের গৃহ উজ্জ্বল করতঃ মাতা পিতাকে সুখসাগরে নিমজ্জিত রাখিয়াছে। বিশেষ কথা এই যে ঐ পুত্র অতি ভক্তিমান। দেব-দেবীর মূর্তি দেখিলেই সে দর ২ ধারে অশ্রুবর্ষণ করে ও গীত গাহে। বালকের বয়ঃক্রম এক বৎসর দুই মাস মাত্র।'

এদিকে গঙ্গানারায়ণ দিন দিন আরও নিভৃতচারী হয়ে উঠছে। এমনিতেই

সে লাজুক, বাড়িতে আত্মীয় সমাগম হলে সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, হাঁটাচলা করে নিঃশব্দে। এখন তাকে আরও দেখতে পাওয়া যায় না। নিজেকে প্রায় সব সময় আবদ্ধ করে রাখে নিজের কক্ষে। বছরখানেক আগে সে ফিরিঙ্গি পাঠশালা ছেড়ে ভর্তি হয়েছে হিন্দু কলেজে। তার মনে এসেছে নতুন জোয়ার। চোখের সামনে খুলে গেছে কল্পনার এক অপরূপ জগত।

একা ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে সে আবৃত্তি করে :

নট ম্যাড, বাট বাউন্ড মোর দ্যান আ ম্যাডম্যান ইজ;
শাট আপ ইন প্রিজন, কেপ্ট উইদাউট মাই ফুড
হুইপ্‌ড অ্যান্ড টরমেন্টেড...

রোমিওর সংলাপ উচ্চারণ করতে করতেও সে শুনতে পায় ক্যাপটেন রিচার্ডসনের কণ্ঠস্বর। ক্যাপটেন সাহেব কাব্যকে একেবারে জীবন্ত করে তোলেন। ক্লাসে পড়াতে পড়াতে কখনো তিনি সিংহের মতন গর্জান আবার কখনো বাঁশীর মতন মধুর সুরেলা স্বর বার করেন। রোমিও'র কথা বলতে বলতে তিনি নিজেই রোমিওভাবে ভাবিত হয়ে যান। আবার তিনিই ক্যাপিউলেট, তিনিই মারকুশিও, এমনকি জুলিয়েট পর্যন্ত। জুলিয়েটের কথা চোখ বুজে শুনলে মনে হবে, ক্লাসের মধ্যে সত্যিই বুঝি কোনো নারী এসে উপস্থিত হয়েছে।

রিচার্ডসনের ক্লাসে একটি পিনের শব্দ পড়লেও শোনা যায়। এমনকি মধুর মতন অত দুরন্ত ছেলেও সে সময় তন্ময় হয়ে থাকে।

গঙ্গানারায়ণের বিবাহের কথাবার্তা চলছে। রামকমল চান খুব শীঘ্রই গঙ্গাকে বিষয়-কর্মে লাগিয়ে দিতে। অনেক পাত্রী দেখার পর বাগবাজারের গোকুল বসুর কন্যা লীলাবতীকে মোটামুটি পছন্দ করা হয়েছে। লীলাবতীর বয়েস সাত। গঙ্গানারায়ণের এখন বিবাহের এতটুকুও ইচ্ছে নেই। কিন্তু সে কথাও সে মুখ ফুটে বলতে পারে না কারুকে। অতটুকু একটা মেয়ের সঙ্গে সে কী কথা বলবে? তা ছাড়া, বিবাহের চিন্তাতেই গঙ্গানারায়ণের কর্ণমূল আরক্ত হয়। ঐ ব্যাপারটির মধ্যে কী যেন একটা রহস্য আছে, তা সে এখনো ঠিক বোঝে না। ইদানীং ঐ কথা তুলে বিন্দুবাসিনী প্রায়ই খুব রঙ্গ করে।

বিন্দুবাসিনী বিধুশেখরের তৃতীয়া মেয়ে। গঙ্গানারায়ণ বিকেলের দিকে মাঝে মাঝে যায় ঐ বাড়িতে। আগে প্রায় প্রত্যহই যেত, এখন বিশেষ করে শনিবার ও রবিবার সে যেতে ভোলে না। বিধুশেখরের বাড়ির আশ্রিতদের মধ্যে একজন হচ্ছেন শিবরাম আচার্য, তাঁর কাছ থেকে নিয়মিত সংস্কৃত ও বাংলার পাঠ নিতে যেত গঙ্গানারায়ণ। কিছুদিন হলো আচার্যমশাই মার্শম্যান সাহেবের কাগজে পণ্ডিতের চাকুরি নিয়েছেন। সারা সপ্তাহ শ্রীরামপুরে থেকে শনিবার কলকাতায় আসেন।

বিন্দুবাসিনীও পাঠ নেয় ঐ আচার্যের কাছে। বিন্দুবাসিনীর পড়াশুনায় বড় আগ্রহ, সেখানেই তার সঙ্গে গঙ্গানারায়ণের মিল। বিধবা হয়ে পিত্রালয়ে ফিরে এসে বিন্দুবাসিনী পড়াশুনোয় বেশী করে মন দিয়েছে।

বিধুশেখরের কন্যার সংখ্যা পাঁচ, তিনি অপুত্রক। পুত্রসন্তান নেই বলেই বিধুশেখরের বাড়িতে গঙ্গানারায়ণের বেশী আদর। বিধুশেখরের পঞ্চম কন্যাটির বয়েস আট, তারও বিবাহ এই সামনের অগ্রহায়ণে। সেই কন্যার সঙ্গে গঙ্গানারায়ণের বিবাহ হলে ব্যাপারটি সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারতো, কিন্তু তা হবার নয়। বিধুশেখররা ব্রাহ্মণ।

বৈদিক কুলীন বলে ঐ পরিবারের মেয়েদের বিবাহ হয় কুল সম্বন্ধ করে।

কন্যাসন্তান জন্মাবার দু'-এক মাসের মধ্যেই স্বজাতের মধ্যে কোনো পাত্র নির্বাচন করে তার সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক করে রাখতে হয়। তারপর যথাসময়ে সেই নির্দিষ্ট পাত্রের সঙ্গেই বিবাহ।

বাল্য থেকেই বিন্দুবাসিনীর কপাল পোড়া। কৃষ্ণনগরের যে ছেলেটির সঙ্গে তার কুলসম্বন্ধ করা ছিল, বিন্দুবাসিনীর বয়েস সাত না পুরতেই মরে গেল সেই ছেলেটি। ফলে বিন্দুবাসিনী অন্যপূর্বা হয়ে গেল, তার আর কুলীন ঘরে বিবাহ সম্ভব নয়। এক মৌলিক ঘরের পাত্র ঠিক করা হলো তার জন্য। বিন্দুবাসিনী প্রায় গঙ্গানারায়ণের সমবয়সী। গঙ্গানারায়ণের মনে আছে বিন্দুবাসিনীর বিবাহের দিনটির কথা। সেদিন আকাশের রঙ ছিল রক্তবর্ণ। পাথুরিয়াঘাটায় সাংঘাতিক আগুন লেগেছিল, পুরো দু'দিন ধরে জ্বলেছিল সেই আগুন। সেই লাল আকাশের নীচ দিয়ে খেলাঘর ও পুতুলের সংসার ছেড়ে আট বছরের বালিকা বিন্দুবাসিনী চলে গেল শ্বশুরালয়ে। সেদিন সে গিয়েছিল কাঁদতে কাঁদতে, আবার সেই রকমই কাঁদতে কাঁদতে ঠিক দেড় বছরের মাথায় সে ফিরে এলো সিঁথির সিঁদুর মুছে।

পুত্রসন্তান না থাকলেও বন্ধুর মতন দত্তক নেননি বিধুশেখর। পঞ্চম কন্যা সুহাসিনীর সঙ্গে যার বিবাহ ঠিক করেছেন, তাকে তিনি ঘরজামাই করে রাখবেন। সদর দেওয়ানি আদালতে ওকালতি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন বিধুশেখর, উকিল হিসেবে তাঁর প্রতিপত্তি প্রায় রাজনারায়ণ দত্তের সমান সমান। সুহাসিনীর কুলসম্বন্ধ ছিল যার সঙ্গে, সে ইতিমধ্যেই আরও দুটি বিবাহ করায় ক্রুদ্ধ বিধুশেখর সেই পাত্রের সঙ্গে নিজ কন্যার সম্বন্ধ ছিন্ন করেছেন। এর ফলে সমাজে কিছু গুঞ্জন উঠেছিল, কিন্তু বিধুশেখর অর্থের জোরে সমাজের মুখ চাপা দেবেন। সংস্কৃত কলেজ থেকে একটি দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকে তিনি সুহাসিনীর বর হিসেবে ঠিক করেছেন, এই ছেলেটিও খাঁটি দাক্ষিণাত্য বৈদিক কুলীন বংশীয়।

বিধবা হয়ে ফিরে আসার পর বিন্দুবাসিনী আর পুতুল খেলায় মন দেয়নি। যথা নিয়মে অবশ্য তাকে প্রথমে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল আরও বৃহৎ একটি পুতুল খেলার ঘরে। আবেগকম্পিত গলায় বিধুশেখর বলেছিলেন, মা, আর কাঁদিস নে, আজ থেকে গৃহদেবতার সেবার সব ভার তোর ওপরেই দিলাম। মনে করিস, স্বয়ং জনার্দনই তোর স্বামী। আমরা সকলে তোর সন্তান।

কিন্তু সাড়ে ন' বছরের একটি বালিকার সর্বক্ষণ ঠাকুরঘরে মন বসবে কেন? গোড়ায় কিছুদিন সে একটা সাদা থান আলুথালুভাবে শরীরে জড়িয়ে ঠাকুরঘরে গিয়ে গম্ভীরভাবে চোখ বুজে বসে থাকতো। কখনো কখনো তার মা গিয়ে দেখেছেন যে মেয়ে কুশের আসনের ওপরই কাৎ হয়ে ঘুমিয়ে আছে।

এখন বিন্দুবাসিনী দু'বেলা নমো নমো করে কোনোক্রমে পুজো সেরে আসে, আর বাকি সময় পড়ে। সংস্কৃত ও বাংলায় তার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মেছে। কূট প্রশ্নে সে গঙ্গানারায়ণকেও হারিয়ে দেয়। বিন্দুবাসিনী প্রশ্ন করে, বল তো গঙ্গা, 'বিজ্ঞানার্থং মনুষ্যানাং মনঃ পূর্বং প্রবর্ততে'-এর মানে কী?

গঙ্গানারায়ণ কোনক্রমে উত্তর দেয়, মানুষের মন সব কিছু জানবার জন্য ব্যস্ত।

বিন্দুবাসিনী মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসে আর বলে, হলো না, হলো না! অত কী সহজ। মানুষের মন প্রথমে বস্তুর স্বরূপ জানবার জন্য প্রবৃত্ত হয়। তারপর মানুষের মন এর ওপরে উঠে যায়, আর সেই বস্তুকে অনুভব করার সংকল্প করে—আর তাতে বাধা পেলে চটে যায়।...'তৎ প্রাপ্য কামং ভজতে রোষঞ্চ দ্বিজসত্তম!'

বিন্দুবাসিনীর মুখে এত বড় বড় কথা শুনে গঙ্গানারায়ণেরও হাসি পায়। সে বলে, এ তো কাব্য নয়। এ সব শুকনো দর্শন আর আমার ভালো লাগে না।

বিন্দুবাসিনী ফোঁস করে ওঠে।

—এ সব শুকনো দর্শন? তুই বুজিস ছাই! দু'পাতা ইংরেজি পড়েই তুই সব বুজে গিয়েচিস। তাই না?

সংস্কৃত সম্পর্কে গঙ্গানারায়ণের আগ্রহ সত্যিই অনেক কমে গেছে। আর বাংলায় তো পড়বার মতন একখানাও বই নেই।

—তুই তো ইংরাজি পড়লি না বিন্দু! তুই বুঝবি কী করে যে কত সুন্দর রসের কাব্য ওরা লিকেচে। মেকলে সাহেব কী বলেচেন, জানিস? আমাদের দেশের যে কটা ভালো বই, তা আঙুলে গোনা যায়। ইওরোপীয় লাইব্রেরির একখানা তাকও ভরবে না। আর ওদের সাহিত্যের কী বিরাট ভান্ডার!

—তোর সেই মাকালু সাহেবকে জিজ্ঞেস করিস তো, শুধু গোটা মহাভারতখানা রাখতেই ক'টা তাক লাগে।

—তুই যে এত সংস্কৃত পড়াশুনো করিস, এতে তোর কী লাভ, বিন্দু? তুই তো আর টোল খুলবি না।

—আমি পড়ি আমার নিজের আনন্দের জন্য।

শিবরাম আচার্য অত্যন্ত শীর্ণকায়, কথা বলার সময় সব সময় হাঁটু দুটো নাড়তে থাকেন আর তাঁর হাতের হুঁকোয় মটমট শব্দ হয়। একতলায় তাঁর ঘরখানি দিনের বেলাতেও বেশ অন্ধকার, চতুর্দিকে ডাঁই করা পুঁথিপত্র। ঐ রকম রোগা চেহারা হলেও তাঁর গলাখানা বাজখাঁই। একখানা পুঁথি খুলে তার ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে পাঠ উদ্ধার করেন। পড়াতে ভালোবাসেন তিনি, গঙ্গানারায়ণ ও বিন্দুবাসিনীর মতন দুটি মনোযোগী ছাত্র-ছাত্রী পেয়ে তিনি বেশ উৎসাহের সঙ্গেই পড়ান। বিন্দুবাসিনীর অন্য বোনেদের কখনো পড়াশুনোয় এমন আগ্রহ দেখা যায়নি। তবে সকলেই বাংলা লিখতে ও পড়তে জানে। গঙ্গানারায়ণ লক্ষ্য করেছে যে ব্রাহ্মণবাড়ির মেয়েরা মোটামুটি লিখতে পড়তে সবাই শিখে যায়। তার মা বিম্ববতীর অক্ষর জ্ঞান নেই। ছোটভাইটি জন্মাবার আগে পর্যন্ত সে প্রত্যেকদিন মাকে বই পড়ে শুনিয়েছে।

শনিবার শ্রীরামপুর থেকে একটু আগে ফিরেছেন শিবরাম আচার্য। হাত-পা ধুয়ে জপ সেরে নিলেন। চোখ খুলেই দেখেন দুই ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত। প্রথমেই তিনি গঙ্গানারায়ণের কাছ থেকে তার বাড়ির কুশল সংবাদ জানলেন। বিশেষত গঙ্গার কনিষ্ঠ ভাইটি সম্পর্কে তাঁর বেশী আগ্রহ।

তারপর তিনি হুঁকো ধরিয়ে টানতে লাগলেন আরাম করে, পুঁথি খুললেন না।

বিন্দুবাসিনী বললো; পণ্ডিতমশাই, আপনি আজ আমাদের কালিদাস পড়াবেন বলেচিলেন, মেঘদূত...

শিবরাম আচার্য বললেন, মেঘদূতম্...হুঁ।

চিন্তিতভাবে জোরে জোরে খানিকক্ষণ হাঁটু নাচালেন তিনি। তারপর বললেন, মা বিন্দু, কিছুদিন ধরিয়াই তোমাকে একটি কথা বলিব বলিব করিয়াছি, কিন্তু বলা হইয়া উঠে না। আমার নিকট তুমি যথেষ্ট শিখিয়াছ, আর কিছু তোমার শিখিবার প্রয়োজন দেখি না।

বিন্দু অবাক হয়ে বললো, আর কিছু শেকার নেই? আপনিই তো বলেচেন, মানুষের শিক্ষার কখনো শেষ হয় না। তাছাড়া, আমি তো এখনো কিছুই

শিখিনি।

শিবরাম বললেন, যাহা শিখিয়াছ, তাহাই যথেষ্ট। আর প্রয়োজন নাই। স্ত্রীলোকের পক্ষে যতখানি শিক্ষা করা উচিত, তুমি তাহা অপেক্ষা বেশীই পড়িয়াছ।

—না পণ্ডিতমশাই। ও কথা আমি শুনবো না। পড়াশুনো না করলে আমি সময় কাটাবো কেমন করে?

—বেশ তো, যদি পাঠাভ্যাস রাখিতে চাও, নিজে নিজেই তাহা পারিবে। আমার সাহায্য লাগিবে না।

—নিজে নিজে পড়বো? আপনি তো মুগ্ধবোধ শেষ করেননি। সংস্কৃত ব্যাকরণ আমি এখনো সব বুজতে পারি না। গঙ্গা বলছিল, ওর দর্শন ভালো লাগে না, কাব্য ভালো লাগে। ইংরেজিতে নাকি ভালো কাব্য আছে। মেঘদূতের চেয়েও কি ভালো কাব্য ইংরেজিতে আছে? আপনি আমাদের মেঘদূত পড়ান।

—শুন, মা বিন্দু, মেঘদূতম্ স্ত্রীলোকের পাঠ করা উচিত হয় না।

কথাটা বলে ফেলে শিবরাম আচার্য নিজেই যেন লজ্জা পেলেন, মুখটা নীচু করলেন মাটির দিকে। বিন্দুবাসিনীর মুখখানা এবার বিবর্ণ হয়ে গেল। সে অস্পষ্টভাবে জানে যে কোথাও কোথাও একটা কিছু সীমারেখা আছে, যা সে লঙ্ঘন করতে পারবে না।

গঙ্গানারায়ণ চুপ করে বসে ছিল। শিক্ষাদানের ব্যাপারে অত্যুৎসাহী পণ্ডিতের হঠাৎ এই মন পরিবর্তনের কারণটা সে ঠিক বুঝতে পারলো না। বিন্দু কেন আর পড়বে না?

সে জিজ্ঞেস করলো, পণ্ডিতমশাই, আপনি আমাকেও আর পড়াবেন না?

পণ্ডিত বললো, তোমাকে কেন না পড়াইব? তোমার যখন ইচ্ছা আসিও।

—তা হলে বিন্দু কী দোষ করলো?

—স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা দিবার অধিকার আমাদের নাই। ইহা লোকাচার-সম্মত নহে। বিন্দু যাহা শিখিয়াছে তাহাতেই সে নিজে ধর্মগ্রন্থাদি যথেষ্ট পড়িতে পারিবে। বিশেষত মেঘদূতম্ পাঠ স্ত্রীগণের পক্ষে অতি গর্হিত।

—ঠিক আছে, মেঘদূত না হয় থাক। আপনি মহাভারত পড়াচ্ছিলেন, সেটিও তো এখনো শেষ হয়নি।

—শুন, তাহা হইলে সত্য কথাটি বলি। শুন, বিন্দু। তোমার পিতা মহাশয় আমাকে বলিয়াছেন যে, কন্যার পাঠ যথেষ্ট হইল। আর অধিক কী! সে এখন পঞ্চদশবর্ষীয়া হইয়াছে।

বিন্দু রাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আপনি তাহলে আমাকে আর পড়বে না?

—তোমার পিতার অনিচ্ছা, আমি কী করি বলো!

সমস্ত মুখখানা কুঁকড়ে গেছে বিন্দুর। ঠোঁট চেপে সে কান্না সামলাচ্ছে। এই আকস্মিক আঘাতে তার সরল অন্তঃকরণখানি যেন তছনছ হয়ে গেছে। বিনা দোষে শাস্তি পেলেই মানুষের মনে বেশী আঘাত লাগে। বিন্দু আর একটি কথাও বললো না। হঠাৎ দৌড়ে বেরিয়ে চলে গেল ঘর থেকে।

অপরাধীর মতন চুপ করে বসে রইলো গঙ্গানারায়ণ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শিবরাম আচার্য বললেন, এ গৃহ হইতে আমার এবার বুঝি পাট উঠিল। আমারও আর এত দূর যাতায়াত পোষায় না। শ্রীরামপুরেই বাসা ভাড়া লইব মনস্থ করিয়াছি।

গঙ্গানারায়ণের মন খারাপ লাগলো। বিধুশেখর হঠাৎ এ রকম নির্দেশ দিলেন কেন? বিন্দু বলেছিল, সে পড়াশুনো করে নিজের আনন্দের জন্য, তার বাবা কেন সেই আনন্দটুকু কেড়ে নিতে চান? সারল্যে ভরা হাসিখুশী স্বভাবের মেয়ে বিন্দু, তাকে দুঃখ দিয়ে কী লাভ! শিবরাম আচার্যের জন্যও একটু কষ্ট হলো তার। উনি চলে গেলে গঙ্গানারায়ণের খারাপ লাগবে। মানুষটি মৃতদার এবং ছন্নছাড়া স্বভাবের, সংসারে নাকি ওঁর কেউ নেই। তিনবার বিবাহ করেছিলেন, তিন স্ত্রীই অকাল মৃতা, তাই নিজেকে অপয়া মনে করে উনি আর বিবাহ করবেন না ঠিক করেছেন। নিজেই উনি ওঁর বিবাহের গল্প করেছেন বিন্দু আর গঙ্গানারায়ণের কাছে। মানুষটির মনটি খুব ফর্সা।

—তোমার কি আজ পাঠের মন আছে?

গঙ্গানারায়ণ বললো, আপনি চলে যাবেন, আমারও তো আর পড়া হবে না।

—তুমি কালেজে পড়িতেছ, তোমার চিন্তা কী! সংস্কৃতের যুগ ফুরাইয়াছে। আমি আর কিছুদিন থাকিলে তোমার নিকট হইতে গোটা দুই-চারি ইংরাজি শব্দ শিক্ষা করিতাম। ম্লেচ্ছভাষার এখন জয় জয়কার। ইংরাজি না শিখিলে আর কোনোদিকেই কোনো সুবিধা নাই। আচ্ছা বলো তো, নর শব্দের প্রথমার এক-বচনের ইংরাজি কী হইবে?

একটু পরে গঙ্গানারায়ণ পণ্ডিতমশাইয়ের পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে পড়লো। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, এখন তার বাড়ি ফিরে যাবার কথা। সন্ধ্যের পর পথঘাট দিয়ে একা একা চলা নিরাপদ নয়। অবশ্য বাড়ি কাছেই, গঙ্গানারায়ণ এক ছুটে চলে যেতে পারে।

কিন্তু যাবার আগে একবার বিন্দুর সঙ্গে দেখা করে যেতে ইচ্ছে হলো তার। বিন্দুর অভিমান বড় তীব্র। তাকে পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, এই অভিমানে সে হয়তো বই-খাতাপত্র সব ছিঁড়ে ফেলে দেবে। আর কোনোদিন কোনো বই স্পর্শ করবে না। তাহলে বিন্দু কী নিয়ে থাকবে? গঙ্গানারায়ণ এইটুকু বোঝে যে বিন্দুর সামনে এক সুদীর্ঘ নিঃসঙ্গ জীবন পড়ে আছে। স্ত্রীলোকের মেঘদূত পড়া নিষেধ। কী আছে মেঘদূতে? গঙ্গানারায়ণকে পড়ে দেখতেই হবে।

সুহাসিনী দোতলার বারান্দায় দাসীর কোলে বসে দুধভাত খাচ্ছে। সুহাসিনী নিজে কিছুই খেতে চায় না, তাকে জোর করে খাইয়ে দিতে হয়। সেইজন্য বিধুশেখর সুহাসিনীর জন্য একটি আলাদা ব্রাহ্মণী দাসী রেখেছেন।

—এই, বিন্দু কোথায় রে?

সুহাসিনী বললো, কী জানি! দেখিনি তো!

দাসীটি বললো, ঠাকুরঘরের দিকে যেতে দেকলুম তো একবার।

গঙ্গানারায়ণ সেদিকে এগোলো। সুহাসিনী তার সরু রিনরিনে গলায় জিজ্ঞেস করলো, গঙ্গাদাদা, তোমার আগে বিয়ে হবে, না আমার আগে বিয়ে হবে?

দাসীটি বললো, মেয়ে একেবারে বিয়ের জন্য পাগল!

গঙ্গানারায়ণ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, দাঁড়া, তোর বরকে আমি বলে দেবো, তুই দুধভাত খেতে দেরি করিস। তাহলে সে গুম গুম করে তোর পিঠে কিল মারবে।

সুহাসিনী তার ছোট্ট মুঠি তুলে বললো, আমিও তাকে মারবো।

ঠাকুরঘরের ভেতরে ঢুকবে না গঙ্গানারায়ণ। দরজার কাছে গড় হয়ে আগে প্রণাম করলো, তারপর ডাকলো, বিন্দু, বিন্দু!

কোনো সাড়া নেই। গঙ্গানারায়ণ একটু মুখ ঝুঁকিয়ে উঁকি মেরে দেখলো

বিন্দু নেই এখানে।

বিন্দু তার নিজের ঘরেও নেই। হয়তো মায়ের কাছে গিয়ে বসে থাকতে পারে। কিন্তু কান্নার সময় বিন্দু একা থাকতে চায়, গঙ্গানারায়ণ আগে দেখেছে। গঙ্গানারায়ণ ছাদে খুঁজতে গেল।

পশ্চিম দিকের আলসের কাছে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে বিন্দু। আকাশে তখনও বর্ণ পরিবর্তনের পর্ব শেষ হয়নি। একদিকের আকাশ তখন প্রায় অন্ধকার, মাঝে মাঝে রয়ে গেছে কয়েকটি রুপালি রেখা। অন্যদিকের আকাশে ঝলকাচ্ছে সোনার রঙ, কোথাও কোথাও তা সিঁদুরের মতন লাল। বিন্দু তাকিয়ে আছে সেই সূর্যাস্তের সমারোহের দিকে। শুভ্রবসনা বিন্দুকে সেই লাল রঙের পটভূমিকায় দেখে গঙ্গানারায়ণের মনে হলো, এ রকম রক্তিম আকাশের সঙ্গে বিন্দুর জীবনের যেন কোনো যোগ আছে।

গঙ্গানারায়ণ ভাবলো, পিছন থেকে চুপি চুপি গিয়ে বিন্দুর পিঠে হাত রেখে চমকে দেবে। বিন্দুর চোখে যদি এখনো জল থাকে, তাহলে সে তাকে বলবে, তুই কাঁদিস নি, বিন্দু। এখন থেকে আমি তোকে পড়াবো। আমি কালেজ থেকে যা শিখে আসবো, সে সব আবার শোনাবো তোকে।

খুব কাছে গিয়ে হাত তুলেও থেমে গেল গঙ্গানারায়ণ। তার মনে হলো, সব কিছু আর আগেকার মতন নেই। এক একটা কথায় অনেক কিছু ভেঙে যায়। পণ্ডিতমশাই আজ বারবার বিন্দুকে বলছিলেন স্ত্রীলোক। বিন্দু ঠিক কবে থেকে স্ত্রীলোক হয়ে গেল? এই তো কাল পর্যন্তও সে ছিল একটি কিশোরী, গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে কত কৌতুক করেছে। আজ যদি সে স্ত্রীলোক হয়ে যায়, তাহলে তার পিঠে হাত রাখা কি ঠিক হবে?

গঙ্গানারায়ণ উদ্যত হাতটা ফিরিয়ে নিল।



গঙ্গানারায়ণ পদব্রজেই রোজ কলেজ যায়। তার সহপাঠীরা অনেকেই আসে পালকিতে কিংবা ভাড়া করা কেরাঞ্চি গাড়িতে, জমিদারপুত্র হিসেবে তার জুড়ি-গাড়িতেই আসা উচিত, কিন্তু গঙ্গানারায়ণ হাঁটতেই ভালোবাসে। তাদের বাড়ি থেকে পটলডাঙা খুব বেশী দূর নয়। পথের দৃশ্য দেখতে দেখতে সে আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যায় কলেজে।

সেদিন সে পটলডাঙার মোড়ে পৌঁছে দেখলো কলেজের সামনে থেকে অনেক ছেলে দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে গোলদীঘির দিকে। সেখানে এক কোণে রীতিমতন একটা জটলা। কৌতূহলী হয়ে গঙ্গানারায়ণও সেই দিকে ধাবিত হলো।

গোলদীঘির উল্টোদিকে মাধব দত্তের বাজারে মাঝে মাঝে চোর ধরা পড়ে, তখন শুধু দোকানদাররা নয়, পথচারীরাও সেই চোরকে উত্তম মধ্যম ঠ্যাঙায়। চোর ছাড়াও আছে নানারকম লুটেরা। কাবাবের দোকান থেকে কোনো মাতাল হয়তো এক থাবা কাবাব তুলে নিয়ে পালালো। গাঁজার দোকানের আশেপাশে গেঁজেলরা থাকে তক্কে তক্কে, দোকানদার জলত্যাগ করার কারণে বা অন্য কিছুর জন্য একটু দোকানের বার হলেই কোনো ঘুঘু গেঁজেল সুট করে ঢুকে পড়ে

দোকান তছনছ করতে। কখনো কখনো এই সব ঘটনায় কলেজের কোনো ছাত্রও ধরা পড়ে, তখন বাজারের লোকদের সংগে কলেজের ছেলেদের কাজিয়া বেঁধে যায়। হেয়ার সাহেব গাঁজার দোকানদারদের নিষেধ করে দিয়েছেন যেন কোনো কলেজের ছাত্রকে তারা গাঁজা না বেচে, তাই তাদের দোকানেই হামলা হয় বেশী।

দোকানদাররা উত্ত্যক্ত হয়ে একদিন একটি গাঁজা-চোর কলেজের ছাত্রকে হাতেনাতে ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল হেয়ার সাহেবের কাছে। হেয়ার সাহেব এমনিতে আলাভোলা নরম মানুষ হলে কী হবে, তাঁর নির্দেশের ব্যত্যয় হলে এক একদিন ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন সাংঘাতিক। দোকানীর অভিযোগ শুনে তিনি হুংকার দিয়ে বলেছিলেন, কাশী, চাবুক লাও! কাশী মালি চাবুক এনে দিল, তিনি উগ্র মূর্তি ধরে দশ-বারো ঘা চাবুক কষালেন ছেলেটিকে।

গংগানারায়ণেরই সহপাঠী বংকু দত্তকে এরকমভাবে আর একদিন চাবুক মেরেছিলেন হেয়ার সাহেব। বংকু অবশ্য গাঁজা চুরি করেনি, সে মীর্জাপুর মিশনে সেণ্ডিস সাহেবের কাছে বাইবেল পাঠ শোনবার জন্য যাতায়াত শুরু করেছিল। সে খবর পেয়ে হেয়ার সাহেব একদিন বংকুকে নিজের কামরায় ডেকে পাঠালেন। সেদিনও তাঁর হাতে চাবুক মজুত। মুখের চেহারা বিকট। মেরে বংকুর পিঠে রক্ত বার করে দেবার পর হেয়ার সাহেব নিজেই কাঁদতে শুরু করেছিলেন, গরম জলে বংকুর ক্ষতস্থান ধুয়ে দিতে দিতে কোমল ইংরেজিতে বলেছিলেন, বাবা সকল, এখন পাঠে মন দাও। ধর্ম নিয়ে এখন মস্তক না ঘামাইলেও চলিবে!

ডিরোজিও সাহেব বরখাস্ত হবার পর থেকে হেয়ার সাহেব সাবধান হয়ে গেছেন। কলেজের ছাত্রদের মধ্যে খৃষ্টানী প্রভাব ছড়াতে দেখলেই অভিভাবকরা ক্ষেপে উঠবেন আবার। ইতিমধ্যেই কিছু কিছু ভালো পরিবারের ছেলে হিন্দু কলেজ ছেড়ে গৌর আঢ্যির ইস্কুল ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে ভর্তি হচ্ছে।

আজ আবার নতুন কী মামলা তা দেখবার জন্য ছুটে গেল গংগানারায়ণ। ভিড়ের মধ্যে তার অনেক সহপাঠীও রয়েছে। ভোলানাথ, বেণী, বংকু, ভূদেব দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি, তাদের মুখে দারুণ উদ্বেগের ছাপ।

গংগানারায়ণ তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কিসের গোলযোগ রে?

বেণী বললো, আজ আবার মধু ক্ষেপেছে!

—মধু!

স্বচক্ষে দেখবার জন্য গংগানারায়ণ নিজে ভিড় ঠেলে উঁকি মারলো। গোল জনতার মাঝখানে ঘাসের ওপরে বসে আছে মধু। তার হাতে সুরার বোতল, জড়িত গলায় সে চ্যাঁচাচ্ছে, আই অ্যাম লাইক দা আর্থ, রিভলভিং এভার রাউণ্ড দা সেল্ফ-সেইম সান, বয়—

গংগানারায়ণ শিউরে উঠলো। কিছুদিন ধরে মধু খুবই বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। আগে সে সন্ধ্যের পর সুরাপান করতো, এখন দিনের বেলাতেও বাদ থাকে না। ক্লাসেও তার মুখ দিয়ে প্রায়ই ভকভক করে দুর্গন্ধ বেরোয়, কথা বলার সময় জিভ এলিয়ে যায়। কয়েকদিন আগে কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেব এজন্য খুব ধমক দিয়েছেন মধুকে।

অদূরে রাস্তায় মধুর বাড়ির পালকি দাঁড় করানো। মধুর সংগে সব সময় দু'জন গৃহভৃত্য আসে। তারা অসহায়ভাবে দু'পাশে দাঁড়িয়ে। মধুর হাত ধরে টেনে তোলার সাধ্য এদের নেই। যখন তখন মধু ওদের লাথি ঘুষি মারে আবার মুঠো-মুঠো পয়সা দেয়।

মধুর গায়ে ইংরাজি কোট। দারুণ গ্রীষ্মেও সে এই কোট খোলে না। কিছুদিন

আগে সে বুট-পায়জামা ও আচকান ছেড়ে হঠাৎ এই কোট ধরেছে, তারপর থেকে তার সুরাপানের মাত্রাও বেড়েছে। গঙ্গানারায়ণকে দেখতে পেয়ে সে বাঁ চোখ কুঁচকে বললো, কি রে গঙ্গা, তুই এখনো রয়িচিস? ভূদেব, বঙ্কুরা সব পালিয়েচে বুঝি? সীজনস্, বোথ অব জয় অ্যান্ড সরো, আই হ্যাভ, লাইক হার, অ্যাজ আই রান, বয়—

ভিড় ঠেলে এসে বেণী বললো, মধু, এসব কী করতেছিস! শিক্ষক মহাশয়রা এ পথ দিয়ে যাতায়াত করেন, তোকে এ অবস্থায় দেকলে—

মধু ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো, দেকলে তো আমার ভারী পাঁচ পুরুষ উদ্ধার হয়ে গেল! সিলি, বেণী-লাইক টক্!

হাতের বোতলটি দেখিয়ে ইঙ্গিত করে বললো, কাম হিদার, ইফ ইউ হ্যাভ ক্যারেজ, হ্যাভ এ সিপ!

তারপর নিজেই সে নির্জলা ব্র্যান্ডি খানিকটা ঢকঢক করে ঢেলে দিল গলায়।

ভূদেব বললো, এখুনি এ খবর কার সাহেবের কানে গিয়ে পঁহুছাবে! কার সাহেব কড়া ধাতুর লোক, হয়তো এমন ব্যবস্থা লবেন...

তাকে থামিয়ে দিয়ে মধু হুঙ্কার দিয়ে বললো, আই হেইট দা ড্যামনড ফেলো কার! দিস উইল ডু মী নো হার্ম! নান্ হোয়াট এভার!

বেণী বললো, চুপ! চুপ! কান্ডাকান্ডি জ্ঞান একেবারে গ্যাচে দেকচি! স্যারের নামে ও-কথা বলতে আচে!

বঙ্কু বললো, মধু ওঠ! কালেজ যাবি না?

মধু ফরাসী কায়দায় কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, নো-ও-ও!

বঙ্কু বললো, গত এক হপ্তা তুই আসিস নাই, তুই কি আর পড়বি না?

ভূদেব বললো, কেন পড়বে না? চল মধু, আমাদিগের সঙ্গে চল।

মধু বললো, তোরা যা! ইউ গুডি গুডি বয়জ, ইউ গো টু দা ক্লাস! আমি আর যাবো না।

ভোলানাথ ফিসফিস করে বললো, এই চুপ, চুপ! রীজ সাহেব যাচ্ছেন।

অন্যরা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো, তাদের কলেজের অঙ্ক শিক্ষক রীজ সাহেব গোলদীঘির রেলিং-এর পাশ দিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন ধীর পায়ে। চোখ দুটি চিন্তামগ্ন।

মধু বললো, ও, দ্যাট ফেলো! ভয়ের কী আছে? আমি আর ভয় পাই না।

রীজ সাহেব দূরে চলে যাবার পর ভূদেব হাসতে হাসতে বললো, যতই মুখে সাহস দেখা, মধু, রীজ সাহেবকে তুই ভয় পাস ঠিকই!

ভয় যে পায় না সেটা দেখাবার জন্যই মধু আবার ব্র্যান্ডির বোতলে ঠোঁট ছোঁয়ালো। তারপর তার সরু চিবুকে চাপড় মারতে মারতে বললো, আমি মধুসূদন দত্ত এস্কোয়ার, আমি কাহাকেও ভয় পাই না!

ভোলানাথ বললো, স্যারকে ডাকবো? রীজ সাহেব সম্রাট নেপোলিয়ানের সৈন্যবাহিনীতে থেকে লড়াই দিয়েচেন, এখুনি এসে তোকে চ্যাংদোলা করে লয়ে যাবেন!

মধু বললো, ডাক, ডাক দেখি!

ভূদেব বললো, ওরকম করিসনি মধু। তুই ক্লাসে না গেলে আমাদিগেরও ভালো লাগে না।

মধু চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, কেন, তোরাই তো সব এক একটা স্টার রইচিস।

বঙ্কু বললো, আমরা স্টার হতে পারি, কিন্তু মধু, তুই হচ্ছিস জুপিটার।

ভূদেব বললো, আবার অ্যাসে কম্পিটিশান হতেছে, এবারেও মধু তুই প্রাইজ পেতে পারিস।

মধু বললো, এ ফিগ্ ফর ইওর স্কলাস্টিক ফেম্।

—তুই সত্যিই আর কালেজে যাবি না?

—নো! আই হেইট কালেজ! আই হেইট কার।

—কালেজের ওপর তোর এত রাগ হলো কেন? তুই অপরাধ করিচিলি, তাই কার সাহেব তোকে ধমক দিয়েচেন।

—ডি আল আর না এলে ও কালেজে আর আমি যাবো না! আমাকে পড়াবার মতন বিদ্যাবুদ্ধি আর কারো নাই!

—রিচার্ডসন সাহেব তো আবার ফিরে আসচেন। তিনি না আসা পর্যন্ত তুই পড়াশুনা বন্ধ রাখবি?

—ইয়েস!

—ওঠ মধু, আমার কথা শোন্।

—ইউ বী ড্যাম্‌ন্‌ড!

গঙ্গানারায়ণ এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। এবার সে ভূদেবের কানে কানে বললো, গৌরকে ডেকে আনবো? ও নিশ্চয়ই গৌরের কথা শুনবে।

ভূদেব বললো, ঠিক বলিছিস। দ্যাখ তো সে এসেচে কি না?

গঙ্গানারায়ণ কলেজের দিকে ছুটে চলে গেল। গেটের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল গৌর, সংস্কৃত কলেজের দুটি ছেলের সঙ্গে কথা বলছিল। গঙ্গানারায়ণ তাকে ডেকে একটু দূরে এনে বার্তাটি জানালো।

গৌর উদাসীনভাবে বললো, আমি গিয়ে কী করবো?

গৌরের ফর্সা ছিপছিপে চেহারা, টানা টানা চোখ, যুগ্ম ভুরু, ঠোঁটের রেখা ও থুতনিতে নারীসুলভ কমনীয়তা রয়েছে। ভিড়ের মধ্যে থাকলেও সে সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেয়।

গঙ্গানারায়ণ গৌরের আপত্তি শুনলো না, জোর করে টেনে নিয়ে এলো। জনতা ভেদ করে মাঝখানে এসে গৌর বিষণ্ণ গলায় বললো, মধু, তুই ফের ব্র্যান্ডির বোতল নিয়ে কালেজে এসিচিস?

তাকে দেখেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো মধু। দু'হাতে জাপটে ধরে দু' গালে ফটাফট করে দু'খানা চুমো দিয়ে বললো, গৌর, গৌর, কতদিন তোকে দেখি নাই! তোর জন্যই আমি এসিচি। মেকানিকাল ইনস্টিটিউশানে যাই, সেখানেও তোকে দেখি না। তোকে পর পর সাতখানা লম্বা লম্বা লেটার লিকলুম; তুই উত্তরে মাত্র একখানা পিগমি লেটার পাট্যেচিস। কেন, গৌর, কেন?

গৌর বিব্রতভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু মধু কিছুতেই ছাড়বে না। মধু গৌরের চেয়ে একটু লম্বা, রোগা চেহারা হলেও তার গায়ে বেশ জোর আছে, গৌরকে সে বুকে চেপে আছে মাতালের ভীম আলিঙ্গনে।

গৌর বললো, তুই আবার দিনের বেলা মদ খেয়িচিস?

—বেশ করিচি! কেন খাবো না? রিচার্ডসন মদ খান না? তিনি মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করেন না? সেইজন্যই তো তিনি পোয়েট্রি এত ভালোবাসতে পারেন। সেইজন্যই তাঁর কাছে পৃথিবী এত সুন্দর! তিনি কী বলিছিলেন, মনে নেই! টু কোল্ড অ্যান্ড ভালগার মাইন্ডস হাউ লার্জ আ পোরশান অব দিস বিউটিফুল ওয়ার্ল্ড ইজ আ ড্রিয়ারি ব্ল্যাঙ্ক! গৌর, কবিতা ছাড়া আমার আর কিছুই ভালো লাগে না। পোয়েট্রি ওয়াইডেনস দা স্ফিয়ার অব আওয়ার পিওরেস্ট অ্যান্ড মোস্ট

পার্মানেণ্ট এনজয়মেণ্টস। দেখিস, একদিন আমি কত বড় হবো! বায়রণ, বায়রণের সমান, তোরা তখন আমার জীবনী লিকবি।

গৌর বললো, বেশ তো, বড় কবি হবি। কিন্তু তুই আমাকে কথা দিয়িছিলি, মদ খেয়ে কালেজ পানে আসবি না।

—কথা! আমি কোনো কথা রাখতে পারি না। ইট ইজ ট্রু, গৌর, আমি কথা রাখতে পারি না। ভূদেব পারে, বঙ্কু পারে, গঙ্গা পারে। রাজনারায়ণ পারে, আমি পারি না! তা বলে তুই আমার ওপর রাগ করবি? তোর বিহনে যে আমি বাঁচতে পারিনে! তুই তো কথা রাখিস গৌর, তবু কেন তুই আমার বাড়িতে আসবি বলেও আসিস নে!

ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন চেঁচিয়ে বললো, এ যে কেষ্ট রাধার মান অভিমান!

ভূদেব বললো, লোকে সঙ দেখছে। গৌর, মধুকে এখান থেকে নিয়ে চল।

মধু কোনোদিকেই ভ্রূক্ষেপ করছে না। গৌরের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বললো, শুধু একটা প্রমিজ আমি রাখবোই! আই উইল গো টু ইংল্যান্ড। আই উইল! আই উইল। আই সাই ফর অ্যালবিয়ানস ডিসট্যাণ্ট শোর...

গৌর ধীর স্বরে বললো, আমাকে এবার ছাড়, মধু। আমি কবি হবো না, তাই আমি এখন কালেজে যাবো।

মধু অবিকল রিচার্ডসন সাহেবের গলা নকল করে কাতরভাবে গর্জন করে উঠলো, ওহ নো! আই বিসীচ ইউ! লো, রেইজড আপান দিস ভাস্ট এরিয়াল হাইট, দিস রিয়েল্‌ম্ অব এয়ার...আজ কেউ কালেজে যাবে না। না, আজ তোরা আমার সঙ্গে চল, ভূদেব, বেণী, বঙ্কু, গঙ্গা চল, সবাই চল।

এক হাতে গৌরকে ধরে রেখে অন্য হাতে সে অন্য বন্ধুদের ধরবার চেষ্টা করলো। ভিড় ক্রমশ বাড়ছে এবং আমোদ গেঁড়ে লোকেরা নানারকম টিটকিরি শুরু করেছে। ভিড়ের মধ্যে সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররাও রয়েছে।

সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজ সন্নিহিত বাড়িতে বসলেও দু' দল ছাত্রের মধ্যে রেষারেষি আছে। হেয়ার সাহেবের সুপারিশের কিছু ফ্রি ছাত্র ছাড়া হিন্দু কলেজের অধিকাংশ ছাত্রই আসে বিশিষ্ট ধনী পরিবার থেকে। সেই তুলনায় সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের গেঁয়ো গেঁয়ো চেহারা। তারা এখনো জামা পরতে শেখেনি, উড়ুনি গায়ে জড়িয়ে আসে। কিন্তু তাদের জিভগুলি ক্ষুরধার, হুল ফোটানো মন্তব্য করতে তারা ওস্তাদ। মধুর গায়ের রঙ কালো আর গৌর খুবই ফর্সা বলে তারা নানারকম উপমা মিশিয়ে কটুকাটব্য করছে।

ভূদেব এসব পছন্দ করে না। মধুর পাল্লা থেকে ছাড়া পাওয়া যাবে না বুঝে সে দ্রুত ভিড় ছাড়িয়ে এসে উঠে বসলো মধুর পাল্কিতে।

গৌরদাসকে মধু তখনো ছাড়েনি। এক হাতে ব্র্যাণ্ডির বোতল, অন্য হাতে গৌরের কব্জিটা শক্ত করে চেপে ধরে সেও টলতে টলতে বেরিয়ে এলো ভিড় ছেড়ে। এক পাল্কিতে সব বন্ধুদের জায়গা হবে না বলে মধু খুব জোরে শিস দিয়ে উঠলো দু'বার। জিভের তলায় আঙুল দিয়ে ফিরিঙ্গিদের মতন সে চমৎকার শিস দিতে শিখেছে।

পটলডাঙ্গার মোড়ে পাল্কি বেহারাদের আড্ডা। দু'খানি পাল্কি ছুটে এলো তৎক্ষণাৎ। সবাই মধুকে চেনে আর খাতিরও করে খুব। এই ছোকরা বাবু পাল্কি নিলে আশাতীত বখশিশ পাওয়া যায়।

বন্ধুবান্ধব সবাইকে তুলে মধু বললো, চালাও খিদিরপুর।

মধুদের বিশাল বাড়িতে অধিবাসীর সংখ্যা যৎসামান্য। মধুর বাবা রাজনারায়ণ দত্ত অত্যন্ত বিলাসী পুরুষ। বাড়িতে তিনি আত্মীয় স্বজনের ভিড় পছন্দ করেন না। তাঁর গাঁ সাগরদাঁড়ির জনা দুয়েক স্ত্রীলোক আছে তাঁর পত্নী জাহ্নবী দেবীর সেবার জন্য। এ ছাড়া অন্য দুঃস্থ আত্মীয় স্বজন আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এলে তাদের জন্য আলাদা বাড়ি ভাড়া করে দেওয়া হয়। রাজনারায়ণ এ বাড়ি শখ করে বানিয়েছেন এবং এ বাড়ির আদবকায়দার কথা তিনি পাঁচ কান করতে চান না।

বাড়িতে দাসদাসীর সংখ্যা চোদ্দটি। রাজনারায়ণ দত্ত রীতিমতন খাদ্যরসিক, প্রত্যেকদিন তাঁর নতুন স্বাদের খাদ্য চাই। সেইজন্য তিনি সাহেববাড়ি থেকে বাবুর্চি খানসামাদের বেশী বেতন দিয়ে ভাঙিয়ে আনেন। কোনো রান্না তাঁর পছন্দ না হলে তিনি পাত্রসমেত ছুঁড়ে ফেলে দেন। এ বাড়ির পাঁঠার মাংসের পোলাউ যে একবার খেয়েছে, সে জীবনে আর সে স্বাদ ভুলতে পারবে না। মধুর বন্ধুরা এ বাড়িতে এসে প্রায়ই নানান সুস্বাদু দ্রব্য খেয়ে যায় কিন্তু সেই পাঁঠার পোলাউয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই তারা বলে, রাজাদের মধ্যে যেমন রাশিয়ার জার, তেমনি খাদ্যের মধ্যে এই পোলাউ!

মধুর আর কোনো ভাই বোন নেই। বাড়িতে তার অপরিমিত প্রশ্রয়। মধুর যে-কোনো হুকুম তামিল করার জন্য পাঁচ-সাতজন ভৃত্য সব সময় মুখিয়ে থাকে। জাহ্নবী দেবীর কড়া নির্দেশ, আর যে কোন কাজই থাক, মধু কোনো জিনিস চাইলে, মুখ থেকে কথাটি খসানো মাত্র যেন তা পায়।

রাজনারায়ণ দত্তও পুত্র-স্নেহে অন্ধ। বেঙ্গল স্পেকটেটর, ক্যালকাটা লিটারারি গেজেট, কমেট প্রভৃতি কাগজে তাঁর সতেরো আঠারো বছরের ছেলের পদ্য ছাপা হচ্ছে, সেজন্য তাঁর গর্বের অন্ত নেই। আদালতে তাঁর সহকর্মী বিধুশেখর একদিন বলেছিলেন, তোমার ছেলে যা দারুণ ইংরেজি শিখেচে দু'দিন বাদে তো সাহেবদের মাতায় হাগবে! একথা শুনে পরম পরিতৃপ্তি পেয়েছিলেন রাজনারায়ণ। সাহেবরা দেখুক, নেটিবরা তাদের চেয়ে কোনো অংশে কম যায় না। বাড়িতে কৌচে বসে তামাক টানতে টানতে তিনি অনেক সময় আদর করে ছেলের হাতে বাড়িয়ে দেন আলবোলার নল। আবগারির দোকান থেকে মধুর জন্য মদের বোতল আসে, রাজনারায়ণ বিনা বাক্যব্যয়ে বিল মিটিয়ে দেন। এ ছাড়াও আরও কত দোকান থেকে যে মধু ধারে জিনিস আনে তা সে নিজেই মনে রাখতে পারে না, রাজনারায়ণকেই তার খোঁজ রাখতে হয়। হ্যামিল্টন সাহেবের দোকানে তাঁর বলা আছে যে বিলেত থেকে প্রত্যেকবার জাহাজ এলে যে-সব নতুন নতুন সুগন্ধ প্রসাধন দ্রব্য আসবে, সেগুলি যেন প্রত্যেকটি এক বোতল করে মধুর নামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বাড়ির লোকদের জব্দ করার জন্য মধুরও বাতিকের শেষ নেই। প্রায়ই নতুন নতুন জিনিসের জন্য বায়না ধরে সে নিজের ঘরে বসে মিটিমিটি হাসে। রাজনারায়ণ বিভিন্ন দিকে লোক পাঠান সেই জিনিসের সন্ধানে। টাকার কোনো পরোয়া নেই, জিনিসটি চাই যে-কোনো উপায়ে। সংগ্রহ করা হলে রাজনারায়ণ নিজে সেটি মধুর কাছে নিয়ে এসে হাসতে হাসতে বলেন, এবার আরও কিছু বল দেখি!

এইভাবে বাপ ছেলেতে খেলা চলে। অবশ্য, মধুর প্রধান নেশা বই কেনা।

বন্ধুদেরও মধু নানারকমে তাক লাগিয়ে দেয় প্রায়ই। নিজের ঘরে বসিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করে, কে কোন্ খাবার খেতে চাস বল চোখ মুদে। যে-কোনো জিনিসের নাম কর। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোদের জন্য তা এনে দেব! গরম গরম।

সত্যি সে তা পারে। মুর্গী, মটন, ছানার ডালনা, ডিমের হালুয়া, যে-কোনো কিছুর নাম করলেই হলো। সঙ্গে সঙ্গে হাজির। এবং গরম। মধুর জন্য নাকি প্রত্যেকদিন চার পাঁচটি উনুনে অনেক রকম খাবার সব সময় তৈরি থাকে। তার যেটা ইচ্ছে খাবে, যেটা ইচ্ছে হবে না, খাবে না। কোন্‌দিন তার কোন্‌টি খেতে ইচ্ছে হবে, তা আগের থেকে জানবার উপায় নেই।

অবশ্য এমন দিনও যায়, মধু কিছুই খায় না। পাশে সুরার পাত্র ও চোখের সামনে বই খুলে সে কাটিয়ে দেয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তখন কেউ তার ঘরে ঢুকবে না। এক সময় নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় সে তার বিছানায় মূর্ছিত হয়ে পড়ে। সেইভাবে সারারাত কেটে যায়।

বাড়ির সামনে পাল্কি থেকে সদলবলে নামলো মধু, তারপর সাড়ম্বরে ভেতরে ঢুকলো। চার-পাঁচজন ভৃত্য সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে দ্বারের কাছে। মধু কোটের পকেট থেকে এক মুঠো টাকা বার করে একজন ভৃত্যের হাতে দিয়ে বললো, ওদের মিটিয়ে দে!

তারপর সে দু'হাত ছড়িয়ে চিৎকার করলো, হেই হো! হেই হো! যেন সে জানান দিচ্ছে যে সে বাড়িতে ফিরেছে। অথচ উল্লাসভরা গলার স্বরটি এমন যেন নতুন কোনো দ্বীপে পদার্পণ করছে কোনো দুঃসাহসী রাজকুমার।

প্রশস্ত চত্বরের চার পাশে ঘেরা বারান্দা। একদিক দিয়ে উঠে গেছে মর্মর প্রস্তরের সিঁড়ি। সেই সিঁড়িতে পা দিয়ে মধু একটু থমকে দাঁড়ালো। তারপর আপনমনে বিড়বিড় করে বললো, ইফ ইউ মীট মাই ফাদার...

বন্ধুরা অন্য কথায় মগ্ন ছিল তাই মধুর কথা শুনলো না। মধু এবার বেশ চেঁচিয়ে বললো, ইফ ইউ মীট মাই ফাদার, পে নো অ্যাটেনশান টু হিম!

বন্ধুরা অবাক হয়ে গেল। মধু এরকম কথা বলছে কেন? রাজনারায়ণ দত্তের সঙ্গে বন্ধুদের দেখা হয়েছে বেশ কয়েকবার। রাশভারী রাজনারায়ণ ছেলের বন্ধুদের সঙ্গে বেশ প্রসন্ন ব্যবহার করেন। প্রত্যেকের বাড়ির খবর নেন। গঙ্গানারায়ণের বাবাকে তো তিনি বিশেষভাবে চেনেন, তাই গঙ্গাকে দেখলে স্নেহভরে অনেক কথা বলেন। মধুরও তো বাবার সঙ্গে বেশ মাই-ডিয়ারি আছে।

মধু চোয়াল কঠিন করে বললো, বাবার সঙ্গে দেখা হলে তোরা কথা বলবিনি। তোরা বুঝিয়ে দিবি যে তোরা আমার দলে।

বঙ্কু জিজ্ঞেস করলো, বাবার সঙ্গে তোর কী হয়েচে রে, মধু?

—অনেক কিছু!

রাজনারায়ণ দত্ত এই সময় আদালতে থাকেন, সুতরাং তাঁর সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। তবু বন্ধুরা সবাই বিস্মিত হয়ে রইলো।

ওপরে উঠে এসে মধু নিজের ঘরের ভেজানো দরজায় এক লাথি কষালো। দড়াম করে খুলে গেল দরজাটা। ভেতরে ঢুকে মধু বললো, বোস।

সঙ্গে সঙ্গে সে আলমারি খুলে বার করলো কয়েকটি বিলিতি কাচের গেলাস। সেগুলিতে ব্র্যাণ্ডি ঢেলে বললো, নে। নিজে একটি গেলাস তুলে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করলো।

অন্যরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে। কেউ গেলাস ছুঁলো না। গৌর দুঃখিত গলায় বললো, তুই আরও খাবি, মধু?

মধু বললো, কেন খাবো না! আজ আমার আনন্দ, খুব আনন্দ হচ্ছে, তোরা এয়িচিস। বঙ্কু নে, ভোলা নে, গঙ্গা নিবি না?

ভূদেব শেষ পর্যন্ত আসেনি, কৌশল করে মাঝ রাস্তায় নেমে গেছে। ভূদেব

অত্যন্ত বুদ্ধিমান। সে প্রায়ই বলে, আমি গরীব বামুনের ছেলে, এত বড় মানুষদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা আমার সহ্য হবে না। এর আগে যে কয়েকদিন গঙ্গানারায়ণ এ বাড়িতে এসেছে, কোনোদিনই ভূদেবকে দেখেনি। যদিও ভূদেব মধুকে খুব ভালোবাসে। বাড়িতে নিয়ে এলেই মধু মদ্যপানের জন্য সবাইকে জোড়াজুড়ি করে। ভূদেব এই সব সময়ে মধুর সংগ বর্জন করে।

মধু জোর করে গঙ্গানারায়ণের হাতে একটি গেলাস ধরিয়ে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা কেঁপে উঠলো গঙ্গানারায়ণের। তার মনে পড়ে গেল বিন্দুবাসিনীর কথা।

বিন্দুবাসিনী একদিন গঙ্গানারায়ণকে জিজ্ঞেস করেছিল, হিন্দু কালেজের তো সব ছেলেই মদ খায়। তুই-ও খাবি নিশ্চয়ই? গঙ্গানারায়ণ বলেছিল, না, কিছুতেই না। বিন্দু বলেছিল, রাস্তায় মাতালদের দেখি আর আমার ঘেন্না করে। কালেজের শিক্ষিত ছেলেরাও এমন মাতাল হয়! ছি! মদ খেলে তুই আর আমার কাছে আসিস না গঙ্গা! গঙ্গানারায়ণ বলেছিল, বললাম তো, আমি কোনোদিন সুরা পান করবো না। তুই দেখে নিস। বিন্দু বলেছিল, তুই আমার হাত ছুঁয়ে শপথ নে!

আজ কি গঙ্গানারায়ণ শপথ রাখতে পারবে? গৌর একটি গেলাস তুলে ওষ্ঠে সামান্য স্পর্শ করে বললো, বাবার সঙ্গে তোর কী গোল হয়েচে রে মধু? সত্যি করে বল্!

মধু বললো, আমাকে জোর করে বিয়ে দিতে চাইছে। কোথাকার একটা আট-ন' বছরের খুকি মেয়ে, তাকে আমি বিয়ে করবো? নেভার! রাজনারায়ণ দত্তের সাধ্য নেই!

বেণী, বঙ্কু আর ভোলানাথের বিয়ে হয়ে গেছে এর মধ্যেই। গৌরেরও যেন কার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। ওরা মধুর কথায় গুরুত্ব দিল না।

বেণী বললো, বিয়ে করতে বলচেন, চোখ বুজে বিয়ে করে ফেলবি! এতে আর কথা কী আচে!

মধু বললো, আট-ন' বছরের মেয়েকে? ইমপসিবল! সে আমার কোনো কথা বুঝবে? নাক দিয়ে সিকনি গড়াবে আর ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদবে।

ভোলানাথ বললো, এর চেয়ে বড় মেয়ে আর তুই পাবি কোথায়? কায়স্থ ঘরে কি সোমথ মেয়ে কুমারী থাকে? সারা দেশ খুঁজলেও পাবি না। এখন বিয়ে করে ফেলে রাখ, দু'-চার বছরের মধ্যেই সে মেয়ে লায়েক হয়ে যাবে!

—বাপ মায়ের পছন্দ করা মেয়ে আমি বিয়েই করবো না! না! না, না, না। এলাস্!—দে নো নট দ্যাট আই ডাই অব পেইনস দ্যাট নান ক্যান হিল।

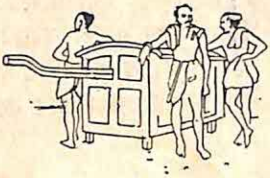
গঙ্গানারায়ণ হঠাৎ খুব বিমর্ষ বোধ করলো, মধুর মতন তারও ঠিক একই অবস্থা। সেও কিছুতেই বিয়ে করতে চায় না এখন। কিন্তু মধুর মতন সে তো এত দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করতে পারে না। তাকে নিয়তি মেনে নিতেই হবে।

বেণী বললো, সব ছেলেই বিয়ের আগে মধুর মতন একটু চেঁচামেচি করে, তারপর মেনে নেয়। মধুও মেনে নেবে। বংশরক্ষার জন্য আমরা সবাই বিয়ে করতে বাধ্য।

মধু হুঙ্কার দিয়ে বললো, বাধ্য! আচ্ছা তোরা দেখিস!

—তোর বাবা জোর করলে, তুই কী করবি? কতদিন এড়িয়ে থাকবি!

মধু আবার ব্র্যান্ডির বোতল হাতে তুলে নিয়ে বললো, রাজনারায়ণ
আমার ওপর জোর করবেন? বেশী জোর করলে রাজনারায়ণ দত্তকে আমি
পানিশমেণ্ট দেবো যে তা তিনি জীবনেও ভুলতে পারবেন না!



মধু ঝট করে গায়ের কোটখানা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল
তারপর দেওয়াল সংলগ্ন একটি কাঠের আলমারির পাল্লা খুলে গৌরকে
করলো, এবার কোন্ পোশাকটি পরি বল তো?

আলমারিতে অন্তত কুড়ি পঁচিশ রকমের কোট ঝুলছে, বিভিন্ন
গড়নের। অনেক দোকানেও এক মাপের এত রকমারি কোট দেখা
আলমারিটা রঙের শোভায় ঝলমল করছে।

বেণী জিজ্ঞেস করলো, এখন আবার কোট পরবি? তুই কি কোথাও
এক্ষুনি?

মধু বললো, না, কোথাও যাবো না। তোরা এসিচিস তাতেই
হয়েচে।

—তাহলে কোট পরবি কেন?

—তবে কি বর্বরের মতন খালি গায়ে বসে থাকবো?

—নিজেই তো আগের কোট খুলে ফেললি।

—বেশীক্ষণ এক পোশাক পরে থাকা...ডিসগাস্টিং! । কী
রঙ বদলালেই মুড বদলায়, কোন্টা পরবো বল, গৌর?

—তোর যেটা খুশী।

—তুই পছন্দ করে দিবি না? এই সোনালীটা? এটা তোর পছ

যদিও মধু শুধু গৌরেরই মতামত চায়, তবু বেণী মাঝে মাঝে
পারে না। বেণীর সঙ্গে মধুর খানিকটা রেষারেষি আছে, ক্লাসে প্রায়ই
যায়। বেণী নিজেও বেশ বড় মানুষের ছেলে, কিন্তু তার বাবার কৃ
খ্যাতি আছে। মধুর মতন বেণী পয়সা ওড়াবার আরাম পায় না!

বেণী বললো, এই দুপুরবেলা সোনালী কোট? বাবাঃ!
মধু?

মধু বললো, তোর রুচির সঙ্গে আমার রুচি কোনোদিন মিল
আই লাভ টু সী দোজ ক্লাউডস অব গোল্ডেন ডাই ফ্লোট গ্রেসফুল
ব্লু এক্সপ্যান্স...আকাশের দিকে চোখ চেয়ে দ্যাক—কেমন গোল্ডেন

বেণী জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললো, কোতায় বাবা
এ তো কোন্নগরের কালো মেঘ আকাশ ছাইচে, বিকেলে ঝড় বৃ

বঙ্কু বললো, কবিরা অমন অনেক কিছু দ্যাকে।

কোটটা গায়ে দিয়ে মধু সগর্বে মঞ্চ অভিনেতার মতন পায়চারি
নেশার জন্য তার চোখ দুটি অত্যুজ্জ্বল। মুখখানাও চকচক করে
চেয়েও আজ তাকে বেশী অস্থির দেখাচ্ছে।

বেণী বললো, অত ছটফটাচ্ছিস কেন মধু? একটু বোস না স্থি

ভনেতার ভঙ্গিতেই মধু হাসলো হা হা করে। রিচার্ডসন সাহেব হ্যামলেট সময় যেমন থুতনিটা উঁচু করে কথা বলেন, ঠিক সেই রকম মুখ করে লো, আমি স্থির হতে পারি না, পারি না, পারি না! আই অ্যাম লাইক, রিভলভিং এভার রাউন্ড দা সেলফ-সেম সান, বয়—! এই তোরা খাচ্ছিস নি গেলাস সব ভর্তি। নে, নে, এই বঙ্কু, এই ভোলা।

ঙ্গানারায়ণ মধুর পেড়াপেড়িতে ব্র্যান্ডি ভর্তি গেলাস হাতে নিয়ে চুপ সে আছে, একবারও ওষ্ঠে ছোঁয়ায়নি। অন্যরা সবাই একটু একটু করে করছে।

কজন বাবুর্চি দু' প্লেট ভর্তি কাবাব নিয়ে এলো। খুব নরম, এখনো বেরুচ্ছে। মধু দু' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, আহ্ মাই ফেভারিট! তোরা এটা করে দ্যাক, কচি বাছুরের মাংস...ওনলি থ্রি মান্থস ওল্ড...ডেলিশাস...

ঙ্গানারায়ণ শিউরে উঠলো। হঠাৎ একটা দৃশ্য মনে পড়ে গেল তার। তাদের পেছনে গোয়াল ঘর আছে। কিছুদিন আগেই সেখানে একটি গাভী প্রসব ই। জন্মাবার পরই বাছুরটা তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে লাগলো। আর পরেই ছুটে গেল পুকুর ধারে। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। গঙ্গানারায়ণ আগে া এমন দেখেনি। সেই বাছুরটার বয়েস এখন তিন মাস হবে বোধহয়। ধপধপে গা, টানা টানা চোখ, গভীর কালো, ঠিক মনে হয় যেন কাজল না, দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। সেই রকমই একটা বাছুরের মাংসের ব দেখে মধু আহ্লাদ করছে!

ন্যরা সবাই খানিকটা করে কাবাব তুলে নিল।

বেণী সবচেয়ে প্রথমে অনেকখানি একসঙ্গে পুরে দিল মুখে। আর সঙ্গে লাফিয়ে উঠলো আসন থেকে। মুখে হাত চাপা দিয়ে আ-ফু ফু ফু শব্দ লাগলো। অসম্ভব গরম মাংস, সে গিলতেও পারছে না। ফেলতেও পারছে সবাই হেসে উঠলো। বেণী সামলে নিয়ে ঢোঁক গিলে বললো, সত্যি শাস...কী নরম।

গৌর জিজ্ঞেস করলো, তোর বাবা বাড়িতেই বীফ অ্যালাউ করেন, মধু?

মধু বললো, এ বাড়িতে আমি যা চাইবো তাই চলবে!

বঙ্কু বললো, মধুর বিয়েতে আমরা দারুণ কাণ্ড করবো। বাঈ নাচ লাগাবি, মধু?

মধু বললো, বাঈ নাচ দেখতে চাস যেদিন খুশী লাগাতে পারি, কিন্তু সেজন্য য়ে করার দরকার কী? বিয়ে আমি এখন কিছুতেই করবো না!

বঙ্কু বললো, আরে রাখ রাখ! ওরকম কথা সবাই বলে! তোর বাবা যখন র করেচেন—

মধু বললো, বললুম না, আমার বাবার বাপের সাধ্য নেই আমার ওপর ার করে!

বঙ্কু সে কথাও উড়িয়ে দিয়ে বললো, তোর বাবাকে বলবো, এই শীতেই য়েটা লাগিয়ে দিতে! একটা বজরা ভাড়া নিয়ে ফুর্তি করবো ক'দিন...কমলা লে একটা মেয়ে চমৎকার নাচে, তাকে আনবো।

কমলার নাম করে বঙ্কু আড়চোখে একবার তাকালো গঙ্গানারায়ণের দিকে। গানারায়ণ জানে তার বাবা কমলাসুন্দরী নাম্নী একটি মেয়ের বাড়িতে প্রায়ই াতায়াত করেন, মেয়েটির বয়েস মাত্র সতেরো-আঠারো, পাথর কোঁদা চেহারা। ঙ্কু ইচ্ছে করেই খোঁচা মারলো গঙ্গাকে। গঙ্গা মুখ নীচু করে রইলো।

বেণী বললো, একটা গুড়ের নাগরির মতন মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলে মধু জব্দ হবে।

মধু ক্রোধে চিৎকার করে বললো, তোরাও আমার বাবার দলে ভিড়তে চাস?

গৌর বললো, মধু, আস্তে।

মধু সঙ্গে সঙ্গে স্তিমিত হয়ে গিয়ে বললো, বঙ্কু আর বেণী কেন আমার মনে ব্যথা দিচ্চে? ওরা কি আমার মন বোঝে না?

—তুই বাবাকে কী শাস্তি দিবি, মধু? বাবা মাকে কখনো শাস্তি দেওয়া যায়?

—যায়! আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো! তখন ঠ্যালা বুঝবে রাজনারায়ণ দত্ত!

বেণী ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললো, বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি? তখন তোর এত রঙ-বেরঙের পোশাক আর বোতল বোতল ব্র্যাণ্ডি আর দিনে পাঁচ রকমের খাবারের খরচ জোগাবে কে? হেঃ হেঃ হেঃ! কবিবর, তখন কি কোপ্তা কাবাবের বদলে আকাশের মেঘ আর ব্র্যাণ্ডির বদলে হাওয়া খেলেই চলবে?

—আই কেয়ার এ ড্যাম্। হ্যাঁ, হাওয়া খেয়েই থাকবো।

গৌর বললো, মধু, পাগলামি করিসনি। আমরা তো দেখিচি, তোর বাবা, তোর মা তোকে কত ভালোবাসেন, তুই তাদের মনে দুঃখ দিস না।

—দিতে হবেই। মহান কবি পোপ কী বলেছেন জানিস? "টু ফলো পোয়েট্রি, ওয়ান মাস্ট লীভ বোথ ফাদার অ্যাণ্ড মাদার।"

বেণী বললো, পোপ তো বলেছেলেন ও কথা, কিন্তু নিজের জীবনে কি পালন করেছেলেন? কবিরা মুখে অমন বলে, সব কতার কতা।

—দেকিস, দেকিস, আমি পারি কিনা।

গঙ্গানারায়ণ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি এবার বাড়ি যাবো।

মধু বললো, কেন? একি গঙ্গা, তুই কিছু খাসনি? গেলাস ফুরোয়নি।

বঙ্কু বললো, ফুরোবে কি, ও তো একটা চুমুকও দেয়নি।

মধু এক লম্ফে গঙ্গানারায়ণের কাছে এসে বললো, আমার বাড়ি থেকে কেউ না খেয়ে যায় না। খা, খা।

গঙ্গা বললো, না, মধু! আজ আমি কিছু খাবো না, আমার প্রবৃত্তি নেই!

—এক চুমুক দে আগে।

—না, আমি সুরা পান করবো না।

মধু জোর করে গেলাসটা গঙ্গার মুখের কাছে আনার চেষ্টা করলো, গঙ্গাও জোর করে ছাড়িয়ে নিতে গেল নিজের হাত, সেই ধাক্কাধাক্কিতে গেলাস পড়ে গেল মাটিতে। মদে ভিজে গেল মেঝেতে পাতা লাল রঙের পারস্য-গালিচা, গেলাসটা গড়াতে গড়াতে চলে গেল টেবিলের তলায়।

মধু ভ্রূক্ষেপও করলো না, এবার নিজের গেলাসটা তুলে এনে বললো, নে।

গঙ্গানারায়ণ হাত জোড় করে বললো, আমাকে ছেড়ে দে মধু। আমি কিছুতেই মদ খাবো না।

—তবে কাবাব খা খানিকটা...ঠাণ্ডা মেরে গেল যে ছাই।

—আমাদের বাড়িতে একটা বাছুর আছে, আমি তাকে ভালোবাসি, আমি বাছুরের মাংসও খেতে পারবো না।

বেণী বললো, বাছুর বলিস না, শুনতে খারাপ লাগে। বল বীফ!

বঙ্কু বললো, কাবাবটা একটু খেয়ে দেখলে পারতি, গঙ্গা। এমন ভালো কাবাব লাইফ-টাইমে খাইনি।

মধু বললো, এই জন্যই তোদের কিছু হবে না! তোদের হিন্দু ধর্মের ওপর এইজন্য আমার ঘেন্না ধরে যায়। বীফ অ্যান্ড ওয়াইন...স্ট্রং পিপ্‌লদের সব সময় দরকার। দ্যাক ইংরেজ, ফরাসী, রুশ, যবন সবাই গোমাংস খায়, সবাই ড্রিংক করে...এইজন্যই দে আর মাইটি, দে আর কঙ্কারার্স, ওরা ভালো কবিতাও লেকে! শুধু হিন্দুরাই মিনমিনে, নিরামিষ খায় আর ন্যাড়ামুন্ডি হয়ে বসে থাকে, সেইজন্যই অন্য জাত যখন তখন এসে হিন্দুদের গালে থাপ্পড় মেরে যায়।

বেণী বললো, আমার তো বীফ ছাড়া আর কোনো মীটই ভালো লাগে না।

গঙ্গা বললো, তোরা বীফ খাচ্চিস, ব্র্যান্ডি খাচ্চিস, তোরা হিন্দু সমাজকে উদ্ধার করবি, আমি না হয় বাদই রইলুম।

—ফুঃ! কাওয়ার্ড!

—সবাই কি সোসিয়াল রিফর্মার হয়? সবাই সাহসী হয়?

—এই গঙ্গাটার মধ্যে কোনো নিউ আইডিয়াজ নেই! তুই কি চিরকাল গোবেচারা ভালো মানুষই থেকে যাবি গঙ্গা?

—কী করবো বল! আমি তোদের মতন ব্রাইট নই! গো-মাংস খেতে আমার রুচি হয় না।

অন্য বন্ধুরা গঙ্গানারায়ণকে কোণঠাসা করছে দেখে মধু হঠাৎ এক সময় হো-হো করে হেসে উঠলো। তারপর গঙ্গানারায়ণের পিঠে এক চাপড় মেরে বললো, ওদের ঠকিয়িচি রে গঙ্গা! তুই-ও ঠকে গেলি! এ গুলো বীফের কাবাব নয় রে, বিশুদ্ধ খাসীর! বাড়িতে মা রয়েচে না, বাড়িতে কি গো-মাংস ঢোকার জো আচে? আই লাইক বীফ, কিন্তু বাইরে খেতে হয়। এগুলো খাসীর মাংস, ট্রাস্ট মী, রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে মিথ্যে বলে না, নে, একটু টেস্ট কর—

গঙ্গানারায়ণকে আর আটকে রাখা গেল না। সে চলে যাবেই। ভোলা আর বঙ্কুও আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করবে না। ওরাও যেতে চাইলো গঙ্গার সঙ্গে। সকলেই উঠে দাঁড়ালো।

মধু গৌরের হাত চেপে ধরে বললো, না, তুই যাবি না। তুই থাক।

গৌর বললো, আমি ফিরবো না? সেই কতদূর যেতে হবে!

মধু কাতরভাবে বললো, না, গৌর, তুই যাস না। আমি একা একা থেকে কী করবো? তুইও যদি চলে যাস আমি তবে আরও ড্রিংক করবো...অ্যানাদার ফুল বট্‌ল।

গৌর বললো, আচ্ছা, আচ্ছা বাবা, আমি থাকচি আর একটু।

বেণী বললো, মধু, আমিও থাকচি। আমি না হয় পরে গৌরের সঙ্গে ফিরবো। ওরা যাক।

মধুর মুখটা শুকিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। অন্যরা চলে যাবার পরও বেণীর বসে থাকা সে পছন্দ করলো না। গৌর আর মধু চুপ করে রইলো, বেণী একাই বক বক করতে লাগলো কিছুক্ষণ।

দেয়ালের পাশে একটি বড় শ্বেত পাথরের টেবিলে মধুর অনেক বই এলোমেলো করে ছড়ানো। এক সময় বেণী উঠে গিয়ে দেখতে লাগলো সেই সব বই। যদিও বেণী খুব ভালোভাবেই জানে, মধু তার বই ঘাঁটাঘাটি একদম পছন্দ করে না।

দু'খানা বই বেছে নিয়ে বেণী বললো, মধু, আমি এ দুটো তোর কাছ থেকে বরো করতে পারি?

মধু বললো, টেক অ্যাজ মেনি অ্যাজ ইউ উইশ। শুধু বায়রনস লাইফটা

নিস না। ওটা আমি পড়চি।

জানলা দিয়ে নীচে উঁকি মেরে মধু আবার বললো, আমার পাল্কি বেহারারা এখুনি নাইতে যাবে, বেণী, তুই যদি বাড়ি যেতে চাস, যেতে পারিস, ওরা তোকে পৌঁছে দেবে। নইলে পরে গেলে তোকে পাল্কি ভাড়া করতে হবে।

বেণী সচকিত হয়ে বললো, না, না, তা হলে আমি এখুনি যাবো। কিন্তু গৌর যাবে না? কি রে, গৌর?

গৌরের বদলে মধুই বললো, না, গৌর এখন যাবে না। ও সারাদিন থাকবে আমার সঙ্গে। ইভ্‌ন মে বী সারারাত!

বেণী ভুরু তুলে বললো, সারারাত!

গৌর বললো, মাথা খারাপ নাকি! সারারাত থাকবো কে বললে! তুই এগো বেণী, ও একটু ঠাণ্ডা হলেই আমি তারপর যাবো। এখন ওকে ফেলে গেলে ও আরও মদ খাবে।

বেণী মুচকি হেসে বললো, তুই ছাড়া কেউ ওকে সামলাতে পারবে না। তুই একটু আদর যত্ন কর...হ্যাঁ রে মধু, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, তুই রাগ করবি না?

—কী?

—তুই যে অ্যাক্রসটিক কবিতাটা লিখেচিস গৌরকে নিয়ে, সেটাতে গৌরকে তুই হী না বলে শী বলিচিস কেন রে? গৌরের অবশ্য ভারী সুন্দর চেহারা, মেয়ে বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।

মধু গম্ভীর স্বরে বললো, ওটা গৌরকে নিয়ে লেখা কে বললো? আমার বেশীর ভাগ কবিতাই তো গৌরকে ডেডিকেট করা, তা বলে কি সবই ওর উদ্দেশে লেখা?

—কিন্তু অ্যাক্রসটিক তো লাইনের প্রথম অক্ষর মিলিয়ে যার নাম হয়, তাকে নিয়েই লেখা হয়! ডি এল আর একদিন বলেচিলেন না? তারপরই তো তুই ওটা লিখলি। আমার মনে আছে এখনো ক'টা লাইন, গো-ও! সিম্‌পল লে! অ্যান্ড টেল দ্যাট ফেয়ার, ও-হ! টিজ ফর হার, হার লাভার ডাইজ!

—ভালো করে পড়তে শেখ, বেণী! ওভাবে কবিতা পড়ে না! মনে রাখিস, তুই বায়রন কিংবা পোপের মতন একজন মহাকবির লেখা পড়চিস।

—আমার হাতে কবিতা আসে না, নইলে গৌরকে নিয়ে আমারও ওরকম লিখতে ইচ্ছে করে...

—বেহারারা নাইতে চলে গেলে পরে কিন্তু ওদের ডেকে ডেকে আর পাওয়া যাবে না।

—না, না, আমি যাচ্চি, যাচ্চি।

বেণী তাড়াতাড়ি উঠে বেরিয়ে গেল। তাকে সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসে দরজাটা ভেজিয়ে দিল মধু। ভুরু থেকে বিরক্তি উধাও করে সে বললো, কৃপণের ব্যাটা কৃপণ! পাল্কি ভাড়া দিতে হবে শুনেই পালালো। গুড রিডেন্স।

গৌর আরক্ত মুখে নতনেত্র হয়ে বসে আছে।

মধু ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে ফটাফট চুমো দিতে দিতে বললো, এবার শুধু তুই আর আমি। আমি আর তুই। গৌর আর মধু। মধু আর গৌর। আহ্‌! বড় আনন্দ।

গৌর নিজেকে অতি কষ্টে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, তুই কী পাগলামি করিস, মধু! সকলের সামনে আমায় এমন লজ্জায় ফেলিস!

মধু বললো, কিসের লজ্জা! আই অ্যাম প্যাশানেটলি ফন্ড অফ ইয়োর কম্পানি, অ্যাজ আই অ্যাম অফ ইউ!

—বেণী কি রকম বিশ্রীভাবে কথা বলে গেল!

—বেণী বী ড্যাম্‌ন্‌ড।

—না মধু, তুই মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্চিস। আজকাল তুই অন্যের কোনো কথা শুনিস না।

—শুধু তোর কথা শুনি।

—তুই এমন ছেলেমি করলে আমিও আর কখনো আসবো না।

—ওকথা বলিস নি গৌর, ওকথা বলিস নি। তোকে না দেখে আমি থাকতে পারবো না। এইজন্যই কি সম্প্রতি তুই আমাকে অ্যাভয়েড করিস?

—আমাদের আরও কত বন্ধু আচে, তুই আর কারো নামে কবিতা ডেডিকেট করিস না, শুধু তুই আমার নামে করিস কেন?

—বেশ করি! আমার শুধু তোকেই ভালো লাগে। তোর জন্য আমি কী এনে রেখিচি দ্যাক। টেবিলের ঐ টানাটা খোল।

—আবার কী এনিচিস?

মধু নিজেই টেবিলের ড্রয়ার খুলে ফেললো হ্যাঁচকা টানে। তার মধ্যে রয়েছে দুটি সুদৃশ্য প্রসাধন সামগ্রীর বোতল। মধু সে দুটি তুলে নিয়ে বললো, এই দ্যাক, সবচেয়ে বড় ফরাসী কম্পানির পমেটম্‌। আর এটা ল্যাভেন্ডার!

—তুই আবার এসব আনিয়েচিস আমার জন্য?

—তুই সেদিন বলিছিলিস না, তুই ল্যাভেন্ডার খুব ভালোবাসিস?

—সে তো কতার কতা!

—ল্যাভেন্ডারটা অতি কষ্টে জোগাড় করিচি...সব সময় পাওয়া যায় না।

—তুই আমার জন্য কত খরচ করবি, মধু? এই তো সেদিন 'ফরগেট মী নট' পাঠালি!

—স্টিল ইউ ফরগেট মী! খরচের কথা কেন বলচিস, গৌর? তোর জন্য আমি সর্বস্ব দিতে পারি। তোর একটা ছবি আমি আমার কাচে রাখতে চাই, সে ছবি গড়াবার জন্য যদি আমার সব জামা-কাপড় বিক্রি করে দিতেও হয়, তাতেও আমি রাজি।

দু' হাত ছড়িয়ে চোখ বুজে মধু আবেগের সঙ্গে বললো, অ-ল কাইন্ড, টু দিজ ফন্ড আর্মস অব মাইন। কা-ম! অ্যান্ড লেট মী নো লঙ্গার সাই!...বেণী স্টুপিডটা ঠিকই ধরেচে, এই অ্যাক্রসটিকটা তোকে নিয়েই লেকা!

মধু আলিঙ্গনের জন্য এগিয়ে আসতেই গৌর টেবিলের অন্য দিকে চলে গিয়ে প্রসঙ্গ ঘোরাবার চেষ্টা করে বললো, তুই কি আর সত্যিই কালেজে যাবি না মধু!

মধু বললো, রিচার্ডসন যদি আবার পড়াতে আসেন, তখন ভেবে দেখতে পারি।

—পড়াশুনো মানে কি শুধু কাব্য-পাঠ? তুই অঙ্কের ক্লাসে যাস না অনেকদিন।

—অঙ্ক আমি ঘৃণা করি। অঙ্ক শিখে কী হবে? অঙ্ক তো যে-সে শিখতে পারে, আমি পোয়েট, আমার অঙ্ক নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। শেক্সপীয়ার ইচ্ছে করলে নিউটন হতে পারতেন কিন্তু নিউটনের সাধ্য ছিল না শেক্সপীয়ার হওয়ার।

—আর বাংলা ক্লাসে যাওয়া তো একেবারে ছেড়েই দিয়িচিস!

—ঐ চাকর-বাকরদের ল্যাঙেগায়েজ শিখে আমি সময় নষ্ট করবো বলতে চাস? ফাই আপঅন ইট।

—আমরা বাড়িতে এখনো বেঙ্গলিতে কথা বলি। শুধু চাকর-বাকরদের ল্যাঙেগায়েজ বলচিস কেন?

—কথা বলার জন্য ল্যাঙেগায়েজ শিখতে হয় না। মুটে-মজুরও কথা বলে।

—হেয়ার সাহেব বলেছিলেন, যারা বেঙ্গলি শিখবে না, তাদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না।

—আমি পরীক্ষা গ্রাহ্য করি না। আর হেয়ার সাহেব! বাদ দে, বাদ দে! মাগুর মাছের ঝোল আর ঝিঙে-পোস্ত খেয়ে খেয়ে হেয়ার সাহেব তো এখন পুরোপুরি ভেতো হিঁদু হয়ে গেচে।

—হেয়ার সাহেব আমার নমস্য। ওঁর কথাতেই আজকাল আমি বাংলায় মন দিয়েচি।

—ঐ ল্যাঙেগায়েজে আর কতটুকু শেখার আচে রে? ওতে আচে কী? যে ভাষায় কবিতা লেখা যায় না, সেটা আবার একটা ভাষা?

—ভারতচন্দ্র তো বেঙ্গলিতেই লিখেচেন। আজকাল ঈশ্বর গুপ্ত লিখচে।

—ভারতচন্দ্র আবার কবি? বায়রন, ওয়ার্ডস্বার্থ-এর পায়ের নখের যোগ্য নয়। আর ঐ ঈশ্বর গুপ্তর মতন পদ্য আমি যখন তখন লিখতে পারি।

—তুই বেঙ্গলিতে কবিতা লিখতে পারিস? লিখে দেকা তো!

—এক্ষুনি লিখে দেখাচ্চি! কাগজ কলম নে।

—আমি লিখবো?

—আমি বলচি, তুই লিখে যা। বেঙ্গলির স্পেলিংটেলিংগুলো আমার মনে থাকে না। ঐ রেফ আর র-ফলা আর যুক্তাক্ষর, বীভৎস ল্যাঙেগায়েজ! ঐ ল্যাঙেগায়েজ নিজের হাতে লিখতে আমার ঘেন্না হয়! তুই তো একটা মেয়ে, তাই বেঙ্গলি ভালোবাসিস।

—এই মধু!

—আমি বেঙ্গলি ভালোবাসি না, তবু তোকে ভালোবাসি, গৌর! তুই লেখ, আমি বলে যাচ্চি...কী নিয়ে লিখবো বল? পাহাড়? সমুদ্র? সুন্দরী রমণী? বাঙালীদের মধ্যে আবার সুন্দর কোতায়? মেঘ করেচে, আচ্ছা বর্ষাকাল নিয়ে লেখা যাক।

পেছনে হাত দিয়ে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ মুখ তুলে মধু বললো, লেখ, 'গম্ভীর গর্জন সদা করে জলধর/উদবিল নদ নদী...'

গৌর বললো, 'উদবিল'? তার মানে কী?

—মানে নেই বুঝি? তা হলে লেখ, উথলিল। 'উথলিল নদ নদী ধরণী উপর' —মিলেচে? জলধর আর উপর, ঠিক মেলেনি? তোদের বাঙলায় তো আবার মিল ছাড়া পদ্য হয় না। এর পরের লাইন :

'রমণী রমণ লয়ে, সুখে কেলি করে'

গৌর জিজ্ঞেস করলো, রমণ লয়ে? তার মানে? রমণীরা কার সঙ্গে সুখে কেলি করবে?

—কেন, রমণের সঙ্গে?

—রমণ কে? ওঃ হো! তুই বুঝি ভেবেচিস রমণীর ম্যাসকুলিন রমণ?

—তা নয়? ঠিক আচে, পরের লাইনে মিলিয়ে দিচ্চি!

"রমণী রমণ লয়ে সুখে কেলি করে
দানবাদি দেব যক্ষ সুখিত অন্তরে"

—সুখিত? সুখিত কথাটা হয়?

—কেন হবে না? আমি মধুসূদন দত্ত বলচি, হয়! দুঃখিত যদি হয় তাহলে সুখিত হবে না কেন?

—আচ্ছা মানলুম। এখানেই শেষ?

—না, আরো আচে। লেখ্...

"সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব
বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রবল প্রবল প্রতাপ"

—মিললো না!

—মেলেনি? প্রবল, প্রবল, আচ্ছা লেখ, প্রবল প্রভাব।

—"বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রভাব?"

—হ্যাঁ! তারপর, আচ্ছা, স্বাধীন বানান কি রে?

—দন্তেয় স-এ ব-ফলা আকার...

—ব-ফলা আছে? এই ফলাগুলি নিয়েও আর এক ঝামেলা! শোন, ঐ ব-ফলা দিতে হবে না, শুধু স দিয়ে লেখ।

—সাধীন?

—হ্যাঁ।

—দূর তা আবার হয় নাকি? সাধীন কথাটার কোনো মানে হয় না।

—তুই লেখ না। এখানে ব-ফলা দিলে চলবে না। কারণ আছে। শুধু স দিয়ে লেখ্।

"সাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়
কলহ করয়ে কোনো মতে শান্ত নয়॥"

—ব্যস, শেষ।

—কবিতার কী মানে হলো?

—মানে হলো না? তোর ঐ ঈশ্বর গুপ্তর চেয়ে ভালো হয়েচে। আমি যা লিখবো, তাই ভালো হবে। কবিতাটা আট লাইন হয়েচে তো ঠিক? এবার তুই সবটা একসঙ্গে পড়। আর প্রত্যেক লাইনের প্রথম অক্ষর জুড়ে দ্যাখ কী হয়!

গৌর মাথা নীচু করে কবিতাটা পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তার ফর্সা মুখটা রাঙা হয়ে গেল।

মুখ তুলে সে বললো, আবার? তোকে নিয়ে যে আর পারি না!

মধু হাসতে হাসতে বললো, গউরদাস বসাক! ঠিক হয়েচে কি না! বাঙলাতেও আমি একটা অ্যাক্রসটিক লিখে দেখিয়ে দিলুম! বেণীকে বলিস, এটাও অ্যাক্রসটিক, এটারও সব লাইনের প্রথম অক্ষর নিয়ে তোর নাম হয়। কিন্তু এটা তোকে নিয়ে লেখা নয়, বর্ষাকাল নিয়ে লেখা। ইচ্ছে করলে আমি সব পারি, বুঝলি? তবে, তোদের এই ডার্টি ল্যাঙ্গোয়েজের কোনো বই আমার ছুঁতেই ইচ্ছে করে না! স্যাংস্কৃটে বামুন বামুন গন্ধ আর বাঙলায় চাকর-বাকরের গন্ধ!

—এসব কথা তুই কার কাচ থেকে শিখলি রে মধু?

—কার কাচ থেকে আবার শিখবো?

—শুনলুম তুই নাকি আজকাল কেষ্ট বাঁড়ুজ্যের কাচে ঘোরাঘুরি কচ্চিস?

—হ্যাঁ, গেচি কয়েকবার। কেন?

—ওনার কোনো সুন্দরী মেয়েটেয়ে রয়েচে বুঝি? তার দর্শন লাভের বাসনায়

যাস?

—এঃ হে হে! গৌর, তোর হিংসে হয়েচে দেখচি? হ্যাঁ, ঠিক বুঝতে পেরেচি, মুখ রক্তিম বর্ণটি ধারণ করেচে, আমি কোনো উওম্যান-এর কাচে গেলে তোর রাগ হয়, সেটা বলবি তো?

মধু এবার গৌরকে ধরে ফেলে বুকে জড়ালো। চুমো দিতে দিতে বলতে লাগলো, কিন্তু আমি তোকেই সবচেয়ে বেশী ভালোবাসি, গৌর, রাগ করিস নি, রাগ করিস নি।

—আঃ মধু, ছাড়, ছাড়।

ডান দিকের দেয়ালে একটি দরজা, তার ওপাশে মধুর শয়ন কক্ষ। মধু গৌরকে টানতে টানতে নিয়ে এলো সেখানে। জোর করে তাকে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে বললো, দাউ হ্যাস্ট ফরগট্‌ন দাই প্রমিজ অব অনারিং মাই পুয়োর কট উইথ দা সেক্রেড ডাস্ট অব ইওর ফিট!...আজ সেই প্রমিজ ফুলফিল কর। আমার খাটে একটু তোর পায়ের ধুলো দে।

গৌর বিব্রতভাবে বললো, আমি এবার যাবো!

—না, না, গৌর, তুই যাবি না।

মধু নিজে মাটিতে বসে পড়ে গৌরের উরুর ওপর দুই হাত রেখে বললো, তোর কোল পেতে দে, আমি মাথা রাখবো।

—কী পাগলের মতন কচ্চিস মধু?

—সেদিন আমি তোর কোলের ওপর কাগজ রেখে লিখতে গেসলাম, কিন্তু তুই কাগজ ফেলে দিলি—

আই থট আই শ্যাল বী এব্‌ল্‌
(মেকিং দাই ল্যাপ মাই টেবল্‌)
টু রাইট দ্যাট নোট উইথ ঈজ :—
বাট হা! ইয়োর শেকিং
গেভ মাই পেন আ কোয়েকিং;—
রুডনেস নেভার আই স লাইক দিস—

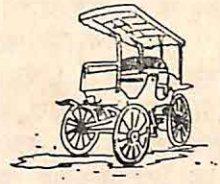
—কেন, কেন, কেন, কেন, গৌর? আমি তোকে এত ভালোবাসি, অথচ, তুই কেন আমাকে ভালোবাসিস না? কেন আমাকে ফিরিয়ে দিস তুই? এত কবিতা লিখি তোকে নিয়ে, তবু তোর মন পাই না? আজ তোকে কাচে পেয়েচি অনেকদিন পর।

—মধু, মাতলামি করিস না। ছাড় আমাকে।

—না, না, না।

মধুর বাড়াবাড়িকে প্রশ্রয় না দিয়ে গৌর দু' হাত দিয়ে জোর করে ঠেলে দিল তার মাথাটা। ভারসাম্য হারিয়ে মধু মেঝেতে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল, দড়াম করে শব্দ হলো মাথা ঠোকার। গৌর সত্যিকারের কুপিত হয়েছে, সে মধুকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়ালো না।

একটু বাদে মধু উঠে বসে অত্যন্ত নিঃস্ব গলায় বললো, গৌর, তুইও আমায় দূরে ঠেলে দিলি? আমার আর কেউ রইলো না। আমি আর তোকে জ্বালাতন করবো না। দেকিস, একদিন আমি হঠাৎ কোথায় চলে যাবো, তোরা আর আমাকে খুঁজেও পাবি না!



বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল এক পুরুষেই প্রচুর টাকা রোজগার করেছেন। অন্য অনেকের মতন তাঁরও ভাগ্য ফিরেছে নুনে।

লুণ্ঠনপর্বের গোড়ার দিকে ইংরেজ কোম্পানি কাতারে কাতারে জাহাজে এ-দেশ থেকে মালপত্র ভরে নিয়ে যেত নিজের দেশে। ফেরার সময় তার অধিকাংশ জাহাজই খালি আসতো। ও-রকম খালি জাহাজ নিয়ে গভীর সমুদ্র পাড়ি দেওয়া বিপজ্জনক, ঝড়ের সময় সেগুলো খেলনার মতন পলকা হয়ে যায়, উল্টে যায় হঠাৎ। তাই সাহেবরা সেই জাহাজগুলি সবচেয়ে সস্তা জিনিস, নুন দিয়ে ভর্তি করে আনতে শুরু করে। প্রথম প্রথম সেই নুন এমনি ফেলে দেওয়া হতো। কিন্তু অচিরেই বণিক জাতির চৈতন্যোদয় হলো। ফেলে দেবার দরকার কী, এই নুনও বিক্রি করা যায়। সাত সমুদ্র তের নদীর পাড় থেকে নুন আমদানী করার কোনো প্রশ্ন ওঠে না যদিও বিলিতি নুন ও ভারতীয় নুন একই রকমের নোনতা, তবু এ-দেশের ডামাডোলের মধ্যে ইংরেজ নানা কৌশলে সেই নুন বিক্রি করা শুরু করলো। দিশী বাজারে নুন চালাবার জন্য সাহায্য নিল কিছু কিছু দিশী লোকের।

ক্রমে ক্রমে এখানকার সমগ্র লবণ ব্যবসাটিই ইংরেজ একচেটিয়াভাবে গ্রহণ করে। লবণ অর্থাৎ করকচ, যা শুধু সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য এবং নতুন ব্যবসায়ীদের কেরামতিতে যার দাম যখন তখন লম্ফ দিয়ে বাড়ে। দেশী উৎপাদকদের বঞ্চিত করে বিদেশী বণিকদের লভ্য বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে নিজেদেরও সংস্থান করে নিয়েছিল কিছু দেওয়ান ও উপদেওয়ানরা। আদি যুগের কলকাতার অনেক ধনীই প্রকৃতপক্ষে এই নুনের গোলাম।

বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল বড়লোক হবার পর শেষ বয়েসে গান বাজনা, হাফ-আখড়াই আর শখের যাত্রা নিয়ে খুব মেতেছিলেন। তাঁর অগাধ বিষয় সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিয়েছিলেন উত্তরাধিকারীদের মধ্যে। বাড়ির কাছেই তিনি যে একটি মস্ত বড় বাজার বসিয়েছিলেন, সে বাজারের মালিকানা তিনি লিখে দিয়েছিলেন তাঁর এক ছেলের বউয়ের নামে। সেই বউরাণীর বাজারের নামই লোকের মুখে মুখে হয়ে যায় বউবাজার। ক্রমে পুরো পল্লীটিরই ঐ নাম হয়।

বউবাজার পাড়াটি বড় বিচিত্র। অনেককাল থেকেই এ পল্লীতে বারবনিতাদের রবরবা। বড় মানুষরা তাদের রক্ষিতাদের জন্য আলাদা বাড়ি করে দিয়েছে। ভাগ্যান্বেষণে অনেক মুসলমান ও পশ্চিমা বাঈজীরাও তাদের জীবন্ত শিল্পপসরা সাজিয়ে বসেছে এখানে। পাইকার, ব্যাপারী আর ইজারাদারদের রাত্রিবাসের জন্য সরাইখানাও গজিয়ে উঠেছে অনেক, যেখানে শয্যা ও শয্যাসঙ্গিনী দুই-ই মেলে।

তাছাড়া এখানে আছে এমন কালীমন্দির যেখানে সাহেবরাও আসে পুজো দিতে। সব ব্যাপারেই সাহেবদের অগ্রাধিকার বলে, যেদিন সাহেবরা কোনো কিছুর মানত করে ডালি সাজিয়ে পুজো দিতে আসে সেদিন পুরুতরা অতি উৎসাহে নেটিভ নিত্য-পূজার্থীদের হাত দিয়ে ঠেলে দিতে দিতে বলে, হঠ যাও, হঠ যাও, আগে গোরা পূজা, আগে গোরা পূজা। সাহেবরা ভক্তিভরে পায়ের জুতো খুলে

মাথা নীচু করে কালী মূর্তির দিকে এগিয়ে যায়।

হাফ-আখড়াই, শখের যাত্রা, বুলবুলির লড়াইতে এ পাড়া প্রায়ই জমজমাট থাকে। ইদানীং উড়িষ্যা থেকে আগত গোপাল নামে একটি ছেলে বিদ্যাসুন্দরের গান গেয়ে সবাইকে খুব মাতিয়ে রেখেছে। শোনা যায়, ঐ গোপাল আগে পথে পথে কলা বিক্রি করতো। একদিন সে বাবু বিশ্বনাথ মতিলালের বাড়ির বাইরে হাঁক দিয়েছে, চাই কলা, চাঁপা কলা-আ-আ—অমনি বাড়ির মালিক বৈঠকখানা ঘরে বসে কান খাড়া করলেন। দু'-তিনবার সেই কলাওয়ালার হাঁক শুনে বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল তাঁর বয়স্য রাধু সরকারকে বললেন, শুনচো, রাধু, লোকটার গলা শুনচো? খাঁটি কোমল গান্ধার লাগ্যেচে। কেমন খেলাচ্চে সুরটাকে। ওরে কে কোথায় আচিস, ধরে আন। লোকটাকে ধরে আন।

সেই গোপালকে নিয়ে গড়া হলো যাত্রা পার্টি। তার গলার গান এখন লোকের মুখে মুখে ফেরে। "মদন আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ কল্লে কি গুণ ঐ বিদেশী"!

বউবাজার পাড়ার নানা গলির মধ্যে পুরোনো আমলের অনেক বাবুদের বাড়ি রয়েছে। শহরে জনসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, তাই সেই সব অনেক বাড়ির বৈঠকখানা এখন ভাড়া দিয়ে দেওয়া হচ্ছে বহিরাগতদের। একখানা দু'খানা ঘরে কোনো রকমে মাথা গুঁজে থাকে দশ-বারো জন পুরুষ মানুষ। নিত্য নতুন গজিয়ে উঠছে এ রকম এক একটা মেসবাড়ি। সাধারণত একজন কেউ কলকাতার চাকরি পেয়ে ও রকম ঘর ভাড়া নেয়, তারপর গাঁ থেকে ছেলে, ভাই, ভাগ্নেদের আনিয়ে কলকাতার ইস্কুলে ভর্তি করে দেয় কিংবা চাকরির উমেদারিতে লাগায়। ক্রমে ক্রমে দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন কিংবা তাদের সুপারিশ নিয়ে কেউ কেউ চাকরির ধান্ধায় এসে জুটে যায় সেখানে। থাকা তো বিনামূল্যে বটেই, খাওয়াও প্রায় আধলা না খরচ করে, তার বদলে রান্না করা, বাসন মাজার কাজগুলো করে দিতে হয়, এই যা!

বউবাজারের পঞ্চাননতলা গলিতে এ রকম কাছাকাছি দুটি মেসবাড়ি আছে। একটি চালান জয়রাম লাহিড়ী। দু'খানি ঘর ও এক চিলতে ছাদে মোট তের জন মনুষ্য থাকে। জয়রাম ধীর, স্থির, নিষ্ঠাচারী ভদ্রমানুষ। কিন্তু জীবিকা অর্জনের জন্য তাঁকে সারাদিন প্রায় মুখের রক্ত তুলে শ্রম করতে হয়। সকালে নাকে মুখে কিছু অন্ন গুঁজে তিনি বেরিয়ে যান, ফিরতে ফিরতে রাত্রি ন'টা-দশটা বেজে যায়। তিনি কাজ করেন খিদিরপুরে এক সাহেবের অধীনে। মাঝে মাঝে সাহেবের সঙ্গে তাঁকে দু-চার দিনের জন্য মফঃস্বলে যেতে হয়। স্বগ্রামের যে-সব লোকেরা তাঁর কাছে এসে আশ্রয় চায়, তিনি কারুকেই বিমুখ করেন না, এত বড় একটা সংসারের খরচ তিনি একা জোগান, এছাড়া কারুর স্কুলের বেতন, কারুর যাতায়াতের ভাড়াও তিনি দিয়ে যান নিয়মিত। অতিশয় ভালো মানুষ বলেই তিনি খেয়াল করেন না যে, এত রক্ত-জল-করা পরিশ্রমের টাকায় তিনি কতকগুলো কুলাঙ্গার পুষছেন।

জয়রাম লাহিড়ীর পোষ্যরা পাড়ার মধ্যে একটি আতঙ্কবিশেষ। তাদের গোদাগোদা চেহারা, বিকট গলার আওয়াজ। জয়রামের সামনে তারা চুপেচাপে থাকে, আর জয়রাম বাসা থেকে বেরুলেই তারা নিজমূর্তি ধরে। তাদের মধ্যে তিনজন মোটে সামান্য চাকরি জুটিয়েছে, বাকিরা সর্বক্ষণ বাসায় বসে গুলতানি করে আর মদ গাঁজা খায়। এমন কি যে তিনটি কিশোর আছে দলের মধ্যে, স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলেও তারা ক্লাসে যায় না। বড়োরা তাদের দিয়ে জোর করিয়ে বেশী কাজ করায়। এমনও দেখা গেছে, বুড়োধাড়িরা সারা গায়ে তেল মেখে হাত-

পা ছড়িয়ে বসে আছে কুয়োর ধারে, আর সেই তিনটি কিশোর অবিরাম জল তুলে তুলে তাদের মাথায় ঢালছে। সারা দুপুর ধরে চলে এই স্নানপর্ব।

কিশোরদের মধ্যে একটির নাম রামচন্দ্র। পল্লীর লোকে বলে, বাবাঃ, এ আপদের নাম রামচন্দ্র কে রেখেছে? এর নাম হওয়া উচিত ছিল হনুমানচন্দ্র! সেই রামচন্দ্রের উপদ্রবে প্রতিবেশীরা অস্থির। চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়েস হলেও তার বেশ ঢ্যাঙা চেহারা, গায়েও যথেষ্ট শক্তি আছে। আরপুলির গলিতে একটা ইস্কুলে তার নাম লেখানো আছে বটে, কিন্তু সেখানে সে যায় কদাচিৎ। পাড়ার মধ্যে কোনো ফেরিওয়ালা এলে সে কিছু না কিছু চুরি করে পালাবেই। জামরুল, আম, কলা যাই হোক না। এক থাবা দিয়ে তুলে নিয়ে সে দৌড়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

ও বাড়ির বয়স্কদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যক্তিটির নাম হরবল্লভ। তার কীর্তি-কাহিনী এমনই ছড়িয়ে গেছে যে, এমন কি তার কিছু কিছু জয়রামেরও কানে গেছে। এর মধ্যে দু-বার জয়রাম নিজের চেষ্টায় সেই হরবল্লভকে চাকরি জুটিয়ে দিয়ে বলেছেন, বাপু, তুমি এবার নিজে পৃথক বাসা ভাড়া নেও। হরবল্লভ দু-চার দিনের মধ্যেই সেই চাকরি খুইয়ে মুখ কাঁচুমাচু করে ফের জয়রামের পা জড়িয়ে ধরে। জয়রাম আর কিছু বলতে পারেন না।

হরবল্লভের আসল কাজ, অন্য যারা চাকরি করে তাদের কাছ থেকে টেকসো আদায় করা। কে কোন্ দিন বেতন পায়, সেই হিসেব তার নখদর্পণে, সেই সেই দিন সে তাকে তাকে থাকে। সেদিন তার ওপরে হামলে গিয়ে পড়ে, বলে, দে শালা, টাকা দে। ফুর্তি করবো, তুইও ফুর্তির ভাগ পাবি।

ফুর্তি করার নিত্য নতুন উপায় বের করে হরবল্লভ। তার প্রধান সাগরেদ ঐ কিশোর রামচন্দ্র। বিকেল হলে ছাদে খোলা হাওয়ায় খালি গায়ে বসে থাকে হরবল্লভ, আর রামচন্দ্র ছিলিমে গাঁজা সেজে দেয়। দু'জনে ভাগাভাগি করে ছিলিম টানতে টানতে নানা রকম ফন্দী-ফিকির আঁটে। হরবল্লভের গায়ের রঙ কুচকুচে কালো, বুকে পিঠে বড় বড় লোম। লোকে বলে জাম্বুবান আর হনুমান পাশাপাশি বসে আছে।

মেসবাড়িতে কোনো স্ত্রীলোক থাকে না বলে পুরুষগুলোর জিভেরও কোনো বল্গা নেই। ছোটবড় ভেদও মানে না। যে-কোনো রকম কুকথা তারা অনর্গল বলে যায়। যখন তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে, তখন এমন সব কুৎসিত বাক্যের স্রোত বইতে থাকে যে পথচলতি লোকেরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে শোনে।

জয়রাম কার্য উপলক্ষে মফঃস্বলে গেলে এ বাড়ির লোকদের পোয়া বারো। তখন তারা একাধিক সস্তা বেশ্যাকে পথ থেকে ডেকে নিয়ে আসে বাড়ির মধ্যে। তারপর সারারাত ধরে চলে হল্লা। আশপাশের বাড়ির শিশুরা হঠাৎ ঘুম ভেঙে ভয় পেয়ে কেঁদে ওঠে। মায়েরা চুপ চুপ চুপ করে সেই শিশুদের পিঠ চাপড়ে আবার ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করে। স্বামীদের দিকে তারা জ্বলন্ত চোখে তাকায়। স্বামীরা মুখ ফিরিয়ে থাকে। হরবল্লভ আর তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের সবাই ডরায়।

একদিন মাঝরাতে ও বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো একটি মেয়ে। মেয়েটি স্বৈরিণী হলেও বোধ হয় ওদের অতখানি অত্যাচার সহ্য করতে পারেনি, তাই পালিয়ে আসতে চেয়েছিল। তার পেছন পেছন তেড়ে এলো হরবল্লভ, হাতে একটা গোল করে পাকানো মোটা দড়ি, স্খলিত গলায় সে গান গাইছে "আমার এ বিনোদ মালা, পরাবো সখী তোর গলায়"।

হরবল্লভের হাত থেকে বাঁচবার জন্য মেয়েটি একবার এ-বাড়ি একবার ও-বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে দুম দুম করে। যদিও মেয়েটি জানে, কেউই তাকে আশ্রয়

দেবে না। যে মেয়ে একবার পথে বেরোয়, কোনো বাড়িতে তার আর স্থান নেই।

পাড়ার প্রায় সব বাড়িই তখন অন্ধকার। গোলমালে কেউ কেউ জেগে উঠলেও সাড়া শব্দ করছে না। শুধু আলো জ্বলছে একটি বাড়িতে। সেজবাতি জেবলে একটি রোগা পাতলা চেহারার একুশ-বাইশ বছরের যুবক গভীর মনোযোগের সঙ্গে কিছু লিখছিল। স্ত্রীলোকের আর্ত চিৎকারে তার একাগ্রতা নষ্ট হলো। প্রথমে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বোঝার চেষ্টা করলো ব্যাপারটা। ঘরের মধ্যে আরও কয়েকজন ঘুমিয়ে আছে। তাদের পাশ কাটিয়ে সে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো। রাস্তায় কোনো বাতি নেই, তাই সহসা কিছু দেখা যায় না। তারপর সে দেখলো, পথের মোড়ে একটি স্ত্রীলোককে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে একজন পুরুষ। হরবল্লভ গান ছেড়ে এখন কর্কশ গলায় চিৎকার করছে, চল মাগী! আগে পয়সা নিইচিস, এখন ছেনালী! আজ বেঁধে রাখবো তোকে!

কণ্ঠস্বর শুনেই হরবল্লভকে চিনতে পারলো যুবকটি। নতুন কিছু নয়, এ রকম প্রায়ই ঘটে। যুবকটি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। একবার সে ভাবলো ছুটে যাবে মেয়েটিকে সাহায্য করবার জন্য, কিন্তু ততক্ষণে ও বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

সেই যুবকটিও একটি পারিবারিক মেসবাড়িতেই থাকে। এ বাড়িতে বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটির নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে তাঁর নিজের তিন ছেলে, তাঁর ভাইয়ের দুই ছেলে, বোনের দুই ছেলে, শ্যালিকার এক ছেলে এবং পুরোনো ভৃত্য শ্রীরাম নাপিত। এছাড়াও মাঝে মাঝেই গ্রাম থেকে তাঁর অন্য ছেলে এবং আরও আত্মীয়-স্বজন এসে থাকে। ঠাকুরদাস মাইনে পান দশ টাকা, তাই দিয়েই অনেকদিন পর্যন্ত তিনি কলকাতার বাসা খরচ এবং ছেলেদের শিক্ষার খরচ চালিয়েছেন। তাঁর ছেলেরা পড়াশুনোয় ভালো, বড় ছেলে ঈশ্বর সংস্কৃত কলেজের নামকরা ছাত্র, মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক রচনা প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব দেখিয়ে পঞ্চাশ-একশো টাকা পুরস্কার পেয়ে সে টাকা তুলে দিয়েছে বাবার হাতে। মাসে আট টাকা ছাত্রবৃত্তিও পেয়েছে সে। এ বাড়িতে একমাত্র বিলাসিতা মাঝে মাঝে বিকেলবেলা বাতাসা খাওয়া।

ঈশ্বর পড়াশুনোয় ভালো হলেও ছেলেবেলা থেকে দারুণ গোঁয়ার। কোনো একটা কিছু জেদ ধরলে কিছুতেই ছাড়বে না। তার জেদের জন্য এক এক সময় ঠাকুরদাস ওকে মারতে মারতে আধমড়া করে ফেলেছেন, তবু ছেলে জেদ ছাড়েনি। ঠাকুরদাস এখন মারধোর বন্ধ করলেও মাঝে মাঝেই বলেন, আমার এই ছেলেটা একটা ঘাড় বেঁকা এঁড়ে গরু!

সংস্কৃত কলেজের পাঠ সেরে সম্প্রতি ঈশ্বর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সেরেস্তাদারের চাকরি পেয়েছে। মাইনে বেশ ভালোই, পঞ্চাশ টাকা। তার কাজ সাহেব সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া। এ-দেশ শাসন করতে এসে সাহেবরা বুঝেছে, এ দেশের ভাষা না শিখলে এ দেশবাসীর মর্মে প্রবেশ করা যাবে না। সাহেবদের সংস্পর্শে এসে ঈশ্বরও বুঝেছে যে তাকেও ইংরেজি ভাষাটা শিখতে হবে। রাজভাষা না শিখলে রাজ সংসর্গে থাকা যায় না। সকালে ও সন্ধ্যে-বেলা সে নিয়ম করে ইংরেজি ও হিন্দী শিখছে। প্রায়ই তার রান্না করার পালা থাকে। চাকরি সেরে এসে সে রান্নাবান্না সেরে নেয় দ্রুত, খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলে সে ছোট ভাইদের পড়া বলে দেয়। তারপর সকলে ঘুমিয়ে পড়লে সে নিজের পড়াশুনো নিয়ে বসে। খুব গভীর রাত্রে সে লেখে। রাত জাগার ব্যাপারে তার কোনো ক্লান্তি নেই। বাইশ বছর বয়েস হলেও তার রোগা পাতলা ছোট্টখাট্টো

চেহারা, শরীরের তুলনায় মাথাটা বড়।

একদিন বিকেলে কর্মস্থল থেকে ফেরার পথে ঈশ্বর এক মুদিখানা থেকে আধ পয়সার ছোলা কিনছে এমন সময় তার কাঁধে কে যেন থাবড়া মারলো। ঈশ্বর ফিরে দেখলো, তার বন্ধু মদনমোহন।

মদনমোহন ঈশ্বরের চেয়ে বয়েসে কিছু বড় হলেও দু'জনে বাল্যকালে সহপাঠী ছিল বলে গভীর বন্ধুত্ব জন্মে গেছে। মদনমোহনের মাথা কামানো, মাঝখানে মস্ত বড় টিকি। স্বভাবটা তার দিলদরিয়া ধরনের। মদনমোহন সেই মুদিখানায় মুড়ি কিনতে এসেছিল।

মদনমোহন বললো, কি হে বাঁড়ুজ্যের পো! অ্যাতখানি ছোলা কোন্ কাজে লাগবে? ছোলার চাষ দিবে নাকি?

ঈশ্বর হেসে বললো, হ্যাঁ, চাষের কাজটা আমি ভালো পারি বটে। ছেলেবয়েসে কাস্তে হাতে নিয়ে চাষাদের সঙ্গে মাঠে ধান কাটতে যেতাম।

মদনমোহন বললো, নাও, মুড়ি খাও! আমি ভেবেছিলাম, তোমার রসনাই কাস্তের সমান, সত্যকারের কাস্তে হাতে নেবার তোমার দরকার নাই! তা অ্যাতখানি ছোলা কিনলে কোন কম্মে?

—বাড়িতে তো খাবার লোক কম নাই। আমাদের ওদিককার লোকদের পেট বড়ো হয়। আমার ভাইগুলো একদিক থেকে হালুম হালুম করে খায় আর সমানে হাগে।

—এত পরিমাণ ছোলা তো বিশ-পঁচিশজনেও খেয়ে শেষ করতে পারবে না।

—ধরো, এখন আমাদের বাড়িতে এগারোটা পেট। সকালে এই ছোলা ভিজিয়ে রাখলে বিকেলে বেশ ডুমো ডুমো হয়। সেই দিয়ে বিকেলের জলখাবারটা বেশ চলে যায়। সব শেষ করতে পারে না, যতগুলো বাঁচে তা রাতের কুমড়োর তরকারির মধ্যে মিলিয়ে দেই। অমনি সেটা কুমড়োর ছক্কা হয়ে যায়, আর তাতে স্বাদও বাড়ে। শুধু একঘেয়ে কুমড়োর ডালনা আর রোজ ভালো লাগে না।

—বিকালেও ছোলা আর রাত্রেও ছোলা? আর সকালে কী খাও?

—আদা!

—হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ! সেইজন্যই স্বাস্থ্যটি চমৎকার!

গল্প করতে করতে দুই বন্ধু হাঁটতে লাগলো রাস্তা দিয়ে। ঈশ্বরের বাড়িই কাছে। ঈশ্বর মদনমোহকে অনুরোধ করলো, তার বাড়িতে একটু বসে যেতে। পঞ্চাননতলার গলিতে সেদিনও হরবল্লভ আর তার চ্যালারা হুড়োহুড়ি লাগিয়েছে। রামচন্দ্র এক দইওয়ালার বাঁকে ঝোলানো দইয়ের ভাঁড় থেকে এক খাবলা দই চুরি করতে গিয়ে পুরো ভাঁড়টিই ভেঙে ফেলেছে। সে বেচারা জুড়ে দিয়েছে মড়াকান্না। খেসারত না নিয়ে সে কিছুতেই যাবে না। তাকে কিছু দেবার বদলে উল্টে তার ওপরেই হম্বিতম্বি শুরু করেছে হরবল্লভ। কোমরে হাত দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছে তার আরও দু' তিন স্যাঙাত।

কী হয়েছে, কী হয়েছে বলে ঈশ্বর সেদিকে যেতে গেল। মদনমোহন তার হাত টেনে ধরে বললো, করো কী, করো কী, এসব বর্বরদের সঙ্গে বিবাদ করতে যেও না।

ঈশ্বর বললো, ওরা ঐ গরীব বেচারির ওপর হামলা কচ্ছে। এদের অত্যাচারে এ পল্লীতে তেষ্টানো মুশকিল।

মদনমোহন বললো, তুমি উহাদের দিকে তাকায়ো না। উহাদের কথা শুনিও না। তা হলে আর কে তোমাকে বিরক্ত করবে?

—ভাই, পথ চলবার সময় চোখ বন্ধ করা যায় না। আর কান বন্ধ করার ক্ষমতা মনুষ্যগণের পক্ষে সম্ভব?

ঈশ্বর সেইখান থেকেই হাঁক দিয়ে বললো, এই দইওয়ালা, তুই আমার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে যাস। আজ পারবো না, পরশু আসিস। ঐ যে সাদা রঙের বাড়ি।

হরবল্লভ ঈশ্বরের দিকে ফিরে বললো, ঐ যে লাটের ব্যাটা এসে গ্যাচে? তবে আর ভাবনা কী!

রামচন্দ্র সেই সঙ্গে যোগ করলো, বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন!

মদনমোহন ঈশ্বরের হাত ধরে বাড়ির দিকে নিয়ে চলে গেল। ঈশ্বরের নাকের পাটা ফুলে গেছে, চোখে ক্রোধের আগুন। ঘাড়টিও বেঁকে গেছে। হাতে বিশেষ পয়সা নেই বলে সে অসহায় বোধ করছে এখন।

মদনমোহন বললো, দইওয়ালার ভাঁড়ের দাম তুমি মিটাবে। আরও কত গরীব দুঃখী আছে, সকলের দুঃখ তুমি ঘুচাতে পারবে কি?

ঈশ্বর বললো, সাধ্য মতন ঘুচাবো।

—এখন তা হলে বেশ বড় মানুষ হয়েছো মনে হয়?

ঈশ্বর অহংকারের সঙ্গে বললো, আমি গরীব, তবু আমি বড় মানুষ।

বাড়ির মধ্যে এসে মদনমোহনকে নিজের বিছানার ওপর বসিয়ে বললো, কী খাবে বলো?

মদনমোহন বললো, আমি বাপু তোমার ঐ ভিজানো ছোলা খেতে পারব না। ভালো চাকুরি করতেছ, আজ মণ্ডামেঠাই খাওয়াও।

ঈশ্বর বললো, নিশ্চয়ই খাওয়াবো।

পয়সার অনটন থাকলেও ঈশ্বর বন্ধুবান্ধবদের খাওয়ানোর ব্যাপারে খুব উদার। ছাত্র অবস্থায় জলপানির টাকায় প্রায়ই বন্ধুদের খাইয়েছে। এমনকি, এজন্য মিঠাইওয়ালার দোকানে ধার করতেও দ্বিধা করে না। সে ছোট ভাই শম্ভুচন্দ্রকে ডেকে বললো, যা, মোড়ের মিঠাইওয়ালাকে আমার নাম করে বল, মতিচুর আর সন্দেশ নিয়ে আয়।

ঠাকুরদাস কয়েকদিনের জন্য দেশের বাড়িতে গেছেন। ঈশ্বরই এখন এ বাড়ির কর্তা। কিছুদিন আগে মেজো ভাইটির বিবাহ দেওয়া হয়েছে, সেইজন্য ঋণ করতেও হয়েছে অনেক। ঈশ্বর এখন সংসারের হাল ধরে খরচ চালাচ্ছে টেনে টুনে। অতি সামান্য শাক ব্যঞ্জন রান্না করতে গিয়ে ছোট ভাইরা দিশা পায় না বলে আজকাল রান্নার ভার ঈশ্বর পুরোপুরি নিজেই নিয়েছে।

মদনমোহন বললো, মতিচুর নামটা শুনে আমার একটা কথা মনে পড়ল। সরস্বতী পূজা উপলক্ষে তুমি একবার একটি শ্লোক রচে ছিলে, মনে আছে? আমার কিন্তু মনে আছে, ভারি সরস ছিল শ্লোকটি :

লুচি কচুরি মতিচুর শোভিতং
জিলেপি সন্দেশ গজা বিরাজিতম্।
যস্যাঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্নুমঃ।
সরস্বতী মা জয়তান্নিরন্তম্।

ঈশ্বর বললো, তুমি ঠিক মনে রেখেছো তো! আমি ভুলে গিসলাম।

মদনমোহন বললো, তুমি অপরের রচনা রাশি রাশি মুখস্ত করো, তাই নিজের রচনা মনে রাখতে পারো না।

ঈশ্বর বললো, এক কাজ করা যাক। আমি রসুইটা ধাঁ করে সেরে নিই। তুমি রান্নাঘরের দোরে এসে বসো না, তাহলে আমি কাজ করতে করতে গল্পও করতে পারি।

রান্নাঘরটি অত্যন্ত নোংরা আর স্যাঁতসেতে। একটি মাত্র দরজা, কোনো জানলা নেই। এক দেয়াল থেকে আরেক দেয়ালে ফর্‌র ফর্‌র করে উড়ে যাচ্ছে আরশোলা।

সেই আরশোলার বহর দেখে মদনমোহন বললো, বাপরে, এত তেলাপোকা! কোন্‌দিন যে ওর দু' একটা ব্যঞ্জনের সঙ্গে পাক হয়ে যাবে!

ঈশ্বর মুচকি হাসলো। একদিন যে সত্যিই আরশোলা রান্না হয়ে গিয়েছিল এবং সকলের খাওয়া নষ্ট হবার ভয়ে ঈশ্বর নিজেই কচর মচর করে চিবিয়ে সেই আরশোলা খেয়ে নিয়েছিল, তা তো মদনমোহন জানে না। অবশ্য তাতে দোষই বা কী হয়েছে, চিনেম্যানরা নাকি ওগুলো খায়। কেউ কেউ বলে আরশোলা খেলে হাঁপানি রোগ হয় না।

রান্না অতি সংক্ষিপ্ত। শ্রীরাম ধাঁ করে উঠোনে গিয়ে কিছু কাঠ চ্যালা করে আনলো। তারপর সেই কাঠে সাজিয়ে ফেললো উনুন। চকমকি ঠুকে ঠুকে সেই উনুনে আগুন ধরিয়ে ফেললো ঈশ্বর। মদনমোহন বললো, বাপরে বাপ। কী ধোঁয়া!

শম্ভুচন্দ্র চাল ধুয়ে এনে মাটির হাঁড়িতে মাপমতন জল নিয়ে চাপিয়ে দিল উনুনে। খানিকবাদে ভাত ফুটে উঠতেই ঈশ্বর হাঁড়ি নামিয়ে ফ্যান গাললো। তারপর হলো ডাল। সেই ভিজে ছোলা দিয়ে কুমড়োর ছক্কা। আর পোস্তর বড়া ভাজা।

মদনমোহন বললো, মিছেই সন্দেশ মতিচুর খেলাম। ঈশ্বর, এখন তোমার হাতের রান্না খেতে আমার লোভ হতেছে।

ঈশ্বর বললো, খাও না! বেশী রাত করে আর বাড়ি ফিরেই বা কী করবে। এখানেই আজ শোও বরং।

তাই হলো, খাওয়া দাওয়ার পর অনেক রাত পর্যন্ত দুই বন্ধু গল্প করতে লাগলো। এক সময় সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন ঈশ্বর চুপি চুপি বললো, ভাই মদন, আমি একটা লেখা তোমাকে পড়িয়ে শোনাতে চাই। তুমি শুনবে?

মদনমোহন একটু আশ্চর্য হয়ে বললো, কার লেখা? তোমার?

ঈশ্বর তখন যে-কোনো নবীন লেখকেরই মতন আরক্ত মুখ করে লাজুক গলায় বললো, হ্যাঁ।

—কী লিখেছ? নতুন সংস্কৃত শ্লোক?

—না, সংস্কৃতও নয়, শ্লোকও নয়। বাংলা। গদ্য ভাষায় কিছুটা বাংলা লিখেছি।

—বাংলা? তাও গদ্যে? তুমি বলো কী, ঈশ্বর? বাংলা গদ্য অতি অপাঠ্য ও নিরস বস্তু। উহা লিখে লাভ কী?

—ফোর্ট উইলিয়াম কালেজে যেসব বাংলা টেক্‌সট আছে, তা পড়াতে আমার ভক্তি হয় না। অতি উৎকট ভাষা। সেইজন্যই নতুনভাবে কিছু বাংলা রচনার প্রয়োজন অনুভব করি।

—ছাত্রপাঠ্য কিছু যদি লিখে থাকো তো তা আলাইদা কথা। নচেৎ ও লেখা পণ্ডশ্রম।

—কেন, সর্বসাধারণের পাঠ্য কিছু বাংলায় লেখা যায় না?

—সর্বসাধারণের কী দায় ঠেকেছে বাংলা পড়বার। যে রসশাস্ত্র পাঠ করতে

চায়, তাহার জন্য সংস্কৃতের বিশাল ভান্ডার রয়েছে। আর কাজ চালাবার জন্য রয়েছে ইংরাজি। এখন তো সকলেই ইংরাজি পড়ে—

—আমি কিন্তু সর্বসাধারণের কথা চিন্তা করেই লিখতে শুরু করেছিলাম।

—পড়ো, শুনি।

বালিশের তলা থেকে ঈশ্বর টেনে বার করলো লম্বা খাতা। খাগের কলম ছেড়ে সে সম্প্রতি ইংলিশ নিব ব্যবহার করতে শুরু করেছে। প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই সে বড় এক শিশি বিলিতি কালি কিনে এনেছিল হ্যামিল্টনের দোকান থেকে।

খাতাখানি হাতে নিয়ে ঈশ্বর বললো, বাসুদেব চরিত লিখবো ভেবে শুরু করিছি। একটু শুনে বিচার করে দ্যাখো দেখি।

ঈশ্বর পড়তে শুরু করলো, ...নারদ মথুরায় আসিয়া কংসকে কহিলেন মহারাজ তুমি নিশ্চিন্ত রহিয়াছ কোনও অনুসন্ধান করো না এই যাবৎ গোপী ও যাদব দেখিতেছ...

মদনমোহন বললো, আস্তে, একটু আস্তে পড়ো, একেবারে যে পাল্কি বেহারাদের মতন তুর্কি নাচন শুরু করলে।

ঈশ্বর একটুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো, আমি ঠিক গতিতেই পড়ছি, কিন্তু তুমি বুঝতে পারছো না, কারণ অভ্যাস নাই। ইংরাজি গদ্য পড়তে গিয়ে আমি দেখেছি, ওরা কমা, সেমিকোলন, প্রশ্নচিহ্ন, বিস্ময়বোধক চিহ্ন ব্যবহার করে। পদ্যে এগুলির তেমন দরকার না থাকলেও গদ্যে খুব উপকারী। আমি ভাবছি বাংলা গদ্যে এগুলির ব্যবহার করলে কেমন হয়?

মদনমোহন বললো, ঈশ্বর, তুমি দুই চারিদিন মাত্র সাহেবদের সঙ্গে গতায়াত করেই যে উহাদের সব কিছুর গুণগান করতে শুরু করলে দেখি! ইংরাজি চিহ্ন আমাদের দেশীয় ভাষায় লাগবে কেন?

—ওসবের প্রয়োজন নাই, তুমি মনে করো?

—কোনো প্রয়োজন নাই।

—আমার কিন্তু মনে হয়, ঐসব চিহ্নে পাঠের সুবিধা হয়। যা হোক, বাকিটা পড়ি?

ঈশ্বর আবার পড়তে শুরু করলো, ...ইতিমধ্যে বলরাম প্রভৃতি গোপনন্দনেরা নন্দমহিষীর নিকটে গিয়া কহিল ওগো কৃষ্ণ মাটী খাইয়াছে আমরা বারন করিলাম শুনিল না। তখন পুত্রবৎসলা যশোদা অস্তব্যস্তে আসিয়া কৃষ্ণের গন্ড ধরিলেন এবং তর্জন করিয়া কহিলেন রে দুষ্ট তুই মাটী খাইয়াছিস রহ আজ আমি তোকে মাটী খাওয়া ভালো করিয়া শিখাইতেছি...

মদনমোহনের ক্রমশ ভুরু কুঁচকে যাচ্ছিল, এক সময় বললেন, থামো, থামো! ঈশ্বর, এসব কী ছাইমাটী লিখিয়াছ! এসব তো চাষাভূষার মতন কথাবার্তা। সব বোঝা যায়। ইহার মধ্যে রস কোথায়?

ঈশ্বরের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বললো, এর মধ্যে রস নাই?

—কোথায় রস? লোকে চিঠি চাপাটিও এমন সরল লেখে না। ঈশ্বর, তুমি এ কাজে ক্ষান্ত দেও। এ তোমার উপযুক্ত নয়। এমত ছেলেখেলায় কেন সময় নষ্ট করছো?

—ভাই মদন, ছেলেখেলা বললে!

—তা নয় তো কী?..."তুই মাটী খাইয়াছিস রহ আজ আমি তোকে মাটী

খাওয়া ভালো করিয়া শিখাইতেছি...” হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ...এই নাকি রচনা? তুমি এতবড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, তুমি এরকম স্ত্রীলোকদের মতন অশিক্ষিত ভাষা লিখলে সবাই তোমায় উপহাস করবে যে!

—তাই?

—আমাকে দেখিয়েছ দেখিয়েছ, আর কাহাকেও দেখিও না! এ সব হাবিজাবি রচনা গুড়গুড়ে ভট্‌চাজের মতন লঘু লোকেদের মানায়। এ তোমার উচিত কাজ হয় না। কালেজে পড়বার সময় তুমি উত্তম শ্লোক রচনা করতে, তোমার কাছ থেকে সকলে সে রকম আরও রচনা আশা করে।

ঈশ্বরের ঘাড়খানি পাশে বেঁকে গেছে। চোয়াল কঠিন। মদনমোহনের কথা তার পছন্দ হয়নি। অন্য কেউ এ রকম মন্তব্য করলে সে ক্রুদ্ধ উত্তর দিত। কিন্তু মদনমোহনের কথা সে মান্য করে।

সে গম্ভীরভাবে বললো, তুমি বাঙলা রচনার পক্ষপাতী নও?

মদনমোহন বললো, বাঙলায় পদ্য রচা যায়। শিশু ও স্ত্রীলোকদের নীতি শিক্ষার জন্য বাঙলা পদ্য খুব উপকারী। কিন্তু গদ্যের উপযুক্ত গাম্ভীর্য এ ভাষায় সহে না।

—আমি এই বাসুদেব চরিতখানি ছাপাবো ঠিক করেছিলাম!

—সেটা তোমার মতন পণ্ডিতের যোগ্য কাজ হবে না।

খাতাখানা মুড়ে রেখে ঈশ্বর বললো, থাক, ছাপাবো না তা হলে। ছিঁড়ে ফেলে দেব। তোমার কথাই বুঝি ঠিক। বাঙলা ভাষায় সাহিত্য হয় না।



বিন্দুবাসিনী ঠাকুরঘরের মেঝেতে আঁচল ছড়িয়ে শুয়ে আছে। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। বেলা এখন তিন প্রহর। বাড়ির সকলে এই সময় খেয়েদেয়ে ঘুমোয়। নীচতলার দাস-দাসীদের কোলাহলও এখন কিছুক্ষণের জন্য শান্ত। বাইরে রাস্তায় ঠা ঠা পোড়া রোদ্দুর, লোকজন বেশী হাঁটে না, গাড়ি-ঘোড়াও কম। মাঝে মাঝে কাকের কা-কা আর চিলের চি-হি-হি-তে শুধু স্তব্ধতায় একটুখানি চিড় ধরে।

ঠাকুরঘরের একটা জানলা খোলা। তা দিয়ে হাওয়া আসছে হু হু করে। আর সেই জানলার ওপর বসে দুটো কাক একমনে দেখছে বিন্দুবাসিনীকে। তারা খুব চিন্তিত ভঙ্গিতে কিছু একটা আলোচনা করছে পরস্পরের সঙ্গে। আমরা কাকের ভাষা জানি না, কিন্তু তারা যে বিন্দুবাসিনী সম্পর্কেই কথা বলছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই মেয়েটিকে ক'দিন আগেও তারা কত উচ্ছলা-চঞ্চলা দেখেছিল; আজ সেই মেয়েটি একা মাটিতে শুয়ে আছে অশ্রুসজলা হয়ে।

আজ বিন্দুবাসিনীর একা থাকবারই দিন। আজ একাদশী। এর আগেও তো কত একাদশী গেছে, সাড়ে ন' বছর বয়েসে বিধবা হওয়ার পর থেকে বিন্দুবাসিনী নিয়মিত একাদশী করে আসছে। ক্ষিদের জন্য তার কষ্ট হয় না। একাদশীর দিন না খেয়ে থেকেও সে তার বোনেদের সঙ্গে দৌড়োদৌড়ি করে কত রকম খেলেছে। সকাল বিকেলে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে মুখস্থ করেছে পড়া। মায়ের কাছে সে জাঁক করে বলেছে, একদিন কেন, আমি সাতদিনও উপোস দিতে পারি

মা। তুমি দেখতে চাও? আগেকার দিনে মুনি-ঋষিরা বছরের পর বছর না খেয়ে তপস্যা করতো। মহাভারতের অম্বাও এ রকম তপস্যা করেছিল।

মা হেসে বলতেন, মেয়ে আমার একেবারে গুরু ঠাকুর! কথায় কথায় বেদ-পুরাণের তুলনা।

বিন্দুবাসিনীর পরের বোন কুন্দমালার তখনো বিয়ে হয়নি, সে বলতো, তুই কার জন্য তপস্যা করবি রে, সেজদি?

মা বলতেন, তুই চুপ কর, কুন্দ। পরের জন্মে আমাদের বিন্দু শিবের মতন স্বোয়ামী পাবে।

বিন্দুবাসিনী বলতো, রক্ষে কর। আমার আর পরের জন্মে শিবের মতন স্বোয়ামী দরকার নেই, আমি পরের জন্মে পুরুষ মানুষ হবো।

কুন্দমালা আর বিন্দুবাসিনী পিঠোপিঠি বোন। কথায় কথায় টক্কর লাগতো। সে একদিন বলেছিল, জানো মা, প্রত্যেক একাদশীতে সেজদি পাছপুকুরে তিন চারবার ডুব দিয়ে আসে। সেজদি ডুবে ডুবে জল খায়।

বিন্দুবাসিনী রাগ করে বলেছিল, কী অখাদ্য কথা! পাছপুকুরে শ্রীভদ্দর গাড়োয়ান গোরু-মোষ চান করায়, আমি সেই জল খেতে যাবো? ওয়াঃ!

মা বলেছিলেন, তুই থাম তো কুন্দ! কড়ে রাঢ়ী, একাদশীর দিন জল খাবে কী? ওকথা শুনলেও অকল্যাণ হয়।

কুন্দমালা বয়েসের তুলনাতেও বেশী ছেলেমানুষ। বৈধব্যের দুঃখ সে ঠিক বুঝতো না। শ্বশুরবাড়ি নামক একটা অচেনা জায়গায় থাকবার বদলে দিদি যে আবার বাবা-মায়ের কাছে ফিরে এসেছে, এটাকে সে একটা সুখের বিষয় জ্ঞান করতো।

সে বলেছিল, অমন একাদশী আমরাও করতে পারি, মা! পরের দিন দিদির কত খাতির! কত রকম মেঠাই, সন্দেশ, পেস্তার সরবৎ...

বিধুশেখর-জায়া হেসে ফেলে কুন্দর মাথায় একটা চাপড় মেরে বলেছিলেন, এ মেয়েটা আমার একেবারে হাবা! পরক্ষণেই তাঁর চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু চিকচিক করে ওঠে। বিন্দুবাসিনীর দিকে তাকিয়ে তিনি দীর্ঘশ্বাস গোপন করেন।

কুন্দমালাকে বৈধব্য যাতনা সহ্য করতে হয়নি। যথা সময়ে তার বিয়ে হয় উত্তরপাড়ার জমিদারদের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে সে সব সময় মায়ের কাছে আসবার জন্য কান্নাকাটি করতো। দয়ালু শ্বশুরকে জপিয়ে সে চলেও এসেছিল বেশ কয়েকবার। তারপর তার বারো বছর বয়েসে তাকে পাকাপাকিভাবে চলে যেতে হলো এবং সাড়ে চার মাস ধরে জমিদারগিন্নী সাজবার প্রাণপণ চেষ্টা করে সে হঠাৎ-ই মরে গেল একদিন। বছর না ঘুরতেই তার সৌভাগ্যবান স্বামী প্রচুর যৌতুক সমেত আর একটি অষ্টম বর্ষীয়াকে ঘরে আনলো। পৃথিবী থেকে একেবারে বিলীন হয়ে গেছে কুন্দমালা।

বিন্দুবাসিনী তার বৈধব্যকে কখনো গ্রাহ্য করেনি। ছোটখাটো জিনিস থেকেই সুখ খুঁজে নেবার একটা প্রবণতা ছিল তার স্বভাবের মধ্যে। তার চরিত্রের নির্মল তেজস্বিতার জন্য কেউ কখনো খবরদারি করেনি তার ওপরে। কিন্তু হঠাৎ এ কী হলো? যেন একদিন সহসা ঘুম ভেঙে জেগে উঠে তার বাড়ির লোক আবিষ্কার করলো, সে আর বালিকাটি নেই, সে এখন স্ত্রীলোক। আর সেইজন্যই সে এখন থেকে আর ইচ্ছে মতন চলাফেরা করার স্বাধীনতা পাবে না, এমনকি এই বাড়ির মধ্যেও না।

বিধবা হবার বছর তিনেক বাদে বিন্দুবাসিনী একবার ভয় পেয়েছিল, যেদিন সে রক্ত দর্শন করে। রজঃস্বলা হওয়ার ব্যাপারটা সে জানতো না। জানবেই বা কী করে, সাধারণত বিবাহিতা বালিকাদের বয়স্থা ননদ-ভাজরাই ঐ সব গূঢ় কথা জানিয়ে দেয়। বিন্দু তো ওদের সঙ্গে থাকেনি। ভয় পেয়ে বিন্দুবাসিনী লুকিয়ে ছিল নিজের ঘরে, ভেবেছিল তার কোনো কঠিন অসুখ হয়েছে, এবার কুন্দমালার মতন সে-ও মরে যাবে। টানা দেড়দিন বিন্দুবাসিনী ঘরের বার হয়নি।

শেষ পর্যন্ত তার মায়ের কানে খবর যায়। বৃহৎ সংসার, সৌদামিনীর সঙ্গে তাঁর সন্তানদের প্রতিদিন দেখাও হয় না। স্বামীর সেবাতেই তিনি ব্যস্ত থাকেন, সন্তানদের তত্ত্বাবধানের ভার দাস-দাসীদের ওপর। খবর পেয়ে তিনি এসে মেয়েকে এক পলক দেখেই আসল ব্যাপারটি বুঝেছিলেন। বিন্দুবাসিনীর পিঠে হাত বুলিয়ে তিনি বলেছিলেন, পাগলী আমার, এইজন্য বুঝি নাওয়া খাওয়া বন্ধ করে শুয়ে থাকতে হয়? এতে ভয়ের কী আছে? মেয়েমানুষের অমন হয়। ভগবান মেয়েমানুষদের যেমন ভাবে গড়েছেন, তেমনি তো হবে!

যে মেয়েরা স্বামীকে ভালো করে চিনবার আগেই বিধবা হয়, ঋতুমতী হয় তারাও, প্রকৃতির এমনই আশ্চর্য বিধান!

সেদিন থেকে বিন্দু মেয়েমানুষ হয়েছিল, কিন্তু স্ত্রীলোক হয়নি। কেন না, তখনো খর্ব করা হয়নি তার স্বাধীনতা। তারপরও সে পুকুর পাড়ে গিয়ে গাছে চড়েছে, ভর দুপুরবেলা ভূত-তাড়ানি খেলা খেলেছে, আবার পুঁথিপত্তর নিয়ে আচার্য মশাইয়ের কাছে পাঠ নিতেও গেছে। মা কখনো বড়জোর সস্নেহ ভর্ৎসনায় বলেছেন, অত আর দস্যিপনা করিস না, বিন্দু। মেয়েমানুষদের একটু নরম সরম হতে হয়। আদালতে বেরুবার মুখে কিংবা ফেরবার সময় বিধুশেখর কতদিন দেখেছেন সিঁড়ি দিয়ে দুদ্দাড় করে নেমে যাচ্ছে বিন্দুবাসিনী কিংবা নীচের দালানে বসে গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে তর্ক করছে, তিনি সকৌতুকে হেসেছেন। বিন্দুবাসিনী তার পিতার মুখে কখনো কঠোর কথা শোনেনি।

মাত্র সেই এক শনিবার সব কিছু ওলোট-পালোট হয়ে গেল। আচার্য মশাই বললেন, তিনি আর বিন্দুবাসিনীকে পড়াবেন না। কারণ, বিন্দু স্ত্রীলোক হয়ে গেছে। বিন্দু পরে হিসেব করে দেখেছে, সেই দিনটিতে তার বয়েস হয়েছিল চোদ্দ বছর সাত মাস এগারো দিন। ঠিক চোদ্দ বছর সাত মাস এগারো দিনের দিনই এই দুনিয়ার সব মেয়েরা স্ত্রীলোক হয়ে যায়? সেই রাতে বিধুশেখরও গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, মা বিন্দু, তুমি আর নীচতলায় যখন তখন যেও না। পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে তোমার আর পাঠ নেবারও দরকার নাই, তাতে লোকাপবাদ হবে। ভগবত পাঠ করতে শিকোচো, চণ্ডী শিকোচো, তাই যথেষ্ট। এখন বড় হয়েচো, এবার জনার্দনের পাদপদ্মে মন দাও।

রাগে অভিমানে বিন্দুবাসিনীর ইচ্ছে হয়েছিল নিজের শরীরটাই কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলতে। সে কেন স্ত্রীলোক হলো? ঈশ্বর কেন এত নিষ্ঠুর যে তার বয়েস বাড়িয়ে দিলেন?

বিধুশেখরের মুখের কথাই আদেশ। পরদিনই বিন্দু দেখলো তার ঘর থেকে সব বইপত্র উধাও হয়ে গেছে। কয়েক খণ্ড মহাভারতের হাতে লেখা পুঁথি, আর শ্রীরামপুরে ছাপা কিছু বাঙলা সংস্কৃত বই সংগ্রহ করেছিল বিন্দু, সেগুলি ছিল তার প্রাণাধিক প্রিয়! সেগুলি হারিয়ে সে যেন নিঃস্ব হয়ে গেল।

বিধুশেখরের নীতিজ্ঞান অতি কঠোর। কুলশ্রেষ্ঠ কুলীন ঘরে জন্মেও তিনি একাধিক দার পরিগ্রহ করেননি। সন্ধ্যেবেলা ল্যাণ্ডো হাঁকিয়ে তিনি বারযোষিৎ

সংসর্গের জন্য বের হন না কোনোদিন। আবাল্য সুহৃৎ রামকমল সিংহ কয়েক বার কূটকৌশল করেও পারেননি বিধুশেখরকে তাঁর স্ফূর্তির স্থানে নিয়ে যেতে। অবশ্য বিধুশেখরও পারেননি রামকমলকে পণ্যা রমণী-গমন থেকে নিবৃত্ত করতে।

দুই বন্ধুর ব্যক্তিত্বে বৈপরীত্য অনেক। রামকমল সিংহ দুর্বল ও উদার, বিলাসী ও পরনির্ভরশীল। তাঁর সবচেয়ে বেশী নির্ভরতা ভাগ্যের ওপরে। অপর দিকে বিধুশেখর তীক্ষ্ন বুদ্ধিসম্পন্ন ও হিসেবী, তাঁর লালট ও চিবুকে রয়েছে আত্মবিশ্বাসের ধারালো রেখা। খাদ্য-পানীয়ে অসংযমের জন্য রামকমলের শরীর, মধ্যবয়েসে পৌঁছোবার আগেই, শিথিল ও মেদবহুল। বিধুশেখর জীবনে কখনো সুরা স্পর্শ করেননি, এবং তাঁর ঋজু দীর্ঘ শরীরখানি এখনো তলোয়ারের মতন ঝকঝকে। সুরার কারণেই বিধুশেখর রামমোহন রায়ের ওপর চটা। রামমোহন সুদূর ইংলণ্ডে দেহরক্ষা করার পরই এদেশে তাঁর নামে অনেক সোরগোল ওঠে। জীবিতকালে যারা রাজার বিরোধী ছিল, তারাও অনেকে এখন মত বদলে নিয়েছে। কিন্তু বিধুশেখর তাঁর মতবাদ থেকে এখনো টলেননি। কোনো মজলিসে রামমোহনের প্রসঙ্গ উঠলে সবাই যখন তাঁর প্রশস্তি শুরু করে, তখনো বিধুশেখর জিবে আফসোসের শব্দ করে বলেন, কিন্তু রাজা ভদ্রসমাজে মদের স্রোত বহায়ে দেওয়াটা ভালো কর্লেন কি? আমার বিবেচনায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের এমত ব্যবহার উচিত হয় না। রাজা নিজে সেয়ানা ছিলেন, অল্প পানে সংযম রক্ষা কত্তেন, কিন্তু অপরে তাহা পারে কি? রাজা ফেসিয়ান চালু করে দিলেন, এখন দেখ পথে পথে মুক্তকচ্ছ মাতালরা গড়াগড়ি যায়।

রামকমল এ সব শুনে হাসতে হাসতে বলেন, বিধু, তুমি তো এ রসের মর্ম বুঝলে না! একদিন না হয় বোতল টেনে গড়াগড়ি করেই দ্যাকো না! দেকবে, তাতেও সুখ আচে!

হাত নেড়ে রামকমলের কথাটা নিতান্ত তুচ্ছভাবে অগ্রাহ্য করে বিধুশেখর অপ্রসন্নমুখে বলেন, তোমরা যত ইচ্ছে রাজার গুণগান কত্তে চাও করো, আমি তাঁকে সমর্থন করতে পারি না। সংস্কৃতকে হেয় করে রাজা যে স্লেচ্ছ বিদ্যা চালু করে গেলেন, তার ফল ভালো হবে বলতে চাও? দু'পাত ইংরিজি পড়েই ছেলেগুলান বাপ-পিতেমোর অবাধ্য হয়ে যাচ্চে। কী কুক্ষণেই যে রাজার সঙ্গে ঐ খরগোশটার বন্ধুত্ব হলো!

অন্য একজন তখন বলেছিল, বিধুভায়া, ঐ ইংরিজির জন্য তুমিও তো বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় কচ্চো!

কয়েক বছর আগে আদালতে সরকারীভাবে ফার্সীর বদলে ইংরেজি চালু হয়েছে। বিধুশেখর ফার্সীতে কৃতবিদ্য ছিলেন, ইদানীং এক ফিরিঙ্গি শিক্ষক রেখে কাজ চালানো গোছের ইংরেজি শিখে নিয়েছেন।

এত গরমিল সত্ত্বেও কোনো এক অনির্দেশ্য কারণে বিধুশেখর ও রামকমলের মধ্যে এক গভীর অন্তরের টান রয়েছে। সুখে-সঙ্কটে, আপদে-আহ্লাদে দু'জনে সব সময় পাশাপাশি থাকেন। বিষয়কর্মের ব্যাপারে বিধুশেখরের পরামর্শ ছাড়া রামকমল এক-পা চলেন না। সমবয়েসী হলেও রামকমলের প্রতি বিধুশেখরের ব্যবহার অনেকটা অনুজের মতন। অনেক দিন আগে বারানসী থেকে আগত এক জ্যোতিষী বলেছিল, রামকমল সিংহ অল্পায়ু হবেন। সেই জ্যোতিষী-উক্ত নির্দিষ্ট সময় সীমা পার হয়ে এসেও রামকমল এখনো বেঁচে-বর্তে আছেন যদিও কিন্তু

একটা সিরসিরে মৃত্যুভয় প্রায়ই তাঁর বুকে এসে ধাক্কা মারে। সেইজন্য তিনি আগে থেকেই বন্ধুকে বলে রেখেছেন, আমি চক্ষু মুদলে তুই-ই তো আমার সংসারের ভার লবি, বিধু। যে ক'দিন আছি, তোর বকলমাতেই আছি।

সত্যই, রামকমলের সংসারের বিলি ব্যবস্থার ভার অনেক দিনই বিধুশেখরের হাতে। সিংহ-বাড়িতে কোনো দাস-দাসীর চুরি করা ধরা পড়লেও সালিশীর জন্য বিধুশেখরের ডাক পড়ে। বিধুশেখরেরও এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে সময় পেলেই তিনি ও বাড়িতে চলে যান। ও বাড়ির বৈঠকখানায় তাঁর জন্য পৃথক আলবোলা রাখা আছে। তাঁর স্ত্রী সৌদামিনী মাঝে মাঝে অনুযোগ করেন, তুমি তো বন্ধুর সংসার নিয়েই মেতে আচো, নিজের সংসারের ভালোমন্দ কিছুই দেকো না!

এ অনুযোগ অসত্য। নিজের সংসারের প্রতিও যে বিধুশেখরের তীক্ষ্ম নজর আছে, তার প্রমাণ তিনি দেন সঠিক সময়ে। যেমন বিধবা কন্যা বয়স্থা হয়েছে বলে একদিনেই তিনি তার যথেচ্ছ ঘোরাঘুরি এবং পড়াশুনো বন্ধ করে দিলেন।

বিধুশেখর নিজে নির্দেশ দিয়েছেন, একাদশীর দিন বিন্দুবাসিনী যেন কোনো অব্রাহ্মণের মুখ না দেখে। বাড়িভরা দাস-দাসী। বাইরের লোকেরও সব সময় আনাগোনা, সেইজন্য ঐ দিনটা সর্বক্ষণ ওর পক্ষে ঠাকুরঘরে থাকাই শ্রেয়।

আগে কখনো বিন্দুবাসিনীর এমন খিদে পায়নি, এত তেষ্টা পায়নি। ক্ষুধা তৃষ্ণা ছাড়িয়েও তার শরীরে জ্বলতে থাকে রাগ। সেই রাগে তার চোখ দুটি বন-বিড়ালীর মতন ঝকঝক করে!

একাদশীর দিন বিন্দুবাসিনী আগে পড়াশুনো নিয়ে ভুলে থাকতো। বিশেষত এই দিনটি ছিল মুগ্ধবোধ মুখস্থ করার পক্ষে আদর্শ। কঠিন ব্যাকরণের নিয়মের মধ্যে মন নিবিষ্ট করে রাখলে মন আর অন্য কিছু চিন্তা করার সুযোগ পায় না। এখন বিন্দুবাসিনীর সারাদিনব্যাপী এক আগ্রাসী শূন্যতা।

গঙ্গানারায়ণও আর সেইদিন থেকে বিশেষ আসে না। শিবরাম আচার্যের কাছে সেও পাঠ নেওয়া বন্ধ করেছিল, তারপর আচার্যমশাই তো পাকাপাকিভাবে চলে গেলেন শ্রীরামপুরে। কখনো সখনো গঙ্গানারায়ণ এলেও নীচতলা থেকে ওপরে ওঠে না। এ-বাড়িতে তার অবারিত দ্বার। সে কি ওপরে এসে দেখা করে যেতে পারে না বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে? অকৃতজ্ঞ! এখন সে তার সহপাঠী বন্ধুদের নিয়েই মত্ত। অথচ এক সময় লাজুক মুখচোরা ছিল, বিন্দুবাসিনী ছাড়া আর কারুর সঙ্গে ভালো করে মিশতেই পারতো না। আজকাল সে নিশ্চয়ই লুকিয়ে চুরিয়ে মদ খায়, তাই ভয়ে বিন্দুবাসিনীর কাছে আসে না। বিন্দুবাসিনী সংবাদ প্রভাকরে পড়েছিল, হিন্দু কালেজের সব ছাত্রই নাকি ইদানীং মদ খেয়ে দেখানো-পনা করে। অথচ গঙ্গানারায়ণ বিন্দুবাসিনীকে ছুঁয়ে শপথ করেছিল যে সে কখনো সুরা পান করবে না। না রাখতে পারলে তেমন শপথ করা কেন? বিন্দুবাসিনী তক্কে তক্কে আছে, গঙ্গানারায়ণকে একদিন না একদিন তো সামনাসামনি পাবেই, সেদিন সে গায়ের ঝাল ঝেড়ে নেবে।

গঙ্গানারায়ণ আগে বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে তর্ক করতো, এখন মাঝে মাঝে সে এ-বাড়িতে এসে বিধুশেখরের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে মাতে। এখন তার মুখে দিব্যি বোল ফুটেছে। রামকমল সিংহকে সে অতিরিক্ত সমীহ করে বলে তাঁর সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে না। কিন্তু বিধুশেখরের সঙ্গে বাল্যকাল

থেকেই তার খুব সহজ সম্পর্ক। বিধুশেখর এক সময় নিজের মেয়েদের সঙ্গে গঙ্গানারায়ণকেও বসিয়ে কত স্তোত্র মুখস্থ করিয়েছেন। শৈশবে কতদিন কোলে কাঁধে নিয়ে আদর করেছেন ওকে। আজ সেই বিধুশেখরের সঙ্গে গঙ্গানারায়ণ নাস্তিকতা বিষয়ে আলোচনা করে।

রামকমল সিংহ বিষয় তদারকীতে আবার মফঃস্বলে গেছেন। এদিকে গঙ্গানারায়ণের সহপাঠী বঙ্কুর কনিষ্ঠা ভগ্নীর বিবাহ হবে ফরাসডাঙ্গায়, সেখানে যাবার জন্য বন্ধুরা সবাই তাকে পেড়াপেড়ি করছে খুব। এ ব্যাপারে জননী বিম্ববতীর কাছ থেকে অনুমতি নেওয়াই যথেষ্ট নয়, তাই গঙ্গানারায়ণ এসেছিল বিধুশেখরের মতামত জানতে।

বিধুশেখর আপত্তি করলেন না। তবে যাতায়াত ব্যবস্থা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ নেবার পর সিদ্ধান্ত জানালেন যে ও বাড়ির গোমস্তা দিবাকরও তার সঙ্গে যাবে। ব্যাপারটা গঙ্গানারায়ণ খুব পছন্দ না করলেও মেনে নিতে হলো।

কথায় কথায় বিধুশেখর গঙ্গানারায়ণেরও বিবাহ প্রসঙ্গ তুললেন। হাসতে হাসতে বললেন, অন্যের বে'র নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়াচ্চিস, এবার তো তোর বে'টাও দিতে হয় রে, গঙ্গা। আর তো দেরি করা যায় না। বয়েস কত হলো?

গঙ্গানারায়ণ লজ্জায় মাথা নিচু করে রইলো।

বিধুশেখর বললেন, দাঁড়া, আমিই হিসাব করে বলে দিই। ভাদ্র মাসে জন্ম, তাহলে এই ভাদ্রে হলো গে...কত? সতেরো! অ্যাঁ? ষোলো পার হয়ে গেছে। এখনো বে হয়নি! লোকে বলবে কি? তোর বাপেরও যেমন হুঁস নেই, সবই আমার ওপর চাপায়! কন্যেপক্ষ তাড়া দিচ্ছে, এখনো দিন ধার্য হলো না! গত সালে তো ওদের বাড়িতে কালাশৌচ গ্যালো, তারপর তো এক বচর পার হয়ে গ্যাচে, যায়নি? আফসোস করিসনি, এই শীতেই তোরটা লাগিয়ে দেবো!

আফসোস কি, গঙ্গানারায়ণের মনের মধ্যে গুনগুন করছে প্রতিবাদ, কিন্তু সেটা সে মুখ ফুটে বলতে পারবে না।

—বে'টা হয়ে গেলে তারপর তুই বিষয়কম্মে লেগে পড়। কালেজ-টালেজ আর যেতে হবে না। যা হয়েচে, যথেষ্ট হয়েচে!

গঙ্গানারায়ণ চমকে উঠলো। বিধুশেখর বিন্দুবাসিনীর পড়াশুনো বন্ধ করে দিয়েছেন। এবার কি তার পড়াও বন্ধ করতে চান? এর প্রতিবাদ করতেই হবে, চোখ-কান বুজে না হয় বিয়েটা করে ফেলা যাবে। বিয়ের সঙ্গে কলেজ ছাড়ার সম্পর্ক কী?

—খুড়োমশাই, আমার যে এখনো দু' ক্লাস পড়া বাকি আচে?

—যা হয়েচে যথেষ্ট হয়েচে! ইংরেজিতে অ্যাসে লিখতে শিখিচস, বলতে কইতে শিখিচস, আর কালেজে গিয়ে কী হাতি ঘোড়া শিখবি? না উট্‌কো লোকদের মতন তোকে চাকরি খুঁজতে হবে?

গঙ্গানারায়ণ জানে যে এ ব্যাপারে বিধুশেখরের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। উনি যদি এক কথায় না বলে দেন, তাহলে আর সে কথা ফেরাবার উপায় থাকবে না। সে অনুনয়ের পথ নিল।

—আপনি অনুমতি দিন, খুড়োমশাই। আমি আরও দু' বছর পড়বো।

—শোন গঙ্গা, আমার যখন চোদ্দ বছর বয়েস, তখন আমি শেরউড সাহেবের সেরেস্তায় কাজ নিয়িচিলুম। তখন থেকে রোজগার করি। তোর বাপ রামকমলের বয়েস যখন পনেরো, তখন থেকেই সে হাজার হাজার টাকার কারবার করে। আর তোর বয়েস এখন সতেরো, আজও তুই ছাড়া গোরুর মতন ঘুরে ঘুরে বেড়াস।

—আপনাদের আমলে তো লেখাপড়ার এত রেওয়াজ ছিল না।

—আমরা তোদের চেয়ে কম লেখাপড়া করিচি বলতে চাস?

—আজ্ঞে না! আপনারা নিজে নিজে শিক্ষিত হয়েচেন। খুড়োমশাই, আপনি যদি রিচার্ডসন সাহেবের লেকচার শুনতেন, তাহলে বারবার না গিয়ে কিছুতেই থাকতে পারতেন না।

—রিচার্ডসন? সেই মাতালটা? তার ওপর ছেলেদের পড়াবার ভার! স্কুল সোসাইটি যে ওকে এখনো রেখেচে, সেটাই এক কলঙ্ক!

—না, না, উনি এখন নেই। মান্দ্রাজ চলে গেছেন।

—হাঃ হাঃ হাঃ! তাহলে আর টান কিসের? শোন বাবা, আমি সত্যি কথাটা বলি। তোদের ঐ কালেজী শিক্ষা যে ছেলেগুলানের মাথা বিগড়োচ্চে, এ আমার মোটেই পছন্দ হয় না। ধর্মশিক্ষা ছাড়া আবার মানুষের শিক্ষা হয় না কি? সাদা খরগোশটা যেদিন থেকে খয়েরি হলো, সেদিন থেকেই দেশের সর্বনাশ শুরু হলো।

—সাদা খরগোশ? ও, হেয়ার সাহেব!

—তুই এসেছিলিস ঘড়ির ব্যবসা করতে, তাই কর। সাহেবসুবো লোক, তোর অত নেটিবদের সঙ্গে মেলামেশা করারই বা কী ঠ্যাকা? দিশী লোকদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যই বা তোর অত মাথা ব্যথা কেন? এ-দেশের লোক নিজের ভালো বোঝে না? হেয়ার যেদিন নিজের ঘড়ির ব্যবসা তুলে দিল গ্রে সাহেবের হাতে, সেদিন এক ইংরিজি কাগজে লিখেচিল, ওল্ড হেয়ার টার্নড গ্রে। লেখাপড়া তো লবডঙ্কা, আসলে নাস্তিকতা প্রচারের চেষ্টা। আমি বুঝি না? থাক ওসব কতা। আমরা তো বুড়ো হচ্চি, এখন তো তুই আমাদের একটু দায়দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দিবি। কোন্‌দিন চোখ বুজবো...তোর বাপ যা বিষয়সম্পত্তি রেখে যাবে, তাতে তোদের কয়েক পুরুষ অন্তত ইংরেজের গোলামী কত্তে হবে না...তবে আর ঐ ইংরেজের শিক্ষা নিয়ে এত মাতামাতি কেন? আস্তে আস্তে কাজ বুঝে নে...

এইসব কথা যখন হচ্ছিল, তখন দোতলার বারান্দা থেকে শুনছিল বিন্দু। বাবা গঙ্গারও পড়াশুনো বন্ধ করে দিতে চান শুনে তার আনন্দ ও বিষাদ দু'রকমই বোধ হচ্ছিল। এক সময় সে দেখলো, গঙ্গা ম্লান মুখে বেরিয়ে যাচ্ছে, একবারও ওপর পানে চাইলো না।

ঠাকুরঘরের মেঝেতে শুয়ে শুয়ে বিন্দুর এই রকম নানা কথা মনে পড়ে। কিছুতেই তার ঘুম আসে না। তার মনে হয়, সে যেন বিশ্ব পরিত্যক্ত। অসহ্য তৃষ্ণায় গলাটা খরখর করে। বুকটা যেন যে-কোনো মুহূর্তে ফেটে যাবে। জানলায় বসে দুটি কাক অবিশ্রান্তভাবে ডেকে যাচ্ছে। সেই কা-কা ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। বিন্দুবাসিনী মুখখানা উঁচু করতেই তার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগলো। কেন সে কাঁদছে, জানে না।

কান্নারও সীমা আছে। নির্জন ঘরে বসে কেউ তো অবিশ্রান্তভাবে কেঁদে যেতে পারে না। এক সময় বিন্দু চোখ মুছলো। তারপর সে দেখলো মেঝেতে কয়েকটি জলের ফোঁটা। কোনো কিছু না চিন্তা করে বিন্দু লোভীর মতন সেই জল চাটতে লাগলো। ক' ফোঁটা তো জল, জিভটাও ভিজলো না তাতে, শুধু একটু নোনতা স্বাদ। তবু পরক্ষণেই বিন্দু আঁচল দিয়ে ঘষে ফেললো জিভটা। তার কি পাপ হলো? একাদশীর দিন সে জল খেয়ে ফেলেছে। নিজেরই চোখের জল, তা খেলে কী পাপ হয়?

—বিন্দু! বিন্দু!

বিন্দুবাসিনী আমূলভাবে চমকে উঠলো। কে? কে ডাকছে তাকে? খানিকটা চেনা, খানিকটা অচেনা কণ্ঠস্বর। এ সময় কোনো পুরুষমানুষ তো তাকে ডাকবে না।

বিন্দু ধড়মড় করে উঠে জানলার সামনে দাঁড়ালো। এ জানলা দিয়ে বাইরের পথ দেখা যায় না। এদিকে তাদের বাগান, গোয়ালঘর আর একটু দূরে পুকুর। পুকুর ধারের জামরুল গাছটা থেকে গুঁড়ো গুঁড়ো ফুলের রেণু ঝরে পড়ছে, এদিকে কেউ নেই।

দরজা খুলে বিন্দু বাইরে এলো। সিঁড়ির কাছে এসে উঁকি মারলো নীচে। কেউ নেই, সব সুনসান। বিধুশেখর বাড়িতে নেই, ইচ্ছে করলে সে এখন নীচে যেতে পারে। কিন্তু তার অভিমান আছে, সে যাবে না।

ঠাকুরঘরে ফিরে আবার শুয়ে পড়তেই বিন্দু ফের শুনতে পেল সেই ডাক। এবার আর একটু ব্যাকুল গলায়, বিন্দু! বিন্দু!

এই দারুণ নিদাঘের মধ্যেও বিন্দুর সারা শরীরে যেন শীতের অনুভূতি হলো। প্রতিটি রোমকূপে সেই স্পর্শ ঠিক এক ঝলক। বিন্দু চিনতে পেরেছে কণ্ঠস্বর। এ তো অঘোরনাথ। কতদিন আগে, মনে হয় যেন বহু যুগ আগে, রাজপুর গ্রামে ঐ রকম গলায় যেন একজন ডাকতো বিন্দুকে। মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পরা, খালি গা, গোরাদের মতন গায়ের রঙ, মাথায় বাবরি চুল, চোদ্দ বছর বয়েসের এক কিশোর। ঐ চেহারাটাই শুধু মনে আছে বিন্দুর। ঐ চেহারা, ঐ কণ্ঠস্বর তার স্বামী অঘোরনাথের।

গাছে চড়ায় ওস্তাদ ছিল অঘোরনাথ। পেয়ারা গাছের মগডালের ওপর দাঁড়িয়ে সে তার বালিকা বধূর দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতো পাকা পেয়ারা।

সে ডাকছে? কিন্তু সে তো নেই। বিন্দু নিজে দেখেছে, মাত্র দেড়দিনের ভেদ-বমিতে তাকে ছটফটিয়ে মরে যেতে। সে কি ফিরে এসেছে বিন্দুর টানে, সে কি বিন্দুকে নিয়ে যেতে চায় মৃত্যুর অদৃশ্যলোকে। বিন্দু ভয় পেয়ে মুখ ঢেকে ফেললো। তার ইচ্ছে করলো, ছুটে গিয়ে মায়ের কোল ঘেঁষে শুয়ে পড়তে। ছেলে-বয়েসে যেমন যেত। কিন্তু তীব্র অভিমান তার ভয়কেও ছাপিয়ে গেল। সে আবার কাঁদতে লাগলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

এই কান্নাও আবার এক সময় থামে। এবার আর সে নিজের অশ্রু পান করলো না, বরং জ্বলন্ত চোখে তাকালো জনার্দন মূর্তির দিকে। এক বিঘৎ পরিমাণ সোনার মূর্তি, শিল্পীর কারিগরিতে তার ওষ্ঠাধর সব সময় হাস্যময়। যে মানুষ বা যে মূর্তি সব সময় হাসে, তার মতন নিষ্ঠুর বুঝি আর কিছু হয় না। বিন্দুর সারা শরীরে বেরুচ্ছে ক্রোধের ছটা। সে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলো সেই মূর্তির দিকে।

অঘোরনাথ ডাকলেই বা বিন্দু কেন তার সঙ্গে যাবে মৃত্যুর অদৃশ্যলোকে। বাবা বলেছেন, এখন থেকে জনার্দনই তার স্বামী। বিন্দু ফুলমালার স্তূপ থেকে সেই মূর্তিটা তুলে নিল হাতে।

বিন্দু একবস্ত্রা। তার উরসে যৌবন সবে দৃশ্যমান হয়েছে। সেই কোমল, উষ্ণ, স্বর্ণাভ যৌবনময় বুকে কঠিন স্বর্ণমূর্তিটি চেপে ধরে বিন্দু ব্যাকুল গলায় বললো, তুমি আমায় কী দেবে? ঠাকুর, বলো, কী দেবে তুমি আমায়?



শহরটি প্রায় স্পষ্ট দুভাগে ভাগ করা। হুগলী নদীর ধার ঘেঁষে যেখানে পুরোনো কেল্লা ছিল, সেই অঞ্চলেই শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষদের ঘনবসতি। গ্রেট ট্যাঙ্ক বা লাল দীঘির দক্ষিণ আর পশ্চিম দিকে সাহেবদের সুন্দর সুন্দর বসত বাড়ি। এর মাঝখান দিয়ে চলে গেছে কোর্ট হাউস স্ট্রিট নামে একটি প্রশস্ত রাস্তা। আর একটু দক্ষিণে গাছপালা ঘেরা চৌরঙ্গি এবং বেরিয়াল গ্রাউন্ড রোডের পাশে পাশেও কয়েকটি বাগানবাড়ি রয়েছে ধনী সাহেবদের। নতুন কেল্লা তৈরি হয়েছে গভীর জঙ্গল সাফ করে এবং লড়াইয়ের সুবিধের জন্য রাখা হয়েছে অনেকখানি ফাঁকা ময়দান। তার নাম এসপ্লানেড। এই এসপ্লানেড শব্দটির মানেই হচ্ছে দুর্গ এবং নগরীর অট্টালিকা শ্রেণীর মাঝখানের জায়গা।

আদিবাসীদের পল্লী মোটামুটি শহরের উত্তরাঞ্চল জুড়ে। পাদ্রী, শিক্ষক ও কিছু কিছু দোকানদার ছাড়া অন্য সাহেবরা এই নেটিভপাড়ায় বেশী আসে না। অবশ্য ধনী নেটিভবাড়ির উৎসবে নিমন্ত্রণে সাহেবরা আসে মাঝে মাঝে। বেলগাছিয়ায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের রূপকথাতুল্য প্রমোদ ভবনে নেমন্তন্ন পাবার জন্য রাজপুরুষেরা পর্যন্ত লালায়িত হয়ে থাকে। নেটিভদেরও সাহেবপাড়ায় যাবার বিশেষ কোনো বিধিনিষেধ নেই যদিও, কিন্তু বিনা কাজে কেউ চট করে ওদিকে যেতে ভয় পায়। সন্ধ্যের পর গড়ের মাঠে মাতাল গোরারা দিশী লোকদের মেরে হাতের সুখ করে নেয়, এমন জনশ্রুতি আছে। কলকাতা থেকে যারা কালীঘাটে তীর্থ করতে যায় তারাও অন্ধকার নামবার আগেই বেলাবেলি ফিরে আসে অথবা রাত্রিবাস করে সেখানেই।

বউবাজার পার হয়ে লালবাজার দিয়ে সাহেবপাড়ায় ঢুকতে গেলেই প্রথমে চোখে পড়ে সুপ্রিম কোর্ট ভবনটির সুউচ্চ চূড়া। উপনিবেশ স্থাপনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আদালতের প্রতিষ্ঠা করে ইংরেজ চমকে দিয়েছে ভারতবাসীকে। ন্যায়ের প্রতি আনুগত্য ইংরেজের জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং একথা ইংরেজ সগর্বে প্রচার করে। দিশী লোকদেরও ধারণা হয়ে গেছে যে ইংরেজ রাজত্বে সুবিচার পাওয়া যায়। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসীর স্মৃতি লোকের মন থেকে মুছে গেছে। সেও তো প্রায় ষাট সত্তর বছর আগেকার ঘটনা।

ইংরেজ দেশটা শাসন করলেও এখনো পর্যন্ত পাকাপাকি সনদ নিয়ে এদেশের রাজা হয়ে বসেনি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষটা ইজারা নিয়েছে, কিন্তু তাদের কার্যকলাপের জন্য মাঝে মাঝে বৃটিশ পার্লামেন্টের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। এদেশেও তাদের ব্যবহার অতি সতর্ক। নেটিভদের সঙ্গে পরামর্শ না করে ইংরেজ চট করে কোনো সামাজিক নীতি বদল করে না। প্রথম দিকে ক্ষৌরকার, ঝাড়ুদার, খানসামা, দালাল ও ফড়ে শ্রেণীর কিছু কিছু লোক সাহেবদের সংস্পর্শে এসে দু-চারটি ইংরেজি শব্দ শিখতে শুরু করে। সাহেবরা তাদের দিয়েই কাজ চালাতো। এখন সম্ভ্রান্ত, সম্পন্ন ঘরের লোকেরাও ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং তাদের মাধ্যমে সাহেবরাও জানতে পারছে যে এ দেশটা শুধু কুৎসিত, কদর্য চেহারার নির্বোধ মানুষেই ভরা নয়, এদেশে আছে সুদীর্ঘকালের জ্ঞান-

সম্পদ এবং আরও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এদেশের কোনো কোনো অতি দরিদ্র মানুষও বিনা কারণে অহংকারী হতে পারে।

আরও একটি ব্যাপার জানতে পেরে সাহেবদের আত্মশ্লাঘায় খানিকটা গোপন ঘা লেগেছে। অনেক সাহেব যেমন নেটিভদের স্পর্শ করতে ঘৃণা করে, তেমনি অনেক নেটিভও ঘৃণায় সাহেবদের ছোঁয় না কিংবা দৈবাৎ ছুঁয়ে ফেললেও গঙ্গায় স্নান করে আসে। আমি যাকে পায়ের তলায় রাখতে চাই এবং রাখতে পারি, সে কাতরভাবে আমার কাছে দয়া ভিক্ষা করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সে যদি বিনা প্রতিবাদে পায়ের তলায় শুয়ে থাকে এবং মনে মনে আমাকেও তার পায়ের তলায় রাখে, তাহলে সুখটা ঠিক সম্পূর্ণ হয় না।

যাই হোক, ভয় বা ঘৃণার চেয়ে ইংরেজদের সম্পর্কে এখন ভক্তি ভাবটাই অবশ্য বেশী প্রবল। কয়েক শতাব্দীর অরাজকতায় জনসাধারণ একেবারে বিধ্বস্ত অবস্থায় পেঁছিছিল। নবাবী আমল উচ্ছন্নে গেছে বলে কারুর মনে কোনো খেদ নেই। তখনকার জঘন্য অত্যাচারের স্মৃতি এখনো মানুষের মনে সজাগ। সিরাজ-উদ্দৌল্লা, মীরকাশীম, প্রতাপাদিত্য ইত্যাদি নামগুলি ভবিষ্যতের নাট্যকারদের হাতে গৌরবান্বিত হবার অপেক্ষায় আপাতত ইতিহাসের অবহেলিত অন্ধকার কক্ষের দলিল দস্তাবেজে নিহিত। এখন লোকের চোখে ওরা নারীলোলুপ, রক্তশোষণকারী এবং দস্যু। লম্পট এবং দস্যুরা যে এখনো নেই তা নয়, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে এখন নালিশ করা যায়। এবং সুবিচারও দুর্লভ নয়। ক্ষেত্রমণি নাম্নী একটি নাবালিকার ওপর পাশবিক অত্যাচারের অভিযোগে সুবিখ্যাত বসাক পরিবারের সন্তান হরগোবিন্দর সম্প্রতি কারাদণ্ড হয়েছে। এমন কথা কয়েকশো বছরের মধ্যে কেউ শোনেনি। যার পিতার লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি আছে, সে কি না সামান্য একটি দরিদ্র বালিকার কারণে জেল খাটে! মাত্র কিছুদিন আগেও তো বিশ তঙ্কায় ওরকম একটি ক্রীতদাসী পাওয়া যেত।

ইংরেজের এই ন্যায়বিচারের প্রতীক ঐ সুপ্রিম কোর্টের চূড়া। লোকে এই পথ দিয়ে যাবার সময় ভক্তিভরে সেদিকে তাকায়। এখনো কেউ জানে না যে বিচার ব্যবস্থার এই আড়ম্বর ইংরেজ জাতির একটি বিলাসিতা মাত্র। প্রয়োজনের সময় এসব বিলাসিতা ছেঁটে ফেলতে তারা একটুও দ্বিধা করে না।

কোনো এক পর্ব উপলক্ষে আজ আদালতের ছুটি। সুপ্রিম কোর্ট ভবনের সিঁড়িতে একজন মধ্যবয়স্ক গ্রাম্য মানুষ তার স্ত্রী ও দুটি শিশু পুত্রকন্যা নিয়ে বসে আছে। তারা ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত এবং বিভ্রান্ত। পাঁচদিন পাঁচ রাত তারা হেঁটেছে, তারপর নৌকোয় হুগলী নদী পার হয়ে আজই দুপুরে পেঁছেচে আর্মেনিয়ান ঘাটে। ওপরে উঠে কলকাতা শহরের রূপ দেখে তারা হতভম্ব হয়ে গেছে। একসঙ্গে এত সারিবদ্ধ পাকা বাড়ি তারা কখনো দেখেনি, দেখেনি এত বিচিত্র রকমের পোশাক পরা মানুষজন। এমনকি এর আগে স্বচক্ষে কোনো গোরা সাহেব দেখার সৌভাগ্যও হয়নি তাদের।

লোকটির নাম ত্রিলোচন দাস, স্ত্রীর নাম থাকোমণি, ছেলেটি ও মেয়েটির নাম দুলালচন্দ্র ও গোলাপী। ওরা এসেছে কুষ্টিয়ার ভিনকুড়ি গ্রাম থেকে। ত্রিলোচন বংশানুক্রমে রায়ত, চাষবাস ছাড়া কিছুই জানে না। পর পর দু বছরের আকালে সে বড়ই বিপাকে পড়েছিল। কয়েকদিন আগে তার বসতবাড়ি পুড়ে যাওয়ায় সে সর্বস্বান্ত হয়েছে। এই পরিবারটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাম্প্রতিকতম অবদান।

ত্রিলোচন দাস জানতেই পারেনি কবে তার জমিদার বদল হয়ে গেছে। সে

জানে আকাশে কোন্ জাতের মেঘ উড়লে বৃষ্টি হয়, কখন ধানে পোকা লাগে, নদীতে কখন ষাঁড়াষাঁড়ির বান আসে। সে আকাশ, মাটি, রোদ, বৃষ্টি, নদী ও গাছপালার খবর রাখে, সে জানে না দেশ কাকে বলে, সে জানে না জমিদাররা কীভাবে বদলায়। তবে, সে এইটুকুও জানে যে জমিদারকে খাজনা না দেওয়াটাই বড়ই পাপের কথা। মুখের রক্ত তুলেও জমিদারের খাজনা মিটিয়ে দিতে হয়। পর পর দু বছর আকাল হলে কেঁদে পড়ে জমিদারের হাতে পায়ে ধরতে হয়। পাইক-বরকন্দাজদের কাছ থেকে সে সময় কিছু উত্তম মধ্যম জোটে বটে, কিন্তু কিছু একটা ব্যবস্থাও হয়ে যায়।

এবার সে দেখলো নতুন একজন নায়েবকে এবং সঙ্গে নতুন পাইক-বরকন্দাজদের। এবং সে শুনলো যে তাকে তিনগুণ খাজনা দিতে হবে। সে ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলো না। তাদের গ্রামে দু-পাঁচঘর বামুন কায়েত ছাড়া আর সবাই চাষী। সব চাষীরই এক অবস্থা। কেউ কিছুই বুঝলো না। খাজনা না পেলে পাইক বরকন্দাজরা জোরজলুম করে লোকের ঘর থেকে ঘটিবাটি কেড়ে নিতে লাগলো। ত্রিলোচন দাসের ঘরে সেরকম বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না বলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো তার বাড়িতে। সেই আগুনের পাশে দাঁড়িয়েই নায়েবমশাই তামাক টানতে লাগলেন। ত্রিলোচন তার পা ছুঁতে গেল, তিনি পা ছাঁটা দিয়ে বললেন, আরে ছুঁসনি, ছুঁসনি। ব্যাটা ভগবানকে ডাক গিয়ে। ভগবান ছাড়া কেউ তোদের আর বাঁচাতে পারবে না।

আগে জমিদার অত্যাচারী, অর্থপিশাচ হলেও প্রজারা জানতে পারতো সেই মানুষটা কেমন। সেইসব জমিদার নিজেদের স্বার্থেই আকালের বছর চাষীকে ধান দাদন দিত। কারণ, চাষীকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে না রাখলে পরের বছর সে চাষ করবেই বা কী করে আর জমিদারের ঋণই বা শোধ হবে কীভাবে। মরা মানুষের কাছ থেকে তো খাজনা আদায় করা যায় না। কিন্তু এখন অবস্থা অন্যরকম হয়ে গেছে। চাষীর কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে না পারলে জমিদারেরাও ঠিক সময়ে নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে পারতো না ইংরেজ কোম্পানির ভাঁড়ারে। তার ফলে লর্ড কর্নওয়ালিশ করে দিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। জমিদাররা যেভাবে হোক, যত ইচ্ছে হোক খাজনা আদায় করুক, বছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দিতে হবে কোম্পানিকে। বারবার জমিদারি হস্তান্তরে কোম্পানির ক্ষতি হয়। কোম্পানি নির্দিষ্ট টাকা পেলে আর জমিদারদের ব্যাপারে মাথা গলাবে না।

ফলে জমিদারির প্রতি আকৃষ্ট হলো নতুন ধনীরা। নুন, কাপড় এমনকি বোতলের ছিপির কারবার করে যারা হঠাৎ বড়লোক হয়েছিল, তারাও টপাটপ মহালের পর মহাল কিনে জমিদার হয়ে বসলো। খাজনা বাড়াবার অধিকার তাদের, যেমন করে হোক খাজনা আদায়ের অধিকারও তাদের। এই সব নতুন জমিদাররা বসে রইলো কলকাতায়, প্রজাদের সঙ্গে তাদের চাক্ষুষ দর্শনও হলো না, কর্মচারীরা টাকা আদায় করে আনতে লাগলো। নতুন জমিদাররা হর্ম্যমালা নির্মাণ করতে লাগলো শহরে এবং ডুবে রইলো বিলাসিতায়।

আধুনিকতম বিলাসিতা হলো সংস্কৃতি চর্চা। প্রজা নিপীড়নের টাকায় সঙ্গীত, শিল্প এবং ধর্ম সংস্কারের খুব হুজুগ দেখা দিল। এদিকে কর্মচারীরা খাজনা আদায় করতে না পারলে ছোট চাষীদের উচ্ছেদ করে সেই জমি খাস করে দিতে লাগলো বড় চাষীদের। বাঙলায় শুরু হলো ভূমিহীন কৃষকশ্রেণীর উদ্ভব। তাদের মধ্যে অনেকে আবার জীবিকার সন্ধানে আসতে লাগলো শহরে। কলকাতার

দিকে প্রবাহিত হতে লাগলো অবিরাম এক জনস্রোত। আমাদের এই ত্রিলোচন দাস সেই নতুন ভূমিহীনদের একজন।

ইদানীং প্রজা-নিগ্রহের নানারকম কাহিনী বৃটিশ শাসকদের কানে পৌঁছেচে, এমনকি খোদ বিলেতেও সে খবর গেছে। তাই প্রজাদের তত্ত্বতল্লাশ করার জন্য জেলায় জেলায় পাঠানো হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট। জমিদাররাও নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য স্থাপন করেছে ল্যান্ড হোল্ডার্স সোসাইটি। অ্যাসোসিয়েশন, সোসাইটি, সভা, সংবাদপত্র ইত্যাদি ইওরোপীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ আলোকপ্রাপ্ত নেটিভরাও সত্বর ব্যবহার করতে শিখে নিয়েছে।

ত্রিলোচন দাস কোনোদিন ভগবানকে দেখেনি, সাধারণ মানুষ কখনো তাঁর দেখাও পায় না। কিন্তু তার ধারণা ছিল, খুব চেষ্টা করলে কোনোক্রমে জমিদারের দেখা পাওয়া যেতেও পারে। এই বংশানুক্রমিক বিশ্বাস তার মধ্যে বদ্ধমূল ছিল যে, কেঁদে পায়ে পড়তে পারলে জমিদারের দয়া হবেই। লাথি মারুন আর কয়েদ বেড়ি করেই রাখুন, নিজের প্রজাকে তিনি শেষ পর্যন্ত ফেলতে পারবেন না। কর্মচারীদের শরীরে দয়া মায়া থাকে না, কিন্তু হাজার হোক জমিদার একজন মানী লোক।

ত্রিলোচন দাসের ক্ষুদ্র কল্পনাশক্তিতে জমিদার বাড়ির একটাই ছবি ফুটে ওঠে। ছোট ছোট অনেক বাড়ির মধ্যে একটি বিশাল প্রাসাদ, সেখানে লোহার ফটক আর সেই ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে মাথায় পাগড়ি বাঁধা শান্ত্রী। কলকাতা শহরটিকেও সে সেইরকমই কল্পনা করে রেখেছিল। গিয়েই জমিদার বাড়ি দেখতে পাবে।

কিন্তু এখানে যে শয়ে শয়ে জমিদারবাড়ি। এখানে রাস্তায় বহু লোকের মাথায় পাগড়ি। এখানে কেউ কারুকে চেনে না। এবং ত্রিলোচন দাস তার জমিদারের নামও জানে না। সে মাত্র শুনেছিল যে তার জমিদার প্রভু থাকেন কলকাতায়।

ভিড়ের মধ্যে দিশেহারা হয়ে গিয়ে ত্রিলোচন তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে এদিক ওদিক দৌড়েছে। যেখানেই একটু বসতে গেছে, অমনি লোকের তাড়া খেয়েছে। শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিয়েছে এখানে। ছুটির জন্য আদালত পাড়া ফাঁকা।

সুপ্রিম কোর্ট ভবনটিকেও ত্রিলোচন দাসের জমিদার বাড়ি বলেই মনে হয়, কিন্তু ভেতরে জনমনিষ্যি নেই। ত্রিলোচন এদিক ওদিক উঁকিঝুঁকি দেবারও সাহস পায়নি। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, এই নিরালাতেই তারা রাতটা কাটিয়ে দেবে ঠিক করেছে। কাল কী হবে, তার কিছুই জানে না। বাচ্চা দুটো ঘ্যান ঘ্যান করছে অনেকক্ষণ থেকে, থাকোমণি একগলা ঘোমটা দিয়ে বসে আছে, জেগে আছে না ঘুমোচ্ছে, বোঝা যায় না।

একটু অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁক ঝাঁক মশা এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মশা তো নয় যেন চড়ুই পাখির বাচ্চা। ত্রিলোচন দাস ঝপাঝপ করে চড় চাপড় চালাচ্ছে নিজের গায়ে। থাকোমণির এতেও হুঁশ বোধ নেই। পুঁটুলিটাতে মাথা দিয়ে ত্রিলোচন দাস শুয়ে পড়লো।

বাবা মা দু জনকেই চুপচাপ হয়ে যেতে দেখে বাচ্চা দুটো কান্না আরও বাড়িয়ে দিল। ছেলেটির থেকে মেয়েটির গলার জোর আরও বেশী। বিরক্ত হয়ে ত্রিলোচন দাস দু-জনের পিঠে কয়েকখানা বিরাশী সিক্কার কিল বসিয়ে দিল। এইবার নড়ে উঠলো থাকোমণি। হাত দিয়ে ছেলেমেয়ে দুটিকে আড়াল করে সে ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো, মেরোনি! মেরোনি বলচি! ভাত দেবার মুরোদ নেই, কিল মারার গোঁসাই!

ত্রিলোচন দাস বললো, চিঁড়ে গেলে না কেন? চিঁড়ে গিলতে বলো। ফের কাঁনলে আমি ঠেঙিয়ে শেষ করবো।

থাকোমণি বললো, আমাদের ক্যান নে এলে হেথায়? আমাদের ভিনকুড়ি ফিরে দে এসো।

গ্রাম ছেড়ে আসবার জন্য ত্রিলোচন দাস নিজেও এখন মনে মনে আফসোস করছে বটে, কিন্তু সেকথা স্বীকার করবে কেন। সে মুখঝামটা দিয়ে বললো, ভিটে মাটি চাঁটি হয়ে গিয়েছে, সেথায় থাকবে কি গাছতলায়?

এর উত্তরে থাকোমণি জানতে চায় যে এখানেই বা কোন্ রাজবাড়িতে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।

আর উত্তর না দিয়ে ত্রিলোচন দাস রাগে গরগর করে। সে নিরীহ চাষী, নিজের স্ত্রী ছাড়া আর কারুর ওপর সে রাগ দেখাবার সুযোগ পায়নি কখনো।

দুটি বড় পুঁটলির মধ্যে রয়েছে তাদের যথাসর্বস্ব। বেশ কিছু চিঁড়ে আর পাটালি গুড়ও এনেছে সঙ্গে করে। ক'দিন ধরে ক্রমাগত শুকনো চিঁড়ে চিবুতে চিবুতে ছেলেমেয়ে দুটির গাল ছিঁড়ে গেছে। তারা আর চিঁড়ে খেতে চায় না, ভাত চায়। বিদেশ বিভুঁয়ে এসে ত্রিলোচন দাস ভাত জোটাবে কোথা থেকে।

একটু পরে ছেলেমেয়েরা খিদের জ্বালায় সেই চিঁড়ে গুড়ই খেয়ে নিলো খানিকটা। ছেলেটা সিঁড়ির ক'-ধাপ নেমে গিয়ে ছচ্ছড় করে পেচ্ছাপ করে দিল সুপ্রিম কোর্টের দেয়ালের গায়। ফিরে এসেই বললো, জল খাবো।

ত্রিলোচন দাস বললো, হারামজাদ!

ছেলেটা তবু নাকি নাকি গলায় বলতে লাগলো, জঁল খাঁবো। জঁল খাঁবো!

মেয়েটা হেঁচকি তুললো একবার।

থাকোমণি বললো, আমারও তেষ্টা নেগেছে। সারারাত কি গলা শুঁষিয়ে থাকবো!

ত্রিলোচন দাস তিতিবিরক্ত হয়ে উঠলো। আবার একথাও বুঝলো যে এর পর থেকে ওরা অনবরত তাকে জল জল করে জ্বালিয়ে খাবে।

চিঁড়ে আর গুড় আনা হয়েছে দুটো মাটির হাঁড়িতে। একটা বোঁচকা খুলে একটা কাঁথার ওপর চিঁড়েগুলো সব ঢেলে, হাঁড়িটা খালি করে নিয়ে ত্রিলোচন দাস উঠে দাঁড়ালো। আসবার সময় কাছেই সে একটা বড় দীঘি দেখে এসেছে।

থাকোমণি বললো, দুলালকে সাথে নে যাও!

কিন্তু ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাবার ইচ্ছে হচ্ছে না ত্রিলোচন দাসের। সে আর কিছুই না বলে হন হন করে হাঁটতে লাগলো।

শুক্লপক্ষ, তাই আকাশের আলো আছে, পথঘাট খুব অন্ধকার নয়। কিন্তু একটুখানি এসেই থমকে গেল ত্রিলোচন দাস। যদি পথ ভুল হয়ে যায়? পেছন ফিরে একবার দেখে নিয়ে সে সাবধানে আস্তে আস্তে চলতে লাগলো, প্রতিটি পদক্ষেপ গুণে গুণে। গ্রাম দেশে মাঠের মধ্যে আলেয়া দেখে পথ হারিয়ে ফেললে এই রকম পা গুণে গুণে হাঁটতে হয়।

দীঘিটার এক পারে বসে কয়েকটা শিয়াল মন দিয়ে ডাকছে তারস্বরে। আর একটা কী যেন বড় জানোয়ার খানিকটা দূরে খুব জোরে জোরে ভর-র ভস ভর-র ভস করে নিশ্বাস নিচ্ছে। কয়েকটা বগি গাড়ির ঘোড়া ঘাস খেতে এসেছে ওখানে, কিন্তু অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় দূর থেকে ত্রিলোচন দাস সেগুলোকে চিনতে পারলো না। তার গা ছমছম করতে লাগলো। রাশি রাশি জোনাকি বাতাসের ঝাপটায় কখনো আলো কখনো অন্ধকারের ঢেউ হয়ে দুলছে।

পুকুরে নেমে প্রথমেই জল থাবড়ে পানা সরানো অভ্যেস ত্রিলোচন দাসের। এ দীঘির জল স্বচ্ছ টলটলে, ইংরেজদের খুব সাধের গ্রেট ট্যাঙ্ক বা "লাল ডিগি", তারা এর জল পান করে না বটে কিন্তু ছুটির দুপুরে ছিপ ফেলে বসে অথবা সন্তরণ প্রতিযোগিতায় নামে। হঠাৎ কোথাও আগুন লাগলে এই জল ব্যবহার করা হবে বলে দীঘিটি সংরক্ষিত। নেটিভদের এখানে আসা নিষেধ।

হাঁটু পর্যন্ত নেমে জল থাবড়ে ত্রিলোচন দাস প্রথমে মুখ ধুয়ে ভালো করে কুলকুচো করলো খানিকক্ষণ। নিজে জল পান করলো পেট ভরে। তারপর হাঁড়ি ভরে জল নিয়ে যেই উঠতে গেছে, অমনি রে রে করে তেড়ে এলো দুই যমদূত।

ইংরেজ রাজত্বের পাহারাওয়ালা হলেও তাদের চেহারা ও পোশাক অনেকটা নবাবী আমলের সেপাইদের মতন। মোচ আর জুলফি একসঙ্গে জোড়া। গাঁজার নেশায় চোখ টকটকে লাল। নিশুতি রাতে সাহেবপাড়ার মধ্যে এই দীঘিতে একজন হাবিজাবি চেহারার লোককে নামতে দেখে তারা যত না ক্রুদ্ধ তার চেয়ে বেশী অবাক। দুজনে মিলে ত্রিলোচন দাসের ঘাড় চেপে ধরে এমন হল্লা শুরু করে যে ত্রিলোচন দাস কিছুই বুঝতে পারে না। তারপর পিঠের ওপর দুম দাম শুরু হলে সে ভাবে এই বুঝি জমিদারের পেয়াদা এসেছে। তাতে সে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয় এবং এই গোলমালের মধ্যে মাটির হাঁড়িটা তার হাত থেকে পড়ে ভেঙে যায়।

মাতাল ধরার জন্য পাহারাওয়ালারা এখন সঙ্গে ডুলির মতন একটা জিনিস রাখে। কোনো মাতাল বেশী বেগড়বাঁই করলে সেই ডুলির মধ্যে ভরে প্রায় বোঁচকার মতন বেঁধে ফেলে ঝুলিয়ে নিয়ে যায়। ত্রিলোচন দাসের পা সোজা আছে দেখে তারা ওকে ডুলিতে না ভরে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে চললো।

ত্রিলোচন এবার কেঁদে কঁকিয়ে বলে উঠলো, ওগো আমার বউ ছেলে মেয়ে সঙ্গে আছে, তাদের নিয়ে আসি। ওগো—

কে শোনে কার কথা। ততক্ষণে পাহারাওয়ালাদ্বয় ত্রিলোচন দাসের ট্যাঁক হাতড়ে দেখে নিয়েছে যে সেখানে কিছু নেই, সুতরাং তারা আরও নির্দয় হয়ে তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল কোতোয়ালির দিকে। ত্রিলোচন দাস যত চিৎকার করে তারা তাকে তত বেশী প্রহার করে।

এদিকে থাকোমণি পক্ষীমাতার মতন দুই ডানায় ছেলে মেয়েকে আগলে বসে রইলো ঠায়। প্রহরের পর প্রহর কেটে গেল, তার স্বামী এলো না। সে আর কী করবে, শুধু প্রতীক্ষা করা ছাড়া? শেয়ালগুলো ডাকতে ডাকতে তাদের কাছে চলে আসছে। এক সময় দূরে দু-তিন বার গুড়ুম গুড়ুম করে বন্দুকের শব্দ হলো। কিসের যেন একটা শোরগোল উঠলো। এ সব কিছুতে থাকোমণির সর্বাঙ্গে ভয়ের কাঁটা দেয়। সাহেবদের বাড়ির বাগানে শেয়াল ঢুকে পড়লে সাহেবরা জানলা দিয়ে বন্দুক চালায়। দু-একটা শেয়াল মরলে উল্লাসের ধুম পড়ে যায়।

জল জল করে ছেলে-মেয়ে দুটো বেশ কিছুক্ষণ কাৎরে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়লো। ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়লো আর মেয়েটা হেঁচকি তুলতে লাগলো। তারপর গীর্জার গম্বুজের আড়ালে চাঁদ ঢলে পড়লে মেয়েটি কয়েকবার ওয়াক তুলে শুরু করলো বমি। থাকোমণি তাড়াতাড়ি মেয়ের মুখ চাপা দিল নিজের হাতে। কিন্তু ওতে ভেদবমি থামে না। এর নাম ওলাওঠা।

শহরে এমন কোনো বাড়ি নেই যে বাড়িতে অন্তত একজন না একজন ওলাওঠায় মরেনি। তবু গ্রামের তুলনায় শহর নিরাপদ। শহরে বিলিতি দাওয়াই পাওয়া যায় এবং পয়সা দিলে চিকিৎসক বাড়িতে আসে। সে চিকিৎসকদের মুখ চোখ দেখলেই খানিকটা ভক্তি হয়। গ্রামে একবার ওলাবিবির নজর লাগলে গ্রামকে

গ্রাম উজাড় হয়ে যায়। ওলাওঠার ভয়ে বহু লোক গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে এসে কলকাতায় আশ্রয় নিতে শুরু করেছে। গ্রাম থেকে যখন ভোর হতে লোকে পালায়, তখনও বারবার ভয়ে ভয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখে, ওলাবিবি তাড়া করে আসছে কিনা। এই ওলাবিবিই পরে এসিয়াটিক কলেরা নামে চিহ্নিত হয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম মানবধ্বংসকারীর ভূমিকা নিয়েছে।

বমির ফাঁকে ফাঁকে মেয়েটি জল জল বলে গোঙাতে লাগলো। তার ভাই দুলালচন্দ্র জেগে উঠেছে এবং বাবা বাবা বলে ডুকরে উঠলো কয়েকবার। তার বাবা সে ডাক শুনতে পেল না কিন্তু লাঠি ঠকঠকিয়ে এলো আর দুজন পাহারাওয়ালা। এ রকম জায়গায় একজন স্ত্রীলোককে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে বসে থাকতে দেখে তারাও অবাক হলো কম নয়। তারা পথের পাহারাওয়ালা, আদালত ভবন পাহারা দেওয়া তাদের দায়িত্ব নয়। এর জন্য দুজন আলাদা সেপাই থাকে। কিন্তু সারাদিন তাদের পাত্তা নেই।

একজন পাহারাওয়ালা চেঁচিয়ে উঠলো, হুকুমদার!

সেই বাজখাঁই গলা শুনে দুলালচন্দ্র আরও জোরে ও বাবা, বাবাগো বলে কেঁদে উঠলো। থাকোমণি বললো, ওগো, আমাদের ঘরের লোক কোথায় গেল! মেয়েটা কেমন কেমন করতিছে!

অচেনা স্ত্রীলোকের গলা শুনলে প্রথমে যে বিষয়ে কৌতূহল জাগে সেটি যাচাই করার জন্য পাহারাওয়ালা দুজন উঠে এলো সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ। হাতের জাহাজী লণ্ঠনটা উঁচিয়ে ধরলো থাকোমণির মুখের কাছে। থাকোমণিকে যুবতী এবং স্বাস্থ্যবতী দেখে তারা পরস্পর চোখাচোখি করলো এবং এই বিষয়ে এক মত হলো যে, তাহলে একে কোতোয়ালিতে নিয়ে যাবার নাম করে ধরা যায়।

একজন হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, উঠ্‌া! উঠ্‌া! ওঠাকে আ! রেণ্ডি কাঁহিকা।

থাকোমণি আরও সিঁটিয়ে গেল দেয়ালের দিকে। তখন একজন পাহারাওয়ালা তার শাড়ির আঁচল ধরে টানলো, অন্যজন ধরতে গেল তার কোমর।

থাকোমণি বললো, ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, আমার মেয়েটারে বাঁচাও!

এবার পাহারাওয়ালাদের আলো পড়লো মেয়েটির ওপরে। মেয়েটি তক্ষুণি ওয়াক তুলে হুড় হুড় করে বমি করলো অনেকখানি। এই বমি পাহারাওয়ালা চেনে। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে তাদের চোখ উঠলো কপালে।

আর দ্বিরুক্তিমাত্র না করে তারা পেছন ফিরে দৌড় লাগালো। তাদের সেই দৌড়োবার ভঙ্গি দেখে মনে হয় যেন অবিকল দুটি ল্যাজ তোলা বলীবর্দ।

খানিকটা পরে মেয়েটির কণ্ঠস্বর অনেক ক্ষীণ হয়ে এলো, তখনো বলতে লাগলো, জল, জল।

ছোট বোনের কষ্ট দেখে ছ' বছরের শিশু দুলালচন্দ্র বললো, মা, আমি জল নে আসবো?

দ্বিতীয় হাঁড়িটা খালি করে নিয়ে সে এগিয়ে গেল খানিকটা। কোন্ দিকে সে দীঘিটা দেখেছিল, ঠিক ঠাহর করতে পারলো না। তার ভয় করছে। তার ক্ষুদ্র বুকটিতে দারুণ অভিমান জন্মেছে বাবার ওপরে। কেন বাবা ফিরে এলো না। সে আবার প্রাণপণে ডাকলো, বাবা, বাবা!

সেই রিনরিনে শিশুকণ্ঠের ধ্বনি ঠিকরে ফিরে এলো শহরের কঠিন বাড়িগুলির দেয়াল থেকে। কেউ সাড়া দিল না। একটা বলগা ছাড়া একলা ঘোড়া এদিকে কপকপিয়ে ছুটে আসতেই সে ভয় পেয়ে দৌড়ে ফিরে এলো মায়ের কাছে। তার মা বললো, থাক, তোকে আর যেতি হবে না।

কথায় বলে, মাঝ রাতের ভেদবমি রাত শেষ হবার আগেই থেমে যায়। হলোও তাই। খানিক পরে মেয়েটি একেবারে নেতিয়ে গেল। সে ঘুমিয়েছে ভেবে একটু নিশ্চিন্ত হলো তার মা।

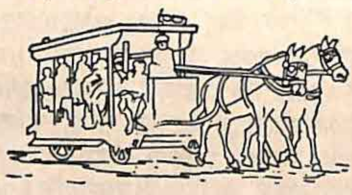
চাঁদ হেলে গেছে। আকাশে এখন খেলা করছে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। এতক্ষণ অসহ্য গরমের পর শেষ রাতে ঠান্ডা বাতাস ভেসে আসছে। এখন পৃথিবী কী শান্ত, সুন্দর। ভোগী, চোর এবং সাধু, যারা রাত জাগে, তারাও এই শেষ প্রহরে ঘুমকে আলিঙ্গনে জড়ায়। থেমে গেছে নর্তকীর পায়ের নূপুর। মাতালরাও এতক্ষণে গড়াগড়ি দিয়েছে। ঘুমন্ত নগরীর ওপর বিছিয়ে রয়েছে এক অনৈসর্গিক সৌন্দর্যের ওড়না।

থাকোমণি আর দুলালচন্দ্রও ঘুমিয়ে পড়েছিল এক সময়। দিনের আলো ফুটে গেলেও ঘুম ভাঙলো না।

ক্রমে পথে লোক চলাচল শুরু হলো। সাহেবরা এ দেশে এসে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়। আগে জেগে ওঠে তাদের নফর, বেহারা, খানসামা, দুধওয়ালা, ভিস্তিওয়ালার দল। যাতায়াতের পথে তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগলো।

পবিত্র ধর্মাধিকরণের সিঁড়িতে ছড়ানো রয়েছে চিঁড়ে, গুড়, ছেঁড়া কাঁথা। তার মধ্যেই শুয়ে আছে এক গ্রাম্য স্ত্রীলোক ও বালক। আর পাশেই বছর পাঁচেকের একটি বালিকা পুরীষ ও বমিতে মাখামাখি হয়ে মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে। তার মুখের ওপর ভন ভন করছে নীল ডুমো ডুমো মাছি।

ধুড়ুম করে বিরাট শব্দে সাতটার তোপ পড়তেই থাকোমণি ধড়ফড় করে উঠে বসলো। সামনেই কিছু লোককে সারবন্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বুকে তুলে নিল তার মৃত কন্যাকে।



থাকোমণিকে খুব সহজে স্থানচ্যুত করা গেল না। একেই তো গ্রাম্য রমণীর জেদ, তার ওপর ভয়ে ও পরাজয়ে সে একেবারে মরীয়া হয়ে উঠেছে। দেখতে দেখতে কৌতূহলী পথচারীদের ভিড় বাড়তে লাগলো, ওলাবিবির শিকার দেখে কেউ অবশ্য খুব কাছে আসছে না, কিন্তু তাদের কথাবার্তা ক্রমেই উচ্চগ্রামে উঠছে। কেউ বলছে, এই মাগী, উঠে আয়! কোথায় বসিচিস খেয়াল নেই! এখুনি কোঁৎকা খাবি! কেউ বলছে, মুদ্দোফরাস ডেকে এখুনি সাফ করে দাও, নইলে সাহেবরা দারুণ ক্ষেপে উঠবে। কেউ বলছে, মত্তে আর জায়গা পেলে না। এখন মহল্লা সুদ্ধু রোগ ছড়াবে। কেউ এক মুঠো কড়ি ছুঁড়ে দিয়ে বললো, রক্ষে করো মা, ওলাবিবি, রক্ষে করো!

সব ভিড়ের মধ্যেই একজন আলাদা মানুষ থাকে। সে বললো, আহা রে, ছেলেটারও মুখ শুকিয়ে গ্যাচে, ওকেও রোগে ধরলো বোধহয়। এই ছেলে, পালা, এখনো পালা!

দুলালচন্দ্র এত লোক দেখে ঘাবড়ে গিয়ে তার মায়ের হাঁটু ধরে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে।

ঝমাঝম শব্দে বড় ঝাঁটার আওয়াজ করতে করতে এগিয়ে এলো দুজন

ঝাড়ুদার। তাদের পেছনে পেছনে গাঁজাখোর চৌকিদার। সেই চৌকিদার শেষ রাতে ফিরে তার ঝুপড়িতে ঘুমিয়ে ছিল, কিছুই টের পায়নি। এখন সে শুরু করে দিল দারুণ হল্লা।

সুপ্রিম কোর্টের বারান্দায় এরকম একটা নোংরা ঘটনা অকল্পনীয় হলেও কী করে যেন ঘটে গেছে। চতুর্দিকে চিঁড়ে, গুড়, ছেঁড়া কাপড় আর বমি ছড়ানো, তার মধ্যে এক মৃত বালিকা।

—এই নিকালো, আভি নিকালো। কাঁহা কা বেহুদা।

জঙ্গল থেকে লোকালয়ে ছিটকে আসা কোনো বন্যপ্রাণী যেমন এক কোণে বসে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে, থাকোমণিও সেই রকম রোঁয়া ফুলিয়ে রইলো। বুকের ওপর শক্ত করে চেপে ধরে আছে তার মরা মেয়েকে।

ঝাড়ুদারদ্বয় সিঁড়ির ওপর দু চার ধাপ উঠে আবার হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে একটি নীতিগত আপত্তি তুললো। তারা মুর্দা ছোঁবে না, তাদের কাজ শুধু ঝাড়ু দেওয়া। তাছাড়া কোন্ না কোন্ জাতের মড়া তার কি কোনো ঠিক আছে? তারা থাকোমণি এবং তার দুই বাচ্চা সমেত খানিকটা জায়গা বাদ দিয়ে ঝাঁটা চালিয়ে প্রস্থান করলো।

মুদ্দোফরাসকে খবর দিয়ে নিয়ে আসতে আসতে অনেক দেরি হয়ে যাবে, তাই চৌকিদার দৌড়ে গিয়ে দুজন মেথরানীকে ধরে আনলো। এই মেথরানীরা এ শহরে রীতিমতন প্রতাপশালিনী। এদের মধ্যে যারা সাহেবপাড়ায় শৌচাগার পরিচ্ছন্ন রাখার ভার পেয়েছে, তাদের উপার্জন বেশ ভালোই। সকালে সন্ধ্যায় এরা সাহেবদের পুরীষের পাত্র মাথায় করে বয়ে নিয়ে গিয়ে পুণ্যসলিলা গঙ্গায় ঢেলে ফেলে দিয়ে আসে। বাকি সময়টা এদের ছুটি। এরা রঙীন ডুরে শাড়ি পরতে ভালোবাসে। এদের সরু কোমর, ভারী বুক এবং জিভগুলি ছুরির মতন। এদের জিভকে ভয় পায় না এমন মানুষ মেলা দুষ্কর। এরা পথেঘাটে নোংরা বইবার সময় মানুষজনকে ছুঁয়ে দিলেও, এবং প্রায়ই দেয়, তার কোনো সুরাহা নেই।

মেথরানী দুজন সিঁড়ির ওপর উঠে পর্যায়ক্রমে থাকোমণি, জনতা এবং চৌকিদারকে উদ্দেশ করে দুর্বোধ্য ভাষায় ঝড়ের বেগে কী যেন বলে গেল। যেন ওরা সবাইকে ধমকাচ্ছে। সেই সঙ্গে তাদের রঙীন শরীরে খেলে যাচ্ছে নানা তরঙ্গ। এমতপ্রকার রমণীদের কণ্ঠের ঝাল-বাক্যও দূর থেকে বেশ উপভোগ্য হয়। তাই বেশ কৌতুক পেয়ে গেল জনতা। থাকোমণি এবং তার মৃত শিশুর বদলে মেথরানী দুটিই তখন প্রধান লক্ষ্যবস্তু হলো।

হঠাৎ সকলের কণ্ঠ আবার থেমে গেল একসঙ্গে। পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে এক সাহেব। ইনি এই আদালতের প্রধান বেইলিফ, খুব কাছেই থাকেন। এঁর নাম অ্যান্ড্রুজ, কিন্তু সাধারণ নেটিভরা এঁকে ইদ্রুস সাহেব বলে ডাকে। ইনি নিষ্ঠুরতার জন্য বিখ্যাত। যে সব সাহেব নেটিভদের ঘৃণায় স্পর্শ করেন না, ইনি তাঁদের দলের নন। এঁর হাতের চড়-চাপড় অনেকেই খেয়েছে। একবার নিজের বাগানের মালির পেটে ইনি এমন লাথি মেরেছিলেন যে, সে লোকটি পরে দেড়দিন ধরে রক্ত বমি করেছিল। সেবার সকলেই খুব প্রশংসা করেছিল ইদ্রুস সাহেবের পায়ের জোরের।

ইদ্রুস সাহেবকে একটি কথাও খসাতে হলো না, তাঁর কটমট চক্ষুতেই কাজ হলো।

মেথরানী দুজন এবার তড়িৎগতিতে ছুটে গিয়ে একজন খপ করে ধরলো থাকোমণির মাথার চুল, অন্যজন মৃত কন্যাটিকে কেড়ে নিতে গেল। শুরু হয়ে

গেল ঝটাপটি। তার স্বামী ফিরে না এলে থাকোমণি যে কিছুতেই এখান থেকে উঠতে পারে না, সে কথা কেউ বুঝলো না।

মাতৃস্নেহের শক্তি মেথরানীদের সবল বাহুর তুলনায় কিছুই নয়। অবিলম্বেই তাদের একজন থাকোমণির কোল থেকে মৃত কন্যাটি কেড়ে নিতে সমর্থ হলো এবং দৌড় লাগালো। মেয়েটি যে মারা গেছে সে বোধহই এখনো হয়নি থাকোমণির। সে কিছুই বুঝতে পারছে না। এ কেমন জায়গা, যেখানে স্বামী জল আনতে গেলে আর ফেরে না, অচেনা লোকেরা দূরে দাঁড়িয়ে হাসে আর ডাকিনী যোগিনীরা এসে কোলের সন্তান কেড়ে নিয়ে যায়!

থাকোমণিও ছুটলো সেই মেথরানীর পিছু পিছু। তার পায়ে পায়ে লেগে রইলো দুলালচন্দ্র। এরপর এক একবার থাকোমণি সেই মেথরানীর কাছ থেকে মেয়েকে কেড়ে নেয়, আর মেথরানী ছিনিয়ে নেয় তার কাছ থেকে। পথের লোক এই দৃশ্য দেখছে, কেউ একটি কথাও উচ্চারণ করছে না। কয়লাঘাটা অঞ্চল পেরিয়ে তারা চলে এলো গঙ্গার ধারে। তিন চারবার কাড়াকাড়ির পর মেথরানীটি এক সময় মৃত শিশুটিকে জোরে আঁকড়ে ধরে খুব দ্রুত দৌড়ে শেষে ঝপাস করে সেটিকে ফেলে দিল নদীতে।

থাকোমণি সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার তাকে তুলে নিয়ে এলো। এবং এবার সে নিজেই ভয় পেয়ে ছুটতে লাগলো বিপরীত দিকে। যেন এইভাবেই ছুটতে ছুটতে এই শহর ছেড়ে সে ফিরে যাবে নিজের গ্রামে।

গঙ্গার পার জুড়ে একটানা শ্মশান। সাধারণ গরীবগুর্বো লোকেরা মৃতদেহ দাহ করে না, জলে ফেলে দেয়। প্রতিদিন নদীর বুকে এরকম অসংখ্য মৃতদেহ ভাসে। অনেকে যথেষ্ট কাঠের অভাবে মৃতদেহ অর্ধদগ্ধ অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়। সেইজন্যই এখানে হাড়গিলে আর শকুনির রাজত্ব। পরিত্যক্ত মৃতদেহ দেখলেই ওরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিশাল বিশাল হাড়গিলেগুলো মাটির ওপর দিয়ে খপাৎ খপাৎ করে লাফিয়ে চলে। এক এক সময় শকুনির দলের সঙ্গে হারগিলেদের লড়াই বেঁধে যায়। সে এক রোমহর্ষক দৃশ্য। আর মাঝে মাঝে কেল্লা থেকে যে সময়সূচক তোপ দাগা হয়, সেই শব্দে তারা ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য কালো করে দেয় আকাশ।

চতুর্দিকে মানুষের হাড় আর করোটি ছড়ানো। এখান দিয়ে হাঁটতে গেলে পায়ে হাড় বিঁধে যায় অনেক সময়। মাঝে মাঝে একটুখানি জায়গা সাফ্-সুতরো করে স্নানের ঘাটে যাবার পথ বানানো হয়েছে। সেই সব পথেও অনেক সময় পড়ে থাকতে দেখা যায় মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

গঙ্গার বুকে অসংখ্য জাহাজ। অধিকাংশই কাঠের তৈরি। অতি সম্প্রতি দু' একটি কলের জাহাজ আসতে শুরু করেছে। জাহাজের আনাগোনায় এই জলপথ এখন সদা ব্যস্ত। মাঝে মাঝে জাহাজে জাহাজে ঠোকাঠুকি লাগে, কিংবা ঝড়বাদলের জন্যও, এক একটা জাহাজ হঠাৎ উল্টে যায়। তখন সেই ডুবে যাওয়া জাহাজ সমস্ত মালপত্র সমেত নিলাম হয়, সেই নিলামে ডাক দেবার জন্য বেনীয়া আর শিপ-সরকাররা ভিড় করে জাহাজঘাটায়।

ভিজে কাপড়ে দৌড়তে দৌড়তে থাকোমণিও এক সময় ক্লান্ত হলো। দুলালচন্দ্রও অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। সুতরাং এক জায়গায় বসে পড়ে মা ও ছেলেতে গলা জড়াজড়ি করে কাঁদতে লাগলো।

কাছাকাছি এত শ্মশান, এখানে কারুর কান্নাই বিসদৃশ্য লাগে না। থাকোমণি বসে আছে একটি স্নানঘাটের পথের পাশে। সে পথ দিয়ে যাবার সময় কিছু

কিছু লোক দুটো চারটে কড়ি বা একটা আধলা ছুঁড়ে দিয়ে যাচ্ছে থাকোমণির কোলে। এসব দয়ার দান নয়, স্বর্গলোভীদের পারানি।

মৃত সন্তানকে কোলে নিয়ে শ্মশানে বসে কাঁদছে থাকোমণি, চিৎকার করে আহ্বান জানাচ্ছে তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর উদ্দেশ্যে। এ যেন 'হরিশ্চন্দ্র' পালার এক দৃশ্য। কিন্তু চণ্ডালবেশী ত্রিলোচন দাস হঠাৎ দেখা দিল না, বরং অপরাপর চণ্ডালরা থাকোমণির প্রতি কুদৃষ্টি দিতে লাগলো।

একটু পরেই হুমহাম করে একটি চার বেহারার পাল্কি এসে থামলো সেখানে। পাল্কির দু ধারেই পর্দা ফেলা। বেহারারা পাল্কি একটু মাটিতে রাখতেই এক ধারের পর্দা একটু ফাঁক হলো। সেখান থেকে একটি শিশুকে কোলে করে নেমে এলো একজন দাসী।

পাল্কির মধ্যে বসে রয়েছেন বিম্ববতী। পূর্ণিমা-অমাবস্যায় তাঁর গঙ্গাস্নানে আসা চাই-ই। ইদানীং তিনি ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে আসেন। মাত্র দু' বছর বয়েস পেরিয়েছে নবীনকুমার, কিন্তু এর মধ্যেই তার দুরন্তপনার শেষ নেই। সেইজন্য বিম্ববতী এক মুহূর্তও ছেলেকে চোখের আড়াল করতে পারেন না। গঙ্গারঘাটে এনেও স্বস্তি নেই, যেটুকু সময় বিম্ববতী স্নান করতে নামেন একদিন তারই মধ্যে ছেলে দাসীর হাত ছাড়িয়ে জলের দিকে ছুট লাগিয়েছিল। সে কারণে এখন দাসী ছাড়াও পাল্কির পিছু পিছু আসে বাড়ির গোমস্তা দিবাকর এবং একজন পাইক। তারা সর্বক্ষণ নবীনকুমারের ওপর নজর রাখে।

দাসী ও শিশু নেমে যাবার পর বেহারারা আবার পাল্কি তুলে নেমে গেল ঘাটের দিকে। স্ত্রী-পুরুষের আলাদা ঘাট নেই, যে-যেখানে পারে জলে নামে। বেহারারা লোকজন সরাবার জন্য চেঁচাতে লাগলো, হঠ যাও; হঠ যাও!

নিয়মিত স্নানার্থীরাও বড় বড় বাবুদের বাড়ির পাল্কি দেখে চিনে ফেলে। সিংগী বাড়ির পাল্কি এসেছে দেখে সবাই পথ ছেড়ে দিল। লোকেরা এই রকম ঘেরাটোপ দেওয়া পাল্কি দেখলেই বোঝে যে ভেতরে রয়েছে কোনো সুন্দরী রমণী। তাই তারা সেদিকে তাকিয়ে থাকে উৎসুক চোরা চোখে। যদি দৈবাৎ কখনো পর্দার ফাঁক দিয়ে সেই রূপবতীর দর্শন পাওয়া যায়। অনেক সময় ঠকতেও হয় তাদের। হাওয়ায় পর্দা উড়লো একটু, আর দেখা গেল ভেতরে বসে আছে দোমড়ানো মোচড়ানো চেহারার কোনো তিনকেলে বুড়ি।

পাল্কিসমেত বেহারারা নেমে গেল বুক জলে। তারপর বিম্ববতী সমেত সেই পাল্কি এক একবার করে জলে চুবিয়েই আবার তুলে নিতে লাগলো। গুনে গুনে ঠিক এরকম সাতবার করার পর তারা ডাণ্ডা কাঁধে নিয়ে দাঁড়ালো স্থির হয়ে। এখন একটুক্ষণ বিম্ববতী সূর্য প্রণাম করবেন।

স্বর্ণ প্রতিমার মতন স্থির হয়ে বসে বিম্ববতী যুক্ত কর ঠেকালেন ললাটে। তাঁর মুখমণ্ডলে প্রশান্ত তৃপ্তি। জীবনে তাঁর আর কোনো অপূর্ণতা নেই।

অকস্মাৎ দিকমণ্ডল কাঁপিয়ে পর পর তিনবার তোপের আওয়াজ হলো। নদীতে বান ডাকবে, তার সতর্কতা। বেহারারা চঞ্চল হয়ে উঠলো।

আবার পাল্কি উঠে এলো ওপরে। চিন্তা দাসী নবীনকুমারকে কোলে নিয়ে নদীর দৃশ্য দেখাচ্ছিল, দিবাকরের ডাক শুনে ফিরে এলো পাল্কির কাছে। পর্দা সরিয়ে সে ভেতরে ঢুকবার পর বিম্ববতী জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কে কাঁদে রে?

থাকোমণি চুপ করে গেছে কিন্তু দুলালচন্দ্র তখনো কেঁদে চলেছে। বিম্ববতী

সেই কান্না শুনতে পেয়েছেন। কোনো শিশুর কান্না শুনলেই তাঁর বুক কাঁপে। নিজের একটি সন্তান জন্মাবার পর তিনি জগতের সব শিশুর প্রতিই জননী-স্নেহ অনুভব করেন এখন।

চিন্তা দাসী বাইরে উঁকি দিয়ে বললো, এক মাগী মেয়ে কোলে নিয়ে পাতর হয়ে বসে আচে, আর তার কচি ছেলেটা কাঁনচে।

বিম্ববতী জিজ্ঞেস করলেন, কেন?

এর আর কী উত্তর দেবে চিন্তা দাসী! সে ঠোঁট উল্টে বললো, খেতে পায় না বোধহয়।

বিম্ববতীর মুখে একটা পাতলা বেদনার ছায়া পড়লো। এই পৃথিবী এত সুন্দর, তবু এখানে মানুষ এত কষ্ট পায় কেন, কেন লোকে খেতে পায় না? বড়রা তবু না হয় না খেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু শিশুদের অনাহারে রাখা ভারী অন্যায়।

—দিবাকরকে ডাক।

চিন্তা দাসী মুখ বাড়িয়ে দিবাকরকে ডাকতেই সে এসে দাঁড়ালো পাল্কির পাশে। বিম্ববতী প্রত্যক্ষভাবে দিবাকরের সঙ্গে কথা বললেন না, কিন্তু তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, চিন্তে, তুই দিবাকরকে বল, ঐ যে ছেলেটি কাঁদচে, ওকে ওর মাকে আর সঙ্গে যারা আচে, সবাইকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসতে। আমার বেহারাদের যেতে বল, ওরা পরে আসুক।

দিবাকর বললো, যে আজ্ঞে।

বিম্ববতীর পাল্কি চলে গেল, কিন্তু দিবাকর পড়লো মহা বিপদে। রাস্তা থেকে যাকে তাকে তুলে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া এক বাতিক হয়েছে গিন্নীমার।

দিবাকর গিয় উবু হয়ে বসলো থাকোমণির সামনে। তারপর জিজ্ঞেস করলো, অ মেয়ে, ঐ বাচ্ছাটা তো মরে গ্যাচে, ওকে কোলে নিয়ে বসে রোয়্যেচো কেন? কী হয়েছেল?

জুতো সেলাই থেকে ঠিক চন্ডীপাঠ না হলেও দলিল দস্তাবেজ পড়া কাজ দিবাকরের। সে সাতঘাটের জল খেয়েছে। সে নানা রকম কথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে থাকোমণি আর দুলালচন্দ্রের কাছ থেকে ওদের ঘটনাটা জেনে নিল। দুজন পুরুত এবং কয়েকজন স্নানার্থীকে জুটিয়ে এনে সে একথাও থাকোমণিকে বুঝিয়ে দিতে সমর্থ হলো যে তার কোলের শিশুটি সত্যিই মরে গেছে। ওকে আর বেশীক্ষণ এমনভাবে ফেলে রাখলে ওর আত্মার অকল্যাণ হবে।

তখন থাকোমণি আর এক প্রস্থ কান্নাকাটি করলো ও কিছু পরে মেয়েকে জলে বিসর্জন দিয়ে এলো। এবং দিবাকরের দয়ালু বাক্যে বিশ্বাস করে তার সঙ্গে সঙ্গে চললো। অবশ্য একথা থাকোমণির পক্ষে সুদূরতম কল্পনাতেও জানা সম্ভব নয় যে, তার স্বামী ত্রিলোচন দাস যে জমিদার প্রভুর দর্শন মানসে গ্রাম ছেড়ে এই শহরে এসেছিল, এখন সে আর তার ছেলে চলেছে সেই জমিদারেরই বাড়িতে।

জোড়াসাঁকোয় পোঁছে দিবাকর দেখলো সিংহ বাড়ির সদর দেউড়ির কাছে একজন মোটাসোটা মধ্যবয়স্ক সাহেব দাঁড়িয়ে। হাতে একটি বড় লাঠি। দিবাকর চমকে উঠলো। সে বহুদর্শী লোক। সে এই সাহেবটিকে চেনে। ইনি হেয়ার সাহেব।

পাইক দারোয়ানদের চোখ এড়িয়ে কারুর পক্ষে ভিতরে ঢোকা সম্ভব নয়।

অচেনা লোক দেখলে তারা ঘাড় ধাক্কা দেয় কিংবা আগেই কিছু সেলামী আদায় করে। সাহেব দেখে তারা একটু ঘাবড়ে গেছে। সাহেবের কথাও তারা বুঝতে পারছে না কিছুই।

দিবাকর দ্রুত গিয়ে সাহেবের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ফেললো।

হেয়ার সাহেব চমকে উঠে সরে গিয়ে বললেন, আরে, করো কী, করো কী!

—সার, আপনি এখানে?

হেয়ার সাহেব বললেন, ইহা গঙ্গানারায়ণের বাপের কুঠি? আমি তাহাকে চাই।

এদিকে থাকোমণি আর দুলালচন্দ্র এত বড় বাড়ির দেউড়ি দেখে আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ভেতরে ঢুকতে চাইছে না। দিবাকর তাদের দিকে ফিরে বললো, এসো, ভিতরে এসো, ভয় কী? গিন্নীমা তোমাদের আশ্রয় দিতে চেয়েচেন, তারপর আর কী কতা! যাও বাছা, ভেতরে যাও!

থাকোমণি আবার কেঁদে উঠলো, আমাদের সে নেই। ওগো, সে মানুষটা আমাদের কোতায় খুঁজে পাবে?

সাহেবের সামনে একটু বিব্রত হয়ে দিবাকর বললো, হবে, হবে, সব হবে, তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে, ভেতরে এসো, গিন্নীমার সঙ্গে কতা বলো।

হেয়ার সাহেবের সব ব্যাপারেই কৌতূহল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইহারা কাঁদে কেন? কী হইয়াছে?

দিবাকর বললো, হাজব্যান্ড লস্ট সার, গঙ্গার ঘাটে ক্রায়িং ক্রায়িং আর একটা ছোট মেয়ে, মানে ডটার সার, ডাই দিস মর্নিং...ভেরী পুয়োর সার—

বাঁ পায়ের ওপর ডান পা রেখে কেষ্ট ঠাকুরের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে হেয়ার সাহেব সব শুনলেন। তাঁর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগলো। বয়েস হয়েছে, হেয়ার সাহেব আজকাল মানুষের দুঃখ কষ্টের কথা একেবারে সহ্য করতে পারেন না।

দুলালচন্দ্র কান্না থামিয়ে হাঁ করে চেয়ে আছে। তার ক্ষুদ্র জীবনে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত রকম ঘটনার বিপর্যয়ে এক দারুণ আলোড়ন চলছে। সকালবেলা সে একটি রক্তচক্ষু সাহেব দেখেছিল, যার সামনে ডাকিনী যোগিনীরা তার মাকে মারছিল। আর এই একজন সাহেব কাঁদছে।

পকেট থেকে রুমাল বার করে হেয়ার সাহেব চোখ মুছলেন। ধরা গলায় বললেন, তোমরা ইহাদের আশ্রয় দিবে? অন্ন দিবে? ভেরি কাইন্ড—মোস্ট গ্রেসাস...

অন্য পকেট থেকে একটি মুদ্রা বার করে দুলালচন্দ্রের হাতে দিয়ে বললো, লও! কয়েক বৎসর পর একটু লায়েক হইলে আমার নিকট আসিও, আমি তোমাকে স্কুলে ভর্তি করিয়া নিব।

দিবাকর পাইককে বললো, এদের ভেতরে নিয়ে যা। গিন্নীমা এরপর ব্যস্ত হয়ে উঠবেন। আপনি আসুন সার। এদিকে আসুন। দয়া করে এ বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েচেন...

দিবাকর হেয়ার সাহেবকে নিয়ে এলো বৈঠকখানা ঘরে। সেখানে বিধুশেখর এবং রামকমল আলবোলার নল হাতে নিয়ে বিষয়কর্মের আলোচনা করছিলেন। হেয়ারকে দেখে তাঁরা অবাক হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। দিবাকর পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই তিনি হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, আমি ডেভিড হেয়ার। আপনাদের সেবক।

ঢোলা প্যাণ্ট, আর সাদা লম্বা কোট পরা, মাথার চুলগুলি প্রায় সব পেকে গেছে, তাতে চিরুনির ছোঁয়া লাগে না মনে হয়। প্রশস্ত কপালে তিনটি স্পষ্ট ভাঁজ। বয়েস যথেষ্ট হলেও এখনো বেশ বলশালী চেহারা হেয়ার সাহেবের।

হাতের লাঠিখানা দরজার পাশে রেখে তিনি একটি কৌচে বসে পড়ে বললেন, গঙ্গানারায়ণের খোঁজে আসিয়াছি। সে দুই সপ্তাহ কালেজে যায় না। সে কি ভুগিতেছে?

রামকমল বললেন, না তো, গঙ্গা তো সুস্থই আছে।

হেয়ার সাহেব বললেন, তবে সে কালেজে যায় না কেন?

রামকমল পুনরায় বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, কালেজে যায় না? কই জানি না তো!

বিধুশেখর চুপ করে আছেন। তিনি গঙ্গানারায়ণকে কলেজে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর বিরূপতা জানিয়েছিলেন, গঙ্গানারায়ণ যে তা সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিয়েছে, তিনি জানতেন না। তিনি হেয়ার সাহেবকে এত সামনা-সামনি দেখেননি আগে। এঁর কার্যকলাপ তিনি বিশেষ সুনজরে দেখেন না। বলতে গেলে এঁরই প্ররোচনায় ইদানীং ডাক্তারি শেখার নামে অজাত-কুজাতের মড়া কাটছে হিন্দু ঘরের ছেলেরা। আর এদিকে কলেজে চালাচ্ছেন এক বিজাতীয় শিক্ষা, যেখানে ধর্মের কোনো স্থান নেই। ছেলেগুলি দিন দিন দুর্বিনীত আর উগ্র হয়ে উঠছে। এর ফল কখনো শুভ হতে পারে না।

কিন্তু এ সাহেবের মুখের ওপর তিনি সে ধরনের কোনো কথা বলতে পারলেন না। হাজার হোক সাহেবের জাত তো। তিনি বললেন, গঙ্গানারায়ণের বিবাহ হবে শীঘ্রই, তাই বুঝি সে কালেজে যায় না।

হেয়ার সাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আজকাল তাঁর ধৈর্য কমে গেছে। বয়স্ক লোকদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা দেখলে তিনি হঠাৎ মেজাজ গরম করে ফেলেন। এরা দুজন জানেই না যে এদের ছেলে কোন্ দিন কলেজে যায় কিংবা বাড়িতে বসে থাকে।

তিনি মাথা নীচু করে নিজেকে শান্ত করলেন। তারপর একটু হেসে বললেন, গঙ্গার বিবাহ...খুব ভালো কথা...আমাদের মিঠাই দিতে ভুলিবেন না...কিন্তু সে কয়দিন বিবাহ করিবে, দুই সপ্তাহব্যাপী?

রামকমল বললেন, আজ্ঞা, না। বিবাহের এখনো কিছু দেরি আছে।

হেয়ার সাহেব বললেন, তবে কি বিবাহের চিন্তাতেই সে মজিল? এখন হইতেই কলেজে যাওয়া বন্ধ করিল?

রামকমল ব্যস্ত হয়ে বললেন, না, না, কালেজ যাবে না কেন! সে কি কথা! নিশ্চয় যাবে।

বিধুশেখর একটু বিরক্ত হয়ে বন্ধুর দিকে তাকালেন। রামকমলের আগ বাড়িয়ে কথা বলার কী দরকার। সব কথাবার্তা তো তিনিই বলবেন।

রামকমল বললেন, মিঃ হেয়ার, স্যার, আপনি কী খাইবেন? প্রথমে একটু তামাকু সেবন করিবেন?

হেয়ার বললেন, আমি ধূমপান করি না।

—তবে কি একটু মদিরা ইচ্ছা করেন? ব্র্যাণ্ডি, বীয়র, ওয়াইন?

—ধন্যবাদ, আমি মাদক গ্রহণ করি না।

—সে কি স্যার, আপনি ড্রিংক করেন না?

—সুরা ব্যতীত অন্য পানীয় গ্রহণ করি। কিন্তু এখন কোনো কিছুর প্রয়োজন

নাই।

রামকমল সিংহ চমৎকৃত হলেন। জাতিতে সাহেব, অথচ বলে কিনা সুরাপান করে না? কবে শোনা যাবে বাঘ-সিংগী নিরামিষ খায়! ডেভিড হেয়ার সাহেবটি সত্যিই বড় অদ্ভুত!

—তবে সামান্য কিছু মিঠাই?

হেয়ার সাহেব বললেন, একবার গঙ্গার সহিত দেখা হইতে পারে কী?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। বলে রামকমল তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে ভেতর বাড়ির দিকে মুখ করে ডাকলেন, গঙ্গা! গঙ্গা! ওরে, কে কোথায় আচিস, গঙ্গাকে একবার খপর দে!

ফিরে এসে রামকমল বললেন, আপনি এসেচেন বলে আমরা ধন্য হয়িচি। আপনি মহদাশয়, নিঃস্বার্থভাবে এ দেশীয় বালকদের শিক্ষার জন্য যা পরিশ্রম করচেন!

বিধুশেখর ভ্রূ কুঞ্চিত করে এক মনে আলবোলা টেনে যেতে লাগলেন।

হেয়ার সাহেব নিজের প্রশংসা শুনে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। তারপর হাত তুলে রামকমলকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আপনারা দেশের প্রধান ব্যক্তি, আপনাদের সাহায্য ছাড়া কিছুই সম্ভবে না। আপনারা আর একটু যত্ন লউন।

সাহেবদের সাহচর্যে এলেই রামকমল বিগলিত হয়ে যান। তিনি হাত জোড় করে বললেন, আমি তো কালেজ স্থাপনের সময় বড় ডোনেশান দিয়িচি। পুনরায় যদি বলেন...

হেয়ার সাহেব বললেন, সে কথা ঠিক, আপনারা সাহায্য দিতে কার্পণ্য করেন নাই। কিন্তু আরও প্রয়োজন নৈতিক সাহায্যের।

এই সময় লাজুক মুখে গঙ্গানারায়ণ এসে ঢুকলো। হেয়ার সাহেব সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলো, তুমি আমার সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য বাহিরে যাইবে। জেণ্টেলমেন, আমি যদি ইহাকে সঙ্গে লই, আপনাদের আপত্তি আছে কি?

এবারও বিধুশেখর কিছু বলবার আগেই রামকমল বললেন, বিলক্ষণ না! আপনার সঙ্গে যাবে, তা আবার আপত্তি!

হেয়ার সাহেব কড়া গলায় গঙ্গানারায়ণকে বললেন, বিনা খবরে তুমি কলেজ যাওয়া বন্ধ করিলে কেন? চলো, আজ তোমার শাস্তি হইবে—।

সাহেব এসেছে শুনে চিন্তা দাসী নবীনকুমারকে কোলে নিয়ে দেখতে এসেছে। নবীনকুমার হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে এলো, যেন সে হেয়ার সাহেবের কোলে উঠতে চায়।

হেয়ার সাহেব তাকে অমনি কোলে টেনে নিয়ে শিশুর শরীরের গন্ধ শুঁকতে লাগলেন। তারপর খুশী হয়ে বললেন, এ কুঠিতে পরিচ্ছন্নতা আছে বটে! এ কার সন্তান?

রামকমল বললেন, আমার। এ আমার কনিষ্ঠ সন্তান।

হেয়ার সাহেব বললেন, বাঃ, বড় সুন্দর শিশুটি। ইহার খুব বুদ্ধি হইবে।

একটুক্ষণ নবীনকুমারকে আদর করে তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন পিতার কাছে। তারপর গঙ্গানারায়ণের কাঁধে হাত রেখে বললেন, চলো!

সকলে সদর দেউড়ি পর্যন্ত গেল হেয়ার সাহেবের সঙ্গে। তিনি যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন তখন কান্না জুড়ে দিল নবীনকুমার। সেও যেন হেয়ার সাহেবের সঙ্গে যেতে চায়।

হেয়ার সাহেব আবার ফিরে এসে নবীনকুমারের গাল টিপে দিয়ে বললেন, আবার আসিবো। আমি ঘোড়া হইলে তুমি আমার পিঠে চাড়তে পারিবে কি?

নবীনকুমার হেয়ার সাহেবের স্কন্ধ শক্ত করে চেপে ধরলো। এই শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিটিকে তার খুব পছন্দ হয়েছে।

হেয়ার সাহেব নবীনকুমারকে দু' হাতে তুলে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে আবার লুফে নিলেন সঙ্গে সঙ্গে। নবীনকুমার বেশ মজা পেয়ে হাসতে লাগলো। হেয়ার সাহেব বললেন, বাঃ, ভয় পায় না। আমি বলিতেছি, পরে মিলাইয়া দেখিবেন, এই সুশ্রী বালকটি কালে কালে অসাধারণ হইবে!



হেয়ার সাহেব শাস্তি দেবেন শুনে গঙ্গানারায়ণ তেমন ভয় পায়নি। ওঁর কাছ থেকে শাস্তি পাওয়া একটা মজার অভিজ্ঞতা। পিঠে দু' চার ঘা পড়ে বটে কিন্তু তারপর হেয়ার সাহেব নিজেই এমন ব্যাকুল হয়ে পড়েন যে তখন তাঁকেই সামলাবার জন্য বলতে হয়, না মহাশয়, অতি অল্পের ওপর হয়েছে, বিশেষ বেদনা বোধ নাই।

কিন্তু গঙ্গানারায়ণ বিস্মিত হয়েছে বেশী। এই সকালবেলা যে হেয়ার সাহেব স্বয়ং তাদের বাড়িতে উপস্থিত হবেন, সে ভাবতেই পারেনি। কলেজের বালকরা কেউ দু' চারদিন অনুপস্থিত হলে বা কেউ অসুস্থ হলে হেয়ার সাহেব খোঁজ-খবর নিতে গেছেন বা নিজের হাতে সেবা করেছেন, একথা গঙ্গানারায়ণ শুনেছে বটে। তবে হালে হেয়ার সাহেব ছোট আদালতের কমিশনার নিযুক্ত হওয়ায় কলেজে আগেকার মতন অত বেশী সময় দিতে পারছিলেন না। বহুদিন ধরে ডেভিড হেয়ার নিঃস্বার্থভাবে শিক্ষার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। নিজের ব্যবসাপত্র তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন। এক সময় বহু ধন উপার্জন করেছিলেন বটে কিন্তু এত বৎসরে তা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই তিনি কোনোদিন কোনো বেতন গ্রহণ করেননি, বরং নিজ অর্থ ব্যয় করেছেন। মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পর সেক্রেটারি হিসেবে তাঁর মোটা বেতন নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, সে অর্থও দান করে দিয়েছেন তিনি।

সরাসরি হেয়ারকে কিছুতেই আর্থিক সাহায্য করা যাবে না বুঝেই সরকার সুকৌশলে তাঁকে আদালতকর্মে নিযুক্ত করেছেন। সেইজন্য ইদানীং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁকে স্কুল পাড়াতে দেখা যেত না। আবার বুঝি তিনি নবোদ্যমে উঠে-পড়ে লেগেছেন।

এক হাত গঙ্গানারায়ণের কাঁধে রেখে অন্য হাতে মোটা ছড়িটা ঠকঠকিয়ে হাঁটতে লাগলেন হেয়ার সাহেব। খানিক দূরে গিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতার সহিত যে দ্বিতীয় ব্যক্তি বসিয়াছিলেন, তিনি কে?

গঙ্গানারায়ণ বললো, উনি আমার খুড়া। আমার পিতার বাল্য সুহৃদ্।

—হুঁ। তুমি ফ্রান্সিস বেকনের প্রতিমূর্তি কখনো দেখিয়াছ কি?

গঙ্গানারায়ণ দুদিকে মাথা নেড়ে জানালো যে সে দেখেনি।

হেয়ার আবার বললেন, দেখিলে বুঝিতে, ঐ লোকটির সহিত ফ্রান্সিস বেকনের মুখের আশ্চর্য সাদৃশ্য রহিয়াছে। একই রকমের চোখ। আমি প্রায়শই অবাক হইয়া দেখি যে অনেক এ-দেশীয় ব্যক্তির সহিত অনেক উওরোপীয়ের

মুখাকৃতির খুব মিল থাকে। শুধু গাত্রবর্ণের তফাৎ।

ফ্রান্সিস বেকনের নাম শেক্সপীয়ার পাঠের সময় দু-একবার শুনেছে মাত্র গঙ্গানারায়ণ। বিশেষ কিছু জানে না। হঠাৎ সেই সাহেবের সঙ্গে বিধুশেখরের কেন মিল খুঁজে পেলেন হেয়ার সাহেব, তা সে বুঝলো না।

খানিক পথ গিয়ে হেয়ার সাহেব আবার থমকে দাঁড়ালেন। সস্নেহে প্রশ্ন করলেন, তোমার ক্ষুধা লাগে নাই তো? উপবাস-ভঙ্গ করিয়াছিলে?

গঙ্গানারায়ণ বললো, হাঁ, মহাশয়।

—সত্য বলো। ভয় নাই, আমার গৃহে খাওয়াইয়া তোমার জাত মারিব না। কোনো মিঠাইওয়ালার দোকানে ভোজন সারিয়া লইতে পারো।

গঙ্গানারায়ণ দৃঢ়ভাবে জানালো যে তার কোনো প্রয়োজন নেই। সে সত্যিই খেয়ে এসেছে। আসলে যদিও সে কিছুই খায়নি। খাবার দেওয়া হয়েছিল, হেয়ার সাহেবের আগমন বার্তা শুনে তাড়াতাড়ি উঠে এসেছে, খাওয়ার সময় পায়নি।

হেয়ার তবু দাঁড়ালেন না। আবার জিজ্ঞেস করলেন, তবে বলো, কোন্ কোন্ দ্রব্য ভক্ষণ করিয়াছ?

গঙ্গানারায়ণ বললো, দুধ।

—শুধু দুধ? ব্যাস, আর কিছু নহে?

—আম, কলা, সন্দেশ।

—উত্তম। তবে এত ধীরে ধীরে হাঁটিতেছ কেন? আমার সহিত দ্রুত পা মিলাও।

হেয়ার সাহেব হাঁটেন রীতিমতন ধুপধাপ শব্দ করে। বয়েস যথেষ্ট হয়েছে, এখনো পদব্রজে বেশ দড়। ওঁর হাবভাব দেখলে যেন ঠিক ধোপদুরস্ত সাহেব মনে হয় না, মনে হয় যেন কোনো বৃহৎ পরিবারের আপনভোলা বড় মামা।

—তোমাদের সহপাঠী ভোলানাথ সরকারের কুঠী কোথায় তুমি জানো?

—হাঁ, জানি।

—বাহির সিমলার জগমোহন সরকারের কুঠী কি?

—জগমোহন সরকার ভোলানাথের জ্যাঠা। পাশাপাশি দুই পৃথক বাড়ি।

—চলো, সেখানে যাইব। ভোলানাথের কোনো সংবাদ জানো? জানো না। শুনিয়াছি সে গুরুতর পীড়ায় পড়িয়াছে। তোমাদের কোনো সহপাঠী বাঁচিল কি মরিল, সে সংবাদও তোমরা রাখো না। আজ সারাদিন তুমি ভোলানাথের সেবা করিবে, এই তোমার শাস্তি।

গঙ্গানারায়ণের শরীরে দারুণ একটা সুখানুভূতি হলো। এই রকম কোনো মানুষের সংস্পর্শে এলেই মন উন্নত হয়ে যায়। হেয়ার সাহেব সর্বক্ষণ পরের জন্য চিন্তা করেন, নিজের কথা কিছুই ভাবেন না। সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য হয়েও মানুষ যে কত আনন্দে থাকতে পারে, ইনি তার অবিশ্বাস্য উদাহরণ।

হেয়ার সাহেব বললেন, জগমোহন সরকারের সহিত আমার প্রয়োজনীয় কথা আছে। স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে উহার সাহায্য পাইব মনে হয়। সুতরাং ভোলানাথের নিকট আমি বেশীক্ষণ থাকিতে পারিব না। তুমি থাকিবে।

গঙ্গানারায়ণ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলো, মহাশয় কি এবার স্ত্রীলোকদের জন্য বিদ্যালয় খুলচেন?

হেয়ার সাহেব কৃত্রিম ধমক দিয়ে বললেন, কেন, তোমার আপত্তি আছে বুঝি?

—আপত্তি দূরে থাক, আহ্লাদ করবো। কিন্তু এ-ও কি সম্ভব?

—কেন সম্ভব নয়। তোমরা সাহায্য করিলেই সম্ভব। ফিমেল সোসাইটি স্থাপন করিয়া এক সময় বালিকাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা শুরু হইয়াছিল। কিন্তু অর্থাভাবে আর বড়মানুষদের আগ্রহের অভাবে তাহা বেশীদিন চলে নাই। তোমরা বালিকা-স্ত্রীলোকদের অন্ধকারে রাখিয়া দিতে চাও?

—আমি চাই না!

—জগমোহন সরকার উদ্যোগী হইয়াছেন। লোকটি অতি সদাশয়। উহার সাহায্যে শীঘ্রই একটি বালিকাদিগের স্কুল স্থাপন করিব। আমি যদি আর দশ বৎসর বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে এ-দেশে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ঘটাইয়া যাইব নিশ্চয়।

গঙ্গানারায়ণের অমনি বিন্দুবাসিনীর কথা মনে পড়লো। পড়াশুনো করার কী তীব্র সাধ ছিল বিন্দুর। সে জিজ্ঞেস করলো, এইস্থলে কি বিধবা স্ত্রীলোকরাও পাঠ নিতে আসবে?

হেয়ার সাহেব মাথা নীচু করে প্রশ্ন করলেন, কী কহিলে, আবার কহো তো?

গঙ্গানারায়ণ তার কথার পুনরাবৃত্তি করলো। হেয়ার সাহেবের মুখখানা বিষণ্ণ হয়ে গেছে। তিনি অভিমানের সঙ্গে বললেন, এ কথা কহিতে তোমার শরম বোধ হইল না? আমি স্কুল খুলিলেই কি তোমরা বিধবা বালিকাদের সেথা পাঠাইবে? তাহারা সূর্যালোক দেখে না, তাহাদের বিদ্যার আলোক দেখাইবে কে?

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, শোনো গঙ্গা, আমি হিন্দু নই, কিন্তু হিন্দুজাতির বিধবা বালাদের কথা মনে আসিলেই আমার চক্ষে জল আসে। স্ত্রী জাতি মাতৃজাতি, তবু তাহাদের এত কষ্ট দেওয়া কি মানুষের উচিত কাজ হয়?

গঙ্গানারায়ণ অধোবদন হয়ে রইলো।

হেয়ার সাহেব তার পিঠ চাপড়ে বললেন, বিদ্যাশিক্ষা করিতেছ, যদি পারো তো দেশবাসীকে বুঝাইয়ো। মাতৃজাতির দুঃখ দূর করিবার জন্য কিছু যত্ন করিয়ো! ও কাজ আমি পারিব না। তোমাদিগেরই কাহাকেও উদ্যোগ লইতে হইবে।

খানিকটা পথ আবার দুজনে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলো। মাঝে মাঝেই পথ চলতি কেউ কেউ হেয়ার সাহেবকে দেখে অভিবাদন জানাচ্ছে। প্রায় কুড়ি বাইশ বছর ধরে বহু ছাত্র হেয়ার সাহেবের অধীনে থেকে পড়াশুনো করে গেছে। শহরে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে হেয়ার সাহেবকে চেনে না। হেয়ার সাহেব কারুর সঙ্গেই দুটো একটার বেশী কথা বলছেন না। আজ যেন হেয়ার সাহেবকে একটু আলাদা রকম মনে হচ্ছে গঙ্গানারায়ণের। মুখে কেমন যেন একটা উদাসীন ভাব। রঙ্গপ্রবণ লঘু মেজাজটি একেবারেই নেই।

মে মাসের শেষের দিক। সকালবেলাতেই রোদ উঠেছে চড়চড়িয়ে। রোদের আঁচে হেয়ার সাহেবের মুখখানা লাল হয়ে গেছে, ঘামে ভিজে গেছে পিঠ তবু হেয়ার সাহেবের কোনো হুঁশ নেই।

প্রথমেই জগমোহন সরকারের বাড়ি পড়লো। জগমোহন আর বিরাজমোহন দুই ভাই। এঁদের মধ্যে জগমোহনই বেশী অর্থ ও খ্যাতি অর্জন করেছেন। পৈতৃক সম্পত্তি বিশেষ পাননি কিন্তু ভাগ্য খুলে গেছে আমদানি রপ্তানির ব্যবসা খুলে। সরকার, আঢ্য অ্যান্ড কোং এ শহরের নামকরা প্রতিষ্ঠান। শুধু অর্থ জুটলেই কৌলীন্য জোটে না। শেরবোর্ণ সাহেবের ইস্কুলে কিছুদিন পড়ে ইংরেজি ভাষাটা মোটামুটি রপ্ত করে নিয়েছেন জগমোহন। যুবা বয়েসে কিছুদিনের জন্য

খৃস্টান হবার দিকে ঝুঁকেছিলেন, সেই খবর পেয়ে তাঁর মাতাঠাকুরানী বিষের পাত্র নিজের ওষ্ঠের সামনে ধরে বলেছিলেন, আর এক বার বল ও কথা! বল! তুই জাত খোয়াবি, আর আমি বেঁচে থাকবো?

এখন ওসব চুকেবুকে গেছে, জগমোহন মহা ধুমধাম করে বাড়িতে প্রতি বৎসর দোল দুর্গোৎসব লাগান, পাবলিক কাজে দান করেন মুক্ত হস্তে, দু-দশজন মোসাহেব প্রতিপালন করছেন, সভায় রামগোপাল ঘোষের পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেন এবং মাঝে মাঝে ইংরেজি কাগজে কৃষকদের দুরবস্থা অথবা স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে জ্বালাময়ী আর্টিকেল লেখেন। শহরের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে তাঁর এখন বেশ নাম ছড়িয়েছে।

জগমোহন সপারিষদ বসেছিলেন বৈঠকখানা ঘরে। তার ঠিক ডান পাশেই বসে আছে একজন দীর্ঘকায়, শীর্ণ, খড়গনাশা মানুষ। এ আমাদের পূর্ব পরিচিত রাইমোহন। সুকৌশলে সে এ গৃহে নিজের স্থান করে নিয়েছে। জগমোহন বহু ব্যাপারে তার ওপরে নির্ভর করেন।

হেয়ার সাহেব আগে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দ্বারের কাছে হেয়ার সাহেবকে দেখে জগমোহন বিশালবপু নিয়ে প্রায় ছুটে এলেন সেদিকে। দু' হাত বাড়িয়ে বললেন, কী সৌভাগ্য! কী সৌভাগ্য! আপনি এশ্চেন! মহামতি হেয়ার আজ আমার বাড়িতে! আজই আপনার কথা স্মরণ কচ্চিলুম। আগামী মাস থেকেই আমি বালিকা বিদ্যালয় খুলে ফেলচি। আমারই এ বাড়িতে। শোভাবাজারের রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রচুর উৎসাহ দিয়েচেন...সব বলচি আস্তে আস্তে, মহাশয় বসুন, বসতে আজ্ঞা হোক।

হেয়ার সাহেব বসলেন না, গঙ্গানারায়ণের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেই বললেন, খুবই সুসংবাদ। আমার যথাসাধ্য সাহায্য করিব। আপনারই গৃহে স্কুল, কিন্তু শিক্ষিকা কোথায় পাইবেন?

জগমোহন বললেন, লন্ডনের ব্রিটিশ অ্যান্ড ফরেন স্কুল সোসাইটিতে পত্র পাটিয়িচি, দ্বারকানাথবাবু ওঁদের সঙ্গে নিজে কথা কইবেন, একজন লেডি টিচার পাওয়া যাবে মনে হয়। খরচ-খর্চা আমি দোবো। এ-দেশের মেয়ে শিক্ষিকা আর পাবো কোতায়। প্রথম দু-চার মাস বুড়ো বুড়ো পন্ডিতদের দিয়ে কাজ চালিয়ে নোবো...নাম দিইচি ফিমেল পাঠশালা।—

হেয়ার সাহেব বললেন, আগে আর একটি কথা জানিয়া লই! সে পাঠশালে ফিমেলরা আসিবে তো? পূর্বে দেখিয়াছি, ছাত্রী জোটানোই ভার।

—আলবাৎ আসবে!

—আপনার নিজ পরিবারের কন্যারা যাইবে আশা করি।

—হায় হায়! আমার তো কোনো কন্যা সন্তানই নেই। থাকলে নিশ্চয়ই যেত। আমি এ পল্লীর প্রতি বাড়ি বাড়ি ঘুরে গিন্নীদের উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে বলিচি, মা জননীরা, দেশ আজ জেগেচে, অজ্ঞানের অন্ধকার দূর হয়ে জ্ঞানের ঊষালোক প্রস্ফুটিত হচ্চে, আর দ্বিধা করবেন না, আমাদিগের কন্যাসমা, ভগ্নীসমা বালিকাদের জন্য জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করুন। মুশকিল কি জানেন, হেয়ার সাহেব, এখনো অনেক লোকের ধারণা, সেই অনেকের মধ্যে অনেক আচ্ছা আচ্ছা বড়মানুষ, শিক্ষিত লোক রয়েচে, যারা মনে করে, নেকাপড়া শিখুলে মেয়ে-সন্তানরা বিধবা হয়! বুঝুন! হাউ ইগনোরেন্ট!

—আর বিধবারা লেখাপড়া শিখিলে তাহাদের কী হয়? তাহারা তো দ্বিতীয় বার বিধবা হইতে পারিবে না! এই যুবকটি প্রশ্ন করিতেছিল যে বিধবারা লেখাপড়া

শিখিতে পারিবে কি না।

—বিধবাদের লেখাপড়া শিখিয়ে লাভ কী হবে? এই ছেলেটি...ইটি কে?

গঙ্গানারায়ণ বললো, আমি ভোলানাথের সহপাঠী। আমার নাম গঙ্গানারায়ণ সিংহ। পিতার নাম রামকমল সিংহ।

রামকমল সিংহের নাম শুনে জগমোহনের ভ্রূদ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত হলো। রামকমল সিংহ জগমোহনের তুলনায় আরও তিন চার ধাপ উঁচু তলার বড় মানুষ। সেজন্য জগমোহনের খানিকটা ঈর্ষাবোধ আছে।

তিনি শুকনো গলায় বললেন, অ। তারপর হেয়ার সাহেবের মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলে বললেন, ওসব ব্যাগড়ার কথা কানে তুলবেন না। বিধবাদের শিক্ষার কথা উচ্চারণ করাও পাপ। বিধবারা আমাদের সংসার পবিত্র করে। ওদের সংযম, ওদের সহনশীলতা কত মহান। এতখানি আত্মকৃছ্ কৃছ্ কৃছ্ কৃস, ইয়ে কৃচ্ছ্রতা শুধু হিন্দু রমণীতেই সম্ভব। বিধবারা আছে বলেই আমাদের ধর্ম টিঁকে আছে।

রাইমোহন বকের মতন গলা উঁচিয়ে বললো, ঠিক কতা! লাক কতার এক কতা।

জগমোহন আবার বললেন, রাজা রাধাকান্ত দেব স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে বই লিখে প্রমাণ করেচেন যে প্রাচীনকালে বড় ঘরের হিন্দু মেয়েদের মধ্যেও শিক্ষার চলন ছেল। মোছলমান আমলেই আমরা মেয়েছেলেদের ঘরে সেঁদিয়ে রেখিচি। বুঝলেন সার, তৈমুর লং ভারত আক্রমণ করবার পরই আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা অন্ধকারে ডুবে গ্যাচে। আবার আমরা মেয়েছেলেদের ঘরের বার করবো, তবে ধীরে ধীরে।

রাইমোহন বললো, রাজাবাহাদুর বেধবাদের নেকাপড়া শেকাবার কতা কিছু বলেননি!

জগমোহন গঙ্গানারায়ণের দিকে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, ও সব কথা তুললে সর্ব কাজ ভণ্ডুল হয়ে যাবে। বুঝলেন, মিঃ হেয়ার, এমনিতেই পাঁচরকম কথা উঠবে। লোকে বলবে আমরা বুঝি ঘরের মেয়েদের মেম বানাবার হুজুগে মেতিচি। লোকে তো সু দ্যাকে না, কু-টাই বড় করে দ্যাকে, কেউ হয়তো আমাদের চরিত্রে কটাক্ষ করবে।

রাইমোহন জিভ কেটে বললো, না মশায়, ও কতা বলবেন না। আর যার সম্পর্কে যাই বলুক, আপনার মতন দেবতুল্য মানুষের চরিত্র তুলে কতা বললে ধর্মে সইবে না।

জগমোহন উদারভাবে বললেন, সবাই কি সব বোঝে।

হেয়ার সাহেব বললেন, আপনারা বিজ্ঞ, আপনারাই ভালো বুঝিবেন। বিধবাদের প্রয়োজন নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকাদের লইয়াই কার্য শুরু হোক।

জগমোহন বললেন, বসুন মিঃ হেয়ার। অনেক কতা আচে। পুরুষেরা যেসব কেতাব পড়ে, বালিকারাও কি সেই একই কেতাব পড়বে? আমার তো মনে হয়, বালিকাদের জন্য নীতিশিক্ষার পৃথক পাঠ্যবই লেকানো দরকার। স্কুল বুক সোসাইটি কি এ কাজে সাহায্য করবে?

হেয়ার সাহেব বললেন, আমি আলোচনা করিব। পরে আসিয়া আপনার সহিত কথা কহিব, আগে ভোলানাথকে দেখিয়া আসি। তার কোন্ ব্যাধি হইয়াছে?

জগমোহন বললেন, ভোলানাথ? ও বাড়ির ভোলা? দুদিন ধরে তার অনেকবার

দাস্ত পায়খানা হচ্চে শুনিচি।

জগমোহন বিষয়টিতে কোনো গুরুত্বই দিলেন না। তিনি অনেক বৃহৎ বৃহৎ সমস্যা নিয়ে চিন্তিত, ভাইপো ভাগ্নেদের সামান্য অসুখের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই তাঁর।

হেয়ার সাহেব বেরিয়ে এলেন গঙ্গানারায়ণকে নিয়ে। গঙ্গানারায়ণ মনে মনে বললো, বিন্দু তোর ভাগ্য খারাপ। এ জীবনে তুই আর কিছু পাবি না। পরজন্মে যেন বিধবা না হোস।

হেয়ার সাহেব যেন ঠিক তার মনের কথাটাই পড়ে ফেলে মুখ ঝুঁকিয়ে গঙ্গানারায়ণের কানে কানে বললেন, প্রিয় বৎস, দেখিয়া লইয়ো, ক্রমে ক্রমে বিধবা বালারাও বিদ্যালয়ে আসিবে। যদি আমি আর দশ বৎসর বাঁচি, তবে সকল শ্রেণীর বালিকাদের জন্যই শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া যাইব। এই আমার শেষ ইচ্ছা।

কথাটা শুনে গঙ্গানারায়ণের শরীরে খানিকটা রোমাঞ্চ হলেও সে তেমন খুশী হতে পারলো না। দশ বছর পর বিন্দুবাসিনীর কি আর পড়াশুনো করার আগ্রহ থাকবে? অত বেশী বয়েসে সে স্কুলে যাবেই বা কী করে!

পাশের গৃহটির দ্বার খোলা, বৈঠকখানাটি খাঁ-খাঁ করছে। গঙ্গানারায়ণ প্রথমে একলা ভেতরে ঢুকে ভোলানাথের নাম ধরে ডাকাডাকি করতে লাগলো। অচিরেই ভোলানাথের বাবা বিরাজমোহন নেমে এসে ওঁদের দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন, হেয়ার সাহেবের হাত জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, সাহেব, আপুনি এয়েচেন। কিন্তু ভোলা বুঝি বাঁচে না।

ভোলানাথ চলৎশক্তিহীন হয়ে দ্বিতলের এক কক্ষে শুয়ে আছে শুনে হেয়ার সাহেব বললেন, আমি কি উহাকে উপরে যাইয়া দেখিতে পারি?

হেয়ার সাহেবকে শুধু যে ওপরে নিয়ে যাওয়া হলো তাই না, ভোলানাথের মা ও পিসী উপস্থিত রইলেন সেখানে, হেয়ার সাহেব যেন এ গৃহের একজন পরমাত্মীয়।

ভোলানাথ একখানি পালঙ্কে দু হাত ছড়িয়ে শুয়ে আছে। মুখখানি দারুণ বিবর্ণ। চোখ বোজা। বিরাজমোহন তার মাথার কাছে গিয়ে বললেন, বাবা ভোলা, দ্যাকো, কে এয়েচেন! দ্যাকো! একবারটি চোখ ম্যালো—

ভোলানাথ অতিকষ্টে চোখ মেললো। চিনতে পারলো কি না বোঝা গেল না, কিন্তু কিছু একটা কথা বলতে গিয়েই ওয়াক তুলে বমি করলো। সেই বমি খানিকটা পড়লো বিছানায়, খানিকটা মেঝেতে।

হেয়ার সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, কলেরা! শহরে সর্বত্র কলেরার মহামারি শুরু হইয়াছে। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে এমন হয়। বৃষ্টি না নামিলে কমিবে না।

তারপর তিনি বিরাজমোহনের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি একটি সম্মার্জনী ও একপাত্র জল চাই। সত্বর আনিয়া দিবেন কি?

গঙ্গানারায়ণকে তিনি নিম্নস্বরে বললেন, তোমাদিগের হিন্দুদিগের গৃহগুলি বড় অপরিচ্ছন্ন। রোগীর কক্ষ সর্বদা উত্তমরূপে পরিষ্কার রাখা কর্তব্য। তোমরা ইহা পালন করো না বলিয়াই রোগ বেশী ছড়ায়।

জল ও ঝাঁটা এসে পোঁছোনো মাত্র হেয়ার সাহেব নিজে সেই বমি পরিষ্কারে প্রবৃত্ত হলেন। অমনি হা-হা করে উঠলো বাড়ির লোক। বিরাজমোহন সাহেবের হাত থেকে ঝাঁটা কেড়ে নিতে এলো। হেয়ার সাহেব কিছুই শুনলেন না। কাজ শেষ করে বললেন, আমি এই ছাত্রটিকে রাখিয়া যাইতেছি। ভোলা বমন করিবামাত্র সে পরিষ্কার করিবে। আমি উহাকে এই দায়িত্ব দিয়াছি। এবার এক খণ্ড পরিষ্কার

বস্ত্র চাই—

দ্বারের কাছে দাঁড়িয়েছিল আট ন' বছরের এক বালিকা। সে তার শাড়ির আঁচলটা ফ্যাঁস করে ছিঁড়ে ফেলে সেই টুকরোটা এগিয়ে দিল সাহেবের দিকে। মেয়েটিকে চিনতে পারলো গঙ্গানারায়ণ। মাত্র মাস ছয়েক আগেই সে এ-বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়ে গেছে। এই মেয়েটি ভোলানাথের স্ত্রী মানকুমারী। ভোলানাথের অসুখের জন্যই নিশ্চয়ই তাকে আনানো হয়েছে পিতৃগৃহ থেকে।

হেয়ার সাহেব সেই বস্ত্রখণ্ড জলে ভিজিয়ে ভোলানাথের মুখখানা ভালো করে মুছে দিতে দিতে মৃদু স্বরে বলতে লাগলেন, ভোলা, মনে জোর আনো, তোমাকে বাঁচিতেই হইবে, ভোলা, জীবন বড় সুন্দর, ইহা ছাড়িয়া যাইতে নাই। না ভোলা, আমরা তোমাকে রাখিব।

ভোলানাথ চোখ বুজেই রইলো। অসহ্য যন্ত্রণায় তার শরীর কুঁকড়ে উঠছে, কিন্তু সে কোনো শব্দ করছে না। তার চোখের দু' পাশে বিন্দু বিন্দু জল।

হেয়ার সাহেব ভোলানাথের চিকিৎসার বিষয়ে কিছু খোঁজখবর নিলেন। বড় বড় কবিরাজরা ভোলানাথকে দেখে প্রায় জবাব দিয়ে গেছে। হেয়ার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, মেডিক্যাল কালেজের ছাত্রদের চিকিৎসার উপর আপনাদিগের ভরসা আছে কি?

ভোলানাথের মা বললেন, সাহেব, আপনি যা বলবেন, আমরা তাই শুনবো।

হেয়ার সাহেব বললেন, তবে আমি পত্র দিতেছি, শীঘ্র কাহাকেও তথায় প্রেরণ করুন।

হেয়ার সাহেব আর সেখানে বেশীক্ষণ রইলেন না। যাবার সময় গঙ্গানারায়ণকে বলে গেলেন, আগামীকল্য কালেজে তুমি আমাকে ভোলার সংবাদ দিও।

হেয়ার সাহেব দ্বারের কাছে যেতেই মানকুমারী হঠাৎ আর্তস্বরে কেঁদে উঠলো। সকলেই থমকে গেল এক মুহূর্ত। হেয়ার সাহেব মুখ ফেরালেন, তাঁর দু' চোখে জল, খুব সম্ভবত ভোলার সম্পর্কে তিনি নিজেও খুব আশা পোষণ করেন না। ধরাগলায় তিনি বললেন, মন দুর্বল করিও না, মা। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

তারপর তিনি দ্রুত বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

কিন্তু পরদিন গঙ্গানারায়ণ কোনো সংবাদ দেবার আগে নিজেই এক সাঙ্ঘাতিক সংবাদ শুনলো।

গঙ্গানারায়ণ সেদিন ভোলানাথের সেবার জন্য বেশীক্ষণ থাকতে পারেনি। বিরাজমোহন খানিকবাদে প্রায় জোরাজুরি করেই তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। গঙ্গানারায়ণ যে বড়মানুষের ছেলে তা তিনি জানেন, সংক্রামক রোগীর পাশে বসে থেকে যদি সেও অসুখ বাধিয়ে বসে তাহলে বড় লজ্জার ব্যাপার হবে। গঙ্গানারায়ণ যেতে চায়নি, কিন্তু ভোলানাথের মা পর্যন্ত বললেন, এবার তুমি বাড়ি যাও বাবা। আমরা তো রয়িচিই, তোমার জননী আবার তোমার জন্য চিন্তে করবেন। আবার না হয় কাল এসো।

পরদিন সকালে বঙ্কু গঙ্গানারায়ণের বাড়িতে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, মহা সর্বনাশ হয়েচে। শিগগির চ।

গঙ্গানারায়ণ শিউরে উঠে জিজ্ঞেস করলো, ভোলা কি...

বঙ্কু বললো, ভোলার খবর জানি না। হেয়ার সাহেব মারা গেছেন।

একটুক্ষণ থমকে থেকে তারপর দুই বন্ধুই কেঁদে উঠলো ডুকরে।

দুই নবীন যুবকের মুখে আহত বিস্ময়। এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত শোকের

মর্ম তারা যেন ঠিক বুঝতে পারছে না। শুধু চক্ষু দিয়ে অবিরাম জল পড়ছে। গঙ্গানারায়ণের মুখখানি বিবর্ণ, রক্তহীন হয়ে গেছে।

হেয়ার সাহেব থাকতেন লালবাজারের বাঁদিকে গ্রে সাহেবের বাড়িতে। পাল্কি ডাকার সময় হলো না, দুজনে ছুটতে লাগলো সেদিকে। ততক্ষণে শহরের বহু লোকই ছুটছে খবর শুনে। গঙ্গানারায়ণের কাছে খবরটা এত আকস্মিক যে কিছুতেই যেন সে বিশ্বাস করতে পারছে না। কাল যে মানুষটি তাদের বাড়িতে এসেছিল, এতক্ষণ যার সঙ্গে সে ছিল...

গ্রে সাহেবের ভবনের সম্মুখভাগ লোকে লোকারণ্য। কোনো বৃটিশ ব্যক্তির বাড়ির সামনে এর আগে এত দেশীয় মানুষ জড়ো হয়নি। বস্তুত, এ শহরের আর কোনো ঘটনাতেই বুঝি একসঙ্গে এত মানুষের সমাবেশ হয়নি কখনো।

হিন্দু স্কুলের বর্তমান, প্রাক্তন কোনো ছাত্রই বাদ যায়নি। এসেছেন ডিরোজিও'র শিষ্যরা। সম্ভ্রান্ত, বুনিয়াদী ঘরের ব্যক্তিরাও আসছেন এক এক করে। গঙ্গানারায়ণের বন্ধুরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে গোল হয়ে। এমনকি যে মধুর ঘুম ভাঙে বেশ বেলায়, সে-ও হাজির হয়েছে আজ। মধু মুখে অনেক লম্বা চওড়া কথা বলে, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের সম্পর্কে অশ্রদ্ধেয় উক্তি করতে ভালোবাসে। কিন্তু আসলে তার মনটি বড় নরম। সে-ও মুখ লুকিয়ে কাঁদছে ফুলে ফুলে। যারা দেরিতে এসেছে, তারা বারবার শুনতে চাইছে সব খবর। কীভাবে হেয়ার সাহেবের মৃত্যু হলো, সে কথা শতবার বলাবলি করে বা শুনেও আশ মিটছে না।

রাত একটায় ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ হেয়ার সাহেব বমি করতে শুরু করলেন। পেটে অসহ্য ব্যথা। তবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তিনি স্থিরভাবে রইলেন। তাঁর সর্দার বেহারাকে ডেকে তুলে তিনি বললেন, বাপু একবার গ্রে সাহেবের নিকট যাও তো! তাঁহাকে গিয়া বলো, আমার জন্য একটি শবাধার তৈয়ার করাইয়া নিয়া আসিতে। সে কথা শুনে বেহারা বাইরে গিয়ে তারস্বরে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো।

সেই চেঁচামেচিতে জেগে উঠলো আরো অনেকে। ছুটে এলেন গ্রে সাহেব। সেই গভীর রাত্রেই চিকিৎসকের জন্য পাল্কি পাঠানো হলো। তাঁর প্রিয় ছাত্র মেডিক্যাল কলেজের সাব-অ্যাসিসট্যাণ্ট সার্জন প্রসন্ন মিত্তির রাত জেগে বসে রইলো পাশে। পেটের বেদনা প্রশমনের জন্য সে ব্লিস্টার লাগাচ্ছিল, এক সময় হেয়ার সাহেব বললেন, প্রসন্ন, প্রিয় বৎস, ঐ বেলেস্তরা সরাইয়া লও। এবার আমি শান্তিতে মরি।

ভোরের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন।

জুড়ি গাড়ি, ল্যাণ্ডো, ফিটনে ভরে গেল পল্লী। আকাশে গুম গুম করে গজরাচ্ছে মেঘ। বাতাসের বেগ ক্রমেই প্রবল হচ্ছে। রেভারেণ্ড চার্লস আয়ার এসে পৌঁছবার পর শুরু হলো শবযাত্রা। অমনি সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো প্রবল ঝড় আর বৃষ্টি। কিন্তু মিছিল ছত্রভঙ্গ হলো না। একজনও কেউ বৃষ্টির ভয়ে শবানুগমন বন্ধ করলো না। নিঃশব্দে নতমস্তকে সবাই চললো গোলদীঘির দিকে। সাহেবদের জন্য নির্দিষ্ট বেরিয়াল গ্রাউণ্ডে নয়। ডেভিড হেয়ারের সমাধি হবে তাঁর স্বপ্নজগত হিন্দু কলেজের কাছেই। তাঁর শেষকৃত্যের ব্যয় বহন করবে জনসাধারণ।

গঙ্গানারায়ণের মনে পড়ছে অনেক কথা। বিশেষত গতকালের কথা। হেয়ার সাহেব বলেছিলেন, বৃষ্টি নামলে কলেরার প্রকোপ কমবে। উনি নিজে এ বৎসরের কলেরার শেষ শিকার হয়ে বৃষ্টি নামিয়ে দিয়ে গেলেন।

রাস্তায় জল জমে গেছে। সেই জল ঠেলে যেতে যেতে গঙ্গানারায়ণের কানে অনবরত একটা কথা বাজতে লাগলো। হেয়ার সাহেব কাল অন্তত দু বার তাকে বলেছিলেন, যদি আর দশ বছর বাঁচি, যদি আর দশ বছর বাঁচি...। উনি বাঁচতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন, জীবনটা কী সুন্দর, আরও অনেক কাজ করতে চেয়েছিলেন...

গঙ্গানারায়ণের চোখ থেকে টপ টপ করে জলের ফোঁটা মিশে যেতে লাগলো বৃষ্টির জলে।



সন্ধ্যের মুখে আবার একদিন গুপী স্যাকরার দোকানের ঝাঁপ ঠেলে ঢুকলো রাইমোহন। গুপী তখন বেরুবার উদ্‌যোগ করছিল, রাইমোহনকে দেখে বসে গেল।

—ঘোষালমশাই যে! বহুৎদিন পায়ের ধুলো দ্যাননি ইদিকে। ভাবলুম বুঝি গরীবকে ভুলেই গ্যালেন।

বেতের মোড়ায় হাঁটু উঁচু করে বসে পানের ডিবে বার করলো রাইমোহন। গুপীকে একটি দিয়ে, নিজে একটি মুখে পুরে বললো, দিনদিন যত গরীব হচ্চিস গুপী, তেম্নি তোর ভুঁড়িখানাও তো দিব্য নেওয়াপাতি হচ্চে বেশ!

—ওদিকে নজর দেবেন না! গরীবের তো এটাই সম্বল। আরও বেশী দুদিনের জন্য জমিয়ে রাখতে হয়।

—বসত বাড়িটে একতোলা থেকে দোতোলা করিচিস দেকলুম য্যানো!

—সেইজন্যই তো হাত একেবারে খালি। বাড়ি কত্তে গিয়ে একেবারে সর্বোস্বান্ত হলুম।

—এমন সর্বস্বান্ত হওয়াও ভাগ্যের কতা। তা একদিন বাড়িতে ডেকে নুচি মণ্ডা খাওয়া! তোর বাড়ি মানে তো আমাদেরই বাড়ি, আমাদেরই টাকায় করিচিস যখন—

—আপনাদের মতন লোক এই অধমের কুঁড়েতে আসবেন, এ তো মহাভাগ্যের কতা। কবে পায়ের ধুলো দেবেন, বলুন!

—সহজে দিতে পারবো না, অ্যাখন পায়ের ধুলো বড় আককারা, যা বৃষ্টি বাদলা চলছে। আমাদের এই চিৎপুরের রাস্তায় তো মেঘ ডাকলেই হাঁটু জল। পদ কাদা দিতে পারি।

—তাই-ই দেবেন না হয়। আপনার পা ধুয়ে একটু চরণামৃত খেয়ে নেবো।

—কী ব্যাপার রে, গুপী! এত খাতির কচ্চিস কেন রে আমাকে? অতি ভক্তি কিসের লক্ষণ য্যানো?

—আপনাকে খাতির করবো না তো করবো কাকে? আগে পায়ে হেঁটে ঘুরতেন, তারপর দেখলুম পাল্কি ধরেছেন, অ্যাখুন আবার দেখচি জুড়ি গাড়ি হাঁকাচ্চেন। গত মঙ্গলবার আমার পাশ দিয়ে ধাঁ করে চলে গেলেন, আমি কত ডাকাডাকি কল্লুম, আপনি গেরাহ্যিই কল্লেন না। তবে বড় খুশী হইচি, আপনার উন্নতি দেখলে আমাদেরও আনন্দ হয়।

—র, র, আর ক'টা দিন সবুর কর, আরও কত দেকবি! এই তো সবে ছিপ ফেলিচি। অ্যাখুন জুড়ি গাড়ি হাঁকাচ্ছি, এরপর দেকবি তেঘুড়ি চৌঘুড়ি হাঁকাবো, নিজের, এক্কেবারে নিজের!

—সিদিনকে তবে কার গাড়িতে যাচ্চিলেন? আপনার নিজের নয়!

—না রে, পাগলা। ও গাড়ি রামকমল সিংগীর।

—সিংগী বাড়িতে আবার ভিড়লেন কবে? এই যে ক'দিন খুব সরকার মশায়ের সঙ্গে ঘোরাঘুরি কচ্চিলেন। তেনাকে ছেড়ে এবার বুঝি রামকমল সিংগীকে ধরলেন?

—ছাড়িনি, তেনাকেও ছাড়িনি। দুজনকে দু হাতে খেলাচ্চি বুজলি, পুকুরের দু ঘাটে চার ফেলিচি।

—তাহলে আপনাকে একটা কাজ কত্তেই হবে আমার জন্যে। বাবু রামকমল সিংগী শুনলুম শিগগিরই ছেলের বে দিচ্চেন। কিছু না হোক, লাখখানেক টাকা খরচা হবে নিশ্চয়!

—লাখখানেক কি রে ব্যাটা! এক লাখ তো আমার মতন বারো ভূতে লুটে পুটেই খাবে। শুনচি, গয়নার হিসেবই হয়েছে আড়াই লাখ।

—ঘোষালমশাই, ওর থেকে আমায় কিছু কাজ ধরে দিতেই হবে। হাজার পঞ্চাশেক পেলেই আমার যতেষ্ট।

নিঃশব্দ হাসিতে রাইমোহনের মুখখানা কুঁচকে গেল। তার হাসির মধ্যেও খানিকটা হিংস্রতা আছে। এই পৃথিবীর কাছে কখনো নিজে জব্দ হয়ে যাবার আগেই সে নানারকম বুদ্ধির প্যাঁচ খেলিয়ে দিতে চায়।

বাঁ হাতটি তুলে গুপীর দিকে অভয় মুদ্রা দেখিয়ে সে বললো, এই কতা! মোটে পঞ্চাশ হাজার পেলে তুই সন্তুষ্ট?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—যদি আরও বেশী কাজ দিই?

—সে আপনার দয়া।

—বিধু মুকুজ্যেও মেয়ের বে লাগাবে, সে খপর শুনিচিস?

—কোন্ বিধু মুকুজ্যে? যিনি বড় উকিল?

—হ্যাঁ, আমাদের রামকমল সিংগীর ফে ফি গা—

—কী বললেন?

—ফেরেন্ড, ফিলজফার অ্যান্ড গাইড। এটুকুও জানিস না?

—এসব জানলে তো আমিও বাজারে নেমে পড়তুম। মুখ্যু বলেই না সারাদিন আগুনের ধারে বসে হাঁপর চালাই।

—সেই বিধু মুকুজ্যের বাড়ির কাজেরও বায়না যদি জোগাড় করে দিই?

—তাহলে আপনাকে রোজ দু' বেলা পেন্নাম ঠুকবো!

—শুধু পেন্নাম! হিস্যে দিবি না ব্যাটা বজ্জাত!

—সেও আপনার দয়া। আপনি হিস্যে চাইলে কি আর আমি কখনো না বলতে পারি?

—টাকায় এক আনা বাট্টা দিবি তো বল এখন থেকেই কাজে লেগে যাই। সিংগী বাড়িতে মাধব স্যাকরার কাজ বাঁধা।

দপ করে জ্বলে উঠলো গুপী। আর পাঁচজন নিরীহ, দুর্বল মানুষের মতন সে-ও নিজের পেশায় কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম সহ্য করতে পারে না। ইদানীং স্বর্ণকার হিসেবে মাধবের খুব খ্যাতি। আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মতন রাইমোহন ওর

নামটা তুলেছে।

—মাধব! সে তো এক নম্বুরি চোর। বিষকুম্ভ, বুঝলেন ঘোষালমশাই, বিষকুম্ভ, এই বলে দিলাম আপনাকে। ও গুখেগোর ব্যাটাকে কেউ সেঁকো বিষ খাওয়াতে পারে না!

—তবেই বোজ! মাধবকে সরানো চাট্টিখানি কতা নয়। দস্তুর মতন মেহনৎ করতে হবে, বুদ্ধি খর্চা করতে হবে। কিছু আগাম দে!

—আজ্ঞে?

—একবার বললে বুঝি কতা বুঝিস না? দু বার তিনবার করে বলতে হবে? কিছু আগাম দে আমায়। এত বড় একটা কাজের পত্তন করবো, কিছু মালকড়ি ছাড়তে হবে না?

—আগাম! এখন তো আমার হাতে কিচু নেই। আগে কাজ করি, বাবুদের কাচ থেকে পয়সা পাই, তারপর কড়ায় ক্রান্তিতে আপনার হিস্যে বুঝে দেবো।

—আরে ব্যাটা, আগে দারোয়ানগুলোনকে হাত কত্তে হবে না? সেজন্য খর্চা-পাতি নেই? এসব বড় বড় বাড়ির দারোয়ানরা এক একজন কাঁচাখেকো দেব্‌তা, এদের খুশী না করে কিচ্ছুটি করার উপায় নেই।

—ঘোষালমশাই, বিশ্বাস করুন, হাত একেবারে খালি।

—দে দে ব্যাটা, বেশী ভ্যানতাড়া করিস না, শুভ কাজে অমন ব্যাগড়া দিতে নেই, অন্তত পঞ্চাশটা টাকা বার কর।

—আজ নয়, আর একদিন বরং—

—তবে কি মাধবের কাচে যাবো বলতে চাস? তোর ভালো চাই বলেই বলচি, নইলে আগ বাড়িয়ে আমার এত গরজ দেকাবার ঠ্যাকাটা কী? সিংগী বাড়িতে একবার যদি ঢুকতে পারিস...টিকটিকি হয়ে ঢুকবি, পাঁচ বছর বাদে কুমির হয়ে বেরিয়ে আসবি!

—তবে আজ তিরিশ টাকা নিন!

—অ্যাই তো। অমনি দরাদরি শুরু করে দিলি। স্বভাব যায় না মলে, অভাব যায় না ধুলে। স্বভাবটা যাবে কোতায়! লাখ লাখ টাকার কারবার, আর তুই দশ-বিশ টাকা নিয়ে ঝামেলা কচ্চিস!

—পঁয়তিরিশ নিন। তার বেশী আজ আর কিছুতেই দিতে পারবো না!

—আর একটু ওঠ্‌। আর একটু বাড়। আচ্ছা বেশী কতার দরকার নেই। দে, পঁয়তাল্লিশই দে। বাকি পাঁচ টাকা তোর ছেলে-মেয়েদের আমি মোয়া মিছরি খেতে দিলুম।

অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে গা মোচড়া-মুচড়ি করতে করতে গুপী কাঠের ক্যাশ বাক্সটা খুললো। ঘর থেকে টাকা বার করে দিতে গুপীর যেন হাড় পাঁজরা ভেঙে যায়। কিন্তু উপায়ও তো নেই, রাইমোহন ঘোষালের সঙ্গে সে কথায় এঁটে উঠতে পারবে না। কাজটাও বড় বেশী লোভনীয়। এই সব বড় মানুষদের বাড়ির একটা বিয়ের কাজ করেই অনেকে ভাগ্য ফিরিয়ে নেয়! মাধবের নাম করেই রাইমোহন গুপীর একেবারে ঠিক জায়গায় ঘা দিয়েছে। মাধবের কাছ থেকে কাজ কেড়ে নেবার আনন্দে গুপী পঞ্চাশ একশো টাকা অনায়াসে জলাঞ্জলি দিতে পারে।

টাকাগুলো গুণে বেনিয়ানের জেবে ভরে নিয়ে রাইমোহন তৃপ্তির হাসি হাসলো। নিজের কৃতিত্বে সে নিজেই মুগ্ধ। উদারভাবে সে আবার পানের ডিবেটা বাড়িয়ে দিল গুপীর দিকে।

—তাহলে কাজ ঠিক হাসিল হবে তো, ঘোষালমশাই?

—তুই নিশ্চিন্ত থাক। তোর বাড়ি এবার তিনতোলা হলো বলে!

—আজ মাল আনেননি কিচু?

—নাঃ!

—তাহলে এধার গা তোলা যাক। আজ খবর-টবরও কিচু শোনালেন না।

—বোস্, আরও কাজ আচে। খবর আর কী, দেশে মড়ক লেগেচে, ওলাউঠোয় কত মানুষ পটাপট মরে যাচ্চে! লোকে মড়া পুড়োবারও ফুর্সোৎ পাচ্চে না। গঙ্গায় হাজারে হাজারে শব ভাসচে। দেকে আয় গে, সে এক দ্যাকার মতন জিনিস!

—রাম কহো! ও আবার কেউ দেকতে যায়!

—ঘাটে এত মড়া ভাসচে যে সাহেবরা জাহাজ ভিড়োতেও পাচ্চে না। বড় বড় কত্তারা এই নিয়ে মিটিং কত্তে লেগেচে। এমন মড়কের কথা জম্মে শুনিনি। এর মধ্যে শুনলুম দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলেত থেকে ফিরলেন।

গুপী চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করলো, বলেন কী? উনি বিলেত গেলেন কবে? কিচুই শুনিনি তো! কালাপানি পেরুলেন? জাত ধম্মো সব জলাঞ্জলি দিলেন?

—ওঁর আর জাত ধম্মো আচে কী? বড় মানুষদের জাতে কখনো ফোস্কা পড়ে? কেউ পাঁতি দিতে গেলে তাদের গায়ে চাঁদির জুতি কষাবেন, অমনি সব ঠিক হয়ে যাবে। ওঁর গুরুঠাকুর কালাপানি পেরিয়েছেল আর উনি পেরুবেন না? যাকগে, শোন, এক ছড়া সোনার হার দে তো আমাকে। ছোট হলেই চলবে, বেশী বড়র দরকার নেই।

—হার? আপনি কিনবেন?

গুপী যদি অতিরিক্ত বিস্ময়াপন্ন হয়ে পড়ে, তা হলেও তাকে দোষ দেওয়া যাবে না। রাইমোহনই এদিক সেদিক থেকে হাত সাফাই করে আনা সোনার জিনিস বিক্রয় করে গুপীকে। বস্তুত সেই উপলক্ষেই তার এখানে পদার্পণ ঘটে। আজ ঠিক তার বিপরীত ব্যাপার সংঘটিত হচ্ছে।

—হ্যাঁরে ব্যাটা, আমি কিনবো। কেন, ক্ষ্যামতা নেই নাকি আমার সোনা কেনার?

—না, বলছিলুম কি, আপনি নিজেই আবার বে-শাদী কচ্চেন নাকি?

—কতা বাড়াসনি। তোর কাচে হারটার কী আচে দ্যাকা, আমার তাড়া আচে।

গুপী ছোট বড় নানা মাপের চার পাঁচটি হার বার করলো। কোনোটিতে পাথরের লকেট বসানো, কোনোটি সাধারণ নক্সাকাটা। এর মধ্যে থেকে একটি ছোট মফচেন তুলে নিয়ে রাইমোহন জিজ্ঞেস করলো, এটা ওজন কর, দ্যাক কতোটা সোনা—

হারটি ছোট হলেও বেশ ভারী, পুরো দেড় ভরি। গুপী তার দর হাঁকলো পঁয়ত্রিশ টাকা। রাইমোহন তাই শুনে গুপীর থুতনিটা নেড়ে দিয়ে বললো, বা বা বা বা বা বা! বলিহারি আক্কেল রে! আমি বেচতে এলে বলবি উনিশ টাকা ভরি, তার বেশী একটা আধলা না, আর আমাকে তুই বেচবি বেশী দরে? অ্যাঁ?

—আজ্ঞে আমার বানিটা ধরবেন তো!

—চশমখোর, আমার কাছ থেকেও বানি চাইচিস!

অনেক দরাদরি করে বত্রিশ টাকায় রফা হলো। গুপী তার কমে কিছুতেই দেবে না। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাইমোহন বললো, আচ্ছা দে! আর পারি না তোর সঙ্গে।

ছোট বাক্সে হারটি ভরে দিতে দিতে গুপী বললো, কিন্তু ঘোষালমশাই, এত ছোট হার তো কোনো হুরী-পরীর গলায় মানাবে না। লাল পাতর বসানোটি নিলে পাত্তেন, বেশ দ্যাখনদার ছিল।

—তার দামটিও যে দ্যাখনদার! দে, দে, ওতেই হবে! তোকে আর ফোঁপর-দালালি করতে হবে না।

—কার গলায় পরাবেন?

—চুপ্ মার!

রাইমোহন যেন একটু লজ্জা পেয়েছে মনে হয়। আর কথা বাড়াতে চায় না। মোড়া থেকে টক করে উঠে পড়লো, আর সঙ্গে সঙ্গে গুঁতো খেল মাথায়। তার দৈর্ঘ্যের তুলনায় এ ঘরের ছাতটি যে নীচু, সে কথা তার প্রায়ই মনে থাকে না।

—চলি রে, গুপী!

—দামটা দিলেন না?

—অ! ভুলেই গিসলাম। আমি নগদানগদির কারবারই পছন্দ করি। ধারধোর রাখা আমার স্বভাব নয়।

বেশ সাড়ম্বরে রাইমোহন একটু আগে গুপীরই দেওয়া সিক্কাগুলি বার করলো জেব থেকে। গুণে গুণে বত্রিশ টাকা তুলে দিল গুপীর হাতে। তারপর কোঁচোটি ট্যাঁকে গুঁজে নিষ্ক্রান্ত হলো।

এবার গুপীও মুচকি হাসলো একটু। সব দুঃখেরই সান্ত্বনা আছে। রাইমোহন চিনতে পারেনি। এই হারটিই রাইমোহন কিছুদিন আগে গুপীর কাছে বিক্রি করে গিয়েছিল আঠাশ টাকায়। গুপী তার ওপর চার টাকা লাভ রেখে দিল। ভাগ্যে না থাকলে এরকম দাঁও জোটে না।

রাইমোহনের গন্তব্য বউবাজার। গুপীর দোকান থেকে বেরিয়েই অদূরেই পথে পড়লো জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। সেদিকে তাকিয়ে রাইমোহন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

এই বাড়িটির ওপর তার রাগ আছে। রাইমোহন এ বাড়িতে ভিড়তে গিয়েছিল, কিন্তু ঠোক্কর খেয়ে ফিরে এসেছে। দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ি গতায়াত করতে পারলে দেশের দশটা লোকের কাছে ইজ্জত বাড়ে। রাইমোহনের কাকা দ্বারকানাথের বয়স্য ছিলেন। তিনি অকালে চোখ বুজেছেন। খুড়োর জায়গায় উপযুক্ত ভাইপোরই কাজ পাবার কথা। তা দ্বারকানাথ তো এখন আর দিশী লোকদের আমোলই দ্যান না। সাহেবসুবো ছাড়া কথা নেই, ঘুরে এলেন খোদ সাহেবদের মুল্লুক থেকে। সে যাই হোক, তাঁর ছেলে দেবেন্দ্র এখন লায়েক হয়েছে, বিষয়কর্ম দেখছে, তাঁরও এখন পারিষদের প্রয়োজন। গোড়ায় গোড়ায় দেবেন্দ্রবাবু যেরকম ফুর্তি-ফার্তা শুরু করেছিল, তাতে বেশ আশা হয়েছিল রাইমোহনের। কয়েকবার সে ঘুরঘুর করেছিল দেবেন্দ্রবাবুর আশে পাশে। কিন্তু ঠিক পাত্তা পায়নি। দেবেন্দ্রবাবুর নাকি মতিগতি বদলে গেছে, মদ মেয়েছেলেতে আসক্তি নেই, নাচ গানের আসর বসান না, পুরুষ-মানুষের যোগ্য কাজ কিছুই করেন না। সংস্কৃত শেখার খুব ঝোঁক হয়েছে নাকি। এটা একটা অন্যায় কথা নয়? অত বড় বংশের ছেলে, একটু আধটু বখামি না করলে আর পাঁচজন লোকের অন্ন সংস্থান হবে কী করে? দেবেন্দ্রবাবুকে বাইরে আর প্রায় দেখাই যায় না, কিছু মৌনমুখো মদ্দার সঙ্গে দিনরাত কী সব গুজুর গুজুর ফুসুর ফাসুর করেন। রাইমোহন ঠিক তাল ধরতে পারছে না। লোকে বলাবলি করছে, দ্বারকানাথের মোসাহেবরা এক একটি গড়ুর পক্ষী, আর সেই মানুষের ছেলে হয়ে দেবেন্দ্রবাবু চাট্টি বায়স পুষছেন।

রাইমোহন মনে মনে বললো, কেটে যাবে, এসবও কেটে যাবে। এসব নিরিমিষ্যি-ভড়ং আর কতদিনের। জমিদার বাড়ির ছেলে রক্ত চাটবে না এ কখনো হয়?

জানবাজারে কমলাসুন্দরীর বাড়িতে আজ দারুণ আসর জমেছে। লখনৌ থেকে কালোয়াতী গানের এক ওস্তাদ আর তবলা বাজনাদার আনিয়েছেন রামকমল সিংহ। এ সবই কমলাসুন্দরীর মনোরঞ্জনের জন্য। কমলাসুন্দরীর নৃত্যের খ্যাতি দিকবিদিক ছড়িয়েছে, সে আরও তালিম নিতে চায়। ব্যয়ের ব্যাপারে রামকমল সিংহের কোনো কার্পণ্য নেই। কমলাসুন্দরীর যে-কোনো আবদার তিনি রক্ষা করতে প্রস্তুত। বাবু তো বাবু রামকমল সিংহ। এ কথা স্বীকার করছে সকলে। পাঁচজন লোক ডেকে নিজের রক্ষিতার নাচ দেখানো এমন কাজ আগে কেউ কখনো করেনি। বাঈ নাচের আসর বসাতে হলে সকলেই বাঈজী ভাড়া করে আনে, নিজের মেয়েমানুষকে রাখে আড়ালে। কিন্তু কমলাসুন্দরীকে আর পাঁচজনে তারিফ করলে রামকমল সিংহ যেন আরও বেশী আনন্দে মেতে ওঠেন।

সন্ধ্যে থেকে বসে নাচ গানের আসর। জানবাজারের বাড়িটি সম্প্রতি রামকমল সিংহ কিনেই ফেলেছেন। ইয়ার বন্ধুদের সেখানে নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনেন তিনি, খাদ্য মদ্য থাকে অঢেল, কিন্তু স্ত্রীলোক ঐ একটিই। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুর্তির মাত্রাও চড়তে থাকে। কমলাসুন্দরীর গাত্রবর্ণ ভ্রমরকৃষ্ণ, লাল রঙের ঘাঘড়া ও ওড়নাই তার পছন্দ, আসরের মাঝখানে তাকে মনে হয় একটি ঘুরন্ত রক্তবর্ণের শিখা। এক একবার নাচ থামলেই কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ এনকোর এনকোর চিৎকারে হুলুস্থুলু পড়ে যায়। উত্তেজনা যখন তুঙ্গে, তখনই এক সময় রামকমল সিংহ উঠে আসরের মাঝখানে এসে কমলাসুন্দরীর কোমর বেষ্টন করেন। সে সময় যুগল নৃত্যের জন্য সমস্বরে অনুরোধ আসে মুহুর্মুহু, কিন্তু রামকমল সিংহ সকলের সামনে নিজেকে এতটা খেলো করতে চান না। তাঁর মুখে ফুরফুরে হাসি, চক্ষু ঢুলুঢুলু, তিনি সেই অবস্থায় কমলাসুন্দরীকে পাশের শয়ন কক্ষে নিয়ে গিয়ে দ্বার বন্ধ করে দেন।

এই প্রকার ব্যবহারে রামকমল সিংহ বেশী আনন্দ পান। লাস্যময়ী কমলাসুন্দরী যখন উপস্থিত ভদ্র পঞ্চজনের কাছে কামনীয়া হয়ে ওঠে, যখন সে সকলেরই বুকে লালসা বহ্নি জেবলে দেয়, সেই সময়ই রামকমল সিংহ যেন তাদের বোঝাতে চান, দেখো, এই রমণী শুধু আমারই অঙ্কশায়িনী।

রাইমোহন এ আসরে নিয়মিতই উপস্থিত থেকে এই মজা দেখে। আজ সে সেই গৃহের কাছাকাছি গিয়েও অন্দরে প্রবেশ করলো না। প্রথমে ভেবেছিল, কিছুক্ষণ অন্তত বসে খানিকটা পরস্মৈপদী সুরা টেনে আসবে। কিন্তু মন বদল করে ফেললো। সে চললো বউবাজারের দিকে।

ছিপছিপ ছিপছিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ছাতা সঙ্গে রাখে না রাইমোহন, ভিজতেই লাগলো। লম্বা লম্বা পা ফেলতে লাগলো খানাখন্দ বাঁচিয়ে। তার মনের মধ্যে একটা দো-টানা চলছে। তার ফুর্তিপ্রিয় মনটা তাকে টানছে পেছনের দিকে, গান বাজনা সম্পর্কে তার একটা সহজাত প্রীতি আছে, প্রথম যৌবনে সে অনেক শখ করে সঙ্গীতের চর্চা করেছিল। তখন উদ্দেশ্য ছিল বিশুদ্ধ আনন্দ, এখন অবশ্য সে সঙ্গীতকে অন্য কাজে লাগায়। তবু এখনো উঁচু জাতের গান তাকে আকৃষ্ট করে, সঠিক তালের নাচের মধ্যে সে লাস্য ছাড়া আরও কিছু পায়। কমলাসুন্দরী রামকমল সিংহের বলতে গেলে ক্রীতা রমণী, সেদিকে রাইমোহনের নজর নেই, কিন্তু তার নাচ দেখলে তবু অন্তত নাচটাই দেখা হয়। তাছাড়া সন্ধ্যের পর মজলিশে মজলিশে সময় কাটানো তার অনেক কালের অভ্যেস, দু'

পাত্তর টানার জন্য গলার ভেতরটা শক শক করছে। অথচ এ কথা রাইমোহন বোঝে যে একবার ঐ মজায় মজলে সে আর সহজে বেরুতে পারবে না। প্রায় রাতেই রাইমোহন কমলাসুন্দরীর নাচঘরের ফরাসেই গড়াগাড়ি দেয়।

আবার হীরেমনির কাছেও পাঁচ সাতদিন আসা হয়নি। সেজন্য রাইমোহন একটু একটু অপরাধী বোধ করে। শেষ পর্যন্ত পিছুটান উপেক্ষা করে সে জোরে জোরে পা চালালো।

পায়ের ইংলিশ জুতো জল কাদায় মাখামাখি। মসজিদের পাশের পুকুরে ভালো করে পা ধুয়ে নিয়ে সে এসে দাঁড়ালো হীরেমনির বাড়ির সামনে।

এ গৃহ আজ বর্ণহীন। জানালাগুলি বন্ধ, ভিতরে কোনো জনমনুষ্য আছে বলেই বোঝা যায় না। রাইমোহন অবাক হলো না। সদরদ্বার খোলাই ছিল, সে ভেতরে ঢুকে পড়লো। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে পা ঘষে ঘষে কোনোক্রমে সে উঠতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে। হীরেমনির নোকরটি পালিয়েছে, রাইমোহন আগের দিন এসেই দেখেছিল, তার বদলে কাজ করছিল একটি পশ্চিমা স্ত্রীলোক। আজ বোধহয় সে-ও নেই। হীরেমনি আছে তো?

ওপরে উঠে এসে বড় ঘরটির দরজা ঠেলে সে সভয়ে ডাকলো, হীরে, হীরেমনি!

এ ঘরটিও অন্ধকার প্রায়। এক কোণে একটি মাটির মালসায় তুষের আগুন জ্বলছে ধিকিধিকি করে। ঘরে কেউ আছে কি না বোঝা যায় না।

দু' তিনবার ডাকবার পর ক্ষীণ গলায় সাড়া এলো, কে?

নিশ্চিন্ত হয়ে রাইমোহন ঢুকে পড়লো ঘরে। চক্ষু সঙ্কুচিত করে আঁধার সইয়ে নিয়ে সে দেখলো জাজিমের ওপর লম্বমান এক নারীকে।

—কেমন আচিস, হীরেমনি?

—তুমি ফের এয়েচো?

রাইমোহন চলে গেল তুষের মালসার কাছে। সে জানে, পাশেই গন্ধক মাখানো টুকরো টুকরো পাটখড়ি রাখা থাকে। হাতড়ে হাতড়ে সেইরকম একটি পাটখড়ি পেয়ে সে তুষের আগুনের মধ্যে ঠেসে ধরলো, অমনি ফস করে জ্বলে উঠলো সেটা। সেই জ্বলন্ত পাটখড়ি উঁচু করে ধরে সে জিজ্ঞেস করলো, মোমবাতি কোতায় রে?

বেশী খুঁজতে হলো না, মোমবাতি সে নিজেই পেল, সেটা ধরাবার পর সে বললো, একটা গামোছা কোতায় পাই বল দি'নি? মাতাটা ভিজে জবজবে হয়ে গ্যাচে।

ম্লান আলোয় মেঘলুপ্ত চাঁদের মতন দেখায় হীরেমনির মুখখানি। দু' চোখের নীচে মৃত্যুর পান্ডু রঙ। শরীর কঙ্কালসার। কণ্ঠে জোর নেই, তবু হীরেমনি বললো, পোড়ামুখো মনিষ্যি, তুমি ফের মরতে এয়েচো এখেনে! দূর হও! দূর হও!

রাইমোহন হেসে বললো, আসা মাত্তরই দূর দূর করচিস কেন রে? লোকে কুকুর বেড়ালকেও এমনিভাবে তাড়ায় না!

হীরেমনি বললো, তোমায় কতবার আসতে বারণ করিচি! আমি তো মরতে বসিইচি, তোমারও মরার সাধ হয়েচে বুঝি?

হীরেমনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে। তার ধারণা, তার সংস্পর্শে এলে রাইমোহনও পড়বে সেই অসুখে। তিন মাস হয়ে গেল হীরেমনিকে আঁকড়ে আছে এই কালরোগ, নিচ্ছেও না, ছাড়চেও না। হীরেমনির কাছে অনেকদিনই আর কেউ আসে না। তার জিনিসপত্রও ক্রমে ক্রমে উধাও হয়ে গেছে। যৌবন চলে

গেলে বারবনিতার আর কিছুই থাকে না, কিন্তু হীরেমনির বয়েস এখনো কুড়ি পূর্ণ হয়নি, তবু তার এই দূরদৃষ্ট।

—চাঁদু কোতায়? চাঁদু?

—ঘুমুচ্চে পাশের ঘরে।

—এই সন্ধেবেলা ঘুমুচ্চে? খেয়েচে কিচু?

—তোমার অত কতার দরকার কী?

—আ মোলো, অমন কতায় কতায় মুখ ঝামটা দিচ্চিস কেন? ছেলেটা খেয়েচে কিনা জানবো না? সেদিন যে মাগীকে দেখে গেসলুম তোদের রান্না করে দিচ্চে, সে গেল কোতায়?

—কে জানে!

রাইমোহন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। বেঘোরে মরতে বসেও হীরেমনির অহংকার যায়নি, সে কিছুতেই রাইমোহনের কাছ থেকে কোনো সাহায্য নিতে চায় না। রাইমোহন টাকা দেওয়ার চেষ্টা করলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। হীরেমনির ছেলে চন্দ্রনাথের বয়স এখন তিন বছর, মায়ের এই অসুখে তারও দুরবস্থার একশেষ হচ্ছে। কেই বা দেখাশুনো করবে। যা অবস্থা, তাতে চোর ডাকাতরা যে কোনোদিন মা-ছেলেকে কেটেকুটে বাকি সব জিনিসপত্রও নিয়ে চলে যাবে। রাইমোহনের সংসারে কেউ নেই, কবেই সব উৎসন্নে গেছে, সুতরাং চন্দ্রনাথকে সে নিজের কাছে নিয়ে রাখতেও ভরসা পায় না। আর কার কাছেই বা রাখবে, বেশ্যার ছেলেকে কে নেবে?

পাশের ঘর থেকে ঘুমন্ত চন্দ্রনাথকে তুলে নিয়ে এলো রাইমোহন। ছেলেটার চোখের নীচে শুকনো জলের দাগ, তাই দেখে কঠিনহৃদয় রাইমোহনেরও বুকটা একটু মুচড়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে রাগও হলো তার।

হীরেমনির পাশে বসে সে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, তুই এখনো বল, হীরেমনি, এ ছেলে কার? আমি তার গলায় গামছা দিয়ে এখানে হিড়হিড় করে টেনে আনবো! গোটা কলকেতা শহরে খবর রটিয়ে দেবো!

হীরেমনি ফোঁস করে উঠে বললো, ফের ঐ কতা? দূর হয়ে যাও আমার চোকের সুমুখ থেকে। ছেলে আমার, ভগমান আমায় দিয়েচেন।

এ কি বিস্ময়কর বিশ্বস্ততা হীরেমনির! মৃত্যু শিয়রে রেখেও সে সততার জেদ ছাড়বে না। এই ব্যাপারটাই রাইমোহনকে বেশী টানে। তঞ্চকতাই তার পেশা; ভণ্ডামি, জুয়াচুরি ও মিথ্যের অস্ত্রগুলি সে সারা জীবন শানিয়ে বেড়াচ্ছে; আর একজন সামান্য স্ত্রীলোক হারিয়ে দিচ্ছে তাকে। সতীত্ব নেই অথচ সততা আছে, এমন স্ত্রীলোকও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে থাকে?

—যদি জগমোহন সরকার হয় তো একবারটি বল, আমি হাটে হাঁড়ি ভাঙবো। সে নচ্ছারটা ফিমেল উদ্ধারের নাম করে ভদ্দরলোকের বাড়ির অন্দরে ঢুঁ মেরে বেড়াচ্চে। মাথা ভরা কুমতলব, আর মুখে বড় বড় কতা! কত পিরীত ছিল তোর সঙ্গে, এখুন আর ইদিকে আসবার নামটি নেই।

—হাজার বার বলিচি তিনি নন্।

—বেশ, তবে আজ থেকে আমিই চাঁদুর বাপ হলুম।

—না, তোমার মুরোদে কুলোবে না। ওর বাপ কেউ নয়। ওর বাপ নেই। আমি মরলে চাঁদুও আমার সঙ্গে মরবে।

—হীরে, আমার ওপর কেন অত রাগ করিস? সুখের খোঁজে লোকে তোদের মতন মেয়েমানুষের কাচে আসে। অসুখে-পড়া মাগ দেখতে কেউ ভুলেও আসে

না। কিন্তু আমি তো এসিচি।

—বেশ কোরেচো। এখন বিদেয় হও।

—চাঁদুকে আমি আজ থেকে পুষ্যি নিলুম। এই দ্যাখ।

ট্যাঁক থেকে সোনার হারটা বার করে সে পরিয়ে দিল চন্দ্রনাথের গলায়। তারপর ছোট একটি হাততালি দিয়ে বললো, বাঃ, দিব্যি মানিয়েচে।

—খুলে নাও, এক্ষুনি খুলে নাও। কার ঘর ঠেঙে চুরি করা মাল তুমি এখেনে গচাতে এয়োচো!

—চুরি করা? তোকে কিরে কেটে বলচি, এ আমার হক্কের জিনিস। ওকে আজ ছেলে বলে ডাকলুম, খালি হাতে আসা যায়? তোকে আর একটা কতাও বলচি, আজ থেকে আমি এখেনেই ঠাঁই নেবো। আর যাচ্চিনি। আমি এখুনি বেরিয়ে খাবারদাবার কিনে আনচি। তুই ভেবেচিস আমায় ফাঁকি দিয়ে পালাবি?

চন্দ্রনাথের মুখশ্রী সুন্দর, গৌরবর্ণ, সোনার হারটি পরানোতে সেই শিশুকে আরও সুশোভন দেখায়। রাইমোহন সেদিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে রইলো। পুষ্যি নেওয়ার দিন একটা কিছু স্বর্ণালঙ্কার দেওয়া নিয়ে কথা। তারপর আবার টাকা পয়সায় হঠাৎ ঘাটতি পড়লে ঐ হারটিই বেচে দিয়ে আবার দু' পাঁচদিন চালানো যাবে।

হীরেমনি আর পারলো না, নিঃশব্দে অশ্রু বর্ষণ করতে শুরু করলো। রাইমোহন হীরেমনির শীর্ণ গ্রীবায় হাত রেখে বললো, তোকে আমি সারিয়ে তুলবোই! তুই ভালো হয়ে ওঠ, হীরে, তারপর তোতে আমাতে মিলে আগুন জ্বালাবো! তোকে আমার খুব দরকার।



এবারে কিছু পুরোনো আমলের গালগল্প করা যাক।

দিল্লীর বাদশাহের সনদ নিয়ে খান জাহান আলী নামে একজন সেনাপতি এসেছেন যশোর শাসন করতে। এই খান জাহান আলীকে অবশ্য আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নেই, আমাদের আগ্রহ তাঁর এক কর্মচারী সম্পর্কে। তবু খান জাহান আলীর উল্লেখের প্রয়োজন হলো, কারণ এই ব্যক্তিটির নাম আছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, ইনি মারা যান ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে, তখনও চৈতন্যদেব জন্মাননি।

তৎকালে বাঙালীদের নামের সঙ্গে কোনো পদবী যুক্ত হওয়ার রেওয়াজ ছিল না। গোত্র এবং গ্রামের পরিচয়েই মানুষের পরিচয়। খান জাহানের সেই কর্মচারীটির সঠিক নামও আমরা জানি না। সে ব্রাহ্মণের ছেলে। নবদ্বীপের কাছে পিরল্যা গ্রামে তার জন্ম। সে এক সুন্দরী মুসলমান রমণীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হলো। সেই প্রণয় এমনই তীব্র যে তার জন্য সে জাত ধর্ম বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। হিন্দু ধর্ম এমনই কঠোরভাবে গণ্ডীবদ্ধ যে সেখানে অন্য ধর্মের মানুষের কোনোক্রমেই প্রবেশ অধিকার নেই। ব্রাহ্মণের ছেলে যবনী বিবাহ করলে তার স্ত্রীকে তো কোনো-ক্রমেই হিন্দুত্বে বরণ করা যাবে না, বরং সে ছেলেটিরই জাত যাবে। সুতরাং প্রণয় পরিণামে এই ব্রাহ্মণ সন্তানটি জাতিভ্রষ্ট হলেও তার নতুন নাম হলো মামুদ তাহির। সে পিরল্যা গ্রাম থেকে এসেছে বলে আগে তাকে পিরল্যাীয়া বলে ডাকা

হতো, এই নামটিরও একটি চমৎকার মুসলমানী রূপ পাওয়া গেল, পির আলী।

হিন্দু ধর্ম নতুন কারুকে গ্রহণ করে না বরং নিজের লোকদেরই পরধর্মের দিকে ঠেলে দেয়, পৃথিবীর অপর ধর্মগুলি কিন্তু নবাগতদের সাদরে অভ্যর্থনা জানায়। এমনকি অনেক সময় কিছু কিছু পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করে। ধর্মান্তরিত হবার পর পির আলী তার প্রভুর নেকনজরে পড়লো এবং বখশিস হিসেবে পেয়ে গেল একটি পরগণা। সেই পরগণাটির নাম চেঙ্গুটিয়া।

ক্রমে এই পরগণাদার পির আলী বেশ একটি মান্যগণ্য লোক হয়ে ওঠলো এবং প্রায়ই ধুমধাম করে নানারকম উৎসবের আয়োজন করতো।

কথায় বলে, নতুন মুসলমান গোরু খাওয়ার যম। পির আলী নিজে তো খেতেনই, উপরন্তু সকলকে গো-মাংস ভক্ষণের উপকারিতা বিষয়ে নানা কথাবার্তা শোনাতেন। কিন্তু চেংগুটিয়া পরগণাটি হিন্দুপ্রধান এবং এখানে বেশ কিছু ব্রাহ্মণের বাস। সুতরাং পির আলীর মতামত সহজে জনপ্রিয় হবার সম্ভাবনা ছিল না।

কামদেব ও জয়দেব নামে দুই ব্রাহ্মণ দেওয়ানী করতো এই পির আলীর অধীনে। একদিন তারা তাদের সহৃদয় প্রভুর সঙ্গে একটি অপ্রত্যাশিত রসিকতা করে ফেললো। সেইটিই তাদের জীবনের মহত্তম ভুল। অথবা, ভুলই বা বলছি কেন, এইসব ঘটনাই তো ইতিহাসের কৌতুক।

রোজার মাস, উপবাসী পির আলী তাঁর পাত্রমিত্রদের সংগে নানা বিষয়ে আলোচনা করছেন, তাঁর হাতে একটি গন্ধ লেবু। মাঝে মাঝে সেটি নাকের কাছে এনে শুঁকছেন তিনি। এমন সময়ে কামদেব ও জয়দেবের মধ্যে একজন কেউ বললো, উজির সাহেব, আপনার আজকের রোজা তো ভংগ হয়ে গেল!

বিস্মিত পির আলীকে সে আরও বুঝিয়ে দিল যে, তাদের শাস্ত্রমতে ঘ্রাণেন অর্ধ ভোজনম্। সুতরাং রোজার মাসের নিয়মরক্ষা হলো না।

এই শুনে পির আলী হাসলেন। সেই হাসির মধ্যে গভীর মতলব ছিল।

এরপর একদিন পির আলী তাঁর দরবারে বহু হিন্দুকে নিমন্ত্রণ করে কথা-বার্তার মাঝে হঠাৎ ভৃত্যদের কী এক ইঙ্গিত করলেন। অমনি ভৃত্যরা অনেকগুলি জ্বলন্ত উনুন নিয়ে এলো সভাকক্ষে, সেইসব উনুনের ওপর কড়াইতে গো-মাংস রান্না হচ্ছে। লোকশ্রুতি এই, সেদিন পির আলী এক শত গো বধ করেছিলেন।

গো-মাংসের গন্ধ পেয়ে অনেক হিন্দু নাকে কাপড় দিলেন, অনেকে সভা ছেড়ে পালালেন। কিন্তু পির আলী চেপে ধরলেন কামদেব আর জয়দেবকে। তিনি বললেন, তোমরা পালাচ্ছো কেন? তোমাদেরই শাস্ত্রমতে তোমাদের অর্ধেক ভোজন হয়ে গেছে এবং সেই অনুযায়ী তোমাদের জাত গেছে। সুতরাং আর চক্ষুলজ্জা রেখে লাভ কী? আমার পাশে বসে বাকি ভোজনটাও সেরে নাও!

ধর্মান্তরিত হবার পর কামদেব আর জয়দেবের নাম হলো কামালউদ্দিন ও জামালউদ্দিন। এবং উপহার পেল জায়গীর। কিন্তু ঘ্রাণে অর্ধ ভোজনের মতন, হিন্দু পরিবারের অর্ধেক মুসলমান হলে বাকি অর্ধেকও নিষ্কৃতি পায় না। কামদেব, জয়দেবের আর দুই ভাই ছিল, তাদের নাম রতিদেব আর শুকদেব। সমাজ খড়্গহস্ত হলো এদের প্রতি, আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে জল-অচল হলো এবং পির আলীর নামের সুবাদে এদের পরিবারের নামের সঙ্গে পিরালী অপবাদ যুক্ত হয়ে গেল। লোকে এদের পুরোপুরি ব্রাহ্মণ বলে না, বলে পিরালীর বামুন।

আত্মীয়স্বজনদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এই দুই ভাইয়ের মধ্যে রতিদেব গৃহত্যাগ করলো। খুব সম্ভব তার কোনো পুত্রকন্যা ছিল না, তাই

বৈরাগ্য গ্রহণ তার পক্ষে সহজ হয়েছিল। কিন্তু শুকদেব পড়লো মহা বিপদে। তার নিজের বিবাহযোগ্যা কন্যা রয়েছে। এক ভগ্নীরও তখনো পর্যন্ত বিবাহ দেওয়া হয়নি। পরিবারে খুঁত লেগে গেছে বলে এই দুই কন্যার বিবাহের জন্য কোনো পাত্র পাওয়া যায় না। তখন শুকদেব সমাজের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করলো তার শেষ অস্ত্র, যার চেয়ে অমোঘ অস্ত্র আর হয় না। টাকা দিয়ে সে কিনে ফেললো দুজন ব্রাহ্মণকে। শুকদেবের ভগ্নীর বিবাহ হলো ফুলে গ্রামের মঙ্গলানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এবং কন্যার স্বামী হলো পিঠাভোগ গ্রামের জগন্নাথ কুশারী। যৌতুক হিসেবে উভয়েই পেল প্রচুর জমি ও ধন। পরবর্তীকালে শুকদেব, মঙ্গলানন্দ, জগন্নাথদের সন্তানসন্ততিরা সকলেই পিরালীর ব্রাহ্মণ বলে চিহ্নিত হয়ে রইলো।

সকলের কথা থাক, আমরা শুধু জগন্নাথ কুশারীকেই অনুসরণ করি। যেমন গাঙ্গুল গ্রামের ব্রাহ্মণেরা গাঙ্গুলী, সেইরকমই কুশ গ্রামনিবাসীরা কুশারী। এই কুশ গ্রামটি বর্ধমান শহরের কাছে। ক্রমে এই কুশারীরা বাঁকুড়ার সোনামুখী, খুলনার পিঠাভোগ এবং ঢাকার কয়কীর্তন গ্রামেও বসতি নেয়। অথবা বলা যায়, সেইসব গ্রামের গ্রামীণ বা গাঞী হয়। আমাদের এই কাহিনীতে, পিঠাভোগের কুশারীদের গুরুত্ব অনেকখানি।

এই কুশারীরা সুদীর্ঘ বংশগৌরব দাবী করতে পারে। আদিশূর নামে গৌড়ের জনৈক রাজা, যিনি পৌরাণিক না ঐতিহাসিক তা বলা শক্ত, (আমরা এ পরিচ্ছেদের শুরুতেই এসব কাহিনীকে গালগল্প বলে অভিহিত করেছি) কনৌজ থেকে পাঁচজন খাঁটি ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন। ধরে নেওয়া যায়, গৌড় বাংলা তখন ছিল অনার্য অধ্যুষিত। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ থেকেই শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, বাৎস্য এবং সাবর্ণ গোত্রের উদ্ভব। উত্তরকালে এইসব গোত্র বিভাগ প্রচুর জটিলতার সৃষ্টি এবং অনাসৃষ্টি করেছিল।

শাণ্ডিল্য গোত্রের প্রথম পুরুষ ক্ষিতীশের এক পুত্রের নাম ভট্টনারায়ণ, যিনি প্রখ্যাত সংস্কৃত নাটক বেণী সংহারের রচয়িতা বলে অনেকের ধারণা। সেই ভট্টনারায়ণের বংশধর আমাদের আলোচ্য কুশারীরা। মূল শাণ্ডিল্য গোত্রের জন্য এঁদের বন্দ্যঘটী বা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু গাঞী নিরিখে এঁরা কুশারী।

এমত বংশগৌরব থাকলেও যবন সংসর্গ হেতু পিঠাভোগের কুশারীদের পিরালী নাম অর্শে গেল। ধর্ম ও সমাজপতিদের অত্যাচার তাদের সইতে হয়েছে বহু প্রজন্ম ধরে। অনেক কাল পরে তারা এর শোধ নেয়।

এবার কয়েক শতাব্দী পেরিয়ে আসা যাক। ঐ কুশারী বংশেরই এক সন্তান পঞ্চানন এবং তাঁর খুল্লতাত শুকদেব আত্মীয়দের সঙ্গে বিবাদ করে স্বগ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন ভাগ্যান্বেষণে। ঘুরতে ঘুরতে এঁরা এসে পৌঁছোলেন গোবিন্দপুরের খাঁড়ির কাছে। খাটো জাতের ব্রাহ্মণ হলেও তাঁদের সাজ-পোশাকের কোনো ত্রুটি ছিল না। পরিধানে পট্টবস্ত্র, মাথায় স্থূল শিখা এবং ললাটে চন্দন, গাত্রবর্ণ অতিশয় গৌর। দেখলেই ব্রাহ্মণ বলে চেনা যায়। গোবিন্দপুরের খাঁড়ির পাশে তখন শুধু কয়েক ঘর জেলে, মালো, কৈবর্তের বাস। ব্রাহ্মণ দেখে তারা ষাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলো এবং সেখানেই অধিষ্ঠিত হবার অনুরোধ জানালো। গ্রামের মধ্যে ব্রাহ্মণদের আশ্রয় দেওয়া একটি বড় পুণ্যকর্ম।

সেই গোবিন্দপুরের খাঁড়ির নামই ইদানীং আদি গঙ্গা বা টালির নালা। গোবিন্দপুর, সুতানটি এবং কলকাতা নামে তিনটি গ্রাম জুড়ে ইংরেজরা তখন

নতুন একটি শহরের পত্তন করছে। এই খাঁড়ি দিয়ে জাহাজ চলাচলের সুবিধার জন্য এটিকে কেটে প্রশস্ত করা হচ্ছে এবং গ্রামের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্য সাহেবরা যখন আসে তখন গ্রামের জেলেরা নিজেরা কথা বলার সাহস না পেয়ে ব্রাহ্মণ দুজনকে এগিয়ে দেয়। ব্রাহ্মণ দেবতুল্য, তাই গ্রামের মানুষ তাঁদের ঠাকুর বলে ডাকে। সাহেবরা সঠিক উচ্চারণ করতে পারে না বলে, তারা বলে টেগোর। কুশারী ও পিরালী পরিচয় মুছে ফেলে পঞ্চানন ও শুকদেব ঠাকুর হয়ে গেলেন।

এই ঠাকুররাই কলকাতার আদিযুগের স্টিভেডর এবং কণ্ট্রাকটর। প্রথম প্রথম পঞ্চানন ও শুকদেব সাহেবদের জাহাজে মালপত্র সরবরাহ করতেন। তারপর সাহেবদের সঙ্গে ভালোমতন পরিচয় হয়ে যাওয়ার ফলে আরও নানারকম কাজের ভার পেতে লাগলেন তাঁরা। নতুন শহরে তখন অনেক প্রকার কর্মোদ্যম চলছে। বর্গীর হাঙ্গামা থেকে রক্ষা পাবার জন্য কাটা হলো মারহাট্টা ডিচ। সিরাজউদ্দৌল্লা হঠাৎ এসে কলকাতার কেল্লা গুঁড়িয়ে দেবার পর ইংরেজরা ময়দানের ফাঁকা জায়গায় মজবুত করে তৈরি করে নতুন কেল্লা বা ফোর্ট উইলিয়াম। এইসব কাজের ঠিকাদারির ভার পায় ঐ দুই ঠাকুরের পুত্র ও পৌত্রেরা। ঠাকুরদের তখন এতই ধনসম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, শোনা যায় দুর্গম বন জঙ্গল সাফ করে তাঁরা যেখানে একটি বাগানবাটি প্রস্তুত করেন, পরে সেখানেই তৈরি হয়েছিল ঐ নতুন কেল্লা।

পরবর্তীকালে এই বংশের আর দুই উল্লেখযোগ্য ভ্রাতার নাম নীলমণি এবং দর্পনারায়ণ। দুজনেই যথেষ্ট ধনাঢ্য, তবে নীলমণি অনেক বেশী কর্মবীর। গোবিন্দপুরের খাঁড়ির কিনারা ছেড়ে ঠাকুরেরা এখন চলে এসেছেন মেছোবাজারের পাথুরিয়াঘাটা নামের অভিজাত পল্লীতে। ছোট ভাইকে সংসার দেখাশুনোর ভার দিয়ে নীলমণি প্রায়ই বাইরে বাইরে কাটান। ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে তিনি চাকুরিসূত্রে আবদ্ধ। কখনো তিনি যান চট্টগ্রামে, কখনো উড়িষ্যায়। অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্য ছাড়াও তাঁর চরিত্রে দুঃসাহস ছিল যথেষ্ট। দেওয়ানি কাজে সেকালে অর্থাগম হতো বিস্তর। সমস্ত টাকা নীলমণি পাঠিয়ে দিতেন ছোট ভাইয়ের কাছে।

এক সময় চাকরি ত্যাগ করে নীলমণি গৃহে ফিরলেন। সেখানে তাঁর জন্য এক বিরাট অশান্তি অপেক্ষা করে ছিল। তাঁদের গৃহে তখন অতুল বৈভব। কিন্তু ছোটভাই দর্পনারায়ণ দাবী করলেন যে এর অধিকাংশই তাঁর নিজের উদ্যোগ ও বিচারবুদ্ধির ফল, এর মধ্যে নীলমণির অংশে সামান্যই। নীলমণি বিদেশ থেকে টাকা পাঠিয়েছেন বটে কিন্তু দর্পনারায়ণই নিজ কৃতিত্বে সম্পত্তি বহুগুণ করেছেন।

ভ্রাতৃবিরোধ এক সময় এমনই চরমে উঠলো যে এক বর্ষার রাতে নীলমণি তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে এবং গৃহদেবতা নারায়ণশিলা সঙ্গে নিয়ে পাথুরিয়া-ঘাটার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। আর কোনোদিন ফিরবেন না। দর্পনারায়ণ তাঁর দাদার হাতে নগদ এক লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছেন এবং তাঁকে দিয়ে স্বীকার করে নিইয়েছেন যে বসতবাটি এবং ভূসম্পত্তির ওপর নীলমণির আর কোনো অধিকার রইলো না।

বৃষ্টিময় অন্ধকার রাতে নীলমণিকে অবশ্য সপরিবারে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হলো না। ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের পুণ্য অর্জনের জন্য তাঁদের আশ্রয় দিলেন কলকাতার এক বিখ্যাত ধনপতি। এঁর নাম শেঠ বৈষ্ণবচরণ। এ বৈষ্ণবচরণ ধনী হয়েছিলেন

শ্রেণী মাত্র, একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের শেয়ারহোল্ডার এবং তাদের বেতনভুক কর্মচারীগণ। এছাড়াও অন্য ইংরেজ আছে। যারা ভাগ্যান্বেষণে এসেছে ভারতবর্ষে, তাদের আছে স্বাধীন পেশা, রাজকর্মচারীদের সঙ্গে তাদেরও স্বার্থের সংঘাত হয়, আদর্শগত বিভেদ দেখা দেয়। এদের মধ্যে অনেকে অর্থপিশাচ, অনেকে নারী-লোলুপ, অনেকে নীতিহীন নরপশু। আবার কেউ কেউ মুক্তমনা, উদার, একতরফা শোষণের প্রতিবাদকারী। তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এ দেশের ভাষা ও প্রাচীন সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করে, শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহ দেখায়, সংবাদপত্রে সরকারী নীতির সমালোচনা করে।

রামমোহন ও দ্বারকানাথ দুজনেই বুঝেছিলেন অরাজক এবং নীতি-শিক্ষা-সংস্কৃতি ভ্রষ্ট ভারতের পক্ষে ইংরেজের শাসন আশীর্বাদ স্বরূপ। তবে, ইংরেজ যেন ভারতীয়দের আত্মসম্মানে আঘাত না দেয়। রামমোহনের তুলনায় দ্বারকানাথ আরও বেশী বুঝেছিলেন যে, ইংরেজদের কাছে ভারতীয়রা ক্রীতদাস। ভারতবাসী বহুকাল ধরে যুদ্ধবিদ্যায় অনভ্যস্ত, তাদের পক্ষে ইংরেজদের বিরোধিতা করা বাতুলতা। সেইজন্যই ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে যতদূর সম্ভব ধন মান প্রাণের অধিকার আদায় করতে হলে ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরেজদের সাহায্য নিতেই হবে।

ইওরোপ ভ্রমণে গিয়ে দ্বারকানাথ এই সত্য আরো বেশী উপলব্ধি করলেন। ভারতে ইংরেজ-রাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের অন্য শ্রেণীর ইংরেজদের অনেক প্রভেদ। ভৃত্য বা প্রজার মতন নয়, তারা দ্বারকানাথের সঙ্গে ব্যবহার করেছে সমান সমান মানুষের মতন, কিংবা তারও বেশী সম্ভ্রমের সঙ্গে। স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁকে পাশে স্থান দিয়েছেন। বড় বড় ডিউক, লর্ড থেকে শুরু করে ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স পর্যন্ত দেখা করে গেছেন তাঁর বাড়িতে এসে।

ভারত থেকে ইংলণ্ডবাসীদের জন্য নানান উপহার নিয়ে গিয়েছিলেন দ্বারকানাথ। ইংলণ্ড থেকেও তিনি ভারতীয়দের জন্য বিশেষ একটি উপহার নিয়ে এলেন। একটি মানুষ। এঁর নাম টমসন। এই টমসন পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের স্বাধীনতার জন্য জীবনপণ লড়াই-এ প্রস্তুত। এর আগে তিনি আমেরিকায় ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে অগ্নিস্রাবী ভাষণ দিয়ে এসেছেন বিভিন্ন জায়গায়। সেজন্য তাঁর প্রাণ বিপন্ন হবার সম্ভাবনা ছিল বারবার। এই বিশেষ মানুষটিকে দ্বারকানাথ ভারতে আমন্ত্রণ করে আনলেন এক গূঢ় উদ্দেশ্যে।

এক শীতের ভোরে দ্বারকানাথের জাহাজ এসে ভিড়লো কলকাতা বন্দরে। আগে থেকেই খবর পেয়ে শত শত ব্যক্তি সেই সকালেই সেখানে এসে সমবেত হয়েছেন তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য। জেটিতে জাহাজটি স্পর্শ করার পর দ্বারকানাথ তাঁর কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন পোর্ট সাইড ডেকে। তাঁর মুখখানি এক অদ্ভুত হাস্যে সমুজ্জ্বল। সকল অবিশ্বাসীরা এবার দেখুক! বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে অনেকেই তাঁকে বলেছিল যে ইওরোপীয় জল হাওয়া ভারতবাসীর সহ্য হয় না। সেখান থেকে কেউ বেঁচে ফেরে না, যেমন রামমোহন ফেরেননি।

দ্বারকানাথ হাত তুলে বললেন, আমি বেঁচে আছি।



গোরা সৈন্য ও সিপাহীরা শহরের উপান্তে এক স্থলে বন্দুকের তাক অভ্যাস করে। দিনরাত গোলাগুলির শব্দের জন্য লোকে সেই অঞ্চলের নাম দিয়েছে দমদমা। এই দমদমা বা দমদমে যাবার পথেই এক জায়গার নাম বেলগাছিয়া। যে পল্লীতে যে গাছ বেশী দৃষ্ট হয় সেই গাছের নামেই পল্লীর নাম। যেমন বটতলা, কাঁকুড়গাছি, লেবুবাগান, পেয়ারাবাগান, তালতলা, ডালিমতলা ইত্যাদি।

বেলগাছিয়ায় দ্বারকানাথের মনোরম বিলাসপুরী বেলগাছিয়া ভিলা। এক বিশাল উদ্যানের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে প্রবাহিত হয়েছে মতিঝিল, তার স্বচ্ছ নির্মল জল, সে জলে ফুটে আছে নীল পদ্ম ও রক্ত পদ্ম, যা কবিদের অতি প্রিয়। উদ্যানটিও সযত্নে কেয়ারি করা, এর মধ্যে রয়েছে গোলাপ, কদম্ব, স্থলপদ্ম, যুঁই, বেল, পিটুনিয়া, জিনিয়া, সাকসপার্স, আরও কত না বাহারী ফুল।

বাহির বাড়িটিতে অতি প্রশস্ত সব হলঘর। সেগুলির ত্রুটিহীন সৌষ্ঠবে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। দেয়ালগুলি আধুনিক শিল্পীদের চিত্রকলায় সজ্জিত। মধ্যে মধ্যে এক একটি ভাস্কর্যের নিদর্শন। কোনো কোনো কক্ষে দেয়ালজোড়া বেলজিয়াম আয়না। ওপর থেকে ঝুলছে এক শো দেড়শো মোমের ঝাড়বাতি, যার আলো ঠিকরে পড়ছে দর্পণে। প্রতিটি প্রকোষ্ঠের মেঝেতে ছড়ানো রয়েছে মীর্জাপুরী গালিচা। বুটিদার লাল রঙের কাপড় ও সবুজ সিল্কে আসবাবগুলি মোড়া। মধ্যে মধ্যে শ্বেতপাথরের টেবিল, তার ওপরে সাজানো পুষ্পস্তবক। সিঁড়ির দু' পাশে ঝুলছে দুষ্প্রাপ্য অর্কিড, লোহার রেলিং ঢেকে দেওয়া হয়েছে লতাপাতায়।

বাইরে একটি মার্বেল পাথরের ফোয়ারা, তার ওপরে দণ্ডায়মান প্রেমের দেবতা কিউপিড। ফোয়ারাটিকেও আজ আলোকোদ্ভাসিত করা হয়েছে। এ যেন সত্যিই ইন্দ্রপুরী।

মতিঝিলের মাঝখানে একটি দ্বীপ, সেই দ্বীপের ওপরেও রয়েছে আর একটি গৃহ, এটির নাম গ্রীষ্মাবাস। একদিকে একটি ঝুলন্ত লোহার সেতু ও আর একদিকে একটি কাঠের সেতু দিয়ে এই গ্রীষ্মাবাসটি বাগানের সঙ্গে যুক্ত। অবশ্য এই দুই সেতুও সদ্য আনীত দেবদারু পাতায় মোড়া এবং স্থানে স্থানে উড়ছে বহুবর্ণ পতাকা। অতিথিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার তারতম্য অনুযায়ী কেউ বৈঠকখানায় কেউ ঐ গ্রীষ্মাবাসে বসেছেন। চতুর্দিক থেকে ভেসে আসছে যন্ত্রবাদ্য ও নৃত্য-গীতের ধ্বনি। উদ্যানে অবিরাম বাজি পোড়ানো চলেছে।

শীতকাল, ফিনফিনে বাতাস বইছে। আকাশ পরিষ্কার, অজস্র নক্ষত্রের সভাসদ নিয়ে নিশাপতি আজ সেখানে পূর্ণ গৌরবে বিরাজমান। ধরণীতলে, এই বেলগাছিয়া ভিলাতেও যেন দ্বারকানাথ আজ তারকাদের মধ্যে চন্দ্র। ইওরোপ বিজয় করে এসেছেন তিনি, সেই উপলক্ষে আজ তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে মিলনোৎসব। তাঁর অভিজ্ঞতা শ্রবণের জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব।

বেলগাছিয়া ভিলা স্থাপনের প্রথম দিকে দ্বারকানাথ তাঁর শ্বেতাঙ্গ বন্ধু ও কৃষ্ণাঙ্গ বন্ধুদের পৃথক পৃথক দিনে নিমন্ত্রণ জানাতেন। ইদানীং তিনি সেই প্রভেদ ঘুচিয়ে দিয়েছেন। বিশিষ্ট রাজপুরুষ, কাউন্সিলের সদস্য, সুপ্রিম কোর্টের

নাই। আমার এ বাগানটি এখন আমার চক্ষে দুয়োরানীর তুল্য অপ্রিয় বোধহয়।

এক ইংরেজ প্রশ্ন করলো, আপনি ডিউক অব ডেভনশায়ারের কানন-সৌধটি পরিদর্শন করিয়াছেন কি?

দ্বারকানাথ এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, আ, আপনি যথার্থ নামটি উচ্চারণ করিয়াছেন। অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু উহার তুল্য আর দেখি নাই। চ্যাটসওয়ার্থে ডিউক অব ডেভনশায়ারের কানন, তাহাতে যে কত প্রকার দেশী বিদেশী বৃক্ষ রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কে জানিত, এই পৃথিবী এতপ্রকার বৃক্ষ ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যান্বিতা। আরও বড় বিস্ময়ের কথা, সেই শীতপ্রধান দেশেও ডিউক মহাশয় কতপ্রকার নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বৃক্ষরাজি সযত্নে সংগ্রহ করিয়াছেন। সেই উদ্যানের তুলনায় আমার এই ভিলা? যেন সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদ।

—ও দেশের আর কোন্ কোন্ বস্তু দেখিয়া আপনি বিস্ময়ান্বিত হইয়াছেন?

—আসল কথাটাই তো এখনো বলি নাই। একটি বিস্ময়ই আর সব কিছুকে ছাড়াইয়া বহুদূর গিয়াছে। শ্বেতাঙ্গজাতি এক অসাধ্য সাধন করিয়াছে। তাহারা এক মহাশক্তিশালী দৈত্যকে বন্দী করিয়া ভৃত্য করিয়াছে।

—মহাশয়, রহস্য না করিয়া একটু খুলিয়া বলিবেন কি?

—আমি ফারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষা করিয়াছি। উহাতে কতকগুলান অত্যুৎকৃষ্ট কিস্যা রহিয়াছে। একটির নাম কলসীর দৈত্যের কিস্যা। কলসীর মধ্যে বন্দী এক দানবকে মুক্ত করিয়া এক ব্যক্তি তাহার সাহায্যে যাবতীয় কর্ম করাইয়া লইত। য়ুরোপে গিয়া দেখিলাম, তাহা অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী এক দৈত্য এখন শ্বেতাঙ্গদের দাস। সেই দৈত্যের নাম বাষ্প। আপনারা কল্পনা করিতে পারেন কি, এক বিশাল লৌহ শকট, যাহাতে শতশত লোক বসিতে পারে, সেই শকট বাষ্পে টানিয়া লইতেছে? সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য বটে। বিলাতের কয়েক স্থলে এই শকট চলিতেছে, ইহার গমন পথকে রেইল রোড কহে। আমি জার্মানির কলোন নগরীতে, বিলাতের ম্যানচেষ্টারে স্বয়ং এই রেইলযোগে গমনাগমন করিয়াছি। সে যে কী বিস্ময়!

উপস্থিত ইওরোপীয়দের অনেকেরই রেলওয়ে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। বাঙালীরাও যে বাষ্পচালিত রেলের কথা আগে শোনেনি, তা নয়, সংবাদপত্রে প্রায়ই এ বিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ থাকে, কিন্তু দ্বারকানাথ স্বচক্ষে রেলগাড়ি দেখে প্রায় যেন শিশুর মতন মুগ্ধ। নিউ ক্যাসেল-এ কয়লাখনি পরিদর্শন করতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে সেখানেও কয়লা উত্তোলনের ব্যাপারে বাষ্পশক্তির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে, কয়লা বহন করা হচ্ছে রেলগাড়িতে। বাংলাদেশে রানীগঞ্জে সর্বশ্রেষ্ঠ কয়লাখনির প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকানাথ নিউ ক্যাসেল-এ গিয়ে আফসোস করেছিলেন, যদি তাঁর নিজের দেশেও কয়লা চালানের এমন সুবিধা থাকতো! এ দেশে রেললাইন পাতা যায় না?

দ্বারকানাথ বললেন, শুধু রেইলগাড়ি কেন, বাষ্প আরও কত অদ্ভুত কর্ম করিতেছে। আমি দেখিলাম, বাষ্পশক্তির সাহায্যে সংবাদপত্র মুদ্রিত হয়, ব্যাঙ্ক নোট মুদ্রিত হয়।

একজন কেউ মন্তব্য করলো, জাহাজেও আজিকালি তো বাষ্প কল লাগান হইতেছে।

দ্বারকানাথ বললেন, লিভারপুলে আমি জাহাজ নির্মাণ কারখানাও দেখিতে গিয়াছিলাম। বিলাত গমনের পূর্বেই আমার দুইখানি জাহাজ নির্মাণের জন্য ফকেট কম্পানিকে বরাৎ দেওয়া ছিল। আমি স্বচক্ষে দেখিলাম, সেই জাহাজ-

দ্বয়ের এঞ্জিন নির্মিত হইতেছে। আমার আত্মীয়-বান্ধবদের আগ্রহে ও অনুরোধে একটি জাহাজের নামকরণ হইয়াছে, আমার নামে। সেই 'দ্বারকানাথ' জাহাজের এঞ্জিন তিন শো পঞ্চাশ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট। কল্পনা করুন একবার, সার্ধ তিনশত অশ্বের স্থান লইয়াছে শুধু বাষ্প। তাহা হইলে সে কত বড় দৈত্য?

ঈষৎ রঙীন নেশায় সকলে হঠাৎ চটপট করে করতালি ধ্বনি দিয়ে উঠলো।

গল্পে গল্পে ঘন হয়ে এলো রাত। দ্বারকানাথের ভ্রমণ বর্ণনা সাহেব ও নেটিভ উভয় দলের কাছেই খুব আকর্ষণীয়। এই প্রথম কোনো সম্ভ্রান্তবংশীয় নেটিভ ইওরোপ পরিভ্রমণ করে এসে চাক্ষুষ বিবরণ পেশ করছেন। এবং দ্বারকানাথ যে সব কিছুরই প্রশংসা করছেন, তা নয়। এবং দ্বারকানাথের বর্ণনার মধ্যে খুব সূক্ষ্মভাবে একটা কথাও ফুটে উঠছে যে ভারতের সম্পদ আহরণ করেই ইংলণ্ডের এতখানি উন্নতি। সাহেবরাও এই প্রথম একজন নেটিভের মুখ থেকে তাদের পিতৃভূমি সম্পর্কে নানা কথা শুনছে। এই এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। এবং সবচেয়ে বড় কথা, নেটিভ হয়েও এই ব্যক্তি এমন এমন স্থানে গমন করেছে, যেখানে যাওয়ার সুযোগ তাদের নিজেদেরই হয় না।

প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যেতে যেতে কথা একটু অপ্রিয় দিকে বাঁক নিল এক সময়। সুরার প্রভাবে কারুর কারুর ব্যবহার আরও সুমিষ্ট হয়, কারুর বা ভেতরের তিক্ততা বেরিয়ে আসে।

'ফ্রেন্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার জনৈক লেখক হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, শ্রীযুক্ত ঠাকুর, আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, ইংলণ্ড, গৌরবোজ্জ্বল ইংলণ্ড আপনাকে মুগ্ধ করিয়াছে। আপনি কি সেখানে পুনরায় যাইতে পারিবেন?

দ্বারকানাথ দৃঢ়ভাবে বললেন, নিশ্চয়। ফিরিবার পথেই আমার মনে হইতেছিল যে কত কিছুই দেখা হইল না। অতৃপ্তি রহিয়া গেল। আবার আসিব। অনেক নবলব্ধ বন্ধুবর্গকে বলিয়া আসিয়াছি, আবার আসিব।

—কিন্তু আপনি ব্রাহ্মণ হইয়া নিষিদ্ধ কালাপানি পাড়ি দিয়াছেন, আপনার সমাজ আপনাকে জাতিচ্যুত করিবে না? এ বিষয়ে যে একটি আন্দোলন উঠিয়াছে, তাহা আমরা জানি। আপনাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে নিশ্চয়? ইহা কি সত্য যে হিন্দুশাস্ত্র মতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে গেলে গোময় আহার করিতে হয়?

কেউ কেউ হেসে উঠলো, কেউ কেউ হাসি গোপন করলো। ভ্রূকুঞ্চিত করে দ্বারকানাথ একটুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। 'ফ্রেন্ড অফ ইণ্ডিয়া' মাঝে মাঝেই তাঁকে কুটুস কুটুস করে দংশন করে। অবশ্য বিলাত যাত্রার প্রাক্কালে তারা অভিনন্দন জানিয়েছিল। এখন এই ব্যক্তি তাঁর বেদনার জায়গায় ঘা দিয়েছে। এতকাল ধরে তিনি কত ব্রাহ্মণের ভরণপোষণ করেছেন, তিনি কল্পনাও করতে পারেননি যে এঁরা কখনো তাঁর বিরুদ্ধে যাবে। অথচ এঁরাই এখন তাঁকে সমাজচ্যুত করার জন্য কলকোলাহল শুরু করেছে। মূর্খ ও সংস্কারসর্বস্ব ব্রাহ্মণদের তিনি আজকাল দু' চক্ষে দেখতে পারেন না। হিন্দুধর্ম আর কতকাল কূপমণ্ডূক হয়ে রইবে? দেশ-বিদেশের জ্ঞান আহরণ, মানুষের সৃষ্ট এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য দর্শনেরও বাধা সৃষ্টি করে এই মূর্খরা!

ধীর গম্ভীর স্বরে দ্বারকানাথ প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্যে বললেন, আপনি নিশ্চয়ই জ্ঞাত আছেন যে পরলোকগত রাজা রামমোহন রায় ছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু। তাঁহার আদর্শে আমি এই সকল ক্ষুদ্র সংস্কার বর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছি। এ সমাজ যদি আমাকে পরিত্যাগ করে, তবে আমি স্বয়ং সুখী চিত্তে পৃথক সমাজ গড়িব। সে সাধ্য আমার রহিয়াছে।

—আপনার পরিবারের সকলে আপনার পক্ষে যাইবে কি?

দ্বারকানাথ একবার প্রসন্নকুমারের দিকে তাকালেন। তাঁর এই জ্ঞাতিভ্রাতা তাঁকে পরিত্যাগ করেনি। প্রসন্নকুমারের পিতা রামমোহন-দ্বেষী ছিলেন কিন্তু প্রসন্নকুমার রামমোহনের মুক্তচিন্তার অনুসারী। অথচ, দুঃখের বিষয়, তাঁর নিজের পিতৃব্য ও ভ্রাতারা সর্বাংশে তাঁকে সমর্থন করেননি, ম্লেচ্ছ-সংসর্গ দোষের জন্য তাঁরাও দ্বারকানাথের প্রায়শ্চিত্তের দাবি জানিয়ে গুনগুন করছেন।

দ্বারকানাথ বললেন, নিজ পরিবারের মধ্যে সাময়িক মনান্তর হয়ই, তাহাতে গুরুত্ব দিবার কিছু নাই। তবে আবার আপনাদের বলিতেছি, আমি কদাচ প্রায়শ্চিত্ত করিব না। আমি কোনো দোষ করি নাই, বরং দেশবাসীর সম্মুখে একটি মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছি।

—আপনার সুযোগ্য পুত্র বাবু দেবেন্দ্র কি আপনার সমর্থক? আমরা জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি কতখানি নিঃসঙ্গ?

—আমার পুত্র...অবশ্যই সে আমার সমর্থক...অদ্যকার উৎসব সার্থক করিবার ভার তো তাহারই উপর।

প্রকোষ্ঠের বাইরে অপেক্ষমান ভৃত্যদের উদ্দেশ্যে গলা চড়িয়ে দ্বারকানাথ বললেন, ওরে, কে আচিস? দেবেন্দ্রকে একবার ডাক তো!

কেউ কোনো সাড়া দিল না।

অঙ্গের শালখানির একপ্রান্ত মাটিতে লুটিয়ে দ্বারকানাথ চলে এলেন দ্বারের পাশে। তাঁর ব্যক্তিগত দুজন ভৃত্য সেখানে নিথরভাবে দাঁড়িয়ে।

তিনি রুক্ষস্বরে বললেন, দেবেন্দ্র কোথায়? সে এখানেই ছেল না?

ভৃত্য দুজন অত্যন্ত ভীত স্বরে বললো, আজ্ঞা না হুজুর।

—সে কি বৈঠকখানা বাড়িতে রয়েচে? যা দেকে আয়। আমার নাম করে বলবি এখুনি আসতে।

ভৃত্য দুজন তড়িৎগতিতে ছুটে চলে গেল। তবু ওদের ব্যবহারে কেমন একটা খটকা লাগলো দ্বারকানাথের মনে। কয়েক বছর আগের একটি ঘটনা তাঁর মনে পড়লো।

তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, রক্তের ঝলক এসে গেল তাঁর মুখে। তিনি কক্ষের অভ্যাগতদের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনারা বিশ্রম্ভালাপ করুন, আমি অবিলম্বে আসিতেছি।

জুতো মসমসিয়ে দ্বারকানাথ সেতু পার হয়ে চলে এলেন বৈঠকখানা বাড়ির দিকে। তাঁর ললাটে কুঞ্চন রেখা। ফোয়ারার সামনে আর কয়েকজন ভৃত্যকে দেখে তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, তোরা কেউ দেবেন্দ্রকে দেকিচিস?

ভৃত্যেরা উত্তর দিতে সাহস পায় না। তারা কর্তাবাবুর মেজাজ জানে। ওঁর অপছন্দমত সত্য কথাও উনি একেবারে সহ্য করতে পারেন না। ভৃত্যেরা সবাই জানে কর্তাবাবুর বড় ছেলে এখানে নেই, তবু তারা খোঁজ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ছুটে গেল। দেবেন্দ্রবাবু যাবার সময় ভৃত্যদের এবং বৈকুণ্ঠ নায়েবকে বলে গেছেন যে বাবামশাইকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয়, তিনি সুস্থ বোধ করছেন না, তিনি চলে যাচ্ছেন।

বৈকুণ্ঠ নায়েব দূর থেকে দ্বারকানাথকে দেখেই দ্রুত উদ্যানের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো। দ্বারকানাথ নিজে 'দেবেন্দ্র' 'দেবেন্দ্র' বলে ডাকতে ডাকতে প্রতিটি কক্ষে উঁকি দিতে লাগলেন। তারপর যখন তিনি বুঝলেন, তাঁর পুত্র বেলগাছিয়া ভিলার কোথাও নেই, তখন তাঁর মুখখানি বিবর্ণ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে তিনি

বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন উন্মুক্ত আকাশের তলায়।

বৎসর কয়েক আগে বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ডের ভগিনী মিস ইডেনের সম্বর্ধনার উদ্দেশ্যে তিনি এই বেলগাছিয়া ভিলাতেই মহাসমারোহের সঙ্গে এক ভোজের আয়োজন করেছিলেন। সেদিনও তিনি দেবেন্দ্রকে দিয়েছিলেন পরিচালনার ভার। পুত্রকে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে এইসব উৎসবের অর্থব্যয় কখনো বৃথা যায় না। ব্যবসা ও জমিদারি পরিচালনার জন্য মান্যগণ্য রাজপুরুষদের সঙ্গে সৌহার্দ্য রাখলে অনেক সুবিধে হয়। সেদিনও দেবেন্দ্র তার কাজে অবহেলা করেছিল, এক সময় দেখা গিয়েছিল যে সে অনুপস্থিত।

কিন্তু আজও সে চলে গেছে? অতিথিরা এ-কথা জানলে সকলের সামনে তাঁর মাথা হেঁট হয়ে যাবে। তাঁর পুত্র পিতৃগৌরব সম্পর্কে উদাসীন!

পুত্রের মতিগতি তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। কলেজ ছাড়ার পর দেবেন্দ্র হঠাৎ অত্যন্ত বেশী বাবুয়ানি শুরু করেছিল। সে সংবাদ দ্বারকানাথের কানে গেলেও তিনি বাধা দেননি। তিনি বুঝেছিলেন, বয়েসকালে ও দোষ কেটে যাবে। একবার দেবেন্দ্র এমনই এক সরস্বতী পুজোর ধুম লাগালো যে সারা শহরে গাঁদা ফুল আর সন্দেশ বাকি ছিল না, সবই এসেছিল ঠাকুরবাড়িতে। এতটা বাড়াবাড়ি দ্বারকানাথ পছন্দ করেননি। পুজো উপলক্ষে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করার চেয়ে যে এইরূপ ভোজের আসরের উপযোগিতা বেশী, তা দেবেন্দ্র বুঝবে না। দেবেন্দ্রর চপলমতি কিছুটা সংশোধন করার অভিপ্রায়ে দ্বারকানাথ ছেলেকে ব্যাঙ্কের হিসাব রক্ষকের কাজে লাগিয়ে দিলেন।

দ্বারকানাথ লক্ষ করেছেন, দেবেন্দ্র সাহেব-সুবোদের সঙ্গে খুব একটা সংসর্গ করতে চায় না। সে ইংরেজিতে কিছু কাঁচা, সে তো শিক্ষক রেখে কিছুদিনের মধ্যেই আয়ত্ত করে নেওয়া যেতে পারে। দেবেন্দ্র বুদ্ধিমান যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পিতা এ দেশের শিরোমণি, জজ ম্যাজিস্ট্রেট থেকে শুরু করে উচ্চতম পদের ইংরেজের সঙ্গে যাঁর শুধু পরিচয় নয়, বন্ধুত্বের সম্পর্ক, তাঁর পুত্র পারতপক্ষে ইংরেজদের সংস্পর্শেই যেতে চায় না। দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রকে কার টেগোর কোম্পানির অংশীদার করে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর অবর্তমানে দেবেন্দ্র সাহেবদের সঙ্গে মিলেমিশে সে কোম্পানি চালাবে কী করে?

দেবেন্দ্রর সেই সাময়িক বাবুয়ানি ঘুচে গেছে। কিন্তু তার পরিবর্তে যা শুরু করেছে, তার চেয়ে বাবুয়ানি ছিল ভালো। বড় মানুষের ছেলে মাঝে মাঝে আমোদ-আহ্লাদ করবে সেটাই তো স্বাভাবিক, অথচ দেবেন্দ্র এখন দিনরাত সংস্কৃত চর্চা করে, আর কী এক পাঠশালা স্থাপন করে তাই নিয়ে মেতে আছে। একদিন তিনি এজন্য শাস্ত্রী মশায়কে ধমক দিয়েছিলেন। এতবড় বিষয় সম্পত্তির তদারকি করতে হবে যাকে, সে কেন ঐসব অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার নিয়ে পড়ে থাকছে! প্রবাস থেকে ফিরে তিনি এমন কথাও শুনেছেন যে কোনো কোনোদিন দেবেন্দ্র নাকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেদারায় বসে থাকে, নাওয়া খাওয়ার ব্যাপারেও হুঁশ নেই, কেউ ডাকলেও সাড়া দেয় না। এসব কিসের লক্ষণ?

দ্বারকানাথ নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকালেন। তাঁর মুখে বেদনার গাঢ় ছায়া। তাঁর ধারণা ছিল, তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই সব কিছু সঙ্ঘটিত হবে। কিন্তু আজ নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ হলো। সামান্য অবস্থা থেকে কত কঠোর পরিশ্রমে ও জেদে তিনি প্রায় একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করেছেন। কিন্তু কী লাভ হলো? ইংরেজ পুরুষটি প্রশ্ন করেছিল, তিনি আজ কতটা নিঃসঙ্গ। বস্তুত, তাঁর মতন নিঃসঙ্গ মানুষ বুঝি আর কেউ নেই! পিতা নেই, মাতা নেই, সহধর্মিণীও

কয়েক বৎসর আগে গত হয়েছেন। আত্মীয় পরিজনরা তাঁর প্রতি হিংসুক। প্রিয়তম পুত্রকে তিনি নিজের আদলে গড়বেন ভেবেছিলেন, কিন্তু সে দূরে দূরে সরে থাকে, কখনো নিজে থেকে এসে ঘনিষ্ঠ বাক্য বলে না। বাড়ির সকলে তাঁকে সমীহ করে, ভয় করে, যেন তিনি একটা বাঘ। একটা স্নেহের কথা বলার মতন কেউ নেই। দেবেন্দ্র কি তাঁর জীবন প্রণালীর প্রতি অবজ্ঞা পোষণ করে?

দ্বারকানাথ অভিমানের সঙ্গে চিন্তা করলেন, তাহলে আর বাণিজ্য ও সমৃদ্ধির জন্য এত শ্রম করে কী হবে? তাঁর জীবন তো শুষ্কই থেকে যাবে। মনে পড়লো, প্রবাসের দিনগুলি কত মনোরম ছিল। কত অভ্যর্থনা, কত স্তুতি। তিনি যেখানেই গেছেন, সকলের দৃষ্টি ঘিরে থেকেছে তাঁকে।

অর্থ উপার্জন তো অনেক হয়েছে, আর নয়, দ্বারকানাথ সংকল্প করলেন যতশীঘ্র সম্ভব তিনি আবার সাগরপাড়ের দেশের উদ্দেশ্যে ভেসে পড়বেন। এ পোড়া দেশের জন্য আর মস্তক ঘর্মাক্ত করে লাভ কী?



জোড়াসাঁকোর বাড়ির সম্মুখের অলিন্দে একটি আরাম কেদারায় বসে আছেন দেবেন্দ্র। সময় প্রায় মধ্যরাত্রি, সমস্ত গৃহটি অন্ধকার। বাতাসে ধারালো শীতের ভাব, কিন্তু দেবেন্দ্র শুধু পিরানের ওপর একটা মুগার চাদর জড়িয়ে আছেন, অন্তরের চাঞ্চল্যের জন্য তাঁর এখন শীতবোধ নেই।

দেবেন্দ্র এখন ছাব্বিশ বৎসর বয়স্ক যুবা পুরুষ। সবল, দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, আয়তচক্ষু। কিন্তু তাঁর মুখখানিতে বিষাদের ছায়া মাখা। মাথার ওপরে নক্ষত্র-খচিত নীলাকাশ, তিনি মধ্যে মধ্যে সেদিকে চোখ তুলে দেখছেন। এইরূপ আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি প্রায়ই প্রগাঢ় প্রশান্তি বোধ করেন, কিন্তু আজ মন কিছুতেই যেন স্ববশে আসছে না।

একটু আগেই তিনি বেলগাছিয়ায় তাঁর পিতার বিলাসপুরী থেকে চলে এসেছেন। এর ফলাফল কতদূর গড়াবে কে জানে। তাঁর পিতা সিংহবিক্রম পুরুষ, তাঁর অনুগতরা কেউ তাঁর ইচ্ছাবিরুদ্ধ কাজ করছে, এ তিনি কিছুতেই সহ্য করেন না। কিন্তু দেবেন্দ্র আর কোনোক্রমেই থাকতে পারছিলেন না সেখানে, তাঁর অসহ্য বোধ হচ্ছিল। অতগুলি মানুষ নিছক লঘু আমোদে মত্ত। নৃত্য, গীত আর অবিরাম সুরার স্রোতে কারুর ক্লান্তি নেই। সেখানে অবস্থানের সময় একটি কথা বার বার দেবেন্দ্রর মস্তিষ্কে ঘুরছিল। কথাটি আছে কঠোপনিষদে। "প্রমাদী ও ধনমদে মূঢ় নির্বোধের নিকট পরলোক সাধনের উপায় প্রকাশ পায় না। ইহলোকই আছে, পরলোক নাই—যাহারা এ প্রকার মনে করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ আমার বশে (অর্থাৎ মৃত্যুর বশে) আসে।" চেষ্টা করেও দেবেন্দ্র কিছুতেই কথাগুলি মন থেকে বিতাড়ন করতে পারছিলেন না, ক্রমে দামামা ধ্বনির মতন এর প্রতিটি শব্দ যেন আঘাত করছিল তাঁকে। তিনি প্রায় দৌড়ে চলে এলেন সেখান থেকে।

পিতা ক্রুদ্ধ হবেন। তবু আজ দেবেন্দ্রর জীবনে একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নেবার সময় এসেছে। তিনি আজ সাবালক, তবু তাঁর পিতা তাঁকে সর্ববিষয়ে উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে চালিত করতে চান। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ইউনিয়ন

ব্যাঙ্কে বসে টাকাকড়ি গণনা করতে করতে তাঁর চিত্ত বিকল হয়ে যায়, তবু তাঁর পিতার আদেশে তাঁকে সেই কর্মই করতে হবে। পিতা চান সম্পদে ও ক্ষমতায় ভারতীয়দের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করবেন এবং তাঁর প্রিয়তম পুত্র তাঁর ছত্র-ছায়ায় থেকে এই অভিপ্রায় সিদ্ধির সহায়তা করবে। বস্তুতান্ত্রিক পিতা একেবারেই রাখেন না পুত্রের মনের খবর। প্রৌঢ় দ্বারকানাথ জানেন না তরুণ দেবেন্দ্রর মনে জেগেছে ঐহিক সম্পদের বদলে পারত্রিক জ্ঞানের জন্য আকুলতা। কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদন যেমন জানতেন না তাঁর তরুণ পুত্র যুবরাজ শাক্য সিংহের বৈরাগ্য অনুভূতির কথা।

জীবনের উদ্দেশ্য কী?

এই প্রশ্ন দেবেন্দ্রর মনে এসেছিল এমনই এক মধ্য রাত্রে, গঙ্গার তীরে। এ জগতে সবচেয়ে যাঁকে তিনি ভালোবাসতেন, তাঁর সেই ঠাকুরমা তখন মৃত্যু-পথযাত্রিনী। এই ঠাকুরমা দেবেন্দ্রকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন, শুনিয়েছেন কত রূপকথা, কত পুরান কাহিনী। ঠাকুরমাকে আনা হয়েছে অন্তর্জলী যাত্রার জন্য, শুইয়ে রাখা হয়েছে কাঁচা ঘরে। অর্ধেক শরীর তীরের ওপরে, পা দু-খানি জলমগ্ন, একদল কীর্তন গায়ক সেই মুমূর্ষুর কানে হরিনাম শোনাচ্ছে।

সেখান থেকে একটু দূরে একটা চাঁচের ওপর বসেছিলেন দেবেন্দ্র। তখন বয়েস একুশ, কী এক কার্যোপলক্ষে দ্বারকানাথ সে সময় এলাহাবাদে, দেবেন্দ্র সর্বক্ষণ রয়েছেন পিতামহীর সঙ্গে। গঙ্গার স্রোতের কুলুকুলু ধ্বনি, বাতাসে ভেসে আসা কীর্তনের সুর, মাথার ওপর জ্যোৎস্নাধৌত অনন্ত আকাশ—এইসব মিলেমিশে এক বিচিত্র অনুভূতি হলো তাঁর।

তিনি নিজেকেই প্রশ্ন করলেন, জীবনের উদ্দেশ্য কী?

তিনি এ দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনীর সন্তান, তাঁর অঙ্গুলি হেলনে যে-কোনো বিলাসদ্রব্য মুহূর্তে চলে আসবে তাঁর কাছে, ভোগের পরাকাষ্ঠা তিনি দেখিয়ে যেতে পারেন। কিছুদিন সব কিছুই চেখে দেখেছেন। কিন্তু এই ভোগবিলাস ও মৃত্যু, এই কি জীবনের চরম পরিণতি? পশুর জীবনের সঙ্গে এ জীবনের পার্থক্য কী? এ জীবন আর কি কোনো বৃহত্তর মহত্তর আনন্দের স্বাদ পাবার যোগ্য নয়?

শোক ও সংশয় নিয়ে বসে থাকা সেই একাকী যুবকের মনে হঠাৎ যেন একটা দিব্য আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। আকাশের জ্যোৎস্নায় যেন ধুয়ে গেল তাঁর চিত্ত। জীবনের উদ্দেশ্য কী, সে উত্তর তিনি তখুনি পেলেন না। কিন্তু এই নিশ্চিন্ত উপলব্ধি হলো যে, এই ভোগমত্ততাই জীবনের সব নয়। ঐশ্বর্য, আড়ম্বর, অপরের ওপর প্রভুত্ব করার দাপট, এসব অতি তুচ্ছ। সামান্য যে চাঁচের ওপর তিনি বসেছিলেন সেটাই যেন তাঁর যোগ্য স্থান, গালিচা দুলিচা সব হেয় বোধ হলো।

শেষ রাত্রে তিনি বাড়ি ফিরলেন, কিন্তু ঘুম হলো না। সারা শরীরের প্রবাহিত আনন্দে তিনি ছটফট করতে লাগলেন।

পরদিন সকালে আবার তিনি পিতামহীকে দেখতে এলেন শ্মশানঘাটে। বৃদ্ধার আজ শেষ সময় উপস্থিত। সকলে ধরাধরি করে তাঁকে গঙ্গাগর্ভে নামিয়ে চিৎকার করছে "গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম"। দেবেন্দ্র জলে নেমে পাশে দাঁড়ালেন, তাঁর চোখে অশ্রু নেই। তখন দ্বারকানাথের পালিকা-জননী, পুণ্যশীলা অলকাদেবী প্রিয়তম নাতির দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে একটি হাত নিজের বুকে রাখলেন, অন্য হাতের একটি আঙুল উঁচু করে ওপরের দিকে ঘোরাতে ঘোরাতে "হরিবোল" বলে ইহলোক ছেড়ে চলে গেলেন। দেবেন্দ্রর মনে হলো যেন

ঠাকুরমা ঈশ্বর ও পরকালের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন তাঁকে।

ঠাকুরমার শ্রাদ্ধের পর কল্পতরু সাজলেন দেবেন্দ্র। যে যা চায়, সবই তিনি বিলিয়ে দেবেন। সংক্ষিপ্ত বিলাসের আমলে যত সাজ-সজ্জা অলঙ্কার তিনি প্রিয়বোধে সংগ্রহ করেছিলেন, সে সব কিছু থেকে আবার মুক্ত হতে চান। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যারা সামান্য সুখ নিয়ে মত্ত, তাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। এক একজন এক একটি দ্রব্য হাতে তুলে বলছে, নেবো? তিনি তৎক্ষণাৎ মাথা হেলিয়ে বলছেন, নাও। এক একজনের দু-হাতেও জিনিস ধরে না। তাঁর একজন জ্যাঠতুতো ভাই নিয়েছে তাঁর জড়ির পোষাক, দেয়াল থেকে খুলে নিচ্ছে মূল্যবান সব ছবি, তবু তার লোভ যায় না। শ্বেত মর্মরের টেবিল, আবলুষ কাষ্ঠের কৌচ এগুলোর দিকে চেয়েও সে জিজ্ঞেস করে, নেবো? দেবেন্দ্র ক্ষণমাত্র দ্বিধা না করে বললেন, নাও! সে তখন মুটে ডেকে সব নিয়ে গেল।

শ্মশানে যে তীব্র আনন্দ হয়েছিল, তা বেশীদিন স্থায়ী হলো না। আবার এক দুঃখবোধ তাঁকে ঘিরে ধরলো। তিনি নেতি পেয়েছেন, কিন্তু অস্তি পাননি। কিসে সুখ নেই, তা বুঝেছেন, কিন্তু যাতে চিরসুখ ও চিরশান্তি তা অবলম্বন করতে পারছেন না। ঈশ্বর অনন্ত সুখের আকর, কিন্তু ঈশ্বর কে? তিনি কোথায়? কী তাঁর স্বরূপ?

প্রথম বয়েসে উপনয়নের পর তিনি মন দিয়ে শালগ্রাম শিলার পূজা দেখতেন। তখন বোধ হতো ঐ শিলাই ঈশ্বর। দুর্গাপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, সরস্বতী পূজায় তিনি আর পাঁচজনের মতই মেতে উঠতেন। প্রতিদিন কলেজে যাবার পথে ভক্তিভরে প্রণাম করতেন ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী দেবীকে, অপরাপর বালকদের মতন তিনিও পরীক্ষার আগে দুরুদুরু বক্ষে দেবীর কাছে পাশ করার বর প্রার্থনা করতেন। তখন জানতেন যে শালগ্রাম শিলার মতনই দশভুজা দুর্গা বা চতুর্ভুজা সিদ্ধেশ্বরী—সবই ঈশ্বরের প্রকাশ।

এখন বুঝতে পারছেন, এই সব কাষ্ঠ লোষ্ট্র দিয়ে গড়া মূর্তি কখনো ঈশ্বর হতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের স্বরূপ কী? নব্য বঙ্গীয় যুবকরা এই কাষ্ঠ লোষ্ট্র পূজায় তিতিবিরক্ত হয়ে অনেকেই নাস্তিকতার দিকে ঝুঁকেছে, আবার অনেকে খৃষ্টীয় ধর্ম বরণ করে নিচ্ছে। দেশের ভালো ভালো মেধা চলে যাচ্ছে খৃষ্টীয় ধর্মের দিকে। কিন্তু দেবেন্দ্র চান নিজেই নিজের ঈশ্বরকে খুঁজে বার করতে।

এই অনুসন্ধানের যাতনা যে কী তীব্র, তা আর অন্য কে বুঝবে? বিষয় কর্মে একেবারেই মন টেঁকে না। মানুষের সংসর্গও ভালো লাগে না। এক একদিন অফিস ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যান, নৌকোয় গঙ্গা পার হয়ে চলে আসেন শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে। এ স্থান অতি নির্জন। কিড সাহেবের স্মৃতিস্তম্ভের ওপর একাকী বসে থেকে তিনি মনের বিষাদ অপনয়নের চেষ্টা করেন। কিছুতে যায় না সে বিষাদ। রোদ্দুরের রঙ-ও তাঁর ঘোর কালো বলে বোধহয়।

তীব্র অনুসন্ধিৎসায় তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শন গ্রন্থগুলি মন্থন করতে লাগলেন। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে হিউম ও লকের দর্শনের খুব প্রতিপত্তি। এঁরা জড়বাদ ও সংশয়বাদের প্রবক্তা। আমাতেই আমি-র শেষ। আগুনের যে পোড়াবার ক্ষমতা আছে তা চিরসত্য কে বলেছে? আমি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অগ্নিকে প্রত্যক্ষ করি, তার দাহিকা শক্তি আমি অনুভব করি, কিন্তু যেখানে আমি নেই, সেখানেও অগ্নির দাহিকা শক্তির কথা আমি স্বীকার করবো কী করে? মানুষের মন একটা শূন্য পাতা, সেখানে শুধু অভিজ্ঞতার আঁচড় পড়ে। সমস্ত জ্ঞানই আমাদের

অভিজ্ঞতা, এ ছাড়া আর কোনো জ্ঞান নেই। এই জড়বাদ দেবেন্দ্রকে তৃপ্তি দেয় না।

প্রকৃতিবাদীরা আবার অন্য কথা বলে। প্রকৃতির অধীনতাই মানুষের সর্বস্ব। এ তত্ত্বে শিউরে ওঠেন দেবেন্দ্র। প্রকৃতির অধীনতাই মানুষের সর্বস্ব? এই পিশাচীর পরাক্রম দুর্নিবার।...এই পিশাচী প্রকৃতির হাতে তো কারুর নিস্তার নেই। এর কাছে নতশিরে বসে থাকাই যদি চরম কথা হয়, তাহলে আর আশা কৈ ভরসা কৈ?

সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেও তিনি তৃপ্ত হন না। মাঝে মাঝে একটু একটু যেন আলোক দেখতে পান, আবার হারিয়ে যায়। মনের বিষাদ আর কিছুতেই দূর হয় না। তারপর একদিন অকস্মাৎ এলো সেই উন্মোচনের মুহূর্তটি।

একদিন তিনি উপর মহলের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছেন, এমন সময় দোতলার বারান্দায় দেখলেন কোনো একটি বইয়ের ছিন্ন পৃষ্ঠা উড়ছে। কৌতূহলী হয়ে তিনি কাগজটি তুলে নিলেন। তাতে কিছু সংস্কৃত শ্লোক লেখা আছে। দেবেন্দ্র মোটামুটি সংস্কৃত ভাষা রপ্ত করেছেন, কিন্তু সেই শ্লোকের অর্থ বুঝতে পারলেন না।

সংস্কৃত চর্চার জন্য তিনি একজন গৃহশিক্ষক রেখেছিলেন। সেই শ্যামাচরণ পণ্ডিতকে ডেকে তিনি বললেন, দেখুন তো, এই পৃষ্ঠাটি কোথা থেকেই বা এলো এবং এতে যা মুদ্রিত রয়েছে, তার অর্থই বা কী?

পণ্ডিত ভ্রূ কুঞ্চিত করে রইলেন। এই শ্লোক তাঁর কাছেও অপরিচিত, সঠিক অর্থ তাঁর কাছেও পরিষ্কার হচ্ছে না।

দেবেন্দ্র তখন বেশী দেরি করতে পারছেন না। সকাল দশটা বেজে গেছে, এখন তাঁর ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে যাবার কথা। তিনি না গেলে ক্যাশ খোলা হবে না। পণ্ডিতকে বললেন, আপনি এর অর্থ করে রাখুন, আমি বৈকালে এসে দেখবোখন।

অফিসে গিয়েও তিনি সর্বক্ষণ ছটফট করতে লাগলেন। নিদারুণ ঔৎসুক্যে তাঁর মর্মপীড়া হতে লাগলো। কোথা থেকে এলো ঐ কাগজটা, কী ওতে লেখা আছে? দ্বিপ্রহরের পর আর থাকতে পারলেন না তিনি। অন্য একজনকে ক্যাশ বুঝিয়ে দিয়ে তিনি দ্রুত গৃহে ফিরে এলেন।

শ্যামাচরণ পণ্ডিতের মুখখানি তখনও মলিন। তিনি শ্লোকের অর্থ উদ্ধার করতে পারেননি। খানিক ইতস্তত করে তিনি বললেন, আপনি বরং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে ডাকাইয়া লউন। আমার মনে হয় এসব ব্রহ্মসভার কথা!

ব্রহ্মসভার নাম শুনেই দেবেন্দ্রর বুক ধড়াস করে উঠলো। সেই ব্রহ্মসভা এখনো আছে? কে চালায়? রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ? হ্যাঁ তাও তো বটে, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁরই পিতার বেতনভুক। তৎক্ষণাৎ তিনি বিদ্যাবাগীশকে ডাকতে পাঠিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন।

রামমোহন ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একেশ্বরবাদীদের উপাসনার জন্য। হিন্দু, ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান সকলেই এতে যোগ দিতে পারবে। বিদ্যাবাগীশ তার আগে থেকেই রামমোহনের সঙ্গে আছেন। তাঁর ইচ্ছে এই সভার পক্ষ থেকে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম প্রচার করা হোক। রামমোহন রাজি হননি। নতুন ধর্মের

প্রয়োজন নেই, সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই যারা নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসক, তাদের মিলনই চেয়েছিলেন তিনি। তাঁর উপস্থিতিতে সেখানে সব ধর্মের লোকেরাই আসতো। সন্ধ্যেবেলা ফিরিঙ্গি ও মুসলমান বালকেরা ইংরেজি ও ফারসি ভাষায় স্তব গান করে যেত। বিষ্ণু ও কৃষ্ণ নামে দুই গায়ক ধরতেন গান, তাঁদের সঙ্গে পাখোয়াজ সঙ্গত করতেন গোলাম আব্বাস। বালক দেবেন্দ্র রামমোহনের পাশে বসে শুনতেন।

ব্রহ্মসভার জন্য আলাদা গৃহ নির্মাণ করেছিলেন রামমোহন। কিন্তু বছর দু-এক এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার পর তিনি পাড়ি দিলেন ইংলণ্ড। আর ফিরলেন না। রামমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ নিষ্ঠাবান হিন্দু, পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী, পিতার এই ধর্মসভাকে টিঁকিয়ে রাখার ব্যাপারে তিনি আগ্রহী হলেন না। এই সভা বন্ধই হয়ে যেত, কিন্তু এগিয়ে এলেন দ্বারকানাথ। সারা দেশ রামমোহনের বিপক্ষে, ব্রহ্মসভা স্থাপনের পর থেকেই হিন্দু ধর্ম যায় যায় রব উঠেছিল, গোঁড়ার দল পাল্টা সভা স্থাপন করেছিল। সুতরাং বিবাদ এড়াবার জন্য দ্বারকানাথ রামমোহনের মতে পুরো মত মেলাননি। তবে বন্ধুর একটি বাসনা বা বাতিককে সম্মান প্রদর্শন করতে চেয়ে তিনি বললেন যে, ব্রহ্মসভা যদি চলে তো চলুক, তিনি এর ব্যয়ভার বহন করবেন।

দেবেন্দ্রনাথের মনে পড়লো একটি দিনের কথা। বালক বয়েসে তিনি মাণিক-তলায় রামমোহন রায়ের গৃহে প্রায়ই যেতেন। একবার তিনি গিয়েছিলেন রাজাকে দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণ করতে। দেবেন্দ্র যেই বললেন, 'রামমণি ঠাকুরের বাড়িতে আপনার দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণ', অমনি চমকে উঠলেন রাজা। তিনি বললেন, 'আমাকে পূজায় নিমন্ত্রণ?' তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এত প্রতিবাদ করছেন, তবু লোকে তাঁকে পূজায় ডাকে? রামমোহন তাঁর বন্ধুপুত্র দেবেন্দ্রকে সম্বোধন করতেন 'বেরাদর' বলে। তিনি বললেন, বেরাদর, আমাকে নয়, আমার পুত্র রাধাপ্রসাদকে নিমন্ত্রণ করো গে।

"আমাকে পূজায় নিমন্ত্রণ?" সেই বিস্মিত স্বর যেন দেবেন্দ্রর কানে আবার ভেসে উঠেছিল, অথচ অনেকদিন ভুলে ছিলেন মাঝখানে। আর একটা কথাও মনে পড়লো তাঁর। বিলাত যাত্রার কিছুক্ষণ আগে রামমোহন এসেছিলেন দ্বারকা-নাথের কাছে বিদায় নিতে। খানিক কথাবার্তার পর তিনি বলেছিলেন, দেবেন্দ্র কোথায়? দেবেন্দ্রকে ডাকো। তার কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে আমি যাবো না।

কিশোর দেবেন্দ্র এলে রাজা সাগ্রহে তার হাত চেপে ধরেছিলেন। সেই ব্যবহারের কোনো গূঢ় অর্থ ছিল কি? রাজা কি বোঝাতে চেয়েছিলেন, বেরাদর দেবেন্দ্র, আমি তোমার পিতাকে জানি। তিনি বৈষয়িক লোক। কিন্তু আমার কার্যভার তুমি লও!

অথচ প্রমোদে প্রমাদে সে কথা ভুলে ছিলেন দেবেন্দ্র। প্রবাসে রাজার মৃত্যুর পর দু-একবার মাত্র ব্রহ্মসভায় গিয়েছিলেন তিনি। নিছক কৌতূহল বশে। সেখানে তখন দারুণ দৈন্য দশা। প্রবল জেদে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ একাই সেখানকার দীপ জেবলে রেখেছেন। আর একজন দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ সেখানে উপনিষদ পাঠ করেন। কোনো কোনো দিন তিনি না এলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ নিজেই একমাত্র উপাসক। নিজেই উপাচার্য এবং নিজেই শ্রোতা। বৃষ্টি বাদলার দিন কিছু লোক এমনিই হঠাৎ ঢুকে পড়ে সেখানে। তাদের কারুর হাতে বাজার ভর্তি ধামা, কারুর হাতে টিয়াপাখি। উৎসাহিত হয়ে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উপদেশ শুরু করে দেন, শ্রোতারা গোল গোল চক্ষু করে শোনে এবং বৃষ্টি থামা মাত্র হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে চলে

যায়।

এসব দেখে কৌতুক বোধ করেছিলেন দেবেন্দ্র। আর যাননি। মধ্যে কয়েক বৎসর তিনি ব্রহ্মসভার কথা একেবারেই বিস্মৃত হয়ে ছিলেন।

ডাক পেয়ে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ জোড়াসাঁকোয় ঠাকুরবাড়িতে এসে দেবেন্দ্রর সামনে আসন গ্রহণ করলেন। যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনের পর দেবেন্দ্র প্রশ্ন করলেন, মহাশয়, এই ছিন্ন পৃষ্ঠাটি কোন্ গ্রন্থের? এই শ্লোকের অর্থ আপনি আমার নিকট ব্যাখ্যা করতে পারেন কি?

বিদ্যাবাগীশ পৃষ্ঠাটি পরীক্ষা করে বললেন, ইহা তো ঈশোপনিষদের শ্লোক। ব্রহ্মসমাজ সংকলিত গ্রন্থ হইতে ছিন্ন হইয়াছে। এ কাগজ এ স্থলে আসিল কী প্রকারে?

দেবেন্দ্র বললেন, তাহা আমি জানি না। আপনি শ্লোকের অর্থ আমাকে বুঝিয়ে দিন।

বিদ্যাবাগীশ শ্লোকটি উচ্চারণ করলেন।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং॥

তারপর প্রথমে বললেন, আক্ষরিক অর্থ। ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত জগৎকে আচ্ছাদন করো। তিনি যাহা দান করেছেন, তাহাই উপভোগ করো।

এবার শুরু করলেন ব্যাখ্যা। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ—তিনি যাহা দান করিয়াছেন, তাহাই উপভোগ করো...তিনি কী দান করিয়াছেন? তিনি আপনাকেই দান করিয়াছেন। সেই পরম ধনকে উপভোগ করো। আর সকল ত্যাগ করিয়া সেই পরম ধনকে উপভোগ করো...

দেবেন্দ্র যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ খুঁজছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, ঈশ্বরকে কোথায় পাবেন? এখন শুনলেন ঈশ্বরের দ্বারাই সমুদয় জগতকে আচ্ছাদন করো। তিনি আপনাকেই দান করেছেন—এর থেকে বেশী মানুষ আর কী চাইতে পারে?

এই উড়ন্ত কাগজ যেন এক দৈববাণী বহন করে আনলো তাঁর কাছে। অভিভূতের মতন উঠে গিয়ে তিনি বিদ্যাবাগীশকে প্রণাম করলেন।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশও ব্যাকুল হয়ে খুঁজছিলেন একজন মন্ত্রশিষ্যকে। দেবেন্দ্রর মধ্যে তিনি তাকে পেয়ে গেলেন। এক প্রচারকের সঙ্গে মিলন হলো এক মুমুক্ষুর।

তাঁর এই নবলব্ধ জ্ঞানের চর্চা ও প্রসারের জন্য দেবেন্দ্র কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন তত্ত্বরঞ্জিনী সভা। দ্বিতীয় বৎসর সেই সভার নাম বদলে হলো তত্ত্ববোধিনী। বাড়ির একতলার একটি অন্ধকার ঘরে বসে এর অধিবেশন, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ নিয়মিত এখানে এসে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম বিষয়ে নানান উপদেশ দেন। দেবেন্দ্র ভেবেছিলেন এ কাজ চলবে তাঁর পিতার অজ্ঞাতসারে। কিন্তু তীক্ষ্ণধী দ্বারকানাথের কাছে কিছুই গোপন থাকে না। একদিন তিনি বেদান্তবাগীশকে ডেকে ধমক দিয়ে বললেন, একেই তো দেবেন্দ্রর বিষয়বুদ্ধি অল্প, তার ওপর তার মাথায় ব্রহ্ম ব্রহ্ম ঢুকিয়ে যে তার সর্বনাশ কচ্চো!

দেবেন্দ্র পিতার এই ভ্রূকুটি মান্য করলেন না। তত্ত্ববোধিনী সভার তরফ থেকে প্রকাশিত হলো পত্রিকা, স্থাপিত হলো বিদ্যালয়। বাণিজ্য-রাজ দ্বারকানাথের

পুত্র হয়ে তিনি মেতে রইলেন নিছক যত অ-বাণিজ্যিক কাজে। এমন কি একবার তত্ত্ববোধিনী সভার সাম্বৎসরিক উৎসবে কলকাতায় তাঁদের পরিবারের যতগুলি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অফিস আছে তার সমস্ত কর্মচারীদের নামে তিনি আলাদা করে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠালেন। তত্ত্ববোধিনী সভা ততদিন পর্যন্ত ছিল অনেকটা গুপ্ত ধরনের ব্যাপার, মাত্র একশত দেড়শত লোকের জ্ঞাত ছিল এ খবর। কর্মচারীরা ও সভার নামই শোনেনি, এমন কি নাম শুনেও অর্থ বুঝতে পারলো না। অবশ্য মালিকপুত্রের নিমন্ত্রণই আদেশের সমান, এসে উপস্থিত হলো সকলেই। শঙ্খ, ঘণ্টা ও শিঙা বাজিয়ে রাত্রি আটটায় দরজা খোলা হলো সভাকক্ষের। লাল রঙের বনাত গায় দিয়ে দশ জন দশ জন করে দুই সারিতে বিশ জন দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ সমস্বরে করলেন বেদপাঠ। তারপর দেবেন্দ্র পুতুল পূজার পরিবর্তে নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের তত্ত্ব ব্যাখ্যান করলেন। এরপর আরও বক্তৃতা। একের পর এক। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ একাই লাগিয়ে দিলেন দু ঘণ্টা। রাত দুটোর পর কর্মচারীরা বিমূঢ় বিহ্বল অবস্থায় বাড়ি ফিরলো। এ সব কী কাণ্ড হচ্ছে ওখানে, কিছুই তাদের মাথায় ঢুকলো না। কিন্তু তাতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো দেবেন্দ্রর। তিনি তত্ত্ববোধিনী সভাকে প্রকাশ্যে, জনসমক্ষে নিয়ে এলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই দেবেন্দ্র বুঝলেন, তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রহ্মসমাজকে আলাদা করে রেখে লাভ নেই। দুই সভারই উদ্দেশ্য যখন এক, তখন একসঙ্গে মিলে যাওয়াই ভালো। তত্ত্ববোধিনী সভার মাসিক উপাসনা হতে লাগলো ব্রহ্ম-সভার উপাসনার সঙ্গে মিলিয়ে।

এই পর্যন্ত এগিয়ে দেবেন্দ্র একটু থমকে ছিলেন। রামমোহনের ব্রহ্মসভার সঙ্গে প্রকাশ্যে একাত্মতা স্থাপনের বহু রকম প্রতিকূলতা দেখা দেবার সম্ভাবনা। শুধু হিন্দুসমাজের কাছ থেকেই নয়, নিজেদের পরিবার থেকেও। স্বয়ং পিতা কী বলবেন ঠিক নেই। দ্বারকানাথ পুত্রকে মুখে রূঢ় বাক্য বলেন না, কিন্তু সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণে তিনি অবিচল।

কিন্তু দেবেন্দ্র তখনও অস্থির হয়ে আছেন। তাঁর নির্মল চিত্তে কোনোরূপ ছলনার স্থান নেই। বহুকালাবধি প্রচলিত ধর্মীয় আচার, সংস্কার ও পূজা পার্বণ সম্পর্কে তাঁর মন বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছে। একথা সকলকে না জানানো পর্যন্ত তাঁর স্বস্তি নেই। যে সত্যের সন্ধান তিনি পেয়েছেন, সেই সত্যের স্বাদ তিনি দিতে চান অন্যকে। এই সত্য সাধনা যেন পৃথক এক ধর্ম, এর প্রচার প্রয়োজন। এবং তারও আগে প্রয়োজন এক ধর্মীয় দল স্থাপনের। দেশের মানুষকে খৃষ্টানী থেকে দূরে সরিয়ে আনার জন্য এই নব ধর্মের প্রচার ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এ ব্যাপারেই দ্বিধায় দুলছিলেন তিনি। বেলগাছিয়া ভিলা থেকে অকস্মাৎ চলে এসে বারান্দায় একলা বসে থেকে তাঁর বারংবার মনে হতে লাগলো, বৃথা সময় চলে যাচ্ছে। তাঁর পিতার বাহ্য আড়ম্বর ও জাঁকজমকের বিরুদ্ধে তাঁর একটা প্রতিবাদ রাখা দরকার। জীবনের উদ্দেশ্য নয় পার্থিব জগতে সবার ঊর্ধ্বে ওঠা, জীবনের উদ্দেশ্য সত্যের প্রতিষ্ঠা।

জ্যোৎস্নাময় আকাশের দিকে চেয়ে তিনি প্রেরণা চাইলেন, তাঁর মনে বল এলো, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ মনে মনে একটি শপথ নিয়ে নিলেন।

৭ই পৌষ দেবেন্দ্র তাঁর কুড়িজন বন্ধুর সঙ্গে এক নতুন ধর্মে দীক্ষা নিলেন। ব্রাহ্মসমাজের যে নিভৃত কুঠুরীতে বেদ পাঠ হতো, সেই কুঠুরী ঢেকে ফেলা হলো পর্দা দিয়ে, মধ্যে একটি বেদী, তার ওপরে বসলেন বৃদ্ধ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।

সেদিন বৃহস্পতিবার, দুপুর তিনটের সময় দেবেন্দ্র অফিস ছেড়ে চলে এসেছেন। বিদ্যাবাগীশকে তিনি বললেন, হে আচার্য, বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম ধর্মব্রত গ্রহণ করিবার জন্য আমরা সকলে আপনার নিকট উপনীত হইয়াছি।...যাহাতে আমরা অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারি, যাহাতে সৎকর্মে আমাদের প্রবৃত্তি হয় এবং পাপ মোহে মুগ্ধ না হই, এরূপ উপদেশ দিয়া আমাদের সকলকে মুক্তির পথে উন্মুখ করুন।

বিদ্যাবাগীশের চক্ষে অশ্রু এসে গেল। বহুদিন পর তাঁর স্বপ্ন সফল হতে চলেছে।

বয়েস অনুসারে প্রথমে শ্রীধর ভট্টাচার্য, পরে শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য এগিয়ে গিয়ে বেদীর সামনে প্রতিজ্ঞা পাঠ করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন। তৃতীয় ব্রাহ্ম হলেন দেবেন্দ্রনাথ। তারপর তাঁর ভাই গিরীন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়কুমার দত্ত ও অন্যান্যরা। দীক্ষান্তে নবীন ব্রাহ্মরা প্রত্যেকে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন। এক সামাজিক বিপ্লব ঘটতে চলেছে যে, সেই সচেতনতা থেকে তাঁদের শরীরে রোমাঞ্চ হতে লাগলো।

দেবেন্দ্র সকলকে বললেন, পূর্বে ব্রাহ্মসমাজ ছিল। এখন ব্রাহ্মধর্ম হইল। ব্রহ্ম ব্যতীত ধর্ম থাকিতে পারে না এবং ধর্ম ব্যতীতও ব্রহ্ম লাভ হয় না।

এইভাবে রামমোহনের আদর্শ থেকে কিছু বিচ্যুত হয়ে বিদ্যাবাগীশ ও দেবেন্দ্র সূচনা করলেন এক পৃথক ধর্মের। রামমোহন চেয়েছিলেন সর্বধর্মের মধ্য থেকে সংস্কারমুক্ত একেশ্বরবাদী মানুষগুলিকে এক জায়গায় এনে জড়ো করতে, সেইজন্যই তিনি পৃথক নাম দিয়ে কোনো ধর্ম প্রচার করতে চাননি। আর দেবেন্দ্র স্থাপন করলেন, শুধু উচ্চবর্ণের হিন্দু ভদ্র সমাজের জন্য এক বিদ্রোহী ধর্মের। অবশ্য রামমোহনের মতটি ছিল একটি তত্ত্ব মাত্র, আর দেবেন্দ্রর অধ্যক্ষতায় নব-প্রতিষ্ঠিত ধর্মটি বাস্তব পথ নিল অচিরেই।

সিংহদের অট্টালিকার নীচমহলের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দিবাকরের স্ত্রী সোহাগ-বালার হাতে।

দিবাকর এ বাড়ির গোমস্তাই শুধু নয়, রামকমল সিংহের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ। সে দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করার কাজে পরম দক্ষ। আপনভোলা রামকমল সিংহকে সে পোস্তার হাটে বিক্রয় করে আবার কুলিবাজার থেকে ক্রয় করে আনার ক্ষমতা রাখে, নেহাৎ বিধুশেখরের তীক্ষ্ণ নজরের জন্যই তা সম্ভব হয় না। বিধুশেখরকে দিবাকরের মতন ধুরন্ধর ব্যক্তিও ডরায়। দিবাকর যে তার স্বগ্রাম জয়নগরে পাকা কোঠাবাড়ি বানিয়েছে এবং প্রতি বছরই বিঘের পর বিঘে জমি খাস করে ভূসম্পত্তি বাড়াচ্ছে, তা বিধুশেখরের অজানা নেই। বিধুশেখর মনে করেন, চাকর-কর্মচারীদের খানিকটা চুরির প্রশ্রয় না দিলে ঠিক কাজ আদায় করা যায় না। তবে মাঝে মাঝে হুঁশিয়ারি দিতে হয়।

অকস্মাৎ হয়তো একদিন দিবাকরকে ডেকে বিধুশেখর বলেন, এবার গাঁয়ে গিয়ে কি পুকুর কাটালে নাকি হে, দিবাকর?

দিবাকর কেঁপে ওঠে। এ বুড়োর কানে সে খবরও পৌঁছে গেছে? তার পশ্চাতে কাকে যে চর লাগানো হয়েছে, তা দিবাকর কিছুতেই ধরে উঠতে পারে না।

বিধুশেখর হাত তুলে তাকে অভয় দিয়ে বলেন, তা বেশ করেচো। গাঁয়ে একজন পুকুর কাটালে পাঁচজনের উবগার হয়। তা পুকুর উচ্ছুগ্যু করতে হয় জানো তো? কার নামে উচ্ছুগ্যু করলে?

দিবাকর চট করে উত্তর দেয়, আজ্ঞে, আমাদের কত্তার নামে!

—পাগল হোয়েচো নাকি! জ্যান্ত মানুষের নামে উচ্ছুগ্যু হয়? কেন, তোমাদের গৃহদেবতা নেই? পুকুর কেটোচো আর মা কালীর প্রতিষ্ঠা করোনি?

দিবাকররা বৈষ্ণব। তাদের বাড়িতে কালী পুজো হয় না, এমনকি অন্যত্র ঐ অনুষ্ঠানে সে প্রণাম দিতেও যায় না।

সে বললো, সাত পুরুষ ধরে আমাদের বাড়িতে নারায়ণের পুজো হয়।

—বলোনি তো সে কতা আগে কখনো। থাউকো খাতায় তোমার নামে পঞ্চাশ টাকা লিখিয়ে নিও, আমি রামকমলকে বলে দেবোখন। সেই টাকায় ঠাকুরের মাতায় একটা সোনার মুকুট গড়িয়ে দিও!

দিবাকর বুঝতে পারে না, বিধুশেখর কোন্ দিক থেকে প্যাঁচটা কষলেন। তবে এটা যে এক প্রকার সতর্কীকরণ, তা বুঝতে কোনো ভুল হয় না। পুকুর কাটার খরচ কোথা থেকে জোগাড় করলো, সে প্রশ্ন না তুলে অযাচিতভাবে পঞ্চাশ টাকা বখশিস! দিবাকর চলে ডালে ডালে তো বিধুশেখর চলেন পাতায় পাতায়।

কিন্তু অন্দরমহলের নীচতলায় সোহাগবালার ক্রিয়াকলাপের হদিশ বিধুশেখরও পান না। সেটা একটা পৃথক জগৎ।

বাড়িতে শুধু দাসদাসীর সংখ্যাই আঠারো, এছাড়া রয়েছে নিজস্ব রজক, গোয়ালা, মালি, পাচক, দ্বারবান, পাল্কি-বেহারা ও সহিস। দাসদাসীরা পৃথক পৃথক কাজের জন্য নির্দিষ্ট। খোদ কর্তার জন্য তিনজন, গিন্নীমার তিনজন, দুই পুত্রের জন্য চারজন, এছাড়া কর্তার বিধবা ভ্রাতৃবধূ, পিসী ইত্যাদির জন্যও একজন করে রয়েছে। একজন অন্যের কাজ করবে না। এই তো কর্তার মা মারা গেলেন গত বছর, তাঁর দুজন নিজস্ব দাসী এখনো রয়ে গেছে। পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকে, তাদের জন্য কাজ খালি নেই।

এ বাড়িতে দুই হেঁসেল। একটি ওপরতলার কর্তাদের জন্য, অন্যটি আশ্রিত পরিজন ও দাসদাসীদের। এর মধ্যে দ্বিতীয় হেঁসেলটি সম্পূর্ণ সোহাগবালার করায়ত্তে। সোহাগবালার দাপটে তার মুখের ওপর কেউ রা কাড়তে পারে না।

বাড়ির পেছনে মস্ত বাগান, গোয়াল ঘর ও পুষ্করিণী। বাগানের এক পাশে সারি সারি গোলপাতার ঘর, তার পেছনে কয়েকটি খাটা পায়খানা। ঐ গোলপাতার ঘরগুলি দাসদাসীদের। তার একটি ঘর থেকে প্রতিনিয়ত কান্নার স্বর ভেসে আসে।

গঙ্গার ঘাট থেকে বিম্ববতী এক মা আর ছেলেকে কুড়িয়ে এনেছেন। স্ত্রীলোকটির স্বামী হারিয়ে গেছে আর মেয়ে মারা গেছে শুনে চক্ষের জল ফেলেছেন তিনি। তারপর সোহাগবালাকে ডেকে নির্দেশ দিয়েছেন, এখন থেকে ওরা এ বাড়িতেই থাকবে।

প্রথম দিন থেকেই ওদের অপছন্দ করেছে সোহাগবালা। নতুন কোনো আশ্রিত এলেই তার এই মনোভাব হয়। অন্যান্য আশ্রিতরাও বিষচক্ষে দেখলো থাকোমণি

আর দুলালচন্দ্রকে। আশ্রিতদের ধর্মই এই, ওপর মহল থেকে করুণা কণা পাবার প্রতিযোগিতায় তারা পরস্পরকে হিংসে করে। মরে গেলেও একজন আর একজনকে সাহায্য করবে না।

নবাগতদের শায়েস্তা করবার জন্য সোহাগবালার নিজস্ব কিছু প্রক্রিয়া আছে। গিন্নীমা তো কয়েকদিনের মধ্যেই ওদের কথা ভুলে যাবেন। তখন সোহাগবালা ওদের ওপর এমন অত্যাচার চালাবে যে কিছুদিনের মধ্যেই ওরা বাপ বাপ বলে পালাবার পথ পাবে না। তবে প্রথম কয়েকদিন একটু তোয়াজ করতে হবে, হঠাৎ গিন্নীমার টনক নড়লে আর রক্ষে নেই। মাগীটা দিনরাত পা ছড়িয়ে বসে ডুকরে ডুকরে অলক্ষ্মণের মতন কাঁদে। আর যেন কারুর স্বামী হারায় না দুনিয়ায়। আর যেন কারুর মেয়ে মরে না। স্বামীটা হারিয়েছে না ওদের ফেলে পালিয়েছে তার ঠিক কী? আর ছেলেটাও মায়ের পাশে বসে ঘ্যানোর ঘ্যানোর করে। খেতে ডাকলেও আসে না। যেন নবাবের বেটী, ওদের ঘরে গিয়ে খাবার দিয়ে আসতে হবে।

লোক পাঠিয়ে ছেলেটাকে জোর করে ধরে আনালে সোহাগবালা। খালি গা, সামান্য একটি নেংটি পরা, বছর ছয়েক বয়েস দুলালচন্দ্রের, শরীরে এখনো গ্রাম্য শ্যাওলা লেগে আছে মনে হয়। চোখ দুটি জলে-পড়া বালকের মতন।

দালানে একটা ছোট জলচৌকির ওপর বসে সোহাগবালা, সামনে পানের সরঞ্জাম ছড়ানো। প্রতিদিন সকাল থেকে দু' প্রহর বেলা পর্যন্ত এখানে বসে থেকে সে সর্বদিকে তীক্ষ্ন নজর রাখে আর মুখের মধ্যে সমানে পানের জাবর কাটা চলতে থাকে। তার শরীরখানি অতিশয় পৃথুলা, পাতলা শাড়ি ভেদ করে তার বিশাল দুই বুক ও কোমরের চর্বির স্তর স্পষ্ট দেখা যায়। ফর্সা মুখখানিতে যেন গনগনে চুল্লির আঁচ।

দুই ভৃত্য দুলালচন্দ্রকে ধরে এনে সামনে দাঁড় করাবার পর সোহাগবালা একবার আপাদমস্তক দেখলো তাকে, তারপর পাশের পিকদানিতে লাল থুতু নিক্ষেপ করে বললো, তোরা মায়ে পুতে ভেবেচিস কী, অ্যাঁ? ডেড় মাস হয়ে গেল, এখুনো বসে বসে কাঁদবি? হাতে করে কুটোটি নাড়ারও নাম নেই!

দুলালচন্দ্র ভয়ে সিঁটিয়ে রইলো। কী উত্তর দেবে সে জানে না।

সোহাগবালা বললো, এই, তোরা এই ছোঁড়াকে কাজে লাগিয়ে দে আজ থেকে। এক গামলা জল আর একটা ন্যাতা দে ওকে, এই দালানটা পুঁছুক।

যদিও একাজের জন্য অন্য লোক আছে, তবু দাসদাসীরা এই বালকটিকে কাজে নিয়োগ করতে বেশ উৎসাহী হয়ে উঠলো। তক্ষুনি এসে গেল মাটির গামলায় জল ও পাটের ন্যাতা। এক দাসী জলে ভেজানো ন্যাতাটা দুলালচন্দ্রের হাতে তুলে দিয়ে বললো, আবাগীর ব্যাটা ডাঁইরে ডাঁইরে দেকচিস কী! নে, পোঁছ! গোমস্তা-মা রেগে গেলে তোকে কাঁচা খেয়ে ফেলবেন!

দুলালচন্দ্র দালান মুছতে শুরু করে দিল। এ কাজে সে খুব একটা অসুখী হলো না, কারণ দিনের পর দিন অন্ধকার ঘরে বসে মায়ের কান্না শুনতে শুনতে তারও একঘেয়ে লাগছিল। এখানে তবু কতরকমের মানুষ।

উঠোনের ওপর ধপাস ধপাস করে ফেলা হলো দুটো বড় বড় কাতলা মাছ। মাছ দুটি দাপটের সঙ্গে লাফাতে লাগলো কয়েকবার। মস্ত বড় বঁটি নিয়ে বসে গেল দুজন। সোহাগবালা দূর থেকে বসে নির্দেশ দেয়, মুড়ো দুটো সরিয়ে রাখ... কত্তাবাবু বাড়ি নেই, ওপরের হেঁসেলে মুড়ো যাবে না। পেটি আর গাদার মাচ আলাদা রাখ, পরে টুকরোগুলো আমায় গুণে দেকাবি...দুর্যোধন, তুমি এখেনে

হাঁ করে ডাঁড়িয়ে কী দেকচো? দুধটা ক্ষীর করোচো? যাও আগে সেটা করো গে...হ্যাঁ লা পাঁচী, গিন্নীমার পাখিদের ছোলা দিইচিলি ওপরে? দিসনি এখনো... ওমা তোদের নিয়ে কি কর্বো...মরণ আমার...এক মণ ছোলা এয়েচে এ মাসে। এর মধ্যে ফুইরে গ্যালো...পাখির বদলে কি হাতিকে ছোলা খাওয়াচ্চিস?

পাঁচী উত্তর দিল, এক মণ কোতায় গো, ফড়ে মিনসে যে আদ মণ মেপে দিয়ে গ্যালো...। সোহাগবালা প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললো, তোর মাতা! চুনীর বাপ নিজে এক মণের কতা বলেচে, আমি নিজে দেকে নিইচি আর তুই আমায় চোখ ঠারাবি! ইদিকে আয়, আয় ইদিকে—

এইসব ডামাডোলের মধ্যে দুলালচন্দ্র এক কাণ্ড করে বসলো। জলভর্তি অত বড় মাটির গামলাটা সে টেনে টেনে সরাতে পারে না, একবার জোরে হ্যাঁচকা টান দিতেই সেটি উল্টে গিয়ে দ্বিখণ্ড হলো, সমস্ত জল গড়িয়ে গেল উঠোনে, মাছ-কাটা লোকগুলো, আ মোলো, আ মোলো বলে চেঁচিয়ে উঠলো।

সোহাগবালা বললো, দেকেই বুঝিচলুম অলুক্ষুণে ছেলে! দিলে তো সব নষ্ট করে। এই নকুড়, দে তো ওর কান ধরে দু' থাবড়া!

ছেলের টানে টানে এই সময় থাকোমণি এসে উপস্থিত সেখানে। তার ছেলে মার খাচ্ছে দেখে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং ছেলেকে সরিয়ে এনে জুড়ে দিল মড়াকান্না, ওগো, ওর বাপ নেই গো! ওর বাপকে খুঁজে দাও তোমরা—

সোহাগবালা বিস্ময়ে আতঙ্কে চোখ কপালে তুলে ফেললো একেবারে। মাগীর এত বড় সাহস, অন্দরমহলের দালানে এসে কাঁদছে! এই কান্নার শব্দ একবার ওপর মহলে পৌঁছোলে আর উপায় আছে?

সোহাগবালা বলে উঠলো, ওরে, মাগীটাকে শিগগির থামা, মুখে নুড়ো গুঁজে দে, ওর থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দে, কী সব্বনেশে রে বাবা, আমাদের সব্বাইকে ধমক খাওয়াবে।

সত্যিই দুজন ভৃত্য থাকোমণির মুখ চেপে ধরে চিৎ করে শুইয়ে ফেললো মাটিতে। থাকোমণি মুণ্ডকাটা পাঁঠার মতন ছটফট করতে লাগলো—

সোহাগবালা নিজের আসন ছেড়ে কখনো ওঠে না। আজ সেই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে ওদের কাছে এসে বললো, দ্যাকো বাছা, এ বাড়িতে যদি প্রাণ নিয়ে টিঁকতে চাও, তাহলে কক্ষনো টুঁ শব্দটি কর্বে না। ফের যদি কোনোদিন চিল্লানি শুনি তাহলে জ্যান্ত হাত পা বেঁধে পুকুরে ফেলে দোবো। এই বলে রাকলুক।

চাকর দুটি তাকে ছেড়ে দেবার পর থাকোমণি চোখের সামনে সেই ভীমা মূর্তি দেখে আর কথা বলার সাহস পেলো না। বিস্ফারিত চক্ষে তাকিয়ে রইলো। এরা যে যে-কোনো মুহূর্তে তাকে বা তার ছেলেকে মেরে ফেলতে পারে, এই বোধ তার তৎক্ষণাৎ হয়ে গেল।

সোহাগবালা আবার বললো, দ্যাকো তোমার ছেলের কিত্তি! সামান্য এই বারোণ্ডাটা পুঁছতে বলিচি আর অমনি এই গামলাটা ভেঙে ফেললে গা? এর দাম কে দেবে? গতর দিয়ে শুধতে পারো তো ভালো, নইলে তিনবেলা খাওয়া বন্দ।

অর্থাৎ সেদিন থেকে থাকোমণিকে লাগিয়ে দেওয়া হলো দালান মোছার কাজে। তিন মহলা বাড়ির একতলায় মোট আটটি দালান, সবই মুছতে হবে তাকে। ঠিক ঝকঝকে তকতকে হলো কিনা, তা দেখবার জন্য সোহাগবালা মাঝে মাঝেই এক একজনকে তদারকে পাঠায়। সে আবার নিজের কাজ দেখাবার জন্য অদৃশ্য ছোপের দিকে আঙুল নির্দেশ করে থাকোমণিকে পুরো দালানটি আবার

মুছতে বাধ্য করে। অথবা সে সোহাগবালার কাছে নালিশ জানায় যে থাকোমণি একই ময়লা জলে বারবার ন্যাতা ডোবায়, প্রত্যেকটি দালানে গিয়ে সে গামলার জল বদলে নেয় না।

বকুনি ও চড়চাপড় খেতে খেতে থাকোমণি ক্রমশ অভিজ্ঞ দাসী হয়ে উঠলো। সে বুঝে গেছে যে এ বাড়িতেই তার নিয়তি তার জন্য অন্ন বরাদ্দ করেছে। এ বাড়ির বাইরে সে এক পা দিতেও সাহস করে না। এই নগরীতে প্রথম দিন আসার স্মৃতি মনে পড়লেই তার বুক থরথর করে কাঁপে।

থাকোমণির বুকের অশ্রুসাগর শুকিয়ে গিয়ে এখন সেখানে খর মরুভূমি। সে আর কাঁদে না। সে আর তার স্বামী ত্রিলোচন দাসকে খুঁজে পাবে না, এমন বদ্ধমূল বিশ্বাস তার জন্মে গেছে। ভিনকুড়ি গ্রামের খালধারে একটি ছোট মাটির বাড়ি, তার স্বামী-শ্বশুরের ভিটে, পিছন দিকে এক লপ্তে ধান জমি, বাড়ির সামনে পাশাপাশি দুটি জাম গাছ, পেছন দিকে সার বাঁধা দু' গণ্ডা সুপুরি গাছ, একটি পারিবারিক গোরু, এবং বৃষ্টির দিনে এ সব কিছুরই ওপর কাছে নেমে আসা আকাশ! এ সবই এখন স্বপ্নের মতন মনে হয়, যেন গতজন্মে ছিল। সেই স্বাধীন জীবনে সে আর কোনোদিন ফিরে যাবে না, এই অচেনা বাড়ির দাসীগিরি করেই তার সারা জীবন কাটবে। সে দাসী অথবা বাঁদী। তার পুত্র তার বাপ-পিতামহের বৃত্তি যে চাষবাস, তা আর শিখবে না, সে-ও দাস হবে।

সারাদিন পরিশ্রমের পর থাকোমণি এক একদিন সন্ধ্যেবেলা তার ঘরের দরজার কাছে থুম হয়ে বসে থাকে। হয়তো তার মনে পড়ে ভিনকুড়ি গ্রামে তার নিজের সংসারের কথা, যত ছোটই হোক, তবু সে ছিল সেই সংসারের কর্ত্রী, যত অভাবই থাক, তবু ছিল একটা অনির্দিষ্ট সুখ বোধ। কার অভিশাপে, কোন্ পাপে সেই সব কিছু ছারখার হয়ে গেল, তা সে আজও বুঝতে পারে না। কেন জমিদারের লোক এসে তাদের বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিয়ে গেল একদিন? কেন তার স্বামী সেই রাত্রে জল আনতে গিয়ে আর ফিরলো না?

দুলালচন্দ্র অবশ্য এ সব আর ভাবে না কিছুই। বালকদের বাল্যস্মৃতি থাকে না। তারা উপস্থিতকে নিয়ে বাঁচে। মাকে একলা ফেলে সে এই সময় পুকুর ধারে গিয়ে হাঁসগুলিকে আ চৈ চৈ চৈ চৈ বলে ডাকে কিংবা একটা সদ্যোজাত বাছুরের পেছনে পেছনে অকারণে দৌড়োয়।

পাশাপাশি অন্য ঘরগুলিতে যে সব দাস-দাসীরা থাকে তাদের কারুর সঙ্গেই থাকোমণির ঘনিষ্ঠতা হয়নি। তারা এখনো থাকোমণির দিকে আড়চক্ষে তাকায় এবং কথার ছলে হুল ফোটায়। বাবুদের বাড়ি থেকে চুরি করা জিনিসপত্রের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে তারা সর্বক্ষণ ঝগড়ায় মেতে থাকে। বস্তুত, কোলাহল, কুকথা ও খেউড়ই তাদের জীবনের প্রধান ব্যসন। এদিককার গোলমাল বাবুদের মহলের ওপরতলা পর্যন্ত পৌঁছোয় না, তাই নিজেদের ঘরে এসেই তারা জিভের অর্গল খুলে দেয়।

এই সব অন্য দাস-দাসীরাও এসেছে কাছাকাছি গাঁ থেকে। যারা দু-এক পুরুষ আগে ভূমিহীন হয়ে শ্রমদাস হয়েছে, তারা অনেক পোড় খেয়ে এখন ঘাগী। ভৃত্যতন্ত্রে বেশী দিনের অভিজ্ঞতার জন্য তারা গর্বিত এবং এই জন্যই নতুন দাস-দাসীদের তারা অবজ্ঞা করে, নিজেদের গ্রামীণ পরিচয় মুছে ফেলে তারা থাকোমণির মতন স্ত্রীলোকদের মনে করে গাঁইয়া ভূত।

প্রাসাদের পিছনের এই ভৃত্য-উপনিবেশটিতে জন্ম, মৃত্যু কিছুই থেমে থাকে না। সব কিছু চলে আপন নিয়মে। বিবাহ এখানে একপ্রকার নিষিদ্ধ বলেই

ব্যভিচার চলে প্রবলভাবে। ওসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। একমাত্র ঝগড়ার সময়ই জানা যায় যে, কে কার নাঙ্ আর কোন্ মাগী শতেক ভাতারী। তবে ব্যভিচার যতই চলুক, কোনো নারীর পক্ষে গর্ভবতী হওয়া এখানে সাংঘাতিক অপরাধ। এবং সে দায় শুধু নারীদের বলেই সব শাস্তি তাদেরই প্রাপ্য। কেউ গর্ভবতী হলেই অমনি সেই গোলপাতার ঘরের অন্ধকারেও সমাজ এসে উঁকি মারে। বিধবা কিংবা কুমারীর পেটে সন্তান? ওকে দূর করে দাও, ওকে পিটিয়ে মারো! অন্য দাস-দাসীরাই সমাজের প্রতিনিধি হয়ে এই শোরগোল তোলে এবং যথাসময়ে সে কথা সোহাগবালার কানে ঠিক পৌঁছে যায়।

মাতু মাতু বলে একটি মেয়েকে ডাকে সবাই, তার আসল নাম কী, তা থাকোমণি জানে না। আঠারো উনিশ বছর বয়েস, হাতে লোহা নেই এবং সাদা থান পরে বলে বোঝা যায় সে বিধবা, সেই মাতু একদিন ধরা পড়ে গেল। তার পেট হয়েছে, সে নাকি বাগানে বসে একটা ভাঙা মাটির হাঁড়ির চাড়া কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খাচ্ছিল। তাহলে তো আর কোনো সন্দেহই নেই। ডুবে ডুবে জল খায় মেয়েটা, এতদিন কেউ কিছু টেরই পায়নি, আবার লোক দেখিয়ে একাদশীর দিন উপোস দেওয়া হতো! কার সঙ্গে হলো তোর আশনাই, বল? সবাই রসালো কাহিনীটি শুনতে চায়। মাতু প্রথমে কিছুতেই বলবে না। রান্নার ঠাকুর দুর্যোধন এই সব কথা বার করার ব্যাপারে খুব ওস্তাদ। মাতুর চুলের মুঠি ধরে সে তাকে দু-একবার শূন্যে তোলার চেষ্টা করতেই মাতুর প্রতিরোধ ভেঙে পড়লো। ভৃত্যদের মধ্যে কেউ নয়, রাখু নামে বাগানের মালিই মাতুর প্রেমিক। কোন্ রাখু? যে তিন মাস আগে ছুটি নিয়ে দেশে যাবার নাম করে পালিয়েছে। তবে তো সে বখেরা চুকেই গেল!

সন্ধ্যেবেলা দেয়ালগিরি আর রেড়ির তেলের লণ্ঠনগুলো জ্বালার আগেই অন্ধকার দালানে সোহাগবালা একগাছা মোটা দড়ি এনে দুজন ভৃত্যকে বললো, তোরা দু দিকে এটা ধর!

তারপর মাতুকে বললো, এবার লাপা। এদিক ঠেঙে লাপিয়ে এদিকে এসে পড়!

মাতুর তখন মধ্যপ্রদেশ রীতিমত স্ফীত। গমনাগমন আলস্য মাখা। সে হাপুস নয়নে কেঁদে বললো, আমি পারবো না, পারবো না, গোমস্তা-মা, তোমার পায়ে ধরচি।

সোহাগবালা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে সেই অন্ধকারেও যেন চোখ জ্বালিয়ে বললো, ঠেঙিয়ে তোর বিষ ঝেড়ে দোবো! হারামজাদী, তোর নজ্জা করে না! ফের কতা! লাপা বলচি, লাপা!

মাতু তখনও দ্বিধা করছে দেখে সোহাগবালা নিজেই ঠাঁই ঠাঁই করে দুখানা চড় মারলো তার গালে।

শাড়ি পরে লাফানো যাবে না বলে মাতুকে আগেই উলঙ্গ করা হয়েছে, এই অন্ধকারের মধ্যে কেউ তো দেখবে না, সুতরাং তার লজ্জারও কিছু নেই। আরও কয়েকবার চড়চাপড় খাওয়ার পর সে বাধ্য হয়েই লাফাতে শুরু করলো। সোহাগবালা গুণতে লাগলো, এক—দুই—তিন।

ভৃত্যদের শেখানো ছিল আগে থেকেই। প্রথমে নীচু করে ধরে থাকা দড়ি একটু একটু করে তোলা হতে লাগলো ওপরে। এবং এক একবার ইচ্ছে করেই হঠাৎ বেশী উঁচু করে মাতুর পায়ে জড়িয়ে দিতে লাগলো, যাতে সে ধপাস করে আছড়ে পড়ে মাটিতে। সেই রকম এক একবার মাতু পড়ে যায় আর সবাই

হেসে ওঠে।

একদিন পর একদিন বাদ দিয়ে এক পক্ষকালব্যাপী চললো এই ব্যায়াম প্রক্রিয়া। প্রথমদিন কুড়িবার, পরদিন পঁচিশ, তার পরদিন তিরিশ এইভাবে বাড়তে থাকে। কিন্তু এত করেও কিছু হলো না, মাতুর উদর হেতমপুরের কুমড়োর মতন ক্রমেই প্রকাণ্ড হতে লাগলো। সোহাগবালা মাতুর সেই স্থলে হাত রেখে অনুভব করে বোঝে যে মা-খাগী সন্তানটা দিব্যি নড়াচড়া করছে।

মাতু কেঁদেকেটে বলে, আমায় ছেড়ে দাও গো, গোমস্তা-মা। যেদিকে দু' চোখ যায় আমি চলে যাই। তারপর আমার কপালে যা আছে হবে।

এত বড় অনাচারের কথা শুনে সোহাগবালা থ হয়ে যায়। কাঁচা বয়েসের বিধবা, পেটে একটা সন্তান নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে? ওকে যে শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে! তাছাড়া, ধর্ম বলে কি কিছু নেই? যা খুশি করলেই হলো? মাতুর ভালোর জন্যই যে তার পেটের কাঁটাটা খসানোর চেষ্টা হচ্ছে, সে কথাও ও বোঝে না! ছোটলোকরা এমনই অকৃতজ্ঞ হয় বটে। সোহাগবালা বলে, তোর জিভ টেনে আমার ছিঁড়ে দিতে ইচ্ছে হয়, হারামজাদী! আগে এ কতা মনে ছেল না!

মাতুর পরবর্তী ব্যায়াম হলো গরম ভাতের ফ্যান ভর্তি গামলা মাথায় করে বয়ে নিয়ে যাওয়া। পেল্লায় আকারের গামলা, অত বড় জিনিসটা ভর্তি অবস্থায় একজনের পক্ষে বয়ে নিয়ে যাওয়াই দুষ্কর, সে গামলা তিনজন মিলে ধরাধরি করে চাপিয়ে দেয় মাতুর মাথায়, পুকুর ধার পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে ফ্যান ফেলে আসতে হবে। এর দু' রকম সুযোগ। একে তো অত ভারী জিনিস বইলেই পেটের জিনিস নষ্ট হয়ে যায়, তা ছাড়াও, গামলা থেকে ফ্যান ছলকে পড়বেই মাটিতে আর সেই ফ্যানের ওপর পা দিলেই মাতু পা হড়কে পড়ে যাবে। গরম ফ্যান সমেত গামলা নিয়ে পড়ে গেলে আর মাতুর নিস্তার আছে? ও যদিও বা প্রাণে বাঁচে, পেটেরটা কিছুতেই বাঁচবে না।

কিন্তু কোথা থেকে যেন অমানুষিক শক্তি পেয়ে গেছে মাতু। অত বড় গামলা সে ঠিক বয়ে নিয়ে যায়, এবং অসম্ভব জেদের ফলেই যেন এক ফোঁটা ফ্যানও ছলকে পড়ে না মাটিতে। দিনের পর দিন সে সোহাগবালা এবং অন্য সকলের প্রত্যাশা নষ্ট করে দেয়।

সোহাগবালা এবার নিল মোক্ষম ব্যবস্থা। আর দেরি করা চলে না, যে-কোনো দিন বাচ্চাটা ভূমিষ্ঠ হয়ে ট্যাঁ ট্যাঁ করতে পারে। চিত্তেশ্বরীর মন্দিরের কাছে একজন নামকরা দেয়াসিনী থাকে, তার কাছে এক বিশ্বস্ত ভৃত্যকে পাঠালো সোহাগবালা। সব দিক তো সোহাগবালাকেই সামলাতে হবে। কর্তাদের কানে যদি যায় যে, বাড়িতে বিধবা মেয়ে এমন অধর্ম করেছে, তাহলে তাঁরা সোহাগ-বালার ওপরেই দোষারোপ করবেন না? ঐ দেয়াসিনীর জড়িবুটি আগেও পরখ করে দেখা আছে সোহাগবালার, ফল একেবারে অব্যর্থ। ভৃত্যটি নিয়ে এলো কিছু শেকড়বাকড় আর তামাকের গুলির মতন কয়েকটি কালো কালো বড়ি। সব বেটে খাওয়াতে হবে একসঙ্গে, আর স্বাদের জন্য মেশাতে হবে একটু এখোগুড়। এরই জন্য মূল্য দিতে হলো নগদ তিনটি টংকা।

মাতুকে ক'দিন ধরে চোখে চোখে রাখা হয়েছে, তবু সে পালিয়ে গিয়ে বসেছিল পুকুর পাড়ে। সেখান থেকে ধরে এনে তিন-চারজন মিলে তাকে চেপে মাটিতে শুইয়ে আর দুজনে জোর করে তার ঠোঁট ফাঁক করে ঢেলে দিল সেই ক্বাথ। এবং এই প্রথম একটু নরম গলায় সোহাগবালা বললো, আর কোনো ভয়

নেই বাছা, চুপ করে ঘুমিয়ে থাক, কাল সকালেই পেট খালাস হয়ে যাবে, দু'দিন পরই আবার কাজকম্মো করতে পারবি।

সেই রাত্রেই মারা গেল মাতু। মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়েছে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে। শেষের দিকে সে ধড়ফড় করতে করতে বলছিল, ওগো, আমাকে একটু বাইরে নিয়ে যাও, আমি নাকে হাওয়া পাচ্ছি নি...ওগো...। কেউ নিয়ে যায়নি বাইরে। এক সময় সব শব্দ থেমে গেল। তার গর্ভের গোঁয়ার সন্তানটি তার পরেও কিছুক্ষণ বেঁচে ছিল কিনা কে জানে! হয়তো সে মাতৃগর্ভ ফুঁড়ে বাইরে আসবার চেষ্টা করেছিল, পারেনি।

এক দিন এক রাত সেই ঘরেই পড়ে রইলো মাতুর লাশ। তারপর ভোরবেলা ডেকে আনা হলো দুজন মুদ্দোফরাসকে। মাতুর দেহটা হোগলায় জড়িয়ে বাঁশে বেঁধে ঝুলিয়ে তারা ফেলে দিয়ে এলো গঙ্গায়। মাতুর ক্ষুদ্র জীবন কাহিনী এখানেই শেষ। কর্তাদের কানে এ খবর কিছুই পৌঁছোলো না। শুধু দিন সাতেক পরে বিম্ববতীর বড় জা হেমাঙ্গিনীর বাপের বাড়ি থেকে একজন আত্মীয় আসায় তার জন্য ধুতি কুচোতে দিয়ে হেমাঙ্গিনী তাঁর নিজস্ব দাসীকে বললেন, মাতু বলে একটা মেয়ে আচে না, তাকে ডাক বরং, সে বেশ ভালো কাপড় কুচোয়। হেমাঙ্গিনীর দাসী তখন সংবাদ দিল, সে তো নেই মা, সে মরে গ্যাচে! হেমাঙ্গিনী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ওমা, সে কী কতা! জলজ্যান্ত মেয়েটা ক'দিন আগেও দেখলুম যে! দাসী তখন ফিসফিস করে জানালো যে মাতু কলঙ্কিনী হয়ে বিষ খেয়েছে! হেমাঙ্গিনী নাক কুঁচকোলেন। এ সব অপবিত্র কথা কানে তোলাই পাপ। একটু পরেই তিনি প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন। ব্যস, মাতু একেবারে মুছে গেল ওপর তলা থেকে।

মাতুর পরিণতি দেখে খুব একটা বিস্মিত বা ভীত হয়নি থাকোমণি। তারও অভিমত এই যে, একে বিধবা, তায় কুলটা, এমন মেয়েমানুষদের তো এমন গতিই হয়। তবু যে পেটের সন্তানটাকে মেরে মাতুকে বাঁচিয়ে রাখার অনেক চেষ্টা করেছিল সোহাগবালা, তাতে প্রমাণিত হয় যে, বাইরে যতই বকাঝকা করুক, সোহাগবালার অন্তরে দয়ামায়া আছে। সে যাই হোক, কিন্তু ভূতের ভয় ধরে গেল থাকোমণির। মাতুর ঘরখানা ছিল তার পাশেই, এখনো সেটা খালি পড়ে আছে। থাকোমণি যখন-তখন মাতুকে দেখতে পায়। এক মুহূর্তে সে থাকোমণির দিকে চেয়ে ভয়ঙ্করভাবে হাসে, আবার পরের মুহূর্তেই মিলিয়ে যায়। এক একদিন মাঝ রাত্তিরে সে মাতুর ঘর থেকে গোঁ গোঁ শব্দ পায়। অমনি উঠে বসে থাকোমণি ভয়ে ঠকঠকিয়ে কাঁপে।

আশ্চর্য ব্যাপার, মাতুর প্রেতকে আর কেউ দেখতে পায় না। থাকোমণির চ্যাঁচামেচি শুনে অনেক সময় অন্য দাস-দাসীরা ছুটে আসে, মাতুর শূন্য ঘরে উঁকি মারে, কিন্তু কেউ কিছু প্রমাণ পায় না। এ বাড়িতে আগে থেকেই একটি বাঁধা ভূত আছে। সন্ধ্যের পর পাইখানার দিকে তাকে প্রায়ই দেখা যায়, অনেকেই দেখেছে। অধিকন্তু ন দোষায় হিসেবে মাতুর প্রেতকেও অনেকেই মেনে নিতে রাজি ছিল, কিন্তু কিছুতেই সে অন্যদের কাছে ধরা দেয় না। একমাত্র শুধু থাকোমণির সামনেই সে মাঝে মাঝে এসে হাজির হয়, বুক কাঁপানো স্বরে হি হি করে হাসে এবং তারপরই মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে বলে, ওগো, আমি নাকে হাওয়া পাচ্ছিনি, ওগো, আমায় একটু হাওয়া দাও...।

সেইজন্যই থাকোমণি সন্ধ্যেবেলা আর পারতপক্ষে ঘরের বার হতে চায় না। দুলালচন্দ্রকেও সে কাছে রাখতে চায়। কিন্তু দুলালচন্দ্র শুনবে কেন? একটু

সুযোগ পেলেই সে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে পালায়।

থাকোমণি কোনোদিন এ বাড়ির ওপর মহলে যায়নি। হুকুম নেই। বাড়ির কর্তা এবং গিন্নীমাদেরও সে দূর থেকে কয়েকবার মাত্র দেখেছে। স্বর্গে থাকেন দেবতারা, বাবুরাও প্রায় সেই রকমই দূরের মানুষ। অবোধ দুলালচন্দ্র কিন্তু দু' একবার চুপি চুপি ওপরে উঠে গেছে সিঁড়ি দিয়ে। সন্ধ্যের পর ঝাড়-লণ্ঠনগুলি যখন জ্বলে দোতলায়, তখন যেন ঠিক বাদলা পোকার মতন সেই আলোয় আকৃষ্ট হয়ে দুলালচন্দ্র ওপর মহলে একটু দেখতে যায়। এজন্য ওপর মহলের দাস-দাসীদের কাছ থেকে সে তাড়া খেয়েছে কয়েকবার।

একদিন সে নবীনকুমারের চোখে পড়ে গেল। চিন্তামণি নবীনকুমারকে সন্দেশ খাওয়াচ্ছিল এমন সময় কে রে? কে রে? বলে উঠলো। সিঁড়ির মুখে একটি বিহ্বল কালো বালকের মুখ।

নবীনকুমার বললো, ওকে ডাকো! ওকে ডাকো!

চিন্তামণির কথায় দুলালচন্দ্র এগিয়ে এলো কাছে। নবীনকুমার বাটি থেকে একটা সন্দেশ তুলে বললো, এই নে!

চিন্তামণি তাকে নিষেধ করতেই নবীনকুমার তীক্ষ্ন গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, হ্যাঁ দোবো! বেশ করবো! দুটো দেবো, তিনটে দেবো, চারটে দেবো!

নবীনকুমার নিজে থেকেই দুলালচন্দ্রকে বেছে নিল তার খেলার সাথী হিসেবে। যদিও তাদের বয়েসের বেশ তফাত। নবীনকুমারের সদ্য তিন পেরিয়েছে, দুলালচন্দ্রের সাড়ে ছয়। কিন্তু এ বাড়িতে তো আর কোনো অল্পবয়েসী ছেলে-মেয়ে নেই। নবীনকুমার তাকে নিয়মিত নিজের ভাগের সন্দেশ খেতে দেয়।

নবীনকুমারের খেলাগুলোও ভারী অদ্ভুত। কোনোদিন সে দুলালচন্দ্রকে মাটিতে শুয়ে পড়তে বলে। তারপর সে তার বুকের ওপর উঠে দাঁড়ায়। সে মা কালী সাজবে। দুলালচন্দ্রের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে সে দু' হাত ছড়িয়ে জিভ বার করে দেয়। কোনোদিন সে দুলালচন্দ্রকে উপুড় হয়ে শুয়ে ময়ূর সাজতে বলে। তখন তার পিঠের ওপর বসে নবীনকুমার হয় কার্তিক ঠাকুর। তার কোমরে গোঁজা কাঠের তলোয়ার।

সহজাত বুদ্ধিতেই যেন এই দুই শিশু জানে, কে প্রভু, কে ভৃত্য। দুলালচন্দ্র খুশী মনেই প্রভু-পুত্রকে পিঠে তুলে নেয় বা বুকে দাঁড়াতে দেয়। তার বদলে সে পায় অমৃতের আস্বাদযুক্ত সন্দেশ।

চিন্তামণি দাসী একদিন একটি সোনার বালা চুরি করে ধরা পড়েছিল। বিম্ববতী বহুদিনের বিশ্বস্ত পুরোনো দাসীকে সেই প্রথম অপরাধের জন্য ছাড়িয়ে দেননি বটে, কিন্তু ক্ষমা চাইয়ে নাকে খৎ দিইয়েছিলেন। সেই দৃশ্যটি নবীনকুমার দেখে ফেলে ও বেশ মজা পায়।

পরদিনই সে বললো, এই দুলাল, নাক খৎ দে তো!

দুলালচন্দ্র নাকে খৎ দিতে জানে না। তখন নবীনকুমারই তাকে দেখিয়ে দিল, এই যে, এমনি করে...।

সেই সময় তিনতলা থেকে নেমে এলো গঙ্গানারায়ণ। ছোট ভাইটিকে মাটির ওপর নাক দিয়ে থাকা অদ্ভুত ভঙ্গিতে দেখে হেসে ফেললো সে। ও কি, ছোট্কু! ও কি! বলে ভাইকে কোলে তুলে নিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে খুব প্রীতি করে গঙ্গানারায়ণ। তার দু' গালে হামি দিয়ে আদর করলো।

নবীনকুমার বললো, আমি নাকখৎ শেকাচ্ছি ওকে!

গঙ্গানারায়ণ হো হো করে হেসে বললো, ও নাকে খৎ দিতে জানে না, আর

তুই শিখে গেলি? এ তো ভারী মজার কথা!

গঙ্গানারায়ণের কোনো ব্যস্ততা ছিল, তাই বেশীক্ষণ না দাঁড়িয়ে সে চলে গেল।

নবীনকুমার দুলালচন্দ্রকে বললো, এইবার তুই দে!

দুলালচন্দ্র মেঝেতে একবার নাকটা ঠেকালো। কিন্তু এ খেলাটা তার ঠিক পছন্দ হলো না। সে বললো, না ছোটবাবু, অন্য খেলা বলো।

কিন্তু নবীনকুমারের জেদ। একবার কিছু ধরলে সে তো আর সহজে ছাড়বে না। অবিলম্বে তার চিৎকার শুনে দৌড়ে এলো চিন্তামণি। দুলালচন্দ্র নাকে খৎ দিতে রাজি হচ্ছে না শুনে সে বললো, হতচ্ছাড়া ছেলে, কতা শুনচিস নি? ছোটবাবু তোকে নাকে খৎ দিতে বলেচে, এক্ষুনি দিবি! তোর সঙ্গে খেলে, এই না তোর কত বাপের ভাগ্যি!

সেই সময় দিবাকরও আসছিল ওপরে। সেও মামলাটি শুনে দুই ধমক দিল দুলালচন্দ্রকে। কানটি ধরে মুলে দিয়ে বললো, ছোটবাবুর হুকুমের যদি কোনো নড়চড় হয় তো তোর গর্দান যাবে, মনে রাকিস।

দুলালচন্দ্র মসৃণ দুগ্ধ ধবল শ্বেত পাথরের মেঝেতে নাক খৎ দিতে লাগলো। একটু দিয়েই থেমে গেলে চলবে না। বারান্দার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যেতে হবে। আবার সেইরকমভাবে ফেরা। নবীনকুমারের হাতে জগন্নাথ-ক্ষেত্র থেকে আনা একটি রঙীন লাঠি, সেট দিয়ে দুলালচন্দ্রের পেছনে মারতে মারতে সে খলখল করে হাসতে লাগলো। দুলালচন্দ্র একটু থামলেই সে আবার বলে, হ্যাট, হ্যাট। চল রে, ঘোড়া, চলরে গাধা, চলরে ঘোড়া...

কী সুন্দর নবীনকুমারের কণ্ঠস্বর। সুরেলা, রিনিঝিনি! যে শোনে, তারই ওকে আদর করতে ইচ্ছে করে।



এক সপ্তাহের মধ্যেই দুই বিবাহের লগন। সোমে গঙ্গানারায়ণের আর বৃহস্পতিতে সুহাসিনীর। বিধুশেখর অনেক ভাবনা চিন্তা করেই এমন দিন ফেলেছেন। দুটি বিবাহেরই সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান করতে হবে বিধুশেখরকেই, কেননা রামকমল সিংহ ইদানীং সংসার থেকে প্রায় পুরোপুরি বিযুক্ত হয়ে পড়েছেন, সান্ধ্যকালীন ভোগ আহ্লাদ ছাড়া আর কোনো দিকেই মন নেই। বিধুশেখর অনেক চেষ্টা করেও বন্ধুকে ফেরাতে পারলেন না। কঠিন ভর্ৎসনা করলেও রামকমল মৃদু মৃদু হেসে বলেন, তুই তো এ রসে মজলি না বিধু, তুই এর মর্ম বুঝবি কি? কখনো মাঝ নদীতে স্রোতের মুখে গা ছেড়ে দিয়ে দেখিচস, কী আরাম?

ব্যয় সঙ্কোচের অবশ্য কোনো প্রশ্নই নেই। বিশিষ্ট নিমন্ত্রিতদের বাড়িতে পাঠানো হয়েছে দুখানি করে শাল, দুটি সোনা বাঁধানো লোহা, একজোড়া ঢাকাই কাপড় ও দু' শিশি গুলাবী আতর। সিংহ বাড়ি ও মুখুজ্জে বাড়িতে সার বেঁধে বসে গেছে দর্জি ও খলিফাগণ। ভৃত্য ও দ্বারবানেরা পাবে দু' প্রস্থ করে লাল বনাতের তকমা ও উর্দি। অধ্যক্ষ ভট্টাচার্যরা একবার এ বাড়ি একবার ও বাড়িতে গিয়ে ঘোঁট পাকাচ্ছে। নহবতের সানাই ও ঢুলী, বাজনাদাররা মাত করে দিয়েছে

পাড়া। ভিয়েনের ধোঁয়ায় আকাশে মেঘ জমে যাচ্ছে, বাতাস একেবারে ম ম। হাতে একটি সোনা বাঁধানো ছড়ি নিয়ে শক্ত ঋজু চেহারার বিধুশেখর পরিদর্শন করছেন সব কিছু। তিনি যে কোথায় কখন উপস্থিত হবেন, তার কোনো ঠিক নেই।

রামকমল সিংহের ওপর কোনো দায়িত্ব না দিলেও তাঁকে বিধুশেখর অনুরোধ করেছেন যে উৎসবের ক'টি দিন তাঁকে থাকতে হবে বাড়িতে। কন্যাপক্ষের বাড়িতেও তাঁকে বেসামাল হলে চলবে না। গঙ্গানারায়ণকে বিবাহ বাসরে নিয়ে যাবার আগে কন্যাকর্তা যখন অনুমতি চাইতে আসবেন, তখন সে অনুমতি তো বিধুশেখর দেবেন না, রামকমল সিংহকেই দিতে হবে। আর একটি শর্ত, বিবাহ উপলক্ষে বাড়িতে বাঈ নাচের ব্যবস্থা না হয় হোক, কারণ সেটাই বড় মানুষদের প্রথা, কিন্তু কমলাসুন্দরীকে বাড়িতে আনা চলবে না।

বাগবাজারের বসু বাড়ির কন্যা লীলাবতীকে বিবাহ করে নির্বিঘ্নে স্বগৃহে ফিরে এলো গঙ্গানারায়ণ। লীলাবতীর বয়েস এখন আট বৎসর পাঁচ মাস। লাল বেনারসী চেলী ও ফুলের মালার মধ্যে তাকে যেন আর দেখাই যায় না। মনে হয় একটি চলন্ত পুঁটুলি। দাস-দাসী, পাইক-বরকন্দাজদের বিরাট মিছিল নিয়ে গঙ্গানারায়ণ থামলো বাড়ির সিংহদ্বারের সামনে। সেখানে একটি বিশাল উনুনের ওপর এক কড়া দুধ ফুটচে।

গঙ্গানারায়ণের জননী বিম্ববতী আত্মীয় আশ্রিত মহিলাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে। গঙ্গানারায়ণ বিম্ববতীর চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করলো। সেই দেখাদেখি লীলাবতীও ঢিপ করে মাথা ঠেকালো তাঁর পায়ের ওপর।

প্রথা অনুযায়ী বিম্ববতী পুত্রকে প্রশ্ন করলেন, এ কাকে এনিচিস রে গঙ্গা?

গঙ্গানারায়ণ লজ্জারুণ মুখখানি নীচু করে বললো, মা, তোমার জন্য দাসী এনেচি।

অমনি সমবেত মহিলারা উলু দিয়ে উঠলেন, ফচকে ছোঁড়ারা হাততালি দিল আর ঢাক ঢোলের শব্দে কর্ণপটাহ ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হলো।

এবার বিম্ববতী দুধের কড়াইয়ের দিকে ইঙ্গিত করে নববধূকে জিজ্ঞেস করলেন, মা, কী দেখচো?

পিত্রালয় থেকে সহস্রবার শিখিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও এর উত্তর ভুলে গেছে লীলাবতী। অথবা লজ্জায় তার মুখ খুলছে না। চতুর্দিকের নানান শব্দে কান পাতা দায়।

বিম্ববতী আবার বললেন প্রশ্নটি। সাড়ে আট বৎসরের মেয়েটির মাথা নুইতে নুইতে যেন মাটির সঙ্গে ঠেকে যাবে। তখন একজন এয়ো স্ত্রী এগিয়ে এসে লীলাবতীর পাশে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে তার মুখটি তুলে ধরে বললেন, বল্ মা বল্, আমার সংসার উতলে পড়চে দেকচি।

দু' তিনবারের চেষ্টায় লীলাবতী কোনোক্রমে মুনিয়া পাখির মতন সরু গলায় কথাগুলি উচ্চারণ করতেই আবার উলু, উল্লাসধ্বনি ও বাদ্যরবে ছেয়ে গেল অঙ্গন। বিম্ববতী পুত্রবধূকে কোলে টেনে নিলেন।

গাঁটছড়া খুলে এতক্ষণ পরে মুক্ত হলো গঙ্গানারায়ণ। ভৃত্যরা জল ঢেলে দিতে এলো, নাগরা খুলে পা ধুয়ে বাড়ির মধ্যে চলে এসে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। ওঃ, বিবাহ না যেন এক কঠিন পরীক্ষা। কয়েকদিন ধরে নানারকম আচার অনুষ্ঠানে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বাগবাজারের শ্বশুরালয়ে তো তাকে সর্বক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়েছে, নানারকম রঙ্গ রসিকতায় তাকে নাস্তানাবুদ করার জন্য সকলের কী চেষ্টা!

বাসরঘরে তো এক কাণ্ডই হয়েছিল। সেখানে গঙ্গানারায়ণের বন্ধুদের প্রবেশ অধিকার ছিল না, শুধু যত রাজ্যের অচেনা মহিলা সেখানে উপস্থিত। বন্ধুদের ছেড়ে আরও অসহায় বোধ করছিল গঙ্গানারায়ণ। একটি রত্নখচিত সিংহাসনে আসীন সে একমাত্র পুরুষ, নববধূ পাশে নেই, প্রায় দুশো জন নারী তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

হঠাৎ একজন যুবতী তার সামনে এসে থুতনিতে হাত দিয়ে প্রশ্ন করেছিল, এই যে, আমাদের কালেজে পড়া বরমশাই, তোমার বউটি গেল কোথায়? আমাদের মধ্যে কোন্‌টি তোমার বউ খুঁজে বার করো তো!

গঙ্গানারায়ণ ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছিল। এ যে বড় কঠিন প্রশ্ন। নানান বয়েসী স্ত্রীলোক সেখানে উপস্থিত, তাদের মধ্যে কোন্‌টি তার পত্নী তা খুঁজে বার করা সত্যিই খুব দুষ্কর। শুভদৃষ্টির সময় একবার মাত্র সে লীলাবতীকে দেখেছে, তাও ভালো করে দেখার সুযোগ পায়নি কিংবা সে চেষ্টাও সে করেনি। এদের মধ্যে কোন্‌জন সে? বিবাহ উৎসবে নারীরা জমকালো সাজ-পোশাক করে আসে, অনেককেই সে কারণে এক রকম দেখায়।

গঙ্গানারায়ণ উদ্‌ভ্রান্তের মতন সকলের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। বাসর কক্ষে অন্যান্য নারীদের প্রগলভা হতে কোনো বাধা নেই। কারুর দিকে চোখ পড়তেই সে হেসে ওঠে, কেউ বা ভ্রূভঙ্গি করে, কেউ বা এগিয়ে এসে বলে, ও, আমায় বুঝি মনে ধরেচে? আহা, সে কথা আগে বলতে হয়!

গঙ্গানারায়ণকে ওরা কিছুতেই নিরুত্তর থাকতে দেবে না। সে যতই দিশাহারা হয়, ততই নারীরা অধিক কৌতুক পেয়ে কেউ তাকে ঠোনা মারে, কেউ কান মুলে দেয়। কেউ বলে, ওমা, বিয়ে কত্তে এসে বউ হারিয়ে ফেললে? কাল মায়ের কাছে মুখ দেখাবে কী করে? কেউ বলে, ভুল বাড়িতে এয়োচো নাকি গো? শেষকালে কী, 'গোঁসাই পাড়ার বর এলো গো কায়েৎ বাড়িতে, টোপর খুলে মুখ নুকোলো কালো হাঁড়িতে!' আর অমনি শত শত কাচের বাসন ভাঙার মতন হাসির শব্দে ঘর ভরে যায়।

এক এক সময় অতি নিরীহ ব্যক্তিও যেমন হঠাৎ খুন করে বসে, সেই রকমই অত্যন্ত লাজুক গঙ্গানারায়ণও এক সময় মরীয়া হয়ে তুখোড় হয়ে উঠলো। নানা রত্নালঙ্কারে সজ্জিতা ষোলো সতেরো বৎসরের এক সুন্দরী বিবাহিতা যুবতী, যে মাঝে মাঝেই এসে গঙ্গানারায়ণের কান মুলে দিয়ে যাচ্ছিল, গঙ্গানারায়ণ হঠাৎ খপ করে তার হাত চেপে ধরে বললো, এই তো পেয়েছি! এই তো আমার বউ!

অমনি সারা কক্ষে আবার হাসির হুল্লোড়। সেই যুবতীটি ত্রস্তে হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতেই গঙ্গানারায়ণ বললো, আর হারাচ্চি না, একবার পেয়ে গেচি, আর ছাড়বো না!

কৌতুকের বন্যায় সেই যুবতীটিই শেষ পর্যন্ত কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠলো। গঙ্গানারায়ণ জোর করে তার হাত চেপে ধরে আছে। দূর থেকে একজন বললো, ও গো, নতুন বর, আমাদের ঐ কনকলতার সোয়ামী কিন্তু কুস্তি করে, এখুনি এসে তোমায় ঠ্যাঙাবে! ওকে ছাড়ো!

গঙ্গানারায়ণ চোখ পাকিয়ে বলেছিল, না!

তখন আড়াল থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল লীলাবতীকে। একজন তাকে সামনে এগিয়ে দিতে দিতে বলেছিল, দেকিস লো, সাবধান! তোর বর এখুনি তো সতীন আনতে চায়।

আজ বাড়ি ফেরার পর গঙ্গানারায়ণের ছুটি। আজ আর তার করণীয় কিছু নেই, এই রাতকে বলে কালরাত্রি, এখন সন্ধ্যে থেকে কাল প্রভাত পর্যন্ত নববধূর মুখ দেখা তার নিষেধ। এখন অন্দরমহলে মহিলারা নববধূকে নিয়ে মেতে থাকবে, ক্লান্তি অপনোদনের জন্য কর্তাবাবুরা এখন সুরাপানের আসরে বসে বাঈ নাচ দেখবেন, ঢাকী-ঢুলী বাজনাদাররা ধেনো ওড়াবে, আর ভট্টাচার্যির দল আর চাকর-বাকররা লুচি মণ্ডা নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে। সেই এক কড়াই গরম দুধে মাটির ভাঁড় ডুবিয়ে ডুবিয়ে ইতিমধ্যেই কয়েকজন শেষ করে দিয়েছে।

বরবেশ ছেড়ে একটা সাদা কামিজের ওপর একখানা কাশ্মীরী শাল জড়িয়ে গঙ্গানারায়ণ আবার নেমে এলো নীচে। ফেব্রুয়ারি মাস শুরু হয়ে গেছে, তবু বেশ শীত শীত ভাব। গঙ্গানারায়ণ তার সহপাঠী বন্ধুদের এই সময় আসতে বলেছিল।

কর্তারা বাগানে বসেছেন, তাই বৈঠকখানা ঘরটি এখন খালি। গঙ্গানারায়ণ সেখানেই বন্ধুদের নিয়ে এলো। গৌরদাস, ভূদেব, রাজনারায়ণ, গিরীশ, বঙ্কু, বেণী প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত। গতকালের বিবাহ বাসরের নানান ঘটনার উল্লেখ করে ওরা খুব আমোদ করতে লাগলো।

গঙ্গানারায়ণ সুরা পান করে না। সেইজন্য বন্ধুদের জন্য সে সুরার কোনো বন্দোবস্ত রাখেনি। কিন্তু রাজনারায়ণ ছটফট করছে। ইদানীং রাজনারায়ণ প্রায় মধুরই মতন অতি সুরাপায়ী হয়ে উঠেছে। সে আগেই খানিকটা পান করে এসেছে, তাই বারবার বলছে, গেলাস কোতায়? ব্র্যাণ্ডি কোতায়? শুদু মুখে কি গপ্পো হয়? তোরাও য্যামন! এই গঙ্গা, তোর বাপের ভাঁড়ার থেকে দু' পাঁচ বোতল ব্র্যাণ্ডি নিয়ে আয় না!

কথা ঘোরাবার জন্য গঙ্গানারায়ণ প্রশ্ন করলো, হ্যাঁ রে, মধু কোথায় রে! সে এলো না? সে কালও আসেনি।

রাজনারায়ণ ঠোঁট উল্টে বললো, মধু গোল্লায় গেছে! কেন বাওয়া, মধু আসেনি বলে কি আমাদের ব্র্যাণ্ডি দেওয়া হবে না?

গঙ্গানারায়ণ অন্যদের দিকে ফিরে ঈষৎ দুঃখিত স্বরে বললো, মধুকে এত করে আমি বলে এইচিলাম, তবু সে এলো না?

বেণী বললো, মধুর কতা এখন আর নাই বা শুনলি! শুভ কাজের মধ্যে আবার অশুভ জিনিস টেনে আনা কেন?

গঙ্গানারায়ণ ক্ষুব্ধ হলো। নানা রকম বয়াটেপনা করলেও দুরন্ত স্বভাবের মধুকে সে ভালোবাসে। মধু যে কবি, সে বায়রন-মিল্টনের সমগোত্রীয়, সেইজন্য অনেক কিছুই তাকে মানায়। বেণী মধুকে পছন্দ করে না, সব সময় টক্কর লড়তে চায়, তা গঙ্গানারায়ণ জানে।

মধুর নাম উঠতেই অন্যরা যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেছে মনে হলো। আবার নতুন কী কাণ্ড করেছে মধু? একমাত্র গৌরদাসকে প্রশ্ন করলেই সঠিক জানা যাবে, গৌরদাস মধুর প্রাণের দোসর এবং সে অযথা মিথ্যে ভাষণ করে না।

—গৌর, মধুর কী হয়েচে রে?

গৌরের ফর্সা মুখখানিতে ম্লান ছায়া। সে অন্যমনস্ক। খুব আস্তে আস্তে থেমে থেমে সে বললো, তোকে কাল ইচ্ছে করেই খবরটা দিইনি, গঙ্গা! মধু বাড়ি থেকে পালিয়েচে। মধু খৃষ্টান হবার জন্য পাদ্রীদের কাচে গিয়ে লুকিয়েচে!

রাজনারায়ণ জড়িত কণ্ঠে বললো, যে সে পাদ্রী নয় বাবা! একেবারে লাট পাদ্রী। লর্ড বিশপ যাঁকে বলে। তিনি আবার মধুকে ফোর্ট উইলিয়ামের মধ্যে

ঠুঁসে রেখেচেন। আর কেল্লার কত্তা ব্রিগেডিয়ার পৌনি নিজে পাহারা দিচ্চেন মধুকে! এবার মধু গেল, তাকে আর পাবি না কোনোদিন!

গঙ্গানারায়ণ বললো, কেল্লার মধ্যে? বলিস কী?

বঙ্কু বললো, মধুর বাবা লাঠিয়াল পাইক আনিয়েচেন যে। পুলিসের হাত থেকে মধুকে তিনি কেড়ে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কেল্লার গোরাদের সঙ্গে তো আর তিনি লড়াই দিতে পারবেন না। স্বয়ং সেনাপতির তাঁবে রয়েচে সে। মধু নিজেই এই ফন্দী এঁটে বাপের ওপর এক হাত নিয়েচে!

—মধুকে জোর করে সেখানে ধরে রাখেনি তো?

ভূদেব গম্ভীর স্বরে বললো, না, আমি আর গৌর দেখা করতে গেসলাম মধুর সঙ্গে।

—তারপর?

—আমার সঙ্গে অবশ্য সে দেখা করে নাই। সে নিজেই অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল, না পাদ্রীরাই আমাদের ভাগিয়ে দিল, তা জানি না। পরে গৌর একবার একা গেস্‌লো, ওর সঙ্গে দেখা হয়েচে।

গঙ্গানারায়ণ গৌরের দিকে তাকালো। গৌর নিশ্চয় মধুর সমস্ত গোপন কথা জানে। মধু গৌরের সঙ্গে দেখা করবে না, এ কখনো হতেই পারে না। ভূদেব সঙ্গে গিয়েছিল বলেই বোধহয় মধু আগের দিন ইচ্ছে করে ওদের সঙ্গে দেখা করেনি। গোঁড়া নীতিবাগিশ ভূদেবকে বন্ধুরা অনেকেই ডরায়।

গৌর বললো, আমার সঙ্গে দেখা হয়েচে বটে, কিন্তু আমাকে সে বিশেষ কথা বলতেই দেয়নি। নিজের উচ্ছ্বাসেই সে ডগোমগো। আমি একবার শুধু কইলাম, মধু, তুই বাপ মায়ের মনে এমন দুঃখও দিতে পারলি? তোর মা যে মূর্চ্ছিতা হয়ে রয়েচেন, অন্ন-জল ত্যাগ করেচেন, তাতে মধু আমার ওষ্ঠে আঙুল দিয়ে বললে, চুপ, চুপ, ওসব কথা কোস না এখন! আমার মন অ্যাখুন পরম-পিতার পায়ে আশ্রয় নেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আচে। এই উপলক্ষে আমি একটা হিম রচেচি সেটা বরং তোকে শোনাই। তোকে না শোনানো পর্যন্ত আমার তৃপ্তি নেই! ভাই, তারপর মধু যে পদ্যটা পড়ে শোনালো, মধুর লেখা অত খারাপ ইংরেজি পদ্য আমি কখনো পড়িনি বা শুনিনি! সে একেবারে ভক্তিতে জ্যাবজেবে আর আমাদের ধম্মো যে কত খারাপ, সেই কতা।

গঙ্গানারায়ণ বললো, কিন্তু মধুর মুখে এমন খৃষ্টভক্তির কথা তো আগে কখনো শুনিনি! বরং থিয়োডোর পার্কারের বই পড়ার পর তার মধ্যে একটু নাস্তিক নাস্তিক ভাবই দেকেচিলুম।

বেণী বললো, আরে মধু কেরেস্তান হচ্চে কি আর শুধু ভক্তিতে? এর মধ্যে অন্য কোনো মতলব আচে। ও তো এক পা বিলেতের দিকে বাড়িয়েই ছেল, এবার পাদ্রীরা ওকে বিলেতে পাঠাবে।

গঙ্গানারায়ণ বললো, মধুকে বাড়ি থেকে পালাবার এই বুদ্ধি দিল কে? কৃষ্ণমোহন বাঁড়ুজ্যেই নিশ্চয়ই ওর কানে মন্তোর দিয়েচেন।

বঙ্কু বললো, এই ক্যাটি কেষ্টর জ্বালায় আর পারা গেল না। নিজে তো জাত খুইয়েচেই, আবার কচি কচি ছেলেদের ধরে ধরে কেরেস্তান করাচ্চে! সাহেবদের পা-চাটা নচ্ছার কোথাকার!

ভূদেব বললো, শুধু শুধু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দোষ দিও না। তিনি নিজ বিশ্বাস লয়ে আছেন। মধুর বাবা তেনাকে চেপে ধরায় তিনি তো সাফ বলে দিয়েচেন, আপনার পুত্র তো দুধের বাছাটি নয়! রীতিমতন লেকাপড়া শিখে

সাবালক হয়েচে, তার কি নিজের কোনো বুদ্ধি ভাষ্য নাই? আপনার ক্ষমতা থাকে তাকে ঠেকান!...আমার কী মনে হয় জানো, মধুদের পাড়ায় যে নবীন মিত্তির বলে একটা ছোঁড়া আছে না? সেই ছোঁড়াই মধুকে ফুসলেছে! ছোঁড়া তো অনেক আগেই খৃষ্টান হয়েছে। আমি অনেকবার শুনিছি, সেই ছোঁড়া মধুকে বলছে, খৃষ্টান হলেই বিলেত যেতে পারবে!

রাজনারায়ণ বললো, আরে না, ওসব কিচু না! মধু খেষ্টান হয়েচে হিঁদু বে করবে না বলে! হিঁদুর মেয়েগুলো লেকাপড়া শেখে না। তেমন মেয়েকে মধু কিচুতেই বউ করবে না। ওর বাপ জোর করে বে দিতে গেসলো, তাই মধু পাখি হয়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল।

গঙ্গানারায়ণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। এইখানেই মধুর জয়। সে নিজে তো কিছুতেই পারলো না। এই বিবাহে তার তীব্র অসম্মতি ছিল তবু তো মেনে নিতে হলো তাকে। বিবাহ অনুষ্ঠানে সে বিন্দুমাত্র পুলক বোধ করেনি, বরং মনের মধ্যে বিরক্তি স্তূপীকৃত হয়েছে। নববধূর দিকে তার পূর্ণ দৃষ্টি মেলে চাইতেও ইচ্ছে করে না।

বন্ধুরা চলে যাবার পর রাত্রে একা শুয়ে শুয়ে গঙ্গানারায়ণ অনেকক্ষণ মধুর কথা চিন্তা করলো। তাহলে কি আর কোনোদিন মধুর সঙ্গে দেখা হবে না? খৃষ্টান হবার পর কি মধু এ শহরে টিঁকতে পারবে? তার দোর্দণ্ডপ্রতাপ পিতা সহ্য করতে পারবেন এই অপমান?

এক সময় গঙ্গানারায়ণ টের পেল, তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে অনেকক্ষণ ধরেই তার স্ত্রী লীলাবতীর কথাও ভাবছে। হঠাৎ গঙ্গানারায়ণ শয্যার উপরে উঠে বসলো। না, সে অন্যায় করছিল। মধুর সঙ্গে তার তুলনা হয় না। মধু মধুই, গঙ্গানারায়ণ কোনোদিন মধুর মতন হবে না। নিজ অভিলাষ সিদ্ধির জন্য গঙ্গানারায়ণ কখনো ধর্মত্যাগ করতে পারবে না, মা এবং পিতার মনে সে দুঃখও দিতে পারবে না। বিবাহ যখন করেছেই, তখন আর স্ত্রীর প্রতি বিরূপতা পোষণ করা অন্যায়। ধর্ম সাক্ষী করে সে একটি সরলা বালিকাকে নিজের জীবনসঙ্গিনী হিসেবে বরণ করেছে, এখন সর্বপ্রকারে এ বালিকাকে খুশী করার চেষ্টায় তার যত্নবান হওয়া উচিত। সে কোনোদিন লীলাবতীর প্রতি অনাগ্রহ বা অনাদর দেখাবে না।

বৃহস্পতিবার বিধুশেখরের গৃহে সুহাসিনীর বিবাহ অনুষ্ঠানে গঙ্গানারায়ণের ওপর অতিথিদের সাদর সম্ভাষণের ভার পড়েছে। নিজ বিবাহের দিনের অভ্যাগতদের সকলকে ঠিক মতন দেখার সুযোগ হয়নি তার, আজ সে স্বয়ং দ্বারের কাছে দণ্ডায়মান। বিধুশেখরের পুত্র নেই, গঙ্গানারায়ণই তাঁর পুত্রবৎ। একে একে উপস্থিত হতে লাগলেন শহরের অভিজাত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। বহু-রকম শকটের ভিড়ে পথ একেবারে পরিপূর্ণ। সরকারী সেপাইরা মহামান্য ব্যক্তিদের অশ্বযানের পথ পরিষ্কার করে দেবার চেষ্টায় হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। বিধুশেখর এ শহরের বিশেষ প্রতিপত্তিশালী আইনজীবী, তাঁর সঙ্গে দেশের সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় আছে।

এলেন বর্ধমান-অধিপতি তেজেশচন্দ্রের দত্তকপুত্র মহাতাবচাঁদ বাহাদুর। তারপরই এলেন রাজা নরসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর, ইনি পোস্তার সুবিখ্যাত রাজা সুখময় রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। সপারিষদ এসে উপস্থিত হলেন শোভাবাজারের রাজা,

বর্তমান হিন্দু সমাজের শিরোমণি রাধাকান্ত দেব। একটু পরেই এলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর ভ্রাতাগণ। এত রাজা-রাজড়াদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের পোশাকই সবচেয়ে অনাড়ম্বর, যদিও একটি সাদা শাল জড়ানো থাকায় তাঁর গৌরবর্ণ আরও বেশী গৌর দেখাচ্ছে। তাঁর ঠিক পরেই এলেন বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রামকমল সেন। তিনি সঙ্গে তাঁর পাঁচ বছরের দৌহিত্র কেশবকে নিয়ে এসেছেন। পিতৃবন্ধু রামকমল সেনকে দেখে দেবেন্দ্রনাথ ক্ষণেক দাঁড়িয়ে দু' চারটি কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন এবং শিশু কেশবের থুতনি ছুঁয়ে আদর জানালেন একটু। তখুনি ভূকৈলাশের রাজা সত্যশরণ ঘোষাল এসে পড়ায় ওঁরা কথা বলতে বলতে চলে গেলেন ভিতরে।

একসঙ্গে দল বেঁধে এলেন রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্তী। এঁরা এক সময়ে ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল নামে কথিত ডিরোজিও-শিষ্য বিদ্রোহী যুবাবৃন্দ, এখন পরিণত বয়েসে সংসারী হয়ে বিশিষ্ট ভদ্রব্যক্তি হয়েছেন।

বিধুশেখর তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার জন্য জামাতাকে ধনী পরিবার থেকে আনেন নি। পাত্রটি দরিদ্র হলেও সংস্কৃত কলেজের উজ্জ্বল ছাত্র ছিল, এখন আইন অধ্যয়ন করে জজ পণ্ডিত হবার অপেক্ষায় আছে। বরের নাম পার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তার সঙ্গে এসেছে তার সহপাঠী এবং আত্মীয়দের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, মহেশচন্দ্র শাস্ত্রী, রামনারায়ণ তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

গঙ্গানারায়ণের নিজের বন্ধুরা এলো কিঞ্চিৎ দেরি করে। গণ্যমান্য অতিথিদের আপ্যায়ন করার কাজে ব্যাপৃত থাকলেও সে তার বন্ধুদের সাক্ষাৎ পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ছিল।

ওরা এসে উপস্থিত হতেই গঙ্গানারায়ণ দ্বারের কাছ থেকে একটু সরে এসে ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলো, খবর কী, বল! হয়ে গ্যাচে?

গৌর বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে জানালো, হ্যাঁ।

—তুই গিইছিলিস?

—হাঁ, কিন্তু কথা কিছু হলো না। এক ঝলক শুধু চোখের দেকা দেকিচি।

ভূদেব বললো, কোনোক্রমে কাছে ঘেঁষবার তো উপায় রাখে নাই। মিশন রো'র ওল্ড মিশন চার্চ তো সশস্ত্র সৈনিক দিয়ে একেবারে ঘিরে রেখেচিল। এত সেপাই শান্ত্রী নিয়ে ধর্মান্তর গ্রহণের ব্যাপার আগে কেউ বাপের জন্মে দেকেচে! ইংরেজের যে-টুক্ চক্ষুলজ্জা ছিল, তাও আর নাই! এদেশে আর কেউ হিন্দু থাকবে না, দেশটা ম্লেচ্ছে ভরে যাবে!

—মধুকে কেমন দেকলি?

—দেকলুম আর কোথায়! কেল্লা থেকে ঢাকা গাড়ি করে বাঘা-বাঘা সাহেবরা মধুকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো। যেন কোনো ডিউক বা লার্ডের বিবি, পাছে কেউ কেড়ে নেয়, তাই এত সাবধানতা। আর কোনো নেটিভকে ওরা আগে কখনো আদর দেখিয়ে কোলে বসিয়ে আনেনি। গাড়ি থেকে নেমে গীর্জায় ঢোকার সময় আমরা মধুকে দূর থেকে দেকলুম এক ঝলক। মধু অবশ্য একবারও ফিরেও তাকায়নি।

—সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে গ্যালো। সব সাহেব মেম গিজগিজ করছে, শুধু দুজন নেটিভ রইলো ভেতরে। এক মধু, আর আমাদের কালোমানিক কেষ্টমোহন। সেই তো রাজসাক্ষী হয়েচে গো! ঐ যে দেকচিস রামগোপাল ঘোষ,

রামতনু লাহিড়ীরা দাঁড়িয়ে আচে, ওদেরই তো বন্ধু ঐ ক্যাটিকেষ্ট। ওরা বন্ধুকে সামলাতে পারে না? নইলে আমরাই ওকে একদিন দোবো দু' ঘা!

ভিতর থেকে ডাক আসায় গঙ্গানারায়ণকে চলে যেতে হলো তখন। তারপর আর ঘণ্টা দু'এক সে ফুরসৎ পেল না।

এক সময়, অতিথিরা যখন আহারে বসেছে, বিবাহবাসরে সম্প্রদানের মন্ত্র উচ্চারণ শুরু হয়ে গেছে, তখন হঠাৎ গঙ্গানারায়ণের একটা কথা মনে পড়লো। সারাদিনে সে এবাড়ির সমস্ত মহল চষে বেড়িয়েছে বেশ কয়েকবার, কিন্তু একবারও তো সে বিন্দুবাসিনীকে দেখেনি। এত উৎসবের মধ্যে বিন্দুবাসিনী কোথায়?

কথাটা মনে পড়া মাত্র গঙ্গানারায়ণের হৃদয় কম্পিত হতে লাগলো। এ জগতে যেন সে এক চরম ঘৃণ্য অপরাধী। শুধু আজ কেন, সপ্তাহব্যাপী দুই বাড়িতে যে এত সমারোহ, তার মধ্যে কোনো এক সময়েও তো বিন্দুবাসিনীর দেখা মেলেনি। এবং একথা একবারের জন্যও গঙ্গানারায়ণের মনে আসেনি পর্যন্ত। গত কয়েক মাস ধরেই সে বিন্দুবাসিনীর কথা কখনো নিজ চিন্তায় স্থান দেয়নি। বিন্দুবাসিনী তার বাল্য সখী, তাকে সে বিস্মৃত হয়েছে।

নহবৎখানায় সানাইয়ের স্বরও গঙ্গানারায়ণের কাছে নিরানন্দ মনে হলো। চতুর্দিকে এত মানুষ, অথচ একজনের অভাবেই মনে হলো সব কিছু শূন্য।

সারা বাড়ি আর একবার তন্ন তন্ন করে খুঁজে গঙ্গানারায়ণ ত্রিতলে পূজার কক্ষের সামনে এসে দাঁড়ালো। আর সব জায়গায় এত আলো, এত রঙের বাহার কিন্তু এখানে শুধু একটি রেড়ির তেলের বাতি জ্বলছে। সেই ম্লান আলোয় চতুর্দিকে ছড়ানো অজস্র বাসি ফুলের মধ্যে বসে আছে সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণা এক যুবতী। সে আজ প্রকৃতই একা, কেননা এ কক্ষে আজ জনার্দনমূর্তিও নেই, পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী সেই মূর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে বিবাহ বাসরে।

গঙ্গানারায়ণের মনে হলো, বিন্দুবাসিনী যেন এক তপঃকৃষ্টা ব্রতচারিণী। পিঠের ওপর খোলা চুল, তার শ্বেত বসনও যেন রেড়ির তেলের আলোয় গেরুয়া-মতন দেখায়। বিন্দুবাসিনীর চক্ষু দুটি মুদিত, সেই অবস্থায় বসে থেকে সে যেন একটু একটু দুলছে।

—বিন্দু!

বিন্দুবাসিনী চমকালো না। ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। স্নিগ্ধ হাস্যের সঙ্গে বললো, কে? গঙ্গা? তুই কেমন বউ আনলি? একদিন তোর বউ দেকতে যাবো!

অভিমান মিশ্রিত গলায় গঙ্গানারায়ণ বললো, তুই কেন আমার বিবাহে যাসনি? আমি নিজে এসে তোকে নেমন্তন্ন করিনি বলে? সে না হয় বুঝলুম, কিন্তু আজ সুহাসিনীর বে, তুই সেজে গুজে আহ্লাদ না করে এখানে এমন করে বসে রয়িচিস কেন? তোর বড় দেমাক, তাই না?

সেইরকম হাস্যমুখেই ছদ্মভর্ৎসনা করে বিন্দুবাসিনী বললো, যাঃ! অমন কতা বলতে আচে? তুই এখনো ছেলেমানুষ রয়ে গেলি! আমি কাঁচা বয়েসের রাঁঢ়, কোনো শুভকাজের সময় আমার মুখ দেখাতে নেই, তুই জানিস না?

গঙ্গানারায়ণ কয়েক মুহূর্তের জন্য প্রস্তরমূর্তির মতন স্থির হয়ে রইলো। কী উত্তর দেবে সে জানে না।

পরক্ষণেই যেন এক প্রবল জোয়ারে সে প্লাবিত হয়ে গেল সহসা। আর সব কিছুই মিথ্যা বলে বোধ হলো। চোখের সম্মুখে এ কাকে সে দেখছে? এ যে

বিন্দু, তার শৈশব কৈশোরের সমস্ত স্বপ্নের সঙ্গী। একে ঘিরেই তো সে এক স্বর্গ রচনা করতে পারতো, তার বদলে কোন মহত্তর ভুলে সে জড়িয়ে পড়লো? বিন্দুকে বাদ দিয়ে তার জীবন শূন্য, ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ব্রাহ্মণবাড়ির পূজার কক্ষে গঙ্গানারায়ণ প্রবেশ করে না। কিন্তু আজ এঘরে দেবতা নেই। গঙ্গানারায়ণ দ্রুত সেখানে ঢুকে সবলে বিন্দুকে আঁকড়ে ধরে আবেগ-মথিত কণ্ঠে বললো, বিন্দু, বিন্দু, তুই আমার! এতকাল বুঝিনি! তোকে ছেড়ে আমি কিছুতেই সুখ পাবো না।

বিন্দু গঙ্গানারায়ণকে মৃদু অথচ কঠিনভাবে ঠেলে দিয়ে বললো, ছিঃ গঙ্গা, এসব কথা উচ্চারণ কত্তে নেই! আমি তোর কেউ না। তুই সুখে থাক, তাহলেই আমি সুখী হবো।



রাজনারায়ণ দত্তের শয্যাকণ্টকী হয়েছে। একটুক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকলেই তাঁর সর্ব শরীরে জ্বালা ধরে, তৎক্ষণাৎ উঠে ছটফটিয়ে বেড়ান। সমস্তক্ষণ শরীরে এতটা অস্থিরতা, বসে থাকলে মনে হয় পায়চারি করলে ভালো লাগবে, আবার তাতেও একটু পরেই ক্লান্তি বোধ হয়, তখন ইচ্ছা হয় বিছানায় একটু গড়িয়ে নিতে। কিন্তু তারও উপায় নেই।

রাতের পর রাত ঘুম নেই। রাজনারায়ণ দত্তের বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ, তাঁর অন্তরে দাউ দাউ করে জ্বলছে ক্রোধ। এত অপমানিত তিনি জীবনে আর কখনো হননি।

আজ বৈকালেই রাগুটিয়ার জমিদার স্বয়ং এসেছিলেন তাঁর গৃহে। সেই মানুষটি মাত্র এই কয়েকদিনেই একেবারে শুষ্ক বিবর্ণ হয়ে গেছেন। শত অনুরোধেও তিনি বৈঠকখানায় এসে আসন গ্রহণ করলেন না। ল্যাণ্ডো থেকে নেমে এসে তিনি রূপোয় মোড়া ছড়িখানিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দ্বারের কাছে। রাজনারায়ণ দত্ত অতি বিনীতভাবে তাঁকে বলেছিলেন, যা হবার তা তো হয়ে গ্যাচেই, আসুন আপনার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে আমি একটু জুড়োই।

সেই শীর্ণকায় বৃদ্ধ বিষণ্ণ-ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, না, আপনাকে শুধু একটা কথা শুধোতে এলুম। দত্তজা, আপনি জেনে শুনে আমার এ সর্বনাশ করলেন কেন?

রাজনারায়ণ দত্ত স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। সহসা কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। 'জেনে শুনে'? রাজনারায়ণ দত্ত জেনে শুনে কথার খেলাপ করবেন? তিনি একজন সাধারণ ফড়ে-দালালের মতন মিথ্যাবাদী?

তিনি সেই বৃদ্ধের তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে যেন সোজা তাকাতে পারছেন না। কোনোক্রমে বললেন, মহাশয়, আপনার সর্বনাশ হয়েচে, আমার হয়নি? আমার আর পুত্র নেই, যদি থাকতো, তবে আপনার সম্মান বাঁচাবার জন্য...

রাখুটিয়ারাজ পুরো কথা শুনলেন না, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পেছন ফিরে ধীরে ধীরে গিয়ে আবার ল্যাণ্ডোতে চড়ে বসলেন। রাজনারায়ণ দত্ত তাঁকে বিদায় জানাতে পর্যন্ত পারলেন না, রাখুটিয়ারাজ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন।

অভিমানী বৃদ্ধ তখন অশ্রু সংবরণের চেষ্টা করছেন প্রাণপণে।

দোর্দণ্ড প্রতাপশালী রাজনারায়ণ দত্তের বাড়ি বয়ে এসে কেউ এমনভাবে কখনো অপমান করে যাবার সাহস পায়নি। অথচ তিনি কিছুই করতে পারলেন না। তাঁর মস্তক ঘূর্ণিত হতে লাগলো। তিনি যেন জ্ঞান হারিয়ে সেখানেই পড়ে যাবেন।

রাখুটিয়ার জমিদারের সর্বনাশের জন্য রাজনারায়ণ দত্ত দায়ী তো বটেই। ওঁর কনিষ্ঠা কন্যার সঙ্গে রাজনারায়ণ নিজের পুত্র মধুর বিবাহ ঠিক করেছিলেন। পাটীপত্র হয়ে গেছে, বিবাহের দিনও ধার্য হয়েছে। আর মাত্র বাইশ দিন বাকি। কন্যাপক্ষ নিমন্ত্রণ পর্যন্ত শুরু করে দিয়েছিলেন।

বিবাহ ভেঙে যাওয়ায় সেই কন্যার নামে কলঙ্ক বর্তে গেল। আর ঐ কন্যার বিবাহ দেওয়া সম্ভব হবে? এই অন্যপূর্বা পাত্রীর জন্য আর কোনো সদ্বংশজাত পাত্র পাওয়া যাবে না।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে রাজনারায়ণ দত্ত মধ্যে মধ্যে আঃ আঃ শব্দ করতে লাগলেন। যেন তাঁর সর্বাঙ্গে বৃশ্চিক দংশন হচ্ছে। এ সময় তাঁকে একটু সান্ত্বনা দেবারও কেউ নেই। পত্নী জাহ্নবী তো মূর্ছা যাচ্ছেন ঘন ঘন। তাঁকে আর বাঁচানো যাবে কিনা কে জানে! এত স্নেহ, ভালোবাসা, প্রশ্রয় দিয়েছিলেন মধুকে, অথচ সে তার পিতার মানসম্মান সব ধুলোয় লুটিয়ে দিতে একটুও দ্বিধা করলো না?

রাজনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র প্যারীমোহন মধুর খোঁজে চতুর্দিকে ছুটোছুটি করছে কয়েকদিন ধরে। তিন দিন আগে মধু খৃষ্টান হয়ে গেছে, তা আর কিছুতেই রোধ করা যায়নি। প্যারীমোহন তবুও চেষ্টা করছে যদি মধুকে এখনো বাড়িতে ফিরিয়ে আনা যায়।

সকালবেলা সে এসে উঁকি মারলো রাজনারায়ণ দত্তের কক্ষে। সারারাত্রি চোখের পাতা জোড়েনি, বিধ্বস্ত চেহারায় একটি কৌচে শূন্য দৃষ্টি মেলে বসে আছেন তিনি।

প্যারীমোহন মৃদুকণ্ঠে বললো, বড়খুড়া, একটা কথা কইবো? একবার কৃষ্ণমোহনবাবুকে ডাকি? উনি আসতে রাজি হয়েছেন।

রাজনারায়ণ দত্ত ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, কৃষ্ণমোহন? ঐ কেলে কেরেস্তানটা? ও আমার বাড়ির দিকে এলে আমি পাইক লেলিয়ে ওর হাড় গুঁড়ো করে দেবো!

প্যারীমোহন বললো, আজ্ঞে, এখন আর মিছামিছি রাগ করে কী হবে। যা হবার তো হয়েইচে। এখন রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহনের সাহায্য নিলে মধুর খোঁজটা অন্তত পাওয়া যায়।

—রেভারেন্ড? ছোঃ! ও ব্যাটা বামুনের ঘরের চাঁড়াল। পয়সার লোভে জাত খুইয়েচে।

—তবু ওনার কথা সাহেবরা মানে-গোণে!

—ওর নাম আমার সামনে আর কখনো উচ্চারণ করিস না, প্যারী! আমার আর মাথা গরম করিয়ে দিসনি!

—যতদূর সন্ধান পেয়েচি, মধু অ্যাখুন পাদ্রী ডিয়ালট্রি সাহেবের বাড়িতে রয়েচে। আমি যদি পারি, একবার তাকে বাড়িতে নিয়ে আসবো?

—না।

—বড়খুড়া, একবার মধুর জননীর কথা ভেবে দেখুন। তিনি যে দিনরাত হা মধু, কোথায় মধু কচ্চেন আর মুচ্ছো যাচ্ছেন। তেনাকে বাঁচাবার কথাটি

একবার ভাববেন না?

—তুই ছেলেমানুষ, প্যারী। তুই সব বুঝিস না, সে আসবে না। তুই কেন উপযাচক হয়ে মান খোয়াতে যাবি? তুই জানিস না, কেল্লার মধ্যে সে যখন সাহেবদের কোলে বসেছেল, তখন আমি আমার বন্ধু ভূকৈলাশের রাজা সত্যশরণ ঘোষালকে পাটিয়েচিলুম। এমন বেয়াদপ ছেলে যে তাঁর সঙ্গে পর্যন্ত দেকা করলে না। অতবড় একটা মানী লোক মুখ চুন করে ফিরে এলেন!

—মধু আমাকে ফেরালে তো আর আমার মান যাবে না। সে আমার ভাই। সে আমি যেমন করে পারি তাকে ধরে নে আসবো। আপনি ওকে মারধোর করবেন না বলুন? আপনি কথা দিন।

—তুই পারবি নি। কেন মিছিমিছি হয়রাণ হবি।

—সে দায়িত্ব আমার। চেষ্টা তো করতে হবে। এর মধ্যে মধু কবে ফস করে বিলেত পালিয়ে যায়, তার ঠিক আচে কি? কৃষ্ণমোহনবাবুর বাড়িতে আর দু-তিন জন ভদ্দরলোক বসে ছেলেন। বলাবলি করছেলেন যে মধুর তো তেমন খৃষ্টান হবার আগ্রহ ছেল না। বিলেত যাবার দিকেই ওর ঝোঁক। পাদ্রীরা ওকে বিলেত পাঠাবে বলেই...

রাজনারায়ণ দত্ত এবার গর্জে উঠলেন। সামান্য স্বার্থের জন্য কেউ বংশানুক্রমিক ধর্ম বিসর্জন দিতে পারে, এই চিন্তাই তাঁকে বেশী পীড়া দেয়।

—পাদ্রীরা ওকে বিলেত পাঠাবে? কেন, আমার পয়সা নেই? আমি ওকে সাতবার বিলেত ঘুরিয়ে আনতে পারি, সে ক্ষমতা আমার আচে। কেন পাঠাইনি জানিস? সে তার মাকে একদিন কী বলেছেল তুই শুনিসনি? বাঙালী মেয়েদের চেয়ে নাকি ইংরেজ মেয়েদের রূপ-গুণ একশো গুণ বেশী। দিনের পর দিন স্নান করে না। গায়ের গন্ধে ভূত পালায়, সেই ন্যাবা লাগা ইংরেজ মাগীগুলো আমাদের বাঙালী মেয়েদের চে ভালো? হিন্দু মেয়েরা নেকাপড়া শেকে না। মাথায় ঘোমটা দেয়। পায়ে জুতো ইস্টাকিন দিয়ে বিবি সেজে পথে পথে ধেই ধেই করে বেড়ায় না বলে মধু তাদের বে করবে না বলেছেল। এই অবস্থায় ওকে বিলেত পাঠালে আর রক্ষে ছেল? ও সেখানেই এক বেড়ালমুখীকে বে করে ফেলতো না? তাহলেও তো সেই জাত খোয়ানোই হতো। সেইজন্যই আমি ভেবে রেকিচিলুম, আগে জোর করে ওর বে'টা দি, হিন্দু কালেজেও এক বছর পড়া বাকি আচে, সেটা সেরে নিক, তারপর না হয় বিলেত পাঠানো যাবে! তার আগেই ছেলে আমার মাথায় বজ্রাঘাত কল্লে!

প্যারীমোহন বললো, মধুর ঐ তো দোষ, বড় চঞ্চল। আমি যেমন ভাবে পারি বলে কয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠিক নিয়ে আসবো। খৃষ্টান হয়েচে বলে কি ওকে বাড়ি ছাড়া করতে হবে? হাজার হোক, ও তো আমাদেরই মধু। প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে আবার মধুকে স্বজাতে নিয়ে আসবো। আপনি যেন অমত করবেন না। অন্তত খুড়ীমার মুখ চেয়ে—।

এদিকে মধু আর্চবিশপ ডিয়ালট্রির বাড়িতে মহা আনন্দেই রয়েছে। এখন শহরের যাবতীয় মানুষ শুধু তার কথা নিয়ে মেতে আছে, এতেই মধুর রক্তে উত্তেজনার সঞ্চার হয়। সমস্ত সংবাদপত্রে তার খবর। খৃষ্টান তো আরও অনেকেই হয়েছে। কিন্তু নেটিভ ও সাহেব মহলে এতখানি হৈ চৈ-এর সৃষ্টি করতে পেরেছে আর কে, সে, মধুসূদন দত্ত ছাড়া?

'কবিতার জন্য পিতামাতাকেও পরিত্যাগ করতে হয়', কবি পোপের এই বাণী সে তার জীবনে সার্থক করে তুলেছে। তার বন্ধুরা ভেবেছিল সে পারবে

না। পারবে না? ওরা মধুকে এখনো চেনে না। রাজনারায়ণ দত্ত ভেবেছিলেন জোর করে তার বিয়ে দেবেন। রাজনারায়ণ দত্ত ছেলেকে এখনো চেনেননি।

তবু বন্ধুদের জন্যই মধুর একটু একটু মন কেমন করে। বিশেষত গৌরের জন্য। গৌরকে একদিনও সে চোখের দেখা না দেখে থাকতে পারতো না। গৌরের সঙ্গে তার অনেক গল্প বাকি আছে। গঙ্গানারায়ণের বিবাহ হয়ে গেল এর মধ্যে, নিশ্চয়ই সেই উপলক্ষে বন্ধুরা দুশো মজা করেছে।

গৌরকে সে আসতে বলেছিল, তবু সে আসে না কেন? গৌর কি তার উপরে এখনো ক্রুদ্ধ হয়ে আছে? না, না, বাকি পৃথিবীর যে যাই বলুক, তাতে মধুর কিছু আসে যায় না। কিন্তু গৌর যদি তাকে ভুলে যায়, তাহলে সে আঘাত মধু সইতে পারবে না।

কাগজ-কলম নিয়ে মধু গৌরকে একটা চিঠি লিখতে বসলো।

আশ্চর্য, তার প্রথমেই মনে পড়লো একটা বাংলা কথা। 'ও গৌর। দুদিন চার দিনেতেই এত!' কথাটা বার বার উচ্চারণ করলো সে। এই কথার সঠিক ইংরেজি তার মনে এলো না। অথচ বাংলা অক্ষরও লিখবে না সে। এখন সে খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষা নিয়ে ইংরাজদের সমতুল্য হয়েছে, এখন তো আর ঐ নেটিভদের সামান্য ভাষা ব্যবহার করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

'ও গৌর, দু-চার দিনেতেই এত!!!' এই বাক্যটি সে প্রথমে লিখলো রোমান হরফে। তারপর ইংরেজিতে চিঠি শুরু করলো, "তুই যদি সত্যিই আমায় দেখতে চাস, তাহলে এখানে, এই ওল্ড চার্চ মিশান রো-তে চলে আয়। তুই নিশ্চয় বলবি, তোর গাড়িভাড়া নেই। ঠিক আচে, একটা পাল্কি ভাড়া করে সোজা চলেই আয় না, আমি ভাড়া মিটিয়ে দেবো। আমার কাচে এখানে ঢের ঢের টাকা রয়েচে। মিঃ কার-এর কাচ থেকে ছুটি নিয়ে চলে আয়...।"

কাম, ব্রাইটেস্ট গৌর দাস, অন আ হায়ার্ড পাল্কি
অ্যাংড সি দাই অ্যাংকশাস ফ্রেংড, এম এস ডি

সে চিঠি পেয়েও গৌর এলো না। মধুর মন খারাপ ক্রমশ পরিব্যাপ্ত হতে লাগলো। এক নতুন জগতে প্রবেশ করেছে সে, এত উৎসাহ উদ্দীপনা, এ সব কথা কি গৌরকে না জানালে চলে?

সে আবার একটি চিঠি লিখলো :

প্রিয় বন্ধু আমার, এক কবি তাঁর প্রেয়সীকে বলেছিলেন, "ক্যান আই সীজ টু লাভ দী! নো!" সেই কথাই আমি বলচি, আমার এক প্রিয়তর জনকে, এক বন্ধু, খাঁটি, (কী দুর্লভ এ জিনিস); খাঁটি বন্ধুকে।...তুই কেমন আচিস? কখনো ভাবিস না যে আমি তোকে ভুলে যাবো—তুইও যেন আমায় ভুলিস না।...কবিতা লিকচি...কোথায় ছাপা হবে জানিস, খোদ লন্ডনে! ভাবতে পারিস? বেণীর সঙ্গে দেখা হয়? কী আশ্চর্য ব্যাপার, বেণীকে আমি পছন্দ করি না, বেণীও আমায় দেখতে পারে না, অথচ ক'দিন ধরে বেণীর কথা বার বার মনে পড়চে। অন্য বন্ধুদের কথাও প্রায়ই ভাবি...ভূদেব মেডেলটা পেয়েচে?...তুই আসচিস নি কেন একবার। আয়, গৌর আয়, পাল্কি ভাড়া করে আসিস। আমি তো বলিচিই...

গৌরদাস এরপর এলো বটে, কিন্তু সঙ্গে প্যারীমোহনকে নিয়ে। প্যারীমোহন এর আগেও দু একবার এসেছে মধুর কাছে কিন্তু তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়নি। প্যারী খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছিল, গৌরদাসের কথাতেই মধু বশীভূত হতে পারে। সেইজন্য সে গৌরদাসের সঙ্গে এসেছে।

মধু ছুটে গিয়ে গৌরকে জড়িয়ে ধরতে গিয়েও পশ্চাতে প্যারীমোহনকে

দেখে থমকে গেল। ছদ্ম কোপের সঙ্গে বললো, প্যারীদাদা, তুমি ফের এয়োচো? আমি তো বলেই দিয়িচি, তোমাদের ও প্রস্তাব আমি মানবো না, মানবো না, মানবো না! তোমাদের কথা মতন আমি বিলেত যাওয়া এখন স্থগিত রেখিচি, তোমরা আর কী চাও?

প্যারীমোহন বললো, মধু, তুই একবারটি অন্তত বাড়ি চ।

মধু বললো, এ বাড়িতে আমায় মধু মধু বলে ডেকো না। এখন আমার নাম মাইকেল।

বলেই সে হা হা করে উচ্চশব্দে হেসে উঠলো। দুরন্ত শিশুর মতন হাসি। যেন সে কোনো অভিনব ফন্দীতে গুরুজনদের জব্দ করেছে।

গৌর বললো, মধু, তোর মাকে আমি কথা দিয়িচি, তোকে একবার নিয়ে যাবো।

মধু সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললো, গৌর, তুই অন্য যা কিছু অনুরোধ কর, শুধু ও কথা বলিসনি!

—কেন, এটা কি অন্যায় অনুরোধ?

—এ সব তুই বুঝবিনি।

প্যারীমোহন বললো, খুড়ী ঠাকুরানীর কষ্ট যে আমরা চোখে দেখতে পারি না আর। শোকে দুঃখে একেবারে পাগলের মতন হয়ে গ্যাচেন। মধু, তোর একবারও ইচ্ছে করে না অমন স্নেহময়ী জননীকে দেখে আসতে?

মধু উত্তর দিল, প্যারীদাদা, তুমি প্রতিদিন এই একই কথা বলো কেন? এর উত্তর তো আমি অনেকবার দিয়িচি।

গৌর বললো, মিস্টার মাইকেল এম এস ডাট্, তুমি যদি আর আমার কথা না শোনো, তবে আমায় এখানে আসবার জন্য পেড়াপীড়ি করো কেন? আমি আর আসবো না।

মধু গৌরের হাত চেপে ধরে বললো, তুই মিথ্যেই রাগ করচিস গৌর। তুই সব জানিস না। মাকে দেখতে আমার সাধ হবে না কেন? আমিও তো মায়ের হাতের পাখার বাতাস খাবার জন্য ছটফট করচি। এই বসন্ত ঋতুতেই কেমন ঘাম ছুটচে দেকচিস তো। পাংখা পুলার যতই হাওয়া করুক কিন্তু আমার মায়ের হাতপাখার বাতাস যেমন ঠাণ্ডা, তেমন আর কিছুই না। কিন্তু আমি বাড়ি গেলেই বাবা পাইক প্যায়দা দিয়ে আমায় আটক করে দেবেন।

প্যারীমোহন সঙ্গে সঙ্গে বললো, না, না, ঠাকুরখুড়া নিজে আমায় কথা দিয়েচেন। কেউ তোকে আটকাবে না।

গৌর বললো, আমি দায়িক রইলুম, তুই আবার ইচ্ছে মতন ফিরে আসবি।

মধু বললো, তুই লিকেচিলি, কুক্ষণে ডিয়ালট্রি সাহেব এদেশে এয়েচিলেন বলেই আমি খৃস্টান হয়েচি। তোর এ ধারণা ভুল। তোরা জানিস, আমার উপর জোর করে কিছু করিয়ে নেবার সাধ্যি কারুর নেই। পরম পিতা যীশুর পাদপদ্মে আমি নিজেকে সঁপে দিতে চেয়েছি স্বেচ্ছায়। আমি কারুর জোর-জবরদস্তি মানি না।

—বেশ মানলুম। তুই তা হলে মাকে দেখতে যাবি কি না?

—যাবো।

প্যারী তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমাদের পাল্কিওয়ালাটা চলে গ্যাচে বোধ হয়। আর একটা পাল্কি ডেকে আনি?

মধু বললো, রও, রও, প্যারীদাদা, অমন হটমট করচো কেন? যাবো বলে কি

এখুনি যাবো? আজ চার্চে একটা মেমোরিয়াল সার্ভিস রয়েচে, সেটা অ্যাটেণ্ড করতেই হবে। তারপর, কাল, না, কালও হবে না। ক্যাপটেন রিচার্ডসন কাল এখানে ডিনার খেতে আসচেন। পরশু যেতে পারি। ধরো, পরশু সকাল এগারোটায়।

গৌর বললো, তুই বুঝি তোর মায়ের সঙ্গেও অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে দেখা করতে যেতে চাস?

—অফ কোর্স? হোয়াই নট?

—চার্চে মেমোরিয়াল সার্ভিস তো সন্ধ্যাকালে। এখন এই সকালবেলা, তোর যেতে আপত্তি কী? তুই এখন যেতে চাস তো বল, নইলে তোর যা খুশী করিস!

মধু কাঁধ ঝাঁকাল। তারপর আপন মনে বলে উঠলো, বিকজ আই লাভ, রেসপেক্ট অ্যাণ্ড অনার দী, অ্যাণ্ড থিংক ইউ আর আ ম্যান অফ অনেস্টি? ঠিক আচে, চল।

কেউ একটুও অতিরঞ্জিত করে বলেনি, জাহ্নবী দেবী তখনও নিজ কক্ষের ভূঁয়ের ওপর বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। খোলা চুল লুটোচ্ছে পাশে। তাঁর একটি হাত যেন শক্ত সিমেণ্টের মেঝেকেই আঁকড়ে ধরতে চাইছে।

জুতো না খুলেই মধু দ্রুত এসে কাছে বসে পড়ে ডাকলো, মা!

সেই ডাকে যেন ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হলো। যেন প্রবল একটি আঘাতে জাহ্নবী তড়াক করে উঠে পড়ে ভয়ার্ত গলায় বললেন, কে?

পর মুহূর্তেই ঘোর কেটে গেল। তিনি পুত্রকে জড়িয়ে ধরে উন্মাদিনীর মতন বলতে লাগলেন, মধু, মধু, মধু, মধু। মধুও সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগলো মা, মা, মা, মা।

প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কেটে যাবার পর জাহ্নবী তাঁর হৃদয়ের নিধির দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ম্লান গলায় বললেন, বাছা, তুই আমায় এমন দাগা দিলি? দিতে পারলি?

মধু বললো, মা, দ্যাখো, আমি তো তোমার সেই মধুই রয়িচি। আমার চোখ, মুখ, কান, হাত, পা কিছুই কি বদলেচে? আমি কি অন্য রকম কথা কইচি? আমার মনের বিশ্বাস শুধু অন্য রকম হয়েচে। কিন্তু তোমার ছেলে তো তোমারই রয়েচে, মা!

—ওরে, কত মানুষের ছেলেদের যমে কেড়ে নিয়ে যায়। তোকে সাহেবরা কেড়ে নিয়ে গেল আমার কোল থেকে।

—আমায় কেউ কেড়ে নেয়নি। এই দ্যাখো না, আমি নিজের ইচ্ছেতে এসিচি তোমার কাচে।

—তুই আবার চলে যাবি?

প্যারীমোহন গিয়ে খবর দিয়েছিল রাজনারায়ণ দত্তকে। প্রথমে তিনি আসতে চাননি। ছেলে এসে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তবে তিনি ছেলের সঙ্গে কথা বলবেন। প্যারী প্রায় হাতে পায়ে ধরে অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে তাঁকে একবার নিয়ে এলো। কেননা, প্যারীর ভয় ছিল, মধু শুধু তার মায়ের সঙ্গে দেখা করবার কড়ারে এসেছে, হয়তো শুধু মাকে দেখেই চলে যাবে। তাতে রাজনারায়ণ দত্ত আরও অপমানিত হবেন।

দ্বারের কাছে এসে দাঁড়ালেন রাজনারায়ণ দত্ত। তাঁর ছায়া এসে পড়লো মধুর শরীরে। রাজনারায়ণের মুখ উৎকট গাম্ভীর্য মাখানো। যেন সেই গাম্ভীর্য দিয়েই

তিনি তাঁর আহত অহংকার ঢাকতে চান। মধুও ঘাড় শক্ত করে রইলো।

মাত্র বৎসরকাল আগেও পিতা ও পুত্র ছিল দুই বন্ধুর মতন। আর এখন যেন মুখোমুখি দুই যুযুধান।

রাজনারায়ণ জলদ স্বরে বললেন, আমি পুরুত বামুনদের সঙ্গে কথা কয়িচি। প্রায়শ্চিত্তি করাবার কোনো অসুবিধে হবে না। তারা নিদেন খুঁজে বার করেচে। দু-পাঁচশো বামুনকে শাল-দোশাল দিয়ে একদিন পেট পুরে খাইয়ে দিলেই হবে। আর তোকে এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে পঞ্চগব্য খেয়ে দুটো চারটে মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে। শুভস্য শীঘ্রং, আমি ব্যবস্থা নিচ্চি, এ হপ্তার মধ্যেই সব হয়ে যাবে।

মধু উঠে দাঁড়িয়ে তেজের সঙ্গে বলে উঠলো, বাবা, আপনি একটা কথা শুনে রাখুন, যদি আকাশে চন্দ্র সূর্য না ওঠে, যদি পুবের বদলে পশ্চিমে সূর্যের উদয় হয়, তা হলেও আমি প্রায়শ্চিত্ত করবো না! আমি নিজের জ্ঞান বুদ্ধি মতে খৃষ্টান হয়িচি! আমি বর্বর হিন্দু সমাজ ছেড়ে সুসভ্য ইংরাজদের সমকক্ষ হয়িচি!

ক্রোধে রাজনারায়ণের শরীর কম্পিত হতে লাগলো। তিনি বললেন, দূর হয়ে যা! আর কোনোদিন যেন তোর মুখ আমায় দেখতে না হয়!

লম্বা অলিন্দ ধরে হাঁটতে লাগলেন রাজনারায়ণ। বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন, ও আমার ছেলে নয়! ও আমার কেউ নয়! বিধর্মী, ও কালসর্প। ওকে আমি মন থেকে মুচে ফেলবো। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।

এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে রাজনারায়ণ আবার ভাবলেন, আমার পুত্র নেই। আমি ম'লে আমার মুখাগ্নি করার কেউ রইলো না। আমাকে পুন্নাম নরকে যেতে হবে।

মুখমণ্ডল কঠিন করে তিনি সেইক্ষণেই শপথ নিলেন, তিনি আবার বিবাহ করবেন। আর একটি পুত্র সন্তান তাঁর চাই-ই চাই।

মধুর বেশ সুবিধেই হয়ে গেল। পিতার এবম্বিধ কঠিন ব্যবহার গৌর প্রত্যক্ষ করেছে। সুতরাং এ রকম একজন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী থাকার ফলে অন্যান্য বন্ধু ও শুভার্থীদের কাছে মধু এর পর থেকে অনায়াসেই বলতে পারে, পিতা চান না, সে বাড়ি ফিরবে কী করে? মাঝে মাঝে সে অবশ্য লুকিয়ে চুরিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং মুঠো মুঠো টাকা পকেট ভরে নিয়ে যায়। বিলাসিতা তার অহংকারের আশ্রয়। প্রচুর অর্থ না থাকলে তার স্বস্তি হয় না।

প্রথম কিছুদিন তার অসুবিধে হলো পড়াশুনোর ব্যাপারে। শিক্ষা অর্জনে তার অদম্য উৎসাহ। কিন্তু হিন্দু কলেজে তার প্রবেশ অধিকার নেই। হিন্দু ছাড়া আর কোনো ছাত্র সেখানে পড়তে পারে না। বেশ কয়েক মাস মধু বিভিন্ন পাদ্রীদের গৃহে অবস্থান করে তাঁদের কাছ থেকেই পাঠ গ্রহণ করতে লাগলো। এই যুবকটির মেধা ও আগ্রহ দেখে বহু সাহেবই মুগ্ধ ও বিস্মিত। তাঁরাই পরামর্শ দিলেন মধুকে বিশপস কলেজে ভর্তি হবার জন্য।

বিশপস কলেজে আবাসিক ছাত্র হওয়া রীতিমতন ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। প্রতি মাসে ষাট টাকা করে লাগে। মায়ের কাছ থেকে নিয়মিত এত টাকা পাবার সম্ভাবনা নেই, তাই মায়ের মারফৎ কথাটা সে তার পিতার কানে তোলালো। রাজনারায়ণ দত্ত নিজের পুত্রকে অস্বীকার করলেও লোকে এখনো মধুকে বলে, রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে। এর পরেও মধু যদি পাদ্রীদের কাছে ভিক্ষাজীবী হয়, তাতে রাজনারায়ণেরই মান ক্ষুণ্ণ হবে। পত্নীর হাত দিয়েই তিনি পুত্রের জন্য মাসিক একশো টাকা বরাদ্দ করে দিলেন।

বিশপস কলেজে মধু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছাত্র। সেখানে খাঁটি ইওরোপীয়

যুবকেরা পড়ে, আর রয়েচে কিছু দেশীয় খৃষ্টান। নিঃসন্দেহে এদের সকলের মধ্যে মধু সবচেয়ে বেশী উজ্জ্বল। ক্লাসিকাল ল্যাঙ্গোয়েজ বিভাগে মধু গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু এবং সংস্কৃত শিক্ষা করতে লাগলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে। ভাষা শিক্ষায় তার দ্রুত কৃতিত্বে শিক্ষকরা মুগ্ধ। আবার এই মধুই এক একদিন ক্লাসে অসম্ভব দৌরাত্ম্য করে। কলেজের নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে প্রায়ই। সন্ধ্যাকালে সে বিলাসী পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে প্রমোদ সন্ধানে যায়, যখন ফেরে, তখন তার মস্তক ও পদদ্বয় টালমাটাল।

কলেজে ভর্তি হবার প্রথম কয়েক দিনের মধ্যেই মধু একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে তুললো। সে দেখলো যে, ইওরোপীয় ছাত্র ও দেশী খৃষ্টান ছাত্রদের দু রকম পোশাক। সে ভেবেছিল, খৃষ্টান ধর্মে কোনো জাতিভেদ নেই, মানুষে মানুষে সমভ্রাতৃত্বই এই ধর্মের সার কথা। তবে দু রকমের পোশাক কেন?

মধু ইওরোপীয় ছাত্রদের মতন কালো ক্যাসক, কোমরবন্ধ ও চতুষ্কোণ টুপী পরিধান করে ক্লাসে এলো একদিন। সব ইওরোপীয় ছাত্ররা আড়চোখে দেখতে লাগলো তাকে। শিক্ষক মহাশয় পড়ানো বন্ধ করলেন এবং অধ্যক্ষ মহাশয় ছুটে এলেন। তিনি মধুকে বললেন, প্রিয় বৎস, যদি ক্যাসক পরিধান করিতেই চাও তো সাদা রঙের পরিধান করিও।

মধু উঠে দাঁড়িয়ে বললো, না, মহাশয়। হয় ইওরোপীয় পোশাক পরিধান করিব, নয় তো আমার পছন্দ মতন দেশীয় পোশাক।

অধ্যক্ষ বললেন, বেশ, দেশীয় পোশাকেই আসিও।

মধু মুচকি হেসে তখুনি মনে মনে মতলব ভেঁজে নিল। এবং পরদিন ক্লাসে সে বাধিয়ে দিল আরও এক হুলস্থূল কাণ্ড। লেখাপড়া সব মাথায় উঠলো, সমস্ত কলেজের ছাত্ররা নিজ নিজ ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে এসে দেখতে লাগলো মধুকে। সেদিন মধু পরেছে সাদা সিল্কের কাবা, গলায় বহু রঙের কাজ করা শালের কার্ফ এবং মাথায় উকিলদের মতন বিরাট রঙীন পাগড়ি। মধু যেন সেদিন কোনো 'গো অ্যাজ ইউ লাইক' প্রদর্শনীর নায়ক। আবার ছুটে এলেন অধ্যক্ষ।

এমন ছেলেকে একটি ধর্মীয় বিদ্যালয়ে রাখা নিরাপদ নয়। অধ্যক্ষ ও কলেজ কর্তৃপক্ষ মধুকে নিয়ে একটি সভায় বসলেন। সেদিনই মধুর নাম কাটা যেত, কিন্তু রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পরামর্শ দিলেন, মধুর ওপর যদি এমন কঠোর নীতি প্রয়োগ করা হয়, তা হলে এর পর আর সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেদের খৃষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা সুদূরপরাহত হবে। অনেক বিচার বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ কৃষ্ণমোহনের পরামর্শই মেনে নিলেন। মধু ইওরোপীয় ছাত্রদের মতনই পোশাক পরবার অনুমতি পেল।

এরপর মাইকেল এম এস ডাট পাক্কা সাহেব। ক্লাস করবার সময় তার পাদ্রীদের মতন পোশাক আর তার সায়ংকালীন প্রমোদযাত্রায় ইংলিশ কোট ও মাথায় বীভার হ্যাট।

আবার একদিন অধ্যক্ষ নিজ কক্ষে ডেকে পাঠালেন মধুকে। ঈষদুষ্ণ কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন, বৎস, তুমি গতকল্য গীর্জায় উপাসনার সময় হাসিয়াছিলে কেন?

মধু বললো, আমাদের মাননীয় পাদ্রী বাংলাভাষায় উপদেশ দিতেছিলেন কিনা!

অধ্যক্ষ ভর্ৎসনা করে বললেন, তুমি নিজে বঙ্গবাসী, তবু বঙ্গভাষা শুনিলে তোমার হাস্য উদ্রেক হয়? ছিঃ!

বাংলা ভাষাকে মধু নিজের জীবন থেকে ত্যাগ করেছিল। সে এখন খৃষ্টান, সে ইংরেজদের স্বজাতি, সে ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনা করে অমর হবে। বাংলা ভাষা দিয়ে তার প্রয়োজন কী? কিন্তু গীর্জার উপাসনায় অকস্মাৎ বাংলা ভাষার ব্যবহার তার বিস্ময় উদ্রেক করে।

অধ্যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে সে বললো, মহাশয়, উপাসনার সময় আমাদের মাননীয় পাদ্রী কী ধরনের বাংলা বলিতেছিলেন আপনি জানেন কি? তিনি বলিতেছিলেন, "আমরা তাম্বু ফেলিলাম, সন্ধ্যা হইল, বায়ু বহিল, কুকুর-বিড়াল বৃষ্টি পড়িল, কল্য উঠাইয়া লইলাম, এবং অন্য স্থানে তাম্বু গাড়িলাম!" এই কি বাংলা? বাংলা ভাষা এত যাহা তাহা নহে। এই ধরনের বিলাতি বাংলা শুনিলে হাস্যই আসে, ইহার পরিবর্তে ইংরাজি বলাই শ্রেয়

এর পরের ঘটনাটি অবশ্য আরও অনেক গুরুতর। সেটি ঘটেছিল ডাইনিং হলে।

সন্ধ্যার সময় ছাত্রেরা ইচ্ছে মতন বাইরে ঘুরে আসে। কে কোথায় যায়, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। তবে নৈশভোজের ঘণ্টাধ্বনির সময় সব ছাত্রের ডাইনিং হলে এসে উপস্থিত হবার কথা। মধু অবশ্য দু একদিন অধিক রাত করে ফেলে, কিন্তু ইতিমধ্যেই তার সম্পর্কে নিয়ম কানুন একটু শিথিল। সে যতই উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন করুক, অধ্যয়নের ব্যাপারে সে যে এই কলেজের গৌরব। কোনো কোনো ছুটির দিনে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মধু শুধু দু'বেলা আহারের সময় ছাড়া আর একবারও নিজের ঘর থেকে নির্গত হয় না। অনবরত শুধু বই পড়ে যায়।

সেরকমই একটি দিনে মধু নৈশভোজের ঘণ্টাধ্বনি শুনে ডাইনিং হলে উপস্থিত হয়েছে। সারাদিনের পরিশ্রমে সে ক্লান্ত। তবু আহার সেরেই সে আবার বই নিয়ে বসবে। ইদানীং সে এতই ব্যস্ত যে গৌরদাস বসাকের চিঠির উত্তর দেবারও সময় পায় না। মূল ভাষায় সে ভার্জিল ও হোমার পড়তে শুরু করেছে।

ইউরোপীয় প্রথা অনুযায়ী আহারের পূর্বে দু' এক পেগ হাল্কা সুরা পরিবেশন করা হয়। সারাদিন মধু কিছু পান করেনি, তাই সে ঐটুকু সুরার জন্যই উন্মুখ হয়েছিল। হঠাৎ সে দেখলো, পরিচারক শুধু শ্বেতাঙ্গ ছাত্রদেরই সুরা পরিবেশন করে গেল, কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গদের গেলাস শূন্যই পড়ে রইলো।

ক্রোধে কুঞ্চিত হয়ে গেল মধুর মুখ। এই ক্রোধ সে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, প্রথমে সে জিভের তলায় আঙুল দিয়ে একটা তীক্ষ্ন শিস দিল। তারপর ডান হাতের তর্জনী হেলন করে ডাকলো, স্টুয়ার্ড, কাম হিদার!

পরিচারকটি এগিয়ে আসার পর মধু নিজের শূন্য গেলাসটির দিকে ইঙ্গিত করে বললো, এটি পূর্ণ করোনি কেন?

পরিচারক বললো, আজ আমাদের ভান্ডারে সুরা কিছু কম আছে, তাই সকলকে দেওয়া যায়নি।

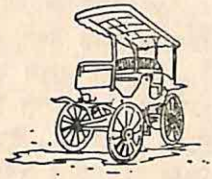
মধু বললো, তাহলে সব ইওরোপীয় ছাত্ররা পেল কী করে? একজনও দেশীয় ছাত্র পায়নি কেন? তোমার যদি অল্প সুরা থাকে, তবে প্রথম থেকে শুরু করে যে-ক'জন পাবে তো পাবে। এটাই নিয়মসঙ্গত নয় কি?

পরিচারকটি কাঁচুমাচু হয়ে বললো, আমাদের ওপর নির্দেশ আছে, প্রথমে শ্বেতাঙ্গ ছাত্রদের, তারপর অন্যদের...

মধু উঠে দাঁড়িয়ে সিংহগর্জনে বললো, ইউ বী ড্যামড্! দোজ ইনসট্রাকশানস বী ড্যামড্!

সঙ্গে সঙ্গে মধু নিজের শূন্য গেলাসটা ছুঁড়ে মারলো মাটিতে। শুধু

নিজেরটা নয়, আশপাশের কয়েকজন কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্রের গেলাস তুলে নিয়ে সে ঝন্ঝন শব্দে ভাঙতে লাগলো।



মানিকগঞ্জের জমিদার পূর্ণচন্দ্র রায় যাবেন কলকাতা দর্শনে। বাঙাল দেশের লোক, আগে কখনো পদ্মা পার হননি, রাজধানী কলকাতা সম্পর্কে মনের মধ্যে কিছুটা ভয় ভয় ভাব আছে। কিন্তু দেশ গাঁয়ে আমোদ ফূর্তির মধ্যে কোনো বৈচিত্র্য নেই, একটু বিদেশ ঘুরে আসার জন্য মন ঘুর ঘুর করে। তা ছাড়া একটি মাতৃদায়ও রয়েছে। পরপর দু বৎসর উত্তম ফসল হওয়ায় আদায়-তহশিলও ভালো, সারা বাড়িতে টাকার থলিগুলি ঝমর ঝমর করে নাচে। তাই বাবু পূর্ণচন্দ্র বর্ষার পরই ঘুরে আসা মনস্থ করলেন।

পূর্ণচন্দ্রের পিতা গত হয়েছেন অনেকদিন আগেই। তাঁর মা অনঙ্গমোহিনী ছিলেন অতি জাঁদরেল নারী, নাবালক পুত্রের হয়ে তিনিই জমিদারী শাসন করতেন অতি দক্ষতার সঙ্গে। এমনকি পূর্ণচন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হলেও অনঙ্গমোহিনী একটুও রাশ আলগা করেননি, পুত্র তখন নামে মাত্র জমিদার হলেও সমস্ত কর্তৃত্ব ছিল তাঁর হাতে। বৎসর দেড়েক আগে সেই অনঙ্গমোহিনীও স্বর্গারোহণ করেছেন। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তিনি পুত্রকে বলেছিলেন, বাবা পূর্ণ, মা কালীর কাছে আমার একটা মানত আছে, তুই কালীঘাটে মায়ের পূজা দিয়া আসিস, নইলে আমার আত্মা স্বর্গে গিয়াও তৃপ্তি পাবে না।

মানতটি অবশ্য পূর্ণচন্দ্র সম্পর্কেই, মায়ের মৃত্যুকালে পূর্ণচন্দ্রের বয়স উনত্রিশ কিন্তু তখনও বংশে নতুন উত্তরাধিকারী আসেনি। নাতির মুখ দেখার জেদে অনঙ্গমোহিনী আট বৎসরের মধ্যে পাঁচবার পুত্রের বিবাহ দিয়েছেন। সেই পাঁচটি বধূই এ বাড়িতে থাকে কিন্তু তারা কেউই স্বামীকে একটিও সন্তান উপহার দিতে পারেনি। কালাশৌচ কেটে যাবার পর ইয়ার বন্ধুরা পূর্ণচন্দ্রকে আর একবার দার পরিগ্রহ করার পরামর্শ দিচ্ছিল, তার আগে পূর্ণচন্দ্র ঠিক করলেন একবার কালীঘাটটা ঘুরে আসা যাক।

পাশের পরগণার জমিদার ইব্রাহিম শেখের সঙ্গে পূর্ণচন্দ্রের দোস্তি আছে। ইব্রাহিম শেখ বুঝদার লোক, ইতিমধ্যে তিনি দুবার ঘুরে এসেছেন কলকাতা থেকে। সুতরাং পূর্ণচন্দ্র গেলেন তাঁর কাছে পরামর্শ নিতে।

ইব্রাহিম শেখ পথের সুলুক সন্ধান দিয়ে দিলেন এবং কলকাতার এমন একটি চিত্র আঁকলেন যাতে পূর্ণচন্দ্র একেবারে তাজ্জব। জল নাকি জমে শক্ত হয়ে যায় এবং তা কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খায় কলকাতার মানুষ। আরও কতক মানুষ নাকি দিনের বেলা ঘুমোয় ও রাতের বেলা জেগে থাকে। মুসলমান মেয়েমানুষের বাড়িতে হিন্দু বাবুরা যায় এবং কসবীর আম্মাকে মা বলে ডাকে।

পূর্ণচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, ভাইডি, একটা কথা কও তো। শুনছি, কইলকাতায় গ্যালেই সাহেবরা নাকি সক্কলডিরে ধইরা ধইরা খৃষ্ঠান কইরা দেয়? তোমারে ধরতে আসে নাই?

ইব্রাহিম শেখ অহংকারী পুরুষ, মুসলমান জাতির পূর্ব গৌরব সম্পর্কে

সদা সজাগ। তিনি বললেন, আমারে খৃষ্টান করতে আইব কুন পুঙ্গির পুত? হ্যারে তার মায় এখনো জন্ম দেয় নাই।

পূর্ণচন্দ্র বললো, ভাই তোমাগো মুসলমানগো সাহেবরা এখনো ডরায়। কিন্তু হিন্দুগুলোর উপর নাকি খুব অইত্যাচার করে?

ইব্রাহিম শেখ বললো, দোস্ত, আমি কইলকাতা থিকা অইন্য খবর শুইন্যা আইছি। তোমাগো হিন্দুগো সর্বনাশ করতে আছে হিন্দুরাই। হিন্দু ধর্ম আর বুঝি রইল না। ইংরাজি ল্যাখাপড়া শিখ্যা এক দলের মাথা বিগড়াইয়া গ্যাছে, তারা হিন্দুদের জবরদস্তি কইরা বেম্মজ্ঞানি কইরা দিতাছে।

—কী কইরা দিতাছে?

—বেম্মজ্ঞানি। হেডা কী বস্তু তা তোমরাই ভালো বোঝবা। আমি দ্যাখলাম, সিঁদুরিয়াপট্টিতে একদল বাবুরে দেইখ্যা রাস্তার লোকেরা বেম্মজ্ঞানি বেম্মজ্ঞানি কইরা তরাসে চিল্লাইতে চিল্লাইতে আগল বাগল দৌড়াইয়া পলাইয়া গ্যালো।

ইংরাজি শিক্ষার ঢেউ পূর্ব বাংলার এতদূর অভ্যন্তরে পৌঁছোয়নি। পূর্ণচন্দ্র অতি অল্প কিছুদিন এক মুন্সীর কাছে সামান্য ফার্সী পড়েছিলেন এবং বাংলায় নাম সই করতে পারেন মাত্র। বেম্মজ্ঞানি কথাটার অর্থ তিনি কিছুই বুঝলেন না। বেম্মদৈত্যের নাম শুনেছেন, সেরকমই একটা কিছু বলে মনে হলো।

ভয়ে বিবর্ণ মুখে তিনি বললেন, তাহলে আর কইলকাতায় গিয়া কাম নাই। জাত খোয়াইতে পারমু না। স্বর্গ থিকা মায় আমারে অভিশাপ দিবে।

ইব্রাহিম শেখ তখন আশ্বাস দিয়ে বললেন, দুই চাইরজন পাইক লাঠিয়াল নিয়া যাও সঙ্গে। কইলকাতার মানুষ দুইডা জিনিসরে বড় মাইন্য করে। পেয়াদা আর পয়সা। পেয়াদার লাঠি দ্যাখলেই ভয়ে পলায় আর পয়সা ছড়াইলেই পায়ের উপর আইস্যা পড়ে। পয়সা ছড়াও আর লাথ্থি মারো, কইলকাতায় এই একটা বড় সুখ।

শুভক্ষণ দেখে পূর্ণচন্দ্র কয়েকজন দেহরক্ষী নিয়ে বজরায় ভেসে পড়লেন। দিন সাতেক পর লালগোলার কাছে চড়ায় আটকে গেল সেই বজরা। সে আর কিছুতেই নড়ানো যায় না। এখান থেকে স্থলপথে তিনি পালকিতে যেতে পারেন বটে কিন্তু ইব্রাহিম শেখ বারবার বলে দিয়েছেন, নিজস্ব বজরা না নিয়ে গেলে খাতির পাওয়া যায় না কলকাতা শহরে। সুতরাং পুরোনো বজরা সেখানেই ফেলে রেখে, লোক লাগিয়ে দেখে শুনে একটি বজরা কিনে ফেললেন এবং ভগবানগোলা থেকে সেই বজরায় আবার যাত্রা শুরু করলেন। যথাসময়ে বাগবাজারের ঘাটে এসে ভিড়লো তাঁর সেই নতুন বজরা।

এই সব ঘাটে মোসাহেব ও দালালরা সদাপ্রত্যহ ছোঁক ছোঁক করে। এখান থেকেই বাবু পাকড়াতে হয়। তীর্থস্থানের পাণ্ডাদের মতন দালাল মোসাহেবরা কে আগে কোন্ বাবুকে পাকড়াবে তা নিয়ে রীতিমতন প্রতিযোগিতা ও ধুন্ধুমার কাণ্ড চলে। বিশেষত বাঙাল দেশের বড়মানুষ দেখলে তাদের আমোদ আর ধরে না। বাঙাল দেশের বড়মানুষরা প্রত্যেকেই এক একটি যেন নধর পাঁঠা।

পূর্ণচন্দ্র যে দুই দালালের এক্তিয়ারে পড়লেন, তাদের নিজস্ব নাম যা-ই থাক, লোকে তাদের নন্দী ও ভৃঙ্গী বলে ডাকে। সেই নন্দী ও ভৃঙ্গী পূর্ণচন্দ্রের বজরায় উঠে ষাষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করলো।

কলকাতা যতই এগিয়ে আসছিল, ততই পূর্ণচন্দ্রের বক্ষের ধুকপুকানি

বাড়ছিল। কোন্ আজব জায়গা দেখবেন কে জানে! পাইক লাঠিয়ালদের প্রস্তুত থাকতে বলে তিনি উত্তেজনা প্রশমনের জন্য সুরাপান শুরু করে দিলেন, বাগবাজারে এসে যখন পৌঁছোলেন তখন তাঁর টপভুজঙ্গ দশা। এই সময় তাঁর ভীরুতা, দুর্বলতা একেবারে উপে যায়, সুরাপান করলেই তিনি শের। মা জীবিত থাকতে তিনি কখনো ও জিনিস স্পর্শ করতেও সাহস পাননি, মাত্র এই দেড় বৎসরেই পূর্বেকার সব তৃষ্ণা মিটিয়ে নিয়েছেন।

রক্তাক্ত চক্ষে কামরার বাইরে এসে তিনি গর্জন করে বললেন, তোমরা কেডা? আমার বজরায় আইছ কার হুকুমে?

নন্দী ও ভৃঙ্গী হাত জোড় করে বললো, হুজুর, আমরা আপনার দাসানুদাস। আপনার সেবা করবার জন্য আমরা হাজির হইচি।

দোস্ত ইব্রাহিম শেখের পরামর্শ মনে রেখে পূর্ণচন্দ্র তাঁর রেশমী কুর্তার পকেট থেকে দু মুঠো টাকা বার করে ছুঁড়ে দিলেন ওদের দুজনের সামনে। ওরা সাগ্রহে সেই টাকা কুড়িয়ে নেবার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়তেই পূর্ণচন্দ্র দুজনের পশ্চাৎদেশে ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ করে দুটি লাথি কষালেন।

মারের আকস্মিকতায় ঈষৎ চমকে উঠলেও নন্দী ও ভৃঙ্গী বিগলিত হাসিমুখ করে রইলো। দুধেল গোরু তো মাঝে মাঝে চাঁট মারবেই।

পূর্ণচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, কেমন লাগলো?

নন্দী ভৃঙ্গী একসঙ্গে বলে উঠলো, আহা কী কোমল আপনার পা, যেন পদ্মফুল দিয়ে গড়া। যেন ছিরিকেষ্টর পদাঘাত, আমরা হলুম গে রাধিকে। আর একবার মারুন।

পূর্ণচন্দ্র হৃষ্ট হয়ে বললেন, বাঃ বেশ!

তারপর নিজের লোকজনদের দিকে ফিরে বললেন, দেখলি? কেমন সোন্দর কথা কয়? কইলকাতা শহরের সহবৎই আলাদা।

নন্দী ভৃঙ্গী কাজে নিযুক্ত হয়ে গেল। একটি বাসা ভাড়া করা হলো রামবাগানে। তারপর মচ্ছব চলতে লাগলো কয়েকদিন ধরে। বাঙাল পূর্ণচন্দ্রকে শহুরে বাবু করে তোলার জন্য নন্দী ভৃঙ্গী উঠে-পড়ে লাগলো। পূর্ণচন্দ্রের পোশাক আসাক ও মাথার চুল দেখলেই বাঙাল বলে চেনা যায়, কথা বললে তো আর রক্ষে নেই। রাস্তা দিয়ে দশ বারোজন পারিষদ পরিবৃত হয়ে পূর্ণচন্দ্র যখন চলেন, অমনি ফচকে ছোঁড়া, কুঠীওয়ালা ও গেঁজেল গুলিখোররা চেঁচিয়ে ওঠে, বাঙাল ভিড়েচে! বাঙালের মরণ! মাথাখানা দ্যাখ, যেন কাতলা মাছ!

এসব কথায় পূর্ণচন্দ্রের মনে বড় ব্যথা লাগে। তাই নাপিত ডেকে তাঁর চুল ছাঁটিয়ে দেওয়া হলো। নন্দী ভৃঙ্গী বোঝালো যে ঘাড়ের কাছের চুল সব ছেঁটে ফেললে ঘাড়ে বাতাস লাগে, বুদ্ধি খোলসা হয়, সেইজন্যই কলকাতার সব বড় বড় বাবুদের ঘাড় ছাঁটা। বেশী চুল রাখতে হয় মাথার সামনের দিকে, সেটা হলো গিয়ে শোভা, যেমন মোরগের মাথার ঝুঁটি। পূর্ণচন্দ্রবাবুর পোশাক ছিল ফিন-ফিনে আটহাতি নতকলকা ধুতি, তার ওপর নবাবী আমলের খাজাঞ্চিদের মতন রেশমী বেনিয়ান আর পায়ে শুঁড়ওয়ালা নাগরা। এসব ছাড়িয়ে তাকে পরানো হলো দো-নলা প্যাণ্টালুন, লালদীঘির ধারের দোকানের আলপাকার চায়না কোট আর গরানহাটার ইংলিশ জুতো। মাথায় হাকিমী পাগড়ি। কোটের বুক পকেটে ওয়াচগার্ড সংবলিত ঘড়ি, হাতে হীরের আংটি এবং সর্বদা সঙ্গে রাখেন ফুকো-শিশি ভরা আতর। এই রূপে পূর্ণচন্দ্র ভব্য হলেন।

বাবুর জন্য সকলরকম কেনাকাটার কাজেই দালালরা দু দফা দস্তুরি পায়।

কিন্তু সবচেয়ে বেশী দস্তুর মেয়েমানুষে। এই বাসা বাড়ির খুব কাছেই অবিদ্যাদের আশ্রয়স্থল। অবশ্য এ শহরের কোথাই বা তারা নেই, সর্বত্রই তাদের অধিষ্ঠান। পূর্ণচন্দ্র এক জোড়া বড় সাদা ঘোড়া সমেত একটি ফেটিং গাড়ি কিনেছেন, সেই গাড়ি এক এক রাত্রে থামতে লাগলো এক এক বারবনিতার বাড়ি। ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত সুকুমারী নাম্নী এক অল্পবয়েসী বারবনিতার প্রতি তাঁর মন মজে গেল।

সুকুমারীর বয়েস উনিশ। চিকন পাতলা গড়ন, মেম-পারা গায়ের রঙ, মাথা ভর্তি কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। সুকুমারীরা তিন পুরুষের বেশ্যা, তার মা চুনীবালা (ডাক নাম পোঁটা চুন্নি) সদ্য কাজ থেকে অবসর নিয়ে বাড়িউলি মাসি হয়েছে। সুকুমারীরও খুব পছন্দ হয়ে গেল পূর্ণচন্দ্রকে। মানুষটি বেশ আলাভোলা, যখন মদ খায় না তখন মিনমিন করে আর একটু মদ পেটে পড়লেই অন্য চেহারা। সন্ধ্যে হতে না হতেই ব্র্যান্ডি আর শ্যাম্পেনের স্রোত বইতে থাকে সুকুমারীর ঘরে। নন্দী আর ভৃঙ্গী চোঁ-চোঁ করে মদ গিলতে পারে এবং সহজে তারা বেহেড হয় না, তারা নানারকম সরেস গল্প বলে পূর্ণচন্দ্রের মন খুশী রাখে। ওদের খেইচি, গিইচি ধরনের কথার সব অর্থ বুঝতে পারেন না পূর্ণচন্দ্র, তবু শুধু কথা শুনেই হেসে গড়াগড়ি যান। নেশা বেশ খানিকটা জমে উঠলে পূর্ণচন্দ্র অধিকতর মজার জন্য পকেট থেকে পাঁচ দশ টাকা বার করে হুংকার দেন, নন্দী!

নন্দী অমনি বুঝতে পারে, টাকাগুলো হাত পেতে নিয়ে সুবোধ বালকের মতন পশ্চাদ্দেশটি ঘুরিয়ে বসে আর পূর্ণচন্দ্র সজোরে সেখানে লাথি কষান। তারপর ভৃঙ্গীর পালা। সত্যি, কী শুলুকই দিয়েছে ইব্রাহিম শেখ, এমন মজা আর হয় না।

সুকুমারীও এতে দারুণ আমোদ পায়। সে বলে, ওগো, আমায় ট্যাকা দাও, আমায় ট্যাকা দাও, আমিও নাতি মারবো!

ইঁদুরমুখো তবলা বাজনদারটি হাঁ করে চেয়ে থাকে। একদিন সে বলেই ফেললো, হ্যাঁ মোশাই, আপনাদের দেশে বুঝি নাথি মারবার লোক নেই? সবাই সেখানে জমিদার?

পূর্ণচন্দ্র বলেন, থাকবে না ক্যান? কিন্তু নিজের দ্যাশে লাথথি মারায় সুখ নাই। আমার প্রজাগো আমি যারে খুশী লাথ্থি মারতে পারি, বাঁশ দিয়ে ডলাইতে পারি, পোঙায় হুড়কা দিতে পারি, কিন্তু হ্যারা হইল আমার প্রজা, হ্যারা তো টু শব্দও করবে না!

তবলা বাজনদারটি বলে, বুইচি, দৈনিক দু চারটি নাথি না মেরে আপনারা জলখাবার খান না। আমরা এখেনে অনেক বাবু দেকিচি, কিন্তু এসব নাথি-মারা বাবু আগে দেকিনি!

নন্দী বললো, এমন নাথি নাথি করছো কেন গা? এ হলো গে হুজুরের স্নেহাশীর্বাদ।

ভৃঙ্গী বললো, তোর বুঝি হিংসেয় বুক জ্বলচে? চুম্ মেরে থাক। তবলা চাঁটানো কাজ, তবলা চাঁটা!

সুকুমারী জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ গা বাবু, তোমাদের দেশে তো শুনিচি চারদিকে শুদু জল। তোমরা এ বাড়ি ও বাড়ি কী করে যাও? সাঁতরে?

নন্দী বললো, বাবু কত বড় বজরা এনেচেন, জানিস? এই অ্যাত্তবড়, দুখানা

বাড়ির সমান। বাবুর দেশে কত নৌকো, কত বজরা, বাবু সাঁতরে যাবেন কোন্ দুঃখে?

ভৃঙ্গী বললো, চাদ্দিকে জল হলে কী হবে, তার মধ্যে বাবুর রাজপ্রাসাদখানি যেন ইন্দ্রের ঐরাবত!

পূর্ণচন্দ্র বললেন, ঐরাবত না তোমার মাথা! আমার বাড়ি থিকা সাত মাইল দূরে ম্যাঘনা নদী, তাছাড়া সব দিক শুকনা। আমি জমিদারি দ্যাখতে ঘুরায় চইড়া যাই।

সুকুমারী জিজ্ঞেস করলো, ঘুরায়?

পূর্ণচন্দ্র বললেন, হ্যা হ্যা, ঘুরা। ছুট ছুট ঘুরা। কিন্তু ছুট হইলে কী হয়, তাগৎ খুব। ঠিক যেন পংখীরাজ!

ছুট ছুট ঘুরা, ছুট ছুট ঘুরা, এই কথা বলতে বলতে সুকুমারী হাসতে হাসতে গড়াগড়ি দেয়।

সুকুমারীর মা পোঁটাচুন্নি বসে থাকে পাশের ঘরে। মেয়ের ঘরে যখন বাবু থাকবে, তখন সে কক্ষনো সে ঘরে ঢুকবে না, এটাই নিয়ম। মোসাহেবরা মাঝে মাঝে মদের গেলাস ভরে হাত বাড়িয়ে পোঁটাচুন্নির দিকে এগিয়ে দেয়।

পোঁটাচুন্নি পাশের ঘর থেকে ফিসফিস করে বললো, অ সুকু, বাবুকে বল্ না একদিন বাজরায় করে আমাদের ঘুরিয়ে আনতে। কতদিন বাজরায় বসে হাওয়া খাওয়া হয়নি!

পূর্ণচন্দ্র শুনতে পেয়ে বললেন, কাইলই চলেন। মা, আপনে যখন কইতে আছেন, তখন হ্যায় আর কথা কী! কাইল ক্যান, আইজ রাইতেই চলেন!

ইব্রাহিম শেখ বলে দিয়েছিল কসবীর মাকে মা বলে ডাকতে হয়, সেটাই কলকাতার প্রথা, পূর্ণচন্দ্র তা ভুলে যায়নি। কিন্তু ঐ মা ডাক শুনে পোঁটাচুন্নি পাশের ঘরে বসে আধ হাত জিভ কাটে।

বাইরে কোনো একটা গোলমাল হতেই পূর্ণচন্দ্র সন্ত্রস্ত হয়ে বলে ওঠে, কেডা আইল, কেডা আইল? বেম্মজ্ঞানি নাকি? অ্যাঁ?

কলকাতায় এ পর্যন্ত বেম্মজ্ঞানিদের সঙ্গে পূর্ণচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু মনে মনে ভয় আছে এখনো। সঙ্গের দুজন লাঠিয়ালকে দাঁড় করানো আছে সুকুমারীর বাড়ির সদরে।

এর পর তিন চারদিন গেল বজরা সফরে। আমোদ-হুল্লোড় ঠিক যেমন হয়—তেমনই হলো পুরোপুরি, শুধু ছোট একটুখানি বৈচিত্র্য ঘটেছিল।

বজরার ছাদে বসে ব্র্যান্ডির নেশায় চুরচুর হয়ে হঠাৎ পূর্ণচন্দ্রের আবার লাথি মারার শখ জেগে ওঠায় যথারীতি নন্দী ও ভৃঙ্গী তৈরি হয়েছিল পেছন ঘুরিয়ে। কিন্তু ভৃঙ্গীর বেলায় লাথিটা এমন জোরে হয়ে যায় যে সে ছিটকে পড়ে গেল ভরা গঙ্গায়। কলকাতার লোক অনেকেই সাঁতার জানে না, ভৃঙ্গী বেচারা প্রাণেই মারা যেত, শেষ পর্যন্ত বজরার দুজন দাঁড়ি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বাঁচায়।

দিনের মনে দিন কাটতে লাগলো। পূর্ণচন্দ্রের যে টাকাকড়ি ফুরিয়ে আসছে, তার খেয়াল নেই। বৃদ্ধ নায়েব সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু তাকে আনলে ফুর্তির বাধা হবে বলে তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছে। মূর্খ পূর্ণচন্দ্র টাকাকড়ির হিসেবও বোঝে না। সুকুমারীর নেশায় সে উন্মত্ত, দেশ থেকে টাকাকড়ি আনতে

অনেক দেরি হয়ে যাবে বলে বজরাটি বেচে দেওয়া হলো।

পোঁটাচন্নি আবার একদিন মেয়ের মারফত অনুরোধ জানালো, তার খুব কালীঘাট দর্শন করবার ইচ্ছে। বাবু দয়া করলেই তাদের কালীঘাট যাওয়া হয়।

পূর্ণচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে বললো, বিলক্ষণ! কাইল সকালেই যামু। নন্দী, ভৃঙ্গী সব ব্যবস্থা পাক্কা কইরা ন্যাও।

সুকুমারীদের পাড়ায় একটা সাজ সাজ রব পড়ে গেল। কালীঘাট ভ্রমণের সুযোগ পাওয়া যায় না। সুকুমারী পূর্ণচন্দ্রের কাছে আবদার ধরে বললো, কালীঘাটে শুধু আমরা যাবো, আমার সই, মিতিন, গঙ্গাজল, মকর, চোকের বালি, মনের কালি, নয়নতারা এরা যাবে না?

পূর্ণচন্দ্র বললেন, ক্যান যাবে না? হক্কলডিই যাবে!

সুকুমারী পূর্ণচন্দ্রের গাল টিপে আদর করে বললো, ওরে আমার হক্কলডিরে! ওরে আমার ক্যান রে! এইজন্যই তোমায় আমার এত ভালো লাগে।

দেখা গেল, সব মিলিয়ে যাবার মানুষ আটচল্লিশ জন। নন্দী বললো, হুজুর, এটা আপনার একটা যোগ্য কাজ হয়েচে। তিথ্যিস্থানে বড় দঙ্গল না নিয়ে গেলে পান্ডারা বড় হ্যাটা করে।

ভৃঙ্গী বললো, বাবুর মন এত বড়, তিনি ছোট দঙ্গল নিয়ে যেতে পারেন কখনো? আমাদের বাবু কোনো কিছুতেই পেচপাঁও নন।

মেছোবাজারের আড়গড়া থেকে বেছে বেছে পনেরখানি ছ্যাকরা গাড়ি ভাড়া করে আনা হলো। যার যত ভালো ভালো শাড়ি গয়না ছিল, তাতে সেজেগুজে ছুঁড়ি ও বুড়ি বেশ্যারা পিলপিল করে বেরিয়ে এলো বাড়ি থেকে। নিজের ফিটনখানা পূর্ণচন্দ্র আগের দিনই বেচে দিয়েছেন, সুতরাং নিজেও একটি ভাড়া গাড়িতে সুকুমারী আর তার চোখের বালি ও গঙ্গাজলকে সঙ্গে নিয়ে উঠলেন।

কালীঘাট যেতে হলে নানাবিধ সরঞ্জাম লাগে। নন্দী আগেই একলা গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেছে, সেখানে গিয়ে একটি বাড়ি ভাড়া করে সব ব্যবস্থা করে রাখবে। ভৃঙ্গী এদিককার বাজার করে নিয়ে যাবে। রাধাবাজার থেকে কিনতে হবে মদের বোতল, বড়বাজার থেকে চাল ডাল, মেছোবাজার থেকে সাজিয়ে নিতে হবে গোলাপী ও ছাঁচী পানের খিলি, মোগলের দোকানের অম্বুরি তামাক।

যথাসময়ে শহর ছাড়িয়ে ওরা কালীঘাটের গ্রামে এসে পোঁছোলো। গাড়ি থেকে নেমেই সুকুমারী খোঁজ করলো, মা কোতা? মায়ের গাড়ি এয়েচে? পূর্ণচন্দ্রও শশব্যস্ত হয়ে বললেন, মায়ের গাড়ি ঠিকঠাক আইছে তো? মায়ের কষ্ট হয় নাই তো!

পোঁটাচন্নি পাখা দিয়ে বাতাস খেতে খেতে সদ্য ভাড়া করা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বললো, এই তো আমি। এসো বাছা, প্রথমে বসে একটু বিচ্ছাম নাও।

অনেক দূরের পথ, গাড়িতে বসে বসে আসায় বেশ পরিশ্রম হয়েছে। সুকুমারী বিবি রুমালে মুখ রগড়ে রগড়ে মুখ একেবারে লাল করে ফেললে। নন্দী একটা গেলাসে ব্র্যান্ডি ঢেলে তাতে সোডা ওয়াটার মিশিয়ে ধরলে সুকুমারীর মুখের কাছে। বিবি অমনি চটে উঠে বললো, তোমরা সহবত শেকোনি গা? মিতিন, মকর, গঙ্গাজল এরা সব রয়েচে, তাদের না দিয়ে তুমি প্রথমেই আমাকে দিলে? নিজেরা আগে টেনে বসে আচো, বাবুর যে গলা শুকোচ্চে, সে খেয়াল নেই?

কালীঘাটে এসে এক দন্ড বাইরে তিষ্ঠোবার উপায় নেই। পাল পাল কাঙালী এসে ছেঁকে ধরে। এ ছাড়া পুজুরি বামুন, রাঁধুনি বামুন, আরও হাজার রকমের

উমেদার। কেউ খ্যাংরা-গ'ফো, কেউ গামছা-কাঁধে, কেউ ধামা-মাথায়। চতুর্দিকে একেবারে চিলুবিলু অবস্থা। বড়বাজারের দোকানে পাকানো পৈতে বিক্রি শুরু হবার পর শহরে বামুন খুব বেড়ে গেছে, কালীঘাটে এখন কাঙালী বেশী না বামুন বেশী, তা বোঝা ভার।

দোতলায় কার্পেট বিছানো ঘরে এসে বসে পূর্ণচন্দ্র একটু জিরোতে লাগলেন। সুকুমারীর সইয়েরা বাতাস করতে লাগলো তাঁকে। নন্দী ভৃঙ্গী এসে সুরার গ্লাস তুলে দিল হাতে। পোঁটাচুন্নি দরজার আড়াল থেকে মৃদু ভর্ৎসনা দিয়ে বললো, অ সুকু, এসেই তোরা টানতে বসে গিলি? পুজো আচ্চার ব্যবস্থা করতে হবে না!

নন্দী বললো, পুজো তো ওব্‌লা? এখন কী? এব্‌লা পাঁচটা উনুন ধরিয়েচে।

পোঁটাচুন্নি বললো, ওমা, সে কি কতা! মন্দিরের ঘণ্টা শুনতে পাচ্চি, আর ও পোড়ারমুখো বলে কি না পুজো ওব্‌লা? কালীঘাটে এসে আগে পুজো দিতে হয়, তার পর অন্য কিচু।

ভৃঙ্গী বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, পুজোর ব্যবস্থা করচি। আমি বামুন পাণ্ডা ধরে আনচি।

ভৃঙ্গী বাইরে থেকে কোরা থান পরা, পৈতের গোছা গলায়, মাথায় মস্ত টিকি, খড়ম পায়ে একজন বেশ বিশ্বাসযোগ্য চেহারার বামুনকে ডেকে আনলো। পোঁটাচুন্নি বললো, ওমা, কী হবে! আসবার সময় আমি যে তাড়াতাড়িতে সিন্দুক খুলেও টাকা বার করতে ভুলে গ্যাচি! আমি যে পুজো মানত করেচিলুম, কী করে পুজো দেবো?

পূর্ণচন্দ্র বললেন, একথা বলে বড় লইজ্জা দিলেন মা। আমার টাকাও যা, আপনের টাকাও তা। এই ন্যান, কত লাগবে?

পকেট থেকে কুড়ি পঁচিশ টাকা যা ওঠে তাই পূর্ণচন্দ্র দিয়ে দিলেন নন্দীর হাতে। নন্দী তার থেকে পাঁচ টাকা সরিয়ে বাকিটা দিল পোঁটাচুন্নিকে। পোঁটাচুন্নি আবার তার থেকে বেশ কিছু সরিয়ে মোট সাতটি টাকা দিল বামুনকে। তাই পেয়েই বামুনের এক গাল হাসি। দুটো ছোট গোছের পাঁঠা, দু' সরাতে আধসেরটাক চিনি, একছড়া মন্দির বেড়া জবাফুলের মালা, কুনকেটাক আলো চাল, গোটা দশেক কাঁঠালি কলা, একটু ঘি, একটু সিঁদুর—সব মিলিয়ে মোট আড়াই টাকার জিনিস কিনে মন্দিরে গিয়ে পুজো চড়িয়ে এলো।

এদিকে ভাড়া বাড়ির একতলায় বড় বড় উনুনে খিচুড়ি তৈরি হচ্ছে, আর দোতলায় বোতলের পর বোতল উড়ছে। বোতল শুধু ওড়ে না, একসময় গড়ায়, তখন মানুষগুলোও গড়ায়। একজন গড়ালে অন্যজন তাকে টেনে তোলবার চেষ্টা করে, তারপর সেও গড়িয়ে যায়। কালীঘাটে এসে এতটা বাড়াবাড়ি পোঁটাচুন্নির পছন্দ হচ্ছে না; তার বয়েস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মে মতি হয়েছে। সে এসে মাঝে মাঝে বকুনি দিয়ে যাচ্ছে ওদের। কিন্তু কে শোনে কার কথা। সুকুমারীর সইরা সব এক একজন মোসাহেবের পাশে বসে গলা জড়াজড়ি করছে। নন্দী আর ভৃঙ্গী মাঝে মাঝে বলে উঠছে, ওফ্, এত ফুর্তি বহুত দিন হয়নি। ধন্য আমাদের পূর্ণচন্দ্রবাবু!

রান্না শেষ, নীচতলার চাতালে জল ছিটিয়ে পাত পাড়া হয়ে গেছ, কিন্তু কে

খেতে যাবে? ওপরের বাবু বিবিদের খাওয়ার কথায় হুঁশ নেই। কেউ ডাকতে এলেও তারা দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। চাকর-নফর, পাইক আর অন্যরা গাণ্ডে-পিণ্ডে গিলতে লাগলো গরম গরম খিচুড়ি, রুই মাছের কালিয়া, পাঁঠার পোলাও, আলুর দম, হাঁসের ডিম, তালদা বাঁশের চোঙায় জমিয়ে ধোঁকা। বেলা গড়িয়ে বিকেল পড়ে এলো।

মদের বোতল সব শূন্য, তবু পূর্ণচন্দ্রের তৃষ্ণা মেটেনি। এলানো অবস্থায় সে বললো, কই বাপ নন্দী, কই বাপ ভৃঙ্গী, গেলাস যে খালি। শ্যাম্পেন কার্ক খোলার ফটাফট মধুর আওয়াজও বন্ধ। কী হইলো তোমাগো?

নন্দী বললো, হুজুর টাকা দিন!

পূর্ণচন্দ্র বললেন, টাকা চাই? কত টাকা?

এবার পোঁটাচুন্নি সত্যিকারের রেগে গিয়ে বললো, হ্যাঁ গা, কী আক্কেল তোমাদের? কাঁড়ি কাঁড়ি রান্না হলো, কিছু খেলে না। গঙ্গায় নাইলে না, মায়ের দর্শন করলে না, এ কেমন ধারা ব্যাভার? সন্ধ্যে হয়ে এলো। আগে দুটি খেয়ে নাও!

পূর্ণচন্দ্র বীরবিক্রমে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, না খামু না! মায়ের দর্শন করতে যামু। উপাস কইরাই পূজা দিতে হয়, তয় তো পুইণ্য হবে! আগে মায়ের দর্শন, তারপর অইন্য কথা! চলো, সুকুমারী!

সুকুমারী দু পা চলতে গিয়েই লুটিয়ে পড়ে গেল। একেবারে জ্ঞানহারা। তাকে একটুক্ষণ টানাটানি করেও কোনো সুবিধে হলো না। পোঁটাচুন্নি বললো, থাক, ওকে ছাড়ো, ওর আর ক্ষ্যামতা নেই।

পূর্ণচন্দ্রের মনে একটা আঘাত লাগলো। এত দূর এসেও সুকুমারী তার সঙ্গে মন্দিরে যাবে না? এত খরচাপাতি করে মেয়েমানুষ রেখে তাহলে লাভ কী হল? পূর্ণচন্দ্রের মস্তিষ্কের নেশাগ্রস্ত যুক্তিতে মনে হলো যে সুকুমারী যেন ইচ্ছে করেই ভিরমি খেয়ে পড়ে আছে। দু-একবার সে তাকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু সুকুমারীর মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরুচ্ছে।

তখন পূর্ণচন্দ্র বললেন, তয় আমি একলাই যামু।

সিঁড়ি দিয়ে দুপ দাপ করে তিনি নেমে এলেন। নন্দী, ভৃঙ্গী এলো সঙ্গে সঙ্গে। নীচতলার লোকগুলো নেশা করেনি বটে কিন্তু প্রচণ্ড রকম খিচুড়ি মিচুড়ি খেয়ে পেট মোটা করে শুয়ে আছে। লাঠিয়াল দুজন ঘুমন্ত। পূর্ণচন্দ্র ওদের আর ডাকলেন না। রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলেন ভিড় ঠেলে। পা দুটি টলমল করলেও তাঁর শরীরে যেন মত্ত মাতঙ্গের শক্তি। নন্দী, ভৃঙ্গী কাঙালীদের হঠাতে লাগলো।

পূর্ণচন্দ্র মন্দিরে এসে উঠলেন। হঠাৎ তাঁর মনটা বিষাদে ভরে গেছে। মনে পড়েছে স্বর্গগতা জননীর কথা। মায়ের মৃত্যুশয্যার অনুরোধেই কালীঘাট দর্শনের জন্য কলকাতায় আসা। অথচ এতদিনে কালীঘাট দর্শনের কথা মনেও পড়েনি। সেই কালীঘাটে আসতে হলো কিনা সুকুমারীর কথায়! আর সে বেশ্যামাগীও এমন নিমকহারাম, শেষ পর্যন্ত সঙ্গে এলো না!

পূর্ণচন্দ্র চেঁচিয়ে উঠলেন, মা, মা, আমি তোমার কুপুত্র। আমি মহাপাতকী।

মন্দিরের পুরুতরা চেহারা ও বেশবাসের চাকচিক্যে পূর্ণচন্দ্রকে একজন বেশ বড় গোছের বাবু ঠাউরে অন্য লোকজনদের সরিয়ে সাগ্রহে বলতে লাগলো, আসুন,

আপনি সামনে আসুন। আপনার গোত্র কী?

পূর্ণচন্দ্র এগোতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন। আর অমনি মুখ দিয়ে হড়হড়িয়ে বমি বেরিয়ে এলো। তাতে অসহ্য দুর্গন্ধ। পুরোহিতরা চেঁচিয়ে উঠলো, দিলে দিলে, সব কিছু নষ্ট করে দিলে। কী আপদ! এ মাতালকে সরাও!

নন্দী, ভৃঙ্গী হাত ধরে তুলে দাঁড় করালো পূর্ণচন্দ্রকে। তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। বিড়বিড় করে বারবার বলছেন, আমি মহাপাতকী, মহাপাতকী! ওগো, আমার মা কী যেন মানত কইরাছিল, তোমাগো মনে আছে?

নন্দী ভৃঙ্গী বললো, হুজুর, আপনার মায়ের মানত আমরা জানবো কী করে!

পূর্ণচন্দ্রের দারুণ কষ্ট হচ্ছে, কিছুতেই একটা কথাও মনে আসছে না।

পুরুতরা বললো, দক্ষিণা যা দেবার দিয়ে একে এবার এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও না।

দক্ষিণার কথা শুনে পূর্ণচন্দ্র পকেটে হাত দিলেন। পকেট শূন্য। অসহায়ভাবে ঘোলাটে চোখে নন্দী আর ভৃঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বললেন, টাকা? আমার টাকা নাই? তোমরা আমারে টাকা দেবা? আমি মায়ের দক্ষিণা দিতে পারমু না?

নন্দী, ভৃঙ্গী বললো, হুজুর, আমরা ট্যাকা পাবো কোথায়? আমাদের কি ট্যাকা থাকে?

হাত থেকে হীরের আংটিটা খুলে প্রণামীর থালার ওপরে ছুঁড়ে দিলেন পূর্ণচন্দ্র। তারপর ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলেন। নন্দী, ভৃঙ্গী ওঁকে ধরাধরি করে চত্বরে নিয়ে এলো।

একটু সামলে পূর্ণচন্দ্র বললো, আমি আর এ মাগীগো কাছে যামু না। আমি বাড়ি যামু। আমার দ্যাশে যামু। আমারে গঙ্গার ধারে নিয়ে চলো, আমি গঙ্গাস্নান কইরা শুদ্ধ হমু।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে, এখন আর স্নানটানের ঝামেলায় নন্দী, ভৃঙ্গী যেতে চায় না। তারা অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু অতিশয় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পূর্ণচন্দ্র বোধশক্তিহীন গোঁয়ার হয়ে গেছেন। তিনি যাবেনই স্নান করতে।

অগত্যা নন্দী আর ভৃঙ্গী ওঁকে নিয়ে চললো টানতে টানতে। পূর্ণচন্দ্রের আর চলার শক্তি নেই, চেতনাও আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। গঙ্গার একেবারে কাছাকাছি এসে আর পারলেন না, একেবারে পাথর হয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। আদি গঙ্গার ঢালু পাড়ে তার মাথাটা নীচের দিকে ঝুলে রইলো।

নন্দী ভৃঙ্গীকে বললো, থাক, এখানেই পড়ে থাক। এ ব্যাটা ছিবড়ে হয়ে গ্যাচে!

ভৃঙ্গী বললো, দ্যাক না, ট্যাঁকে কিছু নুকোনো আচে কিনা!

দুজনে হাঁটু গেড়ে বসে ভালো করে পূর্ণচন্দ্রের ট্যাঁক ও পকেট পরীক্ষা করে দেখলো। না, আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। সুতরাং এর জন্য আর সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না ভেবে চলে যেতে গিয়েও দুজনে আবার থমকে দাঁড়ালো। দুজনের মনে একই কথা এসেছে। ব্যাটার জামাকাপড়গুলোও তো দামী, সেগুলিই বা বাদ থাকে কেন? কাছে ফিরে এসে ওরা পূর্ণচন্দ্রের সমস্ত পোশাক খুলে নিল। পায়ের জুতো জোড়া পর্যন্ত। সব কিছু নিয়ে একটা পুঁটলি বেঁধে উঠে দাঁড়ালো দুজনে।

আবার ওরা চোখাচোখি করলো। ঠিক একই কথা আবার দুজনের মনে এসেছে। দুজনে দুপাশে সরে গিয়ে পূর্ণচন্দ্রের নগ্ন নিতম্বে সপাটে লাথি কষালো কয়েকবার।



পাঁচ বৎসর বয়েসে, সরস্বতী পূজার দিনে নবীনকুমারের হাতেখড়ি হলো। এই উপলক্ষে বেশ ধুমধাম হলো সিংহ সদনে।

বিম্ববতীর পিত্রালয়ের কারুর শিক্ষার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁর শ্বশুর স্বামীও বিদ্যাচর্চা না করেও প্রভূত বিষয়সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন। কিন্তু বিম্ববতীর দত্তকপুত্র গঙ্গানারায়ণ প্রধানত স্বীয় যত্নে আজ কৃতবিদ্য এবং এই বিদ্যার গুণে সে বিনয়ী, সুশীল ও ধীরস্থির। গঙ্গানারায়ণকে প্রীতি করে না, এমন কেউ নেই। বিম্ববতী পুত্রগর্বে গর্বিত এবং গঙ্গানারায়ণের চরিত্রের ক্রম পরিণতি দেখেই তিনি বিদ্যাচর্চা সম্পর্কে আকৃষ্ট হয়েছেন।

হিন্দু কলেজের পাঠ সমাপ্ত করে গঙ্গানারায়ণ এখন বিধুশেখরের নির্দেশ মতন পারিবারিক ব্যবসায় ও জমিদারির কাজে শিক্ষিত হচ্ছে। রামকমল সিংহ তো সব দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন, কমলাসুন্দরীকে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েছেন উত্তরভারত পরিভ্রমণে, গত পাঁচ মাস তাঁর কোনো সংবাদই নেই। যত দূর জানা যায়, তিনি বারানসীতে এক বিশাল প্রাসাদ ভাড়া নিয়ে নৃত্যগীতের আসরে মত্ত হয়ে আছেন।

বিম্ববতী দেখেছেন, কর্তাদের ধারা কিছুই বর্তায়নি গঙ্গানারায়ণের ওপরে। সে সুরা পান করে না। সন্ধ্যার পর জুড়িগাড়ি হাঁকিয়ে গৃহ থেকে নির্গত হয়ে ভোররাত্রে বাড়ি ফেরার যে রীতি, গঙ্গানারায়ণ তেমনটি করেনি একদিনও। যথা সময়ে অফিস দেখতে যায় এবং সন্ধ্যার পর বিদ্বান বন্ধুদের সঙ্গে নানাপ্রকার তর্কে মেতে থাকে। এ গৃহের মজলিশকক্ষে এখন আর নূপুরের নিক্কন কিংবা বোতল-গেলাসের ঠনৎকার শোনা যায় না, বরং গঙ্গানারায়ণের বন্ধুরা সেখানে নানা রকম কেতাব থেকে উচ্চকণ্ঠে পাঠ করে পরস্পরকে শোনায়।

বিধুভূষণও গঙ্গানারায়ণের ওপরে খুব সন্তুষ্ট। হিন্দু কলেজে পাঠ নিয়েও সে ফিরিঙ্গি বনে যায়নি কিংবা দেবেন্দ্র ঠাকুরের হুজুগে দলে গিয়ে ভেড়েনি। তাছাড়া ইতিমধ্যেই দুবার জমিদারি মহল পরিদর্শন করতে গিয়ে সে যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে এবং সুবন্দোবস্ত করে এসেছে।

বিম্ববতী চান, নবীনকুমারও তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অনুসরণ করুক। কর্তারা যা বিষয়-বৈভব করে গেছেন, তাতে এদের সাত পুরুষ বিনা পরিশ্রমে চালিয়ে যেতে পারবে। সুতরাং বিষয় না দেখে যদি শুধু বিদ্যাচর্চা কিংবা ধর্মানুশীলনেও মেতে থাকে তাতে অন্তত সংসারের শান্তি আসবে। দুই ভ্রাতায় খুব ভাব। নবীনকুমারের জন্মের পর যে শঙ্কা বিম্ববতী ও তাঁর স্বামীর মনে জেগেছিল, তা অমূলক প্রতিপন্ন হয়েছে। গঙ্গানারায়ণ তার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অতিশয় ভালোবাসে। আর নবীনকুমারও যতই দুরন্তপনা করুক, সে গঙ্গানারায়ণের খুবই বশবর্তী এবং এক একদিন সে গঙ্গানারায়ণের বন্ধুদের তর্কসভায় গিয়ে চুপটি করে বসে থাকে।

নবীনকুমারের শিক্ষা সম্পর্কে বিম্ববতী বিধুশেখরের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। এ গৃহে বিধুশেখর নিত্য আসেন এবং পরপুরুষদের মধ্যে একমাত্র

সরাসরি বিধুশেখরের সঙ্গেই কথা বলেন বিম্ববতী। যখন নবম বর্ষীয়া কন্যা, সেই সময় নববধূ হয়ে এই বাড়িতে এসেছিলেন বিম্ববতী, আজ তাঁর বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর, এই সুদীর্ঘকাল কত সুখ দুঃখের কথা হয়েছে বিধুশেখরের সঙ্গে। গত কয়েক বৎসর তো স্বামীর সঙ্গে বিম্ববতীর প্রায় দেখাই হয় না। তা নিয়ে অবশ্য কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করেন না বিম্ববতী, কারণ, যেটুকু সময় রামকমল সিংহ গৃহে থাকেন, তখন তিনি যেন বিম্ববতীর দাসানুদাস। গদগদ কণ্ঠে বলেন, বিম্ব, তুমি আমার লক্ষ্মী, তুমিই আমার জগদ্ধাত্রী, তোমার জন্যই আমার এত সব হয়েচে। তুমি যদি রাগ করো তো বলো, আমি বাড়ির বাইরে এক পা যাবো না। তবে, আমায় আর বিষয় দেখতে বলো না! আর যে ক'টা দিন বেঁচে আচি...। সঙ্গে সঙ্গে বিম্ববতী বলেন, ওগো, না, না, তোমার যা মন চায় তাই তুমি কর্বে...।

বিধুশেখরের মত এই যে, নবীনকুমার গৃহেই বিভিন্ন শিক্ষকের কাছে বিদ্যাভ্যাস করুক। সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে সে ইংরাজীও শিখবে বইকি, কিন্তু সেজন্যে তাকে সাহেব শিক্ষকদের স্কুলে পাঠাবার দরকার নেই। আজকাল ভদ্র ঘরের অনেক যুবকও ইংরাজী শিখেছে, গঙ্গানারায়ণের বন্ধুদের মধ্যেও তো দু-একজন গরীব অথচ মেধাবী ছাত্র আছে, তাদেরই কারুর ওপর ভার দেওয়া যেতে পারে। বিম্ববতীর তাতে কোনো আপত্তি নেই।

হাতেখড়ির দিন দীক্ষাচার্য হিসেবে বিধুশেখর তিনজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে আনাবার ব্যবস্থা করলেন। আজকাল অবশ্য প্রকৃত ব্রাহ্মণ খুঁজে পাওয়া ভার। পয়সার লোভে অনেক ব্রাহ্মণই বিবেক ধর্ম বিসর্জন দিয়ে ধনীদের খোসামোদ করে।

সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী বাবু রসময় দত্ত বিধুশেখরের বন্ধুস্থানীয়। বাঙালী বা ভারতীয়দের মধ্যে বোধ হয় তিনিই সর্বোচ্চ সরকারি কর্মে নিযুক্ত, তাঁর বেতন নব্বুই টাকা। সাহেবদের কাছে রসময় দত্তের খুব প্রতিপত্তি। কিন্তু রসময় দত্ত ব্রাহ্মণ নন, তাঁকে আচার্য করা যায় না। সুতরাং ঐ কলেজেরই অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী বৃদ্ধ রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারকে একজন আচার্য হিসেবে মনোনয়ন করলেন বিধুশেখর। রসময় দত্তই বললেন, আর একজনের কথা, তাঁর নাম দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মানুষটির সঙ্গে কথাবার্তা বলে বিধুশেখর মুগ্ধ হলেন। দুর্গাচরণ সত্যিই বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ, ইংরাজী ও সংস্কৃত দুই ভাষাতেই বিশেষ দক্ষতা আছে, এক সময় হেয়ার সাহেবের স্কুলে শিক্ষকতা করতেন, তারপর হঠাৎ শিক্ষকতা ছেড়ে মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র হিসেবে ভর্তি হলেন। চিকিৎসাবিদ্যা উত্তমরূপে শিক্ষা করার পর তিনি দুঃস্থ-আতুর মানুষদের চিকিৎসায় সাহায্য দেন। আবার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড রাইটার হিসাবেও নিযুক্ত। ইংরাজদের শিক্ষা-বিজ্ঞান আহরণ করেও এঁর চালচলন খাঁটি দেশীয়দের মতন, এই প্রকার মানুষই বিধুশেখরের পছন্দ। এই দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় থাকেন তালতলায়, তাঁর বাড়িতেই বিধুশেখরের পরিচয় হলো আর একজনের সঙ্গে। এঁকেই তিনি তৃতীয় আচার্য হিসেবে মনোনীত করে ফেললেন। ইনি মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণ, বয়েসে যুবক এবং বিশিষ্ট পণ্ডিত হিসেবে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছেন। এঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছুকাল আগে সংস্কৃত কলেজ থেকে বিদ্যাসাগর পদবী পেয়েছেন, ইদানীং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রধান পণ্ডিতের কাজ করেন। যুবকটির চেহারা কদাকার। কিন্তু মুখমণ্ডলে আত্মাভিমানের ছাপ প্রকট।

বিধুশেখরের সঙ্গে পরিচয় হতেই ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, মহাশয়কে আমি

বিলক্ষণ চিনি। আপনার স্মরণ নাই, কিন্তু আপনার বাড়িতে গিয়ে একদিন এমন ভূরিভোজ খেতে হয়েছিল যে আজও সেকথা মনে এলে আতঙ্ক হয়। সে আপনার এক কন্যার বিবাহের সময়, আমাদেরই এক সতীর্থ আপনার জামাতা। বরযাত্রীদের খাওয়াইয়ে খাওয়াইয়ে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টাই বুঝি আপনাদিগের রীতি?

বিধুশেখর উচ্চহাস করে উঠেছিলেন।

কিছুক্ষণ রঙ্গালাপের পর বিধুশেখর অত্যন্ত বিনয় সহকারে বলেছিলেন, পণ্ডিতপ্রবর, এই বাগদেবীর পূজায় যদি আমার বন্ধু রামকমল সিংহের গৃহে পদধূলি দেন, তবে আমি ধন্য হই! বন্ধুর একটি পঞ্চম বর্ষীয় সুলক্ষণ পুত্র আছে, সে আমারও পুত্রবৎ, আপনারা সেইদিন তাহাকে আশীর্বাদ কল্লে সে জ্ঞান-পথের পথিক হতে পারে।

দুর্গাচরণ বললেন, সেদিনও ভূরিভোজনের ব্যবস্থা থাকবে তো?

ঈশ্বরচন্দ্র বন্ধুকে বললেন, ঔদরিক! অমনি বুঝি নোলা শক শক করে উঠলো?

দুর্গাচরণ বললেন, ভাই, বামুনের ছেলে উত্তম আহারের সম্ভাবনা দেখলে চাঞ্চল্য ঘটবে না, একি একটা কথা হলো? বংশের অবমাননা হবে যে!

ঈশ্বরচন্দ্র বিধুশেখরকে বললেন, এই উপলক্ষে বামুন পণ্ডিত ডাকছেন যখন, তখন শাল দোশালা বিদায় দেবেন নিশ্চয়?

বিধুশেখর বললেন, আজ্ঞে, সে তো আমাদের প্রথাই রয়েচে!

ঈশ্বরচন্দ্র আবার বললেন, আর সোনাদানা?

দুর্গাচরণ হাসতে হাসতে বললেন, ঈশ্বর, তুমি বোধ হয় জানো না, রামকমল সিংহী কত বড় ধনী। তেনার মনটাও খুব খোলসা শুনিচি! সোনাদানা দিয়ে তোমায় ভরিয়ে দেবেন।

বিধুশেখর বললেন, আমি এইটুকু বলতে পারি, আপনাদের কোনো প্রকার অসম্মান হবে না। আমার বন্ধু আপনাদের মর্যাদার যোগ্য জিনিসই দেবেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, দত্ত মহাশয়, দুর্গাচরণবাবু অতিশয় পরিহাস প্রবণ। তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছাড়া কথা কইতে পারেন না। সেইজন্যই আমার বিষয়টি আমি স্পষ্টাক্ষরে বলি। আপনার বন্ধুপুত্রের হাতেখড়ির সময় উপস্থিত থাকতে রাজি আছি, কিন্তু আমার কিছু শর্ত আছে। সোনা-দানা, শাল-দোশালা দূরে থাক, গুরুদক্ষিণা হিসাবেও আমাকে একটি পাইপয়সা দিতে পারবেন না। আমি পঞ্চাশ টাকা বেতন পাই, তাতেই আমার সংসার অতি উত্তমরূপে চলে যায়। কাহারো কাছ থেকে দান গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না।

বিধুশেখর অভিভূত ভাবে নির্বাক হয়ে রইলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র আবার বললেন, দুর্গাচরণবাবুকেও আমি যথেষ্ট চিনি। উনি বেতন পান আশি টাকা, উঁহারও দান গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখি না। সুতরাং আমরা কিছুই লবো না, এই শর্তে যদি রাজি থাকেন, তবে আমরা যেতে পারি। এই উপলক্ষে যদি অর্থ ব্যয় করতে চান, তবে কিছু দুঃস্থ ছাত্রকে সাহায্য করুন, সেটা কাজে দেবে।

বিধুশেখর বললেন, আপনাদের যা অভিপ্রায়, সেই মতই হবে।

দুর্গাচরণ বললেন, ঈশ্বর, তুমি 'আমরা' 'আমরা' বলে ঠিক করলে না। তুমি নিজে কিছু গ্রহণ করতে চাও না, বুঝলাম! আর আমার সম্পর্কেও সটান এমন বলে দিলে যে ইচ্ছে থাকলেও আমি চক্ষুলজ্জায় আর কিছু নিতে পারবো না!

কিন্তু উনি রামমাণিক্য বিদ্যালংকারকেও আচার্য করেছেন, তাঁকে কেন বঞ্চিত করো, সে বুড়ার যথেষ্ট লোভ আছে আমি জানি। তাছাড়া, বিদ্যালঙ্কারের মস্ত বড় সংসার, কতদিন আর চাকরি করতে পারবেন তার ঠিক নেই। তাঁর অর্থের প্রয়োজন আছে। আমি বলি কী, ইঁহারা আমাদের তিনজনকে যা দেবেন স্থির করেছিলেন, তার সবটাই বিদ্যালঙ্কারকে দিন না কেন!

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, এটা একটা ভারী কাজের কথা বলেছেন। তবে তেমনই করুন। কিন্তু কিছু দুঃস্থ ছাত্রকে সাহায্য করার কথাও ভুলবেন না।

বিধুশেখর বুঝলেন, তিনি যোগ্য ব্যক্তিদের কাছেই এসেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র আবার বললেন, আর একটি কথা। আমি দুগ্ধ জাতীয় কোনো খাদ্য খাই না। মাছ-মাংসও পরিত্যাগ করেছি। আপনার গৃহে শুধু ফলাহার করবো। অধিক কিছু খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করবেন না। আপনাদের মতন বড় মানুষদের গৃহে একদিন আহার করলে পেটের পীড়া সারাতে এক বৎসর লেগে যায়।

দুর্গাচরণ বিধুশেখরকে বললেন, মহাশয়, এই ব্যাপারে কিন্তু আমি ঈশ্বরের সঙ্গে একমত নই। আমি পেটুক মানুষ, লুচি মণ্ডাতে আপত্তি নেই।

মহাসমারোহে সরস্বতী পূজা সম্পন্ন হয়ে গেল। বাহির মহলের উঠানে শামিয়ানা খাটিয়ে সেখানে সব ব্যবস্থা হয়েছে। রামকমল সিংহ উত্তর ভারত থেকে এখনো ফেরেননি, গত সপ্তাহেই তাঁর এক দূত এসে আবার এককাঁড়ি টাকা নিয়ে গেছে, সুতরাং সব দায়িত্ব বিধুশেখরের একার। অচেনা যে-কেউ ভাববে তিনিই এ বাড়ির কর্তা।

তিন ব্রাহ্মণ পাশাপাশি বসেছেন মখমলের আসনে। বালক নবীনকুমারকে সকাল থেকে উপবাসী রেখে, স্নান করিয়ে, কোড়া পট্টবস্ত্র পরিয়ে নিয়ে আসা হলো তাঁদের সামনে। প্রথমে রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার নানা প্রকার মন্ত্রোচ্চারণ করে আশীর্বাদ করলেন তাকে। অধিকাংশ দাঁত নেই, বৃদ্ধ একেবারে ফোকলা, তাই কোনো কথাই প্রায় বোঝা যায় না।

তারপর দুর্গাচরণও নবীনকুমারের মস্তক স্পর্শ করে কয়েকটি মন্ত্র পড়ে আশীর্বাদ করলেন। নবীনকুমারের কোনো রূপ আড়ষ্টতা নেই। সে তার অস্বাভাবিক তীব্র চোখ মেলে দেখছে ওঁদের। দুর্গাচরণ বললেন, এ বালকের মুখে প্রতিভার জ্যোতি আছে।

আচার্যদের যে প্রণাম করতে হয়, সেটা নবীনকুমারকে কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছে না। দুপাশ থেকে গঙ্গানারায়ণ আর বিধুশেখর বারংবার বলছেন, প্রণাম কর। পণ্ডিতমশাইদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কর! নবীনকুমার মুখ ফিরিয়ে শুধু তাকাচ্ছে, সে যেন জানেই না প্রণাম কাকে বলে। শেষ পর্যন্ত গঙ্গানারায়ণ তার হাত ধরে আচার্যদের পায়ে ছোঁয়ালো।

ঈশ্বরচন্দ্র কোনো সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করলেন না। তিনি বললেন, আসল হাতেখড়িই তো হলো না। খড়ি কই? শ্লেট কই?

শ্লেট-পেন্সিল ও কয়েকখানি পুস্তক সরস্বতী মূর্তির পায়ের কাছে রাখা ছিল, সে সব পুষ্পস্তবকের নীচে চাপা পড়ে গেছে। পুরোহিত সেগুলি হাতিয়ে বার করলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে টেনে নিয়ে কোলে বসিয়ে বললেন, তোমার মুক্তার

মতন হস্তাক্ষর হোক। এসো দিকি, আমরা দুজনে মিলে একটু লিখি।

বালকের হাতে পেন্সিল ধরিয়ে দিয়ে নিজেও তার হাতটি চেপে ধরলেন। তারপর বললেন, প্রথমে ওপর থেকে নীচে এই একটা সোজা দাগ। এই, এই! তারপর বাম দিকে তেকোণা করে দুটো দাগ। এই, এই, এই! এবার কী হলো? ঘুড়ি দেখেছো তো? ছেলেরা মাঠে যে ঘুড়ি ওড়ায়? এই হলো একটা ঘুড়ির অর্ধেক, তাই না, এবার ডানদিকে একটা শুণ্ড, এই! এবার কী হলো? এর নাম ক!

নবীনকুমার বললো, ক!

দুর্গাচরণ বললেন, ও কি, ঈশ্বর, আগে অ আ না লিখিয়ে প্রথমেই ব্যঞ্জনবর্ণ ধরালে?

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, ওতেই হবে। প্রথম দিন কিছু একটা লিখলেই হয়। অ-এর চেয়ে ক লেখা বালকদের পক্ষে সহজ।

নবীনকুমার বারবার বলতে লাগলো, ক, ক, ক, ক!

তারপর ঈশ্বরচন্দ্র তার হাত ছেড়ে দিতেই সে নিজের শ্লেটের ওপর আঁকি-বুকি কাটতে লাগলো।

ঈশ্বরচন্দ্র দারুণ বিস্মিত হয়ে বললেন, এ কী? এ বালক কি আগেই লেখা অভ্যেস করেছে?

গঙ্গানারায়ণ বললো, না তো!

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, এ তো ক লিখতে জানে! এই যে একটা লিখেছে।

অপর দুই ব্রাহ্মণও শ্লেটের ওপর উঁকি দিলেন। সত্যিই তো, ঈশ্বরচন্দ্র যে ক লিখে দিলেন, নবীনচন্দ্র তার পাশে আর একটি ক লিখে ফেলেছে। যতই আঁকাবাঁকা রেখা হোক, তবু ক বলে চেনা যায়। প্রথম দিনেই এমন লেখা কোনো বালকের পক্ষে সম্ভব নয়।

বিধুশেখরও শ্লেটখানি তুলে নিয়ে দেখলেন। চারপাশে আরও অনেকে ভিড় করে এলো। দূরে চিকের আড়ালে রয়েছেন বিম্ববতী এবং অন্য রমণীরা।

ঈশ্বরচন্দ্র শ্লেটটা ফেরৎ নিয়ে বললেন, দেখি, দেখি, আর একটা লেখো তো!

কোনো আপত্তি নেই, বালক আবার লিখে দেখালো।

ঈশ্বরচন্দ্র বাঁ হাতের চেটো দিয়ে শ্লেটটা একেবারে মুছে ফেলে বললেন, আর একবার লেখো তো! কী সুন্দর ছেলে! আর একবার লেখো!

এবারে সকলেরই একেবারে স্তম্ভিত অবস্থা। নবীনকুমার সেই শূন্য শ্লেটে, কিছু না দেখেই আবার ক লিখেছে।

দুর্গাচরণ প্রশ্ন করলেন, আপনারা সত্যি জানেন, এ বালক আগে লিখতে শেখেনি?

গঙ্গানারায়ণ ও বিধুশেখর দুজনেই বললেন, আজ্ঞে, না। হাতেখড়ির আগে কেউ কি লেখাপড়া শেখায়?

দুর্গাচরণ এবার নিজে শ্লেটটা নিয়ে ইংরেজি এ আর বি অক্ষর দুটি লিখলেন। তারপর নবীনকুমারকে বললেন, ঠিক এই রকম দুটি পাশে লিখে দেখাও তো!

নবীনকুমার যেন বেশ কৌতুক পেয়েছে। খুব মন দিয়ে পেন্সিল ঘষে সে এ এবং বি অক্ষর ফুটিয়ে তুললো। দুর্গাচরণ সব মুছে দিলেন, তারপরও নবীন-কুমার লিখে দেখাতে পারলো।

আর কোনো সন্দেহ রাখার উপায় নেই। বাড়ির কারুর কাছ থেকে যদি বা বাংলা অক্ষর লিখতে শিখেও থাকে, ইংরেজি অক্ষর শেখাবার মতন লোক কোথায়

পাওয়া যাবে?

দুর্গাচরণ বললেন, ভাই, শ্রুতিধরের কথা শুনেছি। কিন্তু এই বালক কি দৃষ্টিস্মৃতিধর?

বিধুশেখর বললেন, এ শিশু জন্মের অতি অল্পকাল পর থেকেই নানাপ্রকার বিস্ময়ের কাজ করেচে। এ হাঁটতে শিখেচে, কথা কইতে শিখেচে অন্য ছেলেপুলেদের চেয়ে অনেক আগে। হ্যাঁরে গংগা, ও ক' মাসে কথা কইতে শিখেচিল রে?

গংগানারায়ণ পিছন ফিরে মায়ের দিকে চাইলো। সেখান থেকে অন্য লোক মারফৎ উত্তর এলো, আট মাসে!

দুর্গাচরণ বললেন, আমি দেখেই বুঝেছি, এ বালক ক্ষণজন্মা।

বিধুশেখর গর্বিতভাবে বললেন, ওর কুষ্ঠিতেও আছে, ও বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

দুর্গাচরণ বললেন, এর দিকে নজর রাখবেন ভালো করে। স্বাস্থ্যের যত্ন নেবেন। দেখবেন, যেন, এ শিশু দীর্ঘজীবী হয়!

গংগানারায়ণ বললো, দেড় দু বছর বয়েস থেকেই ও অনেক রকম ছড়া বলতে পারে। একলা একলা ছড়া বলে বলে দরদালানে ঘুরে বেড়ায়।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, কই শুনি। একটা ছড়া বলো তো?

গংগানারায়ণ বললেন, বল তো নবীন, একটা ছড়া বল তো।

নবীনকুমার অমনি চোখ বুঁজে বললো :

তুমি প্রভু সৃষ্টিধর জগতের পতি
তোমা পানে সদা মোর যেন থাকে মতি!

তিন ব্রাহ্মণ একসংগে বাহবা দিয়ে উঠলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, বড় সুন্দর কণ্ঠস্বর, আর একটা বলো তো!

এবার নবীনকুমার কণ্ঠস্বর চড়িয়ে বললো :

এসো এসো চাঁদবদনি
এ রসে নিরসো কোরো না ধনি?

দুর্গাচরণ ও ঈশ্বরচন্দ্র হেসে উঠলেও রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার নাক কুঁচকোলেন। তিনি বললেন, এ সব আবার কোথা থেকে শিখলো!

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, আর একটু বলো তো, আর জানো না?

নবীনচন্দ্র আবার দুলে দুলে বলতে লাগলো :

তোমাতে আমাতে একই অংগ
তুমি কমলিনী আমি সে ভৃংগ
অনুমানে বুঝি আমি সে ভূজংগ
তুমি আমার তার রতনমণি

আধো আধো বালকের কথা নয়। প্রায় সঠিক উচ্চারণ। শুনতে শুনতে একটা হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। এমনকি বিধুশেখরও হেসে ফেললেন। একমাত্র বিদ্যালংকারই অসন্তুষ্ট হলেন একটু। ঠাকুর দেবতার সামনে একি অশ্লীল কথা! তাও এক বালকের মুখে!

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, চেনা চেনা যেন মনে হয়, এ গান কার রচনা?

দুর্গাচরণ বললেন, এ তো গোঁজলা গুঁই-এর গান, বহু পুরাতন। এদানি শোনাই যায় না।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, এ শিশু এ গান শিখলে কেমন করে?

গংগানারায়ণ বললো, ভিকিরী, বৈষ্ণব, কীর্তনীয়ারা বাড়িতে এলে আমার

ভাইটি তাদের গান খুব মন দিয়ে শোনে। সে সব শুনে শুনেই শিখেচে।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, তাহলে তো এ বালক শ্রুতিধরও বটে!

দুর্গাচরণ বললেন, এমন আশ্চর্য শিশু আমি আগে আর দেখিনি তো বটেই কোথাও শুনিনি পর্যন্ত! ঈশ্বর ওকে দীর্ঘজীবী করুন।

তারপর উভয়ে মিলে নবীনকুমারকে প্রভূত আদর করতে লাগলেন। দূর থেকে দেখে বিম্ববতীর মন গর্বে ভরে গেল। পুত্রের ব্যবহার দেখে তাঁর নিজের এখনো মাঝে মাঝে খটকা লাগে, কোনো রকম অপ্রাকৃত কিছুর প্রভাব আছে কি না। কিন্তু এত বড় গুণী ব্যক্তিরা তাঁর পুত্রের এমন সুখ্যাতি করছেন যখন, তখন আর কোনো চিন্তা নেই।

ব্রাহ্মণদের এবার জলপান করানো হবে। নবীনকুমারকেও এখন খাওয়ানো দরকার, তাই গঙ্গানারায়ণ তাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাবার জন্য ভাইকে ক্রোড়ে তুলে নিল। নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, দাদা, আমার হাতেখড়ি হয়ে গ্যাচে?

গঙ্গানারায়ণ বললো, হ্যাঁ। তোমার খুব ভালো হাতেখড়ি হয়েচে।

তখন নবীনকুমার তীক্ষ্ণ জোরালো গলায় বললো, দাদা, দুলালের হাতেখড়ি হবে না?

বিধুশেখর বিস্মিতভাবে বললেন, দুলাল? দুলাল কে?

গঙ্গানারায়ণ নবীনকুমারের পিঠ চাপড়ে বলে উঠলো, এখন খাবার খাবি। চল, চল!

নবীনকুমার কেঁদে উঠলো, না, আমি যাবো না। দুলালের হাতেখড়ি হবে। দুলালকে ডাকো। দুলালকে ডাকো।

গঙ্গানারায়ণও জানে না দুলাল কে। খানিকটা বিব্রত অবস্থায় সে নবীনকুমারকে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল। মায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, দুলাল কে মা? দ্যাখো, ছোটবাবু আবার কী বাতিক ধরেচে।

বিম্ববতী বললেন, কী জানি বাবা, নীচের যে ছেলেটি ওর সঙ্গে খেলে, সেই নাকি!

নবীনকুমার দুলালের নাম করে ডুকরে কাঁদতে শুরু করেছে। তখন গঙ্গানারায়ণ ও বিম্ববতী দুজনেই তাকে অনেক কষ্টে বোঝালেন যে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হবে, হবে, দুলালেরও হাতেখড়ি হবে, পরে হবে।

ভিড়ের একেবারে পিছন দিকে থাকোমণি তার পুত্রকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মনিবপুত্রের মুখে দুলালের নাম উচ্চারণ সে-ও শুনতে পেয়েছে। কিন্তু সে ভয় পেয়ে গেল, তার মন বললো, এ সব ভালো নয়। বাবুদের কোনো ব্যাপারের মধ্যেই থাকা ভালো নয়। ছেলেকে নিয়ে থাকোমণি সরে গেল তাড়াতাড়ি।

দুলালচন্দ্রকে নবীনকুমার খুঁজে পেল বিকেলবেলা। শ্লেট আর পেন্সিল সে সারাদিন আর কাছছাড়া করেনি। এগুলিকে সে নতুন খেলনা হিসেবে পেয়েছে।

—দুলাল, তুই হাতেখড়ি দিলিনি? তোর বিদ্যে হবে না।

দুলালচন্দ্র হাতেখড়ি মানে জানে না। সে দূর থেকে দেখেছিল। সাদা রঙের হাঁসের ওপর বসা সরস্বতী ঠাকুরের সামনে স্তূপ করা ছিল সন্দেশের পাহাড়। তার ভাগ্যে একটিও জোটেনি।

—আয়, আমি তোকে হাতেখড়ি শেখাবো। বোস, আমার সামনে বোস, হাঁটু গেড়ে বোস।

নিজে ঠিক ব্রাহ্মণ আচার্যদের ভঙ্গিতে পিঠ সোজা করে বসে সে অবিকল

তাঁদের নকল করে বলতে লাগলো, লেখ, ক! ঘুঁড়ির আধেক আর একটা শুন্ডি! তোকে আগে কেউ লিখতে শিখিয়েচে? লেখ, এ, বি!

এবার আমায় প্রণাম কর।



রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার অকস্মাৎ পরলোকগমন করায় সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির পদটি খালি হলো। এই পদের জন্য দাবিদার অনেক। কিন্তু সাহেবরা বুঝেছে যে বৃদ্ধ পন্ডিত বা গ্রামের টুলো বামুনদের দিয়ে শিক্ষালয় পরিচালনার কাজ ভালো চলে না। এজন্য আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন কোনো তেজস্বী ও উচ্চ শিক্ষিত যুবকের প্রয়োজন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদার ঈশ্বরচন্দ্র বছর পাঁচেক ধরে বেশ যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে সুনাম অর্জন করেছে। সেইজন্য শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারি ময়েট সাহেব ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ মার্সাল সাহেবকে অনুরোধ জানালেন ঈশ্বরকে ছেড়ে দেবার জন্য। মার্সাল সাহেব রাজি হলেন সানন্দে।

উভয় চাকরিরই বেতন একই, সেই পঞ্চাশ টাকা। তবুও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের চেয়ে সংস্কৃত কলেজে কাজ নেওয়ায় ঈশ্বরের বেশী আগ্রহ থাকাই স্বাভাবিক। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পড়াতে হয় সাহেবদের, তারা বাংলা বা সংস্কৃত শেখে চাকরি রক্ষার কারণে। আর সংস্কৃত কলেজে পড়ানো হয় দেশীয় ছাত্রদের এবং সেটিই প্রকৃত বিদ্যাচর্চার স্থল। মার্সাল সাহেব ঈশ্বর পন্ডিতের ওপর এমনই প্রীত ছিলেন যে ঈশ্বর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পরিত্যাগ করার পর তাঁর ভাই দীনবন্ধুকেই তিনি সে জায়গায় বসালেন।

সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্ত। ইনি নিজে সংস্কৃত তেমন কিছু জানেন না। কিন্তু ইংরেজি ভাষায় দক্ষ এবং সাহেবদের সঙ্গে উত্তমরূপে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন বলে সংস্কৃত কলেজ পরিচালনার ভার পেয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র হলেন তাঁর সহকারী। বাবু রসময় দত্তের আরও পাঁচ রকম কর্ম আছে, তা ছাড়া তিনি ছোট আদালতের সাব জজ্, তিনি সর্বক্ষণ কলেজে থাকতে পারেন না, ঘণ্টা দু' একের জন্য এসে ব্যবস্থাদি ঠিক মতন চলছে কিনা দেখে যান। ঈশ্বরচন্দ্র নিজে কলেজের পরিচালনা পদ্ধতি সম্পূর্ণ ঢেলে সাজাবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন।

সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা পাঠ শেষ করবার পর বিদ্যাভূষণ, বিদ্যালঙ্কার, বিদ্যারত্ন, বিদ্যাসাগর ইত্যাদি পদবী পায়। ঈশ্বরচন্দ্রের আগেও দু' একজন বিদ্যাসাগর হয়েছেন, পরেও হয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র নিজের নাম লেখার সময় লেখেন ঈশ্বরচন্দ্র শর্মণ, কিন্তু লোকে তাঁকে বিদ্যাসাগর বলে ডাকতে শুরু করেছে কয়েক বছর আগে থেকেই, সংস্কৃত কলেজে আসবার পর ঐ নামেই তিনি পরিচিত হয়ে উঠলেন।

নতুন চাকরি নেওয়ার পর একবার পিতামাতার সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন। ঈশ্বরচন্দ্র তাই ভাইদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কলকাতার বাসা থেকে স্বগ্রাম মেদিনীপুরে পৌঁছোবার ব্যবস্থা অতি সরল, গাড়ি ঘোড়ার কোনো বালাই নেই।

বউবাজার থেকে বেরিয়ে পদব্রজে হাটখোলার গঙ্গার ধারে এসে ফেরি নৌকোয় পার হয়ে গিয়ে উঠলেন শালিখায়। তারপর বাঁধা রাস্তা ধরে হণ্টন। বৈশাখ মাস, যখন তখন ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা, সে রকম হলে গাছতলায় বিশ্রাম। মসাট গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে রাস্তা ছেড়ে ঈশ্বরচন্দ্র সদলবলে নেমে পড়লেন মাঠের মধ্যে। কোণাকুণি পশ্চিম মুখে গেলে দূরত্ব সংক্ষেপ হয়। বর্ষার সময় রাস্তা ও মাঠ প্রায় একাকার হয়ে যায়, কোথাও কোথাও হাঁটু সমান কাদা ঠেলে এগোতে হয়। এখন অবশ্য মাঠ ঘাট শুকনো। ওঁরা দিন শেষে পৌঁছোলেন রাজবলহাটে। এখানে দামোদর নদ পেরুতে হবে। সঙ্গে চিঁড়ে গুড় মুড়ি যা ছিল, তা দিয়ে আহার সেরে নেওয়া হলো।

দামোদর অতি ভয়ঙ্কর ও সুন্দর নদ। এখন গ্রীষ্মকাল, অধিকাংশ নদী নালারই তেজ মরে যায়, কিন্তু দামোদর এই সময়ও তপস্যারত যোগীর মতন কৃশকায় হলেও সমান তেজস্বী। ভরা বর্ষায় এই নদ করাল রূপ ধারণ করে, দু পার্শ্বের চার-পাঁচ ক্রোশ জলমগ্ন হয়ে যায়। প্রতি বৎসরই বন্যা।

সে রাত্রে নৌকো পাওয়া গেল না বলে ফিরে আসতে হলো রাজবলহাটে। এই গ্রামে রাত্রি যাপনের জন্য সরাইখানা আছে। ধনী ব্যক্তিরা পথিকদের জন্য মধ্যে মধ্যে এ রকম সরাইখানা প্রতিষ্ঠা করে রেখেছেন, পথিকরা বিনা ব্যয়ে এখানে থেকে যান।

ভোরে উঠে দামোদর পেরিয়ে আবার পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে এসে পৌঁছোলেন পাতুল গ্রামে। এখানে ঈশ্বরচন্দ্রের কিছু আত্মীয়স্বজন থাকেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা করে আবার বেরিয়ে পড়লেন নিজের গ্রামের উদ্দেশ্যে। এখান থেকে বীরসিংহা গ্রাম মাত্র সাত ক্রোশ। দুপুরে দুই ঘটিকার মধ্যেই ওঁরা পৌঁছে গেলেন বাড়িতে।

আগে থেকে খবর দেওয়া ছিল না, অকস্মাৎ পুত্রদের উপস্থিত হতে দেখে বাড়িতে আনন্দের সমারোহ পড়ে গেল।

ঠাকুরদাস চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে এখন গ্রামেই থাকেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ঢোকার পরই ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় জোর করেই পিতাকে চাকুরি ছাড়িয়েছেন। ঠাকুরদাস তখন মাইনে পেতেন দশ টাকা। তাঁর সমবয়েসীরা অবশ্য পরামর্শ দিয়েছিলেন, কাঁচা বয়েসের ছেলের কথায় এমন হুট করে কাজ ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়, ছেলে যদি পরে দুশ্চরিত্র হয়ে যায়, বাপ মাকে আর না দেখে, তখন ঠাকুরদাসকে আবার চাকরির খোঁজে দোরে দোরে ঘুরতে হবে। কিন্তু ঠাকুরদাস ততদিনে বুঝে গেছেন, এ ছেলে ঠাকুর দেবতাদের বিশেষ ভক্তি করে না বটে, কিন্তু পিতা মাতাই এর ঠাকুর দেবতা।

সাত ভাইয়ের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র সকলের জ্যেষ্ঠ। তিনি সবচেয়ে বেশী কৃতী হয়েছেন বলেই নয়, বাল্যকাল থেকেই তিনি জননীর বেশী প্রিয়। ঈশ্বর এসেছে বলে ভগবতী অত বেলাতেই আবার রান্নাবান্না নিয়ে মেতে উঠলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পত্নী দীনময়ীও রান্নাঘরে ঢুকে বসে রইলেন শাশুড়ীর সঙ্গে। স্বামী অনেকদিন পরে বাড়ি এসেছেন বটে, কিন্তু দিনের আলোয় স্বামীর সঙ্গে তাঁর দেখা হবে না। সে রকম নিয়ম নেই।

বাবা মায়ের সঙ্গে কুশল সংবাদ সেরে নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বেরুলেন পাড়া বেড়াতে। প্রথমেই গেলেন কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। ইনি ঈশ্বরচন্দ্রের আদি শিক্ষক, প্রত্যেকবার বাড়ি আসবার সময় ঈশ্বরচন্দ্র এঁর জন্য নতুন বস্ত্র

কিনে আনেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়েছে, দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ, তবু তিনি একটি দৃশ্য দেখে চমকে উঠলেন। গৃহিণীকে ডেকে বললেন, ওগো, দেখে যাও, দেখে যাও পাগল ছেলের কাণ্ড!

অদূরের মাঠে ছেলেরা জল কাদার মধ্যে কপাটি খেলছিল, ঈশ্বরচন্দ্রও তাদের মধ্যে নেমে পড়ে লাফালাফি করছেন। গুরুমশাই ঈশ্বরকে ডাকাডাকি করতে লাগলেন, ঈশ্বর দূর থেকেই উত্তর দিলেন, দাঁড়ান, খেলাটি সেরে লই!

খানিক বাদে ঈশ্বরচন্দ্র এলেন হাঁপাতে হাঁপাতে। গুরুমশাই বললেন, এ কি কাণ্ড দেখো! একেবারে বালকদের সঙ্গে মিশে বালক হয়ে গেলে!

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, কলকেতায় তো আর খেলাধুলার সুযোগ হয় না! গ্রামে এলেই আমার শরীর সুস্থ থাকে। নিয়মিত কপাটি খেললে উদরাময় হয় না।

গুরুমশাই তাঁর পত্নীকে বললেন, শোনো ছেলের কথা! এ এখন কী হয়েছে জানো! সংস্কৃত কলেজের সহকারী পরিচালক, দু বেলা সাহেবদের সঙ্গে কথা কইতে হয়, দেশের মাথা মাথা লোকেরা যেখানে ঠাঁই পায় না—

ঈশ্বরচন্দ্র হাসতে লাগলেন।

গুরু-পত্নী বললেন, আমাদের সেদিনের সেই ঈশ্বর, এই তো এইটুকুন গুটলিমতন চেহারা ছিল, কী দুষ্টামিই করতো! সে আজ এত বড়টি হয়েছে! অ ঈশ্বর, তোর বয়েস কত হলো?

ঈশ্বরচন্দ্র হিসেব কষে বললেন, এই তো ছাব্বিশে পড়লাম।

তিনি বললেন, চেহারা দেখে কিন্তু বোঝা যায় না বাপু! সেই যেন ছোটটিই রইছিস।

গুরুমশাই বললেন, হ্যাঁরে ঈশ্বর, সংস্কৃত কলেজের ছেলেরা তোকে মানে?

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, ফোর্ট উইলিয়াম কালেজে আমি সাহেব ছাত্রদের শায়েস্তা করিছি, আর এই নিরীহ ডাল ভাত খাওয়া ছেলেরা আমায় মানবে না?

কথায় কথায় একটু বাদে কালীকান্ত জিজ্ঞেস করলেন, ক্ষীরপাই যাবি নাকি? তা হলে চল আমিও তোর সাথেই যাই। পরশ্ব আমায় সে স্থলে যেতে হবে।

ক্ষীরপাই গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্রের শ্বশুরালয়। তিনি কদাচিৎ সেখানে যান। এখন তাঁর স্ত্রী এখানেই রয়েছেন, সুতরাং যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, আপনার শরীর তো দেখছি ভালো না। আপনি আবার অত দূর যাবেন কী জন্য?

কালীকান্ত বললেন, কী করি বল, আবার একটি বিবাহের সম্বন্ধ এসেছে, না করলেই নয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিস্মিত হয়ে বললেন, বিবাহের সম্বন্ধ? কার? আপনার?

কালীকান্ত বললেন, আর বলিস কেন! না করলে নয়, ওরাও ছাড়ে না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিস্ফারিত চক্ষে তাকিয়ে রইলেন গুরুর দিকে। গুরু-পত্নী পাশেই বসা, তাঁর মুখেও কোনো ভাবান্তর নেই। কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ভঙ্গ কুলীন, বহু বিবাহে আলস্য নেই। ঈশ্বরচন্দ্র ছেলেবেলা থেকেই জানেন এ কথা। বাড়িতে এই একটিই স্ত্রী। অন্যান্য গ্রামে স্ত্রীদের কাছে বৎসরে একবার করে টাকা আদায় করতে যান। সেই সব স্ত্রীদের বৎসরে একবার তিনি সহবাস দিয়ে ধন্য করেন বলে তাদের পিতামাতাকে অর্থব্যয় করতে হয় প্রত্যেকবার।

এসব জানা সত্ত্বেও ঈশ্বরচন্দ্র আজ যেন গুরুকে নতুনভাবে দেখলেন, তাঁর

সমস্ত শরীরে সঞ্চারিত হয়ে গেল ঘৃণা, গুরু হিসেবে যাঁকে শ্রদ্ধা করেছেন, মানুষ হিসেবে তিনি এত অশ্রদ্ধেয়! ইদানীং ঈশ্বর অনুভব করছেন, খাঁটি মানুষ বড় দুর্লভ। লেখাপড়া তো শিখছে অনেকেই, কিন্তু তাদের মধ্যেই বা খাঁটি মানুষ ক'জন?

এই বৃদ্ধের তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখনো বিবাহ করার শখ? জেনেশুনে আবার একটি মেয়ের সর্বনাশ করবে?

ঈশ্বরচন্দ্রকে রুদ্ধবাক দেখে গুরুমশাই নিজেই বললেন, কী করি বল, পাঠশালাটি এখন ভালো চলে না, আমার এ পক্ষেই ছয়টি ছেলেমেয়ে, এত বড় সংসার চালানো কি সহজ কথা! পুরানো শ্বশুরবাটিগুলান থেকেও আদায়পত্তর আজকাল আর ভালো হয় না, রোজগারের একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো!

ঈশ্বরচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, সে মেয়েটির বয়েস কত?

গুরুমশাই বললেন, নয় পার হয়ে গেছে। এত বড় বয়স্থা কন্যা, তার পিতা অতি ব্যস্ত হয়ে আমার একেবারে হাতে পায়ে ধরেছে। টাকা পয়সাও এরা দেবে ভালো।

ঈশ্বরচন্দ্র কড়া গলায় বললেন, দুদিন পর আপনি চোখ বুজলে সে মেয়েটির যে কপাল পুড়বে?

—আর তার যদি বিবাহ না হয়, সমাজে তার বাপ মা পতিত হয়ে যাবে না?

—আপনার ছেলে শ্রীনাথ...সেও তো উপযুক্ত হয়েছে, তার সঙ্গেই এই কন্যার বিবাহ দিন না কেন?

—শ্রীনাথের আমি অন্যত্র বিবাহ ঠিক করিছি। তোকে বললুম না, টাকা পয়সার বড় টান যাচ্ছে।

গুরু-পত্নী স্বহস্তে প্রস্তুত চিঁড়ের মোয়া এনে দিলেন ঈশ্বরের জন্য। কিন্তু ঈশ্বর হাত জোড় করে বললেন, মাপ করুন, এ বাড়িতে আমি জলস্পর্শ করবো না।

তারপর কালীকান্তের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললেন, গুরুমহাশয়, আপনার সহিত এই আমার শেষ দেখা। এ বাড়িতে আর আমি কোনোদিন আসবো না।

পিছন ফিরে হন হন করে হাঁটতে লাগলেন ঈশ্বরচন্দ্র। গুরুমশাই তাঁর ক্রোধের কারণ বুঝতে না পেরে বিস্মিতভাবে ডাকতে লাগলেন, অ ঈশ্বর, শোন, কী হলো, অ ঈশ্বর...

ঈশ্বর আর দাঁড়ালেনও না, উত্তরও দিলেন না।

তারপর থেকে সর্বক্ষণ ঈশ্বরের মন চঞ্চল হয়ে রইলো। যাঁরা নমস্য, যাঁরা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, তাঁরাও এই প্রকার অন্যায় করে, তবে সাধারণ অশিক্ষিত বা কুশিক্ষিত ব্যক্তিরা তো এ রকম করবেই। অথচ এর প্রতিবিধান করার কোনো ক্ষমতা তাঁর নেই, এ কথা চিন্তা করেই গায়ে যেন জ্বালা ধরে।

তাঁর মনে পড়লো, তাঁর ছাত্রাবস্থায় সংস্কৃত কলেজে তাঁর ব্যাকরণ শিক্ষক শম্ভুনাথ বাচস্পতি পত্নী বিয়োগের পর সেই বৃদ্ধ বয়েসেই আবার বিবাহ করতে উদ্যত হন। ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাঁকে বলেছিলেন, এরূপ বয়সে মহাশয়ের বিবাহ করা পরামর্শ সিদ্ধ নয়। বাচস্পতি শুনলেন না, আবার এক বালিকাকে বিয়ে করে আনলেন। সেই থেকে ঈশ্বরচন্দ্র আর যেতেন না শম্ভুনাথ বাচস্পতির গৃহে। বাচস্পতি মাঝে মাঝেই বলতেন, একটি দিনের জন্যও তোমার মাকে দেখতে গেলে না। পেড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত একদিন গেলেন তিনি, কিন্তু মেয়েটিকে দেখা মাত্রই তাঁর চোখ ফেটে জল এলো, নিজেকে কিছুতেই সামলাতে পারেননি।

কিছুদিনের মধ্যেই মেয়েটিকে অকূল পাথারে ভাসিয়ে বাচস্পতি প্রস্থান করলেন পরলোকে।

কালীকান্ত যে মেয়েটিকে বিবাহ করতে যাচ্ছেন, সে মেয়েটিকে চক্ষেও দেখেননি ঈশ্বরচন্দ্র, তবু সেই মেয়েটির কথা ভেবে তাঁর কান্না এসে গেল।

জননী ভগবতীও ঈশ্বরের ব্যবহার দেখে অবাক। এত যত্ন করে তিনি অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করলেন, ঈশ্বরচন্দ্র তার কিছুই প্রায় খেতে চান না। জাল ফেলে পুকুর থেকে মাছ ধরা হয়েছে, বাড়ির গাভির দুধে রাঁধা হয়েছে পায়েসান্ন, পুত্র এতবড় সুসংবাদ বহন করে এনেছে, তারই জন্য এত আয়োজন। কিন্তু ঈশ্বর বললেন, মা, আমি শুধু দুটি ডাল ভাত খাবো, আর কিছু আমার মুখে রুচবে না।

মা চোখ কপালে তুলে বললেন, ওমা, এ কী কথা? তুই খাবিনি কেন? তোর জন্য এত কল্লাম!

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, মা, এতকাল আমরা ডাল ভাত খেয়েই তো মানুষ হয়েছি, সেই ডাল ভাত খেয়েই তো কত আহ্লাদ করলাম। এখন হঠাৎ বড় মানুষী করার প্রয়োজন তো দেখি না। মা, দেশে অনেক দুঃখী, তাদের কথা চিন্তা করলে আমার মুখে ভালো খাদ্য রোচে না।

ভগবতী বললেন, তুই বড় কাজ পেয়েচিস, একদিন গরীব দুঃখীদেরও আমি পেট পুরে খাওয়াবো।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, মা, তোমাদের আশীর্বাদে আমি আর দীনবন্ধু দু' ভায়েই উপযুক্ত কাজ পেয়েছি, এখন আমাদের অবস্থা যদি কিছু ফেরে, তবে তা দিয়ে দেশ গাঁয়ের কিছু উন্নতি ঘটাতে চাই।

—সে হবেখন। একদিন শখ করে রেঁধেছি, তুই খা তো এখন।

ঈশ্বর একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, মা, আমাদের কলকেতার বাসাবাড়ির যাওয়া-আসার পথে আমি রোজ দেখি গোয়ালাদের দুধ দুইতে। বাছুরগুলানকে তারা দূরে বেঁধে রাখে, তারা করুণভাবে ম্যা ম্যা করে ডাকে, তবু তাদের একটু মাতৃস্তন্য পান করতে দেয় না। গোরুর সব দুধ মানুষে চুরি করে নেয়, অথচ গোবৎসদের জন্যই তো দুধ, তাদের আমরা বঞ্চিত করি। এইসব দেখেশুনে দুধের প্রতি আমার অভক্তি জন্মে গেছে। মাছ মাংস খেতেও আমার রুচি হয় না।

ভগবতী রীতিমতন ভয় পেয়ে বললেন, ও মা, এমন অলক্ষুণে কথা তো কখনো শুনিনি। দুধ, মাছ, মাংস না খেলে শরীর টিঁকবে? একেই তো তোদের কত খাটুনি।

এক টুকরো ভাজা মাছ ভগবতী নিজে পাত থেকে তুলে নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের মুখের কাছে ধরে বললেন, খা। আমি বলছি, খা!

অন্য ভাইরা কৌতুক দেখার ভঙ্গিতে চেয়ে আছে। খাদ্য বিষয়ে দাদার এই নতুন বাতিকের কথা তারা জানে। দাদা দারুণ গোঁয়ার, একবার যা বলে সে কথা আর ফেরায় না। কিন্তু জননীর সঙ্গে কি দাদা জেদে পারবে?

ঈশ্বরচন্দ্র মায়ের হাত থেকে মাছ ভাজাটি নিয়ে বললেন, মা, তুমি এত করে বলছো বলে এই আমি এক টুকরো মাছ মুখে দিলাম। কিন্তু পায়েস সরিয়ে নাও। দুধের জিনিস আর আমি কিছুতেই খেতে পারবো না।

ঠাকুরদাস কাছেই দাঁড়িয়ে হুঁকো টানতে টানতে শুনছিলেন সব। এবার তিনি বললেন, ও ঘাড়-বেঁকাকে তুমি আর বেশী সিধে করতে পারবে না, ব্রাহ্মণী! আর বেশী জোর করলে সব ফেলে উঠে যাবে!

কয়েকদিন গ্রামে থেকে ঈশ্বরচন্দ্র আবার ফিরলেন কলকাতার দিকে। এবারে তাঁর বড় মন খারাপ হয়ে গেছে। সেই নয় বৎসর বয়েসে তিনি কলকাতায় চলে যান। তারপর থেকে প্রায় কলকাতাতেই থেকেছেন, মধ্যে মধ্যে ছুটিতে এসেছেন গ্রামে বেড়াতে। প্রত্যেকবারই গ্রামে এসে তাঁর মন প্রফুল্ল হয়ে গেছে, বালকের মতন ফূর্তিতে গায়ে মেখেছেন দেশের ধুলো মাটি। কিন্তু এবারে তাঁর মনে হলো, গ্রামের মানুষের মধ্যে দুঃখ, দারিদ্র্য, কুসংস্কার যেন দিন দিনই বাড়ছে। সামান্য স্বার্থ নিয়ে সবাই ব্যাপৃত, সামান্য কারণে দলাদলি। এ-সব দূর করার উপায় কী? একমাত্র শিক্ষা বিস্তারেই কিছু সুফল পাওয়া যেতে পারে। উপযুক্ত শিক্ষা মানুষের সামনে একটি দর্পণ তুলে ধরে। মানুষ তাতে নিজেকে চিনতে শেখে।

কলকাতায় ফিরেই তিনি সংস্কৃত কলেজটির আমূল সংস্কার করার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন। সংস্কৃত কলেজটি যেন হরিঘোষের গোয়াল হয়েছে। সরকার কলেজ খুলে দিয়েছে, যার যেমন খুশী কলেজটিকে ব্যবহার করে। ছাত্রদের কোনো বেতন লাগে না, তাই পড়াশুনোর কর্মটিকেও তারা মনে করে যেন গোপাল ঠাকুরের ব্যাগার। যার যখন ইচ্ছা আসে যায়। যদিও পাকা ইষ্টকের ভবনে কলেজ বসে, তবু শিক্ষকগণ যেন সেই আগেকার গাছতলার টোলের ধারাটাই অক্ষুণ্ণ রাখতে চান। কোনো শিক্ষক ক্লাসের মধ্যে চেয়ারে পা তুলে বসে তাঁর কোনো প্রিয় ছাত্রকে ডেকে বলেন, বাপু হে, একটু বাতাস করো তো, কিছুক্ষণ ঘুমায়ে লই!

কলেজে কোনো সাপ্তাহিক ছুটির দিন নির্দিষ্ট নেই। অষ্টমী ও প্রতিপদে সংস্কৃত অনুশীলন নিষেধ বলে ঐ দুই তিথিতে কলেজ বন্ধ থাকে। দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় কোনো নতুন পাঠ শুরু করতে নেই, এমন রীতি কে স্থির করেছে তার ঠিক নেই, তবু চলে আসছে।

ঈশ্বরচন্দ্র এ-সব প্রথা বন্ধ করে দিলেন। প্রত্যেক রবিবার কলেজ বন্ধ থাকবে, বাকি দিনগুলিতে যথানিয়মে ক্লাস চলবে। শিক্ষক বা ছাত্র সকলকেই আসতে হবে সাড়ে দশটার মধ্যে। ক্লাসে কোনো শিক্ষক ঘুমোলে তিনি নিজে গিয়ে তাঁকে জাগিয়ে দেন, অতিশয় নিদ্রাতুর কোনো শিক্ষককে হেসে পরামর্শ দেন, এবার থেকে সঙ্গে নস্যর ডিপে রাখুন, ঘুম এলেই নাকে নস্য ঠুসে দেবেন!

কলেজ ভবনের পেছন দিকে মালির ঘরের পাশে শৌচাগার। ছাত্ররা সেখানে যাবার নাম করে দল বেঁধে একসঙ্গে এসে নানারকম রঙ্গ-রস করে। তাদের পাঠ্য রচনার মধ্যে আদি রসাত্মক শ্লোকের ছড়াছড়ি। সেগুলি আলোচনারও এটিই উপযুক্ত জায়গা। নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি নিয়ম করলেন, একবারে একজনের বেশী ছাত্র শৌচাগারে যেতে পারবে না এবং যাবার সময় কাষ্ঠের পাস নিয়ে যেতে হবে সঙ্গে। শিক্ষক বা ছাত্র কেউই আবেদনপত্র না পাঠিয়ে দিনের পর দিন অনুপস্থিত থাকতে পারবে না। মাসে একবার প্রত্যেক ছাত্রকে পরীক্ষা দিতে হবে এবং শুধু সংস্কৃত নয়, ছাত্রদের প্রত্যেককেই বাধ্যতামূলকভাবে শিখতে হবে বাংলা, ইংরেজি ও অংক।

ছাত্রদের নিয়ে বেশী সমস্যা নেই, কিছু কিছু সমস্যা দেখা দিল অধ্যাপকদের নিয়ে। অধিকাংশ বৃদ্ধ অধ্যাপকের কাছে ঈশ্বরচন্দ্র নিজে পড়েছেন। তাঁরা তাঁর গুরুস্থানীয়। ঈশ্বরচন্দ্র এখন তাঁদের ওপরে কর্তা হয়ে বসায় তাঁরা সব নির্দেশ

মানতে চান না। বিশেষত সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে কলেজে এসে পৌঁছোবার ব্যাপারটা বড়ই বাড়াবাড়ি মনে হয়।

গুরুস্থানীয় অধ্যাপকদের ঈশ্বরচন্দ্র মুখে কিছু বলতে পারেন না। ঠিক সাড়ে দশটার সময় তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন কলেজের গেটে, হাতে একটা ঘড়ি। যে-সব অধ্যাপক অনেক বিলম্ব করে পৌঁছোন, তাঁরা দেখতে পান যে, ঈশ্বরচন্দ্র একবার তাঁদের মুখের দিকে আর একবার ঘড়ির দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন। একজন পণ্ডিত একদিন বলেই ফেললেন, ঈশ্বর তুমি যে কিছু বলো না, টিপি টিপি হাসো, ওতেই বড় লজ্জা পাই। ঘাট মানছি বাপু, কাল থেকে ঠিক সময় আসবো।

মাঝখানে একটা ঘটনায় ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্র মহলে খুব জনপ্রিয় হয়ে গেলেন। হিন্দু কলেজ আর সংস্কৃত কলেজ সন্নিহিত ভবনে বসে। একদিন কোনো প্রয়োজনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গেলেন হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কার সাহেবের ঘরে। চরকায় মায়ের হাতে বোনা মোটা সুতোর ধুতি ও চাদর পরা, মাথার সামনের দিক কামানো, পিছনে সুবৃহৎ শিখা। এমন চেহারার মনুষ্যকে দেখে কার সাহেব বসতে বললেন না, বরং নিজের পা দুখানি টেবলের ওপর তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁ, পণ্ডিত, কী দরকার বলো?

অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র ফিরে এলেন সেদিন, কারুকে কিছু বললেন না। কয়েকদিন পরেই একটি সুযোগ পেয়ে গেলেন। পিঠোপিঠি দুই কলেজের পরিচালকদের প্রায়ই নানা কাজে কথাবার্তা বলতে হয়। সেদিন কার সাহেব এলেন সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করতে। আগে থেকে খবর পেয়েই ঈশ্বরচন্দ্র টেবিলের ওপর তাঁর চটি পরা পা দুখানি তুলে রাখলেন, তারপর কার সাহেবকে বসবার চেয়ার না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ, বলো সাহেব, কী তোমার প্রয়োজন?

রাগে ছটফটিয়ে ঘর থেকে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেলেন কার সাহেব।

এই ঘটনাই নানাভাবে পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে। এমনকি ইংরেজ সমাজেরও কানে গেল। সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা এই কথা শুনিয়ে শুনিয়ে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের দুয়ো দেয়। কার সাহেব ঘটনাটিকে রসিকতা হিসেবে না নিয়ে শিক্ষা বিভাগের প্রধানের কাছে নালিশ জানালেন। তিনি বললেন, আর কোনো ইউরোপীয় হলে এই অপমান কিছুতেই সহ্য করতো না।

শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারি ময়েট সাহেব এলেন তদন্তে। ঈশ্বরচন্দ্র নিরীহ-মুখে বললেন, আমি কিছু দোষ করেছি, তা তো জানতাম না। আমি তো ভেবেছিলাম, এটাই তোমাদের দেশের ভদ্রতা। কার সাহেবের মতন একজন মান্য-গণ্য ব্যক্তি যদি টেবিলে চর্ম নির্মিত জুতোশুদ্ধ পা তুলে দিয়ে বসে থাকেন, তা হলে আমার পক্ষে টেবিল থেকে পা নামিয়ে বসা কি অভব্যতা হতো না?

ময়েট সাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর রিপোর্ট লিখলেন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতন সাহসী ও তেজস্বী পুরুষ আমি বাঙালীদের মধ্যে আর একজনও দেখি নাই।

সেবার চাকরি টিঁকে গেলেও মাত্র এক বছর তিন মাস পরেই সংস্কৃত কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

রসময় দত্ত ঈশ্বরচন্দ্রের গতিবিধি সুনজরে দেখছিলেন না। ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্রদের

কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন, কলেজের নানাবিধ সংস্কারের কারণে সাহেবগণ ঈশ্বরচন্দ্রের প্রশংসা করছেন। রসময় দত্ত মনে করলেন, সাহেবদের কাছে তাঁর নিজের সমাদর যেন কমে যাবে এতে। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর অধস্তন কর্মচারী, সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্র খাটবেন, কৃতিত্বটা পাবেন তিনি, এরকমই সাধারণত হয়। কিন্তু এ যে বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় হয়ে যাচ্ছে। এবার রসময় দত্ত শক্ত হাতে হাল ধরলেন এবং ঈশ্বরচন্দ্রের সংস্কার প্রস্তাব বাতিল করে দিতে লাগলেন একটার পর একটা। কলেজটি আমূলভাবে ঢেলে সাজাবার একটি পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। সেটি রসময় দত্ত কিছুতেই পাঠাতে রাজি হলেন না শিক্ষা বিভাগীয় বড় সাহেবদের কাছে।

বিরক্ত হয়ে ইস্তফাপত্র পেশ করলেন ঈশ্বরচন্দ্র। সে কথা শুনে কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক লিখিতভাবে রসময় দত্তকে অনুরোধ করলেন, এই কলেজের পক্ষে বিদ্যাসাগর মহা উপকারী, তাকে যেন যেতে না দেওয়া হয় কিছুতেই। রসময় দত্ত সে-সব গ্রাহ্য করলেন না। তাঁর ধারণা, একটু চাপ দিলেই ঈশ্বরচন্দ্রকে নরম করা যাবে।

এক কথায় ঈশ্বরচন্দ্র চাকরি ছেড়ে চলে এলেন।

বন্ধু ডাক্তার দুর্গাচরণ বাড়িতে এসে বললেন, ওহে ঈশ্বরচন্দ্র, তোমার কান্ড দেখে যে সকলের তাক্ লেগে গেছে। এই বাজারে কেউ এত বড় চাকরি ছাড়ে? রসময় দত্ত কী বলছেন জানো? ছোকরা এক কথায় চাকরি ছাড়লো, এর পর খাবে কী?

ঈশ্বর হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, ওঁকে জানিয়ে দিও, দরকার হলে আলু পটল বেচে খাবো, মুদির দোকান দেবো! তবু যে চাকরিতে মান থাকে না, সে চাকরি আর আমি কক্ষনো করতে যাবো না।



বিন্দুবাসিনী একটা স্বপ্ন দেখছিল। স্বর্গের নন্দনকাননে সে শুয়ে আছে গোলাপের পাপড়ি বিছানো তৃণশয্যায়, তার সামনে দাঁড়িয়ে এক জ্যোতিষ্মান পুরুষ, মাথায় সুবর্ণ কিরীট, মুখখানি অপরূপ হাস্যময়। বিন্দু চিনতে পারলো, ইনিই তো জনার্দনরূপী বিষ্ণু স্বয়ং, যিনি সমস্ত জগতের পতি এবং বিন্দু-বাসিনীর আরাধ্য। তিনি বিন্দুবাসিনীর দিকে হাত বাড়িয়ে ভুবনমোহন স্বরে বললেন, উঠে এসো, কোন্ অভিমানে তুমি শুয়ে আছো, এই তো আমি দর্শন দিয়েছি।

শরীরে মানুষের স্পর্শ লাগতেই বিন্দুবাসিনী ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসলো। দারুণ চমকে গিয়ে বললো, এ কি, তুই?

গঙ্গানারায়ণ বিন্দুর খুব কাছে মাটিতে হাত রেখে ঝুঁকে বসে একদৃষ্টে দেখছিল বিন্দুর ঘুমন্ত মুখখানি। যেন একটি সাদা ফোটা পদ্ম, তাতে শারদ শিশিরের মতন কয়েকটি শ্বেত কণা। বিন্দুবাসিনী এখন পূর্ণ যুবতী, তার রূপ যেন ফেটে পড়ছে। কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে নিবিড় বর্ষার মেঘের মতন কেশভার, তার বুকে যৌবন যেন আপন আগমনের কথা জানান দিচ্ছে শব্দ করে।

তার উরুর রেখাভঙ্গিমা পারস্য দেশীয় খড়গের মতন।

অকৃত্রিম বিস্ময়ের সঙ্গে বিন্দু প্রশ্ন করলো, একি গঙ্গা, তুই ঠাকুরঘরে ঢুকিচিস যে?

গঙ্গানারায়ণ বললো, আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলুম বাইরে, তোর ঘুম ভাঙাতে চাইনি। কী অপরূপ লাবণ্যময়ী হয়িচিস তুই, বিন্দু! তাই আমি আর মাথার ঠিক রাখতে পারলুম না।

বিন্দু ঈষৎ হাস্যে বললো, আহা হা, ঢং! তোর বোয়ের খবর কী? বাপের বাড়ি থেকে সে এয়েচে?

অন্যমনস্কভাবে গঙ্গানারায়ণ বললো, না।

—তাকে আর কতদিন বাপের বাড়িতে ফেলে রাকবি? তাকে নিয়ে আয় এবার। আমরা একটু মনের মতন করে তাকে সাজাই।

—সে আসতে চায় না।

—ওমা সেকি কথা? বাড়ির প্রথম বউ, সে আর কতদিন বাইরে বাইরে থাকবে! নতুন বউ পায়ে মল পরে ঝমর ঝমর করে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াবে, তবেই না আনন্দ!

গঙ্গানারায়ণ বিন্দুর একখানি হাত ধরে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললো, এখন তার কথা থাক। বিন্দু, তুই একটু আমার পানে চা।

বিন্দুবাসিনী গঙ্গানারায়ণের চেয়ে বয়সে সামান্য ছোট হলেও ভাবভঙ্গিতে যেন অনেকখানি বড়। একুশ বৎসর বয়েসে গঙ্গানারায়ণ জীবনে প্রতিষ্ঠিত এবং উচ্চদায়িত্বসম্পন্ন পুরুষ হয়েও বিন্দুর সামনে সে আচরণ করছে বালকের মতন।

বিন্দুবাসিনী গঙ্গানারায়ণের আবেগ-ভাব অগ্রাহ্য করে পুনরায় খুব স্বাভাবিকভাবে বললো, বাড়ির বউকে বেশী দিন বাপের বাড়িতে রাকা মোটেই কাজের কতা নয়। এবার লোক পাটিয়ে তাকে নিয়ে আয়। তিন বচর হলো বিয়ে হয়েচে, এখন তো আর সে ছোটটি নেই।

গঙ্গানারায়ণ অপ্রসন্নভাবে বললো, আজো সে বালিকা। আমার কোনো কথাই সে বোঝে না। সে তার মায়ের আদরিণী মেয়ে, এ বাড়িতে এলেই মায়ের জন্য কাঁদাকাটি করে। এখনো সে পুতুল খেলে।

বিন্দুবাসিনী সহাস্যে বললো, তুই এবার নিয়ে আয়, আমরা তাকে সব শিকিয়ে পড়িয়ে দোবো। এখন সে তোকে নিয়েই পুতুল খেলবে। মেয়েমানুষের সবচেয়ে বড় পুতুল তো তার স্বামী।

—বিন্দু, সে কোনোদিনই আমার জীবনসঙ্গিনী হতে পারবে না। সে লেখা-পড়া কিচুই শেখেনি।

—তুই শিকিয়ে পড়িয়ে দিবি। তুই এত বড় বিদ্বান হয়িচিস।

—আমি তোর সাথে বসে অনেক বই পড়বো। মনে আচে, আমাদের একসঙ্গে মেঘদূতম পাঠের কথা ছেল? আজও তা হলো না।

—আমার আর লেখাপড়া! আমার মতন মেয়েরা লেখাপড়া করলে সে বাড়ির অকল্যাণ হয়!

—তোর সেই অভিমান এখনো আচে, না বিন্দু? খুড়োমশাই তোর পড়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন...এবার থেকে আমরা গোপনে এক সাথে পড়বো আবার।

—আমার হাত ছাড়, বাইরে গিয়ে দাঁড়া। তুই ঠাকুরঘরে ঢুকিচিস, কেউ যদি দ্যাকে?

—বিন্দু, তোকে বিনে আমি বাঁচবো না।

—মরণ! মাথায় বুঝি ভূত সেঁধিয়েচে? যা, বাইরে যা বলচি!

—কেউ দেকবে না। বাড়িতে কেউ নেই। আমি কায়স্থ বলে তুই-ও আমায় ঠাকুরঘর থেকে তাড়িয়ে দিবি? কেন, কায়স্থ হয়ে জন্মিচি বলেই আমি কিসে অপবিত্র?

সে কথার উত্তর না দিয়ে বিন্দু একটুক্ষণ উৎকর্ণ হলো। সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, কখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নেমে এসেছে সে টেরও পায়নি। ঘরের মধ্যে এখন আবছা আবছা অন্ধকার। সারা বাড়িটা নিস্তব্ধ মনে হয়।

বিন্দু জিজ্ঞেস করলো, বাড়িতে কেউ নেই কেন? সবাই কোতায় গেল?

গঙ্গানারায়ণ বললো, আজ শ্রীরামপুরে আমার বড় মামার বাড়িতে সকলের নেমন্তন্ন, তুই জানিস না? সবাই বেলাবেলি রওনা হয়ে গ্যাচে।

বিন্দুবাসিনী একটি সংক্ষিপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্যদিকে মুখ ফেরালো। গঙ্গানারায়ণকে সে তার মনের ভাব বুঝতে দিতে চায় না। সে বিধবা, তাকে তো কোথাও নিয়ে যাওয়া হবে না, তাই কোনদিন কবে নেমন্তন্ন থাকে সে কথা তাকে জানাবারও প্রয়োজন মনে করে না কেউ। ক্রমে ক্রমে এ বাড়ির অনেকেই তার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে। সে তিনতলার ঠাকুরঘরে নির্বাসিতা।

আবার মুখ ফিরিয়ে বিন্দুবাসিনী জিজ্ঞেস করলো, সবাই গ্যাচে, তুই যাসনি কেন?

গঙ্গানারায়ণ বললো, আমার যে জ্বর। তুই তো আমার খবরও রাকিস না, তিনদিন ধরে আমি জ্বরে শুয়েচিলাম।

নারীদের চিরকালীন স্বভাববশত অসুখের কথা শুনেই বিন্দুবাসিনী ঈষৎ ব্যাকুল হয়ে গঙ্গার কপালে হাত ছুঁইয়ে বললো, ওমা, এখনো জ্বর রয়েচে দেকচি! তুই এই জ্বর-গায়ে বেরিয়ে এলি?

উদ্ভিন্নযৌবনা বিন্দুকে এত কাছে পেয়ে গঙ্গানারায়ণ আর স্থির থাকতে পারলো না। তাকে আলিঙ্গন করে বুকে টেনে নিল।

রীতিমতন ভয় পেয়ে বিন্দু বললো, এ কি গঙ্গা, তুই কি পাগল হয়ে গেলি? জ্বরের জন্য তোর বিকার হয়েচে। ছাড়, ছাড় আমাকে।

—না, আমি আর তোকে কোনোদিন ছাড়বো না!

—তোর মাথায় পাপ ঢুকেচে। গঙ্গা, তুই ঠাকুরের সামনে...ছি, ছি, ছি, আমার মরে যেতে ইচ্ছে কচ্চে, তুই আমাকে ছাড়, নইলে আজই আমি আত্মঘাতিনী হবো।

বিন্দুবাসিনীর এই মুক্তি পাওয়ার চেষ্টার মধ্যে কোনো প্রকার ছলাকলা নেই বুঝতে পেরে গঙ্গানারায়ণ ছেড়ে দিল তাকে। আহত, কাতর কণ্ঠে বললো, বিন্দু, তুই সত্যিই আমায় চাস না?

বিন্দুবাসিনী বললো, আমার এই জনার্দন রয়েচে, আমি কি আর অন্য কোনো মানুষকে চাইতে পারি?

গঙ্গানারায়ণ সরোষে সে মূর্তির দিকে হাত বাড়িয়ে বললো, আমি ভেঙে ফেলবো এই পাথরের ঠাকুর।

বিন্দুবাসিনী তার হাত চেপে ধরে বললো, তুই কি সত্যি পাগল হলি? এসব কথা তো তোর মুখে কখনো শুনিনি? তোর কী হয়েচে আমায় সব বল তো!

গঙ্গানারায়ণ বললো, আমি ক'দিন জ্বরে পড়েচিলাম, আমার কিচুই ভালো লাগচিল না। আমার বন্ধুরা এসেচিল, তাদের সঙ্গও আমার ভালো লাগেনি। মা বলেচিলেন, বাগবাজার থেকে লীলাবতীকে আনবেন, আমি বলিচিলুম, থাক মা। সে পুতুল খেলা নিয়ে আচে থাক। আমি তো সেবা চাইনি, আমি চেয়িচিলুম

সাহচর্য। লীলাবতী তো আমায় তা দিতে পারে না, সে এখনও অবোধ বালিকা... আমার খুব অভিমান হচ্ছিল, তুই আমাকে ভুলে গেচিস।

—আমি কি তোকে কখনো ভুলতে পারি, গঙ্গা? আমার আর কী আচে যে তোকে ভুলবো?

—এই যে বললি, তোর জনার্দন আচে? কিন্তু আমার আর কেউ নেই, আমি অনেক ভেবে দেখিচি, তুই দূরে থাকলে আমি কিছুতেই শান্তি পাবো না। আমার কোনো আশ্রয় নেই, অথচ তুই বারবার আমাকে ঠেলে দিস...কেন বিন্দু, কেন, আমার জন্য তোর টান হয় না?

—চল গঙ্গা, আমরা ঠাকুরঘরের বাইরে যাই।

—তুই এখনো ভাবচিস, আমি এখানে থাকলে তোর জনার্দনের ঘর অপবিত্র হয়ে যবে? আমি সত্যিই একদিন ভুঁয়ে আছড়ে তোর এ ঠাকুরকে ভেঙে ফেলবো!

—তুই বুঝি বেম্মদের দলে নাম লিকিয়িচিস? শুনলুম তুই দেবেন ঠাকুরের বাড়িতে যাতায়াত করিস আজকাল?

—তোকে কে বললে?

—তুই ভাবিস আমি তোর খবর রাখি না। কিন্তু আমি সব খবরই রাখি।

—শুধু আমি কাচে এলেই তুই দূরে ঠেলে দিস! আজ আমি তোকে ছাড়বো না। আজ আমাকে বাধা দেবার কেউ নেই।

—ছিঃ! বাড়িতে কেউ নেই বলেই বুঝি তোকে চোরের মতন আসতে হবে! তুই তো রাজা, তুই যেখানে যাবি, রাজার মতন যাবি! তোর কত যাবার জায়গা আচে। আমি দূরেই থাকবো, সেই তো আমার নিয়তি।

—আমি নিয়তি মানি না।

—তুই মানিস না, কিন্তু আমায় মানতেই হবে। আমি যে স্ত্রীলোক।

এই কথা বলেই বিন্দু হাসলো। তার কণ্ঠে একটুও দুঃখের সুর নেই। ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে অন্ধকার গাঢ় হয়েছে, গবাক্ষের বাইরে আকাশে জ্যোৎস্নাধারা।

—তুই হাসলি কেন?

—আমরা একসঙ্গে পড়াশুনো কত্তুম, তোর মনে আচে? হঠাৎ পণ্ডিতমশাই একদিন বলেচিলেন, আমি আর বালিকা নই, আমি স্ত্রীলোক। তখন অবাক হয়িচিলুম, রাগও ধরেছিল খুব। কিন্তু এখন তো সত্যিই আমি স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকের অনেক কিচুই করতে নেই, এমনকি ছেলেবয়সের খেলার সাথী যে তুই, সে তুই-ও এখন আমার কাচে পরপুরুষ, তোর কাচাকাচি আমায় বসতে নেই। তুই এটা বুঝিস না?

—না। আমি বুঝবো না। বিন্দু, আমি তোকে চাই।

—এ জন্মে নয়।

—হ্যাঁ, এ জন্মেই!

গঙ্গানারায়ণ আবার বিন্দুবাসিনীর দু বাহু চেপে ধরে তার সুমেরু পর্বত সদৃশ স্তনের ওপর ব্যাকুল মুখখানি চেপে ধরলো।

নিশ্বাস রোধ করে শরীর শক্ত করে রইলো বিন্দু। তারপর শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললো, ছাড়, আমাকে একবার ছাড়, আগে আমার একটা কতা শোন।

—আমি আর তোর কোনো কতা শুনবো না।

—তুই একবার ছাড়, তারপর তোর সব কতা আমি শুনবো।

গঙ্গানারায়ণ ছেড়ে দিতেই বিন্দুবাসিনী ঝটিতি উঠে পড়েই ছুটলো ঘরের

বাইরে। গঙ্গানারায়ণও তৎক্ষণাৎ তাড়া করে গেল তাকে। নীচের তলার দাস-দাসীরা কেউ ওপরে আসবে না, দ্বিতল, ত্রিতল সম্পূর্ণ ফাঁকা। বিন্দুবাসিনী কোথায় লুকোবে? নীচে যাবার সিঁড়িতে পৌঁছোবার আগেই গঙ্গানারায়ণ তাকে ধরে ফেলবে বুঝতে পেরে সে ছুটতে লাগলো ছাদের দিকে।

যেন বাল্যকালের মতন পরস্পরকে ধরার খেলা। এককালের দুই শিশু-খেলুড়ে এইরকম ভাবেই ছাদে ছুটোছুটি করতো। তবে তখন সব খেলাই ছিল উদ্দেশ্যহীন, কিন্তু দুই যুবক-যুবতী আধো অন্ধকার ছাদে সে প্রকার অনাবিল উদ্দেশ্যহীন খেলা আর খেলতে পারে না।

গঙ্গানারায়ণ অচিরেই ধরে ফেললো বিন্দুবাসিনীকে। সবলে তাকে নিজ শরীরের সঙ্গে চেপে ধরে ক্ষ্যাপার মতন তার সারা মুখে চুম্বন বর্ষণ করতে লাগলো।

একবার ক্ষণেকের জন্য গঙ্গানারায়ণ নিবৃত্ত হতেই বিন্দু বসে পড়লো তার পায়ের কাছে। গঙ্গানারায়ণের জানু ধরে, এতক্ষণ বাদে এই প্রথম সে ব্যথিত গলায় বললো, গঙ্গা, আমি পাপ করতে পারবো না। কিছুতেই পারবো না। তুই আমার বন্ধু হয়েও এমন সর্বনাশ কর্বি?

গঙ্গানারায়ণ বললো, পাপ? এই যদি পাপ হয়, তবে পুণ্য কী? লোকে যাকে পুণ্য বলে, তার সব কিছু আমি পরিত্যাগ করতে রাজি আচি। আমার যথা-সর্বস্বের বিনিময়েও আমি তোকে চাই, এই কি পাপের চাওয়া?

বিন্দু বললো, তুই এসব আর আমাকে বলিসনি। এ জন্মটা আমার এই-ভাবেই যাবে। আশীর্বাদ কর, যেন পরের জন্মে তোকে আমার নিজের করে পেতে পারি।

গঙ্গানারায়ণ নিজেও হাঁটু গেড়ে বিন্দুর মুখোমুখি বসে পড়ে বললো, পর-জন্ম আছে কিনা কে বলতে পারে? তার জন্য এ জন্মটায় নিজেকে বঞ্চনা করা মূর্খামি নয়? আর বিন্দু, এই দেশ কিংবা এই সমাজের বাইরেও অন্য দেশ, অন্য সমাজ আচে, চল, আমরা সেরকম কোনো স্থলে চলে যাই। সেখানে কেউ আমাদের চিনবে না।

বিন্দু বললো, কিন্তু আমরা কি নিজের কাচ থেকে পালাতে পারবো? আমি নিজেই যে জানি, এটা পাপ!

—না, পাপ নয়।

—গঙ্গা, তুই আমাকে ছাড়, আমি পারবো না, কিছুতেই পারবো না।

—বিন্দু, তোকে আমি ছাড়তে পারি না, তোর এই অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি, এমন দেবীর মতন মুখের শোভা—আমার বুকে তুই আগুন জ্বালিয়েচিস বিন্দু।

গঙ্গানারায়ণ ফের বিন্দুকে বক্ষে টানতে যেতেই বিন্দু দু হাতে তাকে বাধা দিয়ে বললো, তুই যদি আমার ওপর জোর করিস, তবে তুই শুধু আমার শরীর পাবি, মন পাবি না। আর আজ রাতেই আমি গলায় ফাঁস বেঁধে মরবো। তুই তো আমার জেদ জানিস?

গঙ্গানারায়ণ বিন্দুকে ছেড়ে দিয়ে তীক্ষ্ম ভাবে বিন্দুর মুখখানি পরীক্ষা করতে করতে বললো, এমন? সত্য করে বল তো, অপর কারোর ওপর তোর মন মজেচে?

—ছিঃ, অমন কথা বলতে নেই, গঙ্গা।

—বিন্দু, তুই আমাকে চাস না?

—এমন নোংরা, কদর্যভাবে তোকে আমি চাই না। আমার কাচে তুই থাকবি

শুদ্ধ, সুন্দর, জ্যোতির্ময়রূপে।

উঠে দাঁড়িয়ে গঙ্গানারায়ণ বললো, আমি চললুম। আর আমি তোর কাচে কোনোদিন আসবো না।

বিন্দুবাসিনী কোনো উত্তর দিল না।

গঙ্গানারায়ণ আবার বললো, আমার মাথার মধ্যে কেমন আগুন জ্বলচে, তুই কিছুই বুঝলি না। জানি না, এখন কিসে শান্তি পাবো। আমাকে না দেখলেই তুই খুশী হোস তো, আমি আর আসবো না তোর কাচে।

বিন্দু এবারও কোনো কথা বললো না। ছাদের আলসেতে হেলান দিয়ে বসে রইলো হাঁটুতে চিবুক ভর দিয়ে।

গঙ্গানারায়ণ পিছন ফিরে ক্রুদ্ধভাবে চলে গেল, সিঁড়িতে তার পদশব্দ হতে লাগলো, তবু কেউ তাকে ফিরে আসবার জন্য ডাকলো না। পথ দিয়ে সে পদব্রজে ধাবিত হলো নিজের বাড়ির দিকে। এ গৃহও শূন্য। কারুর সঙ্গে কথা বলে যে সে তার মস্তিষ্ক জুড়োবে, তারও উপায় নেই। অথচ বন্ধু-বান্ধব কারো কাছে যেতেও তার ইচ্ছে হলো না। শান্ত, মৃদু স্বভাবের গঙ্গানারায়ণ আজ অত্যন্ত চঞ্চল ও উদ্‌ভ্রান্ত। শহরে স্ত্রীলোকের অভাব নেই। ইচ্ছা হলে গঙ্গানারায়ণ এখনই জুড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে কোনো রূপসী সঙ্গীতপটীয়সী বারাঙ্গনার গৃহে গিয়ে উপস্থিত হতে পারে, তার এখন অর্থেরও অভাব নেই। কিন্তু বিন্দুবাসিনী ছাড়া আর কোনো রমণী তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। বিন্দু তার জীবনে শুধু নারীর প্রয়োজন মেটাবে না, বিন্দু তার চেয়েও বেশী অনেক কিছু। সেই বিন্দু তাকে প্রত্যাখ্যান করে ফিরিয়ে দিল।

সেই সন্ধ্যাকালেই নিজের শয্যায় শুয়ে ছটফট করতে লাগলো গঙ্গানারায়ণ।

গঙ্গানারায়ণের এই চাঞ্চল্য এর পরের কয়েকদিনেও কমলো না একটুও। অথচ মন শান্ত করা দরকার। অনেকটা শান্তি পাওয়া যায় দেবেন্দ্রবাবুর কাছে গিয়ে তাঁর মুখনিঃসৃত বাণীগুলি শুনলে।

তার কলেজ জীবনের সহপাঠী রাজনারায়ণ বসু এখন দেবেন্দ্রবাবুর তত্ত্ব-বোধিনী সভার অধীনে উপনিষদ অনুবাদকের চাকুরি করে। একসময় রাজনারায়ণ অতিরিক্ত মদ্যপান শুরু করেছিল, এখন কিছুটা শুধরেছে। রাজনারায়ণ একসময় ছিল সংশয়বাদী, সকল ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো, এখন যেন তার মন খানিকটা ফিরেছে ধর্মপথে। দেবেন্দ্রবাবু উপনিষদের শ্লোকগুলি পাঠ করে তারপর তার অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দেন। সেই শুনে শুনে রাজনারায়ণ এই শ্লোকগুলি ইংরেজিতে অনুবাদ করে। উপনিষদের দুরূহ শ্লোকগুলি দেবেন্দ্র-বাবু এমনই প্রাঞ্জল ও সুললিত ভাষায় ব্যাখ্যা করেন যে তা শুনবার জন্য অনেকেই সেখানে ভিড় করে। গঙ্গানারায়ণ একদিন তার বন্ধু রাজনারায়ণের সঙ্গে গিয়ে দেবেন্দ্রবাবুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। দেবেন্দ্রবাবুও তাকে প্রীতির চক্ষে দেখেন।

কয়েকদিন সেখানে গিয়েও গঙ্গানারায়ণের মন শান্ত হলো না। ধর্ম, দর্শন, সমাজ, সংস্কার কিছুই যেন আর তার ভালো লাগে না। মন সর্বক্ষণ বিন্দুর সান্নিধ্যে যাবার জন্য ছটফট করে। নিজেকে শাস্তি দেবার জন্য সে জমিদারি পরিদর্শনে চলে গেল কুষ্টিয়ায়।

সেখানে পৌঁছেই বুঝলো, সে আরও ভুল করেছে। কলকাতায় তবু বরং এটুকু সান্ত্বনা ছিল যে, বিন্দু অদূরেই আছে, ইচ্ছা করলেই সে ছুটে গিয়ে বিন্দুকে একবার দেখে আসতে পারে। কিন্তু কুষ্টিয়া যেন তার কাছে মরুভূমির

ন্যায় প্রতীয়মান হলো। কাজকর্ম সব অসমাপ্ত রেখে সে আবার ফিরে এলো কলকাতায়।

আবার এক সায়াহ্নে সে বিন্দুর ঠাকুরঘরে উপস্থিত হয়ে বললো, আমি হার মানলাম বিন্দু। তোকে ছেড়ে আমি কিছুতেই দূরে রইতে পাচ্ছি না!

বিন্দু রাগ করলো না, বরং সুমিষ্ট স্বরে তাকে বললো, আয়, দোরের কাচে বোস। শরীরের উপর খুব বুঝি অযত্ন করচিস?

কিন্তু শুধু বিন্দুর সুমিষ্ট বাক্য শুনলেই গঙ্গানারায়ণের মন ভরে না আর। দূরে থাকার সময় সে ভেবেছিল, বুঝি একবার বিন্দুর মুখখানি দেখলেই তার হৃদয় জুড়োবে। কাছে এসে বুঝলো, পতঙ্গ যেমন অগ্নিশিখার দিকে ধায়, তেমনি বিন্দুর রূপরাশির মধ্যে সে চায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হতে।

বিন্দু কিছুতেই তাকে প্রশ্রয় দেবে না। গঙ্গানারায়ণ যদি দূরে বসে তার সঙ্গে গল্পগাছা করতে চায় তার আপত্তি নেই, কিন্তু গঙ্গানারায়ণ তার হস্ত আকর্ষণ করলেই বিন্দু বলে, তুই কি চাস আমি মরি? পাপের পথে যাওয়ার চেয়ে মরণও ভালো।

গঙ্গানারায়ণ প্রশ্ন করে, আর কিচু নয়, আমি যদি তোর ক্রোড়ে মাথা দিয়ে শুই, তাও কি পাপ?

বিন্দু বলে, অমন কতা উচ্চারণ করাও পাপ। এমন কি হাতে হাত ছোঁয়াও পাপ।

গঙ্গানারায়ণ উন্মত্তবৎ হয়ে উঠলো। সে জিদ ধরলো, বিন্দুর এই প্রতিরোধ সে ভাঙবেই। বিন্দুকে না পেলে তার জীবনের আর সব কিছু ব্যর্থ। তার আর দিগ্বিদিক জ্ঞান রইলো না। অফিস-কাছারি থেকে সে যখন তখন চলে এসে বসে থাকে বিন্দুর কাছে। এ গৃহে তার অবারিতদ্বার। যে-কোনো সময় সে আসতে পারে, যার কাছে খুশী সে যেতে পারে, কেউ তাকে বাধা দেবে না। কিন্তু সে যে আর কারো কাছে নয়, শুধু সর্বক্ষণ বিন্দুর কাছেই নিভৃতে বসে থাকে, এটা যে দৃষ্টিকটু এ বোধ তার লুপ্ত হয়ে গেছে। বিন্দুকে ছাড়া এ জগতের আর কিছুই যেন সে এখন দেখতে পায় না।

এক নিঝুম দ্বিপ্রহরে গঙ্গানারায়ণ আবার বিন্দুর ওপর বলপ্রয়োগ করতে গেল। বিন্দু সেদিন কেঁদে ফেললো একেবারে। বিন্দু বড় অসহায়। সে চিৎকার চেঁচামেচি করতে পারে না, কারণ গঙ্গানারায়ণ যে তার বড় প্রিয়, গঙ্গানারায়ণের সম্মানহানি হোক, তাই বা সে চাইবে কী করে! সে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো, আমার মরণই ভালো। তুই কেন এমনভাবে নিজের সর্বনাশ করচিস গঙ্গা? তুই আমায় বিষ এনে দে!

গঙ্গানারায়ণ বিন্দুকে বক্ষে আঁকড়ে ধরে বলতে লাগলো, আমি আর কিচু জানি না, আয় আজ তুই আমি দুইজনে মরণ-উৎসবে মাতি।

বিন্দু ফিসফিস করে বললো, ছেড়ে দে, ওরে আমায় ছেড়ে দে, আমায় এমন-ভাবে নরকের দিকে নিয়ে যাসনি—

পক্ষকাল ধরেই এ বাড়ির দাসদাসী মহলে পাঁচরকম কথা কানাকানি হচ্ছিল। কথা পোঁছেছিল বাড়ির গৃহিণীরও কানে। দাসী সমভিব্যাহারে বিন্দুর মা নিজে সেই সময় এসে এ দৃশ্য দেখে শিউরে উঠলেন। গৃহদেবতার সামনে ব্যভিচারক্রিয়া চলছে।

তিনি তীক্ষ্ম স্বরে ডাকলেন, বিন্দু!

তারপর কপাল চাপড়ে বললেন, হা অদৃষ্ট, এ কি কল্লে? বিন্দু, পোড়ারমুখী,

ঘরজ্বালানী, তুই মরলিনি কেন? তোর মনে মনে এই ছেল? গঙ্গা আমাদের সোনার টুকরো ছেলে, তুই তার ওপর বিষ নজর দিইচিস! ডাইনী!

গঙ্গানারায়ণের চৈতন্য উদয় হলো। বিন্দুর কাছ থেকে সরে এসে নতমস্তকে বললো, খুড়িমা, দোষ আমার। বিন্দুর কোনো দোষ নয়।

বিন্দু পাষাণমূর্তির মতন স্থির।

বিন্দুর মা সৌদামিনী গঙ্গানারায়ণকে বললেন, গঙ্গা, তুমি সরে এসো, ও ডাইনীর কাচে থেকো না। আমার পেটে আমি এই বিষপুঁটুলি ধরিচিলাম। ওফ!

গঙ্গানারায়ণ বাইরে বেরিয়ে আসতেই তিনি দরজা টেনে শিকলি বন্ধ করে দিয়ে বললেন, ও থাকুক এখানে। কত্তা এসে ওকে নিয়ে যা করার করবেন। তুমি এসো, গঙ্গা, নীচে এসো—

দাসীর দিকে ফিরে গৃহকর্ত্রী কড়া সুরে বললেন, দেখিস, খপরদার যেন এ সব কথা পাঁচ কান হয় না! তাহলে তোর জিভ কেটে দোবো!

গঙ্গানারায়ণ আচ্ছন্নের মতন বললো, আপনি...বিন্দুকে বন্ধ করে রাখলেন... দোষ যে সব আমার...আমিই ওর ওপর জোর খাটাচ্ছিলুম...।

গঙ্গানারায়ণ কিছুতেই সেখান থেকে যাবে না। কথাবার্তা উচ্চগ্রামে উঠছে ক্রমশ। দৈবাৎ সেদিন বিধুশেখরও গৃহে ছিলেন, তিনি উঠে এলেন ওপরে।

তাঁকে দেখে সবাই চুপ করে গেল।

গঙ্গানারায়ণ কম্পিতবক্ষে বললো, খুড়ামশাই, বিন্দুকে ক্ষমা করুন। আমার মতিভ্রম হয়েছেল, আমি বিন্দুর উপর লোভ করিচিলুম, কিন্তু বিন্দু আমায় শেষ পর্যন্ত নিবৃত্ত করেচে...যা শাস্তি দেবার আমায় দিন...।

বিধুশেখর দরজা খুলে দেখলেন বিন্দুকে। বিন্দু ঠিক সেই একই রকম স্থির। আলুলায়িত বসনও ঠিক করেনি। যেন সে দক্ষের যজ্ঞ সভায় সতীর মতন নিশ্বাস রোধ করে বসে আছে।

বিধুশেখর বিন্দুকে কিছুই বললেন না, গঙ্গানারায়ণকে আদেশ করলেন, এসো আমার সঙ্গে।

সে আদেশ অমান্য করার সাধ্য গঙ্গানারায়ণের নেই। সে বিধুশেখরের সঙ্গে নীচে নেমে এলো! বিধুশেখর পোশাক পরিবর্তন করলেন না পর্যন্ত। সেইভাবেই গঙ্গানারায়ণকে নিয়ে তাঁর ল্যাণ্ডো গাড়িতে উঠলেন।

গঙ্গানারায়ণ ভেবেছিল, বিধুশেখর তাকে নিয়ে তাদের বাড়িতে চলে আসবেন। পিতা রামকমল শহরে নেই। মাতা বিম্ববতীর সামনে গিয়ে কিছু একটা বোঝাপড়া করবেন বিধুশেখর। কিন্তু তিনি সহিসকে সোজা যাবার হুকুম দিলেন।

পথে একটিও কথা বললেন না বিধুশেখর। তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্বের সামনে গঙ্গানারায়ণ যেন কুঁকড়ে যেতে লাগলো। তবু তৎক্ষণাৎ সে মনে মনে একথাও ঠিক করে রাখলো, যদি তাকে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করাও হয়, তবু সে বিন্দুবাসিনীকে কোনো শাস্তি দেওয়া সহ্য করবে না। সে রুখে দাঁড়াবে।

অনেকক্ষণ পর বিধুশেখরের নির্দেশে গাড়ি এসে দাঁড়ালো বউবাজারের সুবিখ্যাত কালীমন্দিরের সামনে। গাড়ি থেকে নেমে গঙ্গানারায়ণকে বিধুশেখর বললেন, এসো।

সন্ধ্যা হয় হয়। এস্থলে এখন ভক্তবৃন্দের খুব ভিড়। গেঁজেল ও সুরাপায়ীদের গদগদ চিৎকারে কান পাতা দায়। তবে এ মন্দিরের পাণ্ডা-পূজারীরা বিধুশেখরের পরিচিত। তিনি ভিড় ঠেলে উপস্থিত হলেন একেবারে গর্ভ গৃহে। প্রতিমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে গঙ্গানারায়ণকেও বসতে ইঙ্গিত করলেন।

তারপর নিম্ন স্বরে বললেন, গঙ্গা, তুমি আজ যা করেচো, তা কোনোদিন কেউ জানতে পারবে না। তোমার পিতামাতা কিছুই টের পাবেন না। তোমার সংসারে কোনো অশান্তি ঘটুক আমি চাই না। শুধু তুমি শপথ করো, আর কোনোদিন তুমি বিন্দুকে দেকতে যাবে না, আর কোনোদিন তুমি তার সঙ্গে কতা পর্যন্ত বলবে না।

গঙ্গানারায়ণ একটুক্ষণ ইতঃস্তত করে বললো, আমি এ শপথ করতে রাজি আচি। কিন্তু আপনিও বিন্দুকে কোনো শাস্তি দেবেন না বলুন! সে নিরপরাধ।

বিধুশেখর বললেন, বেশ, সেকথাও আমি দিলুম।

গঙ্গানারায়ণ তখন মূর্তির সামনে গড় করে বিড়বিড় করে ঐ শপথ বাক্য উচ্চারণ করলো।

কিন্তু এ ঘটনার তিন-চারদিন পরই গঙ্গানারায়ণ খবর পেল যে, বিন্দুবাসিনী তার নিজের বাড়িতে আর নেই। সে কোথায় গেছে কেউ জানে না।

গঙ্গানারায়ণ ছুটে গেল বিধুশেখরের কাছে। উত্তেজিতভাবে বললো, খুড়ো-মশাই, আপনি যে কতা দিয়েচিলেন—

বিধুশেখর বললেন, আমি ঠিকই আমার কথা রেখিচি, গঙ্গা। বিন্দুকে কোনোরূপ শাস্তি দিইনি, সে ভালো আচে। আমি বরং তোমার শপথ রক্ষার ব্যাপারটা অনেক সহজ করে দিইচি। কাশীতে পাঠিয়ে দিইচি বিন্দুকে। সে আর কোনোদিন এখানে আসবে না। সেখানেই সে ভালো থাকবে।



দ্বারকানাথ আবার বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। স্বদেশে আর তাঁর মন টিঁকছিল না, জ্যেষ্ঠপুত্রের ব্যবহারে তিনি ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত। তাছাড়া এখানে তাঁর প্রাণের দোসর বলতে আর কেউ নেই। তাঁকে সকলে ভয় পায় বা শ্রদ্ধা করে, কেউ ভালোবাসে না। বাণিজ্যে ও জমিদারি পরিচালনায় কৃতিত্বে তিনি সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন। উপার্জন করেছেন প্রভূত ধন-সম্পদ, কিন্তু এক সময় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ভাবলেন, কী লাভ এত পরিশ্রমে? তাঁর উত্তরাধিকারীরা যদি এ সব রক্ষা করতে না পারে বা না চায়, তাহলে তিনিই বা আর লক্ষ্মীর পিছনে ছোটাছুটি করে আয়ুক্ষয় করবেন কেন? বরং এবার দু হাতে ব্যয় করে যাবেন। ইওরোপে তাঁর অগাধ খাতির, রূপসী ললনারা তাঁকে ঘিরে থাকবে সেখানে। সেদেশের খাদ্য ও মদ্যও অতি উচ্চশ্রেণীর।

বিলাত যাত্রার সময় দ্বারকানাথ সঙ্গে প্রচুর ধনসম্পদ তো নিয়ে গেলেনই, তাছাড়া তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রকে কঠোর নির্দেশ দিয়ে গেলেন যেন তাঁকে হাতখরচ হিসাবে প্রতিমাসে একলক্ষ টাকা পাঠানো হয়। এবং এবার তিনি কতদিন থাকবেন, তার কোনো ঠিক নেই। একলক্ষ টাকা অর্থাৎ যা দিয়ে পাঁচ হাজার ভরি সোনা ক্রয় করা যায়।

দ্বিতীয়বার প্রবাস যাত্রার আগে দ্বারকানাথের মনে সামান্য একটু সংশয় ছিল, এবারেও তিনি পূর্বেকার মতন সমাদর পাবেন তো? প্রথম পরিচয়ের বিস্ময় দ্বিতীয়বার অনেকটা কমে যায়। তাছাড়া, তিনি আগেরবার যখন এসেছিলেন,

তখন ইওরোপের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁকেই প্রথম একজন হিন্দু বা ভারতীয় হিসেবে চাক্ষুষ দেখলেন। এক রূপকথার দেশ হিন্দুস্থান বা ভারতবর্ষ, সেখানকার মানুষকে দেখতে কেমন, এই কৌতূহলই ছিল প্রবল। এবারে ইওরোপে পৌঁছেই দ্বারকানাথ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য একেবারে বিলাসের স্রোত বইয়ে দিলেন।

দ্বারকানাথ সঙ্গে নিয়ে এসেছেন ছোটখাটো একটি দল। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ, তাঁর ভাগিনেয় নবীনচন্দ্র, একজন নিজস্ব ইংরেজ চিকিৎসক, একজন ইংরেজ একান্ত সচিব, কয়েকজন ভৃত্য কর্মচারী। এ ছাড়া মেডিক্যাল কলেজের দুজন ছাত্রকে তিনি উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ দেবার জন্য তাদের পথ-খরচ এবং বিলাতে তাদের আহার, বাসস্থান ও শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, এসেছে সেই দুটি ছাত্র এবং সরকারী খরচে আরও দুটি ছাত্র। বিলেতে পৌঁছে তিনি প্রথমেই ঐ ছাত্রদের এবং তাঁর পুত্র ও ভাগিনেয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করে তাদের পৃথক পৃথক বাসা ভাড়া করে দিলেন। তারপর দায়িত্বমুক্ত হয়ে তিনি স্বেচ্ছামার্গী হলেন।

আগের বার এসে তিনি সাহেব জাতিরা কী কী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছে এবং শিল্পে-বাণিজ্যে কোন্ কোন্ অভিনব পন্থা অবলম্বন করে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানবার চেষ্টা করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর স্বদেশেও সে-সব পন্থা প্রয়োগ করবেন। কিন্তু এবারে দ্বারকানাথ স্বদেশের উন্নতি কিংবা নিজ পরিবারের সম্পদ বৃদ্ধির ব্যাপারে উদাসীন। এখন তিনি নৃত্য, গীত, ভোজের আসর কিংবা থিয়েটার, অপেরা সম্পর্কে বেশী আগ্রহী। রানী ও রানীর স্বামীর (বিলাত এমনই দেশ, যেখানে রানীর স্বামী সব সময় রাজা হন না) জন্য তিনি স্বর্ণনির্মিত বহুমূল্য সব উপহার নিয়ে এসেছিলেন, রানী ও যুবরাজ সেগুলি পেয়ে অতিশয় উৎফুল্ল হলেন। রাজপ্রাসাদে দ্বারকানাথের ঘন ঘন ডাক পড়তে লাগলো। তাছাড়াও প্রখ্যাত সব ডিউক ও ডাচেস এবং লর্ড ও লেডিগণ পরিবৃত হয়ে তিনি থাকেন প্রায় সর্বদা। কেউ তাঁকে নিমন্ত্রণ করলে তিনিও সমান বা তার চেয়ে বেশী জাঁকজমকের সঙ্গে তাঁদের পালটা নিমন্ত্রণ করেন। মাঝে মাঝে তিনি প্রখ্যাত সব সাহিত্যিক এবং শিল্পীদের ডেকে আসর জমান নিজের গৃহে। তিনি চান, ইংলণ্ডের লোক বুঝুক পরাজিত জাতির প্রতিনিধি হয়েও একজন ভারতবাসী তাদের সমকক্ষ হতে পারে সব দিক দিয়ে।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের অধিবেশন দেখে দ্বারকানাথের মনে একটি নতুন চিন্তা এলো। ব্রিটিশ প্রজাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই পার্লামেণ্টের আসন অলঙ্কৃত করেন। তাহলে ভারতীয়রাই বা কেন সেই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না? আর ভারতীয়দের মধ্যে দ্বারকানাথের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি কে হতে পারে? পার্লামেণ্টে আসন পেলে দ্বারকানাথের বিলাতে অবস্থান স্থায়ী হতে পারে।

এক নৈশভোজের নিমন্ত্রণের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী একদিন নিজে এলেন দ্বারকানাথের বাসভবনে। তখন কথা প্রসঙ্গে দ্বারকানাথ পার্লামেণ্টে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্বের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলেন। অস্বস্তিতে পড়লেন প্রধানমন্ত্রী। এই মহামান্য অতিথির মনে আঘাত লাগবে এমন কোনো কথা তিনি বলতে পারেন না। প্রকারান্তরে তিনি জানালেন যে সেখানে কোনো অ-ব্রিটিশের নির্বাচিত হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। দ্বারকানাথ চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বললেন, তিনি যে কোনো স্থান থেকেই নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জয়ী হতে পারবেন! প্রধানমন্ত্রীকে তখন বলতেই হলো যে, ধরা যাক যদি সেরকমই হয়, তবুও কোনো

হিন্দুর পক্ষে পার্লামেন্টে শপথ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। খৃষ্টান ছাড়া আর কারুর সে অধিকার নেই।

দ্বারকানাথ প্রশ্ন করলেন, হিন্দু খৃষ্টানে তফাৎ কী? হিন্দুও একমাত্র এক পরমেশ্বরের ভজনা করে, খৃষ্টানেও কি তা করে না? হিন্দু ও খৃষ্টানে তো ধর্ম-বিশ্বাসের কোনো সংঘর্ষ নেই, তবে তারা পাশাপাশি কেন বসতে পারবে না পার্লামেন্টে?

প্রধানমন্ত্রী বললেন, খৃষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যীশুকে কি আপনারা ঈশ্বরের পুত্র বলে মানেন? যারা তা মানে না, তাদের আমরা বিপথগামী বলে মনে করি।

আলোচনা অপ্রিয় দিকে মোড় নিচ্ছে বলে উভয়েই এক সময়ে থেমে গেলেন। কিন্তু দ্বারকানাথের মনে বিক্ষোভ রয়েই গেল। এই ঘটনার পর থেকে তাঁর মনে খৃষ্টীয় ধর্ম সম্পর্কে একটা বিরূপতার ভাব জমতে লাগলো ধীরে ধীরে। দেশে থাকতে তিনি ব্রাহ্মণদের ছুঁৎমার্গ ও কুসংস্কার দেখে দেখে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। এবার তিনি পাদ্রীদের নাম দিলেন কালো কোট পরা বিলাতী ব্রাহ্মণ। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে ঘেঁটে যখনই তিনি পাদ্রীদের কোনো পদস্খলন বা লজ্জাজনক ব্যবহারের কাহিনী দেখেন অমনি সেগুলি কেটে কেটে গঁদ দিয়ে সেঁটে রাখতে লাগলেন একটা খাতায়। তাঁর কোনো ইওরোপীয় বন্ধু বা অতিথি খৃষ্টধর্মের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি শুরু করলেই তিনি সেই খাতাটি খুলে দেখান।

মাঝখানে কিছুদিন দ্বারকানাথ ঘুরে এলেন ফ্রান্সে। ফরাসী দেশের সম্রাট লুই ফিলিপ প্রায় তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু হয়ে পড়েছেন। ভার্সাইয়ের রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরেও দ্বারকানাথের গতিবিধি, সম্রাটের পত্নী ও ভগিনীর সঙ্গে এর আগে আর কোনো বহিরাগত কথাবার্তা বলার সম্মান অর্জন করেননি, একমাত্র দ্বারকানাথ ছাড়া। দ্বারকানাথের অঙ্গে দেশীয় পোশাক এবং একটি বহুমূল্য কাশ্মিরী শাল, তা দেখে মহিলারা মুগ্ধ। এ রকম বাহারী জিনিস তারা আগে কখনো দেখেনি।

ফরাসী দেশে এক সান্ধ্য সম্মিলনীর আয়োজন করে দ্বারকানাথ সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী সমেত ফরাসী দেশের শ্রেষ্ঠ অভিজাতদের নিমন্ত্রণ করলেন সেদিন। তিনি বিশেষ করে অনুরোধ করলেন সকলেই যেন তাঁদের স্ত্রী বা প্রেয়সীদের নিয়ে আসেন। একটি বিরাট হলঘরে বসেছে সেই সান্ধ্যভোজের আসর। সেই হলঘরের সব দেয়াল বহুমূল্য সব কাশ্মিরী শালে মোড়া। অতিথিরা, বিশেষত রমণীরা সেই কারুকার্যখচিত শালগুলি থেকে চোখ ফেরাতে পারছেন না। শাল অঙ্গে জড়ানো এখন ফরাসীদেশে একটি দারুণ ফ্যাসানদস্তুর ব্যাপার। কিন্তু এমন চমৎকার কাশ্মীরী শাল ফরাসিনীরাও দেখেননি। কোনো নীলনয়না সুন্দরী দেয়ালের কোনো কাশ্মিরী শালের সামনে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেই দ্বারকানাথ এসে বলছেন, মহাশয়া, এই শালটি আপনাকে উপহার দিয়া আমি ধন্য হতে পারি কি? তারপরই তিনি দেয়াল থেকে সেই শালটি খুলে নিয়ে বিস্ময়াপ্লুত সেই রমণীর শরীরে নিজের হাতে জড়িয়ে দিলেন। ক্রমে ক্রমে সব ক'টি শালই এইভাবে বিলি হয়ে গেল। এমন নিমন্ত্রণ উৎসব বহুকাল কেউ প্যারিসে দেখেননি।

প্যারিসে অবস্থানকালেই দ্বারকানাথের সঙ্গে পরিচয় হলো ম্যাক্সমুলারের। দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রর চেয়েও ম্যাক্সমুলার বছর ছয়েকের ছোট। এই যুবকটি

তখন জার্মানির লাইপৎসিগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি করে ফ্রান্সে এসে অধ্যাপক বুর্ণুফের কাছে সংস্কৃত অধ্যয়ন করছেন। সেই বুর্ণুফই একদিন ম্যাক্সমুলারকে নিয়ে এলেন দ্বারকানাথের কাছে। দ্বারকানাথ নিজে সংস্কৃত অবশ্য ভালো জানেন না, কিন্তু অধ্যাপক বুর্ণুফ এবং ম্যাক্সমুলার সংস্কৃত শিক্ষার সূত্রে ভারতবর্ষ সম্পর্কে এমন সব কথা বলেন, যার সঙ্গে প্রকৃত ভারতবর্ষের সাদৃশ্য খুব কম—এ সব শুনে দ্বারকানাথ কৌতুক বোধ করেন। ম্যাক্সমুলার নামের যুবকটির কৌতূহলের আতিশয্য দেখে দ্বারকানাথ তাকে বললেন, যেদিন খুশী সকালবেলা সে তাঁর কাছে আসতে পারে। ম্যাক্সমুলার প্রায় নিয়মিতই আসতে লাগলেন। সংস্কৃত ভাষা ভালোভাবে না জানলেও পারিবারিক সূত্রে দ্বারকানাথ সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত। তাঁর মুখ থেকে সেই সব কথা ম্যাক্সমুলার গোগ্রাসে গেলেন। ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে এই জার্মান যুবকটির আগ্রহ অসীম।

দ্বারকানাথ এই সময় গান-বাজনার চর্চায়ও মেতে উঠেছেন। ফরাসী ও ইতালীয় অপেরাগীতি তিনি অনুকরণ করতে পারেন অনবদ্যভাবে। তাঁর কণ্ঠস্বর জোরালো। মাঝে মাঝে সেই সব গান তিনি গেয়ে উঠলে ম্যাক্সমুলার শোনেন মুগ্ধভাবে। কখনো কখনো ম্যাক্সমুলার ওঁর গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজান। খুব একটা চর্চা না করলেও দ্বারকানাথের কণ্ঠে বেশ সুর আছে। একদিন ম্যাক্সমুলার দ্বারকানাথকে অনুরোধ করলেন একটি ভারতবর্ষীয় মার্গ সঙ্গীত শোনাবার জন্য। ভারতীয় প্রিন্স বললেন, ও গান বিদেশীরা বুঝবে না। তবু ম্যাক্সমুলার বারবার পেড়াপীড়ি করায় তিনি একটি গান গাইলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কী, এর মর্ম বুঝিলে কিছু?

ম্যাক্সমুলার অকপটে স্বীকার করলেন যে, ঐ গানে তিনি কোনো রস পাননি, ওটি কোনো গান বলিয়া মনে হয় না। সুর তাল লয় কিছুই নেই।

অমনি চটে উঠলেন দ্বারকানাথ। রুক্ষ স্বরে বললেন, এই তোমাদের এক দোষ। তোমরা সহজে কোনো নতুন জিনিস গ্রহণ করিতে পারো না। কোনো জিনিস যদি প্রথমবারেই তোমাদের মনোরঞ্জন করিতে না পারে, অমনি তোমরা তার প্রতি বিরূপ হও। আমি যখন প্রথম ইতালীয় গীতবাদ্য শুনি, তখন মনে হইয়াছিল উহা বিড়ালের চ্যাঁচামেচি। ধৈর্য ধারণ করিয়া আমি তাহার রস গ্রহণ করিতে শিখিয়াছি। তোমরা মনে করো, আমাদের ধর্ম ধর্মই নয়, আমাদের কাব্য কাব্যই নয়, আমাদের দর্শন দর্শনই নয়, যেহেতু তোমরা তা বোঝো না।

ম্যাক্সমুলার চুপসে গেলেন একেবারে।

ইদানীং দ্বারকানাথের মেজাজ প্রায়ই ভালো থাকে না। দেশ থেকে টাকা আসতে সামান্য দেরি হলে, তিনি জ্যেষ্ঠপুত্রকে তীব্র ভর্ৎসনা করে চিঠি লেখেন। দেবেন্দ্রকে তিনি জানিয়ে দেন, তিনি ভালোই বুঝতে পেরেছেন যে দেবেন্দ্র যে পথে চলেছে, তাতে বিষয়সম্পত্তি কিছুই রক্ষা করতে পারবে না।

এদিকে সত্যিই সেইপ্রকার ব্যাপার চলছে। পিতা বিদেশবাসী হবার পর দেবেন্দ্র বিষয়কর্ম থেকে মন একেবারেই সরিয়ে ফেলেছেন যেন। সর্বক্ষণ তিনি ধর্ম সাধনায় ও ধর্ম বিস্তারের জন্য উন্মুখ। ইতিমধ্যেই দীক্ষিত ব্রাহ্মর সংখ্যা পাঁচশত ছাড়িয়ে গেছে, এখন শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলেও এই নব ধর্ম প্রচারের আয়োজন চলছে।

একদিন সকালে দেবেন্দ্র তাঁদের বাহির বাটিতে বসে সংবাদপত্র পাঠ করছেন, এমন সময় তাঁদের হাউসের সরকার রাজেন্দ্রনাথ এসে তাঁর কাছে কেঁদে পড়লো।

কাঁদতে কাঁদতে সে বললো, দেশে এত বড় অবিচার সংঘটিত হচ্ছে, অথচ তার প্রতিকার করার কেউ কি নেই?

কাগজ মুড়ে রেখে দেবেন্দ্র বললেন, কান্না থামাও, আগে বৃত্তান্তটি কি তা খুলো বলো!

রাজেন্দ্রনাথ যে কাহিনীটি বললো, তা এই:

গত রবিবারে রাজেন্দ্রনাথের স্ত্রী এবং তার ছোট ভাই উমেশচন্দ্রের স্ত্রী এক পালকিতে চেপে কোথাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছিল এমন সময় তার ছোট ভাই উমেশচন্দ্র পালকি থামিয়ে জোর করে নিজের স্ত্রীকে নামিয়ে নিয়ে যায় এবং উভয়ে খৃষ্টান হবার নিমিত্ত পাদ্রী ডফ সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে। উমেশচন্দ্রের বয়েস চোদ্দ এবং তার পত্নীর বয়েস এগারো, উভয়েই নাবালক-নাবালিকা। সুতরাং স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হবার অধিকার তাদের নেই। উমেশচন্দ্রের পিতা ডফ সাহেবের কাছে গিয়ে অনুনয় বিনয় করলেন, পুত্র ও পুত্রবধূকে ফিরিয়ে দেবার জন্য। ডফ সাহেব তা শুনলেন না। তখন সুপ্রীমকোর্টে নালিশ করা হলো, সুপ্রীমকোর্ট অচিরাৎ রায় দিয়ে দিল যে ছেলে যখন বাপের কাছে ফিরে যেতে চায় না, তখন আদালত সেখানে জবরদস্তি করবে কেন?

তখন রাজেন্দ্র এবং তার পিতা ডফ সাহেবের কাছে অনুরোধ করে বললো, তারা আবার আদালতে নালিশ আনবে, সেই বিচার সমাপ্ত হবার আগে পর্যন্ত যেন ডফ সাহেব উমেশচন্দ্র ও তার স্ত্রীকে খৃষ্টান না করেন। ডফ সাহেব সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। গতকল্য সন্ধ্যাবেলা ডফ সাহেব ওদের দুজনকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দিয়ে ফেলেছেন।

ঘটনাটি শুনে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন দেবেন্দ্র। আদালত এমত প্রকার রায় দিয়েছে? নাবালক-নাবালিকাকেও জোর করে ধর্মান্তরিত করা যাবে। এ তো স্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব। এই কি ব্রিটিশ ন্যায়-এর উদাহরণ?

তিনি তাঁর কর্মচারী ও বয়স্য অক্ষয় দত্তকে ডেকে বললেন, আপনি এক্ষণেই এর বিরুদ্ধে কলম ধারণ করুন। অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকেরাও এইভাবে ক্রমে ক্রমে স্বধর্ম ছেড়ে পরধর্ম গ্রহণ করবে? এই সাংঘাতিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেও কি আমাদের চৈতন্য হবে না!

দেবেন্দ্র নিজে গাড়ি নিয়ে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতে লাগলেন। তাঁদের বোঝাতে লাগলেন যে, পাদ্রীরা বিনা পয়সায় লেখাপড়া শেখাবার প্রলোভন দেখিয়ে ছোট ছোট বালকদের নিজেদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করাচ্ছে এবং তারপরই প্রথম সুযোগে তাদের খৃষ্টান করে নিচ্ছে। হাজার হাজার ছেলে এইভাবে খৃষ্টান হচ্ছে। এইভাবে চললে যে এদেশের সবাই খৃষ্টান হয়ে যাবে! পাদ্রীদের সংস্পর্শ থেকে এখনি ছেলেদের সরিয়ে আনা দরকার।

সবম্ভ্রান্তদের মধ্যে অনেকেই দেবেন্দ্রকে সুনজরে দেখেন না। ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করে তিনি সনাতন হিন্দুধর্মকে আঘাত করার চেষ্টা করছেন বলে মনে করেন অনেকে। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের শিরোমণি রাধাকান্ত দেব ব্রহ্মসভার বিরুদ্ধে একটি ধর্মসভা স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তিনিও দেবেন্দ্রর এই ব্যাকুলতা দেখে তাঁর সংগে একমত হলেন। উচ্চ ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে দু একজন শুধু প্রশ্ন তুললেন, খৃষ্টান ধর্ম প্রসারে আপত্তি করার নৈতিক ভিত্তি কী? খৃষ্টান ধর্মও তো একটি মহান ধর্ম। ধর্মবিশ্বাসে প্রতিটি মানুষ স্বাধীন, সুতরাং কেউ যদি হিন্দুধর্মের বদলে খৃষ্টধর্ম বরণ করতে চায়, তাহলে তাকে বাধা দেওয়া হবে কেন?

দেবেন্দ্র বললেন, খৃষ্টধর্ম যে মহান তা আমি অবশ্য জানি। ধর্মবিশ্বাসে মানুষ স্বাধীন একথাও ঠিক। কিন্তু প্রধানত খৃষ্টান হয় কাহাদের সন্তানেরা? খৃষ্টান হয় গ্রামের দরিদ্র মানুষ অথবা শহরের নব্য শিক্ষিত যুবকেরা। গ্রামের মানুষ খৃষ্টান হয় নানা প্রকার প্রলোভনে। আর শহরের যুবকেরা হিন্দুশাস্ত্র সম্পর্কে কিছুই জানে না। তাহাদিগকে খৃষ্টান করা সহজ কাজ বটে কিন্তু উচিত কাজ কিনা সেটাই প্রশ্নের বিষয়। পাদ্রীরা বেদান্তধর্ম সম্পর্কে নানা রকম গালা-গালি করে এবং লোকের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করায়। সেইজন্যই আমি বলি, হিন্দুধর্ম ও খৃষ্টধর্মের মতামতগুলির সম্যক জ্ঞান দেশময় বিস্তারিত হোক। তারপর দুই ধর্মমত তৌল করে কেউ যদি একটিকে অন্যটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে বেছে নেয়, তবে তো ভয়ের কোনো কারণ নেই।

দেবেন্দ্রর ব্যাকুলতা ও জোরালো যুক্তি শুনে সকলেই উপলব্ধি করলেন বিষয়টির গুরুত্ব। এইভাবে ভালো ভালো পরিবারের যুবকেরা, এমনকি নাবালক নাবালিকারাও যদি মোহে পড়ে খৃষ্টান হয়, তাহলে হিন্দুসমাজে ভাঙন রোধ করা যাবে কী প্রকারে? ঠিক হলো, পাদ্রীদের বিদ্যালয়ে যেমন ছেলেরা পড়তে পারে, সেই রকম হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় নামে একটি পাঠশালা খোলা হবে, সেখানেও বালকরা বিনাবেতনে পড়বে। বালিকাদের জন্যও একটি পাঠশালার কথা অনেকের মনে গুঞ্জরিত হচ্ছে, এর আগে দু-একবার চেষ্টা করেও সুফল পাওয়া যায়নি, কিন্তু আশা ছাড়েননি অনেকে।

শিমুলিয়াতে এক প্রকাশ্য সভায় এই স্কুল খোলার প্রস্তাবে একদিনে চাঁদা উঠে গেল চল্লিশ হাজার টাকা। এমনকি অন্তঃপুরের মহিলারাও এর জন্য তাঁদের দান পাঠিয়ে দিলেন। দেবেন্দ্রর একটি বড় রকমের জয় হলো।

পত্রিকা পরিচালনা ও ধর্মবিস্তার নিয়ে দেবেন্দ্র বেশ কয়েক বৎসর মত্ত হয়েছিলেন। অন্য কোনো দিকে মন দেবার সময় পাননি। নিজ পরিবারের লোক-জনের সঙ্গেও প্রায় যোগাযোগ শূন্য। শরীর ক্লান্ত। এইজন্য কিছুদিনের জন্য দেবেন্দ্র গেলেন নদীপথে পরিভ্রমণে। শ্রাবণ মাসের ঘোর বর্ষায় তাঁর পত্নী সারদা দেবী এবং তিন শিশু পুত্র দ্বিজেন্দ্র, সত্যেন্দ্র ও হেমেন্দ্রকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। সঙ্গে আরও রইলেন রাজনারায়ণ বসু। রাজনারায়ণ সদ্য ব্রাহ্ম হয়েছে এবং দেবেন্দ্রর বিশেষ প্রিয়পাত্র। ইংরেজি ভাষায় সুপণ্ডিত এই রকম একজন সংগীর প্রয়োজন খুব অনুভব করছিলেন দেবেন্দ্র। অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাজনারায়ণ বসু, এই দুজন যথাক্রমে বাংলা ও ইংরেজিতে দেবেন্দ্রর মতামত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করতে পারেন।

একটি প্রকাণ্ড পিনিসে পত্নী ও পুত্রদের রেখে আর একটি ছোট বোটে দেবেন্দ্র রয়েছেন রাজনারায়ণের সঙ্গে। সারাদিনে দুইজনে নানা প্রকার বিশ্রম্ভালাপ হয়, সন্ধ্যার পর রাজনারায়ণ সেই সব কথা ও সারাদিনের ঘটনা লিপিবন্ধ করে রাখেন। তারপর আহারের সময় দুজনে কিঞ্চিৎ সুরা পান করতে করতে সেগুলি নিয়ে আলোচনায় মেতে ওঠেন আবার।

পরপর কয়েকটি দিন কাটলো। নবদ্বীপ ও পাটুলি ছাড়িয়ে চলেছে নৌকাদ্বয়। তখন সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। দেবেন্দ্র রাজনারায়ণকে বললেন, এবার তোমার দিনলিপি লিখে লও বরং। রাজনারায়ণ বললো, এখনো বেলা শেষ হয়নি, এর মধ্যে আরও কত কাণ্ড কারখানা হতে পারে কে জানে!

বলতে বলতেই প্রায় দেখা গেল আকাশের পশ্চিম কোণ থেকে একখণ্ড জমাট কালো মেঘ যেন ডানা মেলে হু হু করে এগিয়ে আসছে। এখনি ঝড় উঠতে পারে ভেবে দেবেন্দ্র বললেন, ঝড়ের সময় ছোট বোটে থাকা ভালো নয়, চলো আমরা পিনিসে যাই। মাঝিরা বোটটিকে পিনিসের গায়ে লাগাবার চেষ্টা করতে লাগলো, এমন সময় এক ভয়ঙ্কর দমকা হাওয়া উঠে পিনিসের মাস্তুলের এক অংশ ভেঙে তার পাল ও দড়িদড়া সমেত জড়িয়ে বোটের ছাদের ওপর পড়লো। বাকি পালে তীরের মতন ছুটলো পিনিস এবং বোটটাকেও সঙ্গে টেনে নিয়ে দ্রুত চললো। অতবড় পিনিস অর্থাৎ বজরার টানে কাৎ হয়ে গেল ছোট বোটটি, এখুনি দড়িদড়া ছাড়াতে না পারলে ভয়ঙ্কর বিপদ। দড়িদড়া কেটে ফেলবার জন্য দা খোঁজা হতে লাগলো, কিন্তু ঐ হুড়োহুড়ির মধ্যে দা পাওয়া যায় না। একজন মাঝি লগি দিয়ে গুণ ছাড়াতে যেতেই সে লগি পড়লো দেবেন্দ্রর নাকের ওপর, দরদর ধারায় রক্ত বেরুতে লাগলো।

এই সময় বাতাস একটু থেমেই আবার প্রবলতর হলো। ভয়ার্ত মাঝিরা চিৎকার করে উঠলো, ওরে, আবার তাই রে, আবার তাই রে! বোট একদিকে সম্পূর্ণ কাৎ হয়ে গেছে, আর দু-এক মুহূর্তের মধ্যেই ডুবে যাবে। দেবেন্দ্র স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। সামনে নিশ্চিত মৃত্যুকে দেখছেন।

কোনোক্রমে একটা দা খুঁজে পেয়ে মাঝিরা কচাকচ করে কাটতে লাগলো দড়ি। শেষ দড়িটি কাটা হবার সঙ্গে সঙ্গে বোটটি পিনিসকে ছেড়ে তীরবেগে গিয়ে পাড়ের বালিয়াড়ির ওপর আছড়ে পড়লো। দেবেন্দ্র ও রাজনারায়ণ লাফিয়ে পড়লেন নীচে এবং একটুর জন্য বেঁচে গেলেন।

ইতিমধ্যে ঝড়ে ও অন্ধকারে কোনোদিকে কিছু দেখা যায় না। দেবেন্দ্রর স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে পিনিস কোন্‌দিকে ছুটে গেল বোঝার উপায় নেই। এরই মধ্যে ছোট একটি ডিঙি নৌকো এসে ভিড়লো সেখানে। নিশ্চিত বোম্বেটের নৌকো ভেবে সবাই ভয়ার্তভাবে চেঁচিয়ে উঠলো, কে ও? কে ও?

সেই নৌকো থেকে এক ব্যক্তি সত্বর লাফিয়ে পড়ে ছুটে এলো দেবেন্দ্রর দিকে। তার কণ্ঠস্বর শুনেই দেবেন্দ্র চিনতে পারলেন। সে ব্যক্তি তাঁদের বাড়ির স্বরূপ খানসামা। সে একটি জরুরী বার্তাবহ পত্র নিয়ে এসেছে।

অন্ধকারে পড়বার উপায় নেই। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই বিদ্যুতের ঝিকিমিকি আলোয় দেবেন্দ্র কোনোক্রমে খানিকটা পাঠোদ্ধার করলেন।

চিঠিতে আছে, 'ইংলণ্ড হইতে দুঃখের সংবাদ। দ্বারকানাথ আর নাই!'

দেবেন্দ্র মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলেন, রাজনারায়ণ তাঁকে জড়িয়ে ধরলো। অল্পকালের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিলেন দেবেন্দ্র। পিতৃশোকের চেয়েও তিনি অন্য বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন বেশী। অবিলম্বে কলকাতায় না ফিরলে বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে দারুণ গোলযোগ উপস্থিত হবে। তিনি অতি সম্প্রতি জেনেছেন যে, গত কয়েক বৎসরে দ্বারকানাথ বাজারে এক কোটি টাকা দেনা করেছেন, এবার পাওনাদারগণ তাঁদের পরিবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

পরদিনই সেই ঝড়-জলের মধ্যেই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দেবেন্দ্র রওনা হলেন কলকাতার দিকে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কোনোক্রমে পলতায় পেঁছে, সেখানে ডাঙায় নেমে পেয়ে গেলেন অশ্বশকট। সেই দুর্যোগের মধ্যেই গাড়ি হাঁকিয়ে রাত দুপুরে পেঁছোলেন কলকাতায়। সেদিনের সেই ঝড় যেন তাঁদের পারিবারিক বিপর্যয়ের

রূপক।

পাওনাদারেরা ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতন শ্রাদ্ধের দিন পর্যন্ত আশেপাশে ঘুরতে লাগলো। দেবেন্দ্র সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন যে অশৌচদশায় তিনি টাকাপয়সা সংক্রান্ত কোনো আলোচনাই করবেন না।

কিন্তু এর আগেই দারুণ মতান্তর দেখা গেল শ্রাদ্ধপ্রণালী নিয়ে। দেবেন্দ্রর ছোটকাকা রমানাথ ঠাকুর বললেন, দেখো, ব্রহ্ম ব্রহ্ম করে এ সময় কোনো গোলমাল তুলো না। দাদার বড় নাম।

দেবেন্দ্র বললেন, তা কি করে হয়! আমার ধর্মব্রতের বিরুদ্ধে তো কোনো কাজ আমি করতে পারি না। আমি শ্রাদ্ধ করবো উপনিষদের মতে। শালগ্রাম শিলা আমি মানি না। পাথরের নুড়িকে আমি নারায়ণ বলে পুজো করতে পারবো না।

রাজা রাধাকান্ত দেব বললেন, সে হবে না, সে হবে না। তুমি অমন করলে শ্রাদ্ধ বিধিপূর্বক হবে না। তোমার পিতার পারলৌকিক কার্য অসম্পূর্ণ থাকবে।

দেবেন্দ্র তখন তাঁর মেজ ভাই গিরীন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর মত। গিরীন্দ্র দাদার অনুবর্তী। দাদার সঙ্গে তিনিও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এখন তিনিও বললেন, আমরা যদি এমন করি, তাহলে সকলে আমাদিগকে ত্যাগ করবে, সকলে বিপক্ষে যাবে।

দেবেন্দ্র বিস্মিত, বিমূঢ় বোধ করলেন। সকলেই তাঁর মতের বিরোধী। এ দেশে ধর্ম আর সামাজিক প্রথা যেন পৃথক ব্যাপার। যারা ব্রহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছে, তারাও সামাজিক প্রথা অমান্য করতে ভয় পায়।

দেবেন্দ্র তখন নির্জনে বসে প্রশ্ন করতে লাগলেন নিজের বিবেককে। বারবার একই উত্তর পেলেন। লোকভয়, সামাজিক শিষ্টাচারের চেয়েও নিজের ধর্মবিশ্বাস অনেক বড়। এর মধ্যে তিনি একদিন স্বপ্নে দেখলেন তাঁর পরলোকগতা জননীকে। তিনি যেন জীবন্ত হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, তোকে বড় দেখবার ইচ্ছা হয়েছিল। তুই নাকি ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছিস? এর দ্বারা আমাদের কুল পবিত্র হয়েছে, তোর জননী কৃতার্থ হয়েছে। সারা শরীরে আনন্দ প্রবাহ নিয়ে জেগে উঠলেন দেবেন্দ্র।

শ্রাদ্ধের দিন বাড়ির পশ্চিম প্রাঙ্গণে মস্ত এক চালা তৈরি হয়েছে। দান-সাগরের সোনা রূপার যোড়শোপচারে ভরে গেছে সেই চালা। মাঝখানে পুরোহিত, আত্মীয় পরিজন সকলে শালগ্রাম শিলা স্থাপন করে বসে আছেন দেবেন্দ্রর অপেক্ষায়।

দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ দেবেন্দ্র পট্টবস্ত্র পরিধান করে গম্ভীরভাবে প্রবেশ করলেন সেখানে। উপনিষদের একটি শ্লোক উচ্চারণ করে সমগ্র দানসামগ্রী উৎসর্গ করে তিনি আবার পেছন ফিরলেন। আত্মীয়বন্ধুরা তাঁকে ডাকতে লাগলো যজ্ঞের আসনে এসে বসবার জন্য। দ্বারকানাথের তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র, তাঁকে বাদ দিয়ে যজ্ঞ শুরু হতে পারে না। কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না, সোজা উঠে গেলেন তিনতলায়।

একটু পরে তিনি শুনতে পেলেন তাঁর ভাই গিরীন্দ্রনাথ তাঁর হয়ে শ্রাদ্ধের মন্ত্র পাঠ করে চলেছেন।

দেবেন্দ্র মনে মনে বললেন, জ্ঞাতি বন্ধুরা আমায় ত্যাগ করে করুক, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে আরও গ্রহণ করলেন।



মানুষের জীবনে সমস্ত রাত্রিই ভোর হয় না। কোনো কোনো রাত্রি মধ্য পথে থমকে যায়। কালস্রোত নিমেষের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়ে মানুষকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে।

বাবু রামকমল সিংহ জানবাজারের গৃহে কমলাসুন্দরীর আলিঙ্গনে মধুর আলস্যে নিদ্রিত ছিলেন, হঠাৎ গেলুম রে, মলুম রে বলে বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন। তারপরই সদ্য বলি দেওয়া মুণ্ডহীন ছাগের মতন ধড়ফড় করতে লাগলেন শয্যার ওপর।

কমলাসুন্দরী জেগে উঠে কী হলো গা, কী হলো বলে অতি ভীতভাবে ধাক্কা দিতে লাগলো তাঁকে। কিন্তু রামকমল সিংহের মুখে আর কোনো কথা নেই। চক্ষু দুটি ঘূর্ণিত হচ্ছে, গ্যাঁজলা বেরুচ্ছে ঠোঁটের পাশ দিয়ে।

শব্দ শুনে ছুটে এলো দাসী-বাঁদীরা। পাশের মজলিশ ঘরে ইয়ার দোস্তরা কয়েকজন গালিচার ওপর লম্বা হয়ে আছে, তাদের নেশার ঘুম সহজে ভাঙবে না। তবলা বাজনদার ডুগিটির গলা জড়িয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে, যেন ঐ ডুগিটিই তার সোহাগিনী। এদের ডেকে তোলা গেল না। কিন্তু রামকমল সিংহের নিজস্ব ভৃত্য দুখীরাম তার বাবুর এই অবস্থা দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো।

রামকমল সিংহের অবস্থা দেখে ভয় পাবারই কথা। তাঁর বাকরোধ হয়ে গেছে, মুখখানা দারুণ যন্ত্রণায় কুঞ্চিত, মাঝে মাঝে পিঠের শিরদাঁড়া বেঁকে উঠছে ধনুকের মতন। এত বড় একজন মানী লোক, যাঁর হুকুমে পঞ্চাশ-একশোটা লোক যে-কোনো সময় মাটিতে লুটিয়ে পড়তে পারে, সেই মানুষের কী অসহায় দশা।

কমলাসুন্দরী দিশেহারা হয়ে পড়লো। বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে কিছু উপায় ঠিক করা তার ধাতে নেই। সাধারণত বারবিলাসিনীদের মায়েরাই হয় তাদের পরামর্শদাতৃ, কিন্তু কমলাসুন্দরীর মা নেই, স্বজন বলতে কেউ নেই, গত কয়েক বৎসর রামকমল সিংহ যেন তাকে দাস-দাসী, আমোদের উপকরণ আর আদর-যত্ন দিয়ে তুলোয় মুড়ে রেখেছিলেন। সামান্য অবস্থা থেকে আজ কমলাসুন্দরীকে কলকাতার মানুষ একডাকে চেনে।

কমলাসুন্দরীর দাসীরা সবাই যুবতী। রামকমল সিংহ যৌবনের পূজারী। লোলচর্ম ও পক্ককেশ তিনি চক্ষে সইতে পারেন না। এই সব দাসীরাও কোনো কোনো সময় তাঁর কৃপালাভে ধন্য হয়েছে। আগে তিনি দু-এক বৎসর অন্তর রক্ষিতা পরিবর্তন করতেন, কিন্তু এই কমলাসুন্দরী তাঁকে বড় মায়ার বন্ধনে বেঁধেছে। মাঝে মাঝে তিনি বলতেন, যখন সগ্যে যাবো, তখন তোকেও যে আমার সঙ্গে যেতে হবে রে, কমলা! তিনি নিশ্চিত ছিলেন তিনি স্বর্গেই যাবেন। হায়, সেই মানুষের আজ কী দশা!

কমলাসুন্দরীর এক দাসীর নাম আতরবালা। সে বেশ বুদ্ধি ধরে। দিলদরিয়া রামকমলের কাছ থেকে প্রায়ই টাকাটা সিকেটা বাগিয়ে নিয়ে সে ইতিমধ্যেই একটি মাঠকোঠা বাড়ি কিনে নিজে আলাদা কারবার শুরু করার ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে ফেলেছে। সেই আতরবালা দুখীরামকে বললো, আরে মিনসে, এখন কী কাঁদবার

সময়। মান খোয়ালি রে, মান খোয়ালি! কতায় বলে, মরণের চেয়ে মান বড়। এত বড় মানুষটার এখানে যদি কিছু হয়, তবে আর ওঁয়ার মাগ-পুতের মান থাকবে? গাড়ি যুততে বল, বাবুকে চটজলদি বাড়ি নিয়ে যা।

একথা শুনে কমলাসুন্দরী সন্ত্রস্ত হলো। রামকমল সিংহ কি সত্যিই মরতে বসেছেন নাকি? বাবু টাকা-পয়সার ব্যবস্থা তো কিছুই করে যাননি, তিনি মলে তার নিজের কী উপায় হবে? সে অসহায় স্ত্রীলোক, সবাই যদি তাকে তখন ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়? বাবু মুখে অনেকবার বলেছেন বটে যে জানবাজারের এই বাড়ি কমলাসুন্দরীর নামেই কেনা, কিন্তু তার কাগজপত্র কোথায়?

দুখীরাম গাড়ির ব্যবস্থা করতে যাচ্ছিল, কমলাসুন্দরী তাকে বললো, ডাঁড়া ডাঁড়া! ওরে আমার সব্বোনাশ হচ্চে, আমায় একটু চিন্তা করতে দে। বাবুর এখন তখন অবস্থা, গাড়িতে যেতে যেতেই মলে আমি দোষের ভাগী হবো না?

আতরবালা বললো, তবে কি বাবু রাঁড়ের বাড়ি মরবে, সেটা ভালো হবে? দেশশুদ্ধু লোক জানবে যে...

এমন সময় তবলা-বাজনদারটি ঢুলু ঢুলু চক্ষে উঠে এসে বিরক্তভাবে বললো, কী হয়েচে, অ্যাঁ, এত গোলমাল কিসের?

তারপর রামকমল সিংহের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সে সচমকে বললো, আরে, বাবুর এ কী অবস্থা? বাবু যে ধুঁকচেন। এখুনো কোবরেজ ডাকিসনি? মেয়েছেলের বুদ্ধি!

সে নিজেই কবিরাজ ডাকার উদ্যোগ করতে গিয়ে চৌকাঠে পা বেঁধে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। আর উঠলো না।

এ পল্লীতে বিখ্যাত ধনী রাজচন্দ্র মাড়ের সুবৃহৎ প্রাসাদ রয়েছে। রাজচন্দ্র গত হবার পর তাঁর পত্নী রাসমণিই এখন জমিদারী চালান। শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীলোক হলেও তাঁকে অনেকে ইদানীং রানী বলতে শুরু করেছে। সেই রানী রাসমণির প্রাসাদে সম্প্রতি কোনো পল্লীগ্রাম থেকে একজন কবিরাজ এসে রয়েছেন। তিনি নাকি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। দাসী-বাঁদীরাও শুনেছে তাঁর কথা।

কমলাসুন্দরী দাসীদের উদ্দেশে বললো, যা, শিগগির সেই কোবরেজ মশাইকে ডেকে নিয়ে আয়। যেমন করে পারিস নিয়ে আসবি। এত রেতে যদি তিনি না আসতে চান, তেনার পায়ে ধরবি, পায়ের বুড়ো আঙুল মুখে পুরে চুষবি।

দাসীরা গেল কবিরাজকে ডাকতে। দুখীরামও আর দেরী করলো না। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছুটলো। একটা জিনিস সে বুঝেছে, এখন যে-উপায়ে হোক বিধুশেখরকে সংবাদ দেওয়া দরকার। এ রকম সংকটে বিধুশেখরই সব কিছু সুষ্ঠুভাবে চালনা করতে পারেন।

রাত-বিরেতে কলকাতায় পথঘাটে একা চলা দায়। ঠ্যাঙাড়ে-বোম্বেটেদের হাতে পড়লে তো কথাই নেই, পাহারাওয়ালা সেপাইদের নজরে পড়লেও ভোগান্তি কম নয়। দুখীরাম নিশাচর প্রাণীর মতন অন্ধকার দেখে দেখে দৌড়োতে লাগলো প্রাণপণে। তার অতি বাল্যকাল থেকে সে নিযুক্ত আছে রামকমল সিংহের সেবায়, বাবুর মতন এমন ক্ষমতাশালী অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারীও যে সাধারণ মানুষের মতন হঠাৎ মরে যেতে পারে, এ কথা তার মাথাতেই ঢুকছে না।

এক সময় সে বিধুশেখরের বাড়ির সামনে পেঁৗছেও গেল। এত রাত্রে বিধুশেখরের কাছে কোনো সংবাদ পেঁৗছোনোও সহজ কথা নয়। কিন্তু দুখীরাম

প্রবল হল্লা তুলে দিল। বিধুশেখরের নেশাভাঙ করার অভ্যেস থাকলে হয়তো এই মধ্যরাত্রে তাঁর ঘুম ভাঙানো কঠিনই হতো, কিন্তু তাঁর সে সব দোষ নেই এবং পাতলা ঘুম, তিনি জেগে উঠলেন। নীচে নেমে এসে সব বৃত্তান্ত শুনে তিনি কয়েক পলক মাত্র স্থির হয়ে চিন্তা করলেন, একটুও বিচলিত দেখালো না তাঁকে। সুগম্ভীর কণ্ঠে দারবানদের বললেন, সহিসলোককো উঠাও! আস্তাবলকা দরওয়াজা খুলো!

অতি দ্রুত তৈরি হয়ে নিয়ে বিধুশেখর উঠে বসলেন তাঁর চার ঘোড়ার গাড়িতে। এ গাড়ি তাঁকে অত্যল্পকালের মধ্যে পৌঁছে দেবে জানবাজার। শুধু চিৎপুরের রাস্তায় গাড়ি বাঁক নেবার মুখে তিনি শুধু একবার বললেন, রোখো। অদূরের সিংহবাড়ির দিকে তাকিয়ে তিনি একটুক্ষণ চিন্তা করলেন, বিম্ববতী কিংবা গঙ্গানারায়ণকে এখনই খবর দেবেন কি না। তারপরে সিধান্ত নিয়ে বললেন, না, চলো।

রাসমণির বাড়ির কবিরাজটি অতি সদাশয়। বিপদের ডাক তিনি উপেক্ষা করেন না। এত রাতেও তিনি এসেছেন। মানুষটি পৌঁছেছেন বার্ধক্যের শেষ সীমায়। তাঁকে দেখলে মনে হয় তিনি নিজেই মারা যাবেন যে-কোনো মুহূর্তে।

বিধুশেখর জানবাজারের গৃহে পৌঁছে দেখলেন সেই অতি বৃদ্ধ কবিরাজ বসে আছেন রামকমল সিংহের শয্যার পাশে, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তিনি রোগীর নাড়ি দেখতে পারছেন না, এমনই ছটফট করছে রোগী, তার হাত ধরতে গেলেও ঝট্‌কা মেরে সরিয়ে দিচ্ছে। কবিরাজ মহাশয় কয়েকজন দাসদাসীকে বলেছিলেন রোগীকে ধরে থাকতে। তারাও চেষ্টা করে পারেনি। অবশ্য তারাও ধরেছে বড়ই নরমভাবে। এই অবস্থাতেও প্রভুর ওপর বলপ্রয়োগ করতে তারা সাহস পায় না। বিধুশেখর এসেই কড়া গলায় হুকুম দিলেন, দুখী, পা দুটো চেপে ধর। আমি নিজে ওর হাত ধচ্চি।

রেড়ির তেলের একটি মাত্র প্রদীপ জ্বলছে ঘরে, তাতে অতি সামান্য আলো আর প্রায় ঘরজোড়া ছায়া, বিধুশেখর দাসদাসীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কেউ একজন একটা মশাল জ্বালো।

কমলাসুন্দরী আড়ষ্টভাবে তাকিয়ে রইলো বিধুশেখরের দিকে। এই প্রথম দেখা। এই মানুষটি সম্পর্কে এত বছর ধরে অনেক কিছু শুনেছে সে, কিন্তু আগে কখনো চাক্ষুষ দেখেনি। এই মানুষটিই সিংহ পরিবারের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এর পর থেকে কমলাসুন্দরীরও ভাগ্য নির্ভর করবে এঁর হাতে? বিধুশেখর কিন্তু একবারও দৃষ্টি নিক্ষেপ কলেন না কমলাসুন্দরীর দিকে। এই অপবিত্র গৃহে তাঁকে আসতে হয়েছে বলে তাঁর ওষ্ঠ ভঙ্গিমায় ঘৃণা ও বিরক্তি মাখানো।

কবিরাজ কিছুক্ষণ নাড়ি ধরে রেখে মাথা নাড়তে লাগলেন। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, আয়ু নাই, আয়ু নাই, ইঁহার দিন ফুরোয়ে গেচে।

কমলাসুন্দরী তাঁর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললো, আপনি ধন্বন্তরি। আপনি বাঁচিয়ে দিন গো! যত টাকা লাগে, আমার গয়নাগাটি যা আচে সব দোবো গো...

কবিরাজ পা সরিয়ে নিয়ে বললেন, আমার সাধ্য নাই, আমি রোগের চিকিৎসা কত্তে পারি কিন্তু মৃত্যুকে ঠেকাতে পারি না।

বিধুশেখর বললেন, মহাশয়, ইহাকে কি এখন স্বগৃহে লয়ে যেতে পারি? গাড়ির ধকল কি এর সইবে?

কবিরাজ দু-দিকে মাথা নাড়লেন।

বিধুশেখর আবার প্রশ্ন করলেন, ইহার যন্ত্রণা উপশমের কি কোনো নিদান নাই?

কবিরাজ বললেন, এই রোগের নাম ধনুষ্টঙ্কার। স্বয়ং যমও এই ব্যাধিকে ভয় পায়। যমদূতরা কাছে আসতে দ্বিধা করে, সেইজন্যই এই রোগের যন্ত্রণা দীর্ঘস্থায়ী হয়। এ বড় দুষ্ট ব্যাধি।

তখন নিরাশ হয়ে বিধুশেখর বললেন, ইহার কি আর চেতনাও ফিরবে না? দুটো কথাও কইতে পারবে না?

এবার সবাইকে চমকিত করে কবিরাজ বললেন, হ্যাঁ, চেতনা ফিরায়ে দিতে পারি। সে এমন কিছু শক্ত নয়। সূচিকাভরণ দিলে চেতনা হবে, তারপর সব কিছুই ঈশ্বরের ইচ্ছা।

কবিরাজ যেন সত্যিই ধন্বন্তরি। কোন্ তীব্র বিষ তিনি রামকমল সিংহের ওষ্ঠে ছোঁয়ালেন কে জানে। কিয়ৎকালের মধ্যেই তাঁর হাতপায়ের খিঁচুনি কমে গেল। তিনি চোখ মেলে তাকালেন।

কবিরাজ দুর্গা শ্রীহরি দুর্গা শ্রীহরি বলে কপালে হাত ঠেকিয়ে তাঁর ইষ্ট দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, কেউ একটু আলোটা দেখা তো বাবা, আমি যাই, আমার কিছু করবার নেই এখেনে।

কয়েক মুহূর্ত পরেই রামকমল সিংহের মুখে কথা ফুটলো। তিনি বললেন, কে, বিধু?

কবিরাজ বলেছিলেন, ব্যথা কমবে না। কিন্তু রামকমল সিংহের মুখে রোগ-যন্ত্রণার কোনো চিহ্নই নেই। কণ্ঠস্বরও স্বাভাবিক। যেন কোনো অলৌকিক উপায়ে রামকমল সিংহ হঠাৎ বিপন্মুক্ত হয়ে গেছেন।

কমলাসুন্দরী পাশে বসে ফোঁস ফোঁস করে কাঁদছে, বিধুশেখর রয়েছেন বলে সে সাহস করে রামকমল সিংহের সঙ্গে কথা বলতে পারছে না। রামকমল তার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে বললেন, ভয় নেই কমলা। বিধু, কমলা রইলো, দেখিস যেন ও কোনো কষ্ট না পায়।

বিধুশেখর বললেন, তোকে আমি গৃহে ফিরায়ে নিয়ে যেতে এসেচি। বিম্ববতীকে, তোর পুত্রদের দেখতে ইচ্ছে করে না?

রামকমল সিংহের দু চোখের পাশ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। তিনি প্রশ্ন করলেন, আজ কি তিথি?

বিধুশেখর বললেন, একাদশী।

রামকমল এই অবস্থার মধ্যেই ক্ষীণ হেসে বললেন, ঠিক। কাশীর সেই জ্যোতিষী কী বলেচেন তোর মনে নাই? একাদশীতেই আমি যাবো।

বিধুশেখর বললেন, আরও অনেক একাদশী আসবে, এত ত্বরা কিসের?

রামকমল বললেন, তোর সঙ্গে দু চারিটি কথা আচে, যদি আর সময় না পাই...।

বিধুশেখর গলা চড়িয়ে সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, এই, তোমরা সবাই বাইরে যাও। বাইরে যাও। দরজা বন্ধ করে দোবো।

কমলাসুন্দরী তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, বিধুশেখর পরোক্ষে বললেন, দুখী, এনাকেও একটু বাইরে যেতে বল।

কমলাসুন্দরী এবার মুখ তুলে বললো, না, আমি থাকবো। আমি কোতাও যাবো না।

সরাসরি এই প্রথম বিধুশেখর তাকালেন কমলাসুন্দরীর দিকে। রাগে তাঁর

গাত্র জ্বলে গেল। কালো রঙের এই সামান্য স্ত্রীলোকটি কুহক জাল বিস্তার করে বেঁধে রেখেছে রামকমলকে। এর রূপেরই বা কী এমন চাকচিক্য? এ তো বিম্ববতীর পায়ের এক কণা নোখের যোগ্য নয়। বিম্ববতীকে ছেড়ে কোনো বুদ্ধিভাগ্যসম্পন্ন মানুষ এমন এক কুলটা মেয়েতে যে কী ভাবে মজে থাকতে পারে, তা বিধুশেখর কিছুতেই বুঝতে পারছেন না।

তীব্রভাবে কমলাসুন্দরীর চোখে চোখ রেখে বিধুশেখর আদেশ দিলেন, আমাদের কিছু গূঢ় কথা আছে, তুই এখন বাইরে যা!

সে আদেশ অগ্রাহ্য করার সাহস কমলাসুন্দরীর নেই। প্রায় কাঁপতে কাঁপতে উঠে চলে গেল ঘরের বাইরে।

তখন বন্ধুর কপালে হস্ত রেখে বিধুশেখর বললেন, ভাই, চিন্তা করিস না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

রামকমল বললেন, জানতুম, মৃত্যু আমার কাচে যে কোনোদিন আসবে, আমার তৈরি থাকার কথা ছিল...কিন্তু পারিনি। যেতে ইচ্ছে করে না...বড় বাঁচতে ইচ্ছে করে।

—তুই এখন কেমন বোধ করচিস? বেদনা আর আচে কী? এযাত্রা ভালো হয়ে গেলি মনে হয়।

—না, বিধু, আর সময় নেই। শরীরে অসহ্য বেদনা। কিন্তু আমি হাত পা নাড়তে পারছিনি। আর সময় পাবো না...তোর সঙ্গে একটা কতা...

—বিষয়-সম্পত্তি সব উইল করা আচে, নতুন কিছু ইচ্ছে যদি তোর থাকে!

—বিষয় নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না...তুই রইলি...জানি...সব ঠিক থাকবে... শুধু একটা কতা...সে কতা না জানলে মলেও আমার শান্তি হবে না...এতকাল সেই কতা ভেবেই ছটফট করিচি।

—রামকমল, তোকে আমি বাড়িতে নিয়ে যাবো...এ পাপের জায়গা...বুকে সাহস আন...বাড়িতে গিয়ে বিম্ববতীর কোলে মাথা রেখে শুবি...সে সতী সাধ্বী।

—বিধু, আমার ছেলে...নবীন...সে আমার বড় আদরের, সে কি আমার? সে কার সন্তান?

বিধুশেখরের বুকে যেন বজ্রপাত হলো। মুখমণ্ডল হলো বিবর্ণ, রক্তশূন্য। মৃত্যুপথযাত্রীর মুখে এ কী কথা তিনি শুনলেন? তিনি সহসা কোনো উত্তর দিতে পারলেন না।

রামকমল সিংহ বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে নিতে বললেন, আমার মুখে আগুন দেবে...কে...গঙ্গা না নবীন, ওরা কেউ আমার রক্তের নয়?

বিধুশেখর মুখটা ঝুঁকিয়ে এনে বললেন, কী বলচিস তুই রামকমল? নবীন তোর নিজের সন্তান...বিম্ববতী তোর সংসারের লক্ষ্মী, তোর ছেলে বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে এয়েচে।

—সে কি আমার, সত্যি করে বল্?

—আমার কেন হবে? ছি, ছি, ছি, এমন কথা...নবীন তোর ঔরস জাত সন্তান...

—বিধু, আমার বুকে বড় জ্বালা...এতখানি বয়েসে...ভোমর যেমন ফুলে ফুলে ...তেমনি আমি কত নারীতে উপগত হয়িচি, সবই নিষ্ফল? কেউ আমায় একটিও সন্তান দেয়নি, তাই আমি ভেবেচি, আমার ও ক্ষমতা নেই, বিম্ব আমাকে...

—তোর কোনো পাপের সন্তান হয়নি, সে তো ভালোই, তাতে বিষয় সম্পত্তি ছারেখারে যেত...বিম্ববতী অনেক পুণ্য করেচে, ভগবানের কৃপায় সে তোর বংশ

ধন্য করতে অমন হীরের টুকরো ছেলে দিয়েচে...

—ও ছেলে আমার? তোর নয়?

—রামকমল, আমি তাঁবা, তুলসী, গঙ্গাজল ছুঁয়ে শপথ করে বলতে পারি... তুই একি পাগলের মতন কথা বলচিস!

—তুই শপথ করতে পারবি?

—হ্যাঁ...এক্ষুণি আমি আনাচ্চি সব।

—তুই আমার মাথা ছুঁয়ে বল।

—এই যে বললুম, নবীন তোর সন্তান...তোর রক্ত তার শরীরে বইচে, আমি বিম্ববতীকে কোনোদিন মন্দভাবে স্পর্শ করিনি।

—আঃ! শান্তি, শান্তি...আমার বুকে বল এলো...বিধু, নবীনকে একবার দেকতে বড় সাধ হয়...একবার বিম্বকে...আমি কৃতঘ্ন...তার কাচ থেকে দূরে দূরে রয়িচি এতদিন...

—আমি এখুনি তোকে বাড়ি নিয়ে যাচ্চি।

কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই রামকমল সিংহের গলা দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ উঠলো, হাত পায়ের খিঁচুনি শুরু হলো আবার। বোধহয় সূচিকাভরণের শক্তিও নিঃশেষিত হয়ে গেল। বিধুশেখর তাঁর কপাল ছুঁয়ে থেকে তারা ব্রহ্মময়ী, তারা ব্রহ্মময়ী, নাম জপ করতে লাগলেন। এই সময় বন্ধুর মুখে ফোঁটা ফোঁটা গঙ্গাজল দিতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু এই অবিদ্যার বাড়িতে গঙ্গাজলই বা পাওয়া যাবে কী করে?

শেষবারের মতন মুখ ঘুরিয়ে বিধুশেখরের হাতের ওপর মুখ রেখেই শেষ নিশ্বাস ফেললেন রামকমল সিংহ।

বিধুশেখর চিৎকার করে বললেন, দুখীরাম দরজা খুলে দে। অমনি হুড়-মুড়িয়ে ঢুকে এলো সকলে। কমলাসুন্দরী এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো মৃত রামকমল সিংহের বুকে। অন্য দাস-দাসীরাও এসে তাঁর পায়ে মাথা ঠুকতে লাগলো। ক্রন্দন চিৎকারে ভারী হয়ে গেল বাতাস।

বিধুশেখর চাইলেন, বিলম্ব না করে তখুনি রামকমল সিংহের মরদেহ সেখান থেকে সরিয়ে ফেলবেন। তাঁর বন্ধুর এই ঘৃণিত স্থানে মৃত্যু ঘটনার সংবাদ যেন কাকপক্ষীতেও না জানতে পারে। কিন্তু তা সম্ভব হলো না। স্ত্রীলোকদের কাছ থেকে মৃতদেহ সরিয়ে নেওয়াই শক্ত। তাছাড়া কী করে যেন বাতাসের কানে কানে রটে যায় খবর। ভোরের আলো সবে মাত্র ফুটি ফুটি, এখনো অন্ধকার যায়নি, এরই মধ্যে বেশ একটা ভিড় জমে গেছে বাড়ির সামনে। সেই ভিড়ের মধ্যেই সকলের মাথা ছাড়িয়ে দেখা গেল রাইমোহন ঘোষালের লম্বা, সিড়িঙ্গে চেহারা। লোকজন ঠেলতে ঠেলতে সে হাউ হাউ করে কাঁদছে আর বলছে, ওরে সর সর, কত্তাবাবুকে একবার শেষ দেখা দেকেনি। মহাদেবতুল্য লোক ছিলেন আমাদের কত্তাবাবু...আহা কত বড় দরাজ দিল।

রাইমোহনকে দেখে তবু খানিকটা আশ্বস্ত হলেন বিধুশেখর। তিনি জানেন রাইমোহন অতিশয় চতুর ও চটপটে, যে-কোনো হুকুম তামিল করার শক্তি রাখে সে। তিনি বললেন, ওহে রাইমোহন, এই স্ত্রীলোকদের এখন সরে যেতে বলো, আগে রামকমলকে তার বাড়ি নিয়ে যেতে হবে। সেখানে শান্তি স্বস্ত্যয়ন যা করবার...

তৎক্ষণাৎ কৃত্রিম কান্না থামিয়ে তৎপর হয়ে উঠলো রাইমোহন। শোকের বাড়ি তার খুব পছন্দ। শোকের বাড়িতে সব কিছুই অগোছালো থাকে, লোকের চক্ষু

থাকে ঝাপসা। সে অমনি মেয়েদের দঙ্গলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু-হাতে ঠেলতে লাগলো তাদের। আর চিৎকার করতে লাগলো, সবাই সরো সরো, বড় কত্তামশাই রাগ কচ্চেন, সরো, জানো না এখন মড়া ছুঁতে নেই!

এই সুযোগে সে কমলাসুন্দরীর গলা থেকে একটা আলগা স্বর্ণহারও হাতিয়ে ফেললো সুকৌশলে। এবং তারপরও তীক্ষ্ণ লোভমাখা চোখ ফেরাতে লাগলো এদিক ওদিক। এতবড় একজন মানুষ মারা গেলেন সেই উপলক্ষে তার দু-দশটাকা রোজগার হবে না একী একটা কথা হলো! রামকমল সিংহের মৃতদেহ সে একাই পাঁজাকোলা করে তুললো গাড়িতে এবং তারই মধ্যে রামকমল সিংহের দু আঙুলের দুটি মূল্যবান আংটি চলে গেল রাইমোহনের জেবের গহ্বরে।

এরপর রামকমল সিংহের মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে যাত্রা এবং পরে তাঁর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সমারোহ একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে গেল সব কিছুর। লোকের মুখে মুখে কথাই রটে গেল যে, হ্যাঁ, সেই পোস্তার রাজা সুখময় রায়ের বাড়িতে দুর্গোৎসব হয়েছিল আর এই রামকমল সিংগীর ছেরাদ্দ, এমনটি আর দেখা যায়নি। কাগজ-ওয়ালারা চুটিয়ে লিখলে, ইংরেজি কাগজগুলোতেও ছাপা হলো রামকমল সিংহের গুণপণার বৃত্তান্ত। ল্যান্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশান বিশেষ সভা ডেকে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করলে।

তারপর সবকিছু চুকে যাবার পর জোড়াসাঁকোর সিংহ বাড়ি উৎকটরূপে স্তব্ধ হয়ে গেল একসময়। রামকমল সিংহ যখন বেঁচে ছিলেন, তখন তাঁর উপস্থিতি বিশেষ টের পাওয়া যেত না এ বাড়িতে। ইদানীং তিনি তো প্রায় বাড়িতে থাকতেনই না। কিন্তু এখন তিনি গত হয়েছেন শুধু এই সংবাদটির জন্যই যেন বাড়িটি খাঁ খাঁ করে।

ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর মৃত্যুতে বিধুশেখর যে কতখানি আঘাত পেয়েছেন, তা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। কেউ তাঁর চোখে জল দেখেনি, কারুর সামনে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েননি। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে বিরাট যজ্ঞ এবং প্রায় গোটা শহরটিকেই খাওয়ানো দাওয়ানোর সব কিছু দেখাশুনো করেছেন তিনি নিজে। এতখানি ধকল অবশ্য তাঁর সহ্য হয়নি। একেবারে শেষের দিকে তিনি নিজেই খানিকটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

আবার সামলে উঠে তিনি এলেন একদিন সিংহ বাড়িতে। কারুকে তিনি ডাকলেন না, খবর পাঠালেন না, তিনি নিজেই উঠে এলেন দ্বিতলে। লম্বা টানা বারান্দা ধরে তিনি হাঁটতে লাগলেন। সেখান দিয়ে যেতে যেতে তিনি দেখতে পেলেন সিঁড়ির ওপর নবীনকুমার খেলা করছে দুলালচন্দ্রের সঙ্গে। নবীন-কুমারের দিকে তিনি একবার সস্নেহ দৃষ্টিপাত করলেন শুধু, কোনো কথা বললেন না।

বারান্দাটা ডান দিকে ঘুরে গিয়ে শেষ প্রান্তে বিম্ববতীর নিজস্ব কক্ষ। সেখানে এসে দ্বারের সামনে দাঁড়ালেন বিধুশেখর। তারপর অনুচ্চ স্বরে তিনি ডাকলেন, বিম্ব, বিম্ববতী!

দ্বার খুলে গেল, ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো চিন্তামণি দাসী। বিধুশেখর কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন। বড়বাবুকে দেখে চিন্তামণি সলজ্জভাবে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে চলে গেল বাইরে। বিধুশেখর এসে ঢুকলেন ঘরের মধ্যে।

পালঙ্কের ওপর বসে আছেন বিম্ববতী। নতুন বৈধব্যবেশে বিম্ববতীর

রূপ এমনই বদলে গেছে যে বিধুশেখর সাংঘাতিক চমকিত হলেন। কোমর ছাড়ানো বিশাল কালো চুলের গোছা ছিল বিম্ববতীর, তার চিহ্নমাত্র নেই। বিম্ববতী মস্তক মুণ্ডন করেছেন। যে দু হাত ভর্তি স্বর্ণালঙ্কার ও শাঁখা ছিল, সেই হাত দুটি এখন নিরাভরণ। যে সোনার অঙ্গ সজ্জিত থাকতো একসময় বালুচরী বা মসলিনে, এখন সেই অঙ্গ ঢেকে আছে একটি ফরাসডাঙ্গার সাদা থানে। পূর্ণ-যৌবনা বিম্ববতী যেন ধরেছেন যোগিনীর রূপ।

পালঙ্ক থেকে নেমে দাঁড়িয়ে বিম্ববতী বললেন, আমি অভাগিনী, আমার নাবালক সন্তান...আমায় আর দেকবার কেউ নেই...।

বিধুশেখর এক পা অগ্রসর হয়ে বললেন, তোমার এই বেশ আমি সহ্য করতে পারবো না ভেবে আমি কয়েকটা দিন আসিনি। কিন্তু তুমি তো জানো, যতদিন আমি রয়িচি, তোমার কোনো চিন্তা নেই।

বিম্ববতী বললেন, আপনার শরীর অসুস্থ হয়েছিল?

বিধুশেখর বললেন, সে অমন কিচু না...বিম্ব, তোমার মন শক্ত করতে হবে, তোমায় সংসারের হাল ধরতে হবে...আমি যতদিন আচি, ততদিন অবশ্য...

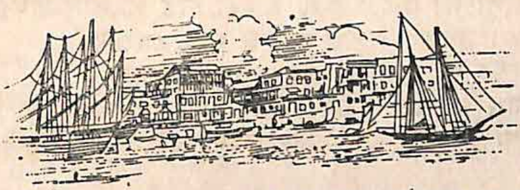
বিম্ববতী একটু এগিয়ে এসে বললেন, আমার ছেলে...সে যে আমার আঁধার ঘরের মানিক, সে যে আমার জীবনসব্বস্ব, যদি কেউ কোনোদিন তার নামে...

বিধুশেখর দৃঢ় স্বরে বললেন, জগতে কেউ কোনোদিন জানবে না, তোমার স্বামী শান্তিতে মরেচে, সে আমায় বিশ্বাস করে গ্যাচে, এখন তুমি শুধু শক্ত হয়ে থাকো...

বিম্ববতীর অধরোষ্ঠ কেঁপে উঠলো, শরীরে যেন লাগলো ঝড়ের বাতাস। তিনি মূর্ছিতার মতন এসে পড়লেন বিধুশেখরের পায়ের কাছে। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমি পারবো না...আমি পারবো না...আমি দুর্বল...।

বিধুশেখর বললেন, পারবে, নিশ্চয়ই পারবে। আমি তো রয়িচিই, তোমার পাশে আমি সর্বক্ষণ আচি...তুমি যে আমার চক্ষের মণি...

বিম্ববতীকে তুলে বক্ষে জড়িয়ে ধরে বিধুশেখর তাঁর পিঠের ওপর হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।



গুপী স্যাকরার বরাত ফিরেছে। রাইমোহনের দৌলতে দু-চারটি বড় বড় মানুষের বাড়ির কাজ ধরবার ফলে বিশেষ সমৃদ্ধি ঘটেছে তার। আর সে আগেকার মতন সন্ধেবেলা দুগ্গাপিদিম জ্বালিয়ে একা একা হাপর চালায় না, এখন তার দোকানে পাঁচ ছ'জন কর্মচারী খাটাখাটনি করে, সে নিজে উঁচু জাজিমের ওপর বসে আরামে গড়গড়া টানে। ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে মেদ বৃদ্ধিও হয়ে চলেছে সমান তালে, মুখমণ্ডলেও দেখা দিয়েছে বেশ একটা তেল চুপচুপে ভাব। সমাজে মান বাড়াবার জন্য গুপীও এখন রামবাগানে একটি পশ্চিমা মেয়ে-মানুষ রেখেছে।

অনেকদিন পর রাইমোহন এলো তার দোকানে। দীর্ঘকায় রাইমোহনের এখন আর ছাতে মাথা ঠুকে যাবার ভয় নেই, কারণ গুপী তার পুরোনো দোকানঘর

ভেঙে নতুন পাকা বাড়ি বানিয়েছে, দেয়ালজোড়া বেলজিয়ান আর্শি, সামনে লোহার গেট। রাইমোহন সাধারণত আসে দোকান বন্ধ হবার মুখটায় যখন আর খদ্দেরপাতি থাকে না। আজও গুপী স্যাকরা যখন তার কর্মচারীদের বিদায় করছে সেই সময় সে এসে উপস্থিত হলো।

গুপী তাকে খাতির দেখাবার জন্য দাঁড়িয়ে উঠে হৈ হৈ করে বললো, আসুন, আসুন, ঘোষালমশাই, আসতে আজ্ঞা হোক, বসতে আজ্ঞা হোক। ওরে পান নিয়ায়, গড়গড়া নিয়ায়। ঘোষালমশাইয়ের জুতো জোড়া ওপাশে রেকে দে।

রাইমোহন জাজিমের ওপর বাবু হয়ে বসে একটি বেশ বড় রকমের উদ্গার তুলে বললো, এক ঘটি জল খাওয়া তো বাপ। ঘি খেতে খেতে বায়ু রোগ ধরে গ্যাল!

গুপীর আদেশে এক ছোকরা কর্মচারী এক কাঁসার ঘটি ভর্তি জল নিয়ে এলো, আলগোছে রাইমোহন তার জলটুকু শেষ করে ফেলে আর একটি উদ্গার তুলে তৃপ্তির সঙ্গে বললো, আঃ!

গুপী জিজ্ঞেস করলো, কোতায় এত ঘি খেলেন, ঘোষালমশাই?

রাইমোহন বললো, আর বলিস কেন? এক একজন বড় মানুষ মরে, আর তাদের শ্রাদ্ধ খেতে খেতে আমাদের পেটের ব্যামো ধরে যায়।

গুপী বললো, আপনারও আহারে অরুচি? এ যে দেখছি অগ্নিরও অগ্নিমান্দ্য!

—বয়েস হলো রে গুপী, আর তেমন খাওয়ার ঢক নেই।

—তা কার ছেরাদ্দে এত খেলেন?

—কেন, রামকমল সিংগীর ছেরাদ্দে তোর নেমন্তন্ন হয়নি?

—হ্যাঁ তা তো হয়েচে। আমি ভাবলুম বুঝি আবার কেউ মারা গেল।

—রামকমল সিংগী মারা যাওয়ায় মনে বড় দাগা পেয়িচি রে। বড় দিলদার মানুষ ছেল, এমনটি আর হবে না।

—আহা হা, সে কতা আর বলতে! মহাদেব তুল্য লোক, কোনোদিন দর কষাকষি করেননি, ভালো মালের কদর বুঝতেন, যেন একটা নক্ষত্র খসে গেল!

—তা যা বলিচিস! কারুর কাচে কখনো হাত পাতেনি রামকমল সিংগী, সব সময় উপুড়হস্ত। তাতেও অগাধ সম্পত্তি রেখে গ্যাচেন।

—আর দেশের কী হালচাল বলুন, ঘোষালমশাই!

—বড় খারাপ রে, বড় খারাপ! মানী মানী লোকেরা চলে যাচ্চে, এখন যত চ্যাংড়াদের উৎপাত, জাত ধম্মো আর কিছু রইলো না, দেশটা রসাতলে যাবে এবার।

—আমাদের মহল্লাতেও এক কালেজী ছোকরা গত পরশু কেরেস্তান হয়েচে। এভাবে যদি ভদ্রঘরের ছেলেরা কেরেস্তান হয়ে যায়—

—আরে কেরেস্তান হবে, সেটা আশ্চর্যি কিচু নয়। হাজার হোক রাজার জাত, যদি জোর করে নিজের পাতে ঝোল টানে, তাতে করার কিচু নেই। কিন্তু হিঁদুরাই যে হিঁদুদের ইয়েতে হুড়কো দিচ্চে। পিরিলি বামুনরাই দেশটার সব্বোনাশ করে দিলে। দ্বারকানাথ ঠাকুর বিদেশে বেঘোরে মলো, শুনলুম নাকি তেনার শবদাহ পর্যন্ত হয়নি, বিলেতে মাটির নীচে পুঁতে রেখেচে, তার ওপর দিয়ে ম্লেচ্ছ সাহেবরা হেঁটে চলে বেড়াচ্চে। ভাব একবার কাণ্ডটা, অত বড় মানী লোক, মরার পর ছেলের হাতে মুখে আগুনটা পর্যন্ত পেলে না। দেবেন ঠাকুর তো বাপের শ্রাদ্ধটাও করলে না।

—ছি ছি ছি ছি ছি ছি।

—তারপর দেবেন ঠাকুর এখন চ্যালাচামুণ্ডো নিয়ে চারদিকে হামলে বেড়াচ্চে, বলচে আমাদের ঠাকুর দেবতা কিচু নেই, বেদ নাকি চাঁড়ালেও শুনতে পারে!

—ছি ছি ছি ছি ছি ছি।

—বামুন-কায়েত-সুদ্দুর গা ঘেঁষাঘেঁষি করে পংক্তি ভোজনে বসে।

—ছি ছি ছি ছি ছি ছি।

—আজই দুকুরে কী দেকে এলুম জানিস? পটলড্যাঙ্গার মোড়ে একটা ছোঁড়া, কালেজে পড়া ছোঁড়াই মনে হলো, সে বিস্কুট খাচ্চে!

—বিস্কুট কী?

—বিস্কুট জানিস না? ঐ যে একরকম আটা-ময়দা গোলা শুকিয়ে গোল গোল চাক্তি বানায়। মোছলমান আর ফিরিঙ্গিদের দোকানে বিক্‌কিরি হয়।

—দেকিনি কখনো!

—সাহেবের সিক্‌নি না মেশালে সে জিনিসের তার হয় না। মোছলমান কারিগররা রোজ দু বেলা সাহেবপাড়ায় গিয়ে মদ্দা-মাগীদের সিক্‌নি নিয়ে আসে ডালায় করে। তারপর তা আটা-ময়দা গোলার সঙ্গে মেশায়, আরও প্যাঁজ রসুন কত কী মেশায় কে জানে, তার ওপর মোছলমানরা দাঁড়িয়ে পা দিয়ে ডলে খুব করে, তারপর তৈরি হয় বিস্কুট। সেই জিনিস হিঁদু ছেলেরা খাচ্চে! আজ দেকলুম, তিনটে ছোঁড়া এ ওকে ঠ্যালাঠেলি কচ্চে, এই তুই বিস্কুট খেতে পারবি? এক টাকা বাজি! অমনি একটা ছোঁড়া দৌড়ে গিয়ে বিস্কুট কিনে কচর মচর করে খেতে লাগলো, রাস্তার মধ্যে, সব্বার সামনে!

—ছি ছি ছি ছি ছি ছি।

—এসব কাদের শিক্ষা? ঐ বেম্ম হারামজাদারাই তো শিখুচ্চে! বেম্ম হতে গেলে শেরি আর বিস্কুট খেতে হয়। ঐ খেয়ে তারা উদ্ধার হয়ে যায়।

—বলেন কী?

দোকানের কয়েকজন কর্মচারী এই সব বাক্যালাপ গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে শুনছিল। রাইমোহন কথা থামিয়ে তাদের তাড়া লাগিয়ে বললো, বাড়ি যাও, বাপধনেরা এবার বাড়ি যাও!

তারা বেরিয়ে যাবার পর গুপী দোকানের ঝাঁপ ফেলে দিয়ে এসে বললো, ঘোষালমশাই, আজ একটা অদ্ভুত মানুষ দেকলুম। অমন আমি কক্ষনো দেকিনি। মানুষ না পুতুল তা বোঝা যায় না। মনে হয় যেন পুতুলই গুড়গুড়িয়ে হাঁটে আর ওয়াঁও মোঁয়াও করে কতা বলে। তাকে সাহেবদের মতন দেখতেও না আবার হিন্দুস্থানীর সঙ্গেও মিল নেই। গায়ের রং হলদে মতন, খুব বেশী লম্বা চওড়া নয়, মাতায় আবার মস্ত বড় বেণী, সে মেয়েছেলে না ব্যাটাছেলে তাও বোজবার জো নেই।

রাইমোহন বললো, বুজিচি, ও তো চায়নাম্যান। তুই আগে দেকিসনি কখনো? ওরা তো অনেক দিন থেকেই আসচে। আছু নামে একটা চায়নাম্যানের নামে অছিপুর গ্রাম হয়ে গেল। ওরা একটা চিনির কল বানিয়েচে। এখুন তো চায়নাম্যান অনেক এয়েচে এ দেশে।

—আমি কিন্তু বাপের জন্মে দেকিনি। আমার দোকানে আজ এয়েছেল লণ্ঠন বেচতে। একটা কতাও বোঝার উপায় নেই।

—হিমালয় পর্বতের ওপাশে চীন দেশ, ওরা সেখান থেকে এয়েচে। সে দেশের মাগী মদ্দা সব দেকতে একরকম। সব্বাইকে দেকতে একরকম, ঠিক যেন যমজ। দেশসুদ্ধ সব লোক যমজ।

—কী সব্বোনেশে দেশ রে বাবা! তা ওরা হিমালয় পাহাড় ডিঙিয়ে এলো কী করে?

—পাহাড় ডিঙিয়ে কী আর আসতে পারে? হিমালয় পাহাড় ডিঙোনো মানুষের সাধ্যি নেই, বাবা মহাদেবের চ্যালারা সে জায়গা সর্বক্ষণ পাহারা দিচ্চে। ওরা এয়েচে জাহাজে। রুস্তমজীদের জাহাজ চলে যে চীন দেশ পর্যন্ত। আসবে আসবে, আরও কত রকমের লোক আসে দেকবি। গুড় থাকলেই পিঁপড়ে ছুটে আসে। এখন কলকেতা শহরে ছড়ানো যে অনেক গুড় আর মধু। জাহাজঘাটায় দেকগে যা কত হরেক জাতের মানুষ আর কত কিচিরমিচির ভাষা। একটা মুস্কো জোয়ান দেকলুম, তার গায়ের রং কী কালো, যেন বাদুড়ে রং মেকেচে। ওরা হলো গে কাফ্রি। তারপর দেকলুম গ্রীক, সে মোগল পাঠানদের চেয়েও দড় চেহারা, ওরা আসে সেকেন্দার শা'র দেশ থেকে। সেকেন্দার শা'র নাম শুনিচিস?

—আজ্ঞে না।

—তুই এখনো মুখ্যুই রয়ে গেলি। আবার শুনচি নাকি রুশীরা কলকেতার ওপর হামলা করবে। একটা জিনিস দেকলুম বটে, সবাই জানতো ইংরেজ সাহেবরা কারুকে ভয় পায় না। এখুন দেকচি, ইংরেজ ব্যাটারাও রুশীদের ভয় পায়। যখন তখন রব ওঠে যে রুশীরা আসচে। কোনো আপিসে একবার রুশীদের কেউ নাম কল্লে হলো, অমনি সাহেব সুবোরা তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে। সত্যি যদি রুশীরা আক্রমণ করে, তাহলে ইংরেজরা পোঁ পোঁ করে পালাবে।

—সত্যিই আসবে নাকি রুশীরা?

আসতেও পারে। শুনিচি তো রুশীরা মস্ত বীর। জগমোহন সরকারের বৈঠকখানায় একদিন কথা হচ্চেলো। সবচে ভালো বেরাণ্ডি তৈরি হয় যে দেশে, তার নাম ফরাসী দেশ। ফরাসী জাতের লোক দেকিচিস তো, চন্ননগরেই রয়েচে। সে দেশে নেপো নামে একটা লোক ছেল, তার মতন বীর নাকি পৃথিবীতে আর জন্মায়নি। সেই নেপোর নাম শুনলেও ইংরেজরা ভির্মি যেত, জ্যান্ত মানুষ চিবিয়ে খেয়ে ফেলতো নেপো। সেই রকম বীরও রুশীদের কাচে ঘায়েল হয়ে গ্যাচে। দু লাখ না পাঁচ লাখ কত যেন সৈন্য নিয়ে নেপো গেস্‌লো রুশীদের সঙ্গে লড়তে, সব সেখেনে মাটিপোঁতা হয়ে গেল। নেপো একলা পালিয়ে বেঁচে ছেল।

—বাবাঃ! সেই রুশীরা আসবে? আবার যুদ্ধ হবে?

—আমরা হলুম গে উলুখাগড়া। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হবে, তাতে তোর আমার কী? বড়জোর ইংরেজ রাজার বদলে রুশী রাজা আসবে।

—তেনারা আবার কেমন কাঁচাখেগো দ্যাবতা হবেন কে জানে!

—যখন আসবে, তখন দ্যাকা যাবে। এবার কাজের কতা বলি।

—মালপত্তর কিচু এনেচেন নাকি?

ট্যাঁক থেকে একটি গেঁজে বার করলো রাইমোহন। তারপর হাস্যময় মুখে বললো, বুড়ি ঠাকুমার বাক্স প্যাঁটরা ঘাঁটতে ঘাঁটতে বেশ কিচু সোনাদানা পেয়ে গেলুম রে! তখুনি বুজলুম, তোরই বরাত খুললো। এসব তো তোরই ভোগে লাগবে।

গুপীও হেসে বললো, আপনার ঠাকুমার যে দেকচি অক্ষয় ধন। এর আগেও

তেনার প্যাঁটরা ঘাঁটতে ঘাঁটতে অনেক কিচু বেরিয়েচে না?

—কত বড় বাড়ির মেয়ে ছিলেন তিনি! হাত ঘুরোলেই সোনাদানা ঝরে পড়তো। আর হাসলেই মুক্তো। সেসব ছিল তাঁর বয়েস কালে, আমি তো চক্ষে দেকিনি, শুনিচি শুধু।

রাইমোহনের গেঁজে থেকে বেরুল এক ছড়া হার আর দুটি আংটি।

গুপী বললো, চেনাচেনা লাগে যেন। এ হারছড়া মনে হচ্চে যেন আমিই বানিয়েচি!

রাইমোহন কৃত্রিম ধমক দিয়ে বলে উঠলো, চোকের মাতা খেয়িচিস নাকি? আমার ঠাকমার হার তুই কী করে বানাবি রে ব্যাটা? আজকালকার মত ফিনফিনে নয়, সেকেলে জিনিস, এ সবের চেকনাই-ই আলাদা।

—যাই বলুন ঘোষালমশাই, হাতে নিলেই যেন মনে হচ্চে এ আমার নিজের হাতের কাজ।

—এক হতে পারে, তোর ঠাকুর্দা বানিয়েছেল। আমার ঠাকুমার জিনিস তোর ঠাকুর্দা বানাবে, তাতে আশ্চায্যি কিছু নেই। সেইজন্যিই তোর চেনা চেনা লাগচে।

—সেটা একটা কতা বটে। আর এই আংটির পাতরটা, পামারস্টোন কোম্পানি বাজারে ছেড়েচে এই দু বছর।

—আরে, পামারস্টোন কোম্পানিরও তো ঠাকুর্দা-কোম্পানি ছেল, ছেল না? সে আমলে কি লোকে আংটিতে পাতর বসাতো না? নে, নে, তোর অত কতায় কাজ কী, ওজন কর, ওজন কর!

যথারীতি এই প্রকার কৌতুক ও দর কষাকষি চললো কিছুক্ষণ। দাম বেশ ভালোই পাওয়া গেছে, নগদ টাকা গুণে নিয়ে পুনরায় সেই গেঁজেতে ভরে ট্যাঁকে গুঁজলো রাইমোহন। তারপর দুজনে একই সঙ্গে বেরুলো দোকান থেকে।

গুপীর অনুরোধে রাইমোহন তার সঙ্গে চললো রামবাগানে। গুপীর ভাড়া করা রমণীটিকে সে একবার দেখে আসবে। রাইমোহন সাত ঘাটের জল খাওয়া মানুষ, তার মতামতের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

রাতের বেলা ডুলি পালকি সহজে পাওয়া যায় না। এক-ঘোড়ার কেরাঞ্চি গাড়িগুলোরও এই সময় বড় গুমোর বাড়ে, খদ্দের ডাকাডাকি করলেও সে গাড়ির গাড়োয়ানরা মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। অনেক চেষ্টায় সে রকম একটি গাড়ি যোগাড় করা গেল।

রামবাগান পাড়া সারাদিন ঘুমিয়ে থাকে, সন্ধের পরই এখানে আসল রমরমা। সব বাড়িতে বাড়িতে আলো, হারমোনিয়াম আর ঘুঙুরের সুমিষ্ট ধ্বনিতে বাতাস মদির। মাঝে মাঝেই শোনা যায় রমণীদের কাংস্য বিনিন্দিত স্বরের হাস্য।

গুপী স্যাকরা যে-বাড়িতে ঢুকলো, সে বাড়ির সামনেই খোলা নর্দমার পাশে একটি মাতাল অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তার ঠোঁটের কাছে ভনভন করছে মাছি। পথ দিয়ে লোকজন আসছে যাচ্ছে, কেউ ভ্রূক্ষেপও করছে না ওর দিকে। গুপী আর রাইমোহনও উঠে গেল ওপরে। তিনতলায় থাকে গুপীর সেই স্ত্রীলোকটি। কিছুকাল আগেও এই স্ত্রীলোকটির নাম ছিল ছুন্নিবিবি, এখন নাম নিয়েছে পদ্মবালা। বেশ মোটাসোটা চেহারা, গুপীর সঙ্গে মানিয়েছে ভালোই।

রাইমোহন সেখানে বসে কয়েক পাত্তর ব্র্যাণ্ডি পান করলো ও পদ্মবালার দু'খানি গান শুনলো। পদ্মবালার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে কালীঘাটের হাঁড়িকাঠে মাথা

দেওয়া বলির পাঁঠার শেষ আওয়াজের অনায়াসেই তুলনা দেওয়া যায়।

রাইমোহন গান শুনতে শুনতে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো। তার চলা-ফেরা খানদানী ঘরের বড় মানুষদের সঙ্গে, দামী দামী মেয়েমানুষ দেখা তার অভ্যেস। এই সব বুঁচি পাঁচী ধরনের বারাঙ্গনাদের সে ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। গুপী স্যাকরার হাতে অনেক কাঁচা টাকা এলেও কৃপণ স্বভাবটি তো যায়নি, সুতরাং তার নজর আর এর থেকে উঁচুতে উঠবে কী করে। তবু রাইমোহন গুপীর দিকে চোখ টিপে ইশারায় জানালো, সরেস মাল, চালিয়ে যা!

অর্ধ সমাপ্ত ব্র্যান্ডির বোতলটি বগলের তলায় লুকিয়ে রাইমোহন উঠে পড়লো। আর বেশীক্ষণ এখানে বসলে আরও গান শুনতে হবে, তাহলে সে মারা পড়বে। আর যাই থাক না থাক রাইমোহনের সঙ্গীত রুচি সত্যিই উঁচু।

রাইমোহন যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো, তখনও সেই মাতালটি ঠিক একই-ভাবে পড়ে আছে নর্দমার ধারে। মাঝে মাঝে বুঁ বুঁ শব্দ করছে মুখ দিয়ে। মালকোচা মারা ধুতি আর বেনিয়ান পরা, বছর পঁচিশেক বয়েস, দেখলে মনে হয় ভদ্রঘরের মানুষ। রাইমোহন লোকটিকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। নতুন কিছু ব্যাপার নয়, এরকম রোজই দেখা যায় দু একজনকে। এদের সকলেরই ইতিহাস এক, ইয়ার বক্সি নিয়ে ফুর্তি করতে এসেছিল, টাকা কড়ি সব ফুরিয়ে যাওয়ায় সঙ্গীরা এই অবস্থায় ফেলে পালিয়েছে। যাদের নিজেদের টাকা নেই, যারা পরের পয়সায় ফুর্তি করে, তারা কিন্তু কখনো এমনভাবে চেতনা হারিয়ে পথের পাশে পড়ে থাকে না।

রাইমোহন লোকটিকে টেনে তুলবার চেষ্টা করলো। কিন্তু অজ্ঞান মানুষ যেন দ্বিগুণ ভারী হয়ে যায়। রাইমোহন তখন লোকটির গালে চাপড়া মারতে মারতে বললো, এই, এই, ওঠ্ ওঠ! লোকটির তবু সাড় আসে না, বুঁ বুঁ শব্দ করে। রাইমোহনের টানাটানিতে যেন বিরক্ত হয়েই সে গড়িয়ে আরও নর্দমার দিকে যেতে চাইলো।

রাইমোহনের উদ্যম দেখে ইতিমধ্যেই একটা ছোট ভিড় জমে গেল। কেউ রাইমোহনকে সাহায্য করার চেষ্টা করলো না, শহুরে মানুষের সেরকম স্বভাব হয়, বরং নানান চুটকি টিপ্পনি শোনা যেতে লাগলো। একজন বললো, বৃথা চেষ্টা মোয়াই! ও বদ-নসীবকে আপনি গঙ্গায় ভাস্যে দিন, তাও ও চোক মেলবে না।

রাইমোহন তখন মুখ ঝুঁকিয়ে লোকটির কানে কানে বললো, এই, আর একটু মাল খাবি?

তাতেই কাজ হলো, লোকটি এক হাত উঁচু করে আঙুলগুলো গেলাস ধরার ভঙ্গিতে রেখে বললো, দে। মাল দে।

রাইমোহন বোতলটি লোকটির হাতে না দিয়ে বললো, হাঁ কর!

বাধ্য ছেলের মতন সে অমনি হাঁ করলো, রাইমোহন গপ্ গপ্ করে বেশ খানিকটা ব্র্যান্ডি ঢেলে দিল তার মুখে। দারুণ বিষম খেয়ে লোকটি সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলো। তারপর কোনোক্রমে সামলে নিয়ে চোখ মেলে বললো, আমি কোথায়?

রাইমোহন লোকটির কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে বললো, চলো ভায়া, আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমায় ঘরে পৌঁছে দেবোখন।

কাঁচা ব্র্যান্ডির তীব্র ঝাঁঝে লোকটির চৈতন্য ফিরে এসেছে, সে উঠে দাঁড়াতে পারলো এবং রাইমোহনের গায়ে ভর দিয়ে হাঁটতেও শুরু করলো।

ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে খানিকটা হাঁটবার পর রাইমোহন জিজ্ঞেস করলো, মশায়ের কোথায় থাকা হয়? এখন কোন্ দিকে যাওয়া হবে?

লোকটি জড়িত স্বরে বললো, আমি এখন আরও মাল খাবো। কিন্তু আমার তো টাকা পয়সা নেই। টাকা কে দেবে?

রাইমোহন বললো, মাল খাবে তো খাও না, আমি দিচ্ছি!

লোকটি একবার বোতলটার দিকে আর একবার রাইমোহনের মুখের দিকে চাইতে লাগলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে বাওয়া, দেবদূত?

রাইমোহন বললো, দেবদূতই বটে। চেহারাখানা দেখচো না!

লোকটি বোতলটা হাতে নিয়ে রীতিমতন বিস্ময়ের সঙ্গে বললো, খাবো? সত্যি খাবো?

—হ্যাঁ, খাও।

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাবো, না বসে বসে?

—যা তোমার ইচ্ছে।

—আমি ভদ্দরলোকের ছেলে, আমি তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাল খাই না।

—তবে বসে বসেই খাও।

কাছেই একটি গৃহের সদরের সিঁড়িতে গিয়ে বসে পড়লো লোকটি। বোতল থেকে একটি আরামের চুমুক দিয়ে রাইমোহনের উদ্দেশ্যে বললো, এসো দাদা, তোমার পায়ের ধুলো নিই।

রাইমোহনও লোকটির পাশে বসে পড়ে বোতলটা থেকে একটু চুমুক লাগালো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, নাম কী?

—হরচন্দ্র সামন্ত। ইয়োর মোস্ট ওবিডিয়েণ্ট সার্ভেণ্ট। অ্যালাউ মী টু টেক দি ডাস্ট অফ ইয়োর ফিট, স্যার!

—হুঁ, পেটে বিদ্যে আচে দেখচি। তা নদ্দোমার ধারে পড়ে ছিলে কেন? অমন ভাবে থাকলে শেষ রাতের দিকে কুকুর-শেয়ালে যে গায়ের মাংস খুবলে নিতো!

হরচন্দ্র উদাসীনভাবে বললো, তা নিতো নিতো!

—বাড়ি কোতায়?

—বাড়ি? আমার বাড়ি নেই। কেউ নেই!

—হুঁ, আমারই মতন অবস্থা দেখচি প্রায়। নেকাপড়া শিকোচো, কাজকম্মো কিচু করো না?

—নাঃ! কাজ শুধু মাল খাওয়া।

—তা মাথা গোঁজবার একটা কিছু জায়গা তো আচে? কাল ছিলে কোতায়?

—রাস্তায়।

—পরশু?

—রাস্তায়।

—বুঝলুম। নাও, বোতলটা শেষ করো, তারপর চলো আমার সঙ্গে।

লোকটিকে বেশ পছন্দ হয়েছে রাইমোহনের। এই ধরনের বিবাগী, বাউণ্ডুলে ধরনের মানুষদের প্রতি তার একটা টান আছে। যারা স্বেচ্ছায় নিজের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, যারা উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে অপরকে প্রবঞ্চনা করার নেশায় মাতে না, রাইমোহনের মতে, তারাই খাঁটি মানুষ। এই সব লোকের সঙ্গে সে সময় কাটাতে ভালোবাসে। এর আগেও সে রাস্তা থেকে এমন লোক কুড়িয়ে নিয়েছে।

এত রাতে আর গাড়ি পাবার আশা নেই, লোকটিকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলো রাইমোহন। হরচন্দ্র মাঝে মাঝে টাল খেয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলেই রাইমোহন তার কাঁধ ধরে ফেলচে। এইভাবে বৌবাজারে পৌঁছোতে ঘণ্টাখানেক লেগে গেল।

রাইমোহন সেই যে হীরেমণির বাড়িতে আস্তানা গেড়ে ছিল, আর সে জায়গা ছাড়েনি। বেশ কিছুকাল কঠিন রোগভোগের পর হীরেমণি আস্তে আস্তে সেরে উঠেছে, ফিরে পেয়েছে আগেকার রূপ। আবার সে পূর্ব পেশায় ফিরে গেছে। হীরেমণি যখন বাবুদের মনোরঞ্জনের জন্য ব্যস্ত থাকে, তখন রাইমোহন হীরেমণির ছেলে চন্দ্রনাথের দেখাশুনো করে।

চন্দ্রনাথকে সে যদিও দত্তক নিয়েছে কিন্তু ও ছেলে কক্ষনো তাকে বাবা বলে ডাকে না। এ ব্যাপারে হীরেমণির কঠিন নিষেধ আছে। কেন যে হীরেমণির এই জেদ, তা রাইমোহন কিছুতেই বোঝে না। হীরেমণি চন্দ্রনাথের পিতৃপরিচয়ও জানাবে না আবার রাইমোহনকেও পিতৃত্বের অধিকার দেবে না। চন্দ্রনাথ তাকে বলে রাইদাদা।

বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি বেশ জমকালো চেহারার জুড়িগাড়ি, মনে হয় আজ কোনো শাঁসালো খদ্দের এসেছে। দ্বিতলের কক্ষে উজ্জ্বল আলো এবং তবলার চটাং চটাং বোল।

বাড়িতে ঢুকতে যাবার আগে থেমে গেল হরচন্দ্র। কোনো রকমে চোখ খুলে সে জিজ্ঞেস করলো, এটা কার বাড়ি?

রাইমোহন বললো, তা জেনে তোমার দরকার কী? মাতা গোঁজবার একটা ঠাঁই পেলেই তো হলো? চলো—

—আমি যার তার বাড়ি যাই না! তুমি আমায় নিয়ে যাচ্চো কেন বাওয়া? তোমার মতলোবখানা কী?

—ধরে নাও, এখেনে তোমার অন্ন বাঁধা আচে। তোমার নিয়তি তোমায় টেনে এনেচে!

—আগেই বলে রাকচি, আমায় চুষে ছিবড়ে করে ফেললেও আমার কাচ থেকে কোনো মালকড়ি বেরুবে না। আমার সব ফিনিস্!

—সে তোমায় দেকেই বুঝিচি!

—তবু তুমি আমায় থাকতে দেবে? শুতে দেবে! খেতেও দেবে? তুমি দেকচি স্বগ্যো থেকে নেমে এলে!

হরচন্দ্রকে টানতে টানতে ভেতরে এনে রাইমোহন তাকে একতলার সিঁড়ির নীচের ঘরটায় বসালো। এ ঘরটা খালিই পড়েছিল, রাইমোহন সাফ সুতরো করে নিয়েছে। হীরেমণির কাছে যেসব সন্ধ্যেবেলা বাবুরা আসে, সেই সময় রাইমোহন এই ঘরে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে। সাধারণত বাবুরা সুন্দরী বারাঙ্গনার কাছে এসে পরপুরুষের মুখ দেখা পছন্দ করে না।

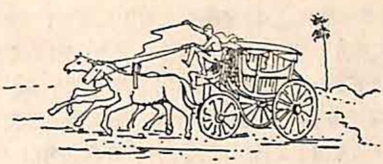
তক্তাপোশের ওপর হরচন্দ্রকে বসিয়ে রাইমোহন বললো, শুয়ে পড়ো ভায়া। যদি খাবার দাবার খেতে চাও, তাও দোবো। শুধু একটা কতা, এখানে টুঁ শব্দ করা চলবে না।

হরচন্দ্রর চৈতন্য আবার লোপ পাবার পথে। সে কোনোক্রমে বললো, আরও মদ খাবো।

রাইমোহন বললে, বেশ তো, খাবে'খন। এখন এক ঘুম ঘুমিয়ে নাও!

ওপরতলায় হীরেমণি গান ধরেছে। রাইমোহন উৎকর্ণ হলো। স্পষ্ট খুশীর ছায়া পড়লো তার মুখমণ্ডলে। রাইমোহনেরই রচিত গান গাইছে হীরেমণি, বড় সুন্দর তার কণ্ঠস্বর, নিখুঁত তার পরিবেশনা।

গানের জন্য শহরে বেশ নাম কাটছে হীরেমণির। এখন অনেকে তাকে হীরেমণির বদলে অন্য একটা নাম দিয়েছে। ভারী মানানসই নাম, হীরা বুলবুল।



বিম্ববতীর কক্ষে একদিন বিধুশেখর গঙ্গানারায়ণ এবং নবীনকুমারকে ডেকে পরলোকগত রামকমল সিংহের উইল পাঠ করে শোনালেন। নবীনকুমারের বয়েস মাত্র ছয়, সে উইলের ভাষা কিছুই বুঝবে না, আর গঙ্গানারায়ণেরও যেন বিষয়-সম্পত্তি, টাকা পয়সা সম্পর্কে কোনো আগ্রহ নেই।

বিধুশেখর জোর করে বিন্দুবাসিনীকে কাশীতে পাঠিয়ে দেবার পর থেকেই গঙ্গানারায়ণ একদিকে যেমন দারুণ অনুতাপানলে দগ্ধ হচ্ছে অন্যদিকে সারা বিশ্ব সংসারের প্রতিও একটা বিরাগ জন্মে গেছে তার। এতকাল সে বিধুশেখরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে, সে শ্রদ্ধা এখন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, এখন সে বিধুশেখরের মুখের দিকে ভালো করে চাইতেও পারে না।

কালাশৌচ পার হয়ে গেলেও গঙ্গানারায়ণ এখনো সেলাই করা বস্ত্র পরিধান করে না। গায়ে একটি তসরের চাদর জড়ানো, সে উদাসীন মুখে বসলো ঘরের মেঝেতে, হাঁটুর ওপর থুতনিটা স্থাপন করা। কিছু বুঝুক না বুঝুক, নবীনকুমার গম্ভীরভাবে বাবু হয়ে বসে আছে মায়ের পাশে, তার অত্যুজ্জ্বল চোখ দুটি বিধুশেখরের দিকে স্থির। গঙ্গানারায়ণ ও নবীনকুমার দুজনেই মস্তক মুণ্ডন করেছে, গঙ্গানারায়ণের মস্তক নগ্ন, আর নবীনকুমার পরেছে একটি লাল মলমলের টুপী।

গলা খাঁকারি দিয়ে বিধুশেখর প্রথমে গঙ্গানারায়ণের দিকে তাকিয়ে বললেন, গঙ্গা, তোমাকে একটি জরুরি কথা আজ জানানো প্রয়োজন। এতদিন এ কথা গোপন ছিল, কিন্তু এখন তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছো, যথেষ্ট বিদ্যাবুদ্ধি আয়ত্ত করেছো, এখন আর গোপন রাখার কোনো কারণ দেখি না। তুমি রামকমল সিংহের ঔরসজাত পুত্র নও, বিম্ববতী তোমার গর্ভধারিণী জননী নন। তবে, এঁরা দুজনেই তোমাকে এত স্নেহ করেচেন যে আপন পিতামাতাও অনেক সময় এতখানি করে না। রামকমল দীর্ঘকাল অপুত্রক ছিলেন, সেই অবস্থায় দত্তক নিয়েছিলেন তোমাকে। এই বংশের রক্ত বহন করচে নবীনকুমার।

বিধুশেখর চকিতে একবার তাকালেন বিম্ববতীর দিকে। বিম্ববতীর মাথায় অনেকখানি ঘোমটা, তাঁর মুখ দেখা যায় না।

গঙ্গানারায়ণ মাটির দিকে চক্ষু রেখে চুপ করে রইলো। বিধুশেখর যা বললেন, সে তথ্য তার অজানা নয়। এসব কথা গোপন থাকে না। নিজের বাবা কিংবা মা সম্পর্কে গঙ্গানারায়ণের সামান্যতম স্মৃতিও নেই, জ্ঞান-উন্মেষের পর থেকে সে রামকমল এবং বিম্ববতীকেই পিতামাতা বলে জেনে এসেছে। কিন্তু নবীনকুমার জন্মাবার পর দাস-দাসী, স্বজন-পরিজনরা আকারে ইঙ্গিতে তাকে জানিয়ে দিয়েছে তার আসল পরিচয়। তাতে কিন্তু গঙ্গানারায়ণের বড় কোনো আঘাত লাগেনি, কারণ তার তো কোনো অভাব-বোধ ছিল না। নবীনকুমার জন্মাবার পরও বিম্ববতী এবং রামকমল তার সঙ্গে আগের মতই সমান স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করেছেন। বিম্ববতীকে সে নিজের মা ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারে না।

বিধুশেখর বললেন, একথাগুলিন আজ তোমার বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন

এই জন্য যে রামকমলের উইলে তোমার আর নবীনের ভাগে কিছু ব্যাসকম রয়েচে। পাচে তুমি দুঃখ পাও তাই তোমাকে আগে থেকেই প্রস্তুত করে দিলুম। বস্তুত এ পরামর্শ রামকমলকে আমিই দিয়েচি। দত্তক গ্রহণ করার পর যদি নিজের ধর্মপত্নীর গর্ভে সন্তান জন্মায়, তবে সেই সন্তান বিষয়-সম্পত্তির মুখ্যভাগের অধিকারী হবে এটাই কৌলিক প্রথা।

গঙ্গানারায়ণ এবার ধীর স্বরে বললো, আপনি সবকিছুই নবীনকুমারকে দিন, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। সে আমার ভাই, আমি আমার সবকিছু তাকেই দিতে চাই।

বিম্ববতী গঙ্গানারায়ণের বাহু ছুঁয়ে মৃদুভাবে ডাকলেন, গঙ্গা!

গঙ্গানারায়ণ বিম্ববতীর পায়ে হাত রেখে বললো, মা—।

শুধু এই দুটি ডাক, এছাড়া কেউই আর কোনো কথা বললো না।

বিধুশেখর এই ধরনের হার্দিক আন্দোলনের বিশেষ গুরুত্ব দেন না। তিনি আবার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করে বললেন, যাক, আগে উইলটি পাঠ করে শোনাই— শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং উইল পত্রমিদং কার্যঞ্চ আপন জ্ঞানপূর্বক ও স্বেচ্ছাধীন এই উইল করিতেছি আমার পৈতৃক দৌলত শ্রীশ্রীঠাকুর ও জায়গা ও বাটী ও এলবাস পোষাক তাঁবা পিতল কাঁসার ও রূপা সোনার বাসন গহনাদি যাহা কিছু ইহার পঞ্চভাগের এক ভাগ আমার বিধবা অপুত্রক ভাতৃজায়া হেমাঙ্গিনী দেব্যা পাইবেক অপর চারি অংশ আমার উত্তরাধিকারীতে বর্তাইবে আমার স্বোপার্জিত দৌলত ও সোনা রূপার বাসন ও গহনাদি ধর্মতলার বাটী বহুবাজারের বাটিদ্বয়— বিরজিতলাওয়ের জমি ৫ বিঘা শহর কলিকাতার মধ্যে খরিদা জায়গা জেলা যশোহরের মোতালক পরগণে খালিসপুর জমিদারী কটকের তালুক হুগলীর জমিদারী...

উইলটি খুব দীর্ঘ নয়। দেখা গেল রামকমল সিংহ সাতটি পরগণায় জমিদারী ও তালুক, কলকাতায় মোট সাতখানি বাড়ি ও বেশ কয়েক বিঘা জমি, তিনটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা, বন্ধকী কারবারে নিযুক্ত সাড়ে সাত লক্ষ টাকা, একখানি জাহাজ, দুটি বৃহৎ কয়লা খনি, দশ লক্ষ টাকার সোনা জহরৎ, তিনজন সাহেবের কাছে ঋণ বাবদ প্রাপ্য সাড়ে ছ' হাজার গিনি ইত্যাদি রেখে গেছেন। এর মধ্যে থেকে দান করা হয়েছে দাস-দাসী, পাইক-গোমস্তাদের বেতনের টাকা প্রতি এক শত টাকা, অর্থাৎ যার বেতন পাঁচ টাকা সে পাবে পাঁচশত টাকা, প্রধান গোমস্তা দিবাকর পাবে বেতনের টাকা প্রতি দুই শত টাকা, আশ্রিতদের জন্য কিছু কিছু মাসোহারা, পৈতৃক গ্রামে দেব মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বার্ষিক দুই শত টাকা, সংস্কৃত কলেজের দুটি উৎকৃষ্ট ছাত্রকে প্রতি বৎসর বৃত্তির জন্য পাঁচ হাজার টাকা জমা ইত্যাদি।

এই সমুদয় সম্পত্তির মধ্যে শুধু একটি পরগণার জমিদারী ও কলকাতার বউবাজারের একটিমাত্র বাড়ি দেওয়া হয়েছে গঙ্গানারায়ণকে, বাকি সবই নবীন-কুমারের। শিশু নবীনকুমার সেই মুহূর্তে অতুল বৈভবের অধিকারী হয়ে গেল।

গঙ্গানারায়ণের দৃষ্টি মাটির দিকে, তবু তার চক্ষু জ্বালা করে উঠলো, বুক ভরে গেল প্রচণ্ড অভিমানে। অতিকষ্টে অশ্রু সামলাতে সামলাতে সে অবাক হয়ে উঠলো। কেন এই অভিমান, তার তো বিষয় সম্পদে সত্যিই লোভ নেই? তার নিজের যথেষ্ট যোগ্যতা রয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের নীতির পরিবর্তন হয়েছে, তারা এখন হিন্দু কলেজের ভালো ছাত্রদের ডেকে ডেকে ডেপুটি কালেকটরের চাকরি

দিচ্ছে, গঙ্গানারায়ণের বেশ কয়েকজন বন্ধু সে রকম চাকরি পেয়ে সুখী। গঙ্গানারায়ণ যে-কোনো সময় ইচ্ছে করলেই সে রকম কাজ পেতে পারে। তবু কেন অভিমান? গঙ্গানারায়ণের শুধু মনে হচ্ছে, তাহলে কি রামকমল সিংহ তাকে আর ভালোবাসতেন না? যত স্নেহ দেখাতেন, তা সবই ভান? আশ্রিত পরিজনদের চেয়ে তাকে সামান্য বেশী কিছু দান করেই তিনি কর্তব্য সেরেছেন। এর বদলে রামকমল তাকে কিছুই না দিলে পারতেন।

অতটুকু ছেলে নবীনকুমার, তবু তার বেশ আমি তুমি জ্ঞান হয়েছে। বিধুশেখরের সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে সে তীক্ষ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলো, কার বেশী? দাদামণির বেশী না আমার বেশী?

বিধুশেখর বললেন, তোমার!

অমনি নবীনকুমার হাততালি দিয়ে বলে উঠলো, আমার বেশী! আমার বেশী! দাদামণি হেরে গ্যাচে!

বিম্ববতী তাকে থামিয়ে দিয়ে বিধুশেখরকে প্রশ্ন করলেন, এ কোন্ উইল? এ উইলের কথা তো আমি কিছুই জানিনি। আগে তো অন্যরকম ছেল!

বিধুশেখর বললেন, মাত্র গত মাসেই রামকমল উইল বদল করেচেন। তোমাকে জানানোর কতা তার মনে আসেনি বোধহয়।

গঙ্গানারায়ণ রোষকশায়িত নেত্রে বিধুশেখরের দিকে তাকালো। সে বুঝতে পারলো, এ সমস্তই বিধুশেখরের কারসাজি। আপনভোলা রামকমলকে দিয়ে বিধুশেখর যা খুশী করিয়ে নিতে পারেন। বিধুশেখর এক সময় গঙ্গানারায়ণকে বেশ ভালোই বাসতেন, কিন্তু বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে সেই ঘটনার পর গঙ্গানারায়ণ বিধুশেখরের স্নেহ থেকে পতিত হয়েছে। বিধুশেখর কঠিন মানুষ, গঙ্গানারায়ণকে বঞ্চিত করে এইভাবে তিনি শাস্তি দিলেন।

গঙ্গানারায়ণ ক্রোধের সঙ্গে বলতে যাচ্ছিল, এই উইল আমি মানি না, কিন্তু সামলে নিল নিজেকে। বিধুশেখর দক্ষ আইনজ্ঞ, তিনি কোনো কাঁচা কাজ করবেন না।

গঙ্গানারায়ণ বিম্ববতীর দিকে চেয়ে বললেন, মা আমার কিছুই চাই না। সবকিছুই নবীনকুমারের হোক। আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো।

বিম্ববতী কেঁদে ফেললেন। গঙ্গানারায়ণের মাথায় হাত রেখে মর্ম-নিঙড়ানো কণ্ঠে বললেন, গঙ্গা, তুই কোথাও চলে গেলে আমি মাথা কুটে মরবো। তোরা দু জনেই আমার কাছে সমান। উইলে যা-ই লেকা থাক, সব সম্পত্তি তোদের দু জনের সমান থাকবে। তুই বড় ভাই, তুই-তো নবীনের মাথার ওপর থাকবি।

বিধুশেখর বললেন, বৌঠান, দিন কখনো সমান যায় না। বিষয় সম্পত্তি ছেলে-খেলার বস্তু নয়। রামকমল বুঝেশুনেই উচিত ব্যবস্থা করে গ্যাচে। আমার মনে হয়, উইলে যেমন আছে, সেই অনুসারে গঙ্গানারায়ণের বিষয় ভাগ করে দেওয়াই কর্তব্য।

লজ্জাশীলা, মৃদুভাষিণী বিম্ববতী এই প্রথম বিধুশেখরের কথার প্রতিবাদ করে দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, না। আমি যতদিন বেঁচে রয়িচি, গঙ্গা আমার কাচেই থাকবে। নবীন নাবালক, তার বিষয় দেকাশুনো করবে কে?

বিধুশেখর বললেন, তুমি আর আমি। উইলে সেই রকমই লেখা রয়েচে।

বিম্ববতী বললেন, আমার হয়ে গঙ্গাই দেকবে সবকিচু। এটা আপনি কাগজে লেখাপড়া করে নিন। গঙ্গা, তোর কাচে আমার এই মাথার দিব্যি রইলো, তুই নবীনেতে আর তোতে কখনো পৃথগ্ দেখবিনি। তোরা দুজনে আমার দুই

নয়নের মণি।

বিধুশেখর বিরক্তভাবে গম্ভীর হলেন।

ব্যাপারটা বেশ জটিল হয়ে রইলো। সমগ্র সম্পত্তির ওপর গঙ্গানারায়ণের আইনত কোনো অধিকার রইলো না, কিন্তু বিম্ববতীর অছি হিসেবে সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও কারবার পরিচালনার ব্যাপারে তার কর্তৃত্ব থাকবে। এজন্য বিধুশেখরের সঙ্গে তার ঠকাঠকি লাগবেই। গঙ্গানারায়ণ মনে মনে বিধুশেখরের সঙ্গে টক্কর দেবার জন্য প্রস্তুত হলো। তার জন্ম থেকে সে দেখে আসছে যে এ বাড়ির সব কিছুই বিধুশেখরের নির্দেশে চলে। এখন থেকে সে বিধুশেখরের সেই অধিকার ক্ষুণ্ণ করার সবরকম চেষ্টা করবে।

বিধুশেখর গঙ্গানারায়ণকে বললেন, ভাইকে নিয়ে তুমি এখন একটু বাইরে যাও। বৌঠানের সঙ্গে আমার আরও দু' চারটি কতা আচে।

ওরা বেরিয়ে যাবার পর দুজনেই চুপ করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। বিধুশেখর কোনোরকম প্রতিবাদ সহ্য করতে পারেন না। বিম্ববতী তাঁর ব্যবস্থা মানেননি, বিম্ববতী তাঁর মুখের ওপর কথা বলতে পারেন, এটাই যেন এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না বিধুশেখর। তিনি উগ্রভাবে বললেন, কাজটা ভালো করলে না, বিম্ব। রামকমল সিংহ যা সম্পত্তি রেখে গ্যাচে, তা অনেক রাজা-রাজড়ারও ভাগ্যে জোটে না। এমন সম্পত্তি নিয়ে অনেক সহোদর ভাইরাও মারা-মারি কাটাকাটি করে। আর গঙ্গা তো পরের ছেলে।

বিম্ববতী বললেন, ও-কতা বলবেন না। গঙ্গাকে আমি সে-চোকে কখনো দেকিনি।

—মানুষ অনেক বদলে যায়। গঙ্গা যে নবীনকে হিংসে করবে না কখনো, তা কি কেউ বলতে পারে? সেইজন্যই তার সম্পত্তি আলাদা করে দিতে চেয়ে-ছিলুম। ওর এখন থেকে আর এ বাড়িতে না থাকাই মঙ্গল।

—গঙ্গা হীরের টুকরো ছেলে। আমার চে বেশী তো তাকে কেউ চেনে না। ওর মনের মধ্যে লোভ বলে কোনো বস্তু নেই। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ও কোনোদিন অসুহৃৎ করবে না।

বিধুশেখর ভ্রূ কুঞ্চিত করে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর নিজের কন্যা বিন্দু-বাসিনীর সঙ্গে গঙ্গানারায়ণ যে কাণ্ডটি করেছে, সে কথা তিনি বিম্ববতীকে বলেননি। হয়তো এখনো বলার সময় আসেনি। বিম্ববতী বলছেন গঙ্গানারায়ণ হীরের টুকরো ছেলে। কিন্তু তিনি তো জানেন, গঙ্গা দুশ্চরিত্র। সে তাঁর পরিবারে কলঙ্ক আনার চেষ্টা করেছিল। সেজন্য তাঁর কাছে ওর কোনো ক্ষমা নেই।

—আমি নবীনের ভালোর জন্যই এ ব্যবস্থা করেচিলুম। নবীন যেমন তোমার, তেমন তো সে আমারও।

—আপনি বলিচিলেন, ও কথা আর কোনোদিন উচ্চারণ করবেন না। যদি কাকপক্ষীতেও টের পায়...

—না, না, আর বলবো না, কোনোদিন বলবো না।

—এমন করে আপনাতে আমাতে নিভৃতে কতা বলাও কি ঠিক? ছেলেরা এখন বড় হয়েচে—

—তুমি চাও না আমি আর আসি?

—আপনি না এলে আমি চক্ষে অসহায় দেকবো। আমার আর কে আচে? তবে এ সময় ঘরে অন্য কেউ থাকলেই শোভন।

—বিম্ব, তুমি আর আমাকে প্রীতি করো না?

বিম্ববতী বিধুশেখরের পায়ের ওপর মাথাটা ছুঁইয়ে কাঁদতে লাগলেন। বিধুশেখর তাঁকে তুলে ধরে বললেন, তোমার এই ভুবনমোহিনী রূপ, রামকমল তার কোনো মূল্য দেয়নি। সন্তানহীনা বলে তোমার অশেষ দুঃখ ছেল, সেই দুঃখ জুড়োবার জন্য আমি তোমাকে একটি ছেলে দিইচি। সে কি পাপ? জীবনে আমি কোনো ভ্রষ্টাচার করিনি, শুধু তোমার কাচেই হার মেনিচি আমি। দ্যাকো, মানুষের নিয়তি কী বিচিত্র! আমার নিজের স্ত্রীর গর্ভে কোনো পুত্রসন্তান হলো না। আর তুমি একবার চাইতেই আমি তোমায় একটি পুত্র দিলুম। তুমি মুখ ফুটে চাওনি জানি, কিন্তু আমি বুঝিচিলুম তোমার দুঃখু, সেইজন্যই, লোভ বা কামের বশবর্তী হয়ে নয়, আমি তোমাতে উপগত হয়িচি কর্তব্যবোধে! আমি ব্রাহ্মণ, কুলীনশ্রেষ্ঠ, বিবাহিতা রমণীর ব্রাহ্মণ নিয়োগে সন্তান উৎপাদন দেশাচারসম্মত। তাই তোমায় বলচি, কোনো পাপ হয়নি, মনে ভয় রেকো না...। থাক, এ কতা কোনোদিন কাকপক্ষীতেও জানবে না। আমি আর একলা আসবো না তোমার কাচে।

বিম্ববতী কাঁদতেই লাগলেন।

বিধুশেখর আবার বললেন, রামকমলকে আমি ভালোবাসতুম, তার অনেক গুণ ছেল, কিন্তু এই একটা ব্যাপারে আমি তাকে কখনো ক্ষমা করতে পারিনি। তোমার মতন এমন সোনার প্রতিমা ছেড়ে সে ছাইগাদায় পড়ে থাকতো। সেই আবাগীর বেটীর আমি এবার বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়বো। উইলে জানবাজারের বাড়ি কারুকে দান করার কথা লেকা নেই। এ হপ্তার মধ্যেই আমি সে মাগীকে ও বাড়ি থেকে দূর করে তাড়াবো।

কান্না মুছে বিম্ববতী বললেন, আহা, সে থাক না!

বিধুশেখর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কে থাকবে? কার কতা বলচো?

বিম্ববতী বললেন, ঐ যে মেয়েটি, ঐ যে কমলা না কী যেন নাম শুনিচি, সে ও বাড়িতে আচে থাক না। একটা বাড়িতে আর কী যাবে আসবে!

—কী বলচো তুমি? সাত ঘাটের জল খাওয়া বেশ্যা মাগী, তার জন্য একখানা বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে? কক্ষনো না!

—আহা, আমার স্বোয়ামী তাকে পছন্দো কত্তেন, তার মনে দুঃখ দেওয়া কী ঠিক হবে? তিনি তো ওর জন্যই বাড়িটা কিনেচিলেন। তাছাড়া শুনিচি সেটা নাকি আগে কোন্ চাঁড়াল না ডোমের বাড়ি ছেল। অমন বাড়ি দিয়ে আমাদের কী হবে!

—ডোম নয়, ডোম নয়, ডম অ্যান্টনি, এক ফিরিঙ্গির বাড়ি। সেখানে তো আমরা বসত করতে যাচ্চিনি। ভাড়া দিলে কোন্ না বিশ পঞ্চাশ টাকা আসবে। মাগী একেবারে ডাইনী, রামকমলকে ভেড়া বানিয়ে রেকেছেল। এ হপ্তাতেই তাড়াবো ওকে।

এই বিষয়টি নিয়েই প্রথম বিধুশেখরের সঙ্গে গঙ্গানারায়ণের বিরোধ বাধলো।

মামলা মোকদ্দমা করবার আগে ভয় দেখিয়ে তাড়াবার জন্য কমলাসুন্দরীর বাড়িতে চারজন পাইকসহ দিবাকরকে পাঠিয়ে দিলেন বিধুশেখর। যাবার সময় দিবাকরকে তিনি বলে দিলেন, কাজ উদ্ধার করে এসো, তোমার ভালোমতন ইনাম মিলবে। কী ইনাম দেবো, তা এখন বলবো না।

বিধুশেখর ভালোরকমই জানেন যে দিবাকরের মতন আমলারা দু তরফ থেকেই টাকা খায়। সেইজন্যই দিবাকরকে আগে থেকে টোপ দিয়ে রাখা দরকার। বিধুশেখর নিজে গেলে অবশ্য এক দাবড়ানি দিয়েই স্ত্রীলোকটিকে একেবারে দেশ-ছাড়া করে দিতে পারতেন, কিন্তু ঐ অপবিত্র স্থানে তিনি আর পদার্পণ করতে চান না। তাছাড়া ওখানে গেলেই রামকমলের স্মৃতি তাঁকে আবার বেশী করে পীড়া দেবে।

ইনামের কথা শুনেই দিবাকর আসল ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে। স্ত্রীলোকটিকে ঐ বাড়ি থেকে উৎখাত না করতে পারলে বড়বাবুর কাছ থেকে ধাতানি খেতে হবে। এই ডামাডোলের মধ্যে তার চাকরি নির্ভর করছে বড়বাবুর মর্জির ওপর।

দিবাকর জানবাজারে পেঁছে বিরাট হম্বিতম্বি শুরু করে দিল। দাসদাসী ও দু-চারজন পরগাছা ধরনের মানুষ তখনো রয়ে গেছে সে বাড়িতে। দিবাকর সামনে যাকে দেখলে তারই ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বললো, নিকালো, আভি নিকালো। দিবাকরের পেছনে ভয়াল চেহারার পাইকদের দেখে ঐ নারী-পুরুষরা প্লাবনের সময়কার ইঁদুরের মতন দৌড়ে পালাতে লাগলো এদিক ওদিক।

দিবাকর উঠে এলো দোতলায়।

বড় মজলিশ কক্ষটির মাঝখানে কুশের আসনে নিশ্চল হয়ে বসে আছে কমলাসুন্দরী। পরনে একখানি সাদা থান, দুই হাতে কিংবা কণ্ঠে কোনো অলঙ্কার নেই, খাঁটি হিন্দু বিধবার মতন বেশ। মাথা অবশ্য মুণ্ডন করেনি কমলাসুন্দরী, দীঘল খোলা চুল পিঠের ওপর ছড়ানো। কমলাসুন্দরীর মুখে এখনো শোক ও বেদনার নরম লেখা।

দিবাকরকে দেখে মুখ তুলে কমলাসুন্দরী প্রশ্ন করলো, কে?

দিবাকর কমলাসুন্দরীকে অনেকদিন থেকেই দেখছে। এই নারীকে সে এই বেশে দেখে হকচকিয়ে গেল।

বিশেষ প্রয়োজনে দিবাকরকে রামকমল সিংহের খোঁজে কয়েকবারই আসতে হয়েছে এখানে। তখন সে দেখেছে এই স্ত্রীলোকটি যেন একটি সাজানো পুতুল, রামকমল সিংহ এই মেয়েটিকে নিয়ে পুতুল খেলা খেলতেন। গত কয়েক বৎসরে নৃত্যপটিয়সী হয়ে উঠেছিল কমলাসুন্দরী, সেই কারণে তার সাজ ও অলঙ্কারের মাত্রা আরও বেড়েছিল। তার এই নিরাভরণ দেহ যেন চেনাই যায় না। তাছাড়া বাবু মারা গেলে তাঁর রক্ষিতা আবার নতুন করে বাবু ধরবে, এটাই স্বাভাবিক। কোনো বেশ্যা যে বিধবার রূপ ধরতে পারে, এমন কথা কেউ সাতজন্মে শোনেনি!

দিবাকর বললো, এই, ইয়ে...বড়বাবু আমায় পাঠিয়ে দিলেন।

কমলাসুন্দরী বললো, বড়বাবু...বড়বাবু কে?

—সেই যে সেদিন এয়েচিলেন, আমাদের বাবুর বন্ধু, তিনিই এখন সবকিছুর মালিক। তা তিনি বললেন...

—আমি একজনকেই বড়বাবু জানি, যিনি আমাদের অকূল পাথারে ভাস্যে সগ্গে গেচেন। আর বড়বাবু কেউ নেই।

—যা হয়ে গ্যাচে তা তো আর ফেরাবার উপায় নেই। বাবু হঠাৎ চলে গ্যালেন, এখন বিধুশেখর মুকুজ্যেই দণ্ডমুণ্ডের কত্তা। তিনি বলে পাটালেন, এ বাড়ি তোমায় ছাড়তে হবে।

—আমি এ বাড়ি ছাড়বো? তারপর আমি কোতায় যাবো? এই বাড়িই আমার বাড়ি—

—সে রকম নেকাপড়া তো কিছু করে যাননি। বাবু ছিলেন আপনভোলা,

হঠাৎ মরে যাবেন তাও তো ভাবেননি, এখন তো, মেয়ে, তোমার নিজের পথ নিজেকেই দেকতে হবে।

—আমি যাবো না।

—সে কতা বললে কী চলে! বাবু তোমায় আলাদা কিচু দিয়ে থুয়ে যাননি? বাবু সোনাদানা টাকাকড়ি তো কম ঢালেননি তোমার পায়ে, আলাদা বাসা ভাড়া করে নেও গে।

—আমি এখেন থেকে যাবো না!

—দেকো মেয়ে, বেশী জেদ করোনি। বিধু মুকুজ্যের কবজা থেকে এ বাড়ি তুমি ছাড়াতে পারবে না।

—আমার বাবু এখেনে মরেচেন, আমিও এখেনেই মরবো। আমি ম'লে তারপর তোমরা এ বাড়ির দখল নিও!

—বালাই ষাট, এমন কাঁচা বয়েসে তুমি মরবে কেন? তোমার তো গোটা জীবনটাই সামনে পড়ে আচে। তবে এ বাড়ির মায়া তোমায় ছাড়তেই হবে।

—খবর্দার, আমার সামনে এসো না!

দু' পা এগিয়ে এসেও দিবাকর থমকে দাঁড়ালো। হঠাৎ বন বিড়ালীর মতন ফোঁস করে উঠেছে কমলাসুন্দরী। ঈষৎ কঠিন হয়ে দিবাকর বললো, তবে কি তোমায় জোর করে তুলতে হবে? আমার ওপর যা হুকুম...কেন অবুঝপনা করচো?

কমলাসুন্দরী বললো, তুমি আমার গায়ে হাত দিয়ে দ্যাকো, আমি তখুনি বিষ খেয়ে আত্মঘাতিনী হবো। এই যে বিষ রেখিচি।

আসনের এক প্রান্ত তুলে দেখালো কমলাসুন্দরী, সেখানে সত্যিই একটি কাগজের পুরিয়া রয়েছে।

দিবাকর আর সাহস করলো না। স্ত্রীলোকদের ওপর জোর জবরদস্তি করা তার ঠিক পছন্দ হয় না। তাছাড়া, মাত্র তো কয়েকদিন আগেই এই রমণী ছিল তার বাবুর দুই নয়নের মণি, তখন এর মনোরঞ্জনের জন্য রামকমল সিংহের আদেশে কত কিছু জোগাড় করতে হয়েছে তাকে, আর আজ সেই রমণীকেই সামান্য কুকুর বিড়ালের মতন গলাধাক্কা দিয়ে তাড়াতে দিবাকরের মতন ঘোর বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরও চক্ষুলজ্জা হলো।

আরও একটা কথা, হঠাৎ যদি সত্যিই বিষ-টিষ খেয়ে বসে, তখন তার হ্যাঁপা সামলাবে কে? তখন হয়তো বিধুশেখরই তাকে বলবেন, কে তোকে বলেছেল হাত ধরে টানাটানি করতে? আমাকে আর একবার জিজ্ঞেস করে যাসনি কেন?

মুখ রক্ষার জন্য দিবাকর বললো, আমি আরও দুদিন সময় দিয়ে যাচ্চি, এর মধ্যে একটা কিচু বন্দোবস্ত করে নাও। এ বাড়ি তোমায় ছাড়তেই হবে বলে রাকলুম।

সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দিবাকরের আবার আফসোস হলো। কার্যোদ্ধার না করে গেলে বিধুশেখরের কাছে কতখানি ধাতানি খেতে হবে কে জানে? বারাঙ্গনাটির কাছে জব্দ হয়ে গেল সে। তার মনে হলো, ঐ সব বৈধব্যের বেশটেশ আসলে ভেক। আসনের নীচে বিষ পর্যন্ত রেখেছে। এসব তো ও মেয়ের নিজের বুদ্ধিতে কুলোবে না, নিশ্চয়ই ওর কানে মন্তর দিয়েছে অন্য কেউ। সহজে ও বাড়ি ছাড়বে না।

ফিরে এসে দিবাকর দেখলো, বৈঠকখানা ঘরে বিধুশেখর আর গঙ্গানারায়ণ অনেক দলিল দস্তাবেজ খুলে বসে হিসেবের কাজে ব্যস্ত। তাদের দুজনের কাছেই দিবাকর তার অভিযানের পরিণাম ব্যক্ত করলো।

বিধুশেখর চোয়াল শক্ত করে বললেন, তুমি গলাধাক্কা দাওনি ভালোই করোচো।

আদালতের প্যায়দা পাঠিয়েই ও কাজটা সারা যাবে।

গঙ্গানারায়ণ বললো, কেন, সে বাড়ি ছাড়বে না কেন? ও বাড়ির ওপর তার কী হক্ক আছে? মামলা মোকদ্দমা করার দরকার কী, আমি নিজে গিয়ে তাকে তাড়িয়ে আসবো।

বিধুশেখর বললেন, না, না, ও সমস্ত জায়গায় তোমার যাবার দরকার নেই।

গঙ্গানারায়ণ বললো, কেন? বাড়ি তো আমাদেরই, সেখানে আমি যেতে পারবো না কেন?

বিধুশেখর বললেন, ঐ অবিদ্যা আগে দূর হোক, তারপর যেও। ওদের মুখ দর্শন করাও পাপ।

বিধুশেখর নিষেধ করলেন বলেই গঙ্গানারায়ণ সেখানে গেল সেদিনই সন্ধে-বেলা। কারুকে কিছু না বলে, একা।



আবার রামকমল সিংহের নিজস্ব জুড়িগাড়ি এসে থামলো জানবাজারে কমলা-সুন্দরীর গৃহের সামনে। গাড়িটি নিকষ কালো মেহগিনি কাষ্ঠে নির্মিত, এমনই চিক্কণ পালিশ যেন দর্পণের মতন মুখ দেখা যায়। আর অশ্বদু'টি দুগ্ধ ধবল, তাদের পৃষ্ঠে জরির কাজ করা কিংখাব। গাড়ির সম্মুখের পিত্তল দণ্ড দুটির এত চাকচিক্য যে সোনা বলে ভ্রম হয়। অবশ্য রামকমল সিংহ তাঁর জুড়িগাড়িতে স্বর্ণ দণ্ড ব্যবহার করলেও আশ্চর্যের কিছু ছিল না। গাড়ির সম্মুখে অধিষ্ঠিত বল্গাধারী কোচম্যানের পোশাক মুঘল সেনানীর মতন, তাকে দেখলেই পথচারীদের মনে সম্ভ্রম জাগে। গাড়ির পিছনেও উর্দিধারী দুজন রক্ষী দণ্ডায়মান থাকে সব সময়।

চার বৎসর আগে জানবাজারের এই গৃহটি ক্রয় করা হয়েছিল, তারপর থেকে প্রায় প্রতিদিনই রামকমল সিংহের এই জুড়িগাড়িকে দেখা গেছে দ্বারের সামনে। কিন্তু আজকের আগমনের সঙ্গে তার কত তফাত! আগে গাড়িখানি থামবার পরই পিছন থেকে রক্ষী দুজন ছুটে এসে দোর খুলে দাঁড়াতো। মেদবহুল শরীর নিয়ে রামকমল সিংহ রক্ষী দুজনের স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করে ধীরে ধীরে নামতেন। তাঁর মাথায় সোনালী জরির পাগড়ি, অঙ্গে মখমলের কুর্তা, হাতে গজদন্তের ছড়ি, আঙুলগুলিতে মোট ছ'খানি আংটি, পুরুষ্টু গুম্ফ সমন্বিত মুখখানি সদা হাস্যময়, এদিক ওদিক তাকিয়ে তিনি শ্লথ পায়ে ঢুকে যেতেন গৃহের মধ্যে।

আজ সব কিছুই অন্যরূপ। জুড়িগাড়ি থামার পরই তার ভেতর থেকে দ্রুত নেমে এলো এক নবীন যুবা। চুনোট করা ধুতি ও চীনা সিল্কের বেনিয়ান পরা, শরীরে কোনো অলঙ্কার নেই। পাছে তাকে কেউ চিনতে ভুল করে তাই কোচম্যান নেমে এসে চিৎকার করতে লাগলো, এই, সব হঠ যাও, হঠ যাও, বাবুর বড় ছেলে এয়েচেন! গড় কর, বাবুর বড় ছেলে।

গঙ্গানারায়ণ অন্যদের দিকে ভ্রূক্ষেপ করলো না, সে থমকে দাঁড়িয়ে বাইরে থেকে একবার গৃহখানি নিরীক্ষণ করে নিল। গৃহটি দ্বিতল তবে প্রস্থে অনেক-

খানি, কক্ষের সংখ্যা অন্তত বারো চোদ্দটি হবেই। লৌহ ফটকের দুপাশে দুটি নারিকেল বৃক্ষ, গৃহের ডান পাশে ছোট একটি বাগানের মতনও রয়েছে।

গঙ্গানারায়ণ কোচম্যানের দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি আগে আগে চলো। গঙ্গানারায়ণ একুশ বৎসর বয়স্ক যুবা, এই প্রথম সে কোনো রূপোপজীবিনীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে যাচ্ছে। তার মতন বড় বংশের এবং তার বয়েসী যুবাদের এই সব প্রমোদ ভবনে গমনাগমন অতি স্বাভাবিক ঘটনা। তার বয়েসী অনেক ধনাঢ্য যুবাই নিজ গৃহে এবং নিজ পত্নীর সঙ্গে একই শয্যায় রাত্রিযাপন করা বড় অসম্মানের কাজ মনে করে। সেজন্য অনেকেরই বাঁধা রাঁঢ় থাকে, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে এরকমও দেখা যায় পিতা ও পুত্রের একই পল্লীর বিভিন্ন গৃহে গতায়াত আছে। কিন্তু হিন্দু কলেজের ছাত্ররা এই প্রথা পরিত্যাগ করেছে। গঙ্গানারায়ণের বন্ধুরা প্রায় সকলেই বারাঙ্গনা-গমনকে ঘৃণার চক্ষে দেখে।

এ বিষয়ে গঙ্গানারায়ণের ঘৃণা যেন আরও প্রবল। সে এসেচে তাদের পারিবারিক সম্পত্তি উদ্ধার করতে। যে কুলটা স্ত্রীলোকের জন্য তার মা বিম্ববতী এতকাল মনঃকষ্ট পেয়েছেন, সেই স্ত্রীলোকটিকে সে আজই গৃহছাড়া করবে।

কোচম্যান ও অন্যান্য অনুচররা হঠো হঠো বলতে লাগলো, গঙ্গানারায়ণ সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো দ্বিতলে। মজলিস-কক্ষটিকে একটু আগেই যেন পরিষ্কার করা হয়েছে, ডুগি-তবলা, হারমোনিয়াম, ঘুঙুর সব অদৃশ্য। পরিচ্ছন্ন গালিচার ওপর শুধু একটি মাত্র কৌচ। উপরতলায় কোনো পুরুষ মানুষ নেই, তিনজন সুসজ্জিতা যুবতী দাসী যেন গঙ্গানারায়ণের জন্যই অপেক্ষা করে ছিল, তারা কৃতার্থ ভঙ্গিতে বললো, আজ আমাদের কত বড় সৌভাগ্য, আপনি নিজে এ বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েচেন!

তারা গঙ্গানারায়ণের হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসালো সেই কৌচে। একজন হাঁটু গেড়ে বসে গঙ্গানারায়ণের পা থেকে জুতো খুলতে লাগলো আর একজন দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এলো একটি শ্বেতপাথরের গেলাস ভর্তি সরবত, সেটি হাতে নিয়ে গঙ্গানারায়ণের সামনে অপ্সরার ভঙ্গিতে দাঁড়ালো।

বিস্মিত গঙ্গানারায়ণ জিজ্ঞেস করলো, এ কী?

মেয়েটি ঝলমল হাস্যে বললো, আপনি ক্লান্ত হয়ে এয়েচেন, একটু পেস্তার সরবত আপনার সেবার জন্য।

গঙ্গানারায়ণ হাত নেড়ে বললো, না, না, আমার প্রয়োজন নেই।

অন্য একটি মেয়ে ততক্ষণে নিয়ে এসেছে আলবোলা। তার রুপো বাঁধানো নলটি এগিয়ে দিল প্রাক্তন প্রভুর পুত্রের দিকে।

গঙ্গানারায়ণ তাকেও বললো, না, না, আমি ধূমপান করি না।

তখন তিনটি মেয়েই সমস্বরে বললো, আমরা আপনার দাসী, আপনি হুকুম করুন আপনার জন্য কী আনবো?

গঙ্গানারায়ণ প্রথমে খানিকটা বিমূঢ় বোধ করলো। নারীদের সঙ্গে সে সব সময় সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করে। তার এ-যাবৎ জীবনে সে এমন লজ্জাহীনা রমণী দেখেনি। দু-চারজন আত্মীয়া ব্যতীত অপর নারীদের মুখ দর্শনই দুরূহ ঘটনা। পথে-ঘাটে সে নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোকদের দেখেছে বটে কিন্তু গঙ্গানারায়ণ তাদের দিকে কখনো ভালো করে দৃষ্টিপাত করেনি। সে বরাবরই লাজুক স্বভাবের। কিন্তু এই স্ত্রীলোকদের এমন সাবলীল নির্লজ্জতা তাকে কাঁপিয়ে দেয়। তার দুই কর্ণমূল উষ্ণ হয়ে ওঠে। সে চক্ষু নত করলো।

দুটি মেয়ে টিপতে লাগলো গঙ্গানারায়ণের দুই পা, এবং এদের মধ্যে যে

বেশী রূপসী সে গঙ্গানারায়ণের কানে তার নরম ওষ্ঠ ছুঁইয়ে ফিসফিস করে বললো, আপনার জন্য একটা শ্যাম্পেন খুলবো কী?

বেশী লজ্জা পেলে মানুষ হঠাৎ রুক্ষ হয়ে ওঠে। গঙ্গানারায়ণ অতিরিক্ত রুক্ষতার সঙ্গে বললো, এসব কী? আপনারা সরে যান। আপনাদের কর্ত্রীকে ডাকুন।

একজন রমণী বললো, আমাদের কর্ত্রী তো আসবেন না।

আরেকজন বললো, আমাদের পছন্দ হলো না? হা অদেষ্ট!

গঙ্গানারায়ণ এবার সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে বললো, কেন, তোমাদের কর্ত্রী আসবেন না কেন?

একজন রমণী বললো, আপনি এয়েচেন শুনেই তিনি ঘরে আগল দিয়েচেন।

আরেকজন বললো, তিনি আপনাকে মুখ দেকাবেন না।

অন্যজন বললো, আপনি যে তাঁর ছেলের মতন গো!

গঙ্গানারায়ণ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি তেনার সঙ্গে কাজের কথা বলতে এয়েচি। তোমরা সরে যাও!

তখন দুই রমণী গঙ্গানারায়ণের দু হাত ধরে বললো, আহা রাগ কচ্চেন কেন গো বাবু, বসো বসো! আমরা হলুম গে অবলা, আপনাদের রাগ দেকলে যে আমাদের বুক কাঁপে।

তারপর একজন তার উত্তাল বক্ষদ্বয়ের ওপর এক হাত রেখে সুমধুর হাস্যে বললো, এই দ্যাকো, কেমন বুক কাঁপচে, দেকুন, দেকুন, নিজে হাত দিয়ে দেকুন।

অন্য একজন বললো, আমরা তোমার রাগ দেকে যদি দাঁত ছিরকুট্টি হয়ে মরে যাই, তা হলে যে আপনার পাপ লাগবে।

গঙ্গানারায়ণের মনে হলো, সে যেন একটা ফাঁদে পড়েচে। কেন সে এখানে এলো! একবার ভাবলো, সে দৌড়ে এখান থেকে পালিয়ে যাবে। কিন্তু তা হলে এই মেয়েরা তার পশ্চাতে খিলখিল করে বিদ্রূপ হাস্য করবে না! সে সিংহ পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান হয়ে পালিয়ে যাবেই বা কেন? এই গৃহ তাদের সম্পত্তি। এখানে সে ইচ্ছে করলে আগুন লাগিয়েও দিতে পারে।

এবার সে কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব গম্ভীর করে বললো, তোমাদের কর্ত্রীর সঙ্গে দেখা না করে আমি যাবো না। তাকে শীঘ্র খবর দাও, এই আমার হুকুম।

পরিহাসপ্রিয়া রমণীটি বললো, ছিঃ, অমন কথা বলতে নেই। আমাদের যদি পছন্দ না হয় তবে আর কারুকে ডাকবো তো বলুন!

সিঁড়ির কাছে বলিষ্ঠকায় কোচম্যান চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। গঙ্গানারায়ণ তার দিকে চেয়ে বললো, করিমবক্স, ঢুঁড়কে দেখো তো মালকান কাঁহা—

তখনই মজলিস কক্ষের একদিকের দ্বার খুলে গেল। সেখানে এসে দাঁড়ালো কমলাসুন্দরী। শুভ্র থানকাপড় পরা সেই আগের মতই বৈধব্য বেশ, অঙ্গে একটিও অলঙ্কার নেই, পিঠের ওপর মেঘের মতন খোলা চুলের ঢাল।

কমলাসুন্দরীকে দেখে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল গঙ্গানারায়ণ। অনেক দিন ধরেই সে এই নারীর কথা শুনে আসছে, মনে মনে কমলাসুন্দরীর রূপ সে কল্পনা করে রেখেছিল। তার সঙ্গে এই নারীর সামান্যতম মিলও নেই।

গঙ্গানারায়ণ ভেবেছিল ছলাকলা নিপুণা এই রমণী হবে মধ্যবর্ষীয়া, অন্তত তার মা বিম্ববতীর সমবয়স্কা তো হবেই। এর ওষ্ঠ হবে তাম্বুলরঞ্জিত, দেহ ঈষৎ

পৃথুলা, চক্ষু দুটি সুর্মা আঁকা। কিন্তু একে দেখে যেন গঙ্গানারায়ণের নিজের চেয়েও ছোট মনে হয়, যেন বিন্দুবাসিনীর সমান। বিশেষত এই বৈধব্যবেশের জন্যই বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে মিলটির কথাই গঙ্গানারায়ণের প্রথমে মনে আসে। তার বক্ষে অমনি একটি মোচড় লাগে।

কমলাসুন্দরী গঙ্গানারায়ণের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে কয়েক পা এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়ালো, তারপর খুব শান্তভাবে ধীরে ধীরে বললো, আপনি...তুমিই গঙ্গা? তোমার কথা কত শুনিচি...কত বড় বিদ্বান, কত গুণ, তুমি এয়েচো, এ বাড়ি ধন্য হলো।

গঙ্গানারায়ণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, কোনো কথা বলতে পারলো না।

কমলাসুন্দরী আবার বললো, আমি হতভাগিনী, জানি, নরকেও আমার স্থান হবে না, আমার জাত নেই, মান নেই, তবু আমি সর্বসমক্ষে বলবো, তোমার বাবা ছিলেন আমার স্বামী, আমি তাঁকে পতির চক্ষে দেকিচি গো, আর কোনো চক্ষে দেকিনি, ভগবান সাক্ষী, আমি তেনাকে কোনোদিন ছলনা করিনি...

সহচরীদের দিকে ফিরে কমলাসুন্দরী সজলনয়নে বললো, তোরা বল, তোরা তো দেকিচিস সব, কোনোদিন আমি তেনাকে ছলনা করিচি? তিনি ছিলেন দেবতুল্য মানুষ।

সহচরীরা বললো, সে কতাই তো এতক্ষুণ এনাকে বোঝাচ্ছিলুম, বড়বাবু ছেলেন আমাদের দেবতা, তেনার ছেলেকে আমরা খাতির যত্ন করবো না?

কমলাসুন্দরী বললো, আমি অসহায়, দীনহীনা, ভাগ্যহীনা, ছেঁড়াকপালী। তিনি আমায় অকূল পাথারে ভাস্যে চলে গেলেন, এই যে এখেনে, ঠিক এই ঘরটায়, মিত্যুর আগে আমার পানে চেয়ে তিনি বললেন, কমল, আমি চললুম, তুমি এখানেই থেকো, আমি ওপর থেকে তোমাকে দেকবো! সেই থেকে আমি এ বাড়ি ছেড়ে এক পা বেরোইনি...গঙ্গা, তোমায় দেকে আমার বুকের মধ্যে উথালি পাথালি কচ্চে, অবিকল যেন সেই মুখখানা বসানো, সেইরকম চাউনি...

গঙ্গানারায়ণ একটি তপ্ত নিশ্বাস ছাড়লো। বাল্যকালে অনেকেই বলতো যে তার মুখের আদলে তার পিতার মুখের খুব মিল আছে। তখন বোধহয় তারা জানতো না যে গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে তার পিতা রামকমল সিংহের কোনো রক্ত-সম্পর্ক নেই। এই নারীও হয়তো সে কথা জানে না।

কমলাসুন্দরী বললো, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো?

গঙ্গানারায়ণ বললো, না, বসবার প্রয়োজন নেই।

কমলাসুন্দরী বললো, তুমি যে এয়েচো, এই আমাদের কত ভাগ্যি। তোমায় দেকে তবু চক্ষু জুড়োলো। যেন তোমার মধ্যে তেনাকে দেকলুম। তিনি এ বাড়িতে শেষ নিশ্বাস ফেলেচেন, এ বাড়ি আমার কাশী-বৃন্দাবন, আমি আমার শেষ দিনটি পর্যন্ত এখেনে থেকে তেনার ইস্মৃতি পুজো করবো।

বয়সে প্রায় সমান হলেও কমলাসুন্দরী এমনভাবে কথা বলছে, যেন সে কত বড়। এই রমণীর স্মৃতি জুড়ে এখনো রয়েছেন রামকমল। গঙ্গানারায়ণ ওর দিকে চেয়ে থাকলেও তার বেশী করে মনে পড়তে লাগলো, বিন্দুবাসিনীর কথা। এই নারীও যেন বিন্দুরই মতন অসহায়। বিন্দুকে একা জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া হলো দূর বিদেশে, অথচ বিন্দুর তো কোনো দোষ ছিল না। আর কি কোনোদিন দেখা হবে বিন্দুর সঙ্গে?

কমলাসুন্দরী বললো, পাইক বরকন্দাজরা এসে জোর করে টানাটানি করলেও আমি যাবো না, আমি এই পুণ্যভূমিতে বিষ খেয়ে মর্বো। আদালতের প্যায়দারা

এসে যদি আমার মাথায় লাঠি মেরে রক্তারক্তি করে, তবু আমায় কেউ ঠাঁই নাড়া কত্তে পারবে না...

গঙ্গানারায়ণকে তবুও নীরব দেখে কমলাসুন্দরী হঠাৎ থেমে গেল। তারপর কণ্ঠস্বর খুব সহজ করে সে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি আমাকে এ বাড়ি থেকে দূর করে দেবার জন্য নিজে এয়েচো? তুমি চুপ করে রয়েচো. লজ্জায় সে কতা বলতে পাচ্চো না? বলো, সে কতা বলো, তুমি মুখ ফুটে একবার বললে, আমি এই দণ্ডে এক কাপড়ে এই ভিটে ছেড়ে চলে যাবো, একবারও পেচুন পানে তাকাবো না। আর কোনোদিন তোমরা আমায় দেকতে পাবে না। যদিও এ-কতা উচ্চারণ করলে আমার জিভ খসে যাওয়া উচিত, তবু আমি বলবো, গঙ্গা, তুমি আমার ছেলের মতন। তুমি বললে আমি সব শুনতে রাজি আচি, তুমি যদি আমায় আস্তাকুঁড়ে যেতে বলো—

গঙ্গানারায়ণ আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলো না। আবেগকম্পিত স্বরে বললো, মা, আপনাকে কোথাও যেতে হবে না, আপনি এ বাড়িতেই থাকবেন।

কমলাসুন্দরী প্রায় চিৎকার করে উঠলো। হাসি-কান্না মেশানো সুরে বললো, মা? তুমি আমায় মা বললে? ওগো, আমার মতন মহাপাতকীও যে উদ্ধার হয়ে গেল!

সহচরীদের দিকে তাকিয়ে কমলাসুন্দরী বললো, ওরে, তোরা সব শুনিচিস? মা বলেচে, আমার প্রাণপতির ছেলে আমায় মা বলেচে, আমি ধন্য!

কমলাসুন্দরী গঙ্গানারায়ণের হাত জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো তীব্র আনন্দে।

গঙ্গানারায়ণ অনভিজ্ঞ, জীবনের কতখানিই বা সে দেখেছে, নারীগণের আকস্মিক হাসি বা কান্নার মর্ম সে বিশেষ কিছুই বোঝে না। কমলাসুন্দরীর অঝোর কান্না দেখে তারও চোখে জল এসে যাচ্ছিল, অতি কষ্টে নিজেকে সামলে রেখে সে বললো, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, কেউ আপনাকে এখেন থেকে সরাতে পারবে না। আমি কথা দিয়ে যাচ্চি।

পাশের যে ঘরটিতে রামকমল সিংহ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন কমলাসুন্দরী সেই ঘরটিতে গিয়ে কাঁধে আঁচলের খুঁট জড়িয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। তারপর মেঝেতে কপাল ছুঁইয়ে বললো, ওগো, তুমি শুনচো? তুমি দেকচো? তোমার ছেলে নিজের মুখে বলেচে, আমি এখেনে থাকবো, তোমার সুযোগ্য ছেলে, হীরের টুকরো ছেলে, সে আমায় মা বলেচে।

গঙ্গানারায়ণ সিঁড়ির দিকে এগোতে যেতেই তিন সহচরী তাকে বললো, আপনি মানুষ নন গো, আপনি দেবতা। কতা দিন, আপনি মাঝে মাঝে আসবেন, আমাদের একটু সেবা কত্তে দেবেন গো।

গঙ্গানারায়ণ বললো, না, সে-রকম কথা দিতে পারি না। তবে ভয় নেই, তোমাদের কেউ বিরক্ত করবে না।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় গঙ্গানারায়ণ অনুভব করলো, তার সর্ব শরীর কাঁপছে। কেন কাঁপছে, তা সে নিজেই বুঝতে পারলো না। স্বল্পবাসা, উন্মুক্ত স্বভাবের এতগুলি রমণীকে এত কাছ থেকে সে কখনো দেখেনি, এদের প্রতি তার অত্যন্ত ঘৃণা ছিল, অথচ আজ এদের মুখোমুখি এসে তো তেমন ঘৃণা জাগলো না। তার মনে হলো, এরা সবাই যেন বিন্দুবাসিনীর মতন নিয়তির প্রহারে এরকম

অবস্থার মধ্যে পড়েছে।

সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে গঙ্গানারায়ণ জুড়িগাড়িতে উঠে বললো, গাড়ি ঘোরাও। কোচম্যান জিজ্ঞেস করলো, হুজুর, এবার কোন্ দিকে যাবো?

গঙ্গানারায়ণ একটুক্ষণ ইতস্তত করলো। সত্যিই তো, সে কোথায় যাবে এখন? এখনই গৃহে ফিরে যেতে তার ইচ্ছে হলো না। তার মনে এখন তীব্র আসঙ্গ লিপ্সা। শুধু মনে পড়ছে বিন্দুবাসিনীর কথা। কিন্তু বিন্দুর সঙ্গে তার আর দেখা হবার উপায় নেই।

কোচম্যানকে সে নির্দেশ দিল কেল্লার কাছে গঙ্গার ধারে গাড়ি নিয়ে যেতে। সে মুক্তবায়ু সেবন করে শরীর জুড়োবে।

এখন প্রতিদিনই সকালে বিধুশেখর এবং গঙ্গানারায়ণ কয়েক ঘণ্টার জন্য আলোচনায় বসে। রামকমল সিংহের বিস্তীর্ণ সম্পত্তি কোন্‌টি কোথায় কী অবস্থায় আছে, তা গঙ্গানারায়ণের বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। এ সম্পর্কে গঙ্গানারায়ণ নিজেই ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছে। কিছুদিন আগেও বিষয়-আসয় সম্পর্কে তার কোনো মোহ ছিল না, কিন্তু উইলে সে নিজে বঞ্চিত হয়েছে বলেই যেন হঠাৎ তার আগ্রহ বেড়ে গেছে। সে নিজে কিছু চায় না, কিন্তু বিধুশেখরের কর্তৃত্ব সে খর্ব করবেই। ভবিষ্যতে নবীনকুমার যখন সাবালক হবে তখন গঙ্গানারায়ণ সম্পূর্ণ সম্পত্তি তার হাতে তুলে দেবে। সিংহ পরিবারকে সে বিধুশেখরের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করবেই।

কথাবার্তা হয় অতি শুষ্কভাবে, আগেকার সেই স্নেহ শ্রদ্ধার সম্পর্ক আর নেই। বিধুশেখর এখনো তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব খাটিয়ে গঙ্গানারায়ণকে জালে আবদ্ধ করতে চ.ন, কিন্তু গঙ্গানারায়ণ আর কোনদিন সে-রকমভাবে অভিভূত হবে না।

আলোচনা শেষ হবার পর বিধুশেখর বললেন, এই পর্যন্ত মোটামুটি তুমি বুঝলে। এবার তুমি ইব্রাহিমপুরের তালুকটা ঘুরে দেকে এসো। সেখানকার প্রজারা বেগড়বাঁই করচে। আমি বলি কী, ওদিককার নীল চাষের কারবারটা সাহেবদের কাছে বেচে দেওয়াই ভালো। সাহেবদের সঙ্গে নীল চাষের ব্যাপারে আমরা যুঝতে পারবো না। গঙ্গানারায়ণ বললো, দেখি, আমি নিজে একবার দেকে আসি।

তারপর গঙ্গানারায়ণ অকস্মাৎ খুব সংক্ষিপ্তভাবে বললো, জানবাজারের বাড়িটা আমরা ছেড়ে দিচ্চি।

কথাটা বলেই গঙ্গানারায়ণ উঠে দাঁড়ালো। যেন এ বিষয়ে আর কিছু আলোচনার প্রয়োজন নেই।

বিধুশেখর বিস্মিতভাবে বললেন, জানবাজারের বাড়ি? কোন্ বাড়ি? যে বাড়ি ডম আণ্টুনির কাচ থেকে কেনা হয়েছেল?

গঙ্গানারায়ণ বললো, হ্যাঁ। সে বাড়ি আমার পিতা আমাদের ভোগে লাগাবার জন্য কেনেননি। সে বাড়ি তিনি অন্য একজনকে দিয়ে গ্যাচেন!

—অন্য একজনকে দিয়ে গ্যাচেন? কাকে? কাগজপত্তরে কোথাও তার উল্লেখ রয়েচে? আমাকে দ্যাখাও দিকি!

—লেখা না থাক, তাঁর মুখের কথাই যথেষ্ট।

বিধুশেখর গঙ্গানারায়ণের কথাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে জোর দিয়ে

বললেন, না, না, ওসব কোনো কাজের কতা নয়। দেব-দ্বিজে দান করলেও না হয় পরকালের কাজে লাগতো। না দেবায়, না ধর্মায়, এক বেশ্যা মাগীর ভোগে লাগবে ঐ অতবড় বাড়ি? ছ্যাঃ! একটা মামলা ঠুকে দিলেই মাগী বাপ বাপ বলে পালাবে।

গঙ্গানারায়ণ বিধুশেখরের মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল না। অকম্পিত গলায় বললো, না, মামলা ঠোকবার দরকার নেই। আমি কথা দিইচি, ও বাড়ি আমরা দখল নিতে যাবো না।

—কথা দিয়োচো? কাকে কথা দিয়োচো?

—আপনি তার নাম জানেন। আমার পিতার মৃত্যুর সময় আপনি তাকে দেকেচিলেন।

—কমলা বলে সেই ছুঁড়িটা? তাকে তুমি কতা দিয়োচো? তাকে তুমি কোতায় দেকলে?

—আমি গিয়েচিলুম ও বাড়িতে।

—তুমি গেসলে? তুমি কি আজকাল ঐ সব পাড়ায় যাতায়াত শুরু করোচো নাকি?

—হ্যাঁ। ভাবচি মাঝে মাঝেই যাবো। এ বিষয়ে তো আমি আপনার কাছে কোনো শপথ করিনি।

গঙ্গানারায়ণ ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো, বিধুশেখর বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ডেকে বললেন, শোনো। তুমি ঐ কমলা ছুঁড়িটাকে কতা দিয়োচো কোন্ এক্তিয়ারে? এমন যাকে তাকে কতা দেবার অধিকার তোমায় কে দিয়েচে?

দ্বারের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে গঙ্গানারায়ণ শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বললো, আমি মায়ের অনুমতি নিইচি। মা বলেচেন, ও সম্পত্তিতে আমাদের প্রয়োজন নেই। পিঁপড়ের পেট টিপে মধু বার না করলেও আমাদের চলে যাবে।

—তোমার মাকে বলোচো যে তুমি রাতের বেলায় অবিদ্যাদের বাড়িতে যাতায়াত করচো?

—হ্যাঁ বলিচি।

—তোমার মা তো আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে কখোনো কোনো বিষয়ে মত দেননি।

—খুড়োমশাই, আপনি জানেন যে আমি মিথ্যে ভাষণ করি না। আপনার সন্দেহ হয় আপনি মাকে জিজ্ঞেস করে দেকবেন।

—দাঁড়াও। তোমার মা বলে থাকলেও তিনি ভুল বুঝে বলেচেন। আমি বলচি, এ মামলা হবেই।

—আমার মা যতদিন রয়েচেন, ততদিন আমার মতামতের একটা মূল্য থাকবে, এমনই দলিল করা হয়েচে। আমার মা যদি আমার ওপর থেকে বিশ্বাস ফিরিয়ে নেন, তবে সেদিন, সেই মুহূর্তেই আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো! আমি বলচি, এ মামলা হবে না।

—বেয়াদপ! আমার মুখে মুখে কতা! তোর মা আমার চেয়ে তোর কতা বেশী শুনবে?

—তা আমি জানি না। সে কতা আপনি নিজেই জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন তাঁর কাছ থেকে।

—ঐ একটা নচ্ছার মেয়েমানুষ...বিষধর সাপ...এর মধ্যেই আবার খদ্দের জুটিয়েচে...ঐ হারামজাদা জগমোহন সরকার ওর কাছে নিয়মিত যায়, সব খবর আসে আমার কানে...সেই কালনাগিনীকে আমরা একটা বাড়ি ছেড়ে দেবো?

কক্ষনো না। এ মামলা হবেই।

গঙ্গানারায়ণ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলো। তার মনশ্চক্ষে ভেসে উঠলো কমলাসুন্দরীর বৈধব্য বেশ, শুদ্ধা সতীর মতন মুখশ্রী। যেন কমলাসুন্দরী নয়, বিন্দুবাসিনীরই ঐ আর এক রূপ। সে আবার বললো, আমি কতা দিইচি, ও বাড়ি ওরই থাকবে।

আর কোনো মন্তব্য না করে গঙ্গানারায়ণ চলে গেল সেখান থেকে। তার বুকের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা, সরাসরি এই প্রথম সে বিধুশেখরের ইচ্ছার বিরুদ্ধতা করলো। তবে এই তো সবে শুরু। একটা মোহময় সুখও অনুভব করলো সে। যেন সে আজ বিধুশেখরের কাছে বিন্দুবাসিনীর ওপর অত্যাচারেরই শোধ নিল।

বৈঠকখানা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গঙ্গানারায়ণ সহিসদের ডেকে গাড়িতে ঘোড়া যুতবার হুকুম দিল। আজ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে ব্রাহ্ম ভক্তরা মিলিত হবে, গঙ্গানারায়ণের বন্ধু রাজনারায়ণ তাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছে সেখানে যেতে। ব্রাহ্মদের সঙ্গ গঙ্গানারায়ণের ভালো লাগে। এক সঙ্গে এত সুন্দর রুচি-সম্পন্ন বিদগ্ধ মানুষের সমাবেশ গঙ্গানারায়ণ আর কখনো দেখেনি।

রাজনারায়ণ তাকে অনেকবার বুঝিয়েছে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করবার জন্য। মনের দিক থেকে গঙ্গানারায়ণের কোনো বাধা নেই। সে শান্তি চায়। জ্ঞানমার্গী ধর্ম আলোচনায় ও সমাজ-সংস্কারের চিন্তায় নিযুক্ত রয়েছে ব্রাহ্মরা, তাদের সংসর্গে গঙ্গানারায়ণ বিশেষ উৎসাহবোধ করে। এক একবার তার ইচ্ছে জাগে, সব ছেড়ে-ছুড়ে ঐ কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

কিন্তু গঙ্গানারায়ণের জননী হয়তো গঙ্গানারায়ণের বারনারীগমনও মেনে নিতে পারবেন। গঙ্গানারায়ণের যদি সত্যিই বাসনা হয়, তা হলে সে অনায়াসেই একটি নিজস্ব রক্ষিতার সঙ্গে বিলাসে ডুবে থাকতে পারে, তার জন্য সে খুব সহজেই এস্টেট থেকে টাকা নিতে পারবে। অথচ গঙ্গানারায়ণ যদি ব্রাহ্ম হতে চায় তা হলে হুলুস্থুলু বেধে যাবে, বিম্ববতী হয়তো আত্মহত্যাই করে বসবেন। ব্রাহ্মরা ঠাকুর দেবতা মানে না একথা শুনে একদিন বিম্ববতী বলেছিলেন, কোনো ছেলে যদি অমন অনাছিষ্টি করে তবে তার মুখ দেখার চেয়ে তার বাপ মায়ের মরে যাওয়াই ভালো। গঙ্গানারায়ণ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, বিম্ববতী কানে আঙুল দিয়ে বলেছিলেন, না, বলিসনি, অমন কতা শোনাও পাপ। সেই দৃশ্য গঙ্গানারায়ণের মনে পড়ে। এই মাতৃদায় সে এড়াবে কী করে?

বাবু রামগোপাল ঘোষের গৃহে সন্ধ্যাকালে তাঁর বন্ধুরা এসেছেন। প্রায় প্রতি সায়াহ্নেই দু-একজন বন্ধু রামগোপাল ঘোষকে সান্নিধ্য দিতে আসেন, কিন্তু আজ অনেকদিন বাদে একসঙ্গে অনেক বন্ধুর পুনর্মিলন হলো।

এক সময় এঁরা "ইয়ং বেঙ্গল" নামে চিহ্নিত হয়ে প্রভূত অখ্যাতি ও কিছু খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন, এঁরা ছিলেন রক্ষণশীল সমাজের চক্ষুশূল, আবার

কিছু কিছু যুবক এঁদের অনুকরণ করতেও শুরু করেছিল। ডিরোজিও শিষ্য এই "ইয়ং বেঙ্গল" দল প্রথম প্রথম উন্মাদনা বশে নানা রকম উৎকট কান্ড করতেন। রাস্তায় কোনো টিকিধারী ব্রাহ্মণ দেখলে তাকে তাড়া করতে করতে বলতেন, "আমরা গোরু খাই গো, গোরু খাই!" সেই যুবকদের ছোঁয়ায় জাত চলে যাবার ভয়ে ব্রাহ্মণরা মুক্তকচ্ছ হয়ে দৌড়োতো। এই যুবকরা কখনো নিজেদের বাড়ির ছাদে উঠে চিৎকার করে প্রতিবাসীদের জানাতো, এই দ্যাখো আমরা মুসলমানের ছোঁয়া জল খাচ্ছি। এই দ্যাখো গো-মাংস! প্রমাণস্বরূপ তারা মাংসের হাড় ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিত চতুর্দিকে।

সে সব অনেকদিন আগেকার কথা। "ইয়ং বেঙ্গল" দলের কেউই আর এখন যুবক নন, তাঁরা এখন মধ্যবয়স্ক, সুস্থির দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নাগরিক। সকলেই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, কেউ কেউ সরকারী উচ্চকর্মে নিযুক্ত, কেউ বা ব্যবসায়ে ভাগ্য ফিরিয়েছেন। তবে প্রথম যৌবনের সেই বিদ্রোহের অগ্নি এখনো একেবারে নির্বাপিত হয়নি, তা যেন এখন অনেকটা প্রদীপের স্নিগ্ধ শিখা হয়ে এঁদের বক্ষে দেদীপ্যমান। প্রতিটি সামাজিক আন্দোলনেই এখনো এঁদের অনেককে এগিয়ে আসতে দেখা যায়।

এই গোষ্ঠীর মধ্যে বাবু রামগোপাল ঘোষ যেন মুকুটহীন রাজা হিসেবে স্বীকৃত। ইংরাজি শিক্ষিতদের মধ্যে তাঁকে প্রধান পুরুষ হিসেবে গণ্য করে লোকে মুখে মুখে তাঁর নাম দিয়েছে এজু-রাজ। সাহেবদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ইংরেজি বক্তৃতার সময় তাঁর মুখ দিয়ে যেন আগুনের ফুলঝুরি ছোটে। ইংরেজরাও তাঁর সম্পর্কে বলে, এক নতুন ডেমস্থেনিস।

রামগোপাল ঘোষ অতিশয় বন্ধুবৎসল মানুষ। এক সময় তিনি ছিলেন দরিদ্রের সন্তান, এখন বেসরকারী ইংরাজদের সঙ্গে যুগ্মভাবে বাণিজ্য করে তিনি প্রভূত ঐশ্বর্যশালী হয়েছেন কিন্তু বন্ধুদের আপদে কিংবা মনস্তুষ্টির জন্য তিনি অর্থব্যয় করতে কার্পণ্য করেন না। তাঁর বাড়ির সান্ধ্য আসরে শেরি ও শ্যামপেন থাকে অপর্যাপ্ত, কিন্তু এখানে কেউ নেশাগ্রস্ত হয়ে কুৎসিত আচরণ করে না, প্রত্যেকের নিজস্ব পরিমাপ আছে। সুরাপান এই আসরের মুখ্য ব্যাপার নয়, পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে আত্মোন্নতি ও জ্ঞান উপার্জনই এঁদের লক্ষ্য।

কার্য উপলক্ষে বন্ধুরা অনেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছেন, নিয়মিত দেখা হবার আর উপায় নেই, আজ অনেকদিন পর কয়েকজন প্রবাসী বন্ধুকে পাওয়া গেছে। রসিককৃষ্ণ মল্লিক এখন বর্ধমানের ডেপুটি কালেকটর, রামতনু লাহিড়ী কৃষ্ণনগর কলেজের শিক্ষক। সবচেয়ে বেশী দূরে থাকেন রাধানাথ সিকদার, তিনি দেরাদুনে সরকারের জরিপ বিভাগে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। পিতার গুরুতর ব্যাধির খবর পেয়ে রাধানাথ চলে এসেছিলেন কলকাতায়। তাঁর পিতা এখন একটু সুস্থ তাই তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ সুহৃদ প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে এসেছেন রামগোপাল ঘোষের বাড়ির সান্ধ্য আসরে।

বহুদিন পর বন্ধুদের কাছে এসে রাধানাথ খুশী হয়েছেন যতখানি, বিস্মিত হয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশী। এতখানি পরিবর্তন তিনি কল্পনাই করতে পারেননি। তিনি সবচেয়ে বেশী অবাক হয়েছেন এঁদের মুখের ভাষা শুনে। তাঁদের ছাত্রবয়েসে তাঁরা নিজেদের মধ্যে সব সময় ইংরাজিতে কথা বলতেন। বাংলা ভাষার কোনো স্থানই ছিল না প্রায়। নেহাৎ বাড়িতে বাবা মায়ের সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে হতো, কিন্তু জ্ঞান, চিত্তশুদ্ধি বা রসাস্বাদনের জন্য বাংলা ছিল অপাংক্তেয়। প্রবাসে থাকার সময় রাধানাথ বাংলা ভাষাকে জীবন থেকে বাদই

দিয়ে ফেলেছিলেন, এবার বাড়িতে এসে বাবার সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁর মুখ দিয়ে ভাঙা হিন্দী ও ইংরেজি বেরিয়ে আসছে বারবার। চেষ্টা করে বাংলা বলতে গেলেও সব কথা মনে আসে না। প্যারীচাঁদ এই নিয়ে তাঁকে ঠাট্টা করছিলেন! প্যারী, রামগোপাল, রসিক এঁরা ইংরেজিতে বিখ্যাত কৃতবিদ্য, অথচ আজ তাঁদের মুখেই বাংলা ভাষা? হঠাৎ এ দেশটার হলো কী, আবার কী লোকে ইংরাজি ভুলে গিয়ে অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে যাবে?

একটি গোল টেবল ঘিরে বসেছে বন্ধুরা। প্রত্যেকের কেদারার পাশে রয়েছে ধূমায়িত আলবোলা। ভৃত্যেরা টেবিলের ওপর সাজিয়ে দিয়ে গেছে গেলাস ও বিভিন্ন প্রকার সুরার বোতল, যার যেমন রুচি, সে নিজে ঢেলে নেবে। শুধু রামগোপালের সামনে একটি বিচিত্র আকৃতির পোর্সিলিনের পাত্র। পাত্রটি গোল, তার একদিক দিয়ে হাতির শুঁড়ের মতন একটি ছোট্ট নল বেরিয়ে আছে। সেখান থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া বেরুচ্ছে। সকলেই কৌতূহলী হয়ে সেদিকে তাকিয়ে।

রামগোপাল মৃদু হেসে বললেন, ইউ পোর ইয়োর ড্রিঙ্কস, মাই ডিয়ার ফেলোজ, আমি আগে একটু উষ্ণ পানীয় পান করবো। ইদানীং এইটি পান করা আমার অভ্যাস হয়ে গেচে।

একটি হাতলযুক্ত গোল পোর্সিলিনের বাটিতে রামগোপাল খানিকটা কালো রঙের উষ্ণ তরল পদার্থ ঢাললেন, তারপর তার সঙ্গে তিন চামচ দুধ ও তিন চামচ চিনি মিশিয়ে গুলতে লাগলেন। মিশ্রণ কার্যটি সমাপ্ত হলে রামগোপাল বাটিটি সাবধানে ওষ্ঠের কাছে এনে সুরুৎ করে ছোট্ট একটি চুমুক দিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে বললেন, আহ!

রাধানাথ সিকদার আর কৌতূহল চাপতে না পেরে বলে উঠলেন, হোয়াট ইজ দ্যাট স্ট্রেঞ্জ কনককশান?

রামগোপাল পরিহাসের সঙ্গে বললেন, দিস ইজ মাই ফেভারিট পয়জন। একটু স্বাদ নিয়ে দেখবে নাকি?

রসিককৃষ্ণ বললেন, দিস ইজ টি। রাধানাথ, তুমি চায়ের কথা শোনো নাই? আগে চীন দেশ থেকে এ বস্তু আসতো, এখন আমাদের আসামেই যথেষ্ট হচ্চে!

রাধানাথ অনেকদিন দেশ ছাড়া বলে চা কথাটা জানেন না, তবে টি-এর কথা কাগজে-পত্রে পড়েছেন, কোনোদিন চর্মচক্ষে দেখেননি। তাঁদের দেরাদুনে নানা রকম মদ্যের ছড়াছড়ি, সেখানে উষ্ণ পানীয় বলতে চলে শুধু ভেড়ার দুধ।

প্যারীচাঁদ মদ্যপান করেন না, তাঁর আসক্তি ধূমপানের দিকে। তিনি বললেন, আমি একটু চেখে দেখতে রাজি আছি। ইংরেজ মহলে আজকাল চা পান খুব চলচে শুনিচি।

রামতনু বললেন, আমি হেয়ার সাহেবকেও ঐ জিনিস পান করতে দেকতুম। তবে ওতে মাদকদ্রব্য বোধহয় কিছু নেই। কারণ, হেয়ার সাহেব নেশা ভাঙ করার বিরোধী ছিলেন।

শিবচন্দ্র বললেন, নেশা না হলে আর ও জিনিস পান করা কেন?

রামগোপাল দ্বিতীয় একটি বাটিতে প্যারীচাঁদের জন্য চা ঢালতে ঢালতে বললেন, নেশা হয় বৈকি। এর এক চুমুকেই পঞ্চেন্দ্রিয়ে একটা অ্যালার্টনেস এসে যায়। লাইক কিসিং এ ড্যামজেল...অ্যান্ড ইউ ওয়ান্ট টু কিস এগেইন...এই নাও প্যারী, আজ আমি তোমায় এই নতুন সুধারসে দীক্ষা দিলুম।

প্যারীচাঁদ প্রথমে খানিকটা ইতস্তত করলেন। বাটিটি হাতে নিয়ে তাকালেন একবার বন্ধুদের দিকে। ঠোঁট পুড়ে যাবার ভয়ে ফুঁ দিলেন কয়েকবার। তারপর কোনোক্রমে একটি চমুক দিয়েই মুখ বিকৃত করে ফেললেন। পানীয়টি তাঁর পছন্দ হয়নি। রামগোপাল কোন সুখে এ জিনিস খাচ্ছেন? রামগোপাল তাঁর সংগে কৌতুক করার জন্য সত্যিই বিষাক্ত কিছু দেননি তো? রামগোপালের কথাই আলাদা, তিনি বেপরোয়া ধরনের মানুষ, কোনো কিছুতেই ভয় পান না। প্রায়ই তিনি কথায় কথায় বলেন, আই বেয়ার এ চার্মড লাইফ।

রামগোপাল জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্রাদার, কেমন লাগলো?

প্যারীচাঁদ বললেন, একটু তিক্ত, একটু কষায়।

বন্ধুরা সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন।

রামগোপাল প্যারীচাঁদের বাটিতে আরও খানিকটা চিনি মিশিয়ে দিয়ে বললেন, এবার দ্যাখো তো!

প্যারীচাঁদ সভয়ে আবার চুমুক দিলেন। এবার তাঁর মুখ হাসিতে ভরে গেল, তিনি বললেন, বাঃ, দিব্য অপূর্ব, স্বাদটা যেন একেবারে বদলে গেল!

রামগোপাল জিজ্ঞেস করলেন, কেমন, শরীরে বেশ একটা চনমনে ভাব হয়নি?

প্যারীচাঁদ বললেন, বিলক্ষণ!

রামগোপাল আবার জিজ্ঞেস করলেন, মনে হয় না আবার চুম্বন করি, আবার, আবার?

প্যারীচাঁদ বললেন, নিশ্চয়! ভাই আমি বলি কি, এবার থেকে আমরা এই বস্তুই পান করবো। শুধু শুধু সুরা পান করে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করা কেন? সর্বনাশিনী সুরা যে এ দেশটাকে ছারখার করে দিচ্চে।

বন্ধুদের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এতক্ষণ নীরব ছিলেন। সম্প্রতি বর্ধমান রাজ পরিবারের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, আইন বিষয়ক পরামর্শের উপলক্ষে সেখানকার বিধবা রাণী তাঁকে ঘন ঘন ডাক পাঠাচ্ছেন। মাঝে মাঝে সেই অপরূপ সুন্দরী রাণী এমন বিহ্বলভাবে চেয়ে থাকেন তাঁর দিকে যাতে মনে হয় শুষ্ক আইনের চেয়েও আইন উপদেষ্টা মানুষটির প্রতিই তাঁর আকর্ষণ বেশী। সেই অপ্সরাতুল্যা রমণীর দিকে দৃষ্টিপাত করে দক্ষিণারঞ্জনেরও মস্তক ঘূর্ণিত হয়। দূরে থাকলেও সর্বক্ষণ মনে পড়ে সেই মুখ। একথা আর কারুকে বলা যায় না।

দক্ষিণারঞ্জন ফটাস শব্দে একটি শ্যাম্পেনের কর্ক খুলে নিজ পাত্রে খানিকটা ঢেলে বললেন, তোমরা চা পান করতে চাও করো, আমি এ জিনিসে মজেচি, আমি ছাড়চি না। সুরা পানে সর্বনাশ হয় মূর্খদের। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সুরা পান করলে তাদের চিন্তাশক্তির আরও বিকাশ হয়।

রাধানাথ বললেন, আই এগ্রি উইথ ইউ, দক্ষিণা! এই ফিলদি লুকিং লিকুইড নিয়ে তুমলোগ কিঁউ ইতনা শোর মচাতা, দ্যাট আই ক্যান নট আণ্ডারস্ট্যাণ্ড!

শিবচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, শোর মচাতা? তার মানে কী ভাই?

প্যারীচাঁদ বললেন, আমাদের রাধানাথ বাংলা একেবারে ভুলে গ্যাচে। বাবাকে বলে পিতাজী আর জলকে বলে পানি।

রাধানাথ রাগতভাবে বললেন, অ্যাণ্ড ইউ...তোমরা...তোমরা তোমরা যে অচানক বাংলা-লাভার হয়ে যাবে, হাউ কুড আই নো দ্যাট? ইন আওয়ার কলেজ ডেইজ ইউ অল ইউজড টু হেট দিস ল্যাংগোয়েজ।

প্যারীচাঁদ বললেন, ভাই, তারপর...এই সময়ের মধ্যে যে বাংলা ভাষা অনেক

বদলে গ্যাচে...আমরা তখন ভাবতুম বাংলা ভাষায় কোনো মহৎ ভাব প্রকাশ করা যায় না...কিন্তু এখন এই ভাষায় এমন অনেক ভালো ভালো লেখক এয়েচেন।

রামগোপাল বললেন, তুমি তত্ত্ববোধিনী কাগচ দেখোচো? আমি আগে কক্ষণো বাংলা পড়তুম না, আমার ঘৃণা হতো, কিন্তু একদিন একখানা তত্ত্ববোধিনী কাগচ আসবার পর আমি চমকিত হয়ে গেচি। তুমি দেখবে, দেখবে সেই কাগচ?

রসিককৃষ্ণ বললেন, দেবেন্দ্র ঠাকুর, অক্ষয় দত্ত এঁরা উচ্চ চিন্তার কথা লিকচেন বাংলা ভাষায়, সে প্রোজ কার্লাইল বা মিলের চেয়ে কোনো অংশে হীন নয়।

প্যারীচাঁদ বললেন, কেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে এক বামুন পন্ডিত একখানা বই লিকেচেন, সে তো রীতিমতন সাহিত্য হে। রামগোপাল, তোমার কাচে নেই সে বইখানা? একবার রাধানাথকে দেখাও না।

রামগোপাল তখুনি উঠে গিয়ে নিয়ে এলেন সেই বই। "বেতাল পঞ্চ বিংশতি", ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। বইখানা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলেন রাধানাথ ও অন্যান্য বন্ধুরা। প্যারীচাঁদ বললেন, আমি এখানা থেকে একটু পড়ে শোনাবো? শুনবে?

প্যারীচাঁদ পড়তে লাগলেন, "ধর্মপুরে গোবিন্দ নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁহার দুই পুত্র তন্মধ্যে একজন ভোজন বিলাসী অর্থাৎ অন্নে ও ব্যঞ্জনে যদি কোনও দোষ থাকিত তাহা দুর্জ্ঞেয় হইলেও ঐ অন্নের ও ঐ ব্যঞ্জনের ভক্ষণে তাহার প্রবৃত্তি হইত না দ্বিতীয় শয্যা বিলাসী অর্থাৎ শয্যায় কোনও দুর্লক্ষ্য বিঘ্ন ঘটিলেও সে তাহাতে শয়ন করিতে পারিত না এই এক এক বিষয়ে তাহাদের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল ঈদৃশ বিস্ময়জনক ক্ষমতার বিষয় তত্রত্য নরপতির কর্ণগোচর হইলে তিনি তাহাদের ঐ ক্ষমতার পরীক্ষার্থে সাতিশয় কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন এবং উভয়কে রাজধানীতে আনাইয়া জিজ্ঞাসিলেন তোমরা কে কোন বিষয়ে বিলাসী..."

পড়া থামিয়ে প্যারীচাঁদ জিজ্ঞেস করলেন, কেমন, এমন সুললিত অথচ সুগম্ভীর বাংলা ভাষা তোমরা আগে শুনোচো কি? এই ভাষা কি অবজ্ঞার বস্তু?

একমাত্র রাধানাথ ব্যতীত আর সকলেই উচ্চ প্রশংসা করলেন। দক্ষিণারঞ্জন বললেন, রচনাটি তো সুন্দর বটে কিন্তু এমন বই কিনবে কে? বাংলা ভাষার গ্রন্থ ভদ্রশ্রেণীর লোকেরা কিনতে চাইবে কি?

প্যারীচাঁদ বললেন, আমি শুনিচি, বইটি প্রকাশ হওয়া মাত্র বেশ একটি শোরগোল পড়ে গ্যাচে। মার্সাল সাহেব ফোর্ট উইলিয়াম কালেজের জন্য এই বই একশো কাপি কিনে নিয়েচেন, পাঠকরাও এ বই কেনার জন্য হুড়োহুড়ি কচ্চে। লোকের মুখে মুখে রটে গ্যাচে যে এখানিই বাংলায় প্রথম সাহিত্য পদবাচ্য গ্রন্থ। এর লেখক ঈশ্বরচন্দ্র সম্পর্কেও লোকের দারুণ কৌতূহল।

রাধানাথ বেশ বিমূঢ় বোধ করলেন। দেবেন্দ্র ঠাকুর, অক্ষয় দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—এইসব ব্যক্তিদের তিনি নামও শোনেননি আগে। তবু দেবেন্দ্র ঠাকুর না হয় বোঝা গেল বিখ্যাত দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ সন্তান, কিন্তু অক্ষয় দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—এই সব অজ্ঞাতকুলশীলরা কারা?

রাধানাথ প্যারীচাঁদকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি এঁদের চেনেন কি না।

প্যারীচাঁদ কলকাতার পাবলিক লাইব্রেরির ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান, নবীন লেখকদের সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ থাকবেই। তিনি বললেন, এই ঈশ্বরচন্দ্র কিছুদিন

সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ছিলেন, সেই সময় ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। রাগ করে এখন চাকরি ছেড়ে দিয়ে বই লিকচেন। আমি কিন্তু ওঁকে দেখেই বুঝিছিলুম, ঐ মানুষটির ভেতরে আগুন আচে। দেবেন্দ্র, অক্ষয়-কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র এঁরা সবাই আমাদিগের চেয়ে বয়েসে ছোট, তবু আমি বলবো, এঁরা দেশের জন্য বড় কাজ কচ্চেন।

রামগোপাল বললেন, সে-কথা ঠিক। দেবেন্দ্রবাবু ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করে দেশের মহদুপকার কচ্চেন। ইয়াং ম্যানরা যে দলে দলে ক্রিশ্চান হচ্ছিল, তা অনেকটা বন্ধ হয়েচে।

রাধানাথ জিজ্ঞেস করলো, এই ব্রাহ্মধর্ম ব্যাপারটা...ক্যান ইউ এক্সপ্লেইন টু মী থরোলি? খুব শুনচি।

প্যারীচাঁদ বললেন, সে আমি তোমায় পরে বুঝিয়ে বলবো। এঁরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুধর্মের ওপর একটা আঘাত হেনেচেন।

দক্ষিণারঞ্জন বললেন, সে আঘাত আমরাই কি আগে হানিনি? সব কৃতিত্ব এঁদের দিচ্চো কেন? হিন্দু গোঁড়ামির বিরুদ্ধে আমাদের রসিককৃষ্ণের চেয়ে বড় কথা এ পর্যন্ত কে বলেচে?

ছাত্রাবস্থায় রসিককৃষ্ণ মল্লিক একটি কাণ্ড বাধিয়ে কলকাতা শহরে তথা হিন্দু সমাজে দারুণ আলোড়ন তুলেছিলেন। কোনো এক মামলায় সুপ্রিম কোর্টে তাঁকে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়েছিল। প্রত্যেক সাক্ষীকে আগে শপথ গ্রহণ করতে হয়, একজন ওড়িশা দেশীয় ব্রাহ্মণ একখানি তাম্রকুণ্ডে তুলসী ও গঙ্গাজল নিয়ে সাক্ষীর সামনে এনে ধরে, সাক্ষী সেটা স্পর্শ করে বলে আমি সত্য বই মিথ্যা বলিব না। রসিককৃষ্ণের সামনে সে রকম তাম্রকুণ্ড এনে ধরা হলে তিনি সেটি স্পর্শ না করে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। বিচারপতি যখন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি শপথ লইতেছেন না কেন? তখন রসিককৃষ্ণ গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, আমি গঙ্গা জলের পবিত্রতা মানি না। ইণ্টারপ্রেটার অমনি চেঁচিয়ে অনুবাদ করে জানালো, সাক্ষী বলছে, "আই ডু নট বিলিভ ইন দি সেক্রেডনেস অব দি গ্যাঞ্জেস।" অমনি আদালতে উপস্থিত হিন্দুরা কানে আঙুল দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। হুলস্থুল পড়ে গেল শহরে, অনেকেই মনে করলো, এই বুঝি ঘোর কলি উপস্থিত, হিন্দুর ছেলে প্রকাশ্যে বলছে গঙ্গা মানে না! তাই নিয়ে সংবাদপত্রে কত লেখালেখি।

দক্ষিণারঞ্জনের কথা শুনে রসিককৃষ্ণ বিনীত লাজুকভাবে বললেন, সে পুরোনো কথা ছাড়ো। আমরা তো সংঘবদ্ধভাবে হিন্দু ধর্মের সংস্কারের জন্য কিছু করিনি, এনারা কচ্চেন।

অতি স্বল্পভাষী রামতনু লাহিড়ী এবার বললেন, তা ঠিক বটে, কিন্তু ব্রাহ্মদের একটা জিনিস আমার পছন্দ হচ্চে না। এঁরা খৃষ্টানদের খুব গালাগাল কচ্চেন। সেটি উচিত হয় না। আমরা সত্যের উপাসক। যে-ধর্মের মধ্যে যে-টুকু সত্য রয়েচে, তা গ্রহণ করাই ধর্মসম্মত। সত্যের অনুসন্ধানের জন্য সবার মন মুক্ত থাকা দরকার।

দক্ষিণারঞ্জন বললেন, খৃষ্টানরাও আমাদের কম গাল দেয় না। ওদের মতে তো হিন্দুধর্ম ধর্মই নয়।

প্যারীচাঁদ বললেন, খৃষ্টানদের মধ্যেও কুসংস্কারগ্রস্ত অনেকে রয়েচে। তাদের জবাব দিতে গিয়ে আমরাই বা কেন কুসংস্কারের আশ্রয় লবো?

রামগোপাল বললেন, ব্রাহ্মদের অনেক কিছুই ঠিক, কিন্তু ওনারাও তো

জাতির পাঁতি ছাড়েননি। সবাই এক ধর্মের উপাসক, অথচ কেউ পৈতেধারী, কেউ বেদ পাঠে অনধিকারী, এ আবার কেমন কথা?

রামতনু বললেন, ওনারা তত্ত্ববোধিনী কাগচে লিকচেন যে বেদ অভ্রান্ত ঈশ্বর বাণী, অথচ অনেকেই তা মনে মনে বিশ্বাস করেন না। এ তো কপটতা। এই জন্য আমি আর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক রবো না ঠিক করিচি।

রামগোপাল বললেন, তনু, তনু, তুমি এত উত্তেজিত হচ্ছো কেন? তত্ত্ব-বোধিনীতে পাঠ্য বিষয় আরও অনেক কিছু থাকে।

রসিককৃষ্ণ বললেন, এসব আলোচনা থাক। এবার ডেভিড হেয়ারের স্মৃতি-সভায় কে কে বক্তৃতা দেবেন, তা ঠিক করে ফেলো। ১লা জুন তো এসে গেল। রাধানাথ, তুমি যখন এখানে আচো, তুমিই এবার কিছু বলো না!

রাধানাথ বললেন, স্পীচ কি বাংলায় ডেলিভার কত্তে হবে নাকি?

প্যারীচাঁদ হেসে বললেন, না, না, তুমি ইংরেজিতেই বলো। কিন্তু বাংলাটা এবার শিখে নাও। ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিরা এখন আর বাংলাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে না। এ দেশের শিক্ষা বিস্তারের জন্য বাংলা ভাষাকেই অবলম্বন কত্তে হবে। বিশেষত যদি স্ত্রীলোকদের শিক্ষা দিতে হয়।

রাধানাথ চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি ফিমেল এডুকেশানের কথা থিংক কচ্চো? এ দেশে তা পসিব্‌ল্?

দক্ষিণারঞ্জন বললেন, কেন সম্ভব নয়? নারীদের আমরা কতকাল অন্ধকারে রাখবো?

এমন সময় গৃহের বাইরে পথে একটা বিষম হট্টগোল শোনা গেল। নানান কণ্ঠের উত্তেজিত আওয়াজ ছাড়িয়েও শোনা যাচ্ছে কয়েকটি কণ্ঠের কান্না। কৌতূহলী হয়ে সকলে এসে দাঁড়ালেন দ্বিতলের নিকটস্থ অলিন্দে।

ব্যাপারটা অবশ্য এমন কিছু অভিনব নয়। একটি মৃতদেহকে বহন করে নিয়ে চলেছে শ্মশানযাত্রীরা, সঙ্গে অনেক লোকজন। গ্রীষ্মের এই মাঝামাঝি সময়ে শহরে মৃত্যুর সংখ্যা খুবই বেড়ে যায়, ওলাউঠোর প্রকোপ এই সময়ই বেশী হয়। দিনরাতই পথে শোনা যায় হরিধ্বনি, তবে সন্ধ্যার পর শ্মশানযাত্রীদের কণ্ঠে এই হরিধ্বনি পরিণত হয় গর্জনে। মাতাল ও গেঁজেলরা নেশার দ্রব্য সংগ্রহের আশায় এ-গলি ও-গলিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ গা, আজ কেউ মলো? আজ কেউ মলো? আমরা শ্মশানবন্ধুরা যে বৃথা বয়ে যাচ্চি গো।

মৃতদেহের পিছনে পিছনে একটি দশ-এগারো বছরের বালিকা এক একবার মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে, কিছু লোকজন তাকে ধরে তোলবার চেষ্টা করতেই সে মৃগীরোগীর মতন ছটফটিয়ে আবার ছিটকে পড়ছে মাটিতে। বালিকাটির মুখ-খানি সিঁদুরে মাখামাখি। খোলা চুল ধুলোয় ধূসর। মেয়েটি আর একবার মাটিতে গড়াতেই দুজন বলশালী লোক তাকে দুদিক থেকে শূন্যে তুলে বহন করে নিয়ে চললো।

রামগোপাল এবং তাঁর বন্ধুদের ধারণা হলো যে ঐ লোকগুলি ঐ বালিকাটিকে বলপ্রয়োগ করে নিয়ে যাচ্ছে। শ্মশানে স্ত্রীলোকদের নিয়ে যাবার প্রথা তো ইদানীং আর নেই। অন্য কোনো আশঙ্কার কথা মনে পড়ে।

ওঁরা সকলে তরতর করে নীচে নেমে এলেন। বালিকাটিকে যদি জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়, তা হলে ওঁরা প্রতিরোধ করবেন। আইনগতভাবে নিষিদ্ধ করা

সত্ত্বেও এখনো গ্রাম দেশ থেকে মাঝে মাঝেই সতীদাহের কথা কানে আসে। কলকাতাতেও সেরকম ঘটনা বিচিত্র কিছু নয়।

রামগোপাল সেই বালিকা-বহনকারী দুই ব্যক্তির মধ্যে একজনের গতি রোধ করে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, একে আপনারা কোথায় নিয়ে যাচ্চেন?

সেই ব্যক্তি রুক্ষ স্বরে বললো, জাহান্নামে।

তখন রামগোপালের সব বন্ধুরাও তাকে ঘিরে দাঁড়ালেন এবং ক্রুদ্ধ রাধানাথ লোকটিকে মারবার জন্য উদ্যত হলেন। তখন লোকটি বললো, মশায়, করেন কী, করেন কী? এ মেয়েটি পাগল হয়ে গ্যাচে।

রামগোপাল বললেন, তোমরা আগে ওকে ছেড়ে দাও, তারপর আমি দেকচি ও কেমন পাগল।

প্যারীচাঁদ বললেন, এখুনি কোতোয়ালিতে সংবাদ দেবো!

দ্বিতীয় লোকটি বললো, আরে খেলে যা! আপনারা কী ভাবচেন আমরা ওকে জোর করে নিয়ে যাচ্চি? এ পাগলি কিছুতেই বাড়িতে রইবে না। আমরা কতবার ঠেলে ঠেলে দিয়ে এলুম—ওর স্বোয়ামী মারা গ্যাচে, বাড়িতে আর মেয়েমানুষ কেউ নেই, আমরা ওকে কী করে আটকাই বলুন!

রামগোপাল বালিকাটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন শ্মশানে যাচ্চো?

বালিকাটির চোখ সত্যিই উন্মাদের মতন। সে তীব্রস্বরে বললো, মর্তে যাচ্চি! মর্তে! তুমি কে গা!

রামগোপাল বললেন, তুমি কেন মরবে?

মেয়েটি বললো, বেশ করবো!

শ্মশানযাত্রীর দল থেমে গেছে, আরও কিছু পথ চলতি উটকো লোক ভিড় জমিয়েছে সেখানে। আর মেয়েটি ক্ষ্যাপাটে গলায় চিৎকার করছে, আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও, আমি মর্বো! মর্বো!

প্যারীচাঁদ বললেন, কোতোয়ালিতে খবর দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমি যাচ্চি।

শ্মশানযাত্রীরা ভয় পেয়ে গেছে। তারা বললো, ও মশাই, আমাদের কী দোষ দেকলেন! এ মেয়ে যে নিজেই যেতে চায়। এক কাজ করুন না, আপনারা ভদ্দর-লোক, এ মেয়েটিকে আপনাদেরই বাড়িতে আটকে রাখুন না হয়।

রামগোপাল বললেন, সেই ভালো। এই মেয়েটিকে আমার বাড়ির মধ্যে আনো, স্ত্রীলোকদের কাছে ওকে পাঠিয়ে দিচ্চি।

মেয়েটি কিছুতেই আসবে না, সুতরাং জোর করেই তাকে আনতে হলো ভেতরে। সে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলো, ওগো আমার কেউ নেই, আমায় মর্তে দাও, আমায় শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে, ওগো, আমায় ছেড়ে দাও।

অন্দরমহলে রেখে আসা হলো মেয়েটিকে। শ্মশানযাত্রীরা আবার নতুন উৎসাহে হরিধ্বনি তুলতে তুলতে চলে গেল।

রামগোপাল এবং তাঁর বন্ধুরা কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে দ্বিতলে উঠে এসে বসলেন টেবিলে। প্যারীচাঁদ ব্যতীত প্রত্যেকেই নিজের নিজের পাত্রে ঢেলে নিলেন সুরা।

প্যারীচাঁদ বললেন, রামমোহনের আনুকূল্যে সতীদাহ রদ হয়েচে বটে কিন্তু তার সুফল পাওয়া গেল কতটুকু? এই সব বালবিধবাদের ভবিষ্যৎ কী? নয় দশ বছরের বালিকারা বিধবা হয়ে সারা জীবন গলগ্রহ হয়ে থাকবে...সেইজন্যই বলচিলুম এদের শিক্ষার ব্যবস্থা না করলে...

রামগোপাল মুখ তুলে গম্ভীরভাবে বললেন, শুধু শিক্ষার ব্যবস্থা করলেই হবে না, এই সব বিধবাদের বিবাহেরও ব্যবস্থা করতে হবে।

দক্ষিণারঞ্জন বললেন, ঠিক কথা।

শিবচরণ বললেন, তা হলে কি এই সব বিধবাদের ক্রিশ্চিয়ান হতে বলছো?

রসিককৃষ্ণ বললেন, ক্রিশ্চিয়ান হোক, মুসলমান হোক, এদের যে-কোনো প্রকারে বিবাহের ব্যবস্থা করা দরকার।

রামগোপাল বললেন, না, তা কেন?

শিবচরণ বললেন, হিন্দু বিধবাদের বিবাহ? সে যে অসম্ভব কথা। ব্রাহ্মরাও এমন সাহস করেছেন বলে তো শুনিনি। এমন কথা সমাজে কে উত্থাপন করবে? আমরা এ বিষয়ে অগ্রসর হতে পেরেচি কতটুকু?

রামগোপাল বললেন, তা জানি না। তোমরা আজ স্বচক্ষে দেখলে তো এই মেয়েটির অবস্থা। এই সব দুঃখিনী মেয়েদের দুঃখ দূর করার জন্য কেউ যদি এঁদের বিবাহ আইন-সিদ্ধ করতে পারে, তবে আমি সর্বতোভাবে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবো।

রাধানাথ ইংরেজিতে বললো, তোমরা এসব কী বলিতেছ হে! তা হলে তো আমাকেও শীঘ্রই কলকাতায় বদলি হইয়া আসিতে হয়।



হীরেমণির বাড়িতে এসে জগমোহন সরকার কেঁদে একেবারে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছেন। নেশাটি বেশ জমেছে, রাত্রিও গভীর, এই সময় জগমোহনের হঠাৎ দেশের মানুষের দুঃখ কষ্টের কথা মনে পড়ে যায়, হৃদয়টা উথালি পাথালি করে। বিশেষত অবলা জাতির অসহায় অবস্থা দূর করার জন্য আজও কিছু করা গেল না! অবলারা এখনো অবোলাই রয়ে গেল! জগমোহন সরকার ফিমেল উদ্ধারের জন্য সেই কবে থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছেন, কিন্তু কেউ তাঁকে মদৎ দিল না। হেয়ার সাহেব মারা যাবার পর সব ধামা চাপা পড়ে গেছে আবার। জগমোহন সরকার মেয়েদের ইস্কুল খোলবার জন্য নিজে জায়গা দিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু ছাত্রী পাওয়া যাবে কোথা থেকে? পাড়াপড়শীরা কেউ রাজি নয়। সবাই ওকথা শুনে হেসে উড়িয়ে দেয়, কেউ কেউ আবার দাঁত কিড়মিড় করে।

জগমোহন সরকার শুনেছেন যে বারাসতে নাকি মেয়েদের জন্য স্কুল খোলা হয়েছে একটি। উত্তরপাড়ার রাজা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও স্ত্রীশিক্ষার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন, অথচ এত বড় শহর কলকাতা, সেখানে ভদ্র হিন্দু পরিবারের মেয়েদের পড়াশুনোর কোনো ব্যবস্থা এখনো হলো না! সাহেব মেমরা এর আগে যে-কয়েকটা স্কুল খুলেছে, সে সব জায়গাতেই শুধু কচি কচি মেয়েদের ভুলিয়ে ভালিয়ে খৃষ্টান করে নেওয়া হয়েছে। যীশু-ভজনা না করলে নাকি লেখাপড়া হয় না। কলকেতায় প্রথম অ-খৃষ্টানী বিদ্যালয় স্থাপনের কৃতিত্ব জগমোহন নিতে চান।

জগমোহন সরকার বারাঙ্গনা গৃহে কখনো ইয়ার-বক্সিদের নিয়ে আসেন না।

এসব জায়গায় তিনি গোপনে একা আসাই পছন্দ করেন। তাঁর ধারণা, তাঁর নিজস্ব কোচম্যান এবং এক অতি বিশ্বস্ত ভৃত্য ছাড়া তাঁর এই অভিযানের কথা আর কেউ জানে না।

জগমোহন বললেন, বুঝলি হীরে, এতখানি জম্মো আমার ব্রেথাই গেল, কিছুই করতে পারলুম নিকো...ওফ্...ওফ্।

লাল মখমলে মোড়া জাজিমের ওপর হীরেমণি বসে আছে জগমোহনের মুখোমুখি। জগমোহনের এমন স্বভাবের কথা সে ভালোভাবেই জানে। এই বিশালবপু বাবুটির দুটি বিচিত্র অভ্যেস আছে। প্রথমে ঘরে ঢুকেই তিনি বেশ জোরে একটি উদ্গার তুলবেন। এইটিই যেন তাঁর তৃপ্তির লক্ষণ। তারপর সুরা পান শুরু করার পরও এইরকম উদ্গার চলতেই থাকবে। সুরাপানের সময় এমন অ্যাও অ্যাও শব্দে ঢেঁকুর তুলতে আর কারুকে দেখেনি হীরেমণি। আর শেষের দিকে এই কান্না। জগমোহন সরকারের কান্না শুনলেই হীরেমণি বুঝতে পারে যে আর আধঘণ্টার বেশী ওঁর চৈতন্য থাকবে না।

হীরেমণি ছোট্ট একটি হাই গোপন করে বললো, আপনি অ্যাত কিছু করেচেন, অ্যাত বাড়ি, গাড়ি, বিষয় সম্পত্তি—

জগমোহন হীরেমণির হাত চেপে ধরে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে বললেন, ওরে তাতে কী হয়, তাতে কী হয়...এই তো গ্যালো মাসেই আর একটা বাড়ি কিনলুম, কিন্তু বিষয় সম্পত্তি সবই তো মায়া প্রপঞ্চ...কিছুই সঙ্গে যাবে না।

হীরেমণি বললো, আপনি দানধ্যানও কম করেননি—

জগমোহন হীরেমণিকে আরও কাছে টেনে এনে বললেন, কার্পণ্য করিনি, যে যা চেয়েচে দিয়িচি...তোকে দিইনি, বল? দিইনি?

—তা দিয়েচেন বইকি! সে কতা স্বীকার না করলে আমার পাপ হবে।

—গ্যালো হপ্তাতেই তোকে এক জোড়া কঙ্কণ দিলুম, আমাদের বাড়ির সুরো দাসীকে একটা আংটি দিয়িচি, কমলাকে দিয়িচি একছড়া চন্দ্রহার—

—এখন বুঝি কমলার ওপর খুব মন মজেচে?

—ওরে সে মাগী বড় দেমাকী। বড় দেমাকী! তোকে কী বলবো! রামকমল সিংগী মরে ভূত হয়ে গেল কবে, আর এখনও সে মাগী বেধবা সেজে ঢং করে আচে। নাক নেই তার নথ, বেশ্যা আবার বেধবা! হুঁঃ!

কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে হীরেমণি নিজেকে জগমোহনের আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বললো, কমলার ওপরেই যখন এত টান, তবে আর আমার কাচে আসা কেন?

জগমোহন তাকে নিবিড় করে টেনে এনে বললেন, ওরে কমলি আলায়দা আর তুই আলায়দা। তোর মতন গান কমলি গাইতে পারবে? কমলির গায়ের রং কালো আর তোর যেন দুধে আলতা। আমি তো পেয়ার করি তোকেই। তবু কমলিকে কেন চাই জানিস? সে ছেল রামকমল সিংগীর মতন একজন বড়মানুষের বাঁধা মেয়েমানুষ, রামকমল সিংগী মারা গ্যাচে, এখন তার মেয়েমানুষকে কে নেবে এই নিয়ে যে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গ্যাচে শহরে। বুঝলি নে, রামকমল সিংগীর মেয়েমানুষকে যে নিতে পারবে তার কতটা মান বাড়বে? আমি ওর বাড়িতে প্রথমে একছড়া চন্দ্রহার পাটালুম, তা বেশ নিয়ে নিলে। ওমা, তারপর আর আসেই না, আসেই না। দুটো অন্য মাগীকে জুতে দিলে আমার সঙ্গে। সে দুটো যেন আশ-

শ্যাওড়া গাচের পেত্নী! আমি বললুম, কমলাকে ডাকো, তার সঙ্গে দুটো কতা কইবো, তা সে পেত্নীরা বলে কিনা উনি তো আসবেন না, আজ যে ওনার একাদশী!...শোন্ কতা! এমন কতা শুনলে গা পিত্তি জ্বলে যায় না?

এতক্ষণ একটু কান্নাটা থেমেছিল আবার ফুঁপিয়ে উঠে হীরেমণির বুকে মুখ গুঁজে জগমোহন বলতে লাগলেন, তুই বল হীরে, এটা কী ওর উচিত কাজ হয়েচে? আমার মতন একটা মানী লোককে ফিরিয়ে দিলে? উফ্ উফ্!

হীরেমণি আদর করে জগমোহনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো, আহা গো, মনে বড় নেগেচে, দুঃখু করো না, দুঃখু করো না, ঐ গতরখাগী শতেক খোয়ারি কমলি ঠিক একদিন তোমার পায়ে এসে লুটোবে—

—ওর থোতামুখ যদি ভোঁতা করে না দিতে পারি, তাহলে আমার নাম জগমোহন সরকার নয়। আমি জানি ব্যাচা মল্লিকও ঐ কমলির কাছে ঘুরঘুর কচ্চে! ব্যাচা মল্লিক আমার ওপর টেক্কা দেবে!

—ব্যাচা মল্লিক তোমার নোখের যুগ্যি নয়!

—তুই বল হীরে, তুই বল, ব্যাচা মল্লিকের নাম ক'জনা জানে? সাহেবদের কাচে সুদ খাটিয়ে ওর বড় টাকার গরমাই হয়েচে! আমি কাগচে আর্টিকেল লিকি, দেশের জন্য এত কাজ কচ্চি, আর ঐ কম্‌লি ছুঁড়ি আমায় না পুঁচে ব্যাচা মল্লিককে পুঁচবে!

—কক্ষণো না।

—তুই দেকিস কম্‌লি, আহা কম্‌লি কি বললুম, হীরে, তুই তো আমার আসল হীরেমণি, আর ঐ কমলিটা ঝুটো মুক্তো! তুই দেকিস, আমি বালিকা বিদ্যালয় খুলে দেশে অক্ষয় কীর্তি রেকে যাবো।

—কী খুলবেন?

—ইস্কুল, মেয়েদের জন্য ইস্কুল—

—ইস্কুল? তাহলে সেখেনে আমার ছেলেটাকে ভর্তি করে নিন গো!

জগমোহন সরকার ধড়ফড় করে উঠে বসে বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে বললেন, 'ছেলে? তোর আবার ছেলে হলো কবে?'

হীরেমণির মুখ থেকে কথাটা হঠাৎ বেরিয়ে গেছে। বারাঙ্গনাদের পুত্রসন্তান থাকতে নেই, থাকলেও বাবুদের সামনে তার কথা উচ্চারণ করা চলে না।

কিন্তু হীরেমণির মনের মধ্যে দিন দিন মাতৃভাবটিই যেন প্রবল হয়ে উঠছে। যখন তখন ছেলের কথা মনে পড়ে, এমনকি কোনো বাবুর অঙ্গশায়িনী অবস্থাতেও চোখে ভাসতে থাকে তার সন্তানের মুখ। আর হীরেমণির ছেলেটিও দিন দিন হয়ে উঠছে বড় সুন্দর। যেমন তার রূপ, তেমনি তার গুণ। বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ম তার ছেলের, এর মধ্যেই পড়াশুনোয় তার বেশ মেধা দেখা যাচ্ছে। রাইমোহন কোথা থেকে একটি মাতালকে ধরে এনে আশ্রয় দিয়েছে বাড়িতে, পেঁচি মাতাল হলেও লোকটি গ্যাট ম্যাট করে ইংরেজি বলে মাঝে মাঝে, যাতে বোঝা যায় কিছু বিদ্যেসিধ্যে আছে তার। পেট খোরাকি আর নেশার দ্রব্য জোগাবার চুক্তিতে সে রোজ সকালবেলা হীরেমণির ছেলে চন্দ্রনাথকে পড়ায়। সুস্থ অবস্থায় সে বেশ বিনীত আর ভদ্র থাকে। সে চন্দ্রনাথকে নিয়ে ইংরেজি শব্দ ঘোষায় : পমকিন—লাউ, কুমড়ো, কুকুম্বার—শশা, ফিলজফর—বিজ্ঞ লোক, প্লোম্যান—চাষা।

ছেলে লেখাপড়া শিখছে দেখে হীরেমণির চোখ কান যেন জুড়িয়ে যায়। একেক সময় এমন কথাও চিন্তা করে হীরেমণি যে সে এই পাপ ব্যবসা ছেড়ে শুধু ছেলেকে নিয়েই থাকবে। সে রাইমোহনকে জিজ্ঞেস করেছিল, হ্যাঁ গা, চাঁদুর যখন

নেকাপড়া শেখার অত ঝোঁক, তা ওকে ইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়া যায় না? রাইমোহন বলেছিল, ইস্কুলে ভর্তি হতে গেলেও ওর বাপের নাম শুধোবে। তুই তো আজও ওর বাপের নাম বললিনি!

এইসব কথাই মাথায় ঘুরছিল বলে হীরেমণি ইস্কুলের নাম শুনেই ছেলের কথা বলে ফেলেছে। এখন আর কথা ফিরিয়ে নেবার উপায় নেই।

সে বললো, আমার ছেলে রয়েচে...অনেকদিন।

জগমোহন সরকার তবু যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। এতদিন যাওয়া আসা করছেন তিনি এ বাড়িতে, অথচ হীরেমণির যে একটি ছেলে আছে, তাই টের পাননি!

—কত বয়েস?

—তা প্রায় আট ন' বচরের হলো।

জগমোহন সরকার হীরেমণির আপাদমস্তক দেখলেন আরেকবার। পশ্চিমা স্ত্রীলোকদের মতন হীরেমণি কাঁচুলি ও ঘাগরা পরে আছে আজ, তার উদ্যত স্তন, মসৃণ ত্বক, ধারালো দুটি চোখ, ভরা যৌবনা যুবতী সে, তাকে জননী রূপে যেন কল্পনাই করা যায় না।

—কোথায় থাকে তোর ছেলে?

—এ বাড়িতেই থাকে, নীচতলায়!

—দূর! যত সব! আয়, আমার কাচে আয়, ঘুম পেয়েচে, তোর কোলে মাতা রেকে এবার আমি ঘুমোবো।

হীরেমণি জানে, এবার জগমোহনের ঘুমেরই সময়। চোখ জুড়ে এসেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ছুটি পাবে।

জগমোহন হীরেমণির কোলে মাথা রেখে বললেন, তুই আর পাঁচ জায়গায় মুজরো খাটতে কেন যাস? আমি যা দিই, তাতে তোর কুলোয় না?

কথা না বাড়াবার জন্য হীরেমণি বললো, আচ্ছা, আর যাবো না!

—বোতলে আর ব্র্যাণ্ডি আচে? দে, আমায় শেষ এক ঢোঁক খাইয়ে দে।

—আপনার ইস্কুলে আমার ছেলেটাকে ভর্তি করে নিন না!

—দূর পাগলি? তোর ছেলে লেখাপড়া শিখে কী করবে? সে কি গেরস্তবাবু হবে নাকি?

—আমার ছেলে নেকাপড়া শিখ্‌লে কুঠিওয়ালাদের মতন আপিসে চাকরি করবে!

—হেঃ, যেমন তোর কতা! বেশ্যার ছেলের মাতায় কখনো বিদ্যে ঢোকে? বরং তুই ওকে কুস্তি শেখা, লাঠিখেলা শেখা, তাহলে বরং এ পাড়ার গুণ্ডোদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে।

—না গো, তার বেশ বুদ্ধি হয়েচে। সে নিজের নাম নিকতে পারে।

—তবে আর কি, যথেষ্ট হয়েচে! তাকে কুস্তি শেখাতে না চাস ডুগি তবলা বাজাতে শেখা!

—কেন, আপনার ইস্কুলে তাকে একবারটি ভর্তি করে দেকুনই না—

—আরে দূর! আমার ইস্কুলে কি ছেলেরা পড়বে নাকি? ছেলেদের ইস্কুল তো গণ্ডাগণ্ডা নিত্যি নতুন গজাচ্চে। ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আমি ইস্কুল খুলবো মেয়েদের জন্য।

—মেয়েরা নেকাপড়া শিখবে? ভদ্রঘরের মেয়েরা রাস্তা দিয়ে হেঁটে ইস্কুলে যাবে। ওমা সে কি কতা গো! সাধ করে কে জাত খোয়াবে?

—জাত খোয়াবে কেন? দেকবি ঠিক আসবে...কচি কচি, ফুটফুটে, সুন্দর সুন্দর মেয়েরা, আহা, যেন সব তাজা তাজা ফুল!

তারপর হীরেমণির স্তনে মুখ ঘষতে ঘষতে জগমোহন সরকার বলতে লাগলেন, মেয়েদের আমি বড্ড ভালোবাসি রে, বড্ড ভালোবাসি, তাদের আমি জ্ঞানের আলো পোঁচে দোবো, তারা হাসবে, খেলবে, ছুটোছুটি করবে, আহা হা, আমি বড্ড ভালোবাসি।

হীরেমণি ঘুম পাড়াবার জন্য জগমোহনের মাথায় ছোট ছোট চাপড় দিতে লাগলো।

জগমোহন জড়িত কণ্ঠে বললেন, একটা গান শোনা, হীরে আমার, বুলবুল আমার, তোর গান শুনলেই আমার মন জুড়োয়, চোখ জুড়োয়, তোর গান শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়বো...

হীরেমণি একটুখানি গুন গুন করে সুর ভেঁজে গান ধরলো :

দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ, বদন ঢেকে যেও না
তোমায় ভালোবাসি তাই
চোখের দেখা দেখতে চাই
কিন্তু 'থাকো' 'থাকো' বলে ধরে রাখবো না।
আমি কোনো দুঃখের কথা তোমায় বলবো না
তুমি যাতে ভালো থাকো সেই ভালো
গেলো গেলো বিচ্ছেদে প্রাণ আমারই গেলো।

জগমোহন সরকার উপুড় হয়ে শুয়ে হীরেমণির উরুতে চাপড় মেরে মেরে তাল দিতে লাগলেন। তাঁর ঘুম প্রায় এলো এলো।

পাশের ঘরের দরজায় একটা মৃদু শব্দ হতেই হীরেমণি তাকালো সেদিকে। দরজাটা ঈষৎ ফাঁক হয়ে গেছে, তার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে রাইমোহন।

রাইমোহন হাত পা নেড়ে ইশারা করছে তার দিকে। হীরেমণি বুঝতে পেরেও দু-একবার মাথা নাড়লো, রাইমোহন তবু কোনো ব্যাপারে তাকে জোর করতে চায়।

তখন হীরেমণি ঐ গান মাঝপথে থামিয়ে অন্য গান ধরলো আড়ে ঠেকায় :

হেরি অবলার দুখ, ওগো গুণনিধি
বুঝি গেল তোমার বুক ফেটে
সদরে রইলো না আগল, ওগো গুণনিধি
তবু তুমি ঢুকলে সিঁধ কেটে
তুমি জগতের মোহন, বংশীধারী
তাই বুঝি, ওগো গুণনিধি, চাই
ষোড়শ গোপিনী উপচারই...

জগমোহন মুখ ফিরিয়ে বললেন, এ কি গান? অ্যাঁ? এ গান তো কখনো শুনিনি! এ গান কে বাঁধলে?

হীরেমণি বললো, কাল এক ভিকিরী ছোঁড়া গাইছেল, শুনতে শুনতে আমার মুখস্ত হয়ে গ্যালো। সুর লাগিয়েছে খাসা...এ গান আমিও আগে শুনিনি।

জগমোহন আতঙ্কিতভাবে বললেন, আবার গা তো! আবার গা একবার।

হীরেমণি আবার ধরলো গানটা।

জগমোহন শুনে যেন আঁতকে আঁতকে উঠতে লাগলেন।

বিড়বিড় করে বললেন, তুমি জগতের মোহন? তার মানে তো আমি! 'হেরি অবলার দুখ, ওগো গুণনিধি, বুঝি গেল তোমার বুক ফেটে'—এ তো আমার সম্বন্ধে...কী সব্বোনেশে কথা, 'তবু তুমি ঢুকলে সিঁধ কেটে', আমি কোথায় সিঁধ কেটে ঢুকিচি? অ্যাঁ? খবর্দার, এ গান গাইবি তো জিভ ছিঁড়ে দোবো! কে এ গান তোকে শিখুলে সত্যি করে বল্।

হীরেমণি নিরীহ মুখ করে বললো, বললুম তো, এক ভিকিরি ছোঁড়া গাইছেল।

—সে কোথাকার ভিকিরি?

—তা আমি কী করে জানবো। আমি তো তার ঠিকুজী ঠিকানা রাখিনি! তবে সে আসে মাঝে মাঝে, দু-চারদিন অন্তর।

—ওরে কেউ আমার সব্বোনাশ করতে চাইচে! কেউ আমার পেচুনে লেগেচে। আমার নামে কুচ্ছো রটাচ্ছে। তুই এ গান গাইতে গেলি কেন, বল? সত্যি করে বল্?

—ও মা, আমি জানবো কী করে যে এ গানে আপনার ঘুম চটে যাবে? আমি ভাবলুম ভক্তির গান, শুনে তাড়াতাড়ি আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন...রাত অনেক হলো।

—ভক্তির গান? অভক্তি! অভক্তি! লোকের ভালো করতে গেলে এই হয়। এ গানের আরও পদ আচে নাকি?

হীরেমণি মাথা ঝুঁকিয়ে বললো, হ্যাঁ গো। অনেক আচে।

পরের লাইনগুলি শুনে জগমোহন সরকার প্রায় তিড়িং তিড়িং করতে লাগলেন। বিরাট শরীর নিয়ে তিনি একবার ঘরের এদিক আর একবার ওদিক ছুটতে লাগলেন উদ্‌ভ্রান্তের মতন। চোখ দিয়ে আবার জল গড়াচ্ছে। ধরা গলায় বলতে লাগলেন, গভীর ষড়যন্ত্র! গভীর ষড়যন্ত্র! কে এমন করলে? ব্যাচা মল্লিক? বাগাড়ম্বর মিত্তির? ওফ্! হীরে, তুই আমায় বাঁচা!

হীরেমণি বললো, আমি সামান্য মেয়েমানুষ, আমি আপনাকে কী করে বাঁচাবো?

জগমোহন সরকার হাহাকার করে বললেন, তুই এ গান ভুলে যা! কোনোদিন ভুলেও আর গাইবিনি। তুই পাঁচ জায়গায় মুজরো গাইতে যাস, কোনোদিন যেন তোর মুখ ফস্কে এ গান না বেরোয়। কতা দে আমায়। দিব্যি কর!

বাঁ হাতের মধ্যমা থেকে একটি বড় পান্না-বসানো আংটি খুলে হীরেমণির কোলে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, এই নে! ওরে, তুই এ গান ভুলে যা!

হীরেমণি ভালোমানুষের ঝিয়ের মতন বললো, আপনি হুকুম করচেন, এরচে আর বড় কতা কী! গাইবো না! কোনোদিন এ গান আর মনেও আনবো না। এ গানের মধ্যে যে অ্যাত, তা আমি জানবো কী করে।

—তুই না হয় গাইবি না, কিন্তু সেই ভিকিরি ছোঁড়া?

—তার আমি কী করে মুখ আটকাবো বলুন?

—তুই বলিলি না যে সে আসে মাঝে মাঝে?

—তা আসে।

—এবার এলেই তাকে চেপে ধর। তাকে মুখ সামলে থাকতে বলবি, নইলে, তাকে ভয় দেকাবি, আমি তাকে গারদে পুরে দোবো! বুঝলি?

—হ্যাঁ বুজলুম?

কোটের দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে দু মুঠো টাকা বার করে জগমোহন সরকার ছুঁড়ে দিলেন হীরেমণির দিকে। বললেন, এই নে! আরও নে! আমার মুখ রক্ষে কর। 'তবু তুমি ঢুকলে সিঁধ কেটে' ওরে বাপরে বাপ, কী সাংঘাতিক কতা। আমার মতন একটা মানী লোক—

হীরেমণি বললো, আপনি অত ছটফটাচ্চেন কেন? শুয়ে পড়ুন, এবার ঘুমোন।

জগমোহন সরকার হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, আর আমি শুয়িচি, ঘুম আমার মাতায় উঠে গ্যাচে। আমার সর্বাঙ্গ জ্বলচে...ভোর হতে আর দেরি নেই বোধহয়, আমি গঙ্গাচ্চান করে তবে বাড়ি ফিরবো!

আর একটুও অপেক্ষা করলেন না জগমোহন সরকার, দরজা খুলে অন্ধকারের মধ্যেই দুপদাপ করে নেমে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে। তারপর বাইরে শোনা গেল তাঁর জুড়িগাড়ির শব্দ।

দরজা ঠেলে এ ঘরে এসে রাইমোহন একেবারে হেসে আকুল। হীরেমণিও হাসতে লাগলো। একটা গানে যে এরকম প্রতিক্রিয়া হবে, তা হীরেমণি কল্পনাও করতে পারেনি।

রাইমোহন বললো, দেকলি, হীরে, দেকলি, কেমন ওষুধ ধরেচে!

হীরেমণি বললো, ইস, মনে বড্ড দাগা পেয়েচেন গো! কাটা পাঁঠার মতন ছটফটাচ্চিলেন মানুষটা।

রাইমোহন বললো, হবে না! ঐ সিঁধ কাটার কথাটাতেই আঁতে ঘা লেগেচে যে! সত্যি যে সিঁধ কাটে।

—সে কি গো! অতবড় একটা মানুষ!

—রেকে দে তোর বড়মানুষ। ও একটা পিশেচেরও অধম! ফিমেল উদ্ধারের নাম করে ভদ্দরলোকের বাড়িতে ঢুকে জাত কুল নষ্ট করচে। এক ব্রাহ্মণের বিধবা, একটি মাত্র ছোট মেয়ে আচে তেনার, সেই মেয়েকে অন্ধকার থেকে আলোয় আনবার জন্য মেয়ের মায়ের সব্বোনাশ করে দিলে গো! আমি সব জানি। এতেই কী হয়েচে, ওকে নিয়ে আরও একটা গান বেঁধেচি, সেটাও তোকে শিকিয়ে দেবোখন।

হীরেমণি বললো, অমন গান দ্বিতীয়টি শুনলে উনি আর ইদিক পানেই আসবেন না!

রাইমোহন বললো, আসবে, আসবে, যত বেশী শুনবে, ততই বেশী জ্বলে-পুড়ে আসবে। শুধু জগু সরকার কেন, ব্যাচা মল্লিককে নিয়েও একটা গান বাঁধা হয়ে গ্যাচে আমার। এবার কারুক্কে ছাড়বো না।



বিধুশেখরের ঘুম ভাঙে অতি প্রত্যুষে। তাঁর শয়নকক্ষটি খুব প্রশস্ত, পশ্চিম-শিয়রী বিছানা। বেশ কয়েক বছর ধরেই তিনি পৃথক কক্ষে একলা ঘুমোন।

বিধুশেখর রাত্রে ঘুমের মধ্যে কোনো বিঘ্ন পছন্দ করেন না। তাঁর স্ত্রী সৌদামিনী বাতব্যাধি ও বহুমূত্রে ভুগছেন, রাত্রে বারবার তাঁকে উঠতে হয়, তাই তিনি নিজেই অন্য ঘরে থাকেন।

পূর্বদিকের গবাক্ষ দিয়ে ভোরবেলার প্রথম সূর্যের রশ্মি এসে পড়ে বিধুশেখরের চোখে। তখনই তিনি চোখ মেলে তাকান। শীত-গ্রীষ্ম বারোমাস এই অভ্যেস। পঞ্চাশের বেশী বয়েস হয়ে গেলেও এখনো তাঁর শরীরে কোনো প্রকার জড়তা আসেনি, ঘুমভাঙা মাত্র তিনি উঠে বসেন এবং হাত জোড় করে ললাটে ঠেকিয়ে প্রণাম জানান কুলদেবতার উদ্দেশে।

তারপর তিনি নাকের সামনে তাঁর বাম করতল এনে নিশ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করেন। বিধুশেখরের ধারণা, ঘুম ভাঙার পর মানুষের শুধু এক নাক দিয়ে প্রশ্বাস পড়ে। কোনোদিন বাম, কোনোদিন ডান। প্রত্যেকদিন এই সময় শয্যায় বসে বিধুশেখর এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করে নেন, আজ কোন্ নাকে, বাম না ডান? ঠিক কোনো নির্দিষ্ট কারণ না থাকলেও কেন যেন বিধুশেখর প্রথম জাগরণের পর বাম নাকের প্রশ্বাসই পছন্দ করেন।

আজ ডান নাক দিয়ে নিশ্বাস পড়ছে। সুতরাং খাট থেকে নামবার জন্য বিধুশেখর প্রথমে বাঁ পা বাড়ালেন। তারপর জানলার দিকে হেঁটে যেতে তিনি পর্যায়ক্রমে একবার বাঁ দিকের নাকের ফুটো আর একবার ডান দিকের নাকের ফুটো টিপে ধরে ধরে প্রশ্বাস পাল্টাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এতে অনেক সময় সত্যিই বদল হয়ে যায়। সেই অবস্থাতেই তিনি সূর্য দেবতার উদ্দেশে ওঁ জবা-কুসুম সঙ্কাশং ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে চললেন।

বিধুশেখর জেগে ওঠার পরও সারা বাড়ি ঘুমিয়ে থাকবে, এটা অসম্ভব কথা। দ্বিতলের বারান্দায় তাঁর খড়মের ঠকঠকানি শুনলেই নীচতলায় একটা চাঞ্চল্য পড়ে যায়। তাঁর খিদমদগারির জন্য তৈরি হয়ে থাকে ভৃত্যমহল।

দোতলায় সিঁড়ির ঠিক সামনের ঘরটায় থাকেন তাঁর স্ত্রী সৌদামিনী। ইদানীং তিনি প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই শয্যাশায়ী। সে ঘরের দরজা ভেজানো, বিধুশেখর একটু ঠেলে খুললেন। ঘরের মেঝেতে শুয়ে থাকে একজন দাসী। কর্তার খড়মের শব্দ শুনে সে আগেই উঠে জড়োসড়ো হয়ে বসে রইলো দেয়ালের ধারে। সৌদামিনী তখনও নিদ্রাভিভূতা, বিধুশেখর পালঙ্কের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পত্নীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। কয়েক বৎসর আগেও সৌদামিনী ছিলেন স্থূলাঙ্গিনী ও সুখী চেহারার রমণী, হঠাৎ যেন শরীরে খরা লেগেছে, মেদ ঝরে গিয়ে শিথিল হয়ে গেছে চামড়া, গৌরবর্ণ এখন পাণ্ডুর হয়ে এসেছে।

বিধুশেখরের চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে কিছু জ্ঞান আছে। শরীরের বর্ণ পরিবর্তন দেখে তিনি রোগের মাত্রা নির্ণয় করতে পারেন। তিনি ঘুমন্ত পত্নীর একটি হাত তুলে নিয়ে নোখের ডগা ও তালুর রং নিরীক্ষণ করলেন, তারপর নাড়ী টিপে দেখলেন। আবার হাতটা তাঁর বুকের ওপর আস্তে নামিয়ে রেখে বিধুশেখর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সবই ললাটলিপি! বিধুশেখর কোনোদিন তাঁর পত্নীর প্রতি অবহেলা, অযত্ন করেননি। তিনি ব্রাহ্মণ, তাঁর ক্ষমতা আছে, অর্থ আছে, তিনি একাধিক বিবাহ করতে পারতেন অনায়াসেই। কিন্তু বিধুশেখর একদার। সৌদামিনী পাঁচটি কন্যাকে গর্ভে ধরেছেন। একটি পুত্রসন্তানও উপহার দিতে পারেননি স্বামীকে। বিধুশেখরের কোনো বংশধর থাকবে না, তবুও তো তিনি অন্য পত্নী গ্রহণ করলেন না। বিধুশেখরেরই সমব্যবসায়ী রাজনারায়ণ দত্ত কী কাণ্ড করছেন! রাজনারায়ণ দত্তের একমাত্র পুত্র মধু খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে

দেশান্তরী হয়েছে। শোনা যায় সে সুদূরে মান্দ্রাজে আছে। মধুকে ত্যাজ্যপুত্র করে আর একটি পুত্রসন্তান পাবার আশায় ক্রুদ্ধ রাজনারায়ণ দত্ত একটার পর একটা বিবাহ করে চলেছেন। নিষ্ফল চেষ্টা, লোক-হাসানো হচ্ছে শুধু।

সৌদামিনী নিজেই বিধুশেখরকে আর একটি বিবাহ করার জন্য পীড়াপীড়ি করেছেন অনেকবার, বিধুশেখর কর্ণপাত করেননি। ভাগ্যে থাকলে এক পত্নীতেই পুত্রসন্তান পাওয়া যেত।

নিয়তি যে কার প্রতি কী রকম ব্যবহার করবেন, তার কোনো ঠিক নেই। স্বামী সোহাগ থেকে কখনো বঞ্চিতা হননি, শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব হয়নি কোনোদিন, তবু তাঁকে এমন কাল রোগে ধরলো। সাধ আহ্লাদ সব মিটে গেল এ জীবনের মতন, এখন শুধু মৃত্যুর পানে তিল তিল করে এগোনো। ওদিকে দেখো বিম্ববতীর ভাগ্য। বিম্ববতী সারাজীবনে স্বামীসঙ্গ পেয়েছেন কমই, রামকমল সিংহ প্রায় রাত্রেই গৃহে থাকতেন না, স্বভাবতই তাঁর খুবই মনোবেদনা থাকবার কথা, তবু বিম্ববতীর কী নিটোল স্বাস্থ্য, শরীরে রোগ ভোগ নেই। এখনো তাঁর রূপ যেন ফেটে পড়ছে। বিধবা হলেন অকালে, তবু বিম্ববতী পুত্রগর্বে সৌভাগ্যবতী।

আবার একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিধুশেখর বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। পুত্র-সন্তান না থাক, বিধুশেখর দত্তকপুত্র নেবার পক্ষপাতী নন। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার স্বামীকে তিনি ঘরজামাই করে রেখেছেন। আরও কয়েক বছর বিধুশেখর তাঁর জামাই দুর্গাপ্রসাদের মতিগতি লক্ষ করবেন। ছেলেটি বড় বেশী চুপচাপ, এখনো তাকে পুরোপুরি ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। যদি সে দুঃশীল হয়, তবে বিধুশেখর সমস্ত সম্পত্তি দেবত্র করে দিয়ে যাবেন। অনেকটা তাঁর অমতেই রামকমল তাড়া-হুড়ো করে গঙ্গানারায়ণকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেছিল, এই তো তার পরিণতি! গঙ্গানারায়ণ! আজকাল এই নামটি মনে পড়লেই বিধুশেখরের গাত্রদাহ হয়।

বিধুশেখর নীচে নেমে এলেন। শীতকালে তিনি রৌদ্রে বসে দাঁতন করেন। বাড়ির পিছনের বাগানে ভৃত্যরা এরই মধ্যে তাঁর জন্য একটি আরাম কেদারা পেতে রেখেছে। একটি ছোট বেতের ঝুড়িতে কয়েকটি নিমডাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন ভৃত্য। বিধুশেখর বাছাবাছি করে একটি নিমডাল তুলে নিলেন। তারপর দাঁতন করতে করতে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন গঙ্গানারায়ণের কথা। যৌবনের দর্পে গঙ্গানারায়ণ যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করেছে। বিধুশেখরের প্রত্যেকটি নির্দেশ অমান্য করেই যেন সে আনন্দ পায়। গঙ্গানারায়ণকে তিনি পাঠিয়েছিলেন যশোহরের ইব্রাহিমপুরের কুঠিতে। সেখানে অনেকখানি জমি নীল-চাষের জন্য পত্তন নেওয়া আছে। নীলচাষ নিয়ে সম্প্রতি কিছু কিছু হাঙ্গামা হচ্ছে। এই চাষ এখন অত্যন্ত লাভের কারবার তাই দলে দলে সাহেবরা ঝুঁকেছে এদিকে। ভাগ্যান্বেষী বে-সরকারী ইংরেজরা এদেশে এসে নানান ব্যবসা ফেঁদে বসে, এখন তারা হুড়মুড়িয়ে যাচ্ছে নীলচাষে। বিধুশেখর বুঝেছেন যে সাহেবদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারা যাবে না। মফস্বলের আদালতে ইংরেজদের বিচার হয় না বলে তারা কোনো রকম আইনের পরোয়া করে না, তারা চাষীদের ওপর যত খুশী জুলুম করতে পারে। সেইজন্যই বিধুশেখর চান নীলচাষের জন্য পত্তন দেওয়া জমি সাহেবদের কাজে ইজারা দিয়ে দিতে, নীলের বাজার তেজী থাকতে থাকতে দাম বেশ ভালো পাওয়া যাবে। সেই উদ্দেশ্যে তিনি পাঠালেন গঙ্গানারায়ণকে, কিন্তু সে করে এলো সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ। সে সাহেবদের কাছে জমি হস্তান্তর করার কোনো চেষ্টাই করেনি, বরং উল্টে সে চাষীদের নীলচাষের দরুন যে দাদন

দেওয়া হয়েছিল তা সব মকুব করে দিয়ে তাদের সেই জমিতে ধান চাষের অনুমতি দিয়ে এসেছে।

বিধুশেখর চিক্ করে থুতু ফেললেন মাটিতে। চাষীদের জন্য দরদ! গঙ্গানারায়ণের দুরভিসন্ধি বুঝতে বিধুশেখরের আর বাকি নেই। চাষীদের কাছে উদার, দেশহিতৈষী সেজে সে প্রমাণ করতে চায় যে যেন সে নিজেই জমিদার! নবীনকুমার এখনো ছোটো, তাকে কেউ চেনে না, প্রজারা এখনো গঙ্গানারায়ণকেই রামকমল সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে মানে। হুঁঃ! বিধুশেখর মনে মনে হাসলেন। তিনি ইচ্ছে করলেই এখনো গঙ্গানারায়ণকে আবর্জনায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন। গঙ্গানারায়ণ জানে না। বিধুশেখর যদি চাইতেন তাহলে তিনি নিজেই এতদিনে রামকমল সিংহের সমগ্র সম্পত্তি গ্রাস করে ফেলতে পারতেন। এমনকি রামকমল সিংহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জোড়াসাঁকো থেকে সমগ্র সিংহ পরিবারকে মুছে ফেলে দেওয়াও তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। সে-সব তিনি করেননি শুধু বিম্ববতী আর নবীনকুমারের মুখ চেয়ে। নবীনকুমারের কথা চিন্তা করলেই তাঁর মন কোমল হয়ে যায়।

নবীনকুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হোক, তাকে তিনি কলকাতার ধনী, অভিজাত সমাজের একেবারে চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত করে যাবেন। তার আগে তিনি সম্পূর্ণ ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়ে যাবেন গঙ্গানারায়ণকে, নইলে তাঁর আত্মা কিছুতে তৃপ্ত হবে না। কুলাঙ্গার! বিধুশেখর একসময় এত প্রশ্রয় দিয়েছিলেন গঙ্গানারায়ণকে, তার প্রতিদানে সে কিনা তাঁরই কন্যার ধর্মনাশ করতে উদ্যত হয়েছিল! দুধ-কলা দিয়ে এই কাল-সর্পকে পোষা হয়েছে এতদিন। এখন সে বিধুশেখরের সামনেই ফোঁস ফোঁস করতে আসে। ওকে বিধুশেখর পথের ভিখারী করে ছাড়বেন।

মৃত্যুর আগে তিনি নির্দেশ দিয়ে যাবেন, যেন নবীনকুমারই তাঁর মুখাগ্নি করে।

দাঁতন শেষ করে নিমডালটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিধুশেখর ডান হাতটা বাড়িয়ে রইলেন। একজন ভৃত্য অমনি একটি তামার জিভ-ছোলা নিয়ে এলো। খানিকক্ষণ জিহবা পরিষ্কার করার পর তিনি সেটা ফিরিয়ে দিলেন ভৃত্যটির দিকে। সে জল নিয়ে প্রস্তুত। মুখ প্রক্ষালন করার পর বিধুশেখর গেলেন অন্য প্রাতঃকৃত্য সেরে আসতে।

সকালবেলা পুজো-আচ্চা শেষ করার আগে বিধুশেখর সাধারণত কারো সঙ্গে একটিও কথা বলেন না। তাই হুকুমের অপেক্ষা করতে হয় না ভৃত্যদের, তারা প্রত্যেকদিনই একই নিয়মমতন পরপর সব কিছু সাজিয়ে রাখে।

প্রাতঃকৃত্যের পর স্নান। বিধুশেখরের বাড়ির সংলগ্ন নিজস্ব পুষ্করিণী আছে। কিন্তু তিনি পুষ্করিণীতে স্নান করা পছন্দ করেন না। অতি ভোর থেকেই ভৃত্যরা বাগানে একটি পোর্সিলিনের বিরাট গামলায় জল ভরে রাখে। সেই জল রৌদ্রে উষ্ণ হয়। তার পাশেই পাতা থাকে একটি মাদুর। প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে বিধুশেখর বাসী কাপড় ছেড়ে একটি তেলধুতি পরে সেই মাদুরের ওপর শুয়ে পড়েন, তখন কয়েকজন ভৃত্য তাঁর শরীরে তৈল মর্দন করে। এই ব্যাপারটা চলে অনেকক্ষণ। প্রভু বা ভৃত্যেরা কেউ কোনো কথা বলে না। শুধু দলাই মলাই করার চপাস চটাং শব্দ হয়। তারপর এক সময় বিধুশেখর নেমে পড়েন জলের গামলায়। সেখানেও তিনি শুয়ে থাকেন স্থির হয়ে, ভৃত্যেরা সম্মার্জন করে তাঁর

অঙ্গ।

এত কান্ড সত্ত্বেও তাঁর স্নানটি প্রায় কাকস্নানের পর্যায়ে পড়ে। জল সম্পর্কে তাঁর ভীতি আছে। পুষ্করিণীতে তো নয়ই, বিধুশেখর এত ধর্মপ্রাণ হয়েও কখনো গঙ্গায় স্নান করতে যান না। তাঁর গৃহে গঙ্গাজল রাখা থাকে। প্রতিদিন পুজোর আগে তিনি সেই জল একটু মাথায় ছিটিয়ে নেন। নৌকাযোগে মহাল পরিদর্শনে যেতে হয় বলে তিনি নিজে জমিদারি পর্যন্ত কেনেননি। তাঁর নিজের অধিকাংশ সম্পত্তি লগ্নী করা আছে কলকাতার বিভিন্ন হৌসে।

স্নান সেরে বিধুশেখর ভেজা কাপড় পরেই চললেন গৃহের দিকে। নাকের সামনে করতল এনে আবার তিনি পরীক্ষা করলেন তাঁর প্রশ্বাস। তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হলো। স্নানের পর দেহ পবিত্র হয়, তখন দু নাক দিয়েই সমানভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস হয়, তখন মানুষ মুক্ত হয় ইড়া-পিঙ্গলার প্রভাব থেকে। অথচ আজও ডান নাক দিয়ে প্রশ্বাস পড়ছে কেন? একি কোনো দুর্লক্ষণ?

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ডান চোখের তারা একবার কেঁপে উঠলো।

বিধুশেখর মনের দুর্বলতার প্রশ্রয় না দিয়ে ওপরে উঠে এসে বস্ত্র পরিবর্তন করলেন। একটি পট্টবস্ত্র পরে তিনি গেলেন পূজার ঘরে। কুশাসনে বসে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে করতেও তিনি অন্যমনস্কভাবে একবার নাকের কাছে নিয়ে এলেন হাত। এখনো ডান নাক দিয়েই!

এই ঠাকুরঘর এক সময় বিন্দুবাসিনীর অধিকারে ছিল। প্রতিদিন সকালে বিধুশেখর এখানে এসে পূজায় বসলেই বিন্দু তার পিতার জন্য কোষাকুষি, গঙ্গাজল, ফুল সব এগিয়ে দিত। সারা দিন রাত্রির মধ্যে শুধু এই সময়টিতেই বিন্দুর সঙ্গে দেখা হতো বিধুশেখরের। দু একটি কথাবার্তা হতো। এখনো এই কক্ষে এসে বসলেই বিন্দুর কথা একবার মনে পড়ে বিধুশেখরের। কিন্তু সেই হতভাগিনী কন্যার কথা ভেবে বিধুশেখরের মনে কোনো দুঃখবোধ হয় না। অপরাধের তুলনায় তিনি তো বিন্দুকে অতি মৃদু শাস্তিই দিয়েছেন। মতিচ্ছন্ন হয়ে সেই মেয়ে এই ঠাকুরঘর অপবিত্র করেছিল। গঙ্গানারায়ণ তাকে পাপ মনে দেখেছিল। পাপ মনে তাকে স্পর্শ করতে এসেছিল, তার আগে বিন্দু বিষ পান করেনি কেন? বিন্দু তেমনভাবে মরলে কন্যার জন্য গর্বিত হতেন বিধুশেখর, কন্যার নামে কালীঘাটের মন্দিরে একটি পাথর বাঁধিয়ে দিতেন। সংযমই তো বিধবার অলঙ্কার। যে বিধবা এ জন্মে প্রতিটি বিধান মেনে কঠোরভাবে আত্মসংযম পালন করে, পরজন্মে তার সিঁথের সিঁদুর অক্ষয় হয়। এ কথা কতবার তিনি বুঝিয়েছিলেন বিন্দুকে। তা সে শুনলো না, জীবনে তিনি তার মুখ দর্শন করবেন না।

পূজা সেরে উঠে দাঁড়ালেন বিধুশেখর। আজ পূজায় ভালো করে মন বসেনি। মনকে তিনি কিছুতেই একাগ্র করতে পারছিলেন না। তবু শুধু শুধু আর বসে থাকার কোনো মানে হয় না। সায়াহ্নে আর একবার বসবেন পূজায়।

নাকের কাছে আবার হাতটা আনলেন। এখনো ডানদিকে।

একটি কমলালেবু, একটি সন্দেশ ও এক গ্লাস ঘোলের সরবত খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করলেন বিধুশেখর। তারপর আবার এলেন পত্নী সৌদামিনীর ঘরে।

সৌদামিনীর নিদ্রা ভঙ্গ হয়েছে কিছু আগে। তবে এখনো তিনি শয্যার ওপরেই আধো-শোয়া হয়ে রয়েছেন, একজন নাপতেনী আলতা পরাচ্ছে তাঁর পায়ে। আগে

এসব আলতা পরানো কিংবা অন্যান্য প্রসাধনপর্ব শুরু হতো বিকেলবেলায়, কিন্তু এখন সৌদামিনীর নানারকম বাতিক দেখা দিয়েছে। যখন তখন তাঁর নানারকম ইচ্ছে জাগে, আর যখন যেটি চাইছেন, তখন তাঁর সেটি চাই-ই। একদিন রাত দুপুরে ঘুম ভেঙে তিনি হঠাৎ নতুন গুড়ের মোয়া খাবার বায়না ধরেছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে দুর্গাপুজোর বাজনা বাজছে আর তার পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাঁর মৃতদেহ। শীতকাল আসবার আগেই তিনি মরে যাবেন। স্বপ্নে এরকম ইঙ্গিত ছিল, তাহলে আর এবছরের নতুন গুড়ের মোয়া খাওয়া হবে না। সে কথা ভেবেই দুঃখে তাঁর বুক ফেটে গেল, তিনি অবোধ বালিকার মতন কান্না জুড়ে দিয়েছিলেন।

সৌদামিনী অসুস্থ হয়ে পড়ার পর থেকে তাঁর বিধবা বড় মেয়ে নারায়ণী সংসারের কর্তৃত্ব নিয়েছে। দাসীরা ডেকে এনেছিল তাকে। নতুন গুড়ের মোয়া তো দূরে থাক, বাড়িতে কোনো রকম মোয়াই নেই, এত রাত্রে তা পাওয়া যাবেই বা কোথায়। নারায়ণী মাকে অনেক করে বুঝিয়েছিল। কিন্তু সৌদামিনী কিছুতেই শুনবেন না। ওরে তোদের জন্য আমি এত করিচি, আর তোরা আমার এইটুকুনি সাধ মিটোবিনি, এই বলে কী কান্না! নারায়ণী পিতার ঘুম ভাঙায়নি। সেই রাত্রেই পোস্তাবাজারে লোক পাঠিয়ে গুড় আনিয়ে বাড়িতে মোয়া বানিয়ে মাকে খাইয়েছিল সে।

বিধুশেখর ঘরের মধ্যে এসে একটুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলেন। নাপতেনী দ্রুত কাজ সেরে বেরিয়ে গেল। তারপর বিধুশেখর কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আজ কেমন বোধ কচ্চো, সদু?

স্বামীকে দেখে সৌদামিনী মাথার ঘোমটা একটু টেনে দিয়ে বললেন, ভালো, কালকের চেয়ে আজ বেশী ভালো আচি।

সৌদামিনীর এই একটা গুণ, স্বামীর কাছে কখনো নিজের অসুখ বিষয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করতে চান না। তাঁর স্বামী অতিশয় ব্যস্ত কাজের মানুষ। তাঁর চিন্তা আর বাড়াতে চান না সতী-সাধ্বী পত্নী।

বিধুশেখর জিজ্ঞেস করলেন, হাঁটুর গ্যাঁটের বেদনাটা কমেচে?

সৌদামিনী বললেন, একদম নেই-ই বলতে গেলে! আপনি ও নিয়ে আর ভাববেন না। কোবরেজমশাই খুব ভালো ওষুধ দিয়েচেন।

তারপর ফ্যাকাশে ভাবে একটু হাসির চেষ্টা করে তিনি আবার বললেন, কোবরেজমশাইকে অমন ভালো ভালো ওষুধ দিতে আপনি নিষেধ করুন না। এখন সিঁথের সিঁদুর নিয়ে মত্তে পারলেই যে আমার সুখ!

বিধুশেখরও সামান্য কৌতুকের চেষ্টা করে বললেন, তা কী করে হবে! পত্নী-বিয়োগ তো আমার কোষ্ঠীতে লেকা নেই। আমার আয়ু আশি বচর, তুমি তার চে বেশী বাঁচবে।

সৌদামিনী বললেন, আশি বচর কেন, আপনি বাঁচবেন আরও ঢের বেশী। মেয়েমানুষের অতদিন বেঁচে থাকা ভালো নয়।

বিধুশেখর পত্নীর ললাটে হাত রাখলেন। ঠান্ডা, একটু বেশী ঠান্ডা। এটাই বিধুশেখরকে চিন্তায় ফেলে। অসুস্থ মানুষের শরীরে তাপ বেশী থাকারই তো কথা। অথচ সৌদামিনীর দেহের তাপ যেন দিনের পর দিন ক্রমশই কমে আসছে।

বিধুশেখর বললেন, হ্যাঁ, ভালোই তো মনে হচ্চে আজ।

—সুহাসিনীদের কোনো পত্তর এয়েচে?

বিধুশেখরের কনিষ্ঠা কন্যা আর জামাই দুর্গাপ্রসাদ গেছে কৃষ্ণনগরে। ওখানেই

বিধুশেখরের পৈতৃক বাড়ি। সে বাড়ি বহুদিন অযত্নে পড়ে আছে, সেইজন্যই বিধুশেখর জামাইকে সেখানে পাঠিয়েছেন যাতে সে বাড়িটি সারিয়ে, বাগানের আগাছা জঙ্গল পরিষ্কার করে সেটা ভদ্রস্থ করে তুলতে পারে। মস্ত বড় বাড়ি, শুধু শুধু ফেলে রাখা কোনো কাজের কথা নয়। ইংরেজ কোম্পানি রাজত্ব নেবার পর বাড়ি ভাড়ার বেশ চাহিদা বেড়েছে, সরকারী কর্মচারীরা উচ্চ দামে বাড়ি ভাড়া নেয়, সুতরাং ও বাড়িটিও ভাড়া দিলে কিছু সুসার হয়। কন্যাকেও পাঠিয়েছেন জামাতার সঙ্গে, কিছুদিন ধরে সে পেটের পীড়ায় ভুগছে, ওখানে গেলে কিছুটা স্বাস্থ্য পরিবর্তন হতে পারে। কৃষ্ণনগরের জল-হাওয়া ভালো।

বিধুশেখর বললেন, না, আসেনি। এই তো ক'দিন মাত্তর গ্যালো, এখনো পত্র আসার সময় হয়নি।

—আজ ও বাড়ি যাওনি?

—যাইনি, যাবো।

ও বাড়ি অর্থাৎ সিংহ ভবন। প্রতিদিন সকালে সিংহ ভবনে একবার গিয়ে সব খবরাখবর নিয়ে আসা বিধুশেখরের বহুকালের অভ্যেস। ও বাড়ির সব রকম ব্যবস্থাপনা এখনো বিধুশেখরের নির্দেশেই চলে। গঙ্গানারায়ণ যতই বিদ্রোহী হবার চেষ্টা করুক, বিধুশেখর এখনো দুই পরিবারের কর্তা।

পত্নীর কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে বিধুশেখর সৌদামিনীর নাকের কাছে হাত নিয়ে বললেন, শ্বাস ফেলো তো!

আশ্চর্য, সৌদামিনীরও ডান নাক দিয়ে প্রশ্বাস পড়ছে।

ললাট কুঞ্চিত করে বিধুশেখর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নেমে এলেন নীচে। বৈঠকখানা ঘরের সামনের বারান্দায় কিছু উমেদার, দালাল ও প্রার্থীর ভিড় জমেছে। আজকাল এক নতুন উৎপাত শুরু হয়েছে, যার নাম চাঁদা। আগে ছেলের পৈতে, বাপের শ্রাদ্ধ, কন্যাদায় ইত্যাদির নাম করে কিছু দরিদ্র, কিছু ফেরেববাজ সাহায্য চাইতে আসতো। আজকাল আসে ইস্কুলের চাঁদা, সঙের চাঁদা, গাজন, চড়ক, দুর্গোৎসব সব কিছুর জন্য চাঁদা। আর এই চাঁদা-আদায়কারীরা যেন গুড়ের নাগরির ওপরকার মাছি, কিছুতেই তাড়ানো যায় না।

প্রার্থীরা বিধুশেখরকে দেখে দন্ডবৎ হলো। এদের থেকে একটু দূরে দাঁড়ানো লম্বা রাইমোহনকেই আগে চোখে পড়ে। খগরাজের ভঙ্গিতে সে হাত জোড় করে রয়েছে।

রামকমল সিংহ মারা যাবার পর রাইমোহন মাঝে মাঝেই এ বাড়িতে যাতায়াত শুরু করেছে। ব্যাপারটা বোঝেন বিধুশেখর। মোসাহেবী করাই রাইমোহনের পেশা, সে নতুন বাবু ধরতে চায়। কিন্তু রাইমোহনের পক্ষে এটা ভুল জায়গা, বিধুশেখর মোসাহেবদের নিয়ে সময় কাটানোকে মোটেই উৎকৃষ্ট আমোদের পন্থা বলে মনে করেন না। তাছাড়া, মোসাহেবরা তাঁর কাছে এসে মদের স্রোতেও ভাসতে পারবে না কিংবা মাগীবাড়িতে গিয়ে ফূর্তির অংশ পাবারও আশা নেই। শহরসুদ্ধ সকলেই জানে এর কোনোটাতেই রুচি নেই বিধুশেখর মুখুজ্যের। তবু রাইমোহন আসে কেন?

বিধুশেখর তার উদ্দেশ্যেই প্রশ্ন করলেন, কী হে, কী বার্তা?

রাইমোহন বিগলিত হাস্যের সঙ্গে বললো, আজ্ঞে, আপনার কুশল সংবাদ নিতে এয়েচিলুম।

তাকে কোনো উত্তর না দিয়ে এবং অন্যদের প্রতি দৃকপাত না করে বিধুশেখর গম্ভীরভাবে এগিয়ে গেলেন দ্বারের দিকে। দ্বারওয়ানরা ঝুঁকে সেলাম জানালো, কোচম্যান ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলো, গাড়ি যুতবে কি না, বিধুশেখর হাত তুলে নিষেধ করলেন। তারপর পদব্রজেই চললেন সিংহ ভবনের দিকে তাঁর মন বলছে, ও বাড়িতে হয়তো কোনো বিপদ ঘটেছে।

বিধুশেখরের দীর্ঘ ঋজু চেহারা, লম্বা লম্বা পদক্ষেপে তিনি অল্পকালের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন ও বাড়িতে। দ্বারের কাছেই দেখা হলো দিবাকরের সঙ্গে। সে শুষ্ক মুখে বিধুশেখরের অপেক্ষাতেই যেন দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে বুকটা একবার কেঁপে উঠলো বিধুশেখরের, তিনি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, ছোট খোকা কেমন আছে? নবীন?

দিবাকর বললো, ভালো। সে গুরুমশাইয়ের কাচে পাঠ নিচ্চে!

—আর তোমাদের কর্তামা, তাঁর শরীর ভালো আচে তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি তো এই মাত্তর গঙ্গাচ্চানে গেলেন!

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন বিধুশেখর। তিনি অকারণ দুশ্চিন্তা করছিলেন। সবই ঠিক আছে। তিনি গঙ্গানারায়ণ সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই করলেন না।

দিবাকর তবু কাঁচুমাচু মুখ করে বললো, বড়বাবু, আপনার সঙ্গে দুটো কতা ছেল! এই বুড়ো বয়েসে কি বউ ছেলে নিয়ে না খেয়ে মরবো? এই আপনাদের বিচার হলো?

বিধুশেখর বললেন, কেন, কী হয়েচে?

—সেই শিশুকাল থেকে এ বাড়ির অন্ন খেয়িচি, কত্তাবাবুদের সেবার কোনো তুরুটি করিনি, মাতার রক্ত জল করে খেটিচি।

বিধুশেখর ঈষৎ ধমক দিয়ে বললেন, ভণিতা না করে আসল কতাটা বল্।

দিবাকর সঙ্গে সঙ্গে বললো, আজ্ঞে গঙ্গাদাদা আমায় লুটিস দিয়েচেন। তিনি আমার চাকরি রাখবেন না। তিনি বলেচেন, এস্টেটের কাজে আমার আর দরকার নেইকো!

—কেন?

—আজ্ঞে আমি নাকি নিমোখারাম! আমি অযোগ্য।

বিধুশেখর জানেন, দিবাকর নিমকহারামও নয়, অযোগ্যও নয়। সে চোর। তবে অতি বিশ্বাসী চোর। তার ওপর কোনো কাজের ভার দিলে সে ঠিকই সেটা উসুল করে আসবে, কিছু চুরিও করবে। আজকাল সব ব্যাটাই চোর, কিন্তু কাজ উসুল করতে জানে ক'জন? সবাই শুধু চুরি করতেই জানে। দিবাকরের মতন কাজের লোক আজকাল দুর্লভ।

—গঙ্গা তোকে ছাড়িয়ে দেবে বলেচে?

—আজ্ঞে ঠিক স্পষ্ট বলেননি। তবে ভাবখানা সেই রকম। শুনে তো আমি আকাশ থেকে পড়িচি। এতকাল সব হুকুম নিয়িচি আপনার কাচ ঠেঙে...মুখের কতাটি খসাতে না খসাতেই আমি...

দিবাকর অতি ধূর্ত। পিঁপড়ে যেমন আগে থেকে ঝড় বৃষ্টির ইঙ্গিত পায়, সেই রকম সে টের পেয়েছে যে বিধুশেখরের সঙ্গে গঙ্গানারায়ণের একটি চূড়ান্ত সঙ্ঘর্ষ আসন্ন। এই সময় সে নিরপেক্ষভাবে দূরে থাকতে পারে না, লাভের অংশ-ভাগী হতে গেলে আগে থেকেই তাকে যে-কোনো এক পক্ষে যোগ দিতে হবে। সব দিক বিচার করে সে বুঝেছে, বিধুশেখরের পক্ষে থাকাই সবচেয়ে শ্রেয় ও নিরাপদ। কূটকৌশলী বিধুশেখরের তুলনায় গঙ্গানারায়ণ নিতান্ত শিশু ছাড়া

তো আর কিছুই নয়।

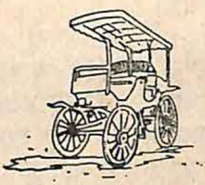
বিধুশেখর হেসে বললেন, তুই দু-চারদিন বাইরে ঘুরে আয় বরং। তোকে আমি ইব্রাহিমপুরের কুঠিতে পাঠাবো ভাবছিলুম। সেখানকার প্রজাদের একটু শায়েস্তা করতে হবে। দরকার হলে দু-চারটে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে পারবি না?

দিবাকর বললো, আজ্ঞে, আপনি যদি হুকুম করেন তাহলে আমি যমের বাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দিয়ে আসতে পারি।

দিবাকরের সঙ্গে কথাবার্তা আর বেশী দূর এগোলো না। বিধুশেখরের নিজস্ব ভৃত্য রঘুনাথ ছুটতে ছুটতে এসে একটা দুঃসংবাদ দিল। কৃষ্ণনগর থেকে একজন লোক এসেছে। সুহাসিনী গুরুতর রকমের অসুস্থ।

খবর শুনে বিধুশেখর একটুক্ষণের জন্য অনড়, স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বিপদ যে এই দিক থেকে আসবে, তা তিনি কল্পনাও করেননি। সকাল থেকে ডান নাকের নিশ্বাস দেখেই তাঁর মনে কু-ডাক ডেকেছিল। সুহাসিনী—তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা, তাঁর সবচেয়ে আদরের সন্তান...।

আচ্ছন্ন অবস্থা থেকে আবার সজাগ হলেন বিধুশেখর। একটুও সময় নষ্ট করলে চলবে না...সুহাসিনীকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা যে করতেই হবে।



কৃষ্ণনগর কম দূরের পথ নয়। স্থলপথে যেতে অন্তত দু-দিন লেগে যাবে। তাছাড়া ঠ্যাঙাড়ে দস্যুদের উপদ্রবের আশঙ্কা আছে, রাত্রে পথ চলা দুষ্কর। নদীপথে কিছু অল্প সময় লাগতে পারে, কিন্তু বিধুশেখর নিজে নৌকোয় চড়তে ভয় পান। তাঁর কোষ্ঠিতে জলে ডোবা ফাঁড়ার উল্লেখ আছে।

বিধুশেখর তাঁর নিজের দুজন কর্মচারী এবং দিবাকরকে অগ্রিম রওনা করিয়ে দিলেন দ্রুতগামী ছিপ নৌকোয়, তারপর তিনি যাত্রা করলেন কয়েকজন পাইক-বরকন্দাজসহ দুখানি জুড়িগাড়িতে। দুঃসংবাদ শুনে গঙ্গানারায়ণও তাঁর সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, বিধুশেখর বলেছেন, তার প্রয়োজন নেই, গঙ্গানারায়ণ কলকাতায় থেকে দুই পরিবারের দেখাশুনো করুক।

রুগ্ণা পত্নীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসার কাজটি সহজ হয়নি। সৌদামিনী এখন একেবারে অবুঝের মতন হয়ে গেছেন, প্রতিদিন সকালে স্বামী সন্দর্শন না হলে তিনি আকুলি বিকুলি করেন। সুতরাং তাঁকে না জানিয়ে বিধুশেখর যেতে পারেন না। আবার সুহাসিনীর অসুখের কথা জানালেও সৌদামিনী এমন অস্থির হয়ে উঠবেন যে তখন তাঁকে বাঁচানোই শক্ত হবে। বিধুশেখর কলকাতা ছেড়ে যান ক্বচিৎ কদাচিৎ, মোকদ্দমার কারণে দু একবার বর্ধমান গিয়েছেন শুধু, সুতরাং হঠাৎ তাঁর বাইরে যাবার কারণটি সৌদামিনীকে বোঝাবেনই বা কী করে। সেই জন্য বিধুশেখরকে কিছু মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছিল, তিনি সৌদামিনীকে বোঝালেন যে কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ি থেকে তাঁর ডাক এসেছে একটি গুরুতর মামলায় তাঁর কাছ থেকে আইনের পরামর্শের জন্য। তিনি যেতে সম্মত হয়েছেন তার কারণ একযাত্রায় দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হবে। তাঁর জামাই কৃষ্ণনগরে তাঁদের বাড়িখানির ব্যবস্থা কতদূর কী করলো তাও দেখে আসা যাবে। তিনি নিজে

উপস্থিত হলে কাজ ত্বরান্বিত হবে নিশ্চিত, তাহলে তিনি মেয়ে জামাইকে সঙ্গে নিয়েও ফিরতে পারেন।

সৌদামিনী এই কথায় প্রবোধ মেনে বলেছিলেন, বাড়ির কাজ শেষ হোক বা না হোক, আপনি সুহাসিনীকে সঙ্গে নিয়েই আসবেন। আমি আর কতদিন আচি কি না আচি, শেষবারের মতন তার মুখখানি যেন দেকে যেতে পারি।

বিধুশেখরের কাপড়-চোপড় গুছিয়ে দিয়েছিল তাঁর বড় মেয়ে নারায়ণী। কয়েক বছর আগে সেও কপাল পুড়িয়ে ফিরে এসেছে বাপের বাড়িতে।

নারায়ণী মৃদু স্বরে বলেছিল, বাবা, আমি কি আপনার সঙ্গে যাবো?

বিধুশেখর বলেছিলেন, না মা, তুই গেলে এ দিকে সব সামলাবে কে? তোর ওপ্পরেই তো এখন সব ভার।

—তবু আমাদের কেউ একজন গেলে ভালো হতো। সুহাসিনী পোয়াতী।

—অ্যাঁ?

রাগে বিধুশেখরের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হয়েছিল। সুহাসিনী যে অন্তঃসত্ত্বা, সে কথা কেউ তাঁকে আগে বলেনি কেন? তাহলে কি তিনি সুহাসিনীকে কৃষ্ণনগরে পাঠাতেন? এ বাড়িতে কেউ তাঁকে কোনো কথা বলে না, সবাই শুধু ভয় পায়।

বিবাহ দেবার পর সুহাস্নিনীকে তিনি একদিনের জন্যও শ্বশুরালয়ে যেতে দেননি। এইজন্যই তিনি এবার অনেক দেখেশুনে গরীব ঘর থেকে একটি সচ্চরিত্র ছেলেকে জামাই করেছেন এবং বিবাহের আগেই শর্ত করে নিয়েছিলেন যে তাকে ঘরজামাই হতে হবে। সবই ঠিকঠাক চলছিল, তারপর মেয়ে নিজেই কৃষ্ণনগর বেড়াতে যাবার জন্য আবদার করলো। বিধুশেখর তখন ভেবেছিলেন, যাক ঘুরে আসুক, কৃষ্ণনগর স্বাস্থ্যকর জায়গা। তখন কেউ তাঁকে একবার বলতে পারেনি যে সুহাসিনী গর্ভবতী!

গাড়ি ছুটে চলেছে ঝমঝমিয়ে, বিধুশেখর ভেতরে বসে আছেন সোজা হয়ে চোখ বুজে। যেন ধ্যানমগ্ন। বিধুশেখরের অন্তরে একটিই চিন্তা, সুহাসিনীকে দেখতে পাবেন তো কৃষ্ণনগরে পৌঁছে! বাহকের হাতে যে পত্র এসেছে তাতে সুহাসিনীর কী অসুখ তা লেখা নেই। এখন শীতের সময়, ওলাওঠার প্রকোপ এই সময় কম থাকে। ঐ রোগটিকেই ভয় সবচেয়ে বেশী, একদিনও সময় দেয় না। তবে আর কোন্ রোগ হতে পারে? রোগ নিশ্চয়ই সাঙ্ঘাতিক রকমের কিছু, নইলে এমনভাবে জরুরী বার্তা আসবে কেন!

বিধুশেখরের সন্তান ভাগ্য বড় মন্দ। পুত্র তো জন্মালোই না, পাঁচটি কন্যার মধ্যে দুটি মারা গেছে, আর দুটি বিধবা। বড় মেয়ে নারায়ণীরও কোনো পুত্র সন্তান হয়নি, সে বিধবা হয়েছে তিনটি কন্যা সন্তান নিয়ে। বিধুশেখর প্রকাশ্যে স্নেহ-মমতা দেখান না, কিন্তু কনিষ্ঠা কন্যা সুহাসিনীর ওপর মনে মনে তিনি তাঁর সমস্ত স্নেহ উজাড় করে দিয়েছিলেন। কত আশা করেছিলেন সুহাসিনীর স্বামী দুর্গাপ্রসাদকে সব কিছু শিখিয়ে পড়িয়ে তাঁর বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে যাবেন। সুহাসিনীই যদি না বাঁচে, তাহলে আর দুর্গাপ্রসাদের কোনো মূল্য নেই তাঁর কাছে! তাহলে সব কিছু নবীনকুমারই পাবে।

দেশসুদ্ধ লোক জানে এবং চিরকাল জানবে যে নবীনকুমার রামকমল সিংহের সন্তান। সেটাই তো সত্য। অর্জুন চিরকাল নিজেকে পাণ্ডব বলেছে। সে কি কখনো ইন্দ্রপুত্র বলে নিজের পরিচয় দিয়েছে? বিধুশেখর ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ মাত্রই দেবতার অংশ নিয়ে জন্মায়। কত নারী সন্তানের আশায় দেবতার কাছে বর

মাগে। বিম্ববতীর একটি পুত্র সন্তানের জন্য বড় সাধ ছিল, বিধুশেখর সেই সাধটুকু পূর্ণ করে দিয়েছেন। এতে কুল রক্ষা হয়েছে, তাঁর বন্ধু রামকমল সিংহ তৃপ্তির সঙ্গে শেষ নিশ্বাস ফেলেছেন, এর চেয়ে বড় পুণ্যকর্ম আর কী হতে পারে। নিছক ভোগ লালসার দৃষ্টিতে বিম্ববতীকে কখনো দেখেননি বিধুশেখর, শুধুমাত্র সন্তান জন্মের প্রয়োজনেই তিনি সহবাস করেছেন বিম্ববতীর সঙ্গে এবং নবীনকুমারের জন্মের পর আর একবারও তিনি বিম্ববতীকে শয্যাসঙ্গিনী হবার জন্য আহ্বান জানাননি। এখন বিম্ববতী বিধবা, আর তো সে প্রশ্নই ওঠে না।

কৃষ্ণনগর যাত্রার প্রাক্কালে নিজ স্ত্রী সৌদামিনীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছেন বিধুশেখর, কিন্তু বিম্ববতীর সঙ্গে একবার দেখাও করে আসতে পারেননি। বিম্ববতী লোকমুখে সংবাদ পাবেন যে বিধুশেখর শহরে নেই। তাতে কী বিম্ববতীর ক্ষীণতম অভিমানও হবে না?

গাড়ি হঠাৎ থেমে যেতেই বিধুশেখর বাইরে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী রে, থামলি কেন? ব্যাটারা শিগগির চল!

ওপর থেকে একজন পাইক বললো, হুজুর কোম্পানীর ফৌজ আসছে!

বিধুশেখর বিউগিলের শব্দ শুনতে পেলেন।

কোম্পানীর সেপাইরা মার্চ করে আসছে, এখন পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াতে হবে। বিধুশেখরের গাড়ি নেমে গেল একটা মাঠের মধ্যে। বিধুশেখর দেখলেন প্রায় সহস্রাধিক পদাতিক ও অশ্বারোহী, এরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। অনেকখানি সময় নষ্ট হলো।

সামনে মাত্র দশ বারো জন গোরা সৈন্য, বাকি সবই দেশী সেপাই। বিখ্যাত বেঙ্গল রেজিমেণ্ট। কলকাতা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত সবাই এই বেঙ্গল রেজিমেণ্টের নামে ভয়ে কাঁপে। দেশে এখন যুদ্ধবিগ্রহ নেই, সর্বত্রই শান্ত অবস্থা তবু কোম্পানির সৈন্যবাহিনী মাঝে মাঝেই পথ পরিক্রমা করে। শান্তি বজায় রাখার জন্য মাঝে মাঝে শক্তি সামর্থ্যের প্রদর্শন করা বৃটিশ জাতির রণকৌশলের একটি অঙ্গ। রেজিমেণ্টে অবশ্য বাঙালী নেই, সিপাহীরা সকলেই পশ্চিমী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতীয়। বাঙালী জাতি যুদ্ধবিদ্যা ভুলে গেছে। কলকাতায় রাজধানী স্থাপন করার পর, সেই রাজধানীকে সুরক্ষিত করার জন্য ইংরেজরা বাঙালীদের হাত থেকে তলোয়ার-বন্দুক কেড়ে নিয়ে তার বদলে কলম ধরিয়ে দিয়েছে।

বিধুশেখর মুগ্ধভাবে তাকিয়ে রইলেন সৈন্যবাহিনীর দিকে। কী সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে চলেছে সিপাহীরা। ইংরেজ জাতির শিক্ষার কী গুণ, দশ-বারোজন মাত্র গোরা সৈন্যের হুকুমে সহস্র সহস্র দেশী সৈন্য নীরবে মাথা নীচু করে চলে। বিধুশেখর তাঁর ঠাকুর্দার মুখে গল্প শুনেছেন যে সেকালে নবাবী ফৌজকে আসতে দেখলেই গ্রামে-জনপদে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তো। বিনা প্ররোচনায় লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ ও হত্যা ছিল নবাবী ফৌজের ব্যসন। সে অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য কোথাও নালিশ জানাবারও উপায় ছিল না। তাই নবাবী ফৌজকে আসতে দেখলেই সবাই বনে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঈশ্বরকে ডাকতো। সেই তুলনায় ইংরেজ জাতি কত ভদ্র, সভ্য। কোম্পানির ফৌজ কখনো অকারণে লুঠ-পাট করে না। বরং কোম্পানির ফৌজ যে পথ দিয়ে যায়, সে অঞ্চলে আর বহুদিন দস্যু-তস্করের উপদ্রব থাকে না।

ফৌজী কলম ছেড়ে একজন গোরা অশ্বারোহী ছুটে এলো বিধুশেখরের গাড়ির দিকে। জুড়ি ঘোড়ার একটির গায়ে এক ঘা চাবুক কষিয়ে সে জিজ্ঞেস

করলে, সাইস, ভিতরে কে আছে? জেনানা না মর্দানা?

বিধুশেখর মুখ বাড়িয়ে বললেন, আই অ্যাম স্যার।

গোরা সৈনিকটি বয়েসে অতি তরুণ, দুপুরের রৌদ্রে মুখখানি টকটকে লাল। সে আবার শূন্যে চাবুকের শব্দ করে বললো, তুমি কোন মহারাজা আছো? কম্পানির ফৌজ যাইতেছে, নামিয়ে দাঁড়াও নাই কেন?

গোরা সৈনিকের দুর্বোধ্য ভাষণ বিধুশেখর ঠিক বুঝতে পারলেন না। তবু দ্রুত নেমে এসে একটি সেলাম ঠুকলেন।

গোরা সৈনিক জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে?

বিধুশেখর বললেন, বিধুশেখর মুখুজ্যে স্যার, লা ইয়ার, স্যার; প্র্যাকটিস ইন সিভিল কোর্ট স্যার!

—উষ্ণীব খোলো, কুক্কুরীর সন্তান!

বিধুশেখর পুরোপুরি আইনজীবীর বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে বেরিয়েছিলেন। চোগা চাপকান ও মাথায় পাগড়ি। তিনি দেখলেন যে অন্য গাড়ির পাইক বরকন্দাজরা আগেই গাড়ি থেকে নেমে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র পায়ের কাছে রেখে হেঁট মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে। বিধুশেখর বাইরে বেরোন কম, আগে কখনো কোম্পানির ফৌজের সামনে পড়েননি, তাই এ সব নিয়ম কেতা জানেন না।

তিনি তাড়াতাড়ি পাগড়ি খুলে সাহেবটিকে আবার সেলাম জানালেন।

অশ্বারোহী সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে ধুলো উড়িয়ে আবার ছুটে গেল। কী অপূর্ব দার্ঢ্যময় তেজীয়ান তার ভঙ্গি, যেন চোখের নিমেষে সে আবার ফিরে গিয়ে মিশে গেল মূল বাহিনীর সঙ্গে।

যতক্ষণ ওদের দেখা যায় ততক্ষণ বিধুশেখর এক হাতে পাগড়ি নিয়ে অন্য হাতে সেলামের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলেন। এ জন্য তিনি ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত বোধ করলেন না। ইংরেজ এদেশে শান্তি ও ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠা করেছে। তার বিনিময়ে এইটুকু সম্ভ্রম তো তারা দাবি করতেই পারে। রাজার জাতি হিসেবে শক্তিমান ইংরেজের প্রতি বিধুশেখরের রীতিমতন শ্রদ্ধাই আছে, কিন্তু তারা যখন ম্লেচ্ছ শিক্ষা প্রবর্তন কিংবা এ দেশের ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করে, সেগুলিই শুধু বিধুশেখর সহ্য করতে পারেন না।

কোম্পানির ফৌজের জন্য দেড় ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করার পর বিধুশেখর আবার যাত্রা শুরু করলেন। এরপর আর কোন বিঘ্ন ঘটলো না। পথে একস্থানে রাত্রিবাস করে কৃষ্ণনগর পৌঁছোলেন পরদিন দ্বিপ্রহরে।

নিজেদের বাড়িতে এসে বিধুশেখরের প্রায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ার মতন অবস্থা হলো। তাঁর কন্যা সুহাসিনী তখনো বেঁচে আছে বটে কিন্তু একেবারে যেন শেষ অবস্থা এবং তার স্বামী দুর্গাপ্রসাদও সমানভাবে পীড়িত। তাদের দুজনেরই কালাজ্বর হয়েছে।

দিবাকররা আগেই পৌঁছে গিয়ে চিকিৎসাপত্রের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করেছে বটে, কিন্তু আশা খুব কম। কালাজ্বর যেন সাক্ষাৎ কালান্তক যম, একবার ছুঁলে আর নিস্তার নেই। যশোর বা খুলনার দিকে হাজার হাজার লোক এই ব্যাধিতে মারা যাচ্ছে, এখন সেই রোগ কৃষ্ণনগরেও এসে উপস্থিত হয়েছে। ইতিমধ্যেই কালাজ্বরের কালগ্রাসে পতিত হয়েছে বেশ কয়েকজন।

বিধুশেখর যেন উন্মত্তবৎ হয়ে উঠলেন। এ জীবনে তিনি মৃত্যু কম দেখেননি। মৃত্যু তো জীবের অমোঘ ভবিতব্য, যার যখন যাবার কথা যেতেই হবে। কিন্তু বিধুশেখর যেন কিছুতেই তাঁর প্রিয়তমা কনিষ্ঠা কন্যা আর তার স্বামীর বিয়োগ

যন্ত্রণা সইতে পারবেন না। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের সংগে তাঁর পূর্ব থেকেই পরিচয় ছিল, সেই দেওয়ানজীকে ধরে রাজবাড়ির চিকিৎসককে তিনি আনাবার ব্যবস্থা করলেন। এখানকার একজন পাদ্রীর সুচিকিৎসক হিসেবে সুনাম আছে, তাঁকেও নিয়ে এলেন কাকুতি মিনতি করে। এমনকি এক মৌলভি হেকিমী চিকিৎসককেও নিয়ে আসা হলো। পালা করে দেখতে লাগলেন তাঁরা তিনজনে। কেউই সুনির্দিষ্ট ভরসা দিতে পারছেন না। তবু যেন চলতে লাগলো যমে মানুষের লড়াই!

বিধুশেখর আহার নিদ্রা ত্যাগ করলেন। পাশাপাশি দুই শয্যায় শুয়ে আছে সুহাসিনী ও দুর্গাপ্রসাদ। তাদের শিয়রের কাছে আসন নিলেন বিধুশেখর। মাঝে মাঝেই তিনি একবার সুহাসিনী একবার দুর্গাপ্রসাদের মুখের কাছে মুখ ঝুঁকিয়ে এনে উদগ্রীবভাবে চেয়ে থাকেন, যদি কেউ কোনো কথা বলে। কিন্তু দুজনেরই বাগ্‌রোধ হয়ে গেছে।

সেই রাত কেটে গেল, পরের দিনেও একই অবস্থা। দুজনেরই যেন মৃত্যুর রঙ মাখা পাণ্ডুর মুখ, সামান্য নাড়ীর স্পন্দনে শুধু তাদের জীবনের স্পন্দন টের পাওয়া যায়। কবিরাজী, ইংরাজী ও হেকিমী এই তিন প্রকার ওষুধের তীব্র ঝাঁঝেই সম্ভবত তাদের প্রাণপাখি খাঁচা ছেড়ে বেরুতে পারছে না। তবে আর একটা রাত কাটবে কী না সন্দেহ।

সেই রাতে, রোগীদের ঘরে একা একা ঠায় বসে থেকে এক সময় বুঝি বিধুশেখরের তন্দ্রা এসে গেল। তিনি নিজেও সেটা বুঝতে পারলেন না। তাঁর ধারণা, তিনি তখনো জেগে আছেন।

বিধুশেখর দেখলেন, হঠাৎ সমস্ত ঘর এক দিব্য আলোয় ভরে গেল, এক স্বর্গীয় সৌরভে আমোদিত হলো সেই বন্ধ ঘরের বাতাস। তারপর আস্তে আস্তে ফুটে উঠলেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ।

বিধুশেখর মনে করলেন, এই বুঝি যমরাজ। স্বয়ং এসেছেন তাঁর কন্যা জামাতাকে নিয়ে যেতে।

তিনি হাত জোড় করে বললেন, প্রভু, দয়া করুন, যদি সারা জীবনে কিছু সৎ কর্ম করে থাকি, তবে তার বিনিময়ে এই দুজনের প্রাণ ভিক্ষা দিন।

তখন সেই মূর্তি বললেন, বিধু, চেয়ে দ্যাখো।

বিধুশেখর ভালো করে দেখে তাঁর ভ্রম বুঝলেন। ইনি তো যমরাজ নন, ইনি তো স্বয়ং জনার্দন, চার হাতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম, মুখে মায়া-রহস্য-কৌতুক মেশা হাসি। ঠিক বিধুশেখরের গৃহদেবতার বেশে ইনি এসেছেন। তখন অপূর্ব এক পুলকে বিধুশেখরের শরীর রোমাঞ্চিত হলো। তাঁর জীবন আজ ধন্য। জগৎপতি জনার্দন তাঁকে দেখা দিয়েছেন, আজ এই সংকটের রাত্রে, তবে তো আর ভয় নেই।

বিধুশেখর আচ্ছন্নের মতন মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। পুনর্বার মাথা তুলতে তাঁর ভয় হলো। যদি সেই মূর্তি আর দেখতে না পান।

তবু, মুখ তুলে দেখলেন। সেই মূর্তি সেই রকমই স্ফুরিত হাস্যে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন।

বিধুশেখর বললেন, হে গিরিধারী, মধুকৈটভহারি, দয়াল, দীনবন্ধু, আমায় ভিক্ষা দিন!

জ্যোতির্ময় পুরুষ বললেন, আমি তো দিতেই এসেছি।

বিধুশেখর বললেন, আমার প্রাণসম কন্যা, আমার জামাতা—

যে হাতে পদ্ম ধরা, সেই হাতের একটি আঙুল দেখিয়ে সেই জ্যোতির্ময়

পুরুষ বললেন, একজন!

বিধুশেখর বুঝতে পারলেন না। হতবুদ্ধির মতন তাকিয়ে রইলেন।

সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ আবার বললেন, যে কোনো একজন। তুমি বেছে নাও, আমি যে কোনো একজনের প্রাণভিক্ষা দেবো!

বিধুশেখরের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো। তিনি কোনো কথাই আর বলতে পারলেন না। যে কোনো একজন? তিনি কার প্রাণভিক্ষা চাইবেন? সুহাসিনীর? কিন্তু দুর্গাপ্রসাদ?

বিধুশেখর দেখলেন সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের দেহটি যেন দীপশিখার মতন একটু একটু কাঁপছে। হয়তো এখুনি আবার মিলিয়ে যাবেন।

বিধুশেখর ক্রন্দন মিশ্রিত ব্যাকুল গলায় বললেন, প্রভু, আমার পুত্র নেই, এই জামাতাই আমার পুত্রের স্থান নিয়েছে, আর সুহাসিনী আমার দুই নয়নের মণি, তাকে ছেড়ে আমি...তার গর্ভধারিণীও আর বাঁচবেন না—

জ্যোতির্ময় পুরুষের মূর্তিটি আরও বেশী কাঁপছে। সত্যিই বুঝি মিলিয়ে যাবার আর দেরী নেই। জলদগম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, একজন!

মুহূর্তে মনস্থির করে ফেললেন বিধুশেখর। সুহাসিনীর মাত্র তের বৎসর বয়েস, দুর্গাপ্রসাদ মারা গেলে তার সামনে পড়ে থাকবে দীর্ঘ বৈধব্য জীবন। কন্যাদের বৈধব্য দশা দেখে দেখে আর বিধুশেখর সহ্য করতে পারছেন না, বিধবা অবস্থায় সুহাসিনী যদি ভ্রষ্টা হয়, যদি কুলে কালি দেয়, তাহলে ইহকাল পরকাল সব যাবে। দুর্গাপ্রসাদ পুরুষ মানুষ, পত্নী বিয়োগের দুঃখ সে সামলে উঠতে পারবে, সে বুদ্ধিমান, কৃতবিদ্য, এক জীবনে তার আরও অনেক কিছু পাবার থাকবে। কিন্তু সুহাসিনীর যে কিছুই থাকবে না।

বিধুশেখর বললেন, দুর্গাপ্রসাদ—

জ্যোতির্ময় পুরুষ সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেলেন। সেই দিব্য আলো ও দিব্য সৌরভও অন্তর্হিত হলো। প্রদীপের মৃদু আলোক ও ধোঁয়ায় মাখা ঘরখানি আগেকার চেহারা ফিরে পেল আবার।

বিধুশেখর যেন এই অন্তর্ধান সহ্য করতে পারলেন না। আর একবার দর্শন পাবার বাসনায় ছুটে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। প্রভু প্রভু বলে চিৎকার করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পড়ে গেলেন হুড়মুড়িয়ে।

নীচতলায় দিবাকর ও অন্য লোকজনরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো শব্দ শুনে। তারা দেখলো, বিধুশেখর বাহ্যজ্ঞানহীন। তাঁকে ধরাধরি করে এনে শুইয়ে দেওয়া হলো একটি খাটে। একজন ছুটে গেল রাজবৈদ্যকে ডেকে আনতে। অন্যরা বিধুশেখরের মাথায় জল ঢালতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর বিধুশেখরের চৈতন্য হলো কিন্তু কোনো কথা বলতে পারলেন না। শুধু মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ বার করতে লাগলেন। সবাই মনে করলো, বিধুশেখরকে ওলায় ধরেছে। ঘুমের মধ্যে অনেক সময় এরকম হয়।

বিধুশেখরকে জোর করে তুলে বসিয়ে দুজনে দুদিকে চেপে রইলো আর দিবাকর ওঁর কানে রাম নাম শোনাতে লাগলো।

এক সময় বিধুশেখর পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে পেলেন। স্বাভাবিক স্বরে বললেন, আমায় ধরে আছিস কেন? ছেড়ে দে!

তারপরই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে দিবাকরকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ওরে, আমি কী দেকলুম! আমি কী দেকলুম!

কঠোর ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বিধুশেখরকে এইভাবে কাঁদতে কেউ

কখনো দেখেনি। সুহাসিনীর ঠিক আগের বোনটিরও তো মৃত্যু হয়েছে বিধুশেখরের সামনেই, তখনো তো এমন দুর্বল হয়ে পড়েননি তিনি!

রাজবৈদ্য যখন এলেন, তখনই বিধুশেখর আপনমনে অশ্রুপ্লুত কণ্ঠে বার-বার বলে যাচ্ছেন, আমি কী দেকলুম! আমি কী দেকলুম!

রাজবৈদ্য ওপরে এসে পরীক্ষা করে বুঝলেন, সুহাসিনী ও দুর্গাপ্রসাদের অবস্থা একই রকম আছে। দুজনেরই এখনো নাড়ীর স্পন্দন পাওয়া যায়। তাহলে বিধুশেখর হঠাৎ এত কান্নাকাটি করছেন কেন?

দেবতাদের কী অপূর্ব লীলা! মানুষকে যে তাঁরা কত রকম পরীক্ষায় ফেলেই দেখতে চান, তার আর কোনো ইয়ত্তা নেই।

পরদিন সকালেই দুর্গাপ্রসাদ মারা গেল এবং সুহাসিনী ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলো। দু দিনের মধ্যেই সুহাসিনীর মৃত্যু আশঙ্কা কেটে গেল একে-বারে। সে যে ইতিমধ্যে বিধবা হয়ে গেছে তা সে জানতেও পারেনি।

বিধুশেখর একেবারে বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। এ কী হলো? তিনি তো দুর্গাপ্রসাদেরই জীবন ভিক্ষা চেয়েছিলেন। তবে কি সেটা তাঁর মনের কথা ছিল না? সর্বজ্ঞ ভগবান কি তাঁর মনের কথা বুঝেই বিপরীত বর দিয়ে গেলেন? কিন্তু গর্ভবতী অবস্থায় বিধবা হয়ে সুহাসিনী দীর্ঘ বিড়ম্বিত জীবন নিয়ে কী করবে? বালবিধবার পক্ষে মৃত্যুই যে আশীর্বাদ।

সুহাসিনী তখনও শয্যাশ্রিতা, উঠে দাঁড়াবার মতন পায়ের জোর পায়নি, সেই অবস্থাতেই তার হাতের শাঁখা ভেঙে, সিঁথের সিঁদুর মুছে দেওয়া হলো। কৃষ্ণনগরের স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি পরামর্শ দিয়েছিলেন, আর কয়েকটা দিন যাক, রুগ্ণা মেয়েটিকে এখনই এমন নিদারুণ শোক সংবাদ জানাবার দরকার নেই।

কিন্তু বিধুশেখর এমন অনাচার হতে দিতে পারেন না। স্বামীর শবদেহ দাহ করা হয়ে গেছে। তার পরেও কোনো হিন্দু রমণী শাঁখা সিঁদুর পরে থাকতে পারে না। সেকালের মুনি-ঋষিরা মূর্খ ছিলেন না। তাঁরা যা নির্দেশ দিয়ে গেছেন, অনেক ভেবেচিন্তেই দিয়েছেন। একজনের পাপে সমগ্র সমাজ ছারেখারে যেতে পারে। ঠাকুর যখন পরীক্ষায় ফেলেছেন, তখন সব কিছু জেনেই বিধুশেখরকে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করতে হবে। সত্যিকারের পুরুষকার যদি থাকে, তাহলে নিয়তির মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে, কোনো কিছুতেই ভয় পেলে চলবে না। বিধুশেখর ভয় পান না।

গলায় জোর নেই, তাই সুহাসিনী ডুকরে কাঁদতে পারলো না। ওষ্ঠ দংশন করে সে চোখের জলে বালিশ ভেজাতে লাগলো। মাত্র তের বৎসর বয়েস হলেও বৈধব্য যন্ত্রণা কী বস্তু, তা সে জানে। সে তার দিদি বিন্দুবাসিনীকে দেখেছে।

কন্যাকে নিয়ে আড়াই মাস কাল কৃষ্ণনগরেই থেকে গেলেন বিধুশেখর। চিকিৎসকের নির্দেশ মতন তখনও সুহাসিনীকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া চলে না। অনেক প্রয়োজনীয় কাজ থাকা সত্ত্বেও বিধুশেখর ফিরতে পারলেন না। কন্যাকে কার ভরসায় রেখে যাবেন? কলকাতার সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদান চলে নিয়মিত। তাঁর পত্নী সৌদামিনী এখন একটু সুস্থই আছেন। দুর্গাপ্রসাদের মৃত্যু সংবাদ তাঁকে জানানো হয়নি।

তারপর এক রাত্রে সুহাসিনীর প্রসব বেদনা উঠলো। এবং যথা সময়ে সে জন্ম দিল একটি পুত্র সন্তানের। পুত্র! প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর বিধুশেখরের বংশে এই প্রথম পুত্র সন্তান এলো। আর এই পুত্রটি গর্ভে থাকা অবস্থায় বিধুশেখর তাঁর

কন্যার মৃত্যু কামনা করেছিলেন।

সেকথা চিন্তা করেই বিধুশেখর শিহরিত হলেন।



সেই লাজুক স্বল্পভাষী কিশোরটি আর নেই। এক সময় যার উপস্থিতিই টের পাওয়া যেত না এই গৃহে। এখন গঙ্গানারায়ণ বলিষ্ঠকায় রাশভারী যুবা। তার গৌরবর্ণ মুখে শ্যামল কোমল গুম্ফ দাড়ি গজিয়েছে কিছু কিছু। তার গুম্ফটি যদিও এখনো সুবিন্যস্ত করার মতন স্বাস্থ্যবান হয়নি, তবু কারুর সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে কথা বলবার সময় সে তার নরম গুম্ফের একপ্রান্ত পাকাবার চেষ্টা করে যায়।

এখন আর সহাধ্যায়ী বন্ধুদের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপে কালক্ষেপণ করে না গঙ্গানারায়ণ। সকালে কাছারিঘরে সে নিজে উপস্থিত থেকে গোমস্তা কর্মচারিদের নানাপ্রকার কাজের নির্দেশ দেয়। তারপর আহারাদি সম্পন্ন করে সে তাদের তিনটি হৌস পরিদর্শনে যায়, তার কোটের পকেটে একটি ঘড়ি থাকে, কোনোদিন সে এক মিনিটও সময়ের ব্যত্যয় করে না। কোনো কোনো দিন সন্ধ্যাকালেও ব্যবসায় কার্যের পরামর্শের জন্য বাড়িতে লোকজন আসে, তাদের সঙ্গে গঙ্গানারায়ণ অনেক রাত পর্যন্ত নিযুক্ত থাকে। বিধুশেখরও উপস্থিত থাকেন সেখানে আর মাঝে মাঝেই তাঁর সঙ্গে গঙ্গানারায়ণের তর্কদ্বন্দ্ব বেঁধে যায়।

অবশ্য তার ভিতরের রোমান্টিক, আবেগপ্রবণ মনটি এখনো রয়ে গেছে, এখনো সে বিরলে গ্রন্থপাঠ করতে করতে অশ্রু বিসর্জন করে। তার স্ত্রী লীলাবতী অধিকাংশ সময়ই থাকে পিত্রালয়ে। লীলাবতীর বালিকা স্বভাব আর ঘুচলো না, বাবা-মা ও পুতুল খেলার সঙ্গিনীদের ছেড়ে সে এখনো বেশী দিন থাকতে পারে না, নানান ছুতো দেখিয়ে তো প্রায়ই বাগবাজারে বাপের বাড়ি চলে যায়। গঙ্গানারায়ণ অবশ্য এজন্য কোনোদিনই আপত্তি জানায়নি, লীলাবতী সম্পর্কে তার মনে বিন্দুমাত্র আগ্রহ জাগেনি। নিজের কক্ষে একাকী গঙ্গানারায়ণ এক একদিন দীপের আলোকে পুস্তক পাঠ করতে করতে সারারাত্রি জেগে কাটিয়ে দেয়।

ইদানীং সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে তার আগ্রহ জেগেছে, ইংরেজী কাব্যগুলির পাশাপাশি সে সংস্কৃত কাব্যগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে পড়ে। তবে, সংস্কৃত কাব্যগুলিতে শৃঙ্গার রসের বড় আধিক্য, পড়তে পড়তে তরুণ গঙ্গানারায়ণের কর্ণমূল আরক্ত হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে বই মুড়ে রেখে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে থাকে। সেই সব গভীর নির্জন মধ্যরাত্রে বিন্দুবাসিনীর কথা তার মনে পড়ে যায়, তার অন্তরের মধ্যে সে যেন শুনতে পায় ঝড়ের গর্জন। সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে তার আর কোনোদিন দেখা হবে না!

প্রায় সকালে গঙ্গানারায়ণের ঘুম ভাঙে এক কচি সুরেলা কণ্ঠে সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ শুনে। নবীনকুমারের বয়েস এখন আট বছর, সে জেগে ওঠে অতি প্রাতে এবং দ্বিতলের বারান্দায় ঘুরে ঘুরে উচ্চকণ্ঠে স্তোত্র পাঠ করে। আশ্চর্য এই বালকের স্মৃতিশক্তি, এতটুকু বয়েসেই সে মহাভারতের কঠিন কঠিন শ্লোক কণ্ঠস্থ করে ফেলেছে। তার মেধা দেখে সকলেই চমৎকৃত। বিম্ববতী নবীন-

কুমারকে চোখের আড়াল করতে চান না বলে এখনও নবীনকুমারকে কোনও বিদ্যালয়ে পাঠানো হয় না, কিন্তু গঙ্গানারায়ণ তার কনিষ্ঠ ভ্রাতার শিক্ষার জন্য ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি করেনি। সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজ থেকে বাছাই করা তিনজন ছাত্রকে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে, তাঁরা নবীনকুমারকে সংস্কৃত, ইংরেজী ও অঙ্ক শিক্ষা দেন। এ ছাড়া নবীনকুমারের সঙ্গীত প্রীতি লক্ষ্য করে এক ওস্তাদজীকেও মাসোহারার বন্দোবস্তে রাখা হয়েছে বাড়িতে, তাঁর কাছ থেকে নবীনকুমার কণ্ঠ সঙ্গীতের তালিম নেবে। ভিখারি বৈরাগীদের গান শুনলেই নবীনকুমার ঠিক ঠিক শিখে নেয়, যে-সব গানের কথার অর্থ তার একেবারেই বোঝার কথা নয়, সেগুলিও সে বেশ ভাব দিয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে গায়। মাঝে মাঝে সে তার মায়ের সামনে নানাপ্রকার নাট্য রঙ্গ করেও দেখায়, কোথা থেকে যে সে এসব শেখে, কে জানে!

নবীনকুমার তার দাদা গঙ্গানারায়ণকে বড় ভালোবাসে। নবীন কিছু নতুন পাঠ শিখলেই সেটি তার দাদাকে শোনানো চাই। গঙ্গানারায়ণ ঘুম থেকে উঠেই নবীনকুমারকে নিজের ঘরে ডেকে আনে। আদর করে তাকে পাশে বসিয়ে নবীনকুমারের নবলব্ধ জ্ঞানের পরীক্ষা করে।

গঙ্গানারায়ণ জিজ্ঞেস করে, গাড মানে কী?

নবীন বলে, ঈশ্বর!

গঙ্গানারায়ণ আবার বলে, লার্ড?

নবীন বলে, প্রভু।

তারপর নবীন নিজেই গড় গড় করে হাততালি দিতে দিতে বলে, আমি ফিলজফর মানে জানি! বিজ্ঞলোক। আর প্লৌম্যান মানে চাষা!

নবীনেতে আর গঙ্গানারায়ণে এই সখ্য বিধুশেখরের চক্ষুশূল। গঙ্গানারায়ণ বেয়াদপী শুরু করলেও বিধুশেখর জানেন, একদিন নবীনকুমারকে দিয়েই তিনি এ গৃহ থেকে গঙ্গানারায়ণকে উৎখাত করাবেন। এর জন্য প্রয়োজন শুধু অপেক্ষা। নবীনকুমার আর একটু বড় হোক, তখন বিধুশেখর দেখবেন গঙ্গানারায়ণের দর্প কীভাবে ভাঙতে হয়।

বিম্ববতী এক অপরাহ্লে ডেকে পাঠালেন গঙ্গানারায়ণকে। সকালবেলা বিম্ববতী যখন তাঁর পোষা পাখিদের ছোলা খাওয়ান তখন একবার গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। গঙ্গানারায়ণ এসে জননীকে প্রণাম করে, দু-একটি কুশল বাক্য বিনিময় হয় তখন। বৈষয়িক ব্যাপারে কোনো আলোচনা থাকলে দিনের অন্য সময়ে গঙ্গানারায়ণ নিজেই খবর পাঠিয়ে বিম্ববতীর কাছে যায়। অপরাহ্লে বিম্ববতী স্বয়ং যখন এত্তেলা পাঠিয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই কিছু গুরুতর ব্যাপার আছে।

অবশ্য ব্যাপারটি তেমন কিছু গুরুতর নয়।

গঙ্গানারায়ণ এসে মায়ের পদধূলি নিয়ে নত মস্তকে দাঁড়াবার পর বিম্ববতী বললেন, বাগবাজার থেকে তত্ত্ব এয়েচে আজ, তুই শুনিচিস?

গঙ্গানারায়ণ একটু বিমূঢ় বোধ করলো। বাগবাজারে তার শ্বশুরালয়। তত্ত্ব সেখান থেকেই এসেছে মনে হয়। কিন্তু একথা তাকে জানাবার কী আছে? তত্ত্ববাহিকারা বড় বড় পরাতে নানাপ্রকার জিনিস সাজিয়ে অন্দরমহলেই চলে আসে এবং গৃহকর্ত্রীর কাছ থেকেই তারা দক্ষিণা পায়। এসব মেয়েমহলের ব্যাপার, গঙ্গানারায়ণ মাথা ঘামাতে চায় না।

গঙ্গানারায়ণ শুষ্ক কণ্ঠে বললো, ও!

বিম্ববতী হেসে ফেলে বললেন, ও কী? তুই এর মর্ম বুঝলিনি?

গঙ্গানারায়ণ বললো, তত্ত্বের আবার মর্ম কী মা?

বিম্ববতী বললেন, পালা-পার্বণ কিচু নেই। জামাইষষ্ঠী নয়, তিলষষ্ঠী নয়, সংক্রান্তি নয়, দধিমুখ নয়, হঠাৎ অমনি অমনি তত্ত্ব পাঠালে? তুই এটাও বুজিস না?

গঙ্গানারায়ণ বললো, দ্যাখো গে ও বাড়িতে বোধহয় কোনো ব্রত-ট্রত আচে—

—না রে না। বেয়ান আমায় ঠেস দিয়েচে! ছ' মাস হয়ে গ্যালো, লীলাবতীকে আমরা ও বাড়ি ঠেঙে আনিনি, তুই একবার খোঁজ নিতেও যাসনি, তাই তত্ত্ব পাঠিয়ে বেয়ান আমাদের মনে করিয়ে দিলে।

—ও!

—আবার ও! একটা ব্যবোস্তা কর। ওঁরা বারো মাতা তত্ত্ব পাঠিয়েচে, আমি কালই ষোলো মাতা পাটাচ্চি, জনার্দন আর দেবীপদকে বলিচি ভালো সন্দেশ আর দশসেরি রুই মাচ জোগাড় করতে, তারপর পরশুদিন তুই গিয়ে লীলাকে নিয়ে আয় গে যা।

গঙ্গানারায়ণ উদাসীনভাবে বললো, আমি যে এখন বড়ই কাজে ব্যস্ত মা, আমি তো যেতে পারবো না, অন্য কারুকে পাঠিয়ে দাও।

—তা কি হয়? তোকে নিজে যেতে হয়। তুই একেবারে শ্বশুরবাড়িমুখো হতে চাস না কেন?

—আমায় যেতে গেলে অনেক দেরি হবে। এ মাসে সময় হবে না।

বিম্ববতী গঙ্গানারায়ণের পিঠে তাঁর সস্নেহ হাতটি রেখে বললেন, যা একবারটি ঘুরে আয়। এই তো বাগবাজার, কতটুকুই বা রাস্তা! তোর শ্বশুরবাড়ি অত বড় মানী বংশ, তুই নিজে না গেলে তাঁরা মেয়ে পাঠাবেনই না। লীলাকে এত বেশী দিন বাপের বাড়ি ফেলে রাখা ভালো দেকায় না। তুই এই একবারটি যা, আর যেতে হবে না। পুরুষমানুষের বেশী শ্বশুরবাড়ি না যাওয়াই ভালো...এই দ্যাক না, তোর বাবা...বিয়ের পর সেই যে আমি এয়িচিলুম, আর কোনোদিন বাপের বাড়ি চক্ষে দেকিনি, আমায় যেতে দিলেন না, উনিও কখনো গেলেন না।

অকস্মাৎ রামকমল সিংহের প্রসঙ্গ এসে পড়ায় বিম্ববতী চক্ষে আঁচল দিলেন।

মায়ের অনুরোধ ঠেলতে পারলো না গঙ্গানারায়ণ, বাগবাজার থেকে লীলাবতীকে নিয়ে আসতে হলো তাকে। এবার যেন সে লীলাবতীর বেশ খানিকটা পরিবর্তন দেখতে পেল। এই কয়েক মাসেই অনেকখানি লম্বা হয়ে গেছে লীলাবতী, মুখের চামড়ায় চিক্কণ ভাব এসেছে, হাত ও পায়ের গড়নে সুডৌল ভাব, বালিকাসুলভ চাপল্যের বদলে তার ব্যবহারে এখন লাজুকতাই বেশী। এর আগে লীলাবতীকে তেমনভাবে লক্ষ্য করার কোনো সুযোগই হয়নি গঙ্গানারায়ণের। লীলাবতীর সঙ্গে সারাদিন তার দেখাই প্রায় হয় না, রাত্রে যখন সে শুতে আসে ততক্ষণে লীলাবতী ঘুমে বিভোর। এবারও গঙ্গানারায়ণ তার স্ত্রী সম্পর্কে বিশেষ কোনো আগ্রহ বোধ করলো না। মায়ের আদেশে স্ত্রীকে সে এনেছে, এখন মা-ই ওর ভার নেবেন।

এক সকালে নবীনকুমার তার দাদার কাছে নালিশ জানাতে এলো। বড় বৌঠান পড়াশুনোয় বড়ই অমনোযোগী। সে এত চেষ্টা করছে, তবু বড় বৌঠান কিছুতেই পড়বে না।

গঙ্গানারায়ণ কৌতুক বোধ করলো।

মাঝে মাঝে সে দেখেছে বটে যে বালক নবীনকুমার আর একজন বালকের

ওপর গুরুমশাইগিরি করছে। এই বালকটি ভৃত্য মহলেরই কারুর সন্তান, তার ওপরে আসা ব্যাপারে অনেক বারই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, কিন্তু নবীনকুমার কান্নাকাটি করে প্রতিবারই ভেঙে দিয়েছে সেই নিষেধাজ্ঞা। নবীনকুমারের কোনো খেলার সংগী নেই, মায়ের সংগে ছাড়া কখনো সে বাড়ির বাইরে যেতে পারে না, সেইজন্য বালকটিকে সে সংগী হিসেবে চায়। শেষ পর্যন্ত সেই বালকটিকে নবীনকুমারের নিজস্ব ভৃত্য করে নেওয়া হয়েছে। সে ছেলেটি নবীনকুমারের সংগে খেলে, তার হুকুম তামিল করে আবার তার ছাত্র সেজেও বসে। পড়া না পারলে নবীনকুমারের হাতে সে মারও খায়।

গংগানারায়ণ জিজ্ঞেস করলো, তুই বড় বৌঠানকেও পড়াতে শুরু করিচিস? বাঃ খুব ভালো কথা! তাহলে তো তোর জন্য গুরুদক্ষিণার ব্যবস্থা করতে হয়!

নবীনকুমার বললো, বড় বৌঠান আমার কতা শোনে না। খালি খালি হাসে। তুমি ওকে বকে দেও!

গংগানারায়ণ হাসতে হাসতে বললো, কেন, হাসে কেন? খুব অন্যায়!

নবীনকুমার বললো, বড় বৌঠানকে আমি কেতাব দিয়ে দিয়িচিলুম তা ছিঁড়ে ফেলেচে! আমি মারতে গেলুম, অমনি মা'র কাচে গিয়ে নুকোলো!

গংগানারায়ণ হাসতে লাগলো খুব।

সারাদিন নানান কাজের মধ্যেও এই কথাগুলো ঘুরতে লাগলো গংগানারায়ণের মাথায়। লীলাবতীকে সত্যি সত্যি পড়াশুনো শেখালে কেমন হয়? ধর্মপত্নীকে তো সে আর ফেলতে পারবে না, সারাজীবন এর সংগেই কাটাতে হবে। যদি নিজের মতন তৈরি করে নেওয়া যায়, তবে লীলাবতী হয়তো একদিন তার যোগ্য সহধর্মিণী হয়ে উঠতে পারবে। খৃষ্টান মেয়েরা আজকাল অনেকেই লেখাপড়া শেখে। লীলাবতীর জন্য একজন ইওরোপীয় মহিলাকে বাড়িতে এসে শিক্ষা দিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। গংগানারায়ণ জানে যে তার মা বিম্ববতী এতে আপত্তি করবেন না। আর বিধুশেখর আপত্তি করলেই বা কী যাবে আসবে? বিধুশেখর বিন্দুবাসিনীর শিক্ষা মধ্যপথে বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তখন গংগানারায়ণ কোনো প্রতিকার করতে পারেনি। কিন্তু লীলাবতীর ক্ষেত্রে সে রকম কোনো বাধাই আসতে পারবে না।

গংগানারায়ণ বিন্দুবাসিনীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, বিধুশেখর গুরুমশাইয়ের কাছে পড়া বন্ধ করে দিলেও সে নিজে গোপনে বিন্দুকে নিয়মিত পড়াবে। সেকথা রাখেনি গংগানারায়ণ, তখন কলেজে বন্ধুবান্ধবদের সংসর্গে উত্তেজনাকর জীবনযাত্রার মধ্যে কিছুকালের জন্য বিন্দুবাসিনীর কথা বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল একেবারে। সেজন্য আজও গংগানারায়ণের অনুশোচনা হয়।

সেদিন রাত্রে আপন কক্ষে এসে গংগানারায়ণ দেখলো, তার পত্নী লীলাবতী তখনও জেগে আছে। একটা জমকালো সিল্কের শাড়ি পরা, জরির কারুকার্য করা একটা কালো রঙের শাল গায়ে জড়ানো। খোঁপায় ও বাহুতে ফুলের অলংকার। শুধু জেগে থাকার জন্যই নয়, রাত্রে তার এই বিশেষ সাজ-সজ্জা দেখেও বিস্মিত হলো গংগানারায়ণ। এসব কী ব্যাপার?

সংলগ্ন ছোট ঘরটিতে গিয়ে বস্ত্র পরিবর্তন করার পর এবার ফিরে এসে গংগানারায়ণ দেখলো, লীলাবতীর দু চোখে জল।

গংগানারায়ণ জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েচে? মায়ের জন্য মন কেমন কচ্চে? তা এই রাত্তিরেই তুমি সেজেগুজে বসেচো, সেখানে যাবার জন্য নাকি?

লীলাবতী বললো, না।

—তবে?

লীলাবতী উঠে এসে গঙ্গানারায়ণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললো, আপনি আমার সঙ্গে কতা বলেন না কেন? বাপের বাড়িতে গেলেই আমার গঙ্গাজল জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ লা, তোর বর তোর সঙ্গে সারারাত জেগে বকর বকর করে? তোর বর সোহাগ করে?

গঙ্গানারায়ণ বললো, সারারাত জেগে বকর বকর করবো, আমি কি পাগল নাকি?

লীলাবতী ওষ্ঠ ফুলিয়ে বললো, গঙ্গাজল বলে যে ওর বর নিজেও সারারাত জাগে আর ওকেও জাগিয়ে রাকে।

গঙ্গানারায়ণ বললো, তোমার গঙ্গাজলের বর নিশ্চয়ই তাহলে সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমোয়। নিষ্কর্মার ঢেঁকি! আমায় সারাদিন অনেক কাজ করতে হয়।

—আমি বাপের বাড়ি গেলে ওরা যে হাসে আমায় নিয়ে।

—হাসুক! শোনো, নবীন তোমায় পড়াতে চায়, তুমি পড়ো না কেন? সে আমার কাছে নালিশ কচ্ছিল।

—ঐটুকু ছেলের মুকে পাকাপাকা কতা, ও যা বলে তাই আমি শুনবো নাকি! ও কি আমার গুরুঠাকুর!

—বেশ তো, তুমি অন্য কারুর কাছে পড়বে?

—না।

—কেন? মেমসাহেব এসে তোমায় পড়াবে। একবার পড়তে শিখলে দেখবে কত কী জানা যায়, কত আনন্দ পাবে।

—না, আমার দরকার নেই। পড়ালেখা করলে মেয়েমানুষের কপাল পোড়ে!

—বাজে কথা, এসব কে বলেছে তোমাকে!

—সবাই বলে। এই তো সুহাসিনীর কপাল পুড়লো!

—ছিঃ অমন কথা বলতে নেই। ওসব নির্বোধের মত কথা।

—আমার মাও বলেচে।

—এবার বাপের বাড়ি গিয়ে তোমার মা-কে বোঝাবে। তোমার কপাল পোড়া মানে তো আমার মরে যাওয়া। তাই যদি হতো, তাহলে কি আমি নিজে তোমাকে পড়াশুনোর কথা বলতুম?

—সুহাসিনীর বরও তো তাকে লেখাপড়া শেখাতো!

—সুহাসিনীর স্বামী মারা গ্যাচে কঠিন অসুখে। যারা লেখাপড়া শেখে না, তাদেরও ঐ অসুখ হয়। তারাও মারা যায়। শোনো, তোমাকে আমি একটা বই থেকে পড়ে শোনাচ্ছি। ঐ কুলুঙ্গিতে যে তিনটে বই রয়েচে, তার সবের নীচের বইটা নিয়ে এসো তো!

—আপনি আনুন।

গঙ্গানারায়ণ উচ্চহাস্য করে বললো, কেন বই ছুঁলেই তোমার কপাল পুড়ে যাবে নাকি? আমি ছুঁলে কোনো দোষ নেই? হাঃ হাঃ হাঃ।

বইখানি নিয়ে এসে পাতা উল্টে এক জায়গায় থেমে গঙ্গানারায়ণ বললো, এই জায়গাটা শোনো। দুজন মেয়ে এখানে কথা বলচে। মনে করো, তুমি আর তোমার গঙ্গাজল। দুজনে আলাপচারি কচ্চে! শোনো, প্রথমে একজন প্রশ্ন কল্লো, ওলো এখন যে অনেক মেয়্যা মানুষ লেখাপড়া করিতে আরম্ভ করিল এ কেমন ধারা। কালে ২ কতই হবে ইহা তোমার মনে কেমন লাগে।

তখন অন্যজন উত্তর দিচ্চে, তবে মন দিয়া শুন দিদি। সাহেবরা এই যে

ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝি এত কালের পর আমার কপাল ফিরিয়াছে। এমন জ্ঞান হয়।

প্রশ্ন : কেন গো। সেসকল পুরুষের কাজ। তাহাতে আমাদের ভাল মন্দ কি।

উত্তর : শুন লো। ইহাতে আমাদের ভাগ্য বড় ভাল বোধ হইতেছে কেননা এদেশের স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া করে না, ইহাতেই তারা প্রায় পশুর মতন অজ্ঞান থাকে। কেবল ঘর দ্বারের কায কর্ম করিয়া কাল কাটায়।

প্রশ্ন : ভাল। লেখা পড়া শিখিলে কি ঘরের কায কর্ম করিতে হয় না। স্ত্রীলোকের ঘর দ্বারের কায রাঁধা বাড়া ছেলেপিলা প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন। তাহা কি পুরুষে করিবে।

উত্তর : না। পুরুষে করিবে কেন, স্ত্রীলোকেরই করিতে হয়। কিন্তু লেখা-পড়াতে যদি কিছু জ্ঞান হয় তবে ঘরের কায কর্ম সারিয়া অবকাশ মতে দুই দণ্ড লেখা পড়া নিয়া থাকিলে মনস্থির থাকে, এবং আপনার গণ্ডাও বুঝিয়া পড়িয়া নিতে পারে।

প্রশ্ন : ভাল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার কথায় বুঝিলাম যে লেখা পড়া আবশ্যক বটে। কিন্তু সেকালের স্ত্রীলোকেরা কহেন যে লেখাপড়া যদি স্ত্রীলোকে করে তবে সে বিধবা হয়, এ কি সত্য কথা। যদি এটা সত্য হয় তবে মেনে আমি পড়িব না। কি জানি ভাংগা কপাল যদি ভাংগে।

উত্তর : না বইন না, সে কেবল কথার কথা। কারণ আমি আমার ঠাকুরানী দিদির ঠাঁই শুনিয়াছি যে কোন শাস্ত্রে এমত লেখা নাই, যে মেয়্যা মানুষ পড়িলে রাঁড় হয়। কেবল গতর শোগা মাগিরা এ কথার সৃষ্টি করিয়া তিলে তাল করিয়াছে। যদি তাহা হইত তবে কত স্ত্রীলোকের বিদ্যার কথা পুরানে শুনিয়াছি, ও বড় ২ মানুষের স্ত্রীলোকেরা প্রায় সকলেই লেখাপড়া করে এমত শুনিতে পাই। সংপ্রতি সাক্ষাতে দেখ না কেন, বিবিরা তো সাহেবের মতন লেখাপড়া জানে, তাহারা কেন রাঁড় হয় না।

লীলাবতী বললো, থাক, থাক, আমি আর শুনবো না। জানি এসব কতা কোনো ফিরিঙ্গি বা ম্লেচ্ছ লিকেচে। ওরা ঐ সব বলে আমাদের জাত মাত্তে চায়।

গঙ্গানারায়ণ বললো, ম্লেচ্ছ ফিরিঙ্গি নয়, এ বই গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার নামে এক খাঁটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের লেখা। আর একটু শুনে দ্যাখো :

প্রশ্ন : ভাল। যদি দোষ নাই তবে এতদিন এ দেশের মেয়্যা মানুষে কেন শিখে নাই।

প্রশ্ন : শুন লো। যখন স্ত্রীলোক মা বাপের বাড়ী থাকে, তখন তাহারা কেবল খেলাধুলা ও নাট্যরঙ্গ দেখিয়ে বেড়ায়। বাপ মায়ও লেখাপড়ার কথা কহেন না। কেবল কহেন যে ঘরের কায কর্ম রাঁধা বাড়া না শিখিলে পরের ঘর কন্না কেমন করিয়া চালাইবি। সংসারের কর্মে দেয়া থোয়া শিখিলেই শ্বশুরবাড়ি সুখ্যাতি হবে। নতুবা অখ্যাতির সীমা নাই। কিন্তু জ্ঞানের কথা কিছুই কহেন না।

লীলাবতী বললো, আমি যখন ছোট ছিলুম, তখনো আমার বে হয়নিকো, আমার ভাই গুরুমশাইয়ের কাচে পড়তো, আমিও পাততাড়ি নিয়ে তার পাশে বসেচিলুম, অমনি আমার ন' পিসীমা এসে আমায় কান ধরে তুলে নে গেল আর বকে বকে বললো, মদ্দা ঢেঁটি ছুঁড়ি, তুই ব্যাটাছেলের সমান হতে চাস? শেষে আমার মতন বেওয়া বিধবা মাগি হয়ে জীবন কাটাবি? সেই কতাগুলান স্মরণে এলেই এখনো আমার বুক কাঁপে!

গঙ্গানারায়ণ গম্ভীরভাবে বললো, তোমার বাপের বাড়ির কোনো নিয়ম বা

কারুর কথা এখানে খাটবে না। আমি আগামী মাস থেকেই তোমার জন্য মাস্টারনী ঠিক করবো।

লীলাবতী ভয়ার্ত গলায় বললো, আমার যে মাথায় বুদ্ধি নেই! লেকাপড়ার শক্ত শক্ত জিনিস আমার মাথায় ঢুকবে না।

গঙ্গানারায়ণের ইচ্ছে হলো হাতের বইখানা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এত অবোধকে সে কী করে মানুষ করবে? আর কোনো কথা না বলে বইখানি কুলুঙ্গিতে রেখে এসে সে শুয়ে পড়লো।

খানিক পরে সে টের পেল লীলাবতী তার বুকের কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরেছে। এটা গঙ্গানারায়ণের নতুন অভিজ্ঞতা। এমন আগে ঘটেনি। সে ঘুমের ভান করে নিথর হয়ে রইলো।

লীলাবতী ফিসফিস করে বললো, আপনি ঘুমুচ্চেন? আপনি রাগ কল্লেন?

গঙ্গানারায়ণ কোনো উত্তর দিল না।

লীলাবতী আবার বললো, আচ্ছা, আমি পড়বো। আপনি নিজে পড়াবেন? মেমসাহেব দেখলেই আমার ভয় লাগে। আপনি পড়ালে আমার কোনো ভয় থাকবে না।

গঙ্গানারায়ণ বললো, ঠিক আচে, এখন ঘুমোও!

—আপনি আমায় একটুও সোহাগ করেন না। গঙ্গাজল বলছেল...

—তোমার গঙ্গাজল কী বলছিল, তা কাল শুনবো। আজ ঘুমোও।

—গঙ্গাজল বলছেল, তোর বর তোকে মা করে দিতে চায় না? তোর বরকে বলবি...

—ছিঃ, ওসব বাজে কথা আমি শুনতে চাই না।

—গঙ্গাজল মা হয়েছে, আমি মা হবো না? সুহাসিনী মা হয়েচে, ক্ষেমঙ্করী মা হয়েচে, দুর্গাময়ী মা হয়েছে, আমি হইনি...সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। সবাই বলে, তোর বর তোকে পীরিত করে না।

—ওসব কথা কাল শুনবো। আজ এখন ঘুমোও, আমার ঘুম পেয়েচে, কাল সকালে আমার অনেক কাজ।

লীলাবতী গঙ্গানারায়ণকে আঁকড়ে ধরে তার বুকে মাথা ঘষতে ঘষতে এক সময় ঘুমিয়েই পড়লো। সে রজঃস্বলা হবার পর নারীমহল তাকে নানারকম শিক্ষা দিয়েছে পতিকে বশ করবার জন্য। বয়েসের তুলনায় লীলাবতী এখনো বেশ সরল, সে অতশত বোঝে না, সে যথাসাধ্য চেষ্টা করে ঘুমিয়ে পড়লো। তার সখীরা বলেছিল, রাত্রে বর যখন প্রথম ঘরে আসবে, তখন একটু সেজেগুজে কাঁদতে বসলেই কেল্লা ফতে হয়ে যাবে। কিন্তু তার বর তো তার কান্নাকে কোনো মূল্যই দিল না!

লীলাবতী ঘুমিয়ে পড়লেও গঙ্গানারায়ণ ঘুমোতে পারলো না অনেকক্ষণ। চোখ থেকে ঘুম সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়ে গেছে, সে কেবলই ছটফট করছে। কেন যে এই অস্থিরতা, তা সে নিজেই বুঝলো না। এক সময় সে উঠে বসলো।

লীলাবতীর বাহুবন্ধন শিথিল হয়ে গেছে, গঙ্গানারায়ণকে ছেড়ে সে এখন চিৎ হয়ে শয়ান। তার নিদ্রাপ্লুত মুখখানিতে জানলা দিয়ে এসে পড়েছে শেষ শীতের স্বচ্ছ জ্যোৎস্না। লীলাবতীর গা থেকে সরে গেছে লেপ।

গঙ্গানারায়ণের বিস্ময় ও মুগ্ধতা হঠাৎ পাল্লা দিতে শুরু করলো। লীলাবতী যে এত সুরূপা, তা তো সে কোনোদিন জানেনি। অথবা কি এই জ্যোৎস্নার জন্যই তার মুখখানি এত অপরূপ দেখাচ্ছে!

সে বিড়বিড় করে বললো, 'ও শী ডাথ টিচ্ দা টর্চেস টু বার্ন ব্রাইট!' তারপর খুব সন্তর্পণে তার একটি হাত রাখলো লীলাবতীর কপালে। তার মনে পড়ে যাচ্ছে তার পঠিত বিভিন্ন কাব্যের নারী-বর্ণনা।

লীলাবতীর একখানা হাত সে তার মুঠিতে তুলে নিয়ে আবার বললো, ইফ আই প্রোফেন উইথ মাই আনওয়ার্দিয়েস্ট হ্যান্ড দিস হোলি স্রাইন, দা জেণ্টল সিন ইজ দিস্।

গঙ্গানারায়ণ যেন আর গঙ্গানারায়ণ নয়, সে এখন শেক্সপীয়ারের কোনো নাট্য-কাব্যের চরিত্র। রোমিও এর পর কী করেছিল? 'ও, দেন, ডিয়ার, সেইন্ট, লেট লিপ্স ডু হোয়াট হ্যান্ডস ডু! দে প্রে: গ্র্যান্ট দাউ, লেস্ট ফেইথ টার্ন টু ডিসপেয়ার।'

গঙ্গানারায়ণ মুখ নীচু করে লীলাবতীর ওষ্ঠ চুম্বন করলো।

লীলাবতী ধড়মড় করে জেগে উঠে বললো, কে? কে? ওমা গো!

গঙ্গানারায়ণ আচ্ছন্নভাবে বলে চললো, সিন ফ্রম মাই লিপ্স? ও ট্রেসপাস সুইটলি আর্জড! গিভ মি মাই সিন এগেইন।

নাট্যের নির্দেশ মতন গঙ্গানারায়ণ আবার গাঢ়ভাবে চুম্বন করলো লীলাবতীকে।

লীলাবতী একেবারে গলে গিয়ে বললো, কী ভালো লাগচে, আমার মাথা ঝিমঝিমিয়ে উঠলো য্যানো...আমি গঙ্গাজলকে বলবো, আমার বরও আমায় সোহাগ করে, শুধু তোর বর একলা করে না।

গঙ্গানারায়ণ বললো, এখন কথা বলো না।

তারপর সে লীলাবতীকে শুইয়ে দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো তার দিকে। ইংরেজীর বদলে এবার তার মনে পড়লো সংস্কৃত। সে আপন মনে বলতে লাগলো:

তন্বী শ্যামা শিখরি-দশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিত-হরিণী প্রেক্ষণা নিম্ন-নাভিঃ!
শ্রোণীভারাদলস-গমনা স্তোক-নম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ যুবতি-বিষয়ে সৃষ্টি রাদ্যেব ধাতুঃ!

লীলাবতী জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি বিয়ের মন্ত্র পড়চেন? আমাদের তো কবেই বে হয়ে গ্যাচে!

গঙ্গানারায়ণ হেসে বললো, না। তুমি এসব বুঝবে না।

—একটু বুঝিয়ে বলুন না।

—সে তন্বী, সে শ্যামা, সুন্দর শিখর যুক্ত তার দাঁত, পাকা বিম্বফলের মতন তার ওষ্ঠ ও অধর, তার কোমর সরু, তার দৃষ্টি হরিণীর মতন চঞ্চলা, গভীর তার নাভি, তার গতি নিতম্বের গুরুভারে শিথিল, স্তনের ভারে সে সামান্য ঝুঁকে রয়েচে—তুমি এরকম যাকে দেখবে, তোমার মনে হবে যুবতী সৃষ্টিতে সে-ই বিধাতার আদর্শ। কে লিখেচেন জানো? কালিদাস! তুমি কি এই রকম?

লীলাবতী বললো, কী জানি! সব কতার মানেই বুজলাম না যে!

গঙ্গানারায়ণ তখন বর্ণনা মতন লীলাবতীর দাঁত, ঠোঁট, স্তন, কোমর ও নাভিতে হাত দিয়ে বুঝিয়ে দিতে লাগলো এটা এই, এটা এই। তারপর লীলাবতীর ঘন ঘন নিশ্বাসে আন্দোলিত বক্ষে নিজ হস্ত স্থাপন করে আবার বললো, ঘটয়তি সুঘনে কুচ-যুগ গগনে মৃগমদ রুচি রুচিতে। মনিসরমমলং তারক-পটলং নখ-পদ-শশি-ভূষিতে...। এই স্তনে কি সত্যিই নখরাঘাত করে রক্ত বয়ার করে দিতে হয়?

গঙ্গানারায়ণ সত্যিই লীলাবতীর বক্ষের কাঁচুলি সরিয়ে স্তনের ওপর পাঁচ আঙুল চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলো, লাগচে? তোমার ব্যথা লাগচে?

লীলাবতী বললো, আঃ আঃ আঃ!

এরপর কুমারসম্ভবের বর্ণনা অনুযায়ী ঠিক মিলিয়ে মিলিয়ে গঙ্গানারায়ণ লীলাবতীর সমস্ত বস্ত্র উন্মোচিত করে রতি ক্রিয়া শুরু করলো।

দু' জনেই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কিন্তু আনন্দের যেন অবধি নেই। লীলাবতীর বেশী আনন্দ এইজন্য যে সে এখন থেকে তার গঙ্গাজল এবং অন্যান্য সখীদের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে গেল। তাদের কাছে এবার সে সগর্বে এই ঘটনার বর্ণনা দিতে পারবে বারবার, যেমন ওরা দেয়। উচ্ছ্বাসে লীলাবতী এইসব কথা গঙ্গানারায়ণকেও শোনাতে যাচ্ছিল, গঙ্গানারায়ণ আকুলভাবে বলতে লাগলো, চুপ করো, চুপ করো, এখন কথা কয়ো না! এবং সেই পরম উৎসুক নারী শরীরকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করার পর সে মনে মনে ভাবতে লাগলো, এ যেন লীলাবতী নয়, সে বিন্দুবাসিনীকেই ভোগ করছে।



এপ্রিল মাসের এক সকালে ভারতের মাটিতে পা দিলেন জন এলিয়ট ড্রিঙ্ক ওয়াটার বীট্‌ন। সাতচল্লিশ বছর বয়েস, স্বাস্থ্যবান উন্নত দেহ, মন বিবিধ উৎসাহে ভরপুর। তিনি সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারের মানুষ, নিজেও আইন ও অঙ্ক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অক্সফোর্ডের র‍্যাংলার। কাব্য সাহিত্য সম্পর্কেও তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ। কলকাতা বন্দরে তিনি নামলেন অনেক আশা নিয়ে। বসন্তকালীন বাতাস ও রৌদ্র ধৌত এই সুন্দর শহরটি দেখে মুগ্ধ হলেন তিনি।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ অনেক দিনের। যৌবনে লণ্ডন শহরে তিনি যখন আইনজীবী হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠছেন, সেই সময় একটি অতি কৌতূহল-জনক মামলায় ওকালতী করার জন্য তাঁর কাছে একটি প্রস্তাব আসে। ব্যাপারটা স্ত্রীলোকদের পুড়িয়ে মারা বিষয়ে। একদল হিন্দু আবেদন করেছিল যে স্বামীর মৃত্যুর পর সেই একই চিতায় তার জীবন্ত স্ত্রীকেও পুড়িয়ে মারার যে প্রথা ভারতে আছে, তা আইন করে বন্ধ করা হোক। আর একদল হিন্দু আবার এই রকম আইনে তাদের ধর্ম কলঙ্কিত হবে বলে এই আইন জারির বিরুদ্ধে প্রিভি কৌন্সিলে আপীল করতে চায়। সেই বিরুদ্ধ পক্ষীয় হিন্দুরাই তাঁর সঙ্গে যোগা-যোগ করেছিল। বিষয়টি জেনে প্রথমে বেশ বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন বীট্‌ন। জীবন্ত নারীকে পুড়িয়ে মারা হবে কি না, তা নিয়েও মতভেদ? 'সুটি'র কথা তিনি নানান পত্র-পত্রিকায় পড়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল এসব রূপকথা। ইওরোপেও ডাইনী ঘোষণা করে অনেক নারীকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে, ইনকুইজিশানের বহু কদাচারের কথা তিনি জানেন, কিন্তু সে তো মধ্যযুগের কথা। এখন ঊনবিংশ শতাব্দী, মানব সভ্যতার এক নবজাগরণ হয়েছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার মধ্যে দেখা দিয়েছে অসীম সম্ভাবনা, চতুর্দিকে প্রবাহিত হচ্ছে মুক্ত চিন্তার বাতাস। এর মধ্যে জ্ঞানীদের দেশ ভারতবর্ষে এতখানি কুসংস্কার আচ্ছন্ন অন্ধকার!

ধাতাস। এর মধ্যে জ্ঞানীদের দেশ ভারতবর্ষে এতখানি কুসংস্কার আচ্ছন্ন অন্ধকার!

সেই থেকে জন বীট্‌ন ভারতবর্ষীয় সমাজ নিয়ে পড়াশুনো শুরু করলেন। তাঁর স্বদেশে তখন নারী মুক্তির আন্দোলন চলছে, চতুর্দিকে স্থাপিত হচ্ছে নানা ধরনের লেডিজ অ্যাসোসিয়েশান, নারীরা প্রকাশ্যে সভাসমিতি করে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দাবি করছে। বীট্‌ন নিজেও মনে করেন যে ঈশ্বর পুরুষ ও নারী জাতিকে সমানভাবেই বুদ্ধি, হৃদয় ও সুখ-দুঃখের অনুভূতি দিয়েছেন। এতকাল পুরুষ যে স্ত্রী জাতিকে নিছক ভোগের সামগ্রী করে রেখেছিল এবং সমাজজীবনে নারীর কোনো ভূমিকাই স্বীকার করেনি, সেটা অন্যায়। ইওরোপে নারীরা একে একে অনেক অধিকার আদায় করছে, কিন্তু বীট্‌ন জেনে দুঃখিত হয়েছিলেন যে ভারতে রমণীরা এখনও পদাবনত। তাদের পুড়িয়ে মারা বন্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও তারা সারাজীবন দগ্ধ হয়।

বীট্‌ন হচ্ছেন সেই ধরনের মানুষ, যাঁরা কয়েকটি মহৎ ধারণার পরিপোষণ করেই জীবনটা কাটিয়ে দিতে সুখ পান। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়েও পৃথিবীর মানুষের কিছু সুখ বৃদ্ধির চেষ্টা করেই তৃপ্তি পান এই ধরনের মানুষ। বীট্‌ন অকৃতদার এবং তাঁর কোনো গৃহ-বন্ধন নেই। বিলাতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ যখন তাঁকে ভারতে আইন সচিব করে পাঠাতে চাইলেন, তখন সে প্রস্তাবে সাগ্রহে সম্মতি দিয়েছিলেন বীট্‌ন। প্রত্যক্ষভাবে ভারতবর্ষকে জানার বাসনা তাঁর এতদিনে চরিতার্থ হবে।

বীট্‌নের আগমনের অল্পকাল আগে লর্ড ডালহৌসি এসেছেন ভারতের বড়লাট হয়ে। ডালহৌসির আকাঙ্ক্ষা রাজ্য বিস্তারের। তা ছলে, বলে ও কৌশলে যে উপায়েই হোক। আর তাঁর আইন সচিব বীট্‌নের বাসনা এই যে, যে নব-জাগরণের জোয়ার এসেছে ইওরোপে, তারই অনুরূপ কিছু এই প্রাচীন, সুমহান সভ্যতার দেশ ভারতবর্ষেও সঞ্চারিত হোক। এই দুই রাজপুরুষেরই অবস্থিতি হলো রাজধানী কলকাতায়।

পদাধিকার বলে বীট্‌ন কাউন্সিল অব এডুকেশনেরও সভাপতি হলেন। অর্থাৎ এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় তিনিই প্রধান। কলকাতায় উপস্থিত হয়েই তিনি জড়িয়ে পড়লেন নানান কাজে। তিনি দেখলেন, কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসা রয়েছে, পৃথকভাবে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার জন্য। আর যেটা সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠান, যেখান থেকে ছাত্ররা পায় পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানের আলোক, সেই হিন্দু কলেজে শুধু হিন্দু ছাত্র ছাড়া আর কারুর প্রবেশ অধিকার নেই। শুধু হিন্দু হলেই হবে না, কিছুটা অন্তত বংশকৌলীন্য না থাকলে যে-কোনো ছাত্রই হিন্দু কলেজে পড়তে আসতে পারে না। এই অদ্ভুত ব্যবস্থা দেখে তাঁর খটকা লাগলো। তাছাড়া তিনি দেখলেন, পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটাই অস্বাভাবিক। সংস্কৃত কলেজে শেখানো হয় সংস্কৃত, মাদ্রাসায় আরবী ফারসী আর হিন্দু কলেজে ইংরেজী। বাংলাদেশে বাঙালী ছাত্ররা কেউ বাংলা ভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শেখে না। বীট্‌ন ভাবলেন, ইংলণ্ডের ইংরাজ যুবকরা শুধু গ্রীক ল্যাটিনের মাধ্যমে পড়াশুনা করছে, ইংরেজী শিখছে না, এ কি কল্পনা করা যায়?

কিছু কিছু দেশীয় লোকদের সঙ্গে কথা বলে তিনি দেখলেন, তারা হিন্দু কলেজের ব্যাপারে খুব গর্বিত। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শহর এই কলকাতায় এমন

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে নেটিভ বালকরা গড় গড় করে ইংরেজী বলতে শেখে, শেকসপীয়ারের কাব্য মুখস্থ রাখে এবং গৃহদেবতার উপাসনার সময়ও হোমারের কাব্য থেকে পাঠ করে। এরা বাংলা ভাষা একেবারেই শেখে না এবং ইংরেজী কৃতিত্বের জন্য গর্ববোধ করে।

বীটনের মনে হলো, হিন্দু কলেজ যেন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নয়, এ তো একটি ভৃত্য বানাবার কারখানা। সাম্রাজ্য বাড়ছে, সরকারী কাজকর্মও বাড়ছে, অল্প বেতনে ইংরেজ কর্মচারী পাওয়া দুষ্কর, তাই হিন্দু কলেজের পাশ করা ছাত্রদের মধ্য থেকেই এখন সরকারের নিম্ন বিভাগীয় কর্মচারী পাওয়া যাচ্ছে যথেষ্ট। কতকগুলি ভৃত্য উৎপাদনের জন্য শেকসপীয়ার, হোমার পঠন-পাঠনের প্রয়োজন কী?

এই সব ব্যাপার দেখে বীটন ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি শিক্ষা সমাজের সভাপতি, তাঁর কাজ শিক্ষা বিস্তার, ভৃত্য উৎপাদন তো নয়। শিক্ষা মানে তো আত্ম উপলব্ধি। যে ছাত্ররা মাতৃভাষা, নিজের সংস্কৃতি ও দেশীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে কিছুই জানলো না, তাদের আবার শিক্ষা হলো কী? বীটন জানেন, ইংলণ্ডে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল কথাই হলো ছাত্রদের মধ্যে নিজের জাতি ও নিজের সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা অন্ধ ভালোবাসা জাগিয়ে তোলা। আর ভারতবর্ষের ব্যবস্থা ঠিক বিপরীত, এখানকার ছাত্ররা শিখছে নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ঘৃণা করতে এবং অন্ধভাবে অনুকরণ করছে বিদেশী সংস্কৃতি ও ভাষার। এরকম ব্যবস্থায় এদের মধ্যে থেকে দৈবাৎ দু-একজন চিন্তাশীল মানুষ বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু বেশির ভাগই তো দাস মনোভাবসম্পন্নই থেকে যাবে।

অন্যান্য রাজকর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলে বীটন বুঝতে পারলেন, এই রকম শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে প্রভুভক্ত দাস সৃষ্টি করাই ব্রিটিশ নীতি। তারা এদেশ শাসন করতে এসেছে, এ দেশের মানুষের আত্মিক উন্নতি ঘটানোর দায়িত্ব তাদের নয়। হিন্দু কলেজে শুধু হিন্দু ছাত্র ভর্তি করাই অভিপ্রেত, মুসলমানদের এখন ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া উচিত হবে না। মুসলমানরা ঘুমন্ত সিংহ, ওদের এখন না জাগানোই ভালো।

ইংলণ্ডে থেকে বীটন এসব কিছুই বুঝতে পারেননি। ইংলণ্ডের জনসাধারণের ধারণা, অধঃপতিত ভারতীয়দের উদ্ধার কার্যেই ব্রিটিশ জাতি সেখানে নিযুক্ত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে এসেছিল বাণিজ্য করতে, তবু ভারতবর্ষ শাসন করার গুরু দায়িত্বও তাদের নিতে হয়েছে বাধ্য হয়ে, কারণ ভারতীয়রা রাজ্য শাসনের রীতিনীতি সব ভুলে গেছে, তারা শুধু পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ করে। কলকাতায় এসে বীটন বুঝলেন স্বদেশে এবং উপনিবেশে ব্রিটিশ নীতি দু রকম। ইংলণ্ডের পণ্য ভারতে আসে বিনা শুল্কে, আর ভারতীয় পণ্য ইংলণ্ডে গেলে তার ওপর চড়া হারে শুল্ক বসে। যাতে আস্তে আস্তে ভারতীয় পণ্যের বাজার ইংলণ্ডে একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের শাসন-ভার তো নিয়েছে এই উদ্দেশ্যেই। ভারতীয়রা আস্তে আস্তে শিল্প উৎপাদন একেবারেই ভুলে যাবে, জীবন ধারণের জন্য যা কিছু দ্রব্যের জন্য তারা হয়ে উঠবে পুরোপুরি ইংলণ্ডের শিল্প উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল।

বীটন অবাক হয়ে ভাবলেন, দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত ভেবে আত্মাভিমান দেখান, তাঁরাও এই তিক্ত সত্যগুলি বুঝতে পারছেন না কেন?

নিজেই এ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলেন। এঁরা বুঝতে পারছেন না, তার কারণ এঁরাও যথার্থ 'শিক্ষিত' নন, এঁদের কোনো আত্ম-উপলব্ধি হয়নি।

বীট্‌ন বুঝলেন, তাঁর একার পক্ষে এই সব কিছু পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তবু তিনি নিরুদ্যমী হয়ে বসে থাকবার মতন মানুষ নন। কয়েকটি মহান আদর্শকে অবলম্বন করেই যাঁরা জীবন কাটান, তাঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকেন না। আমরা যাকে বলি বাস্তবজ্ঞান, সেই জিনিস তাঁদের যথেষ্ট কম থাকে। বীট্‌ন তাঁর কার্যকলাপ শুরু করেই একসঙ্গে এ দেশীয় ব্যক্তিদের এবং তাঁর স্বদেশবাসী ইংরাজদের ক্রুদ্ধ করে দিলেন।

কৈলাশচন্দ্র বসু নামে হিন্দু কলেজের একজন শিক্ষক খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করলেন। অমনি কলেজের অভিভাবক সভার হিন্দু সদস্যারা রুষ্ট হয়ে বললেন, কৈলাশচন্দ্রকে চাকরি থেকে অপসারিত করতে হবে। বীট্‌ন বিস্মিত হলেন। ধর্মান্তরিত হওয়াই কি একজন শিক্ষকের অযোগ্যতার পরিচায়ক? কলেজে তো অনেক ইওরোপীয় শিক্ষক রয়েছেন, যাঁরা ধর্মে খৃষ্টান, তাহলে একজন বাঙালী যদি খৃষ্টান হয়, তবে সে কেন শিক্ষকতা করতে পারবে না? হিন্দু সদস্যরা উত্তরে বললেন, এতে ছাত্রদের সামনে একটি খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে। বীট্‌ন নতুন এসেছেন, সব কিছু ভালো করে বুঝে উঠবার আগেই কৈলাশচন্দ্র বসু অপসারিত হয়ে গেলেন।

কিছুদিন বাদে গুরুচরণ সিংহ নামে একটি ছাত্র খৃষ্টান হলো। দেশে খৃষ্টান হবার ধুম পড়ে গেছে, ইংরেজী শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত যুবকদের ধারণা, খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করলেই তারা রাজার জাতে উন্নীত হবে।

হিন্দু কলেজের নিয়ম অনুযায়ী গুরুচরণ সিংহ আর ছাত্র থাকতে পারবে না সেখানে। হিন্দু ছাড়া কারুর পাঠের অধিকার নেই সেখানে। কয়েক বছর আগে রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র মধুসূদনও খৃষ্টান হবার পর এই কলেজ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু এবার বীট্‌ন দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন।

হিন্দু কলেজ পুরোপুরি সরকারের এক্তিয়ারে নয়। কয়েক বছর ধরে ইংরেজ সরকার এই কলেজকে কিছু আর্থিক সাহায্য করছেন কিন্তু কলেজটি স্থাপিত হয়েছিল বেসরকারী উদ্যোগে এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দানে। সেই সব ব্যক্তিরা কিংবা তাঁদের পারিবারিক প্রতিনিধিরা এখনো রয়েছেন কলেজ পরিচালনা সংস্থার সদস্য। তাঁদের নেতৃত্ব দেন রাজা রাধাকান্ত দেব, রক্ষণশীলতার প্রধান ও সুদৃঢ়তম দুর্গটি তিনিই রক্ষা করে চলেছেন।

হিন্দু সদস্যরা ভাবলেন, পাদ্রীদের মতন বীট্‌নও বুঝি এদেশে খৃষ্ট ধর্মের বন্যা বইয়ে দিতে চান। সুতরাং রাধাকান্ত দেব প্রমুখ দৃঢ় প্রতিরোধে নামলেন। যদিও বীট্‌ন ধর্ম বিষয়ে খুব উৎসাহী নন, অখৃষ্টান মাত্রই নরকে পতিত হবে, এমন বিশ্বাস তাঁর নেই. ধর্ম গ্রহণ বা বর্জনকে তিনি মানুষের ব্যক্তিগত রুচি হিসেবেই গ্রহণ করেন। শুধু হিন্দুরাই ছাত্র হবার অধিকারী, হিন্দু কলেজের এই মূল নিয়মটিকেই তিনি বর্জন করতে চান। তিনি প্রতিপক্ষের সামনে দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন। হুগলীর কলেজ কিংবা প্রিন্স গোলাম মহম্মদ প্রতিষ্ঠিত রসাপাগলা গ্রামের ইংরেজী স্কুলে তো খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দু ছাত্ররা একসঙ্গে পাঠ নেয়। সে সব স্থলে তো কোনো বৈষম্য নেই। মুসলমান-খৃষ্টানরা হিন্দুদের

সঙ্গে একযোগে শিক্ষাভ্যাস করতে অনাগ্রহী নয়, শুধু হিন্দুরাই কেন দূরে সরে থাকবে?

এ তর্ক মাঝপথে রইলো। গুরুচরণ সিংহ নামের ছাত্রটি নিজে থেকেই কলেজ ছেড়ে চলে যাওয়ায় তখুনি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হলো না। কিন্তু রাধাকান্ত দেবের দল বীটনের ওপর চটে রইলেন।

বীটন এরপর চটিয়ে দিলেন ছাত্রদের। ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসের অতি জনপ্রিয় অধ্যাপক ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন অন্যান্য কয়েক জায়গা ঘুরে সম্প্রতি হিন্দু কলেজরই অধ্যক্ষ হয়েছেন। ক্যাপ্টেন সাহেব শিক্ষক হিসেবে অতি সুযোগ্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর নারীঘটিত দুর্বলতার কথা নিয়ে কানাকানি চলছিল সর্বত্র। তাছাড়া যথাসময়ে কলেজে আসাও তাঁর ঠিক ধাতে পোষায় না। এক একদিন কলেজ শুরু হবার অনেক পরে তিনি ঈষৎ স্খলিতপদে কলেজে আসেন, তখনও তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তিমাভ। এই অসংযমী ও সময়জ্ঞানহীন অধ্যক্ষকে বীটন সুনজরে দেখলেন না। ছাত্রদের কাছে এ রকম অধ্যক্ষ মোটেই আদর্শ-স্থানীয় হওয়া উচিত নয়। তিনি রিচার্ডসনের কাছে কৈফিয়ত চাইলেন, অহংকারী রিচার্ডসন তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিলেন পদত্যাগপত্র এবং বীটন তা গ্রহণ করতে দ্বিধা করলেন না একটুও। এর ফলে ছাত্র মহলে শোরগোল পড়ে গেল, অভিভাবকরাও সভা ডেকে বীটনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করলেন। ছাত্ররা ঠিক করলো বিশাল আকারে সম্বর্ধনা দেবে তাঁদের প্রিয় অধ্যাপককে, বীটন তার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে জানালেন যে কোনো বিদায়ী সরকারী কর্মচারীকেও সম্বর্ধনা জানানো আইনবিরুদ্ধ। ছাত্ররা একযোগে সংবাদপত্রে লিখলো বীটনের এই ধরনের কঠোর হস্তক্ষেপ বিষয়ে। সারা দেশে বীটনের নিন্দা রটে গেল।

বীটনের এর পরের উদ্যোগটিতে হাঙ্গামা হলো অনেক বেশী। শিক্ষা বিষয়ের মতন, বীটন দেখলেন, এ দেশে আইন ব্যবস্থার মধ্যেও অনেক বৈষম্য রয়েছে। ইওরোপীয়রা কতকগুলি বিশেষ সুযোগসুবিধা পায় ও তার অপব্যবহার করে। মফস্বলে ইওরোপীয়রা ভারতীয়দের উপর যত অত্যাচারই করুক তার কোনো প্রতিবিধান নেই। মফস্বলের কোনো আদালতে ইওরোপীয়দের কোনো ফৌজদারী মামলার বিচার হয় না। বহু ইংরেজ ও অন্যান্য ইওরোপীয়রা ছড়িয়ে আছে গ্রামে-গঞ্জে, কয়েক রকমের ব্যবসা তারা একচেটিয়া করে নিচ্ছে, রেশম, চিনি এবং নীল উৎপাদনের জন্য তারা কুঠী স্থাপন করে সেখানে নিজস্ব রাজত্ব চালায়। সেখানে কোনো আইনের শাসন নেই, শ্বেতাঙ্গরা স্থানীয় লোকদের মারধোর করে, বাড়িতে আগুন লাগায় ও যুবতী স্ত্রীদের সবলে ধরে নিয়ে যায়। সরকারের দেশী কর্মচারীরা এদের কোনো কাজে বাধা দিতে গেলেও এদের কাছে অপমানিত হয়, অনেক সময় প্রহৃতও হয়।

আইন সচিব হিসেবে বীটন এসব সহ্য করতে রাজি নন। তিনি যে আইন শিক্ষা করেছেন, তার মূল কথাই হলো, আইনের চক্ষে সবাই সমান। আমেরিকায় স্বাধীনতার যুদ্ধ ও ফরাসী বিপ্লবের পর সকল মানুষের সমান অধিকারের কথা ইওরোপের বিদগ্ধ মানুষের কাছে স্বীকৃত হয়েছে। বীটন সেরকমই একজন মানুষ, শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের জন্য দু রকম আইনের ব্যবস্থা তিনি মেনে নিতে প্রস্তুত নন। তিনি ইওরোপীয়দের বিশেষ অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি বাতিল করে দিয়ে নতুন আইনের খসড়া প্রণয়ন করলেন।

অমনি গর্জে উঠলো বেসরকারী ইংরেজ সমাজ। এইসব ইংরেজদের হাতে বেশ কয়েকটি পত্র-পত্রিকাও রয়েছে। সেই সব কাগজে উঠলো প্রতিবাদের ঝড়। তারা বীট্‌নের এই নতুন আইনের নাম দিল ব্ল্যাক অ্যাক্‌ট বা কালা কানুন। প্রায় এক যুগ আগে মেকলে সাহেবও এই রকম আইন প্রয়োগের চেষ্টা করেছিলেন এবং সর্বাংশে সার্থক হতে পারেননি। বীট্‌ন একেবারে বদ্ধপরিকর। সংবাদপত্রে তাঁকে নিয়ে যতই গালাগালি কুৎসা চলুক, তিনি পশ্চাৎপদ হবেন না। তবে তিনি লক্ষ্য করলেন নেটিভদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর পক্ষ সমর্থন করতে এগিয়ে আসছেন। রামগোপাল ঘোষ নামে এক ব্যক্তি ইংরেজীতে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন তাঁর স্বপক্ষে।

তবু শেষ পর্যন্ত হেরে গেলেন বীট্‌ন। লর্ড ডালহৌসি দেশীয় রাজন্য-বর্গের বিষয় সম্পত্তি কেড়ে নেবার পরিকল্পনাতেই তখন ব্যস্ত, তিনি তুচ্ছ আদর্শগত কারণে ইংরেজ সম্প্রদায়কে চটাতে চান না মোটেই। সরকার বীট্‌নের নতুন আইনের খসড়া বাতিল করে দিল। উল্লাসের কলরোল পড়ে গেল ইংরেজ সমাজে, বীট্‌ন সেদিন একা বসে রইলেন নিজের কক্ষে। হিন্দু কলেজেও তিনি সব সম্প্রদায়ের ছাত্রদের প্রবেশ অধিকার দিতে পারেননি, আইনের বিচারের ক্ষেত্রেও তিনি শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের সমান সুযোগ দিতে পারলেন না চেষ্টা করেও।

এরই মধ্যে একদিন সকালে তাঁর খানসামা এসে খবর দিল যে একজন দেশী বাবু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। বীট্‌ন বাবুটিকে ভিতরে নিয়ে আসার অনুমতি দিলেন।

কোট প্যাণ্টে সুসজ্জিত একজন সুপুরুষ বাঙালী এসে ঢুকলেন ঘরে, তাঁর হাতে একখানি বই। ইনি হিন্দু কলেজের ভূতপূর্ব ছাত্র গৌরদাস বসাক।

বিশুদ্ধ ইংরেজীতে গৌরদাস বললেন, মিঃ বেথুন, আমি যে আপনার অমূল্য সময় ব্যয় করাইতে আসিলাম, সেজন্য মার্জনা করিবেন কী?

বীট্‌ন একটু হাসলেন। তাঁর নামের বানান দেখে নেটিভরা প্রায় সকলেই তাঁকে বেথুন বলে সম্বোধন করে। তিনি প্রথম প্রথম সংশোধন করে দিতেন, এখন আর করেন না। বানানটি অন্য রকম, সকলকে বোঝানো সম্ভব নয়।

তিনি একটি কেদারা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ভদ্র মহোদয়, আসন গ্রহণ করুন, তাহার পর আপনার বক্তব্য শুনিব।

গৌরদাস বললেন, মহাশয়, আমার বক্তব্য অতি সামান্য। আমার এক বন্ধু একটি কবিতা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। আপনি স্বয়ং বিদ্বান ও সাহিত্য অনুরাগী, সেই বিবেচনায় আপনাকে সেই পুস্তকের এক কপি উপহার দিতে আসিয়াছি, যদি অনুগ্রহ করিয়া তাহা গ্রহণ করেন।

বীট্‌ন জিজ্ঞেস করলেন, কবিতা পুস্তকটি আপনার রচনা নহে?

গৌরদাস বললেন, না মহাশয়, ইহা আমার এক আবাল্য সুহৃদের। তিনি মান্দ্রাজে থাকেন। তিনি এক্ষণে কলিকাতায় উপস্থিত থাকিলে অবশ্যই স্বয়ং আসিয়া আপনার সমীপে কেতাবটি পেশ করিতেন। তাঁহার অনুরোধেই আমি...

—বাঙলা কবিতা পুস্তক? দুঃখের বিষয়, আমি বাঙলা পড়িতে জানি না।

—না মহাশয়, ইহা ইংরেজীতে রচিত। ইহাতে অতিশয় উচ্চাঙ্গের সব কবিতা গ্রন্থিত হইয়াছে।

বীট্‌ন হাত বাড়িয়ে বইখানি নিলেন। বইখানি সুন্দর করে বাঁধানো, ভিতরে

তাঁর নামের নীচে কবির স্বাক্ষর। কবির নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বইটির নাম 'ক্যাপটিভ লেডী'।

বীট্‌ন পৃষ্ঠা উল্টে উল্টে দেখতে লাগলেন রচনার নিদর্শন।

গৌরদাস বিনীতভাবে বললেন, আমার এই সুহৃদটি অতি অল্প বয়স হইতেই ইংরাজীতে কাব্য রচনা করিয়া বহুজনকে চমৎকৃত করিয়াছে। ক্রমে সে মিলটন বায়রনের সমগোত্রীয় হইয়া উঠিবে, এই আমাদের বিশ্বাস।

বীট্‌ন একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বইটি মুড়লেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বান্ধবটি বাঙালাভাষী হইয়াও বাঙালাতে কাব্য রচনা না করিয়া ইংরাজীতে কাব্য রচিলেন কেন? কোনো কবি মাতৃভাষা ছাড়িয়া অপর ভাষা অবলম্বনে কাব্য রচনা করে, এমন তো কখনো শুনি নাই।

গৌরদাস বললেন, মহাশয়, এই কবি মাইকেল এম এস ডাট ইংরেজদের মতনই ইংরাজী ভাষায় দক্ষ। বহু ইংরাজই একথা স্বীকার পাইয়াছেন।

—আমিও না হয় তাহা স্বীকার করিলাম। অনেক ইংরাজও অত্যুত্তম ফরাসী-ভাষা জানে, কিন্তু তাহারা ফরাসী ভাষাতে কবিতা রচনা করে না। বাঙালাবাসীদের পক্ষে বাঙালাতে কিছু রচনা করার বাধা কোথায়?

—মহাশয়, বাঙালা ভাষা সাহিত্য রচনার উপযোগী নয়। ইহা অতি কদর্য ও ইতর লোকের ব্যবহার্য। এই ভাষার দ্বারা কোনো মহৎ ভাব প্রকাশ সম্ভব না। আমার সুহৃদটিকে আমি নিজেও কয়েকবার বাঙলায় কিছু রচিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছি, কিন্তু সে বাঙলা সম্পর্কে এই রূপ মত প্রকাশ করে।

বীট্‌ন ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। তিনি আগেও লক্ষ করেছেন, বাঙালীরাই বেশী বাঙলা ভাষার নিন্দা করে। বাঙলা ভাষা যদি উচ্চাঙ্গের নাও হয়, তবু সেজন্য বাঙালীদের কোনো দুঃখবোধ নেই। এটা একটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয়?

তাঁর মনে পড়লো কিছুদিন আগে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখেছিলেন কৃতী ছাত্ররা তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য নানান ইংরাজী কবিতা পাঠ করে শোনালো। বীট্‌ন তখন মঞ্চে উপবিষ্ট কয়েকজন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিকে প্রশ্ন করেছিলেন, ভদ্রমহোদয়গণ, ইহারা কি কেহ কোনো বাঙালা কবিতা জানে না? ইংলণ্ডের কোনো সভায় একটিও ইংরাজী পদ্য পাঠ করা হইল না, ইহা অকল্পনীয়। আপনাদের বাঙালা দেশের সভায় ইহা কী করিয়া সম্ভব হয়?

সেই ভদ্রমণ্ডলীও তখন একবাক্যে বলেছিলেন, মহাশয়, ইহারা বাঙালা শিখিবে কি? বাঙালাতে শিখিবার কোনো বস্তু নাই। বাঙালাতে যা রচিত হয়, তা সবই কুরুচিপূর্ণ।

বীট্‌ন একটু রেগে গিয়ে বলেছিলেন, পাঁচশত বৎসর আগে আমাদের ইংলণ্ডেও ইংরাজী ভাষা খুবই অমার্জিত ও বর্বর ছিল। তাহা বলিয়া কি আমরা পর ভাষা গ্রহণ করিয়াছি? আপনাদের মতন ব্যক্তিরা উদ্যোগ করিলে তবেই না বাঙালা ভাষার উন্নতি বিধান ঘটিবে। বাঙালাতে যদি মহৎ ভাবের গ্রন্থ নাই, তবে বিভিন্ন ইওরোপীয় ভাষা হইতে উত্তম উত্তম রচনাদি বাঙালায় অনুবাদিত করাইতেছেন না কেন? বাঙালা ভাষায় সেই সব অনুবাদ পড়িয়া ছাত্রদের রুচি উন্নত হইবে,

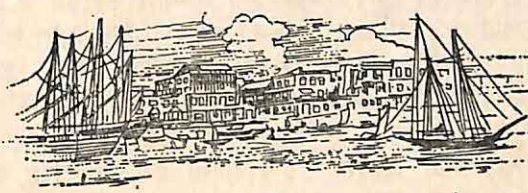
তৎপরে তাহারা উচ্চমানের রচনা বাঙালাতে লিখিতে শিখিবে।

গৌরদাসের মুখের ওপর সরাসরি দৃষ্টি স্থাপন করে বীটন বললেন, মহাশয়, আমি যতটুকু বুঝি তাহাতে বলিতে পারি যে একজন উচ্চাভিলাষী প্রতিভাবান তরুণের পক্ষে এমন সুবর্ণ সুযোগ তো আর হয় না! বাঙালা ভাষা যদি এখনও অপরিণতই থাকে, তবে কাহার না লোভ হইবে সেই ভাষাকে পরিমার্জনা করিয়া দেশের মানুষের কাছে প্রথম মহৎ কোনো রচনা উপহার দেওয়ার? যে ভাষায় বহু সংখ্যক লেখক অনেক উত্তম গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সে ভাষায় খ্যাতি অর্জন করা সুকঠিন। কিন্তু যে ভূমি আজও অকর্ষিত, সেখানে তো অতি সহজেই সোনার ফসল ফলানো যাইতে পারে।

গৌরদাস বসাকের এসব কথাগুলি তেমন পছন্দ হলো না। তিনি ভেবেছিলেন, মিঃ বেথুনের মতন একজন মাননীয় ইংরাজের কাছ থেকে একটি প্রশংসাপত্র আদায় করে মধুর কাছে পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু এ সাহেব যে উল্টো রকমের কথা বলে!

গৌরদাস উঠে দাঁড়িয়ে বিনীতভাবে বললেন, মিঃ বেথুন, আপনার উপদেশ আমি নিশ্চিত আমার বন্ধুকে জানাইব।

গৌরদাস চলে যাবার পর বীটন আবার দেখতে লাগলেন বইখানি। কিছু অংশ পাঠ করলেন মনঃসংযোগ করে। তিনি হতাশ হলেন।। কতখানি ইংরেজী ভাষার চর্চা করেছে এই কবি, তার প্রাণপণ প্রমাণ দেবার চেষ্টা আছে এই বইখানির মধ্যে। কিন্তু এতে কাব্যের নামগন্ধও নেই। এই ব্যক্তির পক্ষে ইংরেজী ভাষার কবিদের মধ্যে স্থান গ্রহণ করা যেন প্রায় এক মুণ্ডহীন ধড়ের দিবাস্বপ্ন। এ দেশের ধারণা অনুযায়ী এ ব্যক্তি 'শিক্ষিত', কিন্তু বীটনের মতে, যতই ইংরেজী শিক্ষা করুক, তবু এই রকম ব্যক্তি শিক্ষাহীন, কারণ এদের আত্ম-উপলব্ধি হয়নি।



সিংহবাড়িতে গণ্ডা গণ্ডা দাস-দাসীর মধ্যে থাকোমণি এখন বেশ ভালোভাবেই মিশে গেছে এবং নিজের কাজে বেশ পাকাপোক্তও হয়ে উঠেছে। এখন সে-ও অন্যদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কলহ করে এবং নিজের ভাগটি কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত হিসেবে বুঝে নিতে জানে। ইদানীং সে বেশ একটু স্থূলকায়া হওয়ায় তার মুখে দেখা দিয়েছে তৈলাক্ত সুখী সুখী ভাব।

খাঁচার পাখিকে নিয়ে কবিরা কত কবিতা রচে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খাঁচার পাখির মনে মুক্ত আকাশের জন্য দুঃখ কতকাল পোষা থাকে তা কে বা জানে। অভ্যাস বশে প্রথম প্রথম কিছুদিন বন্য বিহঙ্গম খাঁচার মধ্যে থেকে ছটফট করে বটে, তারপর এক সময় সে হয়তো সেই খাঁচাকেই ভালোবেসে ফেলে। অনেক সময় দেখা যায়, পিঞ্জরের দ্বার খোলা থাকলেও আকাশের পাখি আর ফিরে যেতে চায় না মুক্ত আকাশে।

গরীব কৃষকের বধূ ছিল থাকোমণি, এখন ধনী গৃহের দাসী, তার নিজস্ব ও সন্তানের জন্য পেয়েছে নিশ্চিন্ত আশ্রয় ও খাদ্য। পুরোনো দিনের কথা আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসছে তার স্মৃতিতে। সেই ভয়মাখানো গ্রাম্য সরলতা তার ভাবে প্রকারে আর খুঁজে পাওয়া যায় না একটুও। প্রথম বছরখানেক সে তার

হারানো স্বামীর জন্য বিরলে অশ্রুপাত করতো, এখন ত্রিলোচন দাসের কথা তার কদাচিৎ মনে পড়ে এবং মনে পড়লেই ক্রোধ জাগে। থাকোমণির এখন নিশ্চিত ধারণা, সে হতচ্ছাড়া মিনসে তাদের ফেলে রেখে সজ্ঞানেই পলায়ন করেছে। নইলে, এ শহরে এত মানুষের সঙ্গে দেখা হয়, আর সেই মানুষটা কর্পূরের মতন উপে গেল? থাকোমণি নিজেও এখন প্রায়ই বাড়ির বাইরে বেরোয়, এই তো সেদিন এ-বাড়ির অন্য দাস-দাসীদের সঙ্গে দল বেঁধে বাগবাজারের কুটুম বাড়িতে তত্ত্ব দিয়ে এলো। দুটি নগদ টাকা আর একখানা নতুন শাড়ি পেয়েছিল সেজন্য। তাছাড়াও গিন্নীমার সঙ্গিনী হয়ে প্রায়ই যায় গঙ্গার ঘাটে। শহুরে হালচালও সে বুঝে গেছে অনেকটা।

স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই ইতিমধ্যে সতীত্ব বিসর্জন দিতে হয়েছে তাকে। দাসী-বাঁদীর কাজ করেও সতীত্বের গুমর দেখাবে, এ তো অসম্ভব কথা। বয়েসে যুবতী, স্বাস্থ্য ভালো, তার ওপর বেওয়া, এমন রমণী তো পুরুষের খাদ্য হবেই। প্রথম বছর দেড়েক থাকোমণি অতি কষ্টে নিজেকে সামলে ছিল, বংশানুক্রমিক সংস্কারবশতঃ তার ধারণা ছিল, যে স্ত্রীলোক পর-পুরুষের কাছে ধরা দেয়, তার স্থান হয় অনন্ত নরকে। কিন্তু শহরের এই জমিদার বাড়িতে থেকে, যে বাড়িকে অনেকে কথায় কথায় বলে রাজবাড়ি, থাকোমণি আস্তে আস্তে বুঝতে পারলো, এ রকম বাড়ির ওপরতলা আর নীচের তলাতেই আছে স্বর্গ আর নরক। আর এখানকার নরকও তেমন ভয়াবহ নয়, বরং একটু মানিয়ে নিতে পারলে বেশ আরামদায়কই হয়ে ওঠে।

এইসব গৃহের ভৃত্যতন্ত্রের মধ্যে মাঝে মাঝেই নানারকম ওঠাপড়া থাকে। কর্তা-গিন্নীদের কাছে যে যত পেয়ারের, নীচের তলায় তার তত প্রতাপ। অবশ্য এমনও দেখা যায়, কর্তা আজ যে ভৃত্যের সব কথা বিশ্বাস করছেন, দুদিন বাদে তাকেই হয়তো জুতো পেটা করে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। এই তো চিন্তামণি দাসী ছিল গিন্নীমা বিম্ববতীর একেবারে অতি নিজের লোক, গত মাসেই কোন্ অপরাধে কে জানে চিন্তামণিকে একেবারে বাড়ি ছাড়া করে দেওয়া হলো। সে নাকি আর কলকাতা শহরেই থাকতে পারবে না।

দিবাকরের স্ত্রী সোহাগবালার কর্তৃত্ব অবশ্য এখনো অক্ষুণ্ণ আছে। তার প্রবল ব্যক্তিত্ব দমন করার সাধ্য কারুর নেই। এখনো সকালবেলা পানের বাটা হাতে নিয়ে বারান্দার জলচৌকিতে বসে সোহাগবালা হুকুমের পর হুকুম চালায়। রান্নাবান্নার ব্যবস্থা থেকে আর সব কিছুই হয় তার নির্দেশে। এই ক'-বছরে আরও অসম্ভব বেশী মোটা হয়ে গেছে সোহাগবালা, এখন আর সে নিজে নিজে হাঁটতে পারে না। দুজন দাসী দুদিক থেকে তাকে ধরে ধরে এনে বসিয়ে দেয় বারান্দায়। ঐটুকু পদচারণার পরিশ্রমেই তার শরীর থেকে স্বেদ নির্গত হয় গল গল করে। গরম সে সহ্য করতে পারে না একেবারেই, গ্রীষ্মকালে গায়ে কাপড় রাখতেও যেন তার কষ্ট হয়। শুধু একটা পাতলা ফিনফিনে সাদা ফরাসডাঙার শাড়ি পরে থাকে। শরীরে যত বেশী মেদ বর্ধিত হচ্ছে, তত ফর্সাও হচ্ছে তার গাত্রবর্ণ। সেই পাতলা শাড়ি ভেদ করে দেখা যায় তার পাশ বালিশের মতন বিশাল দুটি স্তন এবং সিঁড়ির মতন পেটের ভাঁজ। আঁচলের মধ্য দিয়ে হাত গলিয়ে দিয়ে সেখানকার ঘামাচি চুলকোতে চুলকোতে সোহাগবালা হাঁক দেয়, কই রে দুজ্জোধন! মাচের মুড়ো দুটো দেকালি নি? হ্যালা গোপালী, পশ্যু তোকে ঘিয়ের টিন ভরে দিলুম আর এর মধ্যে ফৌত হয়ে গেল? চ্যায়ারাখানা অমন খোলতাই হয়েচে, আজকাল বুজি গতরেও ঘি মাকচিস? গতরসোঁগা, নিমকহারাম, লক্ষ্মীছাড়ী...।

স্বগ্রামে দিবাকর দুখানি পাকা বাড়ি বানিয়েছে, পুকুর কাটিয়েছে, মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রায়ই সে স্ত্রীকে বলে দেশে গিয়ে সেখানকার সংসারের ভার নিয়ে থাকতে। সন্তান-সন্ততি কিছু হলো না, এখন এই বয়েসে তো ধর্মকর্ম করবারই কথা। তাছাড়া সেখানে দিবাকরের দুই ভাইয়ের পরিবার সব লুটে পুটে খাচ্ছে। কিন্তু সোহাগবালা কিছুতেই যাবে না। সেখানে কি সে এতগুলো দাস-দাসীর ওপর কর্তৃত্ব করতে পারবে? তাছাড়া চুরির নেশা বড় নেশা, নিজের সংসারে গেলে সোহাগবালাকে শুধু খরচই করতে হবে, আর এখানে চাল-ডালের পাহাড়ে সে গড়াগড়ি দিতে পারে, সাঁতার দিতে পারে ঘি-তেলের সমুদ্রে। যদিও গড়াগড়ি দেওয়া কিংবা সাঁতার কাটার মতন শারীরিক শক্তি আর তার নেই, প্রায়ই বাত ব্যাধিতে তাকে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়তে হয়।

প্রথম প্রথম অন্যান্য দাসদাসীদের দেখে থাকোমণি বুঝেছিল যে সোহাগবালার সকল রকম অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে যাওয়াই এ বাড়ির নিয়ম। কারণ, সোহাগবালার নামে কারুর কাছে কখনো নালিশ চলে না। ওপর মহলের কারুর সঙ্গে কথা বলারই অধিকার নেই নীচতলার ভৃত্যদের। গুরুতর কোনো ব্যাপার ঘটলে সে খবর জানাতে হয় দিবাকরকে। রান্নাঘরের দুজন ঠাকুর নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে একজন একটি জ্বলন্ত কাঠি তুলে মেরেছিল অন্য জনের মাথায়। সে ঘটনা ওপরতলার বাবুদের কর্ণগোচরও হয়নি। যা কিছু প্রতিবিধান তা দিবাকরই করেছিল। যে পাচকটি মার খেয়েছিল, তাকেই বরখাস্ত করে দেয় দিবাকর। সুতরাং সোহাগবালার হুকুমে খুন্তি পুড়িয়ে পিঠে ছ্যাঁকা দেগে দেবার শাস্তি দেওয়া হয় যখন কোনো অবাধ্য দাস-দাসীকে, তখন সে ঘটনা দিবাকরকে জানানোও অর্থহীন।

বিশ বাইশটি দাস-দাসীর মধ্যে দু-চারজনকে অবশ্য হঠাৎ হঠাৎ দয়া-দাক্ষিণ্য দেখায় সোহাগবালা। এর কারণ সহজে বোঝা যায় না। কোনোদিন যদি সন্ধের পর সোহাগবালা কোনো দাসীকে তার পা টিপে দেবার জন্য নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে যায়, তা হলেই বুঝতে হবে যে সেই দাসীর কপাল ফিরেছে। থাকোমণি অবশ্য গোড়ার থেকেই যে সোহাগবালার বিষ নজরে পড়েছিল, তা কাটিয়ে উঠতে ঢের সময় লেগে গেছে।

দুলালকে আর দিনের বেশীর ভাগ সময়ই কাছে পায় না থাকোমণি। দুলাল থাকে ওপরতলাতেই, সে ছোটবাবুর খাস ভৃত্য হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে, এজন্য দুটি টাকা মাইনেও বরাদ্দ হয়েছে তার এবং ভালোমন্দ খেতেও পায়। সে নবীনকুমারের খেলার সঙ্গী, এই খেলার একটি অঙ্গ প্রহার সহ্য করা, দুলালচন্দ্র এই বয়েসেই শিখে নিয়েছে যে মনিবের হাতে প্রহার খেলে প্রতিবাদ করতে নেই। রুপালী রঙ করা কাঠের তলোয়ার নিয়ে লড়াই করতে করতে দুলালচন্দ্র নিজেই এক সময় ইচ্ছে করে ধরাশায়ী হয়, নবীনকুমার তার বুকের ওপর চেপে বসে গলায় তলোয়ারের পোঁচ দেয়। ব্যথা পেয়ে দুলালচন্দ্র যত হাসে ততই নবীনকুমার মাত্রা বাড়ায় অত্যাচারের এবং শেষ পর্যন্ত দুলালচন্দ্রের চোখ দিয়ে জল বার হতে দেখে তৃপ্ত হয় সে। অবশ্য নবীনকুমার ভালোও বাসে দুলালচন্দ্রকে, সে শুধু ওকে তার সুস্বাদু খাদ্যেরই ভাগ দেয় না, তাকে সে বিদ্যাশিক্ষায়ও সাথী করে নিয়েছে। দুলালচন্দ্র এর মধ্যেই বাংলা যুক্তাক্ষর সমন্বিত "দাতাকর্ণ" বইটি পড়তে পারে।

মানুষ বেশীদিন একেলা থাকতে পারে না। পুত্র সংসর্গ বঞ্চিতা হয়েই

থাকোমণি আস্তে আস্তে অন্য দাসদাসীদের সঙ্গে মিশতে শুরু করে। দাসদাসী মহলের প্রধান বিলাসিতাই হলো নানা রকম কুৎসা রটনা। কলকাতার সমস্ত বড় বড় ঘরের গুপ্ত কাহিনীই যেন তাদের নখদর্পণে। এমন কি কোন্ বড় মানুষ ওপরে ওপরে বড়মানুষী ঠাঁট বজায় রাখলেও ভেতরে ভেতরে সে ফোঁপরা হয়ে গেছে, সে সব গূঢ় কথাও তাদের অজানা নয়।

অধঃপতিত ধনী তাদের কাছে অতিশয় কৃপার বস্তু। যতদিন ঐশ্বর্যের রব-রবা, ততদিন এইসব মানুষরা দেবতা স্থানীয়, স্বর্গ থেকে পতন হলেই দেখতে পাওয়া যায় তাদের খড়ের শরীর। দাসদাসীরা তাদের নিয়ে হাসাহাসি করে। দ্বারকানাথ ঠাকুরকে এরা বলে দ্বারিকা মহারাজ, দাস-দাসীদের চোখে তিনি ছিলেন দেবরাজ ইন্দ্রের তুল্য, সেইজন্যই তাঁর মহারাজ উপাধি এরাই দিয়েছে, কিন্তু তাঁর পুত্রকে এরা বলে দেবাঠাকুর। সেই দেবাঠাকুর নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করেছেন বলে তাঁর প্রতি এদের অসীম ঘৃণা। গ্রাম থেকে আসা এই সব সর্বহারা পরিবারের লোকেরা বড় মানুষদের দারিদ্র্য কিছুতেই যেন সহ্য করতে পারে না। বস্তুত মল্লিক বাড়ির ছোট বধূর এক মুসলমানের সঙ্গে পলায়নের কাহিনীর চেয়েও যেন এই দেবাঠাকুরের অধঃপতনের গল্প দাস-দাসীদের কাছে বেশি আকর্ষণীয় বোধ হয়।

একদিন নকুড় সন্ধেবেলা ঢুকে পড়েছিল থাকোমণির ঘরে। চরসের নেশায় নকুড়ের চোখ দুটি টকটকে লাল, তার গায়েও অসুরের শক্তি। নকুড় সম্প্রতি বাজার সরকারের পদে উন্নীত হয়েছে, ফলে সে আর এখন ঠিক ভৃত্য শ্রেণীর মধ্যে নেই, অন্যরা তাকে নোক্ড়োদাদা বলে ডাকতে শুরু করেছে। ইদানীং মাছের দর বেশি চড়া, রুই-কাৎলার দর উঠেছে আট টাকা মণ, নকুড় তাও দশ টাকা মণ হিসেবে চালায়। এ বাড়িতে রোজ কিছু না হোক আট-দশ সের মাছ আসে, অর্থাৎ নকুড়ের রোজ এক আধুলি উপরি রোজগার, তার থেকে এক সিকি যদিও দিতে হয় সোহাগবালাকে, তবু নকুড়কে দেখলেই বোঝা যায় তার বেশ টাকার গরমাই হয়েছে।

ছেলে থাকে ওপরে বাবু মহলে, তাই থাকোমণি ঘরে ছিল একা, হঠাৎ নকুড়কে দেখে সে আঁতকে উঠেছিল। নকুড় অতি মিঠে গলায় বলেছিল, আর কতদিন শুকিয়ে থাকবি পেয়ারী? আজ তোর নরম হাতের ছিলিম টানবো।

ভৃত্যমহলে গাঁজা, গুলি, চরসের নেশা প্রায় সবাই করে, স্ত্রীলোকেরাও বাদ যায় না। কর্তারা নীচতলার কোনো খবরই রাখেন না। ভৃত্যরা শুধু এক ব্যাপারে সাবধান থাকে, যাতে কোনো রকম গোলমাল ওপরে না পৌঁছোয়। সেইজন্যই সুরাপান এখানে নিষিদ্ধ। সুরাপান করলেই হল্লা করার একটা প্রবৃত্তি জাগে বলে কারুর যদি কোনোদিন ঐ তৃষ্ণা খুব পায়, তাহলে সে সেদিন বাড়ির বাইরে রাত কাটিয়ে আসে।

থাকোমণি বলেছিল, ওমা, ওকি, ওকি!

নকুড় তার পাশে বসে পড়ে আদরকাড়া কণ্ঠে বলেছিল, ছিলিম সাজতে জানিস না, পেয়ারী? আয় আমি তোকে শিক্যে দিচ্চি!

এর পর সে ছিলিম টানার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক বিরহিত কারণে থাকোমণির আঁচল টানার চেষ্টা করেছিল।

থাকোমণি সেবার অবশ্য পালিয়ে বেঁচেছিল। কোনোরকম চিন্তা না করেই সে সহজাত বুদ্ধিতে বুঝেছিল যে বাঁচবার একমাত্র উপায় সোহাগবালার কাছে আশ্রয় নেওয়া। নকুড়ের মতন শক্তিশালী ব্যক্তিও সোহাগবালার সামনে এসে জুলুম

করার সাহস দেখাবে না।

সোহাগবালা জিজ্ঞেস করেছিল, ও মা, অমন হা-ঘরে মাগীদের মতন দম ফাটাচ্চিস কেন! কী হয়েচে লা?

থাকোমণি এটুকুও বুঝেছিল যে নকুড়ের নামে কোনো নালিশ করা ঠিক হবে না। নীচতলার জগতে কোনো পুরুষের নামে কোন স্ত্রীলোকের নালিশ জানাবার নিয়ম নেই। যাবতীয় শাস্তি স্ত্রীলোকদেরই প্রাপ্য।

থাকোমণি কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে ছিল।

—ভূত দেকিচিস নাকি? মুখ অমন আমসি পারা হয়ে গ্যাচে কেন?

এই ব্যাপারটা মেনে নেওয়াই সুবিধাজনক বলে থাকোমণি ঘাড় হেলিয়ে বলেছিল, হ্যাঁ গো মা। ছায়ার মতন কী যেন স্যাঁৎ করে সরে গেল!

—পাইখানার দিক ঠেঙে তো? বাসী কাপড়ে গিয়িচিলি! কদ্দিন বলিচি সন্ধের পর ওদিকে বাসী কাপড়ে যাবিনি, দেবে একদিন ঘাড় মুচড়ে—

নকুড় অবশ্য সেদিন আর কোনো ঝঞ্ঝাট করেনি। থাকোমণির ঘরেই বসে সে ঘণ্টাখানেক ধরে চরস পুড়িয়ে পুড়িয়ে টানতে লাগলো। আর হাসতে লাগলো ফিক ফিক করে।

সব কিছুই চক্রবৎ পরিবর্তিত হয়। যার আরম্ভ এক রকম, তার শেষও সেই অনুযায়ী হবে। থাকোমণির মতন যারা গা ছাঁটা দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে যায়, তারা কেমন ভাবে ফিরে আসবে, তা নকুড় জানে।

এর পর থাকোমণি যেন সত্যিই একদিন বাড়ির মধ্যে ভূত দেখলো। কিছুদিন ধরে তার ওপর ভার দেওয়া হয়েছে সন্ধেবেলা বাতি জ্বালানোর। ওপরতলায় বাতি জ্বালাবার আলাদা লোক আছে, থাকোমণি শুধু রান্না ঘর, ভাঁড়ার ঘর, জলের ঘর, আনাজের ঘর আর ভিতর মহলের এক তলার বিভিন্ন কুলুঙ্গিতে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বালায়। গন্ধকমাখানো একটি পাটকাঠি এক হাতে, অন্য হাতে তেলের ডিবে নিয়ে ঘোরে থাকোমণি।

মাঝ মহলের অব্যবহৃত বৈঠকখানার সামনের বারান্দার কুলুঙ্গিতে রাখা সেজ বাতি জ্বালতে গিয়ে থাকোমণি দারুণ ভাবে চমকে উঠলো। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে দিবাকর। বৈঠকখানার দরজাটা ঠেলা দিয়ে খুলে দিবাকর বললো, আয়!

বড়বাবু তখনো বেঁচে, কিন্তু পর পর কয়েকদিন বাড়ি ফিরছেন না। বাবুর বড় ছেলে গঙ্গানারায়ণ গেছে মহাল পরিদর্শনে। বিধুশেখর সকালে একবার তদারক করে চলে যান, তারপর সারাদিন দিবাকরই যেন বাড়ির কর্তা। এই সব দিনে দিবাকরও যথেষ্ট নেশাভাঙ করে। অবশ্য সোহাগবালার এমনই দাপট যে দিবাকর কোনোদিন বাড়ির বাইরে রাত কাটাবার সাহস পায়নি।

দিবাকরকে দেখে থাকোমণি ভয়ে একেবারে বাক্যরহিত হয়ে গিয়েছিল। চিৎকার পর্যন্ত করতে পারেনি। দিবাকর যে এমন ব্যবহার করবে, তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। পিছন দিকের দালানে এইমাত্র সোহাগবালাকে বসে থাকতে দেখেছে সে, আর এত কাছে দিবাকর তার কাছে এমন প্রস্তাব করছে। দিবাকরের বয়েস প্রায় ষাটের কাছাকাছি, তাকে থাকোমণি প্রায় পিতার মতন মনে করে। তাছাড়া দিবাকরই তো তাদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক।

দিবাকর আবার বললো, ভিতরে আয়, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইচিস কি? অ্যাঁ? চেহারাখানা তো বেশ খোলতাই হয়েচে।

দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে থাকোমণি সেদিনও দৌড়োলো। আবার আশ্রয় নিল সোহাগবালার কাছে। মুখে কিছু বললো না, শুধু থরথর করে কাঁপতে

লাগলো ভয়ে।

সোহাগবালা ধমকে বললো, আ মর, এ আবাগীর বেটির দেকচি বেশী বেশী ভয়! মুচ্ছো যাবে একেবারে। বাড়ির মধ্যে ভূত আসবে? অ্যাঁ? এ বাড়িতে নারায়ণ প্রিতিষ্ঠে করা আছে, ভূতের বাপের সাধ্যি কি এর ত্রিসীমানায় পা বাড়ায়!

সেদিন সারারাত ঘুম আসেনি থাকোমণির। ছেলেকে জড়িয়ে ধরে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছে। সে বুঝেছে, তার যৌবনের প্রতি চিল শকুনের দৃষ্টি পড়েছে। কয়েক বছরে দু-বেলা পেটপুরে খেয়ে জেল্লা ফিরেছে তার শরীরের। আরশিতে নিজেকে দেখে সে নিজেই যেন চিনতে পারে না। পুরুষ মানুষের দৃষ্টি যখন তার গায়ে বেঁধে, তখন এক ধরনের সুখানুভূতিতেও শিরশির করে তার সর্বাঙ্গ। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে পড়ে মাতু বলে সেই মেয়েটির কথা। সে হতভাগিনী পোয়াতী হয়ে পড়েছিল, তারপর সেই ভুলের মাসুল হিসেবে তাকে প্রাণ দিতে হয়। তারপরেও ভব নামের একটি দাসী ঐ একই ভুল করে। সে অবশ্য প্রাণে মরেনি কিন্তু গর্ভ নিষ্কাষণের পর তার শরীর শালিকের বাচ্চার মতন এমনই শুকিয়ে হাড়-বের-করা হয়ে যায় যে এখন আর কেউ তার দিকে তাকিয়েও দেখে না।

সেই রাত্রেই থাকোমণির ইচ্ছে হয়েছিল ও বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবে। বিশ্ব-সংসারে তার ছেলে দুলালচন্দ্র ছাড়া আর কেউ নেই। ছেলের হাত ধরে পথে বেরিয়ে পড়লে সে ভিখ্ মেঙেও দিন চালাতে পারবে। এ শহরে কাঙালীরও অন্ন জুটে যায়। তবু তো থাকোমণির মান বাঁচবে।

থাকোমণি অনায়াসেই চলে যেতে পারতো। কেউ তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখেনি। এক বাড়ির দাসদাসীরা অন্য বাড়িতে কাজ পেয়ে চলে যায়। কেউ তাদের বাধা দেয় না। কিন্তু আমরা পূর্বেই খাঁচার দরজা খোলা পাখির উল্লেখ করেছি।

সম্মান রক্ষার জন্য পুত্রের হাত ধরে থাকোমণির পথে বেরিয়ে পড়ার শুভ সঙ্কল্প ক্রমশই পিছিয়ে যায়। বাবুদের উচ্ছিষ্টান্নও দুলালের কাছে রাজভোগের মতন, থাকোমণি নিজেও কোনোদিন বড় মাছের কাঁটা চচ্চড়ি দিয়ে ভাত খায়নি—এসব ছেড়ে অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে যেতে তার আর পা ওঠে না।

তারপর একদিন তার ডাক পড়ে সোহাগবালার ঘরে। শীতের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সোহাগবালার বাতের ব্যামো বৃদ্ধি পায়। কয়েকদিন ধরে সে সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী। থাকোমণি ইদানীং সোহাগবালার খুব ন্যাওটা হয়ে গেছে, প্রায় সর্বক্ষণ তার কাছাকাছি থেকেছে। সেই সুবাদেই বোধ হয় সোহাগবালার সেবার জন্য থাকোমণিকে পছন্দ করা হয়। সন্ধ্যাকাল, দুলাল তখনও ওপর মহলে নবীনকুমারের সঙ্গে রয়েছে, নবীনকুমার ঘুমিয়ে না পড়লে সে নীচে নামবে না, এই সময় থাকোমণি নিজের ঘরে এসে কাপড় বদলে সোহাগবালার ঘরের দিকে যায়। সোহাগবালার ছুঁৎমার্গ আছে, বাসী কাপড় পরে কেউ তার অঙ্গ স্পর্শ করতে পারে না।

থাকোমণির যাবার সময় অন্য দাসীরা তার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসে। এতদিনে থাকোমণির কপাল ফিরলো, আর কোনোদিন সোহাগবালা গাল মন্দ করে তার বিষ ঝাড়বে না থাকোমণির ওপর। কয়েকজন দাসী কী সব মন্তব্য করে, থাকোমণি ঠিক বুঝতে পারে না।

নীচতলায় সোহাগবালার অধিকারে আছে তিনখানা কুঠরি। নীচ মহলে বেশ

কয়েকটি ঘরই সারা বছর অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকে, ইচ্ছে করলে সোহাগবালা তার সব ক'টাই ব্যবহার করতে পারে।

যত মোটা হচ্ছে ততই সোহাগবালার বিছানার গদি হচ্ছে পুরু। কর্তাদের বাতিল করা বিশাল একটা পালঙ্ক তার শয়নকক্ষে রয়েছে। সোহাগবালা ব্যথায় উঃ আঃ করছিল, এক গলা ঘোমটা দিয়ে এসে থাকোমণি তার পদসেবা করতে লাগলো। ভীমের গদার মতন মোটা মোটা পা সোহাগবালার, কিন্তু মাংস যেন নরম তুলতুলে, হাত দিলে আঙুল বসে যায়।

আধ ঘণ্টাটাক সেবা নেবার পর সোহাগবালা খানিকটা আরাম বোধ করার পর ডাকলো, এই মেয়ে, ইদিকে আয়, আমার সামনে ডাঁড়া।

থাকোমণি এসে তার শিয়রের কাছে দাঁড়ালো।

সোহাগবালা বললো, মুখের কাপড় তোল।

থাকোমণির মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো সোহাগবালা। তার আজকের দৃষ্টি, কণ্ঠস্বর, সবই যেন অন্য প্রকার। থাকোমণির মুখে সে কী দেখছে তা সেই জানে।

একটু পরে সে বললো, পাশের ঘরে যা। তোদের গোমস্তাবাবুর জ্বর হয়েচে। যদি মাতা টিপে দিতে বলে দিবি। যদি পা টিপে দিতে বলে পা টিপে দিবি। যা—

থাকোমণি স্থাণু হয়ে গেল। সোহাগবালা নিজে তাকে দিবাকরের কাছে যেতে বলছে! এই দিবাকর, একদিন তাকে ফাঁকা অন্ধকার বৈঠকখানা ঘরের দরজা খুলে বলেছিল, আয়। সোহাগবালা নিশ্চয়ই সে কথা জানে না। এখন কি সে কথা থাকোমণির বলে দেওয়া কর্তব্য? কিন্তু কোনো পত্নীর কাছে কি কেউ পতির নিন্দা করে? কিংবা তেমন করেও কি কিছু লাভ হবে!

থাকোমণির মনে হলো, সেই মুহূর্তে সে মরে গেলেই যেন ভালো হয়।

সোহাগবালা আবার হুকুমের সুরে বললো, যা। ভয় নেই!

থাকোমণি এবার আর পালিয়ে গেল না। অচৈতন্যের মতন সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল পার্শ্ববর্তী কক্ষের দিকে।

শয্যা শূন্য, সেখানে দিবাকর নেই। সে দাঁড়িয়ে ছিল দ্বারের পাশে, উৎসুক প্রতীক্ষায়। থাকোমণি ঘরে ঢোকা মাত্রই দিবাকর তাকে দু' হাতে চেপে ধরলো। জ্বরো রুগীর মতন তপ্ত তার হাত, কিন্তু এ জ্বর অন্য রকম।

দিবাকর তাকে টেনে নিয়ে গেল শয্যার দিকে। থাকোমণি কোনোক্রমে একবার বললো, ওগো, আমায় দয়া করুন গো বাবু!

তার উত্তরে দিবাকর বললো, চুপ, টু শব্দটি করবিনি। গলা টিপে দোবো একেবারে!

অর্ধ প্রহর পরে সে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো থাকোমণি, তখনও সে কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

সোহাগবালা ঠিক সেই দ্বারের দিকেই চক্ষু নিবদ্ধ করে পাশ ফিরে ছিল। থাকোমণি বেরুতেই সে অঙ্গুলির ইঙ্গিত করে বললো, ডাঁড়া!

তারপর কোনোক্রমে উঠে বসবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে বললো, উফ, নিজে পাচ্ছিনি; শোন, ডান দিকের ঐ কুলুঙ্গিতে দ্যাখ একটা বেতের ঝাঁপি রয়েচে, সেটা নিয়ায় আমার কাচে। পেঁচোয় পাওয়ার মতন হাঁ করে ডাঁড়িয়ে রইলি কেন, যা বলচি শোন! বেতের ঝাঁপিটা আমায় দে।

থাকোমণিকে কান্না থামিয়ে সোহাগবালার হুকুম তামিল করতে হলো। বেতের

ঝাঁপি থেকে কয়েকটি শিকড় বাকড় বার করে সেগুলো থাকোমণির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, এগুলো এখুনি বেটে খেয়ে নিগে যা। ভয় নেই। আমার কতা শুনে চলবি, ঠিক থাকবি। তেত্রিশ বছর হলো বে হয়েছে, একদিনও তোদের গোমস্তাবাবুকে বাড়ির বাইরে রাত কাটাতে দিইনি। পুরুষ মানুষকে ধরে রাকা কি যে সে কতা! তার ওপর ভগমান আমার কপালে ছেলেপুলে দিলেন না!

বালিশের তলা থেকে একটি নতুন শান্তিপুরী তাঁতের শাড়ি বার করে সেখানিও থাকোমণির হাতে তুলে দিয়ে বললো, এ কাপড়টা য্যানো আগেই পরে ফেলিসনিকো। এর পর যেদিন ডাকবো, চান টান করে এই নতুন বস্তর পরে আসবি! এখন যা—!

এর পরেও থাকোমণি স্বেচ্ছায় মরলো না কিংবা ছেলের হাত ধরে পথে বেরিয়ে পড়লো না। দু-তিনদিন লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদলো শুধু। দুলাল তার মাকে অনেকদিন কাঁদতে দেখেনি। রাত্রে শুয়ে শুয়ে একদিন মায়ের ফোঁপানি শুনে জিজ্ঞেস করেছিল, তোর কী হয়েছে মা?

থাকোমণি উত্তর দিতে পারে না।

তারপর, পরের সপ্তাহে যখন সোহাগবালা থাকোমণির বদলে অন্য একজন দাসীকে ডেকে পাঠালো, সেদিন, বিস্ময়ের কিছু নেই, থাকোমণির খানিকটা ঈর্ষা হলো পর্যন্ত। সেদিনও তার চোখ ঠেলে জল বেরিয়ে আসতে চাইছিল। অবশ্য পরবর্তী সপ্তাহে তার আবার ডাক পড়লো। তারপর প্রায় প্রতি মাসেই নিয়মিত দু-একবার।

এবং একদিন নকুড়ও এলো তার ঘরে। ঘোলাটে চক্ষু ও অসম্বৃত কণ্ঠে নকুড় বললো, সেই তো মল খসালি, আগে শুধু এঁটো হলি! তারপর থাকোমণিকে সবলে আঁকড়ে ধপাস করে পড়ে গেল মেঝের ওপরে। সেদিন নকুড়কে বাধা দেবার মতন শুধু শারীরিক জোর নয়, মনের জোরও অবশিষ্ট ছিল না থাকোমণির। এমন কি, এরকম ঘটনা কয়েকবার ঘটবার পর নকুড়কেই বেশী পছন্দ করে ফেললো থাকোমণি। দিবাকর বৃদ্ধ, নকুড় যুবক। দিবাকরের অনেকগুলি দাঁত নেই, আর নকুড় বন্য পশুর মতন হিংস্র।

কিছু দিনের মধ্যেই এই দুই পুরুষ মানুষের সঙ্গে পালা করে মিলন-ভোগ করতে অভ্যস্ত হয়ে গেল থাকোমণি। এবং এর ফলেই হয়তো তার চলনে, বলনে, কথাবার্তায় ব্যক্তিত্বের ছাপ এলো, এতদিন পর সে নারী হিসেবে নিজের মূল্য বুঝতে পেরেছে।

কয়েক দিন ধরে দুলালচন্দ্রের জ্বর। তার জন্য নবীনকুমার এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে স্বয়ং এসে দুলালকে দেখে গেছে। কোনো দাসীর ঘরে বাবুদের ছেলের আসা প্রায় এক অসম্ভব ঘটনা। কিন্তু নবীনকুমার বায়না ধরলে তা রোধ করার ক্ষমতা কারুর নেই। কয়েক দিন দুলালচন্দ্র একেবারে নেতিয়ে পড়েছিল, ভয়ে উৎকণ্ঠায় থাকোমণিও প্রায় মুমূর্ষুর মতন হয়ে গিয়েছিল। ঐ ছেলে ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কেউ নেই, ছেলের কিছু হলে সে আর বাঁচবে কী নিয়ে! কাল থেকে অবশ্য দুলালচন্দ্র আবার ভালোর দিকে, বোঝাই যায়, তার বিপদ কেটে গেছে। এই সময়ে সোহাগবালা অনেক সাহায্য করেছে তাকে, লোক পাঠিয়ে কোবরেজ মশাইদের কাছ থেকে দাওয়াই আনিয়ে দিয়েছে। সোহাগবালার কাছে থাকোমণির কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

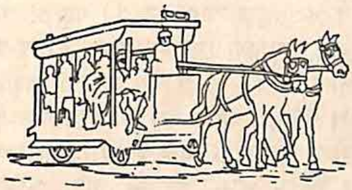
ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে পাশে শুয়ে ছিল থাকোমণি, এমন সময় দরজায় টোকা পড়লো। এ আওয়াজ থাকোমণির চেনা। এ নকুড় নয়, ডাক এসেছে দিবাকরের কাছ থেকে। না গিয়ে উপায় নেই। থাকোমণি স্নান করতে গেল।

ফিরে এসে যখন সে শাড়ি বদল করছে, এমন সময় জেগে উঠলো দুলালচন্দ্র। জিজ্ঞেস করলো, মা, কোথায় যাচ্চিস এখন?

একটু অপ্রস্তুত হয়ে থাকোমণি বললো, কোথাও না! দেখি, একবার বুঝি গিন্নীমা কেন ডেকেচেন।

এর পর স্বাভাবিক ভাবেই ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগলো দুলালচন্দ্র। সে এখন মাকে ছেড়ে থাকতে চায় না। থাকোমণি যতই বোঝায় যে একটু শুয়ে থাক আমি আসচি, সে বুঝবে না। অসুস্থ হলে মায়ের ওপর অযৌক্তিকভাবে বেশী জোর খাটাবার একটা অধিকার সব সন্তানদেরই বর্তে যায়। সেই অনুযায়ী দুলালচন্দ্র আনুনাসিক কান্না জুড়ে দেয় এবং মায়ের আঁচল টেনে ধরে।

বেশী দেরি করলে সোহাগবালা আর দিবাকর রাগ করবে। অনেক চেষ্টা করেও যখন দুলালকে বোঝানো গেল না, তখন বিরক্ত হয়ে থাকোমণি খুব জোরে তাকে একটা থাবড়া কষিয়ে দিল। গরগরিয়ে বললো, তুই মর, মর, মরতে পারিস না! তুই মরলে আমার হাড় জুড়োয়!



বারাসতের বালিকা বিদ্যালয়ের ঘটনা নিয়ে শহরে খুব শোরগোল চলছে।

এত বড় শহরে বালিকাদের শিক্ষার জন্য আজ পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা করা গেল না। এক একবার উদ্যোগ হয় ও ভেস্তে যায়। খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারিকাগণ দু-একটি স্কুল খুলেছেন অবশ্য কিন্তু সেখানে সম্ভ্রান্ত দেশীয় ব্যক্তিগণ কেউই তাঁদের কন্যাদের পাঠাতে চান না। মুসলমান সমাজে কঠোর পর্দা প্রথা, তাদের বালিকারা বাইরে পড়তে যাবে না। হিন্দু পরিবারের অবরোধ একটু একটু করে ভাঙছে, যদিও জাত নষ্ট হবার ভয় এখনো যায়নি। এ ভয় সম্পূর্ণ অমূলকও নয়, মিশনারিরা যেন রক্তলোলুপ ব্যাঘ্রের মতন জোর করে ছেলেমেয়েদের ধরে ধরে খ্রীষ্টান করার জন্য ব্যগ্র। এই অবস্থার মধ্যে বারাসত নামে ক্ষুদ্র পল্লীর স্থানীয় অধিবাসীদের চেষ্টায় একটি দেশীয় বালিকা বিদ্যালয় দিব্য চলছে। এজন্য বারাসতবাসীরা সারা দেশের প্রশংসাভাজন হয়েছিল। বিশেষত প্যারীচরণ সরকারের পরিশ্রম ও উদ্যোগেই স্কুলটি চলছিল বলে সবাই তাঁকে ধন্য ধন্য করে। হঠাৎ একটি উল্টো ব্যাপার ঘটলো।

বারাসতের ঐ বিদ্যালয়ে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসবে একজন ইংরেজ সস্ত্রীক গিয়েছিলেন সভাপতি হিসেবে। একটি অল্প বয়েসী বালিকার কবিতাপাঠ শুনে মোহিত হয়ে ইংরেজ পুরুষটি আদর করে তার গাল টিপে দেন। অমনি অভিভাবকদের মধ্যে চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। একদল বললে, হিন্দু কন্যাকে ম্লেচ্ছ ছুঁয়েছে বলে মেয়েটির জাত গেছে। কেউ কেউ এমন কথাও বললে যে ইংরেজের স্পর্শে মেয়েটির শ্লীলতা হানি হয়েছে। সাহেবটি অপ্রস্তুতের একশেষ। শেষ পর্যন্ত ব্যাপার এমন দাঁড়ালো যে স্কুলটি উঠে যাবারই উপক্রম।

স্কুলের শিক্ষকদের ধোপা নাপিত বন্ধ হলো, এমনকি স্থানীয় জমিদার ডাকাত লেলিয়ে তাঁদের প্রাণে মারবারও চেষ্টা করলেন।

শহরের পত্র-পত্রিকায় এই বিষয় নিয়ে বাদানুবাদ চললো বেশ কয়েকদিন। পথে-ঘাটেও লোকের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা। হিন্দু সমাজের এবম্বিধ ছুঁৎমার্গের নিন্দে করলে অনেকে, আবার সাহেবদের সংস্পর্শ থেকে বালক-বালিকাদের সম্পূর্ণ দূরে রাখারও পক্ষে কম লোক নেই।

এই ঘটনায় সবচেয়ে বেশী মনে আঘাত পেলেন জন বীট্‌ন। এ দেশের মানুষের মন যদি এতখানি সংস্কারাচ্ছন্ন হয়, তাহলে এ দেশে বিদ্যার প্রসার হবে কিরূপে। সরকারী মহলেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। এ দেশের লোকদের ইংরেজি শেখাবার জন্য সরকার ক্রমশই বেশী উদ্যোগ নিচ্ছিল বটে, কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর রাজকর্মচারীদের মত হলো এই যে স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপারে তাঁদের মাথা গলাবার দরকার নেই। এ দেশীয়দের সঙ্গে ব্যবহারে সরকার সব সময় সতর্ক থাকতে চান। মিশনারিদেরও খানিকটা নিরস্ত করা দরকার। ভারতীয়রা অর্থনৈতিক ক্ষতির ব্যাপারটা বোঝে না। শুধু ধর্মে হস্তক্ষেপ করলেই তারা ক্ষেপে ওঠে।

ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিসভায় আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন জন বীট্‌ন। ডেভিড হেয়ার মারা গেছেন ছ' বছর আগে, তবু প্রত্যেক বছর তাঁর মৃত্যুদিনে শিক্ষিত হিন্দুরা সভার আয়োজন করে তাঁকে স্মরণ করে। বক্তৃতা হয় ইংরেজি ও বাংলায়। বীট্‌ন বিস্মিত হয়ে দেখলেন, কোনো কোনো বক্তা হেয়ার সাহেবের কীর্তির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে অশ্রুপাত করে। এ জাতি সত্যিই বড় বিচিত্র। এক সাহেবের স্পর্শে এদের জাতি নষ্ট হয় আবার আর এক সাহেবের কথা মনে করে কাঁদে।

সেই সভাতেই কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালীর সঙ্গে পরিচয় হল বীট্‌নের। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে তিনি খুশী হলেন, তাঁরা যথেষ্ট শিক্ষিত এবং উদার মনের মানুষ। আরও কয়েকটি সভাসমিতিতে দেখা হলো এঁদের সঙ্গে। ভারতীয়দের মধ্যে এঁরা অগ্রণী শ্রেণীর। পরে বীট্‌ন খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলেন যে এঁরাই এককালের 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে খ্যাত যুব সম্প্রদায়, ডিরোজিও নামে এক অকালমৃত ফিরিঙ্গি যুবক ছিলেন এঁদের শিক্ষাগুরু। এ দেশীয়দের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষায় এঁরাই সবচেয়ে বেশী কৃতবিদ্য। তিনি আরও শুনলেন যে এঁদের মধ্যে যাঁর নাম রামগোপাল ঘোষ, তাঁর বাড়িতে প্রায়ই এঁরা একত্রিত হয়ে নানারকম উচ্চাঙ্গের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

বীট্‌ন রামগোপাল ঘোষকে আমন্ত্রণ জানালেন যেন তিনি এক সন্ধ্যাবেলা বন্ধুবান্ধবসহ তাঁর বাড়িতে চা পান করতে আসেন। রামগোপাল ঘোষ এলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে। এঁদের মধ্যে একজন ব্যতীত আর সকলেই সাহেবী পরিচ্ছদে ভূষিত। যিনি ব্যতিক্রম, তিনি পরিধান করে আছেন ধুতি ও ফতুয়া, মাথায় মস্তবড় টিকি। ইনি বিদ্যাসাগরের বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

মদনমোহনের সঙ্গে রামগোপালের পরিচয় হয়েছে কয়েক বছর আগে। এই পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হওয়ায় একটি বিরাট সুফল ফলেছে। ইয়ং বেঙ্গলের দল ইংরেজি শিক্ষার ফলে গোড়ার দিকে দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে শুধু ইওরোপীয় সংস্কৃতি অনুকরণ করতেন। তাঁরা মনে করতেন, এ দেশের সব কিছুই কু-সংস্কারে ভরা। মদনমোহনের মাধ্যমে তাঁদের সেই ভুল আস্তে

আস্তে ভাঙলো, তাঁরা সন্ধান পেলেন সংস্কৃত সাহিত্যের বিরাট ঐশ্বর্যের, তাঁরা বুঝলেন মাতৃভাষা বাংলার প্রয়োজনীয়তা। মদনমোহনের বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলাপ হবার পর তাঁরা টের পেলেন, সংস্কৃত পণ্ডিতদের মধ্যে এমন মুক্ত মনের মানুষ থাকতে পারে। এর ফলে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানের সঙ্গে মিলন হলো ভারতীয় সংস্কৃতির, মানবপ্রেমের সঙ্গে যুক্ত হলো দেশপ্রেম।

বীটন খাতির করে বসালেন রামগোপাল ও তাঁর বন্ধুদের। দু-একবার শুধু তিনি ঈষৎ সংশয়পূর্ণ নয়নে তাকালেন মদনমোহনের দিকে। তিনি শুনেছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা অপরের ছোঁয়া কিছু খায় না। তাহলে এই ব্রাহ্মণকে কি কিছু জলখাবার খাওয়ার অনুরোধ জানানো সংগত হবে? ইনি অপমান বোধ করবেন না তো?

চতুর মদনমোহন বীটনের সংশয় বুঝতে পেরে নিজেই সহাস্যে বলে উঠলেন, মহাশয়, আমি গো-মাংস ভক্ষণ করি না, কিন্তু চায়ের স্বাদে খুব তৃপ্তি পাই। এবং ইহাও জানি, গো-মাংস ভক্ষণকারীরাই অতি উত্তম চা প্রস্তুত করেন।

বীটন বাংলা জানেন না, সুতরাং কথাবার্তা চলতে লাগল ইংরেজিতেই। মদনমোহনও বেশ ইংরেজি জানেন, মাঝে মাঝে দু-একটি শব্দে আটকে যান, তখন বাংলায়, ইংরেজি প্রতিশব্দটি জেনে নেন রামগোপালের কাছ থেকে।

মদনমোহন সুরসিক, হাস্যরঙ্গ ছাড়া কথা বলতে জানেন না, সেজন্য অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই আড়ষ্টতা কেটে গেল। বীটন অতি উচ্চ রাজকর্মচারী হলেও তাঁর ব্যবহারে সেরকম কোনো ভাব নেই।

প্রথমে কথা চলছিল আবহাওয়া নিয়ে। বাতাসে এখন অতি উৎকট তাপ, দুজন পাঙখাপুলার ঘরে ঝোলানো বিশাল পাখাটি টানছে, তবু গরম কমে না। রামগোপাল বললেন, ইংলণ্ডে এখন বসন্তকাল। বাতাস অতি স্নিগ্ধ। আমাদের এদেশে গ্রীষ্ম ও শীতের মধ্যে আর কোনো ঋতু নাই। মহাশয়ের এ দেশের আবহাওয়ায় কষ্ট হইতেছে না?

বীটন বললেন, তেমন কষ্ট কই? আপনাদের দেশে ঘন ঘন বৃষ্টি নামে। আমি বৃষ্টি বড় ভালোবাসি। বৃষ্টিপাত শুরু হইলেই গবাক্ষে দাঁড়াইয়া বাহিরে দেখি। এত তীব্র ধারাবর্ষণ ইংলণ্ডে নাই।

মদনমোহন বললেন, শুধু বৃষ্টি দেখার সুফল নাই। বৃষ্টির সময় নগ্ন গাত্রে বাহিরে দাঁড়াইবেন। তাহাতে ঘামাচি মরিবে!

বীটন হেসে উঠে বললেন, হাঁ, ঘামাচিতে কিছু কষ্ট পাইতেছি বটে, ঘামাচির এই প্রকার ঔষধের কথা তো আমার জানা ছিল না। মহাশয়কে ধন্যবাদ!

দক্ষিণারঞ্জন জিজ্ঞেস করলেন, যতদূর জানি, মহাশয় আগে সরকারী কর্ম করিতেন না। এখন এই পরিণত বয়েসে হঠাৎ সরকারী কর্ম লইলেন কেন?

বীটন বললেন, কারণ ভারতবর্ষে আসিবার আগ্রহ ছিল আমার।

দক্ষিণারঞ্জন বললেন, সেইরকমই অনুমান করিয়াছিলাম। এই আগ্রহের বিশেষ কোনো কারণ আছে কি?

তখন বীটন জানালেন যে, সতীদাহের এক মামলার ব্যাপারে তাঁর প্রথম ভারত সম্পর্কে আগ্রহ জাগবার কথা। তারপর থেকেই তিনি এ দেশ সম্পর্কে অনেক পড়াশুনো করেছেন। কথায় কথায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সতীদাহ প্রথা এ দেশ থেকে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে কি না।

রামগোপাল জানালেন যে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে, তা জোর দিয়ে বলা যায় না। দূর গ্রামাঞ্চলে এখনো এরকম কিছু কিছু ঘটতে পারে। এমন কি এই

শহরেও—। তারপর তিনি কিছুদিন আগে তাঁর বাড়ির সামনের সেই ঘটনাটি সবিস্তারে জানালেন। খুব সম্ভবত মেয়েটি সেদিন তার স্বামীর চিতায় পুড়ে মরতেই যাচ্ছিল। মেয়েটি এখনো রামগোপাল ঘোষের বাড়িতেই আছে। এখনও সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি, মাঝে মাঝেই আত্মঘাতিনী হবার চেষ্টা করে।

দক্ষিণারঞ্জন বললেন, ইহাই আশ্চর্যের কথা, অনেক বালিকা স্বেচ্ছায় মরিতে চায়। কেহ তাহাদের উপর জোর করে না।

মদনমোহন বললেন, জোর নিশ্চয়ই করে। জোর করে এই সমাজ। অসহায় বিধবা বালিকা কোন্ ভরসায়, কাহার ভরসায় বাঁচিবে?

রামগোপাল বললেন, অশিক্ষাই ইহার জন্য দায়ী। বালিকারা যদি কিছু শিক্ষা পাইত, তাহা হইলে নিজের জীবনের মর্ম বুঝিত। মহাশয়কে একটি প্রশ্ন করিতে পারি কি? আপনি সরকারের শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা, এ দেশে বালিকাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে না?

বীট্‌ন হেসে উঠে বললেন, বালিকাদের জন্য শিক্ষা? এ দেশের মানুষ তাহা চায় না। আপনি বারাসতের ঘটনা শ্রবণ করেন নাই?

রামগোপাল বললেন, ওরকম দু-একটি ঘটনাতেই পশ্চাদপদ হইলে চলিবে কেন? আপনার গৃহে আসিবার পূর্বেই আমি এ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম আপনার নিকট এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব। স্ত্রী শিক্ষার জন্য আমরা কিছু করিতে পারি না?

বীট্‌ন বললেন, এ দেশে আসিবার আগে হইতেই আমি স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে চিন্তা করিতেছি। বালিকা স্কুল খোলা আমারও উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এখন দেখিয়া শুনিয়া বুঝিতেছি, এ দেশে তাহা সম্ভব নহে।

মদনমোহন বললেন, মহাশয়, এত অল্প সময়েই নিরাশ হইলেন কী প্রকারে?

বীট্‌ন বললেন, বুঝাইয়া বলিতেছি। আমি সরকারের শিক্ষা বিভাগের প্রধান। কিন্তু আমি ইচ্ছা করিলেই যাহা খুশি করিতে পারি না। অর্থ বরাদ্দের জন্য আমাকেও অন্যদের অনুমতি লইতে হয়। আমি দেখিলাম যে স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার কোনো আগ্রহ সরকারের নাই। বোর্ড অব কণ্ট্রোলের প্রেসিডেণ্ট হবহাউস আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তখনও আমি জেদ ধরিয়াছিলাম, প্রয়োজন হইলে নিজ জেব হইতে অর্থ ব্যয় করিয়া স্কুল খুলিব। আমি দার পরিগ্রহ করি নাই, আমার নিজের সংসার নাই, যদি নারীজাতির সেবার জন্য কিছু করিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে আমার জীবন ধন্য হইবে। কিন্তু বারাসতের ঘটনায় বুঝিলাম, এ দেশের মানুষই স্ত্রী-শিক্ষা চায় না।

দক্ষিণারঞ্জন লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আপনি যদি রাজী থাকেন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। আমরা আপনাকে সর্বাঙ্গীণ সাহায্য করিব।

রামগোপাল দক্ষিণারঞ্জনের মতন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়েন না। তিনি ধীর স্বরে বললেন, আমরা এ ব্যাপারে আপনার মতন সমান আগ্রহী। অবশ্য আপনি ভাবিতে পারেন, আমরা নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া স্কুল খুলিতেছি না কেন? আমরা জানি, বহু লোক আমাদের প্রতিবন্ধকতা করিবে। বলপ্রয়োগেরও চেষ্টা করিতে পারে। বালিকাদের কোনো প্রকার বিপদে জড়াইবার ঝুঁকি নিতে আমরা পারি না। তবে এ দেশের মানুষ রাজশক্তিকে খুব ভয় পায়। সরকার সাহায্য করুক বা না করুক, আপনি ব্যক্তিগতভাবে যদি অগ্রণী হইয়া কোনো স্কুল খুলেন, তাহা হইলেও লোকে আপনাকে সরকারের প্রতিনিধি মনে করিয়া ডরাইবে। আপনার পশ্চাতে থাকিয়া আমরা আপনাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করিব।

মদনমোহন বললেন, স্কুল খুলিলে তাহাতে ছাত্রী সংগ্রহের ভার আমার উপর ছাড়িয়া দিতে পারেন। ভুবনমালা ও কুন্দমালা নামে আমার দুইটি কন্যাসন্তান আছে, তাহারাই প্রথম দুই ছাত্রী হইবে। আপনি কোনো সচ্চরিত্র বিবিকে শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করিবেন।

বীট্ন সবিস্ময়ে বললেন, আপনি ব্রাহ্মণ...আপনার কন্যারা বাড়ির বাহিরে আসিয়া পাঠশালায় যাইবে? সমাজে আপনি পতিত হইবেন না?

মদনমোহন বললেন, কেন পতিত হইব? ব্রাহ্মণ কন্যাদের বিদ্যার্জন তো নতুন কিছু না। চিরকালই করিতেছে। দুই চারিটি উল্লুক না হয় নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিবে, তা করুক।

বীট্ন জিজ্ঞেস করলেন, স্ত্রী-শিক্ষার চল আপনাদের মধ্যে আগেও ছিল বলিতেছেন? আমি কখনো শুনি নাই।

মদনমোহন বললেন, আপনাকে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। পুরাকালে নারীরা পুরুষের সমান শিক্ষিতা ছিল, কয়েকজন বেদের সূক্তও রচনা করিয়াছে। মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্যা আত্রেয়ী অগস্ত্য ঋষির আশ্রমে পাঠ গ্রহণ করিতে যাইতেন। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য গার্গী ও মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। বিদর্ভ রাজার কন্যা রুক্মিনী নিজে পত্র লিখিয়া কৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, এ কথা মহাভারতে আছে। উদয়নাচার্যের কন্যা লীলাবতী কতখানি জ্ঞানবতী ছিলেন দেখুন যে তিনি শঙ্করাচার্য ও মণ্ডন মিশ্রের তর্ক-বিচারে মধ্যস্থতা করিয়াছিলেন। কর্ণাটের রাজমহিষী এবং কবি কালিদাসের পত্নী ছিলেন পণ্ডিতা। বিশ্বদেবী নামে এক নারী গঙ্গাবাক্যাবলী নামে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। খনা নাম্নী এক নারী জ্যোতিষশাস্ত্র এমন উত্তম জানিতেন যে, এখনও লোকে খনার বচন মান্য করে। আর কত উদাহরণ দিব? এত প্রাচীনকালেই বা যাইবার প্রয়োজন কী? হটী বিদ্যালঙ্কার নামে এক প্রসিদ্ধা রমণী বারাণসীতে টোল খুলিয়া বসিয়া এক্ষণে রীতিমতন ছাত্রদের শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহার কথা কে না জানে?

বীট্ন বললেন, এ সব কথা আপনারা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতেছেন না কেন?

মদনমোহন বললেন, করিব, নিশ্চয়ই করিব। বালিকাদের শিক্ষার উপযুক্ত বহি আমি নিজে রচনা করিব।

দক্ষিণারঞ্জন বললেন, যদি শীঘ্র কার্য শুরু করিতে চান, তাহা হইলে বিদ্যালয়ের ভবন আমি নিজে দিতে প্রস্তুত আছি। মীর্জাপুরে আমার একটি বৈঠকখানা বাটী খালি রহিয়াছে, সেখানেই স্কুল বসিতে পারে।

বীট্ন বললেন, আজই চলুন না। শুভস্য শীঘ্রম্।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বীট্ন এবং দক্ষিণারঞ্জনের জুড়িগাড়ি ছুটে চললো মীর্জাপুর—বাহির সিমুলিয়ার দিকে।

দক্ষিণারঞ্জনের বৈঠকখানা বাটীটি সত্যিই দেখবার মতন। বড় বড় খিলান ও দালান সমন্বিত প্রাচীন ঠাটের একটি সুরম্য গৃহ, তার বাইরে চতুর্দিকে বাগান। বাগানে নানাবিধ ফলবান মূল্যবান বৃক্ষ। সেই উদ্যানটি আবার উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। একটি মাত্র প্রবেশদ্বার। বাগানটি আরও প্রশস্ত করবার মানসে দক্ষিণারঞ্জন সম্প্রতি পার্শ্ববর্তী সাড়ে পাঁচ বিঘা ভূমি নয় সহস্র টাকা মূল্যে ক্রয় করেছেন।

বাড়িটি দেখে সকলেরই পছন্দ হলো। সে রকম একটি বাড়ি ভাড়া দিলে কিছু না হোক মাসে একশত টাকা পাওয়া যায়, তবু দক্ষিণারঞ্জন শুধু ফেলে রেখেছিলেন। মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে এখানে অবসর যাপনের জন্য আসতেন, এখন এক কথায় বাড়ি ও সংলগ্ন জমি দান করে দিতে চাইলেন। মদনমোহন সন্তোষ প্রকাশ করে দক্ষিণারঞ্জনকে বললেন, দ্বারের কাছে যষ্টিধারী দুটি দ্বারবান বসিয়ে দিলেই আর কুমতলবীরা কেউ ভিতরে ঢুকতে পারবে না। আর ইস্কুল পরিচালনার জন্য আমার বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্রকে দলে টানতে চাই, ও-রকম একজন কড়া-ধাতুর মানুষ দরকার।

সিদ্ধান্ত হলো, এই প্রশস্ত সুন্দর ভবনটিতেই স্কুল বসবে। অনেক কথা ঠিক হয়ে গেল সেখানেই। প্রশ্ন উঠলো, স্কুলের নাম কী হবে? রামগোপাল বললেন, ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল বা কলিকাতা বালিকা বিদ্যালয়ই তো খুব সহজ ও সঙ্গত নাম।

বীট্ন বললেন, যদি ইংলণ্ডের রানীর নামে স্কুলের নাম রাখা যায়, তাহা হইলে হয়তো ভবিষ্যতে সরকারী সাহায্য মিলিতে পারে।

মদনমোহন বললেন, "বিকটরিয়া বালিকা বিদ্যালয়", ইহা তো অতি উত্তম নাম। স্ত্রী বিদ্যালয়ের সহিত এ জগতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালিনী রমণীর নাম যুক্ত রহিল।

বীট্ন বললেন, আমার ভগিনীর সহিত কুইন ভিকটোরিয়ার পরিচয় আছে। তাহাকে আমি লিখিতে পারি, বোধ করি সে রানীর সম্মতি আদায় করিতে সক্ষম হইবে।

নামের প্রশ্নটি তখনকার মতন অমীমাংসিত থাকলেও স্কুল খোলা বিষয়ে কোনো দ্বিমত রইলো না।

অল্পকালের মধ্যেই এক সোমবারে স্কুল শুরু হয়ে গেল। মদনমোহন তাঁর দুই কন্যাকে স্কুল ভবনের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দ্বারের পাশে। হাওয়ায় ফরফর করে উড়তে লাগলো তাঁর দীর্ঘ শিখাগুচ্ছ, মুখে অনাবিল হাসি। স্কুল ভবনের সামনের উদ্যানে দাঁড়িয়ে শ্রীমতী রিডসডেল নামে এক উচ্চশিক্ষিতা মেম সাদরে ডেকে নিতে লাগলেন বালিকাদের।

প্রথম দিন স্কুলে এলো একুশটি বালিকা। কিন্তু ক্রমশই ছাত্রী সংখ্যা কমতে লাগলো। বালিকাদের কোনো বেতন লাগে না, পুস্তক ও কাগজপত্রও দেওয়া হয় স্কুল থেকে। এমনকি যে সব বালিকার বাড়ি থেকে যাতায়াতের অসুবিধা আছে, স্কুল থেকে তাদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়। তবু কয়েক মাসের মধ্যেই ছাত্রী-সংখ্যা কমতে কমতে দাঁড়ালো সাতে।

ইতিমধ্যে শহরের কিছু মানুষ ও কয়েকটি পত্র-পত্রিকা এই উদ্যমকে স্বাগত জানালেও বহু লোক আর বহু পত্রিকা নিন্দা-মন্দ ও কুৎসা রটনায় উঠে পড়ে লাগলো। এই বিদ্যালয়ে যায় নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য বালিকারা, তবু তাদের নিয়েই আদিরসের রসিকতা চললো অঢেল। এক পত্রিকার বৃদ্ধ সম্পাদক লিখলেন, বাঘ ও ছাগলের মধ্যে যেমন শুধু খাদ্য ও খাদকের সম্বন্ধ, পুরুষ ও নারীর মধ্যেও তাই।

বীট্ন, দক্ষিণারঞ্জন প্রমুখ কিন্তু এতেও দমলেন না। স্কুল তাঁরা চালাবেনই। সাতজন ছাত্রী, তার জন্য মাসে প্রায় আটশো টাকা খরচ। বীট্ন মনে মনে কল্পনা

করে রেখেছেন একদিন এই স্কুল বিশাল হবে, শত শত বালিকা এখানে পড়তে আসবে, তখন আরও বড় ভবনের প্রয়োজন হবে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি ইতিমধ্যে কাছাকাছি আরও অনেক জমি কিনে ফেলেছেন। কিন্তু ছাত্রীসংখ্যা প্রতিনিয়ত কমতে থাকায় তাঁর কল্পনা বুঝি ধূলিসাৎ হয়ে যায়। শুভার্থীরা বললেন, অপ-প্রচারের ফলাফল যাই হোক, ছাত্রীসংখ্যা হ্রাসের আর একটি কারণ আছে, মীর্জাপুর হলো শহরের এক প্রান্তে, অত দূরে অভিভাবকরা তাঁদের কন্যাদের পাঠাতে ভয় পান। স্কুলটি হওয়া উচিত শহরের মধ্যস্থলে।

বীটন এ পরামর্শের যুক্তি স্বীকার করে বললেন যে, তবে তাই হোক, শহরের কেন্দ্রেই গড়ে উঠবে নতুন বিদ্যালয় গৃহ। হেদুয়ার পশ্চিম পার্শ্বে অনেকখানি জমি খালি পড়ে আছে, বর্তমানে তা আগাছায় পূর্ণ। কিন্তু সে জমির মালিক সরকার। বীটন সরকারের কাছে প্রস্তাব দিলেন যে মীর্জাপুরের সমুদয় জমি ও অট্টালিকাটির বিনিময়ে সরকার তাঁদের ঐ হেদুয়ার জমি হস্তান্তর করুন। সরকার এতে আপত্তি করলেন না। বীটন নিজে যেন সরকারের লোক নন, তিনি এক্ষেত্রে দেশীয় সমাজের প্রতিনিধি।

বৎসর দেড়েকের মধ্যেই একদিন তিনি মহা সমারোহে নতুন বিদ্যালয় ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করালেন। ফ্রি মেশনরা এলো সমারোহ করে। ডেপুটি গভর্নরের পত্নী লেডি লিটলারের হস্ত দিয়ে রোপণ করানো হলো একটি অশোক বৃক্ষের চারা। বীটন তাঁর ভাষণে বললেন যে, এই বৃক্ষ হোক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির মিলনের প্রতীক। আমি শুনেছি, বাংলায় অশোক কথাটির অর্থ আনন্দ-বনস্পতি। এই বৃক্ষটি শুধু দেখতে সুন্দর নয়, এর সঙ্গে অনেক শুভ ইচ্ছা মিশ্রিত হয়ে আছে। আমি এ কথাও শুনেছি যে প্রাচীন কালে ভারতীয় রমণীরা এই বৃক্ষের কোমল কোরক চিবিয়ে খেতেন তাঁদের সন্তানদের কল্যাণ কামনায়। আরও সুখের কথা এই যে, ইওরোপীয় প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা এই অশোক বৃক্ষের নাম রেখেছেন জোনেসিয়া অশোকা, এই নামের মধ্য দিয়ে তাঁরা স্যার উইলিয়াম জোনসের স্মৃতিকে অমর করেছেন। সেই মহাত্মা উইলিয়াম জোনস এ দেশে তাঁর জীবন ব্যয় করেছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতের জ্ঞানের সম্মিলনের জন্য। এই বৃক্ষকে কেন্দ্র করে দূর-দূরান্তে সেই জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ুক।

নতুন ভবন নির্মাণ করতে ব্যয় হবে প্রায় চুরাশি হাজার টাকা, এর মধ্যে পূর্বের বাড়ি ও জমি ছাড়াও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় দান করলেন আরও কয়েক হাজার টাকা। উত্তরপাড়ার বিদ্যোৎসাহী রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এগিয়ে এলেন সাহায্যের জন্য, বর্ধমানের মহারাজা এক সহস্র মুদ্রা দিয়ে নিয়মরক্ষা করলেন। একা বীটনই নিজের সঞ্চয় থেকে ব্যয় করলেন চল্লিশ সহস্র মুদ্রার বেশী। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য, ভবনটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমাপ্ত করা। তিনি স্বয়ং এসে প্রায়ই দেখে যান, কাজ কতখানি অগ্রসর হলো। আবার অল্পসংখ্যক ছাত্রী নিয়ে মীর্জাপুরে যে স্কুলটি টিমটিম করে চলছে, সেখানেও তিনি নিয়মিত যান তাদের উৎসাহ দিতে।

একদিন তিনি মীর্জাপুরের বিদ্যালয়ে এলেন ঈষৎ বিষণ্ণ বদনে। তিনি নেটিভদের ব্যাপারে এতখানি উৎসাহী হয়ে পড়েছেন, সর্বক্ষণ নেটিভদের সঙ্গে মেলামেশা করেন বলে তাঁর সহযোগী কোনো কোনো রাজপুরুষ তাঁকে বিদ্রূপ করতে শুরু করেছেন। শুধু এই একটি স্কুল স্থাপন করেই ক্ষান্ত হননি বীটন। তিনি আরও স্কুল খুলতে উদ্যোগী হয়েছেন। বাংলাভাষার উন্নতির জন্যও তিনি চিন্তা করছেন অনেকখানি। মাতৃভাষার মাধ্যম ছাড়া সুচারুভাবে শিক্ষা হতে

পারে না। অথচ বাংলাভাষায় উত্তম গ্রন্থ নেই, সেজন্য তিনি স্থাপন করেছেন বঙ্গ-ভাষানুবাদক সমাজ। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ইংরেজি থেকে বই অনুবাদ করবেন বাংলা-ভাষায়। যার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়, তাকেই তিনি বলেন, বাংলায় বই লিখুন, বাংলাভাষাকে উন্নত করুন। নারীগণের শিক্ষার জন্য আপনারাও কিছু করুন। বাংলা সাহিত্যের পরীক্ষায় সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রের জন্য তিনি একটি সোনার মেডেলও ঘোষণা করেছেন।

স্কুলের জন্য মহারানী ভিকটোরিয়ার নামটি পাওয়া যায়নি। শুধু বিদ্রূপ নয়, সেদিন তাঁর প্রতিযোগী এক রাজপুরুষ তাঁকে ভর্ৎসনাও করেছেন খানিকটা। এ দেশের সরকারকে কিছু না জানিয়ে তিনি সরাসরি ভিকটোরিয়ার এক পার্শ্ব-চরীর মারফত মহারানীকে এই স্কুলের কথা যে জানাবার চেষ্টা করেছিলেন, তা সঙ্গত হয়নি। সুতরাং স্কুলের নাম ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলই থাকবে। ক্ষুব্ধ হয়ে বীট্‌ন এই স্কুল ও অন্যান্য মফঃস্বল স্কুলের সব বৃত্তান্ত জানিয়ে বড়লাট লর্ড ডালহৌসির কাছে এক দীর্ঘ পত্র পাঠিয়েছেন। তবু তাঁর মনের বিষণ্নতা কাটেনি।

স্কুলের উদ্যানে তিনি দেখলেন একটি বালিকা বাড়ি যাবার নাম করে কাঁদছে। বীট্‌ন কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাঁদিতেছ কেন, মা?

বালিকাটি তাঁর কথা বুঝতে পারলো না, কিন্তু চুপ করে গেল। বীট্‌নের সৌম্য মুখমণ্ডল দেখে তাঁকে ছাত্রীরা কেউ ভয় পায় না। তিনি মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে মিঠাই বিতরণ করেন। বালিকারা কাড়াকাড়ি করে খায়।

বীট্‌ন কাছে এসে বালিকাটির চিবুক স্পর্শ করে বললেন, মা, তুমি রানী হইবে?

মেয়েটি তখনো বুঝলো না। প্যান্ট-কোটধারী বীট্‌ন অমনি ধুলোর মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়ে বললেন, এই দ্যাখো আমি ঘোড়া হইয়াছি। তুমি আমার পৃষ্ঠে চড়িয়া রানীর মতন আমাকে হাঁকাও।

স্নেহের একটা বিশ্বজনীন ভাষা আছে, যা সব শিশুরাই বোঝে। মেয়েটি ফিক করে হেসে ফেলে বীট্‌নের পিঠে চড়ে বসে বললো, বেথুন ঘোড়া, হ্যাট হ্যাট।

দুই কন্যাকে নিয়ে যাবার জন্য এসেছিলেন মদনমোহন। দ্বারের কাছ থেকে এই দৃশ্য দেখে তাঁর চোখে জল এসে গেল। একটু পরে বীট্‌ন খেলা সমাপ্ত করার পর তিনি বললেন, মহাশয়, আপনার তুলনায় আমরা অতি নগণ্য মানুষ!

বীট্‌ন লজ্জা পেয়ে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি ছাত্রী সংগ্রহ করিবেন বলিয়াছিলেন, সে কাজ যথেষ্ট করিতেছেন কই? আমার আরও ছাত্রী চাই।

হেদুয়ায় স্কুল ভবনটি প্রায় সমাপ্ত হয়ে এসেছে, আর এক মাসের মধ্যেই এর দ্বারোদঘাটন করা যাবে। বীট্‌ন ভেতরে ভেতরে যেন উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠছেন। সেই শুভ দিনটিতে তিনি কী প্রকার বিশাল উৎসবের আয়োজন করবেন, মনে মনে সেই পরিকল্পনার অন্ত নেই।

ইতিমধ্যে তিনি একদিন গেলেন জনাইতে একটি স্কুল পরিদর্শন করতে। ফেরার পথে সাংঘাতিক বৃষ্টি শুরু হলো। সে বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চলাই দুষ্কর। কিন্তু বীট্‌নের মন পড়ে আছে কলকাতায়, তিনি বৃষ্টিতে ভিজে, সেই জলকাদা ভেঙেই ফিরলেন।

এবং ফিরেই জ্বরে পড়লেন। তিনদিনের মধ্যেই বোঝা গেল তাঁর এই রোগ কালব্যাধি।

পুরো একদিন অচেতন থাকার পর জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ মেলে তিনি

দেখলেন, তাঁর শিয়রের কাছে দেশী ও ইওরোপীয় শুভানুধ্যায়ীরা সার বেঁধে দণ্ডায়মান রয়েছেন। বীটন প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, স্কুল ভবনে রঙের কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে তো?

কয়েকজনের চক্ষে জল এসে গেল। একজন অতিকষ্টে বললেন, রঙ অতি মনোহর হইয়াছে। মহাশয়, আপনি সারিয়া উঠিয়া সব স্বচক্ষে দেখিবেন।

বীটন একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর শান্ত স্বরে তাঁর ভারতীয় বন্ধুদের উদ্দেশে বললেন, আমরা ইংরেজরা মৃত্যুকে ভয় পাই না। আপনাদের মতন আমাদের পরলোকেও বিশ্বাস নাই। জানি, শেষ নিশ্বাসের সাথে সাথেই সব কিছুর শেষ। শুধু দুই একটি বাসনা অপূর্ণ রহিয়া গেল এই যা দুঃখ। আপনাদের নিকট অনুরোধ, দেখিবেন, আমার অবর্তমানে যেন স্কুলটি না মরে।

তারপর তিনি একজন আইনজীবীকে মুখে মুখে তাঁর উইল বলে গেলেন। তাঁর যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সবই তিনি রেখে গেলেন স্কুলটির জন্য। যে জুড়িগাড়িটিতে তিনি নিজে চড়তেন, সেটি প্রত্যহ দাঁড়িয়ে থাকবে বিদ্যালয়ের সামনে। বালিকারা এটিতে করে যাতায়াত করবে।

বীটনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই হেদুয়ার পার্শ্বে নবনির্মিত বালিকা বিদ্যালয়টির নামকরণের সমস্যা আর রইলো না। 'বেথুন সাহেবের স্কুল' সকলের মুখে মুখে রটে গেল এই নাম।



কথায় বলে "রাতের রোশনাই, দিনের ছাইগাদা।" দিনের বেলার দৃশ্য দেখে সত্যিই কিছু বোঝার উপায় নেই। এই সব বাড়ি অনেক বেলা পর্যন্ত নিদ্রিত থাকে, গবাক্ষগুলি সব বন্ধ। গোয়ালা গরু নিয়ে দুধ দুইতে এসে হল্লা লাগায়, সহজে দাস-দাসীরাও দুধের পাত্র নিয়ে আসে না। এখানে দাস-দাসীদের মর্জিও অন্যরকম। হীরেমণির গৃহে প্রাতে দশ ঘটিকা পর্যন্ত শুধু এক বালকের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পাঠাভ্যাস করে। সে বালক হীরেমণির পুত্র চন্দ্রনাথ।

রাতে এ গৃহের দ্বিতলের বড় প্রকোষ্ঠে ঝাড়লণ্ঠন জ্বলে, সেখান থেকে ভেসে আসে হারমোনিয়াম, ডুগি-তবলার আওয়াজ ও নূপুর নিক্কন। দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে জমকালো ধরনের জুড়িগাড়ি। সঙ্গীত লহরী ছাপিয়েও এক এক সময় মদ্যপায়ীদের স্খলিত কণ্ঠ রাত্রির মসৃণতাকে বিদীর্ণ করে। দিনের বেলায় সব শান্ত, অন্যান্য বাড়িগুলির তুলনায় হীরেমণিদের মতন বারাঙ্গনাদের গৃহ যেন বেশী স্তব্ধ।

হীরেমণির এখন অবস্থা ফিরেছে, শহরের বাবু মহলে তার খুব নামডাক, টাকা-পয়সাও আসছে যথেষ্ট। এখন এ শহরে বারাঙ্গনাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নামডাক কমলাসুন্দরী আর হীরেমণির। এরা শুধু তো দেহপশারিণীই নয়, কমলা-সুন্দরী নৃত্যকলা পটিয়সী আর হীরেমণির কণ্ঠের গান যে একবার শুনেছে, সে আর ভুলতে পারে না। হীরেমণির আসল নাম ভুলে গিয়ে লোকে তাকে এখন

বুলবুল বলে ডাকে। বুনিয়াদী পরিবারের দোল-দুর্গোৎসবের মজলিশে যখন সাহেব মেমদেরও নেমন্তন্ন হয়, তখন সেখানে কমলাসুন্দরী হীরেমণিদেরও ডাক পড়ে। সাধারণ ছা-পোষা লোকেরা ভাবে হীরেমণির মতন তয়ফাওয়ালি রেণ্ডিরা বুঝি বাড়িতে হীরে মুক্তো চিবিয়ে খায় আর সোনার বিছানায় শুয়ে রুপোর পাশ-বালিশ জড়ায়। এরা কেউ কোনোদিন দ্বিপ্রহরে গৃহে এলে বিস্ময়ে বাক্‌রহিত হয়ে যেত। কুচোচিংড়ি দিয়ে পুঁইশাকের ডাঁটাচচ্চড়ি হীরেমণির অতি প্রিয় খাদ্য। এক বাটি খেসারির ডাল সে চুমুক দিয়ে খায়। মাংস দেখলে সে নাক সিঁটকোয়, এমনকি বড় জাতের মাছও তার না-পছন্দ, ঐসব মাছে নাকি কাদা কাদা গন্ধ। সে ভালোবাসে পুঁটি, মৌরলা, চাঁদা। দ্বিপ্রহরে সাধারণ কস্তা পাড়ের ডুরে শাড়ি পরে সে যখন রান্নাঘরের সামনের বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে পুঁইডাঁটা চিবোয়, তখন তাকে কোনো সাধারণ বাড়ির বউ-ঝি ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। অবশ্য এই সব খেয়েও হীরেমণির রূপ এখনো যেন ফেটে পড়ছে।

সকাল দশটার সময় ঘুম ভাঙার পরেই রাইমোহনের ওপর একটা কাজ বর্তেছে। অবস্থা ফেরার পর হীরেমণির এখন দাসদাসীর অভাব নেই, তবু কোনো প্রয়োজন হলেই সে রাইমোহনের ওপরেই হুকুম চালায়। আজ সকালে হীরেমণি কুয়োতলায় স্নান করতে গিয়েই দেখে যে জল তোলার দড়ি ছেঁড়া, কলসীটিও উধাও। ছিঁচকে চোরেরা প্রায়ই কুয়োতলার কলসী চুরি করে পালায়, সেইজন্য ব্যবহার করার পরই কলসী ভেতরে তুলে রাখতে হয়। কাল সন্ধ্যায় হয়তো কোনো অমনোযোগী দাসী ভুল করে কলসী ফেলে রেখে গিয়েছিল।

হীরেমণি গতকাল মুজরো গাইতে গিয়েছিল শোভাবাজারে, ফিরেছে শেষ রাতে। ঘুম থেকে উঠেই স্নান করা তার অভ্যাস। কলসী নেই আর দড়ি ছেঁড়া দেখেই তার মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল। দাস-দাসীদের সকলকে ডেকে হীরেমণি তার কুৎসিত গালিগালাজের ভাণ্ডার একেবারে উজাড় করে দিল। অবশ্য দাস-দাসীরাও এমন বে-আক্কেলে, কেউ দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে চায় না, দোষারোপ করতে লাগলো পরস্পরের ওপর। তারা বলতে চায় যে কলসী চুরি যায়নি। দড়ি ছিঁড়ে কুয়োর মধ্যে পড়ে গেছে।

তখন হীরেমণির জেদ চাপলো, কুয়ো থেকে সেই কলসী তোলাতে হবে, নইলে সে কিছুতেই বিশ্বাস করবে না যে চুরি যায়নি। একটার জায়গায় দশটা কলসী তখনই হীরেমণি কিনতে পারে, কিন্তু জেদ হচ্ছে জেদ।

হীরেমণি চেঁচিয়ে বললো, সেই হতচ্ছাড়া বে-আক্কেলে মিনসেটা কী করচে? এখনো পড়ে পড়ে নাক ডাকচে! ওফ্‌, ভগমান আমার কপালে কত দুঃখই দিয়েচেন! আমায় দেকবার কেউ নেই গা!

হরচন্দ্র বলে যে মাতালটিকে রাইমোহন আশ্রয় দিয়েছিল, সে আজও রয়ে গেছে। এছাড়া আরও দু'জন বৃদ্ধ এখানে আশ্রিত। ভাগ্যহীন বাউণ্ডুলেদের সম্পর্কে রাইমোহনের বেশ দুর্বলতা আছে, সে রকম কারুকে চোখে দেখলে সে ডেকে আনে এ বাড়িতে। হীরেমণি অবশ্য এদের দু' চক্ষে সহ্য করতে পারে না, তবু তার মুখচোপা সহ্য করে টিঁকে আছে এই তিনজন।

হীরেমণির চ্যাঁচামেচিতে তাদেরও ঘুম ভেঙে গেছে। উঠোনে কুয়োতলায় গামছা পরে দাঁড়িয়ে সে সমানে চালাচ্ছে হাত, পা, মুখ। গামছায় তার সোনার অঙ্গ ঢাকা পড়েছে খুবই সামান্য। আরও বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে লাফালাফি করলে হঠাৎ তার বিবস্ত্রা হয়ে পড়ারও সম্ভাবনা আছে। হীরেমণির সেদিকে হুঁশ নেই। অমন রূপসী একটি নারী এবং গানের জন্য যে কোকিলকণ্ঠী নামে পরিচিতা,

তার কণ্ঠ থেকেও যে এত কদর্য কুবাক্যের স্রোত বেরিয়ে আসতে পারে, তা কল্পনা করাই শক্ত।

হরচন্দ্র ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো, অ দিদি, আমি দৌড়ে গে একটা কলসী নিয়ে আসবো?

হীরেমণি তার দিকে ফিরে ক্রোধ ঘূর্ণিত নয়নে বললো, দিদি? আমি তোর কোন্ সাতজন্মের দিদি রে, অলপ্পেয়ে? দুনিয়ার কোথাও ঠাঁই নেই। তাই এখেনে মাটি কামড়ে পড়ে আচিস, আবার দিদি বলে সোহাগ! গা জ্বলে যায়!

হরচন্দ্র বললো, চান না করলে যে গা আরও বেশী জ্বলবে! কলসী এনে দি?

হীরেমণি বললো, চুপ্ মার! কেন, সে কোতায়? সেই খাল ভরা, ড্যাকরা, খগরাজের মতন চ্যায়রা হতভাগাটা পড়ে পড়ে ঘুমুবে? তাকে দিয়ে এক তিল উবগার হয় না, তাকে কেউ ডাকতে পাচ্চিসনি?

রাইমোহনের ঘুম গাঢ়, তাছাড়া নেশার ঘুম, সহজে ভাঙে না। একজন ভৃত্য গিয়ে তাকে ঠেলাঠেলি করতে লাগলো।

চক্ষু রগড়াতে রগড়াতে নেমে এসে রাইমোহন বললো, কী হলো? আজ আবার কী বৃত্তান্ত?

হীরেমণি বললো, আমার সব্বোনাশ হলেও তো তুমি চোখ বুজে থাকবে। আদুড় গায়ে সেই কখন থেকে ডাঁড়িয়ে আচি, কেউ একবার ভাবে না আমার কতা!

রাইমোহন অন্যদের কাছ থেকে ঘটনাটি জেনে নিয়ে হীরেমণিকে বললো, এই জন্যই তো তোমায় পই পই করে বলচি, কলসী আর রেকোনি। পেতল কাঁসার জিনিস, তাই চোর ছ্যাঁচোড়ে নিয়ে যায়। আজকাল বালটি বলে একরকম জিনিস বেরিয়েচে, বেশ মজবুত, লোহার তৈরি, তা কেউ নেবে না।

হীরেমণি প্রায় আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো, আমি নোয়ার জিনিসের জলে চ্চান করবো? ওরে আমার পেয়ারের নাঙ রে! অতি বড় শত্তুর ছাড়া কেউ এমন ধারা কতা বলে! আমার যদি কেউ হিতকারী হতো তাহলে আমার চ্চানের জন্যে সোনার কলসী থেকে গোলাপ জল ঢেলে দিত! বলে কিনা নোয়ার জিনিসে জল তুলবে! সেই জলে চ্চান করে আমার গতরটা পচে যাক, তাতেই তোমাদের সুক হবে! ওঃ এত বড় শত্তুরকে ঘরে রেকিচি!

রাইমোহন এক গাল হেসে বললো, আমার তো শত্রু রূপেই ভজনা, তা তুমি জানো না? তুমি যতই আমায় গালি-গালাজ দাও, ততই আমার কানে সুধা বর্ষণ হয়!

এতে হীরেমণি আরও বেশী ক্রুদ্ধ হয়ে আরও তপ্ত বাক্যস্রোত বইয়ে দিতে লাগলো। রাইমোহন অনবরত কৌতুক চালিয়ে গেল তার সঙ্গে। তারপর সত্যিই একবার হীরেমণির অঙ্গ থেকে গামছা খসে যেতেই রাইমোহন দাস-দাসী ও আশ্রিতদের তাড়া দিয়ে বললো, যা, যা, এখেনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে কী দেকচিস? যা না, মসজিদের পাশের তালাও থেকে জল তুলে নিয়ে আয়!

কিন্তু হীরেমণি তাতেও শান্ত হবার পাত্রী নয়। সে পুকুরের জলে স্নান করবে না, এমনকি অন্য কোনো পাত্রে তোলা জল হলেও চলবে না। আগে তার হারানো কলসীর ব্যাপারটির মীমাংসা করা দরকার। এবং তা রাইমোহনকেই করতে হবে।

সেইজন্য রাইমোহন বউবাজারের মোড়ে গিয়ে দাঁড়ালো কুয়োর-জিনিস-তোলাবে-গো'র খোঁজে। কিন্তু যখন যে জিনিসটি খুব বেশী প্রয়োজন, তখনই সেটি পাওয়া দুর্ঘট হয়ে ওঠে। যখন প্রয়োজন কোনো পরামাণিকের, তখন দেখা

যায় গণ্ডায় গণ্ডায় মুচি। যখন চাই মুড়িওলীকে, তখন চোখের সামনে দিয়ে অনবরত যাবে দইওয়ালা। কুয়োর-জিনিস-তোলাবে-গো'রা অন্যদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে চেঁচিয়ে কান ঝালাপালা করে, আর এখন এই সঙ্কটের সময় তাদের পাত্তা নেই। এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর রাইমোহন আরও শঙ্কিত হয়ে উঠলো, এতক্ষণে বাড়িতে কী কাণ্ড ঘটছে কে জানে! হীরেমণির অঙ্গ থেকে হয়তো আরও কয়েকবার গামছা খসে গেছে। রাত্তিরবেলা বড় বড় রইস বাবুরা হীরেমণির রূপসুধা সন্দর্শনের জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করেন, সে হীরেমণিই দিনের বেলা যেন কারুকে মানুষ বলেই গ্রাহ্য করে না।

রাইমোহন একটি নতুন কলসী ও এক গাছি মোটা দড়ি কিনে বাড়ি ফিরলো। হীরেমণি তখন প্রায়োপবেশনের ভঙ্গিতে কুয়োর পাশের পাথরের পৈঠায় বসে আছে গালে হাত দিয়ে। নতুন কলসী দেখে সে আবার রাগে জ্বলে উঠতে যাচ্ছিল, তার আগেই রাইমোহন হাত তুলে বললো, রসো, রসো! সে মুখপোড়াদের একটারও দেকা পেলুমনিকো, তাই আমি নিজেই নাবচি। আমি নিজে এই কুয়োর মধ্যে ডুববো। তোমার জন্য আমি কী না পারি!

তারপর সে কুয়োর ধাপের ওপরে উঠে বসে বললো, এক পাড়াগেঁয়ে বাঙালের মুখে একবার একটি গান শুনিচিলুম, বড় সরেস কথাগুলিন। তার দুটো একটা পংক্তি মনে আচে, 'কোথায় পাইমু কলসী কইন্যে, কোথায় পাইমু দড়ি, তুমি হইও গহীন গাঙ, আমি ডুইব্যে মরি!' আমি ভেবেচিলুম, আমিও তোর ঐ চোখের গহীন গাঙে ডুবে মরবো, কিন্তু তা তো আর হতে দিলিনি, তাই দড়ি কলসী কিনে আনতে হলো।

হীরেমণি বললো, আর রঙ্গ কত্তে হবে না তোমায়। অত যদি মরার ইচ্ছে তবে অ্যাতোদিন মরোনি কেন, কে তোমায় বারণ করেছেল?

রাইমোহন বললো, মরিচি তো! তবে একবার মরলে সুখ হয় না, বারবার মর্তে ইচ্ছে করে!

কুয়োর ওপরের লোহার দণ্ডটির সঙ্গে দড়িটিকে মজবুত করে বেঁধে তার অন্য প্রান্ত নিজের কোমরে জড়িয়ে রাইমোহন বললো, এই আমি ঝুললুম!

তারপর কুয়োর মধ্যে এক পা গলিয়ে আবার সে বললো, যদি না ফিরি, তবে পরজন্মে দেকা হবে।

অমনি সব কিছু বদলে গেল। হীরেমণি ছুটে এসে হাউ মাউ করে কেঁদে বললো, ওগো, না, যেওনি, যেওনি! আমার ঘাট হয়েচে!

রাইমোহন বিয়োগান্ত নাট্যের শেষ দৃশ্যের নায়কের ভঙ্গিতে বললো, বুলবুল, তুই চাইলে আমি গোখরো সাপের মাথার মণিও আনতে যেতে পারি, এ তো সামান্য একটা কল্‌সী!

হীরেমণি বললো, না, না, আমার কলসী চাই না, আমার কিচু চাই না, তুমি চলে গেলে আমায় চিল শকুনে ছিঁড়ে খাবে!

রাইমোহন আরও এক ধাপ নেমে বললো, বন্দুকধারী দ্বারোয়ান রেকো, চিল শকুন আলসের ধার ঘেঁষতে সাহস পাবে না!

দাস-দাসী, আশ্রিতরা বারান্দায় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্য থেকে হরচন্দ্র উৎসাহ দিয়ে বলে উঠলো, নেমে পড়ো, দাদা! ডু অর ডাই!

হীরেমণি রাইমোহনের চুল খামচে ধরে বললো, এই আমি এখেনে কপাল কুটবো! তুমি মরে গেলে আমিও মরবো, আর একটি দিনও বাঁচবো না।

আরও কিছুক্ষণ এইরূপ মস্করা চলার পর রাইমোহন উঠে আসে। বলাই

বাহুল্য কুয়োর মধ্যে নেমে প্রাণ হারাবার ঝুঁকি নেবার বিন্দুমাত্র বাসনা তার ছিল না, সে হীরেমণিকে অতি উত্তমভাবেই চেনে। এরপর হীরেমণি খানিকক্ষণ কাঁদে এবং রাইমোহন নিজে জল তুলে হীরেমণির মাথায় ঢেলে স্নান করায়। খানিকবাদে শুদ্ধ বস্ত্র পরে, এস্রাজ বাজিয়ে হীরেমণি যখন রেওয়াজ করতে বসে, তখন আবার তাকে মনে হয় সম্পূর্ণ অন্য মানুষ।

এটি একদিনের ঘটনা। তবে প্রতিদিনই এ গৃহে এরকম কিছু না কিছু হয়ই। দিনের বেলা রাইমোহনের রঙ্গে হীরেমণির সম্পর্ক পুরোনো দাম্পত্যের মতন মধুর। রাইমোহনের ওপর হীরেমণি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। আর হীরেমণির সংসারই এখন রাইমোহনের সংসার। শহরের দু-চারজন বড় মানুষের গৃহে এখনো যাতায়াত থাকলেও মোসাহেবী পেশা রাইমোহন পরিত্যাগ করেছে, সারাদিন সে হীরেমণির সঙ্গে নানারকম ফষ্টি করে, আর রাতেরবেলা বাবুরা এলে সে অদৃশ্য হয়ে থাকে। হীরেমণি কোথাও মুজরো গাইতে গেলে রাইমোহন নিজে পোঁছে দিয়ে আসে তাকে।

গায়িকা হিসেবে প্রতিষ্ঠাপন্ন হবার পর থেকে হীরেমণিরও খানিকটা পরিবর্তন এসেছে। নিছক দেহলোলুপ ধনীদের সে আর নিজ গৃহে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে চায় না। নিতান্ত দু-চারজন পুরোনো বাবুদের সে এখনও ফেরাতে পারে না শুধু। তাদের মধ্যেও যারা বেশী বাড়াবাড়ি করে, হীরেমণির শরীর-মনের ওপর অত্যাচার করার ব্যাপারে যাদের কোনো মায়া দয়া নেই, তাদের তাড়াবার মোক্ষম কৌশল বার করে দিয়েছে রাইমোহন। সেই সব ধনীদের গুপ্ত পাপ কাহিনী নিয়ে গান বাঁধে রাইমোহন, হীরেমণিকে সেগুলো শিখিয়ে দেয়।

রাইমোহন বলে, দ্যাখ না হীরে, শিগগির এমন দিন আসবে, যখন তোকে আর গাইতেও হবে না। শুধু শহরময় রটিয়ে দেবো যে তুই অমুক অমুক বড় মানুষ সম্পর্কে গান শোনাবি! অমনি দেকবি তারা ছুটে এসে সেই গান বন্ধ করার জন্য তোর পায়ে টাকা ঢেলে দেবে। বাগাড়ম্বর মিত্তির, গাধাকান্ত দেব, একে একে সব্বাইকে ধচ্চি!

হীরেমণির পুত্র চন্দ্রনাথ এখন বেশ ডাগরটি হয়েছে। তার বয়েস এখন চতুর্দশ বৎসর, পিতৃপরিচয়হীন এই কিশোরটির মুখশ্রীর মতন ব্যবহারও অতি মধুর। এই বয়েসেই সে অতি কম কথা বলে, যেটুকু বলে, তাও অতি নম্রভাবে। সে একা একা ক্রীড়া করে, একা একা পড়ে। বাড়িতে এত রকমের গোলমাল, সে ভ্রূক্ষেপও করে না। অতি শৈশবে তাকে দুধের সঙ্গে ঈষৎ আফিং-এর জল মিশিয়ে খাওয়ানো হতো বলে সে সন্ধ্যা থেকে নিদ্রা যেত। রাইমোহন সে কথা জানতে পেরে এখন তা বন্ধ করে দিয়েছে। কিশোরটি অতিশয় বুদ্ধিমান, মায়ের পেশার কথা সে জানতে পারবেই, বা ইতিমধ্যেই বুঝে গেছে হয়তো, সুতরাং কৃত্রিমভাবে তাকে ঘুম পাড়াবার কোনো প্রয়োজন নেই। বুঝুক বা না বুঝুক, চন্দ্রনাথ এ বাড়ির রাতের অতিথিদের সম্পর্কে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করে না। হীরেমণির মনে হয়, তার পুত্রের বুঝি স্নেহ ভালোবাসা ইত্যাদি প্রবৃত্তিগুলিই কম। হীরেমণি যতটা ভালোবাসে তার সন্তানকে, সে তুলনায় চন্দ্রনাথের যেন মায়ের প্রতি তেমন টান নেই, এমনকি সে মায়ের কাছে কোনো আবদার পর্যন্ত করে না।

লেখাপড়ায় তার অসম্ভব আগ্রহ। রাইমোহন নিজে তাকে বাংলা পড়িয়েছে। হরচন্দ্র নামের মাতালটি ইংরেজি জানে বেশ, তার কাছেও ইংরেজি শিক্ষা করেছে

চন্দ্রনাথ, এখন হরচন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছে যে তার যতখানি বিদ্যে ছিল, তা চন্দ্রনাথের শিখতে বাকি নেই আর, এখন তার উন্নততর শিক্ষক আবশ্যক। কিন্তু চন্দ্রনাথকে কোনো ইস্কুলে ভর্তি করার উপায় নেই। যে-কোনো বিদ্যালয়ে পড়তে গেলেই ছাত্রের পিতৃপরিচয় জানাবার প্রয়োজন হয়। রাইমোহন বারংবার বলেছে যে চন্দ্রনাথকে সে নিজের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতে চায়। বারাঙ্গনার গৃহের আবাসিক হলেও তার শরীরে এখনো খাঁটি ব্রাহ্মণের রক্ত বইছে। তার পদবী ঘোষাল, সমাজে এই পদবীর যথেষ্ট কদর আছে। এই ব্যাপারে হীরেমণি বিষম জেদী, সে কিছুতেই রাইমোহনের কথা শোনে না, সে এখনো বলে, ঈশ্বর তাকে এই পুত্রটি দান করেছেন, ঈশ্বরই তার পিতা।

হায়, সব মানুষই ঈশ্বরের সন্তান, তবু বিশেষ কোনো একজন মানুষকে শুধু ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে পরিচয় দিলে, সমাজ তা কিছুতেই মানবে না, উপহাস, ধিক্কার দেবে।

ফিরিঙ্গিদের পাঠশালায় অবশ্য ভর্তি করে দেওয়া যায়। ফিরিঙ্গিরা অতশত মানে না। কিন্তু সেখানে পাঠাতেও হীরেমণির নিতান্ত আপত্তি। ইদানীং শহরে যেন জুজুর ভয় রটেছে। ওলাউঠার হেঙ্গামার চেয়েও খৃষ্টানী হেঙ্গামা অতি প্রবল। একটু আধটু লেখাপড়া শিখলেই ছেলেরা খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে, এ ব্যাপারে মিশনারিদের উৎসাহ উদ্দীপনাও যেন হঠাৎ চতুর্গুণ হয়ে উঠেছে। বর্গীর ভয়ের মতন মা বাপেরা ছেলে-মেয়েদের ঘরে আটকে রাখে, কী জানি কখন পাদ্রীরা তাদের কানে ফুসমন্তর দিয়ে টেনে নিয়ে যায়।

চন্দ্রনাথের লেখাপড়া বিষয়ে হীরেমণির মনে একটা অশান্তি চলছিল। সে নিজে বিদ্যাশিক্ষার অত কিছু মর্ম বোঝে না, কিন্তু তার ছেলেকে যারাই দেখে তারাই বলে যে, এ ছেলে বড় হলে হীরের টুকরো হবে। হীরেমণি দিশেহারা হয়ে যায়।

একদিন দুপুরবেলা খেতে বসে রাইমোহন বললো, বুজলি হীরে, ইচ্ছে করলে চাঁদুকে এ দেশের সবচে বড়, সবচে ভালো বিদ্যালয়ে ভত্তি করে দেওয়া যায়। হিন্দু কালেজের বহুৎ নাম ডাক, সেখানে তোর ছেলে পড়বে, যদি তুই নিজে দু-একটা কাজ করতে রাজি থাকিস।

হীরেমণি অবাক হয়ে বললো, আমি আবার কী করবো? আমার ক' অক্ষর গো-মাংস, ইস্কুলের ব্যাপার আমি কী জানি!

রাইমোহন বললো, সে আমি তোকে শিখোয়ে পড়িয়ে দোবো।

রাইমোহনের পাশেই বসেছিল হরচন্দ্র। সন্ধের পর থেকেই সে মাতাল হয়ে থাকলেও দুনিয়া সম্পর্কে কিছু খোঁজ খবর রাখে। সে বললো, দাদা, এ কথাটি আমিও ভাবছিলুম ক'দিন ধরে। লোকমুখে শুনতে পাচ্চি, বেথুন নামে নাকি একজন সাহেব এয়েচে, সরকারি ইস্কুল বিভাগের বড় কত্তা হয়ে। তিনি নাকি অনেক নিয়ম উল্টে দিয়েচেন আর মেয়েছেলেদেরও পড়ালেখা শিকোচ্চেন। সে সাহেবটি খানিকটা দিলদরিয়া, মাতা পাগলা গোচের। অনেকটা সেই যে ডেভিড হেয়ার ছেলেন, তেনার মতন আর কি!

রাইমোহন বললো, তুই ডেভিড হেয়ারের কতাও জানিস নাকি?

হরচন্দ্র কানে হাত দিয়ে বললো, সে মহাত্মার কথা কে না জানে! আমি নিজেই তো হেয়ার সাহেবের পটলড্যাঙার ইস্কুলে পড়িচি।

—তা নেকাপড়া শিকেও তোর এই অবস্থা হলো কেন? এমন নিষ্কম্মার ঢেঁকি হয়ে রইলি!

—সে দাদা, আমার নিয়তি।

—তুই কতদিন বাড়ি-ছাড়া হয়ে আচিস?

—তা বছর পাঁচেক হবে।

—তুই তার পর থেকে আর কিছুই জানিসনি বোধ করি? সে হেয়ার সাহেব তো কবে পটল তুলে হেভেনে চলে গ্যাচেন রে! ভালো সাহেবরা এ দেশে বেশী বাঁচে না। যে গুলোন রক্তখেকো, সে গুলোন বাঁচে।

হীরেমণি বললো, আবার কী সব হ্যান ত্যান কতা শুরু করলে। চাঁদুর ইস্কুলে ভত্তির কতা কী বলছেলে যে!

হরচন্দ্র বললো, দিদি, আমি নিজে গিয়ে চাঁদুকে হিঁদু কালেজে ভত্তি করে দিয়ে আসবো। দরকার হলে সাহেবদের পায়ে ধরে বলবো, টেস্ট নাও! ছেলেকে যাচিয়ে দেকো।

রাইমোহন তাকে ধমক দিয়ে বললো, তুই থাম! ওতে কিচু হবে না। সাহেবরা পারবে না। আমাদের জাতের বড় বড় মাতা মাতা লোকেরা এখনো কামিটি মেম্বর রয়েচেন, তাঁদের অমতে কিচু হবেনি কো। তাঁদের ধরতে হবে।

তারপর সে হীরেমণির দিকে ফিরে বললো, পশ্যু দত্ত বাড়িতে তো গান গাইবার মুজরো আছে। আমি খবর নিইচি, সেখানে লাট-বেলাট ইংরেজরা তো আসবেই, শহর ছেঁকে বড় মানুষরা আসবে, তার মধ্যে হিন্দু কালেজের অভিভাবক সভার অধ্যক্ষও থাকবেন পাঁচজন। তুই তাঁদের পানে চেয়ে গাইবি। গান গেয়ে তাঁদের মাৎ করে দিতে পারবিনি?

হীরেমণি বললো, কী জানি বাবা! অত বড় আসরে কে মাৎ হলো কি না হলো, তা কি আমি ঠাহর কত্তে পারি?

রাইমোহন বললো, ভাবের গান গাইবি, ভক্তির গান গাইবি। মদের আসরে ভক্তির গান বেশী জমে, বাবুদের চোকে জল এসে যায়। তোকে সেইটি কত্তে হবে। যে পাঁচজন বাবুর নাম বলে দেবো, তাদের পানে চেয়ে কুর্নিশ করবি। তেনারা নিশ্চয়ই কেউ তোকে মালা কিংবা মোহর ছুঁড়ে দেবেন। দেন তো সেরকম!

হীরেমণি ওষ্ঠ উল্টে বললো, কতো! যেগুলো ফোতো, তারা মালাই বেশী দেয়।

রাইমোহন বললো, শোন, যখন ঐ পাঁচজনার মধ্যে কেউ কিচু দেবে, না হয় শুধু মালাই দিল, তখন তুই উঠে তেনার একেবারে সামনে গিয়ে চোখ ছলোছলো করে বলবি, আমি সামান্য স্ত্রীলোক, আমার আর শিরোপা দরকার নেই, যদি আপনাদের মনোরঞ্জন কত্তে পেরে থাকি, তবে আমার ছেলেটার একটা গতি করে দিন। তারপর সব খুলে বলবি, দরকার হয় পায়ে পড়বি প্রথমেই। পারবি না?

রাইমোহনের এই পরামর্শ একেবারেই কার্যকর হলো না। সে রাত্রে ফিরে এসে হীরেমণি তাকে এই মারে কি সেই মারে! তাকে অপমানের একশেষ হতে হয়েছে। হিন্দু কলেজ কমিটির মেম্বারদের যে পাঁচজনের নাম সে করেছিল, তাদের একজনের কণ্ঠে অতিরিক্ত বাহবা শুনে এবং বারবার মালা ছোঁড়ার বহর দেখে হীরেমণি এগিয়ে গিয়ে তার বক্তব্যটি শোনাবার আগেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল। ব্যস, আর যায় কোথায়। সেই মহাপুরুষ অমনি অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, কী, এতবড় সাহস! একজন পতিতা তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করে? এরা মানীর মান রাখতে জানে না। বাঁদর যেমন লাই দিলে মাথায় ওঠে...

সব শুনে ক্রোধে রাইমোহনের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। অনেককাল সে ধনীদের মোসাহেবী করেছে, ইদানীং যেন সব ধনীদের ওপরেই তার জাতক্রোধ জন্মে গেছে।

সে নিষ্ঠুর হাস্যমিশ্রিত কণ্ঠে বললো, তাই! কাঁদিসনি, বুলবুল। তোর ছেলেকে আমি ঐ হিন্দু কালেজে ভর্ত্তি করাবোই। এ নিয়ে আমি ধুন্ধুমার কাণ্ড বাঁধাবো, তুই দেকে নিস। পিশেচের দল! পতিতা অঙ্গ স্পর্শ করলে রাগ দেখানো! লোক-সমক্ষে ভণ্ডামি। আর একলা একলা ঘরের মধ্যে ঐসব বাবুরাই যে তোর মতন মেয়েমানুষের পায়ে ধরে...একে একে আমি সব হাটে হাঁড়ি ভাঙবো...

এরপর দিনক্ষণ দেখে এক সকালে রাইমোহন চন্দ্রনাথ আর হীরেমণিকে নিয়ে যাত্রা করলো। সেদিন সে চন্দ্রনাথকে নিজের হাতে সাজিয়েছে, ধুতির ওপর মলমলের কুর্তা, কাঁধে মুগার উড়ুনি, পায়ে ইংলিশবাড়ির জুতো। চন্দ্রনাথকে দেখাচ্ছে যেন এক বিয়ের আসরের খুদে বরের মতন। হীরেমণিকেও সে দারুণ জমকালোভাবে সাজতে বাধ্য করেছে। দিনের বেলা হীরেমণির এমন সাজ কেউ কখনো দেখেনি। পায়ে জরির নাগরা, সিল্কের শালোয়ার কামিজ, তার ওপরে কাশ্মিরী মলিদা। তার দশ আঙুলে সাতটি অঙ্গুরীয় এবং ওষ্ঠ তাম্বুলরঞ্জিত। এই সাজে সে রাত্রিকালে প্রমোদভবনে যায়, অথচ আজ দিনেরবেলা রাইমোহন এমন সাজেই তাকে নিয়ে যেতে চায় বিদ্যালয়ে।

একটা ভাড়া করা জুড়িগাড়ি এসে থামলো পটলডাঙ্গার মোড়ে হিন্দু কলেজ ভবনের সামনে। গাড়ি থেকে নেমে রাইমোহন হীরেমণিকে বললো, যা, ছেলের হাত ধরে সটান ভেতরে ঢুকে যা। চিবুক উঁচু রাখবি, চোক মাটির দিকে নামাবিনি একবারও। যা শিখ্যে দিইচি, ঠিক তেমনটি তেমনটি বলবি। যা।

হীরেমণি বললো, তুমিও সঙ্গে চলো না। আমার যে ভয় কচ্চে!

হীরেমণিকে দেখে ইতিমধ্যেই পথে ভীড় জমে গেছে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে রাইমোহন বললো, কোনো ভয় নেই, চলে যা। আমি খপর নিইচি, আজ মেম্বারদের মিটিন্ আছে। দেখচিসনি, তেনাদের গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আচে সার বেঁধে। একেবারে সক্কলের সামনে গিয়ে দাঁড়াবি!

রাইমোহন নিজে তাদের ধরে কয়েক কদম এগিয়ে দিয়ে আবার ফিসফিস করে হীরেমণির কানে কানে বললো, সব ঠিক ঠিক মনে আচে তো? চিবুক উঁচিয়ে একেবারে সক্কলের সামনে গিয়ে দাঁড়াবি। বলবি, আমার ছেলেকে ভর্ত্তি করাতে এনিচি। আমার নাম হীরা বুলবুল, আমাকে আপনারা চেনেন না? তারপর ওনারা যখন শুধোবেন, ছেলের বাপের নাম কী, তুই একে একে সকলের মুখের দিকে তাকাবি। তারপর কচাং করে একবার চোখ মেরে, আলতো করে হেসে বলবি, বলবো? ওর বাবার নাম এখেনে বলাটা কি ভালো হবে? তার চেয়ে বরং লিখে নিন, ওর বাবার নাম ভগবান।

সংস্কৃত কলেজের দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন বিদ্যাসাগর। প্রায়ই ছাত্রদের মধ্যে মারামারি লাগে। বিশেষত, পিঠোপিঠি ভাই-বোনের মতন, পাশাপাশি সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজের ছাত্ররা তুচ্ছ কারণে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। বয়েসসুলভ চাপল্যে ছাত্ররা এরকম পারস্পরিক লড়াই মাঝে মাঝে করবেই, অধিকাংশ সময়েই বিদ্যাসাগর ওপর থেকে সে দৃশ্য উপভোগ করেন, কখনো চেঁচিয়ে বলেন, দেখি,

কে জেতে! মারামারি গুরুতর আকার ধারণ করলে অবশ্য তিনি নিজে নেমে যান তাদের থামাতে, দু-একবার পুলিসও ডাকতে হয়েছে।

রসময় দত্ত ইস্তফা দেবার পর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি হয়েছিলেন, এখন সেক্রেটারির পদ উঠে গেছে, বর্তমানে বিদ্যাসাগর এই কলেজের অধ্যক্ষ। এবং দেশে শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে ভারতের ইংরেজ সরকার বিদ্যাসাগরের ওপরে অনেকখানি নির্ভরশীল।

আজ অবশ্য মারামারি বাধেনি, বিদ্যাসাগর দেখলেন হিন্দু কলেজের প্রবেশ-দ্বারের কাছে একটি জুড়িগাড়ি থেমেছে এবং সেখানে কিসের যেন গোলমাল হচ্ছে। ওপর থেকে তিনি সব ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না। তবে এটা তাঁর প্রতিষ্ঠানের ব্যাপার নয় বলে তিনি একটু পরে চলে গেলেন নিজের দপ্তরে।

হিন্দু কলেজের প্রবেশদ্বারের কাছে গোলমাল ক্রমশই বাড়ছিল। এক বালকের হাত ধরে ঝলমলে পোশাকে ভূষিতা এক উগ্রযৌবনা রমণী কলেজের মধ্যে ঢুকতে চাইছে। এমনটি আর কখনো ঘটেনি, দেশগৌরব এই বিদ্যালয়ে এর আগে আর কোনো নারী প্রবেশ করেনি।

আরে একি একি—বলে শোরগোল তুলেছে একদল বালক। সম্ভ্রান্ত বংশীয় বালকেরা চুপ করে দেখছে এক পাশে দাঁড়িয়ে। এদের মধ্যে রয়েছে রামকমল সেনের পৌত্র কেশবচন্দ্র, দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রলাল সরকার, দীনবন্ধু মিত্র, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইত্যাদি। কেশব অত্যন্ত ধীর স্থির ও গম্ভীর স্বভাবের বালক, সে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো স্থির দৃষ্টিতে, অন্যরা সবিস্ময়ে ফিসফিস করতে লাগলো। স্ত্রীলোকটির সঙ্গের বালকটি তাদেরই বয়েসী, লজ্জায় তার মুখ আরক্ত, সে কোনোদিকে তাকাচ্ছে না।

হীরে বুলবুল কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে পুত্রকে নিয়ে সোজা ঢুকে এলো ভেতরে। সিঁড়ির পাশের বাঁ দিকের প্রশস্ত ঘরটিতে কমিটি মেম্বাররা প্রয়োজনে মিলিত হন। রাইমোহনের সংবাদ সঠিকই ছিল, আজ ইংরেজ ও ভারতীয় সদস্যরা অনেকেই এসেছেন কোনো একটি জরুরি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য। পুত্র সমেত হীরাকে প্রবেশ করতে দেখে মাননীয় দেশী সদস্যরা সবাই যেন আঁতকে উঠলেন।

রাইমোহন যা শিখিয়েছিল, তোতাপাখির মতন গড় গড় করে বলে গেল সে কথা। সে চক্ষু নত করেনি এবং চিবুক উঁচিয়ে রেখেছে। হীরেমণি যে একজন বারাঙ্গনা, সে কথা কারুর বলে দেবার অপেক্ষা রাখে না, তাকে দেখা মাত্র বোঝা যায়।

হীরেমণির কথার মধ্যপথেই একজন দেশী সদস্য চেঁচিয়ে উঠলো, আরে মলো যা, কী উৎপাত! দ্বারবান বেটারা কই? রামটহল! ব্রজবাসী!

হীরেমণি বললো, আমার নাম হীরা বুলবুল। দারোয়ান বেটারা আমার গায়ে হাত দেবে? অ্যাতগুলোন ভদ্দরলোক এখানে বসে থাকতে?

ইংরেজ সদস্যরা বাধা দিয়ে বললো, আগে ব্যাপারটা শোনা যাউক। হে মহোদয়া, আপনি আসন পরিগ্রহণ করুন!

অমনি ভারতীয় সদস্যদের মধ্যেকার একজন সমাজ শিরোমণি বলে উঠলেন, সে কি মহাশয়, এক কুলটা রমণী আমাদের সম্মুখে বসিবে কি? তাহার সংস্পর্শে এই পূতঃ বিদ্যালয় অপবিত্র হইয়া যাইতেছে!

হীরেমণি কয়েকজন দেশীয় সম্ভ্রান্ত সদস্যের মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি ন্যস্ত করে রইলো, যেন এখনি সে বলে উঠবে, কী গো বাবু, আমায় চিনতে পাচ্চো না?

কতদিন আমার গা ঘেঁষাঘেঁষি করোচো, তা মনে করিয়ে দিতে হবে?

মুখে অবশ্য সে কথা বললো না হীরেমণি, যেন তার দৃষ্টিই যথেষ্ট।

ইংরেজ সদস্যরা কৌতুক পেয়ে গেল। মুসলমান ও খৃষ্টান ছাত্রদের এ কলেজে প্রবেশ অধিকার এখনো নেই। এমনকি, কোনো হিন্দু ছাত্র বা শিক্ষক ধর্মান্তরিত হলেই হিন্দু সদস্যরা তাদের তাড়াবার জন্য উঠে পড়ে লাগে। এবার ইংরেজ সদস্যরা সুযোগ পেয়েছে। তারা একযোগে বললো, আপনাদের আপত্তির কারণ তো কিছু বুঝিতে পারিতেছি না? এই রমণী কি হিন্দু নয়? হিন্দুর সন্তান অবশ্যই হিন্দু হইবে!

এক ভারতীয় সক্রোধে বলে উঠলেন, বেশ্যার ছেলের আবার জাত কী? ওর কি কোনো বাপের ঠিক আছে?

হীরেমণি চোখ ঘুরিয়ে মুচকি হাসলো। তারপর বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী ব্যক্তিদের প্রত্যেকের মুখের দিকে একে একে দৃষ্টি ফেলে সে বললো, বলবো? এখেনে সকলের সামনে ওর বাপের নাম বলবো? সেটা কি ঠিক হবে? ভেবে দেকুন একবার!

অমনি সব উজ্জ্বল মুখগুলি ম্লান হয়ে গেল। মনে মনে সবাই প্রমাদ গুণলেন। এ পাপীয়সীর মনে কী আছে কে জানে! যদি মিথ্যেমিথ্যে যে-কোনো একজনের নাম বলে দেয়? একবার কলঙ্ক রটে গেলে তা আর সহজে ফেরানো যায় না। বেশ্যার মুখের কথা সারা শহর রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করবে। দুরাচার, সংবাদপত্রের মসিজীবীরা তাই নিয়ে বানাবে সাত কাহন।

হীরেমণি বললো, বলচি তো, লিকে নিন, ওর বাপের নাম ভগবান!

ভারতীয় সদস্যরা সদলে একযোগে প্রতিবাদ স্বরূপ সভাস্থল পরিত্যাগ করে চলে গেলেন।

ইংরেজ সদস্যরা পরীক্ষা করে দেখলো হীরেমণির সন্তানের শিক্ষাগত যোগ্যতা। চন্দ্রনাথের মেধা সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকবার কথা নয়। ইংরেজরা একতরফাভাবে চন্দ্রনাথকে হিন্দু কলেজের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করে নেবার সিদ্ধান্ত নিল। তদ্দণ্ডেই কলেজের অধ্যক্ষ চন্দ্রনাথের হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়ে এলেন ক্লাসে।

বিজয়িনীর ভঙ্গিতে বেরিয়ে এলো হীরেমণি। কিছু দূরে অপেক্ষা করছিল জুড়িগাড়িটি, তার মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে আছে রাইমোহন। হীরেমণি একা এসে গাড়িতে উঠতেই রাইমোহন সেই বসা অবস্থাতেই নৃত্য শুরু করে দিল যেন। দন্তপাটি বিকশিত করে সে বলতে লাগলো, কেমন, ফললো কি না! ফললো কি না! দিয়িচি সব ব্যাটার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে। কেমুন ল্যাজ গুটিয়ে ভেগে পড়লো সব!

গাড়ি ঘরঘরিয়ে চললো, আর তার মধ্যে উল্লাসে লাফাতে লাগলো রাইমোহন।

সেদিন হিন্দু কলেজের তৃতীয় শ্রেণীর বাকি সব ছাত্রদের বাড়িতে এসে স্নান করে মাথায় গঙ্গাজল স্পর্শ করতে হলো। তাদের সেদিনকার পরিধেয় বস্ত্র ফেলে দেওয়া হলো পথে। অভিভাবকদের মধ্যে সৃষ্টি হলো সাংঘাতিক উত্তেজনার। দেশ বুঝি রসাতলে যেতে বসেছে। একি অনাচার! একি অনাচার! শোভাবাজারে রাধাকান্ত দেবের প্রাসাদে, জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অট্টালিকায় এবং তালতলায় রাজেন্দ্রনাথ দত্তের ভবনে পৃথক পৃথক ভাবে বড় মানুষদের সভা বসলো। এর প্রতিবিধান না করতে পারলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দেশের বড় বড় হিন্দুরাই, আজ সে

প্রতিষ্ঠান ইংরেজদের কুক্ষিগত।

পরদিন হিন্দু কলেজে বহু ছাত্রই অনুপস্থিত হলো। তৃতীয় শ্রেণীতে চন্দ্রনাথ ছাড়া আর একজনও আসেনি। বই ও খাতা নিয়ে চন্দ্রনাথ একা চুপ করে বসে রইলো ক্লাস ঘরে। হিন্দু অধ্যাপকরা অনেকেই তৃতীয় শ্রেণীতে গিয়ে চন্দ্রনাথকে পড়াতে রাজি নয়। কিন্তু ইংরেজ অধ্যক্ষ অনড়। যে-সব অধ্যাপক পড়াতে রাজি নন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। চন্দ্রনাথকে ভর্তি করানো হয়েছে যখন, তখন সে পড়বেই। একজন ইংরেজ অধ্যাপক তৃতীয় শ্রেণীতে একা চন্দ্রনাথকে পড়াবার উদ্দেশ্যে এসে বললেন, কাম অন, মাই বয়, উই শ্যাল রীড পোয়েট্রি টুডে। তুমি বায়রনের নাম শুনিয়াছ?

চন্দ্রনাথ নম্রভাবে উঠে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করলো, 'ও টক নট টু মী অফ এ নেম গ্রেট ইন স্টোরি; দি ডেইজ অফ আওয়ার ইউথ আর দি ডেইজ অফ আওয়ার গ্লোরি...।'

সাহেব শুনে চমৎকৃত হয়ে গেলেন।

দেশীয় সমাজের প্রবল প্রতিবাদের উত্তরে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হলো এই যে, বারবনিতারা নিজে থেকে জন্মায় না। এই সমাজই বারবনিতা তৈরি করে। যে সমাজ বারবনিতাদের পোষণ করতে পারে, সে সমাজ তাদের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ দেবে না কেন? ইংলণ্ডেও বারবনিতা আছে, সেখানে তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার কোনো বাধা নেই।

দ্বিতলে বসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যথাসময়ে শুনলেন হিন্দু কলেজের ঘটনা। তিনি কোনো মন্তব্য করলেন না। হিন্দু কলেজের সঙ্গে তাঁর কোনো সংশ্রব নেই, শুধু সেখানকার দু-একজন ইংরেজী ভাষার শিক্ষকের কাছে তিনি ছুটির পর নিয়মিতভাবে ইংরেজী সাহিত্যের পাঠ নিতে যান। সুতরাং সেখানকার সব কথাই তাঁর কানে আসে।

সেদিন কাজ সেরে বেরুতে তাঁর অনেক দেরি হয়েছে। কলেজ থেকে বেরিয়ে তিনি গেলেন সুকিয়া স্ট্রিটে তাঁর বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। এখানে তিনি প্রায়ই আসেন। সর্ব ব্যাপারে রাজকৃষ্ণ তাঁর সহচর। রাত্রের আহার সেখানেই সেরে বিদ্যাসাগর আবার বাড়ির দিকে রওনা হলেন। রাজকৃষ্ণ একটি গাড়ির ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু বিদ্যাসাগর রাজি হননি। তাঁর পায়ের তলায় শর্ষে, তিনি হেঁটে হেঁটেই দুনিয়া ঘুরতে পারেন। সুকিয়া স্ট্রিট থেকে বউবাজার আর কতখানিই বা দূরত্ব। একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে, তবু তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না।

পথে এক স্ত্রীলোক তাঁর পিছু নিল। সে হতভাগিনী মানুষ চিনতে পারেনি। কিংবা বেশী রাতে একা পথচারী দেখে সে উপযুক্ত খরিদ্দারই মনে করেছে। প্রথমে কিছুক্ষণ সে কানের কাছে প্যান প্যান করলো, তারপর একবার মরিয়া হয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের হাত চেপে ধরলো।

ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বিদ্যাসাগর হেঁটে গেলেন হন হন করে। একটু দূরে গিয়ে থামলেন। তারপর আবার ফিরে আসতে লাগলেন মেয়েটির কাছে। হঠাৎ তাঁর চোখে জল এসে গেল। এই এক তাঁর রোগ, যখন তখন কান্না এসে যায়। যুক্তি দিয়ে তিনি মস্তিষ্কে সব বোঝেন, তবু হৃদয়দৌর্বল্য কিছুতেই কমে না।

স্ত্রীলোকটি অল্পবয়েসী, রোগা ছিপছিপে চেহারা, মুখখানি শুকনো। ঈশ্বরচন্দ্র তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এত রাত্রে বৃষ্টির মধ্যে আর পথে পথে ঘুরছো কেন? বাড়ি যাও!

ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখে মেয়েটি একটি হতাশ নিশ্বাস ফেললো। চেহারা দেখলেই মনে হয় কোনো বাড়ির রসুই বামুন, কিংবা পুজুরী। পয়সাকাড়ির মুরোদ নেই। মেয়েটির ভাগ্যে এত রাতে একটি ভুল লোকই জুটেছিল।

মেয়েটি বললো, কী করবো ঠাকুর! আজ একটা খদ্দেরও জোটেনি। বাড়িতে একটা আধলাও নেই, খাবো কী?

ঈশ্বরচন্দ্র চোখ নীচু করলেন। কোন্ মুখে তিনি এই ভাগ্যহীনা রমণীকে তিরস্কার করবেন? আবার তিনি একা এই সমস্যা দূর করবেনই বা কী করে? এই সমাজ স্ত্রীলোকদের লেখাপড়া শেখাতে দেয় না। এই সমাজ স্ত্রীলোকদের অতি শৈশব অবস্থায় বিবাহ করতে বাধ্য করে। তারপর দৈবাৎ কোনো স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে, সে বিধবার সমস্ত সাধ আহ্লাদ ঘুচে যায় সারা জীবনের মতন। মৃত স্বামীর বিষয়-সম্পত্তি লুটে পুটে নেয় পাঁচ ভূতে। তারপর সেই স্ত্রীলোক যদি গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পথে নামতে বাধ্য হয়, অমনি সেই সমাজ তাকে পতিতা বলে ঘোষণা করে দেয়। হীরা বুলবুল তার সন্তানকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করে সমাজের নীচের তলার অনেক ক্লেদ প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে। হীরা বুলবুলের সন্তানের জনক কে, সমাজেরই কোনো বড় মানুষ নিশ্চয়ই।

ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে যা পয়সাকড়ি ছিল মেয়েটির হাতে তুলে দিয়ে বললেন, আজ আর বৃষ্টিতে ভিজো না। আজ বাড়ি যাও।

মেয়েটি বললো, তুমি আমায় এমনি এমনি পয়সা দিচ্চো কেন? তুমি কে গা?

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, আমি কেউ না।

তারপর তিনি হন্‌হন করে হাঁটতে শুরু করলেন। মেয়েটি চিৎকার করতে লাগলো, ও ঠাকুর, চলে যাচ্চো কেন, লজ্জা কী? আমি তোমায় ভালো করে সুখ দোবো! ও ঠাকুর...

ঈশ্বরচন্দ্র দু' হাতে কান চাপা দিয়ে ছুটতে লাগলেন প্রায়।

হিন্দু কলেজে ছাত্রসংখ্যা প্রতিদিনই কমতে লাগলো। অনেক ছাত্র বই খাতা নিয়ে এসে বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে থাকে, চন্দ্রনাথকে ঢুকতে দেখলে তারা বিদ্রূপ ধ্বনি দেয়। চন্দ্রনাথ গ্রাহ্য করে না।

সাতদিন পরে একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে তিন-চারজন লাঠিধারী জোয়ান পিছন থেকে অকস্মাৎ মারতে লাগলো চন্দ্রনাথকে। চন্দ্রনাথ দৌড়ে পালাবারও সময় পেল না, রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে গেল মাটিতে। দুর্বৃত্তরা চম্পট দিল অবিলম্বে। চন্দ্রনাথ পড়েই রইলো সেখানে, একটা কুকুর এসে গন্ধ শুঁকে গেল কিন্তু কোনো মানুষ তাকে স্পর্শ করলো না।

সেদিন আবার সন্ধের আগেই রাইমোহন মাতাল হয়ে বসে আছে। হরচন্দ্র কোথা থেকে কিছু টাকা জোগাড় করেছে, সে-ই ক্রয় করে এনেছে বোতল, তারপর দুজনে মিলে উচ্চণ্ড মাতলামি শুরু করেছে। এদিকে বেলা পার হয়ে আঁধার হয়ে আসার পর হীরেমণি উতলা হয়ে উঠলো ছেলের জন্য। সে রাইমোহনের কাছে এসে কিছু বলতে এলে রাইমোহন হেসে উড়িয়ে দেয়। চন্দ্রনাথ তো আর তেমন ছেলেমানুষটি নয় যে পথ হারিয়ে ফেলবে। সাহেবরা তাকে একলা একলা পড়ায়, সেইজন্য বোধহয় সময়ের হুঁশবোধ নেই।

শেষ পর্যন্ত এক গাছা মুড়ো ঝাঁটা এনে হীরেমণি সপাসপ করে পেটাতে লাগলো ওদের দুজনকে। তখন ওরা দৌড়ে বেরিয়ে পড়লো পথে। গলা ধরাধরি করে দুই

মাতাল চলতে লাগলো, আর মাঝে মাঝে পথের মানুষদের ডেকে ডেকে জড়িত কণ্ঠে শুধোয়, ওগো, তোমরা কেউ চাঁদুকে দেখেছো? লোকেরা কোনো উত্তর না দিয়ে ভয়ে পালিয়ে যায়। একবার পটলডাঙ্গায় হিন্দু কলেজ পর্যন্ত গিয়েও তারা ফিরে এলো, কলেজের দ্বার বন্ধ, সেখানে কেউ নেই। গোলদীঘিতে বসে আরও সুরাপান ও সামনের দোকান থেকে কাবাব এনে ভক্ষণের প্রস্তাব দিল হরচন্দ্র, কিন্তু রাইমোহন বললো, না, চল, বাড়ি যাই। গিয়ে দেকবো, চাঁদু পোঁচে গ্যাচে, আর হীরেকে বলবো, নে, এখন সব ঝ্যাঁটার বাড়ি ফেরৎ নে।

ফেরার পথে তারা দৈবাৎ আবিষ্কার করলো চন্দ্রনাথকে। রক্তমাখা নিস্পন্দ চন্দ্রনাথকে দেখেই তারা কেঁদে উঠলো ডুকরে। পথের ওপর বসে পড়ে ওরা প্রকৃত-পক্ষেই শোকে আকুল হয়ে উঠলো, ওরা দুজনেই চাঁদুকে খুব ভালোবাসে। এই সংবাদ এখন হীরেমণিকে জানাবেই বা কী করে? রাইমোহনের শোক রূপান্তরিত হলো ক্রোধে, সে শহরের সব বড় মানুষের নাম উচ্চারণ করে করে বাপান্ত করতে লাগলো।

তার সেই গালিগালাজেই আকৃষ্ট হলেন দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এখন শহরের নামকরা চিকিৎসক, রুগী দেখে ফিরছিলেন নিজের পালকিতে, মুখ বাড়িয়ে দেখলেন এক কিশোরের শায়িত দেহের পাশে বসে চিল্লাচ্ছে দু'জন মাতাল। তিনি ভর্ৎসনা করে বললেন, এই! চুপ করবি, না পুলিসে এত্তেলা পাঠাবো!

দুর্গাচরণ পালকি থেকে নেমে কিশোরটির উপুড় হওয়া দেহটি উল্টে দেখলেন। চন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়নি, মস্তিষ্কে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে সে অচৈতন্য হয়ে আছে।

দুর্গাচরণ প্রশ্ন করলেন, একে এমনভাবে কে মেরেছে? তোরাই মারিসনি তো?

রাইমোহন উন্মাদের মতন বললো, একে মেরেচেন আপনি! আর এই চারদিকের বাড়িগুলানে, এ শহরে যত ভদ্দরলোক আচে, তারা সবাই মিলে মেরেচে।

দুর্গাচরণ বললেন, তোরা এখেনে জুটলি কোন্ চুলো থেকে? শেয়াল কুকুরের মতন অলুক্ষণে কান্না জুড়েচে। এ ছেলেটার চিকিৎসা করালে তো এখনো বেঁচে যাবে। নে, একে পালকিতে তোল!

রাইমোহন তবু তোড়িয়া গলায় বললো, দেখুন মোশায়, আগে থেকেই একটা কতা বলে দি। এ কিন্তু বেশ্যার ছেলে। একে ছুঁলে আপনার আবার জাত যাবে না তো?

হরচন্দ্র বললো, হি ইজ এ পিউপল অব দি হিন্দু কলেজ। হিজ মাদারস নেম ইজ হীরা বুলবুল!

দুর্গাচরণও শহরের এই চাঞ্চল্যকর বৃত্তান্তটি শুনেছেন। এক নিমেষেই তিনি সব বুঝে গেলেন। তিনি বললেন, আমি ডাক্তার, আমি জাত-বিজেত বুঝি না। নে, নে, আর দেরি করিসনি। শিগগির তোল।

দু-দিনের মধ্যেই চন্দ্রনাথ সুস্থ হয়ে উঠলো। তার মাথায় বাঁধা রইল মস্ত বড় ফেট্টি। সেই অবস্থাতেই চন্দ্রনাথ বললো যে সে কলেজে যাবে।

এমন অসম্ভব কথা শুনে হীরেমণি প্রবল আপত্তি তুললেও রাইমোহন বললো, এই তো বাঘের বাচ্চার মতন কতা! কেন যাবে না। নিশ্চয় যাবে। মাতায় অমনি ফেট্টি বেঁধেই যাবে। সকলকে বলবে, দ্যাক, আমি পরোয়া করি না। আমি নিজে দু-বেলা ওকে দিয়ে আসবো, নিয়ে আসবো। দরকার হলে আমরাও লাঠিয়াল রাকবো। তুই একটা জুড়িগাড়ি কেন তো হীরে। আমি নিজে সেই গাড়ির কোচোয়ানের পাশে বসে থাকবো।

তারপর হরচন্দ্রের দিকে ফিরে বললো, ফের যদি কোনোদিন সন্ধ্যের আগে

আমায় মদ ধরাবি তো আমি তোরই মাতা ভাঙবো, হারামজাদা!

রাইমোহনেরই জয় হলো শেষ পর্যন্ত। চন্দ্রনাথের কলেজে যাওয়া আটকাতে পারলো না। এতদিনের হিন্দু কলেজ ভেঙে পড়বার উপক্রম হলো এই এক ধাক্কায়। সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেরা সবাই ছেড়ে গেল হিন্দু কলেজ। তালতলার রাজেন্দ্র দত্ত রাতারাতি আর একটি কলেজ খোলার প্রস্তাব তুললেন, তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন অনেকেই। রানী রাসমণি দিলেন দশ হাজার টাকা, আরও অনেকের দানে স্থাপিত হলো হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ, হিন্দু কলেজ থেকে বিতাড়িত ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনকে আনা হলো এই কলেজের অধ্যক্ষ করে। কেশব সেনের মতন ছাত্ররা সবাই যোগ দিল এই নতুন কলেজে।

রাইমোহন সেদিন হীরেমণিকে বললো, আজ শুধু আমার জন্য একটা আলাদা মাইফেল বসাবি, হীরে? আর কেউ আসবে না, শুধু আমার জন্য তুই সাজবি, চোখে সুর্মা লাগাবি, আমার জন্যে জ্বলবে ঝাড় লণ্ঠন। ঘরে ম ম করবে আতরের গন্ধ। আমি তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বসে আলবোলা টানবো চোখ বুঁজে, তুই আমার হাতে সুরার পাত্তর তুলে দিবি, আর গান গাইবি! হোক না, আজই!

হীরেমণি বললো, মরে যাই, মরে যাই, বাবুর শক কত!

রাইমোহন বললো, দ্যাক আমি শহরের এতগুলোন বাবুর থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিলুম, আজ আমার একটু বাবু হতে শক যাবে না? আমার প্রাণ চাইচে।

—অত যদি প্রাণ চায় তো রামবাগানে যাও না! মেয়েমানুষের কি অভাব রয়েচে কলকাতায়! ভারী আমার দু পয়সার ফুলবাবু এলেন রে!

—তুই আমায় টাকার খোঁটা দিলি? আমি টাকা রোজগার করি না? তোকে অনেক টাকা দিতে পারি না? দেকবি, আজই টাকা রোজগার করে আনবো?

—থাক, আবার কোতাও চুরি-চামারি করতে যেতে হবে না! কোন্ দিন রাম-ঠ্যাঙানি খাবে!

—আমি চুরি করি না, আমি বুদ্ধি খাটাই! লোকে আমার বুদ্ধির দাম দেয়।

—হয়েচে! আমি ঢের জানি।

—তুই আমায় অন্য মেয়ের কাচে যেতে বললি? সেই কবে থেকে তোর এখেনে এসে হত্যে দিয়িচি, তারপর আর কোনোদিন আর কোনো মেয়েমানুষের দিকে তাকিয়েচি? তোর মন পাবার জন্যিই তো আমার এত সাধনা। তুই আমার দিকে থাক, তারপর দ্যাক না আমরা দুজনায় মিলে কত কী করি!

হীরেমণি হাই তুলে বললো, সারেঙ্গীওয়ালা এখুনি এসে যাবে, আমায় রেওয়াজ করতে হবে, তুমি এখন বিদেয় হও!

রাইমোহন একটুও আহত না হয়ে বললো, লাথি ঝ্যাঁটা খেয়ে তোর এখেনে পড়ে রয়েচি, তবু এই আমার পরম সুখ। আজ আমি কিচুতেই যাচ্চিনি।

হীরেমণি তাকে আরও কিছু বাক্যবাণে বিঁধলো, তার হাত ধরে টানাটানি করলো, তবু রাইমোহন কোনোক্রমেই নড়লো না। হীরেমণির গান সে অহরহ শোনে, হীরেমণি অধিকাংশ রাতেই তার শয্যাসঙ্গিনী, তবু আজ রাতে সে হীরেমণির বাবু সাজতে চায়।

তার ঝুলোঝুলিতে হীরেমণিকে ধড়াচুড়ো পরতেই হলো। বাজার থেকে ফুলের মালা এনে রাইমোহন সাজালো হীরেমণিকে। সে নিজেও লপেটা ধুতি ও ফিনফিনে কাপড়ের বেনিয়ান পরে, গোঁফে লাগালো আতরের ছোঁয়া। মাথার চুল তেল চপচপে করে চিরুনি দিয়ে সামনে টেনে সাজিয়ে দিল কপালের ওপর। তিরিশটা মোমবাতির নতুন ঝাড় লণ্ঠন বসানো হয়েছে ঘরে, তার উজ্জ্বল আলোয় বোঝা যায়, রাইমোহনের

মুখে এতদিন পরে বয়েসের ছাপ পড়েছে। চুল পাতলা হয়ে এসেছে, মুখের চামড়ায় সেই মসৃণতা নেই, চোখের দু পাশে কাকের পায়ের চিহ্ন।

সারেঙ্গীওয়ালাকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। চন্দ্রনাথ ঘুমিয়ে পড়বার পর শুরু হলো ওদের একা মজলিস। শ্যাম্পেনের বোতল খোলা হয়েছে একটা, দুটি পাত্রে তরল সুরা ঢেলে ঠুকলো একবার, তারপর দুজনে চুমুক দিল।

তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আলবোলার নলটি মুখে দেবার পর সত্যিই যেন আরামে রাইমোহনের চোখ বুজে আসছে। কত রাত্রে এই কক্ষে, এই গালিচার ওপর ঠিক এই ভঙ্গিতে বসেছে শহরের কেষ্ট বিষ্টুরা। রাইমোহনকে চোরের মতন লুকিয়ে থাকতে হয়েচে।

রাইমোহন আবেশজড়িত কণ্ঠে বললো, এবার গান গা। সেই যে প্রথম যে গানটা শিখেছিলুম, অনেকদিন আগে, সেই যে রে, 'তুষিতে তোমারে এ যমুনারই পারে'—

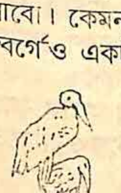
গান চললো একটার পর একটা। গানে হীরেমণির ক্লান্তি নেই। আর যত শ্যাম্পেনের মাত্রা বাড়ে, তত রাইমোহনের তারিফও বেশী বেশী হয়। কখনো সে গানের দু-একটা বাণী সংশোধন করে দেয়। রাইমোহনকে দেখে মনে হয় সে আজ সত্যিকারের পরিতৃপ্ত।

রাত্রে এ পল্লী রীতিমতন সরব। গাড়ি ঘোড়া যাতায়াতের বিরাম নেই। এক এক সময় মনে হয় বুঝি কোনো গাড়ি এ বাড়ির দোরগোড়াতেই থামছে। তখন হীরেমণি উৎকর্ণ হয়ে ওঠে, গান থেকে মন চলে যায়। আর অন্যমনস্ক গানের সুরের অসঙ্গতি ঠিক ধরা পড়ে রাইমোহনের কানে।

সে ধড়ফড় করে উঠে বসে জিজ্ঞেস করে বলে, কেউ এলো?

তারপরই সে চোখ ঘূর্ণিত করে বলে, আজ যদি কেউ আসে, সে যত বড়ই বাবু হোক, আমি তাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদেয় করবো।

তারপর সে হীরেমণিকে কাছে টেনে নিয়ে আলিঙ্গনবদ্ধ করে বলে, ওসব কিচু তুই শুনিসনি হীরে। মনে কর, আজ পৃথিবীতে আর কোনো শব্দ নেই, কোনো বাবু নেই, শুধু তুই আচিস আর আমি আচি। আজ শুধু তোর জন্য আমি আর আমার জন্য তুই। আমি গান বাঁধবো, তুই গাইবি। একদিন এসব ছেড়ে ছুড়ে তোতে আমাতে বেরিয়ে পড়বো, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে গান গাইবো। তারপর বুঝলি হীরে, ওরকমভাবে গান গাইতে গাইতেই দুজনে হাত ধরাধরি করে একদিন স্বর্গে চলে যাবো। কেমন? কী, বিশ্বেস হচ্চে না? দেকিস, তুই দেকে নিস, তোর জন্যে আমি স্বর্গেও একটা জায়গা করে দেবো।



একজন খাঁটি ইংরেজতনয়কে নিযুক্ত করা হয়েছে নবীনকুমারের গৃহ-শিক্ষক হিসেবে। একজন পণ্ডিত সংস্কৃত ও বাংলা পড়ান। নবীনকুমারের গানের প্রতি অত্যধিক ঝোঁক দেখে একজন গায়কও আসেন তাকে গলা সাধানো রেওয়াজ করাতে। গায়কটি বেশ পালোয়ান গোছের, তিনি তাঁর ছাত্রকে কুস্তি ও গান, দুটোই শেখান। তবে নবীনকুমারের কোনো শিক্ষকই বেশী দিন টেঁকেন না। ইংরেজ শিক্ষক কার্ক

প্যাট্রিকও গঙ্গানারায়ণের কাছে তাঁর ছাত্র বিষয়ে নালিশ জানিয়েছেন।

নবীনকুমার সংস্কৃত ও বাংলা বেশ ভালোই শিক্ষা করছে, যদিও পণ্ডিতকে সে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। নবীনকুমারের বাল্যের দুরন্তপনা এখন কৈশোরে অবাধ্যপনায় এসে দাঁড়িয়েছে, সে কারুর কোনো কথা শোনে না। বিম্ববতীর অতিরিক্ত প্রশ্রয়ের ফলে তাকে শাসন করার সাহস কারুর নেই। একমাত্র সে গঙ্গানারায়ণের কথা কিছুটা মানে, তার মুখে মুখে কথা বলে না, কিন্তু গঙ্গানারায়ণকে ইদানীং প্রায়ই মহাল পরিদর্শনের ব্যাপারে মফস্বলে থাকতে হয়।

দ্বাদশ বৎসর বয়েসে নবীনকুমার এখন এক অনিন্দ্যকান্তি বালক। তার মুখ-মণ্ডলে প্রতিভার জ্যোতি, চক্ষু দুটি অত্যুজ্জ্বল, এ বালক যে অসাধারণ তা তার মুখের পানে একবার তাকালেই বোঝা যায়।

কিন্তু এই বালকেরই মনের মধ্যে যে কতখানি নিষ্ঠুরতা আছে, তা কল্পনা করাও দুষ্কর। গৃহের দাস-দাসীদের সে মানুষ বলেই গণ্য করে না, সামান্য কর্তব্যচ্যুতি হলেই সে তাদের অসম্ভব কটু ভাষায় গালিগালাজ করে। তার আহার-বিহার-শয্যার পারিপাট্যের জন্য বিম্ববতী এখন সাতজন দাস-দাসী নিযুক্ত করেছেন। নবীনকুমার এক জায়গায় বসে খেতে পারে না বলে একজন ভৃত্য খাদ্যের ভাণ্ড নিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবে। নবীনকুমার কখনো ছাদে, কখনো বাগানে এক এক চামচ করে খাদ্য মুখে দেবে, এবং সে ইঙ্গিত করা মাত্রই ভৃত্যটি যদি খাদ্যের ভাণ্ড এগিয়ে দিতে মুহূর্তমাত্র দেরি করে, অমনি নবীনকুমার লাথি মেরে সেই ভাণ্ড ফেলে দেবে। সারা বছর ধরে তাকে স্নান করানো হয় ঈষদুষ্ণ জলে, যদি কোনো একদিনও সেই জলের উত্তাপ সামান্য কম বা বেশী হয়, তখনি নবীনকুমার সংশ্লিষ্ট ভৃত্যটিকে গরু গরু বলে গালি দিয়ে ওঠে। কখনো বা অতি ক্রোধবশে সে বয়স্ক কোনো ভৃত্যকে চড় মারতেও দ্বিধা করে না। বাড়ির বাইরে যেতে হলে সে সেকালের নবাবপুত্রদের মতন আরাম কেদারায় পা ছড়িয়ে বসে কোনো ভৃত্যের নাম ধরে ডাকে। তৎক্ষণাৎ সে ভৃত্যটি এসে তার পায়ে জুতো পরিয়ে দেয়।

এই রকম দৃশ্য গঙ্গানারায়ণের চোখে পড়েছে। গঙ্গানারায়ণ হিন্দু কলেজের আলোকপ্রাপ্ত ছাত্র, সে এ সব পছন্দ করে না। মানুষের মধ্যে উচ্চ-নীচ জাতের সংস্কার সে মানে না। ফরাসী বিপ্লবের পর সকল মানুষের সমান অধিকারের যে বারতা পৃথিবীতে ছড়িয়েছিল, তার ঢেউ কিছুটা গঙ্গানারায়ণের মতন যুবকদের মনেও এসে লেগেছে। তাছাড়া, সে দার্শনিক রুশোর কিছু কিছু রচনাও পাঠ করেছে। অর্থনৈতিক নিবন্ধনে পৃথিবীতে অনেককেই এখনো দাসত্ব বরণ করতে হয়, কিন্তু তাদের প্রতি মানবোচিত ব্যবহারেরই পক্ষপাতী গঙ্গানারায়ণ।

সে একদিন নবীনকুমারকে বলেছিল এই কথা। নবীনকুমারকে সে আদর করে ছোটকু বলে ডাকে। সে বলেছিল, এ কি ছোটকু, তুই জুতোর ফিতাটুকুও বাঁধতে জানিস না?

নবীনকুমার সগর্বে উত্তর দিয়েছিল, না।

গঙ্গানারায়ণ বলেছিল, এ তো সবাই পারে। বহারু পর্যন্ত পারে, আর তুই পারিস না?

নবীনকুমার বলেছিল, দাদা, বহারু কি সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতে পারে? আমি পারি। বহারুর কাজ জুতোর ফিতে বাঁধা, আমার তো তা কাজ নয়।

গঙ্গানারায়ণ বলেছিল, মানুষকে নিজের সব কাজই শিখতে হয়। আয়, আমি তোকে জুতো পরা শিখিয়ে দি।

নবীনকুমার বলেছিল, জুতোয় হাত দিলে হাত নোংরা হয়। মা নিষেধ করেচে।

এর পর আর গঙ্গানারায়ণ কিছু বলতে পারেনি। বিম্ববতীর নিষেধের ওপর আর কোনো কথা চলে না। বিম্ববতী পুত্রস্নেহে অন্ধ। এমনিতে বিম্ববতী নিজে খুবই দয়াবতী, কোমলপ্রাণা নারী, তিনি নিজে কখনো দাস-দাসীদের কষ্ট দেন না। কিন্তু নবীনকুমার যদি এমনকি কোনো ভৃত্যের মুণ্ড কাটার হুকুমও দেয়, বিম্ববতী বোধ হয় তা-ও মেনে নেবেন। গঙ্গানারায়ণ মায়ের সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে বহুবার নিরস্ত হয়েছে। নবীনকুমারের ব্যাপারে বিম্ববতী বধির।

\

ছোট ভাইয়ের তত্ত্বাবধান বিষয়ে গঙ্গানারায়ণ ইদানীং প্রায়ই চিন্তা করে। বয়সে বালক হলেও নবীনকুমারের ভাবভঙ্গি ও কথাবার্তার ধরন অনেকটা বয়স্কদের মতন, এটা গঙ্গানারায়ণের মোটেই পছন্দ নয়। এত অল্প বয়েসে এত বেশী প্রশ্রয়ের ফল কখনো শুভ হতে পারে না। এতে উৎসন্নে যাবার পথ যখন-তখন খুলে যেতে পারে। গঙ্গানারায়ণের মনে পড়ে তার বন্ধু মধুর কথা। পিতা-মাতার অতিরিক্ত আদরে মধু ধরাকে সরা জ্ঞান করত। শেষ পর্যন্ত সেই মধুই পিতা-মাতার মনে চরম আঘাত দিয়ে গেল। কোথায় যে হারিয়ে গেছে মধু, তার সংবাদও এখন কেউ রাখে না। তার দুঃখিনী জননী কেঁদে কেঁদেই শেষ নিশ্বাস ফেললেন, আর তার ক্রোধোন্মত্ত পিতা আর একটি পুত্র সন্তানের আশায় পর পর আবার বিবাহ করে চললেন, শেষ পর্যন্ত বিফল মনোরথ হয়ে তিনিও ধরাধাম ত্যাগ করেছেন।

গঙ্গানারায়ণ যেন মধুর সঙ্গে তার ভাই নবীনকুমারের কিছু কিছু মিল খুঁজে পায়। নবীন যেন মধুরই মতন উদ্ধত আর জেদী, সেও যখন তখন কবিতা বা ছড়া আবৃত্তি করে। অবশ্য মধু ছিল বাল্যকাল থেকেই ফিরিঙ্গি-ঘেঁষা, ইংরেজী ছাড়া আর কোনো ভাষা তার মুখে আসত না সহজে, কিন্তু নবীন বেশী ভালোবাসে বাংলা ও সংস্কৃত। মাঝে মাঝে দু-একটি দৃশ্য দেখে গঙ্গানারায়ণ বিস্মিত হয়েছে।

দ্বিতলের একটি ছোট ছাদ নবীনকুমারের খেলার জন্য অতি প্রিয় স্থান। গঙ্গানারায়ণ দেখেছে, প্রায়ই নবীনকুমার সেখানে তার সর্বক্ষণের খেলার সঙ্গী দুলাল নামের ছেলেটিকে নিয়ে বসে থাকে। নবীনের সামনে এক থালা ভর্তি সন্দেশ। সে মুখে মুখে এক একটি ছড়া বা সংস্কৃত শ্লোক বলে দুলালকে জিজ্ঞেস করে, তুই পারবি বলতে? আমি দুবার বলচি, তিনবার বলচি, তুই যদি শুনে শুনে মুখস্থ বলতে পারিস, তোকে সন্দেশ দেব।

দুলাল চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। তখন নবীন এক একটা করে সন্দেশ ছুঁড়ে ছুঁড়ে কাকদের খাওয়ায়। সন্দেশের লোভে ছাদের আলসেতে অনেক কাক, চিল, পায়রা, শালিক এসে ভিড় জমায়। এমনকি বাড়ির পোষা বেড়াল মঞ্জুরীও গুটিসুটি মেরে বসে থাকে এক পাশে। এক একবার দুলাল খানিকটা বলার চেষ্টা করে, তখন নবীনকুমার একটি সন্দেশ তুলে তার মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বলে, আর একটু বল, আর একটু, তা হলেই সন্দেশ পাবি, এই যে দ্যাক, দেকে দেকে বল্...। দুলাল এর পর একটা শব্দ ভুল করে ফেলে আর নবীন অমনি সন্দেশটা দিয়ে দেয় বেড়ালটাকে। এমনি করে সব সন্দেশ ফুরিয়ে যায়।

সংস্কৃত শেখার এত আগ্রহ, তবু নবীনকুমারের জন্য সংস্কৃত পণ্ডিত প্রায়ই

বদল করতে হয়। শিক্ষককে নবীনকুমার একেবারেই গুরু হিসেবে মান্য করে না, প্রায়ই দুষ্টুমি করে পণ্ডিতের শিখা ধরে টানাটানি করে পর্যন্ত। এত বড় ধনী পরিবারে উত্তম দাক্ষিণায় শিক্ষকতা করার জন্য কোনো কোনো গুরু প্রাণপণে টিঁকে থাকে কিছুদিন, তারপর অতি কষ্টে একদিন সম্মান রক্ষার্থে পলায়ন করে।

একবার মহাল থেকে ফিরে এসে গঙ্গানারায়ণ শুনলো যে, নবীনকুমার নাকি একজন পণ্ডিতের টিকি কেটে নিয়েছে। বাড়ি ফেরা মাত্রই তার পত্নী ফিসফিস করে তাকে সম্পূর্ণ ঘটনাটা জানিয়ে দিল।

প্রতি বৎসরই পৌষ সংক্রান্তিতে বিম্ববতী সাড়ম্বরে এক ব্রত করেন, তাতে প্রচুর ধুমধাম হয়। সে সময় বিম্ববতী ব্রাহ্মণদের স্বর্ণ, বস্ত্র এবং তণ্ডুল দান করেন এবং প্রতি বৎসর একজন ব্রাহ্মণকে একটি গরুও দান করা হয়। এ বৎসর যে ব্রাহ্মণকে একটি নধর গো-বৎস দান করা হয়েছিল, সেই ব্রাহ্মণটি জোড়াসাঁকোর সিংহবাড়ি থেকে বেরিয়েই কিছু দূরে কলুটোলায় এক কসাইয়ের কাছে গো-বৎসটি বিক্রয় করে দেয়। দৈবাৎ সিংহবাড়ির দুজন ভৃত্য সেই ঘটনা দেখে ফেলে এবং দৌড়ে বাড়ি ফিরে এসে সবিস্তারে সেই কাহিনী বিম্ববতীর কাছে বর্ণনা করে। বিম্ববতীর কাছেই বসে ছিল নবীনকুমার, সে অমনি ভৃত্যদের হুকুম দেয় সেই ব্রাহ্মণকে ধরে আনতে।

ভৃত্যরা চিরকালই ধরে আনতে বললে বেঁধে আনতে চায়। সে ব্রাহ্মণ পালাবার পথ পেল না, ষণ্ডামার্কা দাসদের হাতে ধরা পড়ে তার অবস্থা সঙ্গিন হলো। সে এসে প্রথমে নানাপ্রকার মিথ্যে বলে মন ভেজাবার চেষ্টা করল বিম্ববতীর, কিন্তু ভৃত্যরা তুমুল কলরবে প্রতিবাদ জানালো তার কথার। তারা নিজের চক্ষে দেখে এসেছে যে কলুটোলার কসাই ইতিমধ্যেই সে গো-বৎসটিকে কোরবানি করে ফেলেছে।

তবু বিম্ববতী দয়া পরবশ হয়ে ব্রাহ্মণকে নিষ্কৃতি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখন নবীনকুমার পরিষ্কার কণ্ঠে দাবি জানায় যে ঐ ব্রাহ্মণের টিকি কেটে দিতে হবে। ঐ টিকি তার চাই। সে কাচ দিয়ে বাঁধিয়ে রাখবে। বিম্ববতী ক্ষীণ আপত্তি করলেন, ব্রাহ্মণের শিখা কর্তন করলে পাপ হয়, সে কথা জানালেন, কিন্তু নবীন-কুমার তা কিছুতেই মানবে না। ব্রাহ্মণের কাছে গরু হচ্ছে গো-মাতা, যে ব্রাহ্মণ গো-মাতাকে কসাইয়ের কাছে বিক্রি করে দিতে পারে, তার কোনো ব্রাহ্মণত্বের চিহ্ন রাখবার অধিকার নেই। দ্বাদশ বর্ষীয় বালক গম্ভীর কণ্ঠে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পরই কাঁদুনে গলায় মায়ের প্রতি আবদার করে বলে, মা, ওর টিকি আমি কাটবোই! আমি কাটবোই!

বিম্ববতী সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, আহা-হা, কাঁদিস না, কাঁদিস না!

প্রয়োজনে বিম্ববতী ছেলের জন্য আকাশের চাঁদও পেড়ে দিতে পারেন, আর এক ব্রাহ্মণের শিখা তো অতি সামান্য বস্তু। তিনি আর আপত্তি করলেন না। কয়েকজন মিলে সেই ব্রাহ্মণকে জোর করে চেপে ধরে রইলো, নবীনকুমার নিজে কাঁচি দিয়ে কচাৎ করে সেই ব্রাহ্মণের শিখা সমূলে নিপাত করে খলখল শব্দে হেসে উঠলো।

এই বৃত্তান্ত শুনে গঙ্গানারায়ণ রীতিমতন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। অশিক্ষিত, বাগাড়ম্বরপ্রিয় ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে তার নিজেরও খুব একটা শ্রদ্ধা নেই, তবে

ইদানীং সংস্কৃত সাহিত্যের রস গ্রহণ করতে শুরু করার পর সে যথার্থ সংস্কৃ
পণ্ডিতদের ভক্তি করে। একজন গরীব ব্রাহ্মণকে গো-বৎস দানের উপযোগিত
বা কী? গাভী কেউ দান করে না, সকলেই দেয় মদ্দা বাছুর। সে বাছুর একদি
বলীবর্দ হয়ে উঠবে, তখন গরীব ব্রাহ্মণ তাকে নিয়ে কী করবে? ব্রাহ্মণ তো আ
হালচাষে নামবে না, শুধু শুধু এক বলীবর্দের আহার জোগাড় করবেই বা কো
উপায়ে?

গঙ্গানারায়ণ শুনেছিল, কুড়ি বাইশ বৎসর আগে ডিরোজিও শিষ্য ইয়ং বেঙ্গলে
দল পথেঘাটে ব্রাহ্মণদের শিখা কেটে নেবার জন্য তাড়া করতো। কিন্তু তখ
কেউই শেষ পর্যন্ত কোনো ব্রাহ্মণের শিখা কাটেনি, আর নবীনকুমার এত অল
বয়েসেই এমন দুঃসাহস দেখালো? তাহলে যুবা অবস্থায় বা পূর্ণ বয়সে
আরও কত কী করবে? সে কোন্ পথে যাচ্ছে?

গঙ্গানারায়ণ আরও অবাক হলো এই ভেবে যে, বিধুশেখর এমন একটা কাণ
ঘটতে দিলেন? তাঁর অজান্তে তো এ বাড়িতে কোনো কিছুই ঘটা সম্ভব নয়
দেব-দ্বিজে বিধুশেখরের অসীম ভক্তি, তাঁর চোখে তো এ কাজ বিরাট অন্যায়।

সেদিনই অপরাহ্ণে নবীনকুমারের দেখা পেয়ে গঙ্গানারায়ণ প্রশ্ন করলো, ছোটক
তুই নাকি এক বামুনের টিকি কেটেচিস?

নবীনকুমার হাস্য ঝলমল মুখে বললো, গঙ্গাদাদা, তুমি তো এখুনো দেকোনি
আমি সকলকে ডেকে ডেকে দেকাই! এসো, আমার ঘরে এসো!

নবীনকুমার গঙ্গানারায়ণের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল নিজের কক্ষে। সত্যি
দেওয়ালে একটি কাচের ফ্রেমে বাঁধানো অবস্থায় সেই একগুচ্ছ শিখা ঝুলিে
রাখা হয়েছে।

গঙ্গানারায়ণ বললো, কী দস্যি ছেলে রে তুই? বামুনের টিকি কাটলি
তোর ভয় করলো না?

নবীনকুমার বললো, গঙ্গাদাদা, তুমি থাকলে আরও মজা হত। টিকি কাটা
পর সে বামুনটা মাথায় হাত দিয়ে তিড়িং তিড়িং করে লাপাতে লাগলো। আ
আমাদের এক ব্যাটা হিন্দুস্থানী দারোয়ান চেঁচিয়ে বললো, হায় রাম, চৈত
চুটকি খো গ্যয়া। হায় রাম।

কথা বলতে বলতে নবীনকুমার একেবারে হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলো
গঙ্গানারায়ণেরও ঠোঁটে স্মিত হাস্য এসে গেল, যদিও অন্তরে সে মৃদু অস্বস্তি
বোধ করছে। তার ধারণা, এই ধরনের কাজের ফলাফল সুদূরপ্রসারী হয়।

সে বললো, তুই যে এমন পাগলামি করলি ছোটকু, এর পর যদি কোনে
বামুন পণ্ডিত তোকে শিক্ষা দিতে না চায়? এবার তোর জন্য খুব নামকরা একজন
পণ্ডিত ঠিক করা হয়েচে।

নবীনকুমার বললো, আমি সেই পণ্ডিতমশাইকে বলিচি, আপনি যদি ন
আসেন, তাহলে পাইক পাঠিয়ে আপনাকেও ধরে এনে আপনারও টিকি কুচ
করে দোবো!

গঙ্গানারায়ণ বললেন, কী সাঙ্ঘাতিক কথা! অত বড় পণ্ডিতকে তুই এমন
করে বললি? তিনি কী উত্তর করলেন?

পণ্ডিতমশাই বললেন, তুমি উত্তম কাজই করেচো বাপু। আজকাল হাজারে
হাজারে নকল বামুন গজিয়েচে। তাদের এমনতর শাস্তিরই দরকার।

—দেকবি, নিউজ পেপারে এবারে আমাদের বাড়ি সম্পর্কে নানা কথা বেরুবে।

—বেরুক গে! কোন্ নিউজ পেপার লিকবে? তুমি সেই নিউজ পেপারটা কিনে নিও!

—ওরে বাস রে!

—তুমি বসো গঙ্গাদাদা, তুমি তো ছিলে নাকো, তাই তোমার জন্য আমি সব কথাগুলোন লিকে রেকিচি।

—কোন্ কথাগুলোন?

—সেদিন টিকি কাটার সময় যা হলো। তুমি বসো, আমি পড়ে শোনাই।

নবীনকুমার তার বইপত্রের মধ্য থেকে কয়েকটি আলগা কাগজ বার করলো। তাতে সুন্দর হস্তাক্ষরে বাংলায় অনেক কিছু লেখা! গঙ্গানারায়ণ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। এমন মুক্তার মতন হস্তাক্ষর কদাচিৎ দেখা যায়। সে আরও চমৎকৃত হয়ে গেল, যখন নবীনকুমার সেই রচনাটি পড়ে শোনালো। রচনার নাম, 'ব্রাহ্মণ হইল চাঁড়াল'। অতি জটিল শব্দসমন্বিত বিশুদ্ধ বাংলা।

গঙ্গানারায়ণ জিজ্ঞেস করলো, এ সব তুই নিজে লিকিচিস? না পণ্ডিতমশাই তোকে বলে দিয়েচেন?

নবীনকুমার বললো, আমি লিকিচি। আমি আরও কত লিকিচি। পণ্ডিতমশাই তো জানেই না। শুদু দুলালকে শুনিয়িচি, আর এই তোমায় শোনালুম।

—এমন তো আমি লিকতে পারি না রে, ছোটকু! বাংলা লিকতে গেলে আমার কলম ভেঙে যায়। তুই তো অতি সুন্দর লিকিচিস, এ লেকা তো বিদ্যেসাগর মশাইকে দেখানো দরকার। তোর পণ্ডিতমশাইকে বলিস।

—গঙ্গাদাদা, আমি গানও বাঁধতে পারি। দুটো বাংলা গান বেঁধেচি, শুনবে?

গঙ্গানারায়ণের বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। নবীনকুমার সত্যিই দুটি বাংলা গানও লিখেছে, যাতে ছন্দ ও মিল আছে রীতিমতন। গঙ্গানারায়ণের মনে হলো, তাহলে কি তার ভাইও মধুর মতন একজন কবি হবে? পোয়েট অ্যান্ড অথর। কবিরা বাল্য থেকেই এমন জেদী, খামখেয়ালি আর স্বতন্ত্রতাপরায়ণ হয়?

নবীনকুমারের বাংলা রচনা-শক্তি ও জ্ঞান দেখে গঙ্গানারায়ণ মুগ্ধ হলেও সে নিজে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত, তার মনে হয় যে ইংরেজী শিক্ষা না পেলে নবীনকুমারের মনের প্রসারতা বাড়বে না। ইওরোপের সাহিত্য ও দর্শনের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় না হলে আধুনিক পৃথিবীর অনেক কিছুই তার অজানা থাকবে।

সেইজন্য গঙ্গানারায়ণ একজন ইংরেজ শিক্ষককে নিযুক্ত করলো তার ছোট ভাইয়ের জন্য। এ ব্যাপারে বিধুশেখর প্রথমে একবার আপত্তি তুলেছিলেন। তাঁর আপত্তি সরাসরি ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে নয়, এখন সকলেই, এমনকি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাও ইংরেজী শিখছে, রাজভাষা শিক্ষা না করলে সমাজে স্থান পাওয়া যায় না, কিন্তু বিধুশেখর বললেন, বাড়িতে ম্লেচ্ছ ঢোকানো চলবে না। ইংরেজরা শুয়োর, গরু খায়, বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করেও জুতো খোলে না, কোনো হিন্দু গৃহে তারা প্রবেশ করলে সে বাড়ির পবিত্রতা নষ্ট হয়। এদিকে বিম্ববতী তাঁর পুত্রকে বাড়ির বাইরে পাঠাবেন না পড়াশুনোর জন্য। নবীনকুমারকে যদি ইংরেজী শেখাতেই হয়, তবে কোনো হিন্দু ভদ্রলোককে নিযুক্ত করা হোক না।

গঙ্গানারায়ণ রাতারাতি সিংহবাড়ির সংলগ্ন উদ্যানে একটি পাঠকক্ষ নির্মাণ করিয়ে ফেললো। গঙ্গানারায়ণের পিতা বেঁচে থাকতে এ বাড়িতে বিবাহাদি উৎসবে অনেক সময় ইংরেজরা নিমন্ত্রিত হয়েছে, তখন তাদের বসানো হয়েছে ঐ উদ্যানে শামিয়ানা খাটিয়ে। সুতরাং, উদ্যানের পাঠকক্ষে ইংরেজ শিক্ষক এসে অনায়াসে

নবীনকুমারকে পড়াতে পারবে।

মিঃ কার্ক প্যাট্রিক একজন মৃদু স্বভাবের মানুষ। অনেক ভাগ্যান্বেষী বেসরকারী ইংরেজের মতন সেও এ দেশে এসেছিল ব্যবসা বাণিজ্য করে লক্ষ্মীলাভ করতে। কিন্তু বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। সব কাজ সকলের জন্য নয়। কার্ক প্যাট্রিক অধিকাংশ সময়ই বই পড়ে কাটায়। তার সঙ্গে কথা বলে গঙ্গানারায়ণ বুঝেছিল যে লোকটির জ্ঞানের কৌতূহল অসীম, এমন একজনই নবীনকুমারের উপযুক্ত শিক্ষক হতে পারবে। যদি সে তার দুরন্তপনাকে কিছুটা বশ করতে পারে।

কিন্তু কার্ক প্যাট্রিক প্রায়ই অভিযোগ জানাতে লাগলো, গঙ্গানারায়ণের কাছে। একবার সে উড়িষ্যা সফরে গিয়েছিল, ফিরে এসে শুনলো যে কার্ক প্যাট্রিক কাজ ছেড়ে চলে গেছে। নবীনকুমারকে প্রশ্ন করে কোনো সদুত্তর পাওয়া গেল না। সে বললো, ও সাহেব তো পাগল! বিড়বিড় করে আপন মনে বকে। ও আবার পড়াবে কী!

শহরে ইংরেজ শিক্ষকের অভাব নেই। একজনের বদলে আরও দশ গণ্ডা পাওয়া যায়। কিন্তু কার্ক প্যাট্রিককে গঙ্গানারায়ণের পছন্দ হয়েছিল, সে কেন কাজ ছেড়ে গেল সেটা জানা দরকার। সে ডেকে পাঠালো কার্ক প্যাট্রিককে।

কার্ক প্যাট্রিক এলো এবং ঘণ্টাখানেক আলোচনা হলো তার সঙ্গে। সে মোটেই নবীনকুমারের ওপর রাগ করে কাজ ছেড়ে চলে যায়নি, বরং নবীনকুমার সম্পর্কে তার মনে অনেকখানি স্নেহ জন্মেছে। তার মতে, নবীনকুমারের মতন এমন মেধাবী ছাত্র অতি বিরল, অসাধারণ তীক্ষ্ন বুদ্ধি এই বালকের, এমন ছাত্রকে পড়িয়েও আনন্দ। কিন্তু এমন অদ্ভুত বালকও সে দেখেনি কখনো। এত অল্প বয়েস হলেও এই বালকের মধ্যে যেন স্পষ্ট দুটি সত্তা আছে। এক একদিন সে পড়াশুনোয় অত্যন্ত আগ্রহী, প্রায় শ্রুতিধরের মতন সে শিক্ষকের মুখ থেকে যা শোনে, পরক্ষণেই তা নিজে বলে দেয়। শিক্ষককে সে নানান প্রশ্ন করে বহু বিষয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেয়। আবার অন্য এক একদিন সে পড়াশুনো সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ বোধ করে না, শিক্ষকের সামনে ডিগবাজি খেয়ে নানা প্রকার কসরত দেখায় এবং ইচ্ছে করেই সে সব দিনে সে একটিও ইংরেজী শব্দ উচ্চারণ না করে বাংলায় নানান কথা বলে আর হাসে। সে সব দিনে বালকটিকে উন্মাদ বলে ভ্রম হয় কার্ক প্যাট্রিকের। এই জন্যই দিশেহারা হয়ে সে এ বাড়িতে আসা বন্ধ করেছে।

গঙ্গানারায়ণ অবিশ্বাস করলো না। অতি শৈশব থেকেই নবীনকুমারের আচরণে নানা রকম অস্বাভাবিক ব্যাপার দেখা গেছে, সে জানে। কিন্তু হয়তো বা এই সব অস্বাভাবিকতাই প্রতিভার লক্ষণ। গঙ্গানারায়ণ সাহেবকে জিজ্ঞেস করলো, এর প্রতিবিধান কী? অন্য শিক্ষকদের সঙ্গেও নবীনকুমার এরকম ব্যবহার করে, কোন্ উপায়ে এর সুচারু শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়।

সাহেবের মতে, নবীনকুমারকে কোনো স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া উচিত। অন্যান্য অনেক বালকের সঙ্গে মিশলে, খানিকটা বাধ্যতামূলক শৃঙ্খলার মধ্যে পড়লে এর স্বভাব শুধরে যেতে পারে।

গঙ্গানারায়ণ তা জানে। কিন্তু তার মা যে কিছুতেই নবীনকে স্কুলে পাঠাতে চান না। নইলে তার কত সাধ ছিল, তার মতন নবীনও হিন্দু কলেজে পড়বে।

কয়েকদিন বাদে অপ্রত্যাশিতভাবে সেই সুযোগ এসে গেল। নবীনকুমার নিজেই এসে বললো, গঙ্গাদাদা, আমি কালেজে পড়বো। আমার আর বাড়ির মাস্টারদের ভালো লাগে না। পথ দিয়ে দেকি ছেলেরা বই খাতা নিয়ে কালেজে যায় আমিও ওরকম যাবো। তুমি মাকে বলো।

নবীনকুমার নিজে আবদার ধরলে তো আর কোনো কথাই নেই। বিম্ববতীর এতকালের আপত্তি একদিনে মুছে গেল। তিনি প্রথমে ক্ষীণভাবে একবার না বলতেই নবীনকুমার সকলের খাওয়া বন্ধ করেছিল। অমনি বিম্ববতী গঙ্গানারায়ণকে ডেকে বললেন, ও গঙ্গা, তুই ব্যবস্থা কর বাপু, ও যখন গোঁ ধরেচে একবার—। পুরুতমশাইকে বল একটা শুভ দিন দেখতে—

হিন্দু কলেজের বহু পুরোনো শিক্ষক এখনো গঙ্গানারায়ণকে চেনে। তার কয়েকজন বন্ধুও এখন ওখানে শিক্ষকতা করছে, সুতরাং ভাইকে ভর্তি করার জন্য তাকে কোনো বেগই পেতে হবে না। মফস্বল থেকে ফিরে গঙ্গানারায়ণ শুনেছে যে, হিন্দু কলেজ নিয়ে কিছু গোলমাল চলছে শহরে। কিছু গোঁড়া লোক হিন্দু কলেজ থেকে বেরিয়ে এসে একটা পাল্টা নতুন কলেজ খুলেছে। তা হোক। গঙ্গানারায়ণ তার নিজের পুরোনো কলেজেই ভর্তি করবে ভাইকে। সারা দেশে হিন্দু কলেজের মতন এমন বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান আর আছে নাকি?

ওস্তাগর ডেকে নবীনকুমারের জন্য ইংরেজী ফ্যাসানের পোশাক তৈরি করানো হয়েছে। একটা পৃথক জুড়িগাড়ি এবং দুজন ভৃত্যকে ঠিক করা হয়েছে, তারা প্রতিদিন নবীনকুমারকে কলেজে নিয়ে যাবে ও নিয়ে আসবে।

ভর্তি হবার আগের দিন বিকেলে এলেন বিধুশেখর। সিঁড়ির মুখে গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে দেখা। গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন, তোমরা নাকি নবীনকে হিন্দু কলেজে ভর্তি কচ্চো? আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজনীয়তাও মনে করোনি?

উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে তিনি ধীর পদে উঠে গেলেন দ্বিতলে। বিম্ববতীর কক্ষের সামনে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তিনি ঐ একই বাক্য দুটি উচ্চারণ করলেন। তারপর ভিতরে ঢুকে দু' পা এগিয়ে তিনি আবার বললেন, ওসব হবে না। নবীন কালেজে যাবে না। বাড়িতে যেমন পড়চে পড়ুক।

বিম্ববতী বললেন, খোকা যে কাঁদাকাটা করবে। খুব বায়না ধরেচে।

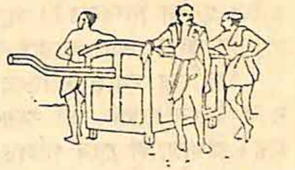
বিধুশেখর রুক্ষ স্বরে বললেন, কাঁদুক। দু' দিনে আবার থেমে যাবে। হিন্দু কালেজ এখন নষ্টামির কালেজ। সেখানে বেশ্যার ছেলে পড়ে। সেখানে এ বাড়ির ছেলেকে পড়াতে পাঠাবে? এসব গঙ্গার বুদ্ধি? বংশমর্যাদা বোঝার ক্ষমতা তার নেই! বেশ্যার ছেলের পাশে বসবে সিংহী বাড়ির ছেলে!

একটু থেমে, বিম্ববতীর মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বিধুশেখর আবার বললেন, খোকাকে মানুষ করার ভার কি শুধু একা তোমার? আমার মতামতের বুঝি কোনো মূল্য নেই?

বিম্ববতী সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠে দারুণ ভয়ার্তভাবে বললেন, না, না, আপনি যা বলবেন, তাই হবে।

একটু পরে, বিম্ববতীর ঘর থেকে ফেরার পথে বিধুশেখর আবার নিজেই গঙ্গানারায়ণকে ডেকে বললেন, নবীন কালেজে যাবে না। সে তেরো বচরে পড়লো, আমি ঠিক করিচি, এ বচরেই তার বিয়ে দেবো। পাত্রী আমার পছন্দ করা হয়ে গ্যাচে।

এবারও গঙ্গানারায়ণের কোনো উত্তর শোনার জন্য অপেক্ষা না করে বিধুশেখর চলে গেলেন বাইরে।



নবীনকুমারের বিবাহে যেমন জাঁক হলো, তার তুল্য কিছু সাম্প্রতিক কালের কলকাতায় আর ঘটেনি। এ শহরে রাজা মহারাজাদের অন্ত নেই, তা ছাড়া নতুন কালের শ্রেষ্ঠী যারা, তাদেরও অতুল ধনসম্পদ। দত্ত, মল্লিক, দেব, শীল, সরকার, ঘোষাল—এই সব এক একটি পরিবারে শ্রাদ্ধ, বিবাহে প্রচুর ধুমধাম আর টাকার ছড়াছড়ি হয় বটে, কিন্তু পরলোকগত রামকমল সিংহের বিধবা পত্নী বিম্ববতী একেবারে সকলকে টেক্কা মেরে গেলেন। লোকে বলাবলি করতে লাগলো, রামকমল সিংগী বেঁচে নেই, তাতেও এত জোস্, আর তিনি বেঁচে থাকলে না জানি আরও কী হতো! লোকে আরও বললো, হ্যাঁ, একেই বলে সোদরোপম বন্ধু! নাবালকের সম্পত্তি চিরকাল বার ভূতে লুটে খায়, আর বিধু মুখুজ্যে তাঁর বন্ধুর নাবালক পুত্রের সম্পত্তি যেন চার গুণ বাড়িয়ে দিয়েচেন।

নবীনকুমারের বিবাহ হলো বাগবাজারে। বর যখন শোভাযাত্রা করে যায়, তখন তাকে দেখবার জন্য শহর সুদ্ধ লোক যেন ভেঙে পড়েছিল। জুড়িগাড়ির বদলে বর গিয়েছিল অশ্বারোহণে, তার জন্য একটা বিশেষ পোশাক তৈরি করানো হয়েছিল, যাতে সাচ্চা হীরা-মোতি-চুনী-পান্নার ঝালর, মাথায় উষ্ণীব, আর কোমরবন্ধের তলোয়ারের খাপে সোনার কাজ করা। ত্রয়োদশ বর্ষের কিশোর নবীনকুমারের সে কি রূপ, যেন তাকে স্বপ্নের দেশের রাজকুমার বলে বোধ হয়।

বিবাহ উপলক্ষে বাই নাচ হয়েছিল সাত দিন ধরে। ইদানীংকালের কেতা অনুযায়ী সাহেব-বিবি এবং দেশীয় ব্যক্তিদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দিনে। নিমন্ত্রিতদের প্রত্যেকের কাছে পত্রের সংগে পাঠানো হয়েছিল পিতলের ঘড়া বা থালা, অথবা কাশ্মীরী শাল বা কাশীর বস্ত্র অথবা রৌপ্য বাঁধানো শংখ ও লোহা। সকল সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপা হলো নবীনকুমারের বিবাহের উৎসবের বর্ণনা।

এত বড় অনুষ্ঠানে গংগানারায়ণের কোনো ভূমিকাই ছিল না, ব্যবস্থাপনার সমস্ত দায়িত্ব বিধুশেখর নিজের হাতে রেখেছিলেন। তিনি কোনো বিষয়েই গংগানারায়ণের সংগে একবারও পরামর্শ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি, প্রকাশ্যেই তিনি গংগানারায়ণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন।

গংগানারায়ণ বাল্যবিবাহের ঘোর বিরোধী, সে নিজে এরকম বিবাহে বাধ্য হয়েছিল বটে, কিন্তু সে চেয়েছিল, তার আদরের ছোট ভাইটি লেখাপড়া শিখে উপযুক্ত হয়ে উঠে যখন ভালো মন্দ বিচারে পারংগম হবে, তখনই তার বিবাহ দেওয়া ঠিক হবে। বাল্যবিবাহরূপ কুপ্রথা এ দেশের অনেক দুর্দশার হেতু।

এ ব্যাপারে গংগানারায়ণ প্রথমে জননী বিম্ববতীকে বোঝাতে গিয়েছিল। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। গংগানারায়ণের সমস্ত কথার উত্তরে উনি শুধু বিধুশেখরের ওপর বরাত দিয়ে বলেছিলেন, উনি যা ভালো বোঝেন তাই করবেন, তুই আর অমত করিসনি, গংগা। উনি তো নবীনের অহিত চাইবেন না!

গংগানারায়ণ কিছুতেই বুঝতে পারেনি, বিধুশেখরের এতখানি জোরের কারণ কী। কলেজে পড়া বন্ধ হওয়ায় নবীনকুমার উন্মাদের মতন কান্নাকাটি করেছে, দুদিন কিছুই খায়নি, তবু বিধুশেখরের মত অগ্রাহ্য করে পুত্রকে কলেজে পাঠাতে

রাজি হননি বিম্ববতী। পুত্র-অন্ত প্রাণ যে বিম্ববতীর, তিনিও বিধুশেখরের ভয়ে পুত্রের ক্রন্দন সহ্য করেছেন।

সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বিধুশেখর রূঢ় ভাষায় গঙ্গানারায়ণকে যে কথাগুলি বলে গিয়েছিলেন, তা স্মরণ করলে এখনো ক্রোধে গঙ্গানারায়ণের শরীর কম্পিত হয়। কথাগুলি যেন গলিত লাভার মতন তার কর্ণে প্রবেশ করেছিল। সেইক্ষণেই সে শপথ নিয়েছিল, এবার সে ঐ বৃদ্ধের দর্প ভাঙবেই। বিম্ববতী যতই বিধুশেখরের পক্ষ সমর্থন করুন, নবীনকুমারকে সে তার নিজের দিকে পাবে। তার ছোট ভাই তার কথা মান্য করে। নবীনকুমার জেদ ধরলে তার অন্যথা করার সাধ্য বিধুশেখরেরও নেই। নবীনকুমার বিধুশেখরকে ভয় পায় না একটুও।

কিন্তু অতীব আশ্চর্যের বিষয়, নবীনকুমার কলেজে যেতে না পারার জন্য কাঁদা-কাটা করলেও বিবাহের প্রস্তাবে এক কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিল। ঐটুকু বালকের বিবাহের জন্য কী আগ্রহ! বস্তুত বিবাহ প্রসঙ্গ এসে পড়াতেই সে কলেজে না-যাবার দুঃখ ভুলে গেল। গঙ্গানারায়ণ জিজ্ঞেস করেছিল, ছোটকু, তুই এরই মধ্যে বে করবি? তুই বে'র কি বুঝিস?

নবীনকুমার বিজ্ঞ ভঙ্গিতে বলেছিল, হ্যাঁ দাদা, আমি রাধাকে বে কর্বো।

গঙ্গানারায়ণ বিস্মিত হয়ে বলেছিল, রাধা? রাধা কে?

নবীনকুমার বলেছিল, আমি তো কেষ্টঠাকুর। তাই রাধা আমার বউ হবে। বেশ মজা হবে, আমি রাধার সঙ্গে বাগানে নুকোচুরি খেলবো। গঙ্গাদাদা, জানো, আমি বাঁশী বাজাতে পারি!

বাগবাজারের যে পাত্রীটি বিধুশেখর পছন্দ করে রেখেছিলেন, তার নাম রাধা নয় অবশ্য, বরং তার থেকে এক কাঠি ওপরে, সে মেয়েটির নাম কৃষ্ণভামিনী। এ নামের অর্থ নবীনকুমারকে বোঝাতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয়নি, সে একেবারে আহ্লাদে ডগমগ।

ঐ বিবাহের কিয়ৎদিবস পরে গঙ্গানারায়ণ আবার মহাল পরিদর্শনে যাওয়া মনস্থ করলো। নীলচাষীদের অসন্তোষ নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। অবিলম্বে এর কিছু বিহিত না করলে অবিলম্বে একটা গুরুতর হাঙ্গামা শুরু হয়ে যেতে পারে। নীলচাষীরা তাদের অসহায় অবস্থা দূর করার জন্য জমিদারদের সাহায্য প্রার্থনা করছে, কিন্তু জমিদাররাও কুঠিয়াল সাহেবদের কাছে পর্যুদস্ত। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও মফস্বল আদালতে কুঠিয়াল সাহেবদের অপরাধের বিচার করার কোনো ব্যবস্থা সরকার মেনে নিলেন না। ফলে মফস্বলে কুঠিয়াল সাহেবগণ অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ, এমনকি মানুষ খুন করেও নিষ্কৃতি পেয়ে যায়। আর চাবুক মারার ঘটনা তো অহরহই ঘটছে। হাতে চাবুক নেই এমন কোনো নীলকর সাহেবের চেহারা কল্পনাও করা যায় না।

গঙ্গানারায়ণ অকুস্থলে গিয়ে যে কিছু ব্যবস্থা করতে পারবে, তার কোনো ভরসা নেই, আবার না গেলেও মহালগুলি চিরতরে হাতছাড়া হয়ে যাবার সম্ভাবনা। বিধুশেখর নিজে কখনো বাইরে যান না, তাই এই দায়িত্ব তার ওপরে দেওয়া ছিল। গঙ্গানারায়ণেরও কলকাতার বাড়িতে মন টিঁকছে না। নবীনকুমারের বিবাহের পর বাড়িতে এখনো বহু আত্মীয়স্বজনের ভিড়, সকলেই নতুন বর-বধূকে নিয়ে মত্ত। গঙ্গানারায়ণ সেই মত্ততায় যোগ দিতে পারেনি বলে তার প্রতিও কেউ মনোযোগ দেয় না। সে যেন নিজগৃহে পরবাসী। যথারীতি নবীনকুমারের পত্নী কৃষ্ণভামিনীও

এক অষ্টমবর্ষীয়া অক্ষরজ্ঞানহীনা বালিকা। দেশে ও সমাজে যে একটা নতুন পরিবর্তনের প্রবাহ এসেছে, সে সম্পর্কে এ বাড়ির সকলেই অচেতন। এটা যেন গঙ্গানারায়ণের কিছুতে সহ্য হয় না।

তার স্ত্রী লীলাবতীকেও সে আপন মনের মতন করে গড়ে নেবার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। লীলাবতীকে সে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করেছিল, হলো না। লীলাবতী কোনো মেমবিবির কাছে পড়বে না। বাইরের কোনো পুরুষ-মানুষ, তা তিনি যত বৃদ্ধই হোন, তাঁর সামনেও মুখ খুলবে না লীলাবতী। তখন গঙ্গানারায়ণ ধৈর্য ধরে নিজে সময় ব্যয় করে লীলাবতীকে পড়াতে চেয়েছে, লীলাবতী তাতেও কান্নাকাটি করে বলেছে, ওগো, আমার মাতা নেই, তুমি রাগ করোনিকো, আমার ওসব হবে না। ছাগল দিয়ে কি হাল চাষ হয়!

যে-স্ত্রীলোক নিজেই নিজেকে ছাগলের সঙ্গে তুলনা দেয়, তার সঙ্গে মানুষ হয়ে গঙ্গানারায়ণ আর কতকাল একসঙ্গে বাস করতে পারবে!

এমনকি নবীনকুমারকেও গঙ্গানারায়ণ বলেছিল, ছোটকু, তোর বউঠানকে মাঝে মধ্যে একটু পড়াবি তো। পড়ায় মন না বসলে বকবি! নবীনকুমার মহোৎসাহে কয়েকদিন পড়াতে বসেছিল লীলাবতীকে। তার ফল শুভ হয়নি। নবীনকুমার আর লীলাবতীর বয়সের ব্যবধান বেশী নয়, লীলাবতী মাত্র দু বৎসরের বড়। প্রায়ই দেখা গেল, তারা হাতাহাতি, চুলোচুলি করছে। শেষে বিম্ববতীই আদেশ দিয়েছেন, দুজনের আর একসঙ্গে পড়তে বসার প্রয়োজন নেই।

বিদ্যার্জনে না হয় আগ্রহ নাই-ই থাকলো, স্বামীর মন বোঝার কিংবা স্বামীকে সঙ্গ দেবার ব্যাপারেও তার কোনো আগ্রহ নেই। লীলাবতী ভাবে, শুধু রাত্রে স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হওয়াতেই নারী জন্মের সার্থকতা। তাতেই সে তৃপ্ত। তার বয়সী অনেক মেয়েই এমন সুযোগও পায় না। লীলাবতী তার মা-দিদিমা-মাসী-পিসীদের জীবন থেকে এই ধারণাই গড়ে নিয়েছে যে বাড়ির কর্তাদের সঙ্গে বাড়ির বউদের দেখাশুনো হবে খুবই কম, নানান কাজে কম্মে কর্তারা প্রায়ই বাড়ির বাইরে রাত কাটাবেন। মাসের পর মাস দেখা না হওয়াটাও আশ্চর্য কিছু নয়। দূরত্ব ও দুর্লভতার কারণেই পতিকে দেবতার মতন সম্মান করতে হয়। গঙ্গানারায়ণ যে লীলাবতীকে প্রতিদিন অনেকক্ষণ ধরে কাছে পেতে চেয়েছে, তার বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের অনেক কথা উজাড় করে দিতে চেয়েছে, তাতে যেন কিছুতেই লীলাবতী স্বস্তি বোধ করেনি, কথার মাঝখানে তার চক্ষে ফুটে উঠেছে চাঞ্চল্য। স্বামীর এরকম ব্যবহার তার কাছে স্বাভাবিক মনে হয় না। সে যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

এমনকি গঙ্গানারায়ণ যখন মহাল পরিদর্শনে যায়, তখনও লীলাবতী তার সঙ্গিনী হতে চায় না। গঙ্গানারায়ণ তার বোটে লীলাবতীকে নিয়ে গেছে দু-একবার, সে উপভোগ করেনি। বাইরের পৃথিবীকে সে একটা ভয়ের স্থান বলে বিবেচনা করে। সন্ধের পর সে একটি সামান্য ছিপ নৌকোকেও মনে করে ডাকাতের নৌকো, খালি-গায়ে যে-কোনো অচেনা মনুষ্যকেই সে মনে করে দুর্বৃত্ত। আর পথে-ঘাটে খালি গায়ে মানুষই বেশী। বর্ষার নদী কিংবা দুপুরের বৃক্ষরাজি কিংবা আকাশে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের গায়ে উড়ন্ত বলাকার দৃশ্যও তাকে মুগ্ধ করে না। গঙ্গানারায়ণ লীলাবতীকে দেখে বুঝেছে যে প্রকৃতির রূপ অবলোকন ও তারিফ করার জন্যও মানসিক শিক্ষার প্রয়োজন। বহু শতাব্দী ধরে যারা মুক্তির স্বাদ পায়নি, তারা তো মুক্তির মর্মই ভুলে গেছে। গঙ্গানারায়ণ অবশ্য এমন নির্লিপ্তভাবে বিষয়টি সব সময় দেখতে পারে না, প্রায়ই তার অভিমান হয়।

এবারও গঙ্গানারায়ণ একাই বেরিয়ে পড়লো। ইব্রাহিমপুর পরগনায় বিশেষ গোলযোগের সংবাদ এসেছে, তার গন্তব্য সেই দিকে। এবার তার হৃদয় খুব ভারাক্রান্ত। অথচ বিশেষ চিন্তা বা উদ্বেগ যে রয়েছে তা নয়, বরং কোনো চিন্তাই যেন দানা বাঁধছে না। চিন্তাহীনতাও যে মনের ভার বৃদ্ধি করে, তা এই সব সময়ে বোঝা যায়। সে যেন তার জীবনের উদ্দেশ্যই হারিয়ে ফেলেছে। সংসারের প্রতি কোনো বন্ধন তার নেই, অথচ সংসারের বাইরে বৃহৎ কোনো কর্মকাণ্ডেও সে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারছে না। শিক্ষা, ধর্মসংস্কার, সাহিত্য-সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারে দেশে নিত্য নতুন নতুন আন্দোলন দেখা দিচ্ছে। এবং এই সব মিলিয়ে আস্তে আস্তে গড়ে উঠছে এক রকমের জাতীয়তাবোধ। গঙ্গানারায়ণ এসব টের পায়, কিন্তু সে যেন শুধু দর্শক, সে অংশগ্রহণকারী নয়। এজন্য সে নিজেকে এক এক সময় তিরস্কার করে, তবু কিছুতেই সে নিজের অন্তর্মুখী স্বভাবটা বদলাতে পারে না।

বিধুশেখরের কাছে সে পরাজিত হয়ে গেছে। বিম্ববতী তাঁকে জমিদারী পরিচালনার ব্যাপারে নিজের প্রতিনিধি করে রেখেছেন। কিন্তু জমিদারী বা ব্যবসায়ের ব্যাপারে সে কোনো পরিবর্তন আনতে গেলে বিধুশেখর মাঝে মাঝে হস্তক্ষেপ করেন। গঙ্গানারায়ণ দশটি প্রস্তাব আনলে চার পাঁচটিতে বিধুশেখর সম্মতি জানিয়ে বাকিগুলি সম্পর্কে গম্ভীরভাবে মস্তক নেড়ে বলেন, না, এটা কল্যাণকর হবে না, কিংবা, না, এটা বাপু এ বংশের মর্যাদার উপযুক্ত হবে না। ব্যাপারটার মধ্যে এমন সূক্ষ্ম চতুরতা আছে যে, তা শুধু গঙ্গানারায়ণের চক্ষেই ধরা পড়ে। অকিঞ্চিৎকর বা অতি সাধারণ বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্মতি জানিয়ে বিধুশেখর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলিতে নিজের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখেন। এতে বিম্ববতী মনে করেন যে গঙ্গানারায়ণের অর্ধেক প্রস্তাব তো বিধুশেখর গ্রহণ করেছেনই, বাকিগুলি সম্পর্কে পরামর্শ দেবার মতন অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও পারিবারিক অধিকার বিধুশেখরের অবশ্যই আছে।

গঙ্গানারায়ণ জানে যে এই বিশাল সম্পত্তির সে মালিক নয়, সে তার ভ্রাতা ও জননীর স্বার্থরক্ষার কারণেই নিজেকে এর সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে। কিন্তু সে যদি তার অধিকার প্রয়োগ করতে না পারে, প্রয়োজন অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিতে বাধা পায়, তাহলে তো তার ভূমিকা একজন সাধারণ কর্মচারীর মতন। তবু গঙ্গানারায়ণ এই কয়েক বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছিল যে, কোনো না কোনো উপায়ে সে এক সময় বিধুশেখরের মৌরুসীপাট্টা ভাঙবেই। কিন্তু কয়েকমাস আগে বিধুশেখর সিঁড়ির পাশে তাকে বললেন, আমি বলচি, নবীনকুমার কালেজে যাবে না, আমি শীঘ্রই বিবাহ দেব তার—এবং কথাগুলি ঠিক অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হলো, এর ফলেই গঙ্গানারায়ণের মন যেন একেবারে ভেঙে গেছে। বিধুশেখর তাকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করেন এবং বিম্ববতীর কাছে বিধুশেখরের আদেশই ধ্রুব।

প্রজারা গঙ্গানারায়ণকে জমিদার জ্ঞানে সম্ভ্রম করে, কিন্তু গঙ্গানারায়ণ প্রকৃত-পক্ষে তো জমিদার নয়, সে সিংহবাড়ির সন্তানও নয়। গঙ্গানারায়ণ এ পৃথিবীর কেউ নয়।

ইব্রাহিমপুর পরগনার ব্যাপার বিশেষ জটিল। রামকমল সিংহের আমলেই এখানে তাদের নিজস্ব একটি নীলকুঠি ছিল। নীল চাষে লাভ যথেষ্ট। তবে কয়েক বছর ধরে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। অদূরেই সাহেবরা আর একটি কুঠি

স্থাপন করেছে এবং জমি ইজারা নিয়ে রায়তদের দিয়ে জোর জুলুম করে নীল চাষ করাচ্ছে। চাষীরা আজকাল তাদের উৎপাদিত নীলের ন্যায্য দাম পায় না, সাহেব কুঠিয়ালের কাছেই তদের সব ফসল বিক্রি করতে হয়। মূল্যের ব্যাপারেও সাহেবদের কথাই চূড়ান্ত। এখন আবার মূল্যের প্রশ্নও নেই। সাহেবগণ বিঘা প্রতি দু টাকা করে দাদন দিচ্ছে চাষীদের, তারপর উৎপন্ন সব ফসলই তাদের। যে রায়ত দাদন নিতে অস্বীকার করে তাকে ধরে এনে প্রহারে প্রহারে আধমরা করার পর কাগজে আঙুলের ছাপ দেওয়ানো হয়। সেই দু টাকার দাদন তার আর ইহজীবনে শোধ হবে না।

চাষীদের দুর্দশা দেখে কয়েক বৎসর আগে গঙ্গানারায়ণ ঠিক করেছিল যে নীল চাষের বদলে সে চাষীদের আবার ধান চাষে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

কিন্তু বিধুশেখর তাতে বাধা দিয়েছেন। বিধুশেখরের বক্তব্য ছিল এই যে, জলে বাস করে যেমন কুমীরের সঙ্গে লড়াই করা যায় না, সেরকমই কোনো রাজার রাজত্বে বাস করে রাজবংশীয় লোকেদের সঙ্গে বিবাদ করে প্রাণ বাঁচানো যায় না। সাহেবরা যখন নীলকুঠি স্থাপন করেছে, তখন সন্নিহিত জমিতে সোনার ধান ফলতে দেখলে তাদের চক্ষু জুড়োবে না। বরং চীনা ড্রাগনের মতন তাদের মুখ দিয়ে আগুন নির্গত হবে এবং সেই আগুনে ধান ক্ষেত ছারখার হয়ে যাবে।

বিধুশেখরের নির্দেশে ইব্রাহিমপুর পরগনার জমিদারীর অর্ধেক নীলকর সাহেবদের ইজারা দিয়ে দেওয়া হলো। সমগ্র জমিই ছাড়া হয়নি, তার কারণ এখানকার কিছু জমিতে খুব ভালো ইক্ষু চাষ হয়, কয়েকজন চায়নাম্যান একটি চিনিকলও স্থাপন করেছে, আর চিনি বিক্রি হয় প্রায় সোনার দামে। কিন্তু সাহেবদের কাছে অর্ধেক জমি ইজারা দিয়েও সমস্যার সমাধান হয়নি। ম্যাকগ্রেগর নামে এক কুঠিয়ালের অত্যাচারে প্রজাদের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ম্যাকগ্রেগরের চাবুকের নাম শ্যামচাঁদ, সেই শ্যামচাঁদ একবার যার পিঠে পড়ে জন্মের মতন তার শিরদাঁড়া বেঁকে যায়। এ বছর খরার কারণে ফসল ভালো হয়নি বলে ম্যাকগ্রেগর ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। এসব রায়তদেরই কারসাজি মনে করে সে গ্রামের ভেতর ঢুকে প্রতিদিন বাড়িঘর তছনছ করে। প্রাণভয়ে ভীত প্রজারা দলে দলে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে সাহেবের এলাকার বাইরে, তবু সেখানেও নিস্তার নেই। ম্যাকগ্রেগর এলাকা মানে না, তার ঘোড়া যতদূর ছুটতে পারে, ততদূরই সে যেতে রাজি। বড় রকমের ঝঞ্ঝাটের আশঙ্কায় চায়নাম্যানরা চিনিকল বন্ধ রেখে চলে গেছে এখান থেকে।

গঙ্গানারায়ণের পিনিস বজরা নদীর ঘাটে এসে ভেড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক দুই করে প্রজারা এসে হাজির হতে লাগলো। বজরার আগমন বার্তা অনেক আগে থেকেই রটে যায়। ইজারা দেওয়া তালুকের প্রজারা এসে কেঁদে পড়লো গঙ্গানারায়ণের পায়ে। বংশানুক্রমিকভাবে তারা জমিদারকেই রক্ষাকর্তা বলে জেনে এসেছে। দেশের রাজা কে, সে খবর তারা রাখে না। খাজনা বাকি পড়লে জমিদারের প্যায়দা গোমস্তারা মারধোর করে, সেটাও জমিদারের অধিকারের মধ্যে পড়ে। আবার আপদে বিপদে জমিদারের চরণেই আশ্রয় নিতে হয়।

গঙ্গানারায়ণ উদাসীনভাবে সব কথা শুনে যেতে লাগলো। বিভিন্ন জনের কথায় কুঠিয়াল ম্যাকগ্রেগরের যে চরিত্র ফুটে উঠছে, তাতে তাকে দানব বলেই প্রতীয়মান হয়। অনেকেরই পিঠে, বুকে, মুখে ম্যাকগ্রেগরের হাতের শ্যামচাঁদের ক্ষতচিহ্ন। অনেকে গৃহহীন।

গঙ্গানারায়ণের মনে হলো, ইজারা দেওয়া তালুকের প্রজাদের সম্পর্কে তার করণীয় কিছু নেই। জমির সঙ্গে সঙ্গে সেই জমি-নির্ভর মানুষদেরও ইজারা দেওয়া হয়ে গেছে। ইজারাদারই সেই জমি ও মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। যদিও সেইসব প্রজারা এখনো জমিদারকেই তাদের প্রভু মনে করছে। কিন্তু আইন একথা মানবে না। আর তাদের খাস তালুকের প্রজাদের ওপরেও যে অত্যাচার চলছে, তার প্রতিবিধান করতে গেলেও কোনো না কোনোভাবে আইনেরই আশ্রয় নিতে হবে। সাহেব জাতির বিরুদ্ধে তো আর পাইক লাঠিয়াল নিয়ে যুদ্ধ করতে যাওয়া যায় না। মামলা মোকদ্দমার বিষয় বিধুশেখরই ভালো বুঝবেন।

গঙ্গানারায়ণের মন বিবশ হয়েছিল, প্রজাদের দুঃখ দুর্দশার কাহিনী শুনতে শুনতে আস্তে আস্তে তার জড়তা কাটতে লাগলো। সবচেয়ে সে বিচলিত হলো জামালুদ্দীন শেখের ঘটনা শুনে। জামালুদ্দীনের বিবি হানিফাকে কয়েকদিন ধরে পাওয়া যাচ্ছে না, সকলের ধারণা নীলকুঠিতেই তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ম্যাকগ্রেগরের কয়েকজন দেশী কর্মচারী আছে, তাদের মধ্যে গোলক দাস নামে একজন একেবারে সাক্ষাৎ শয়তান, সে ঐ সাহেবের সকল অপকর্মের দোসর। ঐ গোলক দাসের চোখ পড়েছিল হানিফা বিবির ওপর, সে-ই তাকে নিশ্চয়ই তুলে দিয়েছে সাহেবের হাতে। হানিফা বিবি দুদিন ধরে বেপাত্তা বলে জামালুদ্দীন শেখ নিজে গিয়েছিল নীলকুঠিতে খবর নিতে, তারপর থেকে জামালুদ্দীনও আর ফেরেনি। নীলকুঠিতে মাটির নীচে একটা ঘর আছে, সেখানে নিশ্চয়ই আটক করে রেখেছে জামালুদ্দীনকে। কিংবা তাকে এতক্ষণে খুন করে ফেলাও বিচিত্র নয়। ঐ নীলকুঠিতে যাবার সাহস আর কারুর নেই, একমাত্র গঙ্গানারায়ণ যদি কোনো ব্যবস্থা করতে পারে। হাজার হোক গঙ্গানারায়ণ জমিদার, নীলকুঠির সাহেব তার মান রেখে কথা বলবে অন্তত।

জামালুদ্দীন শেখকে চেনে গঙ্গানারায়ণ। অত্যন্ত বলিষ্ঠকায় পুরুষ, তার চেহারা ভিড়ের মধ্যেও চোখে পড়ে, সে এখানে একজন মোড়ল গোছের, কথাবার্তার ভঙ্গি গোঁয়ারের মতন, যদিও গঙ্গানারায়ণ বুঝেছিল যে জামালুদ্দীন মানুষটা অতি সরল। সেই জলজ্যান্ত মানুষটা অদৃশ্য!

জামালুদ্দীনের বৃদ্ধ পিতার দু' চোখে ছানি, সামনাসামনি খোলা চোখে চেয়ে থাকে কিন্তু হাত নাড়ে অন্ধের মতন। সে বললো, মুই তোমার গোলাম হইত গো রাজাবাবু, তুমি মোর ছাওয়ালডারে ছামিল কইরা দিতা না?

গঙ্গানারায়ণ বললে, তোমরা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে খবর দাওনি? এর বিহিত তো তিনিই করতে পারেন। তোমরা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে দরবার করো গে যাও!

এর উত্তরে সবাই সমস্বরে গোলমাল করে যা বললো, তার মর্মার্থ এই যে, তারা 'ম্যাজিস্টর' সাহেবের ওপর কোনোই ভরসা রাখে না। তাকে তারা জুজুর মতন ভয় পায়। তিনি এই নীলকুঠির 'ম্যাক গরগর' সাহেবের কুটুম্ব, 'ম্যাজিস্টর' যখন এ তল্লাটে আসেন, তখন তিনি আস্তানা নেন ঐ নীলকুঠিতেই এবং কুঠিয়ালদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে হাত ঝাঁকাঝাঁকি করেন। ম্যাক গরগর সাহেবের হাতি আছে, বাঘের মতন বড় বড় পোষা কুকুর আছে, সেই হাতির পিঠে চড়ে কুকুরগুলো সঙ্গে নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট বাঘ শিকারে গিয়েছিলেন এই তো কয়েক মাস আগে। সুতরাং সেই ম্যাজিস্ট্রেট কি এই ম্যাকগ্রেগর সাহেবের বিরুদ্ধে কোনো

নালিশ শুনবেন?

গঙ্গানারায়ণ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চলো, আমি যাচ্ছি।

গঙ্গানারায়ণ তখুনি পিনিস থেকে নামতে উদ্যত হতেই তার স্থানীয় সরকার বললো, সেকি, আপনি কোথায় চললেন, হুজুর? ম্যাকগ্রেগর একেবারে কাঁচাখেগো দেবতা, ও বর্বর মানীর মান রাখতে জানে না। আপনি জানেন না।

গঙ্গানারায়ণ কোনো উত্তর না দিয়ে নেমে যাচ্ছিল, তখন তার নিজস্ব খাজাঞ্চি বৃদ্ধ অক্ষয় সেন বললেন, বাবু, যাবার আগে আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ আচে, এক দণ্ড অপিক্ষে করে যান।

দিবাকরকে পছন্দ করে না গঙ্গানারায়ণ, তাকে সে কর্মচ্যুত করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু বিধুশেখরের জন্য পারেনি। তবে দিবাকরকে সে আর মফস্বলে আসবার সময় সঙ্গে নেয় না, তার বদলে এই অক্ষয় সেন মানুষটি অনেক ধীর স্থির, এঁর পরামর্শের মূল্য আছে।

ভিতরের একটি কক্ষে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাজাঞ্চি নিভৃতে বললেন, হুজুর, আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা কত্তে যেতে চান তো যাবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনি জমিদার, আর সাহেবরা হাজার হোক আপনার ইজারাদার, দেখা কত্তে হলে সাহেবেরই আপনার নিকটে আসা উচিত। আপনি সাহেবের কাছে এত্তেলা পাঠান।

গঙ্গানারায়ণ বললো, আমি এত্তেলা পাঠালে সে আসবে? যদি না আসে? যতদূর মনে হলো, সে আমার এত্তালার পরোয়া করবে না!

খাজাঞ্চি বললেন, তা হলে আপনি তার সঙ্গে দেখা করবেন না। আপনি জমিদার হয়ে তো বেচালে চলতে পারেন না? প্রজারা নেচে উঠলেই কি আপনার কেতা নষ্ট করা উচিত হয়? আপনার বংশের একটা মান মর্যাদা আছে না!

গঙ্গানারায়ণ বললো, সেন মশাই, যদি এক্ষুনি এই কামরার মধ্যে একটা বিষাক্ত সাপ দেখি, তা হলে অমনি তিড়িং করে লাফিয়ে উঠবো। এমনভাবে লাফিয়ে ওঠা জমিদারের পক্ষে বড়ই অনুচিত কাজ, কিন্তু কখনো কদাচিৎ তাও করতে হয়। আমি চললাম!

তখন খাজাঞ্চি বললেন, তবে অন্তত এক কাজ করুন। আগে থেকে একটা খবর অন্তত পাঠানো হোক। আপনি যাবেন, আপনার আপ্যায়নের জন্য তাদের তৈরি হবার একটু সময় তো দিতে হবে অন্তত। আপনি উট্‌কো হঠাৎ যাবেন। গিয়ে দেখলেন হয়তো সাহেব কুঠিতে নেই। তাছাড়া আপনার এখনো স্নানাহারও হয়নি।

এতে গঙ্গানারায়ণকে রাজি হতেই হলো। নীলকুঠিতে তার দূত গিয়ে খবর দিয়ে এলো যে অপরাহ্ণে সে যাবে দেখা করতে, সাহেব যেন অনুগ্রহ করে তখন উপস্থিত থাকেন।

এই খবর পাঠানোই হলো একটা বড় ভুল। তার অভ্যর্থনার ব্যবস্থাটি বেশ ভালোই হলো। নীলকুঠির বিশাল চত্বরে একটি ক্যাম্প চেয়ারে পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে ম্যাকগ্রেগর, রোদ আড়াল করার জন্য মুখের ওপর টুপি চাপা দেওয়া। মাটিতে গড়াচ্ছে কয়েকটা সুরার বোতল, সেখানে ভন ভন করছে এক ঝাঁক মাছি। সাহেবের জামায় ঝোলের দাগ, বোঝা যায়, দুপুর থেকে খানাপিনা বেশ জবর হয়েছে।

কয়েকজন কর্মচারী সন্ত্রস্ত মুখে একটু দূরে সারবন্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল,

দুজন সঙ্গীকে নিয়ে গঙ্গানারায়ণকে প্রবেশ করতে দেখে তারা সসম্ভ্রমে তাকে ভেতরে নিয়ে এলো এবং একজন সাহেবের কানে কানে কিছু বললো।

সাহেব টুপিটা সরিয়ে রক্তাক্ত চক্ষে গঙ্গানারায়ণের দিকে তাকিয়ে জড়িত স্বরে বললো, হ্যালো, জমিণ্ডার! নাইস সিয়িং ইউ! কাম অন, সীট ডাউন!

একজন দৌড়ে একটি কেদারা এনে দিল গঙ্গানারায়ণের জন্য। গঙ্গানারায়ণ সেটিতে বসে সাহেবের দিকে তাকিয়ে দেখলো, সে ততক্ষণে আবার মাথা হেলিয়ে দিয়ে মুখের ওপর টুপি চাপা দিয়েছে।

গঙ্গানারায়ণ গলা খাঁকারি দিয়ে বললো, মিস্টার ম্যাকগ্রেগর, শুভ অপরাহ্ণ, আশা করি আপনার শরীর স্বাস্থ্য মঙ্গল। আশা করি এতদ অঞ্চলের জলবায়ু আপনার সহ্য ও পছন্দ হইয়াছে। আমি আপনার সহিত কয়েকটি বিষয় লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে আসিয়াছি।

ম্যাকগ্রেগর এর উত্তরে নাক ডাকতে শুরু করলো।

বিস্মিত হয়ে গেল গঙ্গানারায়ণ। অনেক ইংরাজের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে, এ রকম বর্বর তো সে কখনো দেখেনি।

একজন খর্বকায় গোলাকৃতি বাঙালী হাত জোড় করে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে আছে কাছে। তার দিকে ফিরে গঙ্গানারায়ণ বললো, সোনামুড়া পর্যন্ত পত্তনী ইজারা দেওয়া হয়েছিল, তার বাইরে আমার খাস তালুক, সেখানেও নীলকুঠির লোকেরা প্রবেশ করে জোর করে আমার প্রজাদের ধরে আনে। আমার প্রজারা নীলকুঠির রায়ত নয়।

সেই লোকটি বললো, হুজুর, আপনার প্রজাগো হয়রানি করার কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবি না। আপনারা হইলেন এ দিগের তিন পুরুষের জমিদার। তবে কি না আমাগো রায়তরা আপনের তালুকে গিয়া লুকাইয়া ঘাপটি মাইরা থাকে, তাগো ধইরা' আনতে হয়। এলাকা-চাষীরা বে-এলাকায় যাবে ক্যান, হেডা আগে ক'ন? ব্যাটারা দুই আনা পয়সা মজুরি আর পাঁচ পো চাউল খুরাকি পায়, আমাগো সাহেব পয়সা খরচ করতে কক্ষনো নারাজ নন, তবু ব্যাটারা—

গঙ্গানারায়ণ বললো, আমার এলাকায় কয়েকটি পাকা আখের ক্ষেতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েচে, হুমকি দিয়ে চিনি কল বন্ধ করা হয়েচে।

সেই লোকটি বললো, হুজুর, কার ক্ষেতে কে আগুন দেয়, তার কি ঠিক আছে? এ ব্যাটারা কথায় কথায় নিজেগো মইধ্যে কাজিয়া করে, পিতিবেশীর ঘরে আগুন লাগায়, অ্যাগো কথা মোটেই বিশ্বাস লবেন না হুজুর।

গঙ্গানারায়ণ কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। সাধারণ একজন কর্মচারীর সঙ্গে এসব আলোচনা করতে তার ঘৃণা বোধ হচ্ছে। লোকটির মুখ দেখলেই বোঝা যায়, লোকটি অতি খল। কে জানে, এই সেই গোলক দাস কিনা।

গঙ্গানারায়ণ জিজ্ঞেস করলো, কুঠিতে আর কোনো সাহেব নেই? আমার ক'টা জরুরি কতা বলবার ছেল।

লোকটি বললো, আইজ্ঞা না হুজুর, সাহেবরা সবাই চরমহালে শুয়র মারতে গেছেন গিয়া। বেলাবেলিই রওয়ানা হইছেন, আপনে আসবেন কইয়া গ্রেগর সাহেব শুধু রইছেন।

গঙ্গানারায়ণ সেই লোকটিকেই বললো, জামালুদ্দীন বলে একজন চাষী এই কুঠিতে এসেছেল, আর ফিরে যায়নি।

লোকটি বললো, কোন্ জামালুদ্দীন হুজুর? কত মানুষই তো এখেনে আসে যায়।

এবার ম্যাকগ্রেগর জড়িত গলায় বললো, দোজ বেগারস! দে অল লুক অ্যালাইক...

অপমানে কর্ণমূল ও নাসিকাগ্র রক্তিমবর্ণ হয়ে গেল গঙ্গানারায়ণের। সাহেবটি জেগেই আছে, সব শুনছে, শুধু ইচ্ছে করে ঘুমের ভান করে রয়েছেন। এই কথাটি বলেই সে নাক ডাকতে শুরু করেছে আবার।

কর্মচারীটি বললেন, সাহেব কইলেন যে ঐ চাষাভূষা সকলডিরই চ্যাহারা একই লাহান। শুধু নাম শুইন্যা চেনা যায় না।

—তোমার সাহেবকে ডাকো। আমি ওর সঙ্গে কথা বলবো।

লোকটি জিভ কেটে বললো, সে সাইধ্য আমার নাই। এহানে কারুরই নাই, হুজুর! কাচা ঘুম ভাঙাইলে গ্রেগর সাহেব চইট্যা আগুনের মতন লকলক করেন, তহন হাতের সামনে যারে পান...

গঙ্গানারায়ণ উঠে দাঁড়ালো। অভদ্র ব্যবহারের উত্তর কী হতে পারে, শারীরিক শক্তির প্রয়োগ কিংবা পাল্টা অভদ্র ব্যবহার, এর কোনোটিতেই গঙ্গানারায়ণ অভ্যস্ত নয়। সাহেবটি তাকে ইচ্ছে করে অপমান করছে! এটা যেন তার অবিশ্বাস্য মনে হলো। একজন মানুষের সঙ্গে আর একজন মানুষ এমন ব্যবহারও করতে পারে? এই ব্রিটিশ জাতিরই কবি শেকসপীয়র, মিল্টন?

হঠাৎ যেন গঙ্গানারায়ণের মস্তিষ্কটা শূন্য হয়ে গেল। সে দাঁড়িয়ে রইলো স্থির হয়ে, কিন্তু সে ভুলে গেল যে কোথায় আছে। সে চোখে কিছু দেখতে পেল না, সমস্ত শব্দ স্তব্ধ হয়ে গেল তার কানে, সে যেন একটি পাথরের মূর্তি। অপমান ও অত্যন্ত ক্রোধের পর সে যেন অপমান ক্রোধ ছাড়িয়ে চলে গেল অন্য কোনো স্তরে।

কর্মচারীটি বললো, ঐ যে দূরে কদম গাছটা দ্যাখতে আছেন হুজুর, প্রজারা কেউ অর বেশী দূর আসে না। ঐ হানে খাড়াইয়া কথা কয়। কোন্ প্রজার ঘাড়ে কয়টা মাথা যে সাহেব গো কাছারির মইধ্যে পা দিবে। আপনে আইছেন, আপনে মাইন্য লোক, আপনার কথা হইল গিয়া ভেন্ন। কিন্তু সুজাউদ্দীন না গজাউদ্দীন কার কথা কইলেন, সে এ হানে আসফে ক্যান?

গঙ্গানারায়ণ কিছুই শুনতে পেল না এসব। তার চোখের সামনে যে সমস্ত জগৎ চলমান। তার মাথা টলছে একটু একটু।

লোকটি বললো, হুজুর কি সাহেববাড়িতে জল খান? তাইলে একটু মিষ্টি মুখের ব্যবস্থা করি?

একথাও শুনতে পেল না গঙ্গানারায়ণ। সে যেন অচেতন অথচ দণ্ডায়মান। তার সমস্ত মুখে বিষাদের কালিমা মাখা।

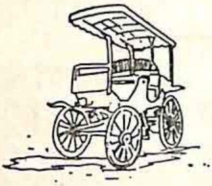
তাকে সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সকলেই বিস্মিত। তার সঙ্গীদের মধ্যে একজন ডাকলো, হুজুর!

গঙ্গানারায়ণ এক পা বাড়াতে গিয়ে টলে পড়ে যাচ্ছিল, তার সঙ্গীরা ধরে ফেললো তাকে। তখন যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সে আচ্ছন্ন গলায় বললো, কী হয়েচে? তোরা আমায় ধরে রইচিস কেন?

—হুজুরের কি শরীর খারাপ হলো?

গঙ্গানারায়ণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, না, চল!

ধীর পায়ে সে বেরিয়ে এলো নীলকুঠি থেকে।



সাহেবের কুঠি থেকে বেরিয়ে পালকি পর্যন্ত সঠিকভাবে হেঁটে এলো গঙ্গানারায়ণ। তারপরই সে সংজ্ঞা হারালো, পালকির মধ্যে এক পা বাড়িয়েই পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। তার সঙ্গীরা উৎকণ্ঠিত হয়ে ডাকাডাকি করতে লাগলো তাকে, কিন্তু কোনো উত্তর পেল না। তখন বেহারারা পালকি তুলে নিয়ে ছুটলো জোর কদমে।

এ স্থল থেকে নদীর ঘাট প্রায় অর্ধ ক্রোশ দূর, এই পথটুকু অচৈতন্য হয়েই রইলো গঙ্গানারায়ণ। বজরার সন্নিকটে নদীতীরে বহু প্রজা তখনো বসেছিল জামালুদ্দিন শেখের সংবাদ জানার প্রত্যাশায়, গঙ্গানারায়ণকে পালকি থেকে ধরা-ধরি করে নামাতে দেখে সকলে উঠে দাঁড়িয়ে হৈহৈ রৈরৈ শুরু করলো। তাদের সকলেরই ধারণা হলো যে সাহেব কুঠিতে গিয়ে গঙ্গানারায়ণ প্রহৃত হয়েছে। দুশমন সাহেবরা কারুকেই রেয়াৎ করে না। বহুকালাবধি সংস্কারের জন্য সাধারণ প্রজারা জমিদারকে পিতৃতুল্য মনে করে, কিংবা তার চেয়েও অনেকখানি বেশী, সেই জমিদারের সম্মানহানি তাদের কাছে অকল্পনীয়। তাদের রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠলো, চিৎকার উঠতে লাগলো উচ্চগ্রামে, কয়েকজন মাটিতে লাঠি ঠুকতে লাগলো সক্রোধে।

গঙ্গানারায়ণকে এনে শোওয়ানো হলো বজরার মধ্যে তার খাস কামরায়। অতি ব্যস্ত হয়ে তার সঙ্গী কর্মচারীরা তাৎক্ষণিক কর্তব্য বিষয়ে শুরু করে দিল বিতণ্ডা। কেউ বললো, গঙ্গানারায়ণকে এখনই বজরা থেকে সরিয়ে ওপরের জমিদারি কুঠিতে নিয়ে যাওয়া হোক। সেখানে একজন কবিরাজ থাকেন, যিনি এক সময় গঙ্গানারায়ণের পিতার চিকিৎসা করেছেন। কেউ বললো, গঙ্গানারায়ণকে সরাবার দরকার নেই, কুঠিতে যেতে অনেক সময় লেগে যাবে। সেই কবিরাজকেই আনানো হোক। আবার কেউ বললো, এই বিদেশ বিভূঁয়ে উত্তম চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্ভব হবে না। সুতরাং কালবিলম্ব না করে এখনই বজরার মুখ ঘুরিয়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেওয়া উচিত।

খাজাঞ্চি অক্ষয় সেন বৈদ্যবংশ সম্ভূত বলে কিছু কিছু চিকিৎসা বিদ্যা জানেন, তিনি গঙ্গানারায়ণের নাড়ি ধরে বসে রইলেন। তাঁরও মত, এখানে অপেক্ষা না করে বরং কলকাতার উদ্দেশেই যাত্রা করা ভালো, অন্তত কৃষ্ণনগর পর্যন্ত পৌঁছালেও সেখানে অ্যালোপাথিক ডাক্তার পাওয়া যাবে।

একটু পরেই গঙ্গানারায়ণ চোখ মেললো এবং উঠে বসলো। তাকে ঘিরে রয়েছে কর্মচারীদের ভীত চকিত মুখ, আর বাইরে প্রজাদের তুমুল কলরব। সে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো, কী ব্যাপার, আমি কী করে এখানে এলুম? অত চ্যাঁচামেচি কিসের?

বৃদ্ধ খাজাঞ্চি বললেন, হুজুর, আপনি কতা বলবেন না। বিশ্রাম নিন।

গঙ্গানারায়ণ পালঙ্ক থেকে নেমে শরীরের আড়মোড়া ভেঙে বললো, কই, আমি তো অসুস্থ বোধ কচ্চি নাকো? আমি নীলকুঠিতে গেসলুম, তারপর কী হলো?

একজন কর্মচারী বললো, হুজুর, আপনি সাহেবের সঙ্গে কতা কইতে গেসলেন।

গঙ্গানারায়ণ বললো, হ্যাঁ। কিন্তু সে সাহেব আমার সঙ্গে কতা কইলে না, একেবারে বর্বর, নেশাখোর...কিন্তু তারপর...তারপর তো আর কিচু মনে পড়ে না।

—আপনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন...এখন শুয়ে থাকুন বরং...একটু পরে জোয়ার এলেই আমরা নৌকো ছেড়ে দোবো।

—জ্ঞান হারিয়ে ফেলিচিলুম? কেন! আমার তো কখনো এমন হয় না।

—হুজুর, সাহেব আপনার মান রাখেননি।

—হ্যাঁ, সে কতা মনে আচে, আমার খুব রাগ হয়েছেল, তা বলে জ্ঞান হারাবো? এ যে বড় আশ্চর্যের কতা!

দুদ্দাড় করে কয়েকজন লাঠিয়াল প্রজা বজরার ওপর উঠে এসে কামরার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে বলে উঠলো, হুজুরের জইন্যে আমরা জান দিমু। পাঁচখানা গাঁয়ের লাইঠ্যালরা হুজুরের থনে আইস্যা খাড়াবে...হুজুর, একবার ক'ন, আমরা সাহেবগুলার ঘেটি ভাইঙ্গা দিমু।

খাজাঞ্চিবাবু ওদের দেখে খিঁচিয়ে উঠে বললেন, আ মোলো, এই হারামজাদাগুলো একেবারে ওপরে উঠে এয়েচে! যা, যা, নীচে যা। আস্পর্ধা দেকো, ছোটলোকগুলো আজকাল যেন একেবারে মাতায় উঠতে চায়।

সে তিরস্কার অগ্রাহ্য করেও প্রজারা বলতে লাগলো, আমাগো হুজুরের শরীলে হাত দিছে, হ্যার বদলা আমরা নিমু। হুজুরের লাইগ্যা আমরা হকলডি এককাট্টা হইয়া নীলকুঠি লাল কইরা দিতাম পারি।

গঙ্গানারায়ণ হাত তুলে বললো, তোমরা শান্ত হও। আমায় মেরেচে? কে বললে আমায় মেরেচে? আমার মনে নেই তো? হ্যাঁরে ভুজঙ্গ, তুই তো গেসলি আমার সঙ্গে। আমায় সত্যিই কেউ মেরেচে?

ভুজঙ্গ বললো, আজ্ঞে না হুজুর, আমি সব সময় আপনার পাশে ডাঁড়িয়ে চিলুম।

খাজাঞ্চি বললেন, হুজুরের গায়ে হাত দেবে, এমন সাধ্য কার আচে! এই ছোটলোকগুলোর ঘটে এক রত্তি বুদ্ধি নেই—

গঙ্গানারায়ণ বললো, তবে, জামালুদ্দীন শেখের কোনো খবর আমি পাইনি... ওরা স্বীকার পেলে না...বললে জামালুদ্দীন শেখকে ওরা চেনে না।

প্রজারা আবার বললো যে, জামালুদ্দীন শেখ নিজে তার বিবি হানিফার খোঁজ নেবার জন্য নীলকুঠিতে গিয়েছিল, সেখান থেকে সে ফেরেনি। হানিফা বিবিকে রাতের বেলা জোর করে ধরে নিয়ে গেছে গোলক দাস—এদের দুজনকেই ওরা কেউ বেরুতে দেখেনি কুঠি থেকে। নদীর পানিতে ওদের লাশও ভেসে ওঠেনি। সুতরাং কুঠির মধ্যেই মাটির নীচের গারদে নিশ্চয়ই আটক করে রাখা হয়েছে ওদের। জামালুদ্দীন আর হানিফা বিবিকে ওরা জোর করে ছাড়িয়ে আনবেই এবং সেই সঙ্গে হুজুরের প্রতি অপমানের প্রতিশোধ নেবে। তাদের কথা শুনে দয়া হয়েছিল বলেই তো হুজুর ঐ বাঘের গুহায় গিয়ে পা দিয়েছিলেন।

প্রজারা সমস্বরে আরও সব উত্তেজক কথা বলতে যাচ্ছিল, খাজাঞ্চি প্রচণ্ড ধমক দিয়ে তাদের থামিয়ে দিলেন। মুখ্যু আর গোঁয়ার লোকগুলো কোমল, উদারহৃদয় জমিদার গঙ্গানারায়ণকে বিপদে ফেলতে চায়। সাহেবদের সঙ্গে লড়বে! হুঃ! পিঁপড়ের পাখা ওঠে মরণের তরে। কান টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি মফস্বলে একটি ইংরেজের গায়ে হাত দিলে অমনি কলকেতা থেকে কামান বন্দুক নিয়ে

রাশি রাশি ইংরেজ সৈন্য ছুটে আসবে, গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দেবে। জমিদারের বজরায় বসে সাহেবদের বিরুদ্ধে কোনো কথা উচ্চারণ করাও অতি গর্হিত। হুজুর, কানে আঙুল দিন, এসব কিছু শুনবেন না।

খাজাঞ্চি সেই প্রজার দলকে কুকুর-ছাগলের মতন তাড়াবার ভঙ্গি করে বললো, দূর হ! দূর হ! বেরো! আভি নিকাল! হুজুর অসুস্থ, তেনার সামনে এসে হল্লা করিস, তোদের এত সাহস! নাম আগে, নাম বজরা থেকে, তারপর তোরা যা খুশী করগে যা। হুজুর তোদের হয়ে কতা কইতে গেসলেন, এই তোদের সাত পুরুষের ভাগ্যি! আজ রাতেই বজরা ঘোরাবো।

গঙ্গানারায়ণ এবার খাজাঞ্চিকে বাধা দিয়ে বললো, সেনমশাই, ওরা আমার প্রজা, বিপদে পড়ে আমার কাচে এয়েচে, এখন ওদের তাড়িয়ে দেওয়া কি উচিত কর্ম হয়? আশ্রিতকে রক্ষণ করাই তো আমাদের ধর্ম!

খাজাঞ্চি বললেন, হুজুর, ওরা আপনার প্রজার যোগ্য কী ব্যবহার করেচে? জমিদারের কাচে এয়েচে, কোনো এক ব্যাটাও কি নজরানা এনেচে? জমিদারের সামনে নজরানা না রেখে মুখ খোলার সাহস দেখায়! ছোটলোকগুলোর আজকাল বড় বেশী বাড় বেড়েচে।

তখন প্রজারা লজ্জিতভাবে বলে উঠলো যে, এখন তাদের পেটে অন্ন নেই, অনেকের বাড়ি ঘর পুড়ে গেছে, তাই কোনো নজরানা আনতে পারেনি। আবার সুদিন যদি আসে, তখন তারা নিশ্চয়ই জমিদারকে নজরানা দিয়ে সম্মান দেখাবে।

একজন একটু বেশী ভাব দিয়ে বললো যে, হুজুর, এ বছর আমাদের চোখের পানিই আপনার নজরানা। আমাদের ফেলে যাবেন না।

খাজাঞ্চি বললেন, হুজুর, এখেনে বসে থেকেই বা আপনার লাভ কী? আপনি তো একবার চেষ্টা করে দেকলেন। নীলকুঠির সাহেব যদি আপনার কতায় কান না দেয়, তাহলেও সে সাহেবকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। নীলচাষের আইন তো আপনাকে বুঝিয়ে বলিচি! নীলকররা পত্তনী জমি নিয়ে যে চাষ করে, তার নাম 'এলাকা চাষ', সেখানে জমিদারের কোনোরকম কতা কওয়ার এক্তিয়ার নেই। এখেনকের প্রজারা এখন নীলকরদের ভূমিদাস, নীলকরদের ইচ্ছে অনুযায়ী ওদের মরণ বাঁচন! আপনি এর মধ্যে থেকে কী করবেন?

গঙ্গানারায়ণ উষ্ণ হয়ে বললো, সেনমশাই, আপনি বলতে চান যে এর কোনো-রকম প্রতিকার নেই? এই নিরীহ মানুষগুলান শুধু শুধু মরবে?

খাজাঞ্চি এতক্ষণে একটু হাসলেন। এই বৃদ্ধ তাঁর জীবনে দেখেছেন অনেক উত্থান পতন। জমিদারের ছেলে প্রজার দুঃখ দেখে বিচলিত হয়, এটা তাঁর কাছেও একটা নতুন অভিজ্ঞতা। গঙ্গানারায়ণের রক্ত এখনো চঞ্চল, তাই নিজের ভালোমন্দ বোঝার সময় এখনো আসেনি।

খাজাঞ্চি বললেন, হুজুর, যুদ্ধে যে জেতে সে কি অমনি অমনি কিচু ছাড়ে? আমরা পরাধীন জাতি, আমরা কি আর বড়মুখ করে অন্যায়ের প্রতিকার চাইতে পারি? সাহেবদের দয়ার ছিটে ফোঁটা পেয়েই আমাদের বাঁচতে হবে। আপনি শুনেচেন নিশ্চয় যে বাংলার জন্য একজন ছোটলাট নিযুক্ত হয়েচেন এ বচর। বড়লাট তো সিমলেতেই বসে থাকেন, রাজধানী কলকাতায় ক'দিনই বা আর আসেন। এখন ছোটলাট হলদি সাহেব যদি দয়া করেন।

গঙ্গানারায়ণ বললো, লেফটেনাণ্ট গভর্ণর হ্যালিডে। তিনি কী করবেন?

খাজাঞ্চি বললেন, শুনিচি ছোটলাট দেশের অবস্থা স্বচক্ষে দেখবার জন্য সফরে বেরিয়েচেন। একদিন না একদিন এদিকপানেও আসবেন। প্রজারা তখন দল বেঁধে গিয়ে তেনার পায়ে গিয়ে আছড়ে পড়ুক। তিনি যদি কিছু সুরাহা করেন তবেই এদের বাঁচোয়া। আপনি কী করবেন? দেশের দণ্ডমুণ্ডের মালিক তো জমিদাররা নয় এখন, সাহেবরা হলো গে মালিক। আমার পরামর্শ যদি শোনেন হুজুর, ইদিকে আপনার যে বাকি জমি এখুনো পত্তনি দেওয়া হয়নি, তাও নীলকরদের হাতে তুলে দিন। তাহলে শান্তিতে থাকবেন। আখের চাষ এখুন মাতায় থাকুক।

গঙ্গানারায়ণ বললো, হ্যালিডে সাহেব ইদিকে কখন আসবেন, তার ঠিক কী! জামালুদ্দীন শেখ আর হানিফা বিবিকে যে গুম করে রেকেচে, তার একটা ব্যবস্থা কত্তে হবে না? তাদের যদি এর মধ্যে মেরে ফেলে?

—মেরে ফেললে আর আপনি কী উপায়ে আটকাবেন? কতায় বলে, মুখ্যুর মরণ গাছের আগায়। ঐ জামালুদ্দীন শেখটাকে আমি চিনি তো, ব্যাটা কাঠগোঁয়ার, ওর মরণ তো এমন আঘাটাতেই বাঁধা ছেল! বিবিকে ধরে নিয়ে গ্যাচে, সেজন্য ওর এত টনক নড়াবার কী দরকার ছেল? সাধ করে কেউ বাঘের গুহায় পা দেয়? জোয়ান মদ্দ, বেঁচে থাকলে একটার বদলে ও অমন আরও দশটা বিবি শাদী কত্তে পাত্তো না? বলুন?

—আপনি বলেন কী, সেনমশাই? ওর বউকে ধরে নিয়ে গেলে ও তার সন্ধান করতে যাবে না? চুপ করে ঘরে বসে থাকবে জোয়ান মদ্দ হয়ে?

—তাই যদি কত্তো তো ও হতভাগা বেঁচে যেতে পাত্তো। বরং ওর উচিত ছেল আর একটা খাপসুরৎ মেয়েকে শাদী করে কিছুদিন পর তাকেও নীলকুঠিতে পাটিয়ে দেওয়া।

—ঘরের বউকে জোর করে টেনে নিয়ে যায়—এত বড় অন্যায় নিয়ে আপনার মস্করা আমার ভালো লাগচে না, সেনমশাই!

—যদি আমার কতাকে মস্করা বলে মনে হয়, তবে ক্ষমা করবেন হুজুর। কিন্তু এর মধ্যে অন্যায়টা আপনি দেকলেন কোতায়? আমাদের এই এতবড় দেশটাকে পছন্দ হয়েচে বলেই তো সাহেবরা কেড়ে নিয়েচে। আর একটা সুন্দরী মাগীকে পছন্দ হলে তাকে ওরা কেড়ে নিতে পারবে না? বীরভোগ্যা বসুন্ধরা আর স্ত্রীলোকরা হলোগে বীর্যশুল্কা। আমাদের শাস্ত্রকাররা এই কতা বলে গ্যাচেন। খুঁজে দেকুন, ওদের মুসলমানী শাস্ত্রেও নিশ্চয় এমন কতা আচে, খৃষ্টানী শাস্ত্রেও আচে।

—শাস্ত্র আলোচনা এখন থাক। প্রজাদের বলুন, কালই আমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে ওদের বিষয় নিয়ে দরবার কত্তে যাবো।

প্রজারা জয়ধ্বনি করে উঠলো।

খাজাঞ্চি বিরস মুখে বললেন, আপনি আজ অসুস্থ হয়ে পড়েচিলেন। এরপর যদি আপনাকে কঠিন ব্যামোয় ধরে তবে কলকাতায় গিয়ে কত্তামা'র কাচে আমরা কী করে মুখ দ্যাকাবো? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাচে গিয়ে আপনি কী করবেন? প্রজাদের মুখেই তো শুনেচেন যে এই নীলকুঠির কুঠিয়াল সাহেব আর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব একেবারে প্রাণের দোসর। সেই সাহেব এ সাহেবের কুঠিতে এসে নিত্য খানা খান। তিনি কি এনার নামে কোনো নালিশ শুনবেন? শুধু শুধু আপনার মুখ নষ্ট হবে।

গঙ্গানারায়ণ গম্ভীরভাবে বললো, নীলকররা রায়তদের দিয়ে জোর করে নীল-চাষে বাধ্য করাতে পারে বটে, আইনের সে রকম ফাঁক রয়ে গ্যাচে, কিন্তু প্রজাদের ঘর থেকে বউ কেড়ে নিয়ে যাওয়া কিংবা গুম খুন করার কোনো অধিকার তাদের নেই। ইংরেজ সরকারের যত দোষই থাকুক, তারা যেসব আইন করে, তার সুযোগ নিতে পারে সকলেই। গরীব নিরীহ লোকগুলো সেইসব আইনের খবর রাকে না বলে কি যে যা খুশী পার পেয়ে যাবে? এই ম্যাকগ্রেগরকে আমি শাস্তি দেওয়াবোই।

—আইনের কতাই যখন তুললেন, হুজুর, তখুন আমি বলি যে আপনি সব দিক ভেবে দ্যাকেননি। আপনি ভালোমতনই জানেন যে, গুম, আটক, খুন বা ঘর বাড়ি পোড়ানো—এসব হোলো গে ফৌজদারি মামলা—মফস্বলে কোনো সাদা চামড়ার মানুষের নামেই ফৌজদারি মামলা আনা যায় না। কোনো আদালতে সে মামলা নেয় না। ম্যাজিস্ট্রেটও আপনার কতা শুনে হাঁকিয়ে দেবে। এর সুরাহা কত্তে হলে আপনাকে মামলা দায়ের কত্তে হবে কলকেতার সুপ্রিম কোর্টে। ঐ জামালুদ্দীনের বুড়ো বাপকে আপনি সঙ্গে নিয়ে চলুন, তারপর কলকেতায় ওকে দিয়ে মামলা ঠোকাবেন। আপনার যদি ইচ্ছে হয়, খরচ পত্তর আপনি দেবেন।

—আর ততদিনে যদি জামালুদ্দীন শেখ আর হানিফা বিবি বেঁচে না থাকে? প্রমাণ লোপ করার জন্য যদি ওরা ওদের দুজনকে খুন করে জলে ভাসিয়ে দ্যায়?

—তা হলে আর কী হবে? এমন হাজার হাজার মচ্চে, তার সঙ্গে আরও দুটি প্রাণী যোগ হবে।

একটু থেমে, একটু কেশে এবার বৃদ্ধ সেনমশাই কুণ্ঠিতভাবে বললেন, আমার কতা আপনার কাছে তিক্ত বোধ হতে পারে হুজুর, কিন্তু আমি বলচি আপনাকে যুক্তির কতা। মিচিমিচি দুটো ভাবের কতা আপনাকে শুনিয়ে তো কোনো লাভ নেই। ঐ হানিফা বিবিকে সাহেব ছুঁয়েচে, এরপর তাকে ঐ মোছলমানরা কেউ কি আর ঘরে ঠাঁই দেবে? ওদের জিজ্ঞেস করে দেকুন না? এমন কি ঐ জামালুদ্দীন শেখও দিত না। হানিফা বিবিকে ছাড়িয়ে আনা হলো গে ভাবের কতা। ঐ একটি মেয়েমানুষের জন্য হাজার হাজার মানুষের ওপর আবার অত্যাচার হবে।

গঙ্গানারায়ণ বললো, আপনার যুক্তি এখন আপনার কাচেই থাক। কাল সকালে ম্যাজিস্ট্রেটের কাচে আমায় যেতেই হবে। এটা আমার দায়।

—আপনার কিসের দায়?

—কিসের তা জানি না। তবু আমার বুকে একটা ভার চেপে আচে।

—আপনার শরীর...

—শরীর এখন ভালো আচে আমার। কেন তখন অমন মাতা ঘুরে গেল বুঝিচ না।

—হুজুর, আপনি শুনেচেন বোধহয়, নদীয়ার কমিশনার সাহেব সুখচরের জমিদার নীলকণ্ঠ রায়কে আটক করে রেখেছেল এই চোতমাসে। লোকে বলে, নীলকণ্ঠ রায়কে জোর করে ঘোড়ার দানা খাওয়ানো হয়েছেল সাহেবের হুকুমে!

—ও সব কথা আর থাক। আপনাকে বললাম যে, এটা আমার দায়।

প্রজাদের উদ্দেশ্য করে গঙ্গানারায়ণ বললো, তোমরা সব এখন যাও। রাত হয়েচে। এইসব কতা আর এখুন পাঁচ কান করো না। এইসব কতা নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঘোঁট পাকিয়েও এখুন কোনো সুফল হবে না। কাল সকালে আমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাচে যাবো, যদি আমার সঙ্গে তোমরা কেউ কেউ যেতে চাও, তা হলে যাবে।

প্রজারা আবার আনন্দে সরব হয়ে উঠলো। এত দুঃখের মধ্যেও তাদের এইটুকুই সান্ত্বনা যে তাদের জমিদার তাদের সমব্যথী হয়েছেন। নায়েব-গোমস্তা-খাজাঞ্চীর কথায় কান না দিয়ে তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়েছেন।

প্রজারা তখনও যেতে চায় না, গঙ্গানারায়ণ বারবার বুঝিয়ে বললো তাদের। তারপর এক সময় সে খাবার ঘরে চলে এলো।

মেঝেতে মখমলের আসন পাতা, সামনে রুপোর থালায় যুঁই ফুল রঙের আতপ চালের ভাত ও দশ বারো রকমের ব্যঞ্জন সাজানো। জননী বিম্ববতীর নির্দেশে সফরে বেরুবার সময় পাচক ভৃত্যের একটি ছোটখাটো দল গঙ্গানারায়ণকে সঙ্গে আনতে হয়। গঙ্গানারায়ণ স্বল্পাহারী, তবু প্রধান রসুইকর দুর্যোধন প্রতিদিন দু'বেলা নানা প্রকারের ব্যঞ্জন পাক করবেই। হস্ত মুখ প্রক্ষালনের সময় গঙ্গানারায়ণ তার ডান হাতের তিনটি অঙ্গুরীয় খুলে বাম হাতের আঙুলে পরলো। ডান হাতে অঙ্গুরীয় পরে থাকা অবস্থায় খাদ্য গ্রহণ করা গঙ্গানারায়ণদের পরিবারে নিষিদ্ধ। কয়েক পুরুষ আগে এই পরিবারের একজন কর্তা নাকি অন্ন গ্রহণের সময় হঠাৎ একটি আলগা অঙ্গুরীও উদরসাৎ করে ফেলেছিলেন এবং আসনে বসে থাকা অবস্থাতেই তিনি মারা যান।

প্রথম গ্রাস অন্ন মুখে তুলেই গঙ্গানারায়ণ বুঝতে পারলো যে আজ তার আহারে একেবারেই রুচি নেই। অথচ একটু আগেই প্রজাদের সঙ্গে কথা বলবার সময় সে বেশ ক্ষুধা বোধ করছিল। এখনো তার ক্ষুধা আছে এবং স্বাভাবিক নিয়মেই এ সময়ে তার ক্ষুধার উদ্রেক হওয়া উচিত, তবু কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না কেন? বিভিন্ন ব্যঞ্জন সে চেখে দেখলো, সবগুলিই যেন বিস্বাদ। নদী থেকে ধরা টাটকা কাল্‌বোস মাছের সুপ, বৃহদাকার গলদা চিংড়ি ভাজা, এঁচোড়ের তরকারি যা দুর্যোধনের রন্ধনগুণে পাঁঠার মাংসের মতন মনে হয়, এর কিছুই একটুকরোর বেশী মুখে দিতে পারলো না গঙ্গানারায়ণ। এমনকি এক পাথরবাটি ভরা উষ্ণ দুধ, যা প্রতিদিন খাদ্যের শেষে পান করে সে, তাতেও ওষ্ঠ ছোঁয়ানো মাত্র সে যেন পুরোনো ঘৃতের গন্ধ পেল, তার প্রায় বমি এসে গেল। গঙ্গানারায়ণ বুঝলো, রন্ধনের কোনো দোষ নয়, তার জিহ্বাই কোনো খাদ্য গ্রহণ করতে চাইছে না, এরকম ব্যাপার গঙ্গানারায়ণের অভিজ্ঞতায় আগে কখনো হয়নি। সে বিমূঢ় বোধ করলো।

গঙ্গানারায়ণকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে দেখে খাজাঞ্চিমশাই বললেন, কিচুই খেলেন না তো হুজুর। আমি তখুন দেকেই বুঝিচি, আপনার শরীর গতিক ভালো নয়। আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন। আজই কলকাতার দিকে রওনা দিলে ভালো হয়।

গঙ্গানারায়ণ মুখ তুলে বললো, আমার শরীরে আর কোনো রকম অসুবিধা বোধ কচ্চি না খাজাঞ্চিমশাই, শুধু খেতেই যেন ইচ্ছে কচ্চে না।

খাজাঞ্চি বললেন, পিত্ত, কফ, বায়ু কুপিত হলে অনেক সময় বুজতে পারা যায় না। আমার কাচে মকরধ্বজ রয়েচে, একটু তুলসীপাতার রস আর মধুর সহিত মেড়ে যদি খেয়ে নেন—

পাত্র ত্যাগ করে উঠে পড়লো গঙ্গানারায়ণ। খাজাঞ্চির দেওয়া ওষুধ খেয়ে নিল বিনা আপত্তিতে। তারপর নিজের কক্ষে গিয়ে গবাক্ষের পাশে বসে চেয়ে রইলো নদীর দিকে। আজ কোন্ তিথি কে জানে, সন্ধ্যার দিকে আকাশ অন্ধকার ছিল,

এখন বেশ জ্যোৎস্না ফুটেছে। নদীর তরঙ্গে লুটোপুটি খেয়ে খেলা করছে শিশু চাঁদ। গঙ্গানারায়ণ অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো সেদিকে, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শয্যায় আশ্রয় নিল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার নিদ্রা এলো না। অপরাহ্ণে ম্যাকগ্রেগরের রূঢ় ব্যবহার আর অসহায় প্রজাদের দুঃখের কথা অনবরত ঘুরতে লাগলো তার মাথায়। সকলের কথা শুনে যা বোধ হচ্ছে, এ জেলার ম্যাজিস্ট্রেটও এক অমার্জিত ইংরেজ। সে কী রকম ব্যবহার করবে তার ঠিক নেই, তবু প্রজাদের কাছে কথা দিয়েছে, গঙ্গানারায়ণকে একবার যেতেই হবে তার কাছে। ইংরেজের হাত থেকে জামালুদ্দীন শেখ আর হানিফা বিবিকে ছাড়িয়ে আনার সাধ্য তার নেই, কিন্তু সর্বপ্রকার চেষ্টা তাকে করতেই হবে। চেষ্টার নামই পুরুষকার।

একসময় গঙ্গানারায়ণ টের পেল যে তার সর্বশরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, মস্তিষ্কের মধ্যে যেন বয়ে যাচ্ছে একটা প্রবল ঝঞ্ঝা। অথচ এ ঠিক জ্বর আসার অনুভূতি নয়, শরীরে কোনো অবশ ভাব নেই, শরীর যেন আর শয্যায় থাকতে চাইছে না।

এ অবস্থায় নিদ্রা আসা অসম্ভব, গঙ্গানারায়ণ উঠে বসলো। এ কী হলো তার? নীলকুঠিতেও কিছুক্ষণের জন্য তার বোধশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল, সে দাঁড়িয়েই ছিল, অথচ সেই সময়টুকুর কথা তার কিছুই মনে নেই। তারপর পাল্কিতে ওঠার সময় সে সম্পূর্ণই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লো, এ রকম তো তার কখনো হয়নি আগে!

ঘাড়ে মাথায় জল ছেটালে উপকার হতে পারে ভেবে সে তাই করলো, তারপর মুক্ত বায়ু সেবনের উদ্দেশ্যে সে উঠে এলো বজরার ছাদে।

রাত্রি কত প্রহর এখন কে জানে। বজরার সকলেই এখন ঘুমন্ত। বজরার সঙ্গে বাঁধা ছোট পিনিসটির ছাদে জ্বলছে একটা মশাল, তার কাছেই দুজন লোক পরস্পরের কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে বসে আছে। পাশে রাখা দুটি ধারালো বর্শা। কোনো সন্দেহ নেই যে প্রহরী দুজনও নিদ্রাপ্লুত।

নরম, শীতল বাতাসে বেশ খানিকটা আরাম পেয়ে ছাদের ওপর পায়চারি করতে লাগলো গঙ্গানারায়ণ। একটু পরেই সে স্থান কাল সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলো।

যেন এখানে কোনো নদী নেই, বজরা নেই, কোনো মানুষ নেই। গঙ্গানারায়ণ সম্পূর্ণ একা, সে কোনো সীমানাহীন স্থলে ঘুরছে। হঠাৎ হঠাৎ তার মস্তিষ্কে বিদ্যুৎচমকের মতো এসে যাচ্ছে এক একটি স্মৃতির টুকরো, সেগুলিও তার অচেনা। সে যেন শিশু হয়ে শুয়ে আছে কোনো জননীর কোলে, কিন্তু সেই জননীকে সে চেনে না...সে ফুলের মালা টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলছে...তার অঙ্গে রাজবেশ...সে ডুবে যাচ্ছে কোন কাল সমুদ্রে, শুধু হাত দুটি উচ্চে তোলা... পরমুহূর্তেই যেন সে আবার শুয়ে আছে নগ্নগাত্রে কোনো মন্দিরের চাতালে।

সে মুখ তুলে তাকালো আকাশের দিকে। লঘু মেঘ ও কিছুটা নীল রং মেশা জ্যোৎস্নাভরা অনন্ত গগনের দিকে চেয়ে সে যেন সত্যিই সন্ধান পেয়ে গেল অসীমের, তার নিশ্বাস পড়তে লাগলো ঘন ঘন, তার মুখের চেহারা এখন অন্যরকম।

একটা শব্দ পেয়ে গঙ্গানারায়ণ তাকালো নদীর ঘাটের দিকে। সেখানে কয়েকটি মানুষ জলে নেমে মুখ প্রক্ষালন করছে আর নিজেদের মধ্যে কথা বলছে গুন গুন

করে। গঙ্গানারায়ণ ওদের দিকে তাকালো বটে কিন্তু কিছু যেন দেখলো না, কিছু গ্রাহ্য করলো না, সে আবার মুখ ফেরালো আকাশের দিকে তৃষ্ণার্তের মতন।

একটু পরেই আবার ঠিক স্বপ্নচালিতের মতন গঙ্গানারায়ণ নেমে এলো ছাদ থেকে, কিন্তু নিজের কক্ষের দিকে গেল না। বজরার সিঁড়ি তুলে রাখা হয়েছে, তীরের বেশ সন্নিকটেই নোঙর করা বজরা, গঙ্গানারায়ণ গলুইয়ের কাছে এসে এক লম্ফে চলে এলো তীরে। নদীর ঘাটের কাছে যেখানে লোকগুলি ছিল, সে সেদিকে এগিয়ে গেল দ্রুত পদে।

লোকগুলি তখন গোল হয়ে বসেছে। একজন বয়স্ক ব্যক্তি একটা বড় পাত্র ভর্তি ভেজানো চিঁড়ে ও আখের গুড় মাখছে, তার থেকে এক একটা মণ্ড তুলে তুলে দিচ্ছে অন্যদের হাতে। গঙ্গানারায়ণ সেখানে বসে পড়ে হাত বাড়ালো। বয়স্ক লোকটি কোনো প্রশ্ন না করে গঙ্গানারায়ণের হাতেও তুলে দিল একটা মণ্ড। গঙ্গানারায়ণ সাগ্রহে সেটা সবখানি এক সঙ্গে ভরে দিল মুখের মধ্যে। ঠিক যেন অমৃতের স্বাদ পেল। লোভীর মতন সে হাত বাড়িয়ে দিল আবার।

বয়স্ক লোকটি এবার জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে বাপু?

গঙ্গানারায়ণ কোনো উত্তর দিল না। সে হাত বাড়িয়েই রইলো। সেই লোকটি বললো, অতিথি নারায়ণ, তুমি যদি তৃপ্ত হও তো যত খুশী লও। আমরা অতি দরিদ্র, আমাদের কাছে লুণ্ঠনযোগ্য ধনসম্পদ কিছুই নেই।

দলটিতে বয়স্ক নারী পুরুষই বেশী, তিনজন যুবক ও একটি শিশুও রয়েছে, এরা তীর্থযাত্রী। আহার শেষ করার পর ওরা যখন আবার যাত্রা শুরু করলো, তখন গঙ্গানারায়ণ নিঃশব্দে অনুসরণ করতে লাগলো ওদের। সাধারণত রাত্রে পথ চলার রীতি নেই। কিন্তু বিদেশী তীর্থযাত্রীরা এ অঞ্চলে এসে শুনেছে যে নীলকরদের অত্যাচারে এখানে ত্রাসের রাজত্ব চলছে। অধিকাংশ প্রজাই গৃহছাড়া। সেইজন্য তীর্থযাত্রীরাও যত দ্রুত সম্ভব এ এলাকা পার হয়ে যেতে চায়।

গঙ্গানারায়ণ মিশে গেল ওদের দলে। ক্রমশ সে চলে যেতে লাগলো তার বজরা থেকে অনেক দূরে। তীর্থযাত্রীরা প্রথমে তাকে কোনো দস্যুদলের প্রতিনিধি মনে করেছিল, তার সঙ্গে কোনো অস্ত্র না থাকলেও তাকে ওরা ঘাঁটাতে সাহস করেনি। ভোরের আলোয় গঙ্গানারায়ণকে দেখে ওরা আরও অবাক হলো। গঙ্গানারায়ণের সর্বাঙ্গে তার পারিবারিক আভিজাত্যের ছাপ পরিস্ফুট। তার পরিধানে চিক্কন সিল্কের ঢিলে কুর্তা ও শেরওয়ানি, কণ্ঠে স্বর্ণের মফচেন, বাঁ হাতের আঙুলে পাঁচটি বিভিন্ন মূল্যবান রত্ন সমন্বিত অঙ্গুরীয়। তার মুখে অদ্ভুত বিষাদ ও ঔদাসীন্য মাখানো। তীর্থযাত্রীদের নেতা সকালবেলা তাকে জিজ্ঞেস করলো, মহাশয়, আপনি কোথায় চলেছেন? কোথায় আপনার নিবাস? আমরা অতি সাধারণ মানুষ, আপনি আমাদের সঙ্গী হলেন কেন?

গঙ্গানারায়ণ বললো, আমাকে আপনাদের দলে স্থান দিন। আমি পথ চিনি না।

গঙ্গানারায়ণ কি কাপুরুষ? সে কি পলাতক হতে চাইছে? প্রজাদের মুখপাত্র হয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাবার কথা ছিল তার, সে কি ভীরুর মতন রাত্রির অন্ধকারে দেশান্তরে চলে যাচ্ছে? এসব কিছুই মনে নেই গঙ্গানারায়ণের। তার সমস্ত বন্ধন টুটে গেছে, কোনো কিছু সম্বন্ধেই সে আর কোনো দায় বোধ করে না।

একটানা বহুদিন বহু রাত ঐ তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে কাটিয়ে বহু পথ পরিক্রমা

করে সে এসে পেঁৗছোলো প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে। যাত্রীদলের গন্তব্য এই প্রয়াগই, এখানে তারা পুণ্য স্নান করতে এসেছে। অতি প্রত্যুষে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী এই তিন নদীর পবিত্র সঙ্গমে অনেকবার ডুব দেবার পর গঙ্গানারায়ণ যেন পুনর্জীবন প্রাপ্ত হলো। তার মস্তিষ্কের শূন্যতাবোধ কেটে গেছে। তার সারা শরীর কাঁপছে, এ কম্পন শীত বোধের জন্য নয়, অন্য এক উপলব্ধির উত্তেজনায়। সিক্ত বসনে পাড়ে উঠে এসে ভোরের আকাশের দিকে তাকিয়ে তার মনে পড়লো, প্রয়াগের থেকে কাশী খুব বেশী দূর নয়, এবার তাকে যেতে হবে সেখানে। তার নিয়তিই তাকে এখানে টেনে এনেছে।

তীর্থযাত্রী দলের সংশ্রব ত্যাগ করে সে একাই রওনা দিল বারানসীর দিকে।



বৈশাখ মাস, সংস্কৃত কলেজে এখন গ্রীষ্মের ছুটি। কিন্তু এই কলেজের অধ্যক্ষের ছুটি নেই, খর্বকায় ব্রাহ্মণ ঠেঙো ধুতি ও উড়ানি গায়ে দিয়ে প্রখর রৌদ্রের মধ্যে বাংলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পায়ে হেঁটে চরকির মতন ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

ভারতে এসে অকালমৃত বেথুন সাহেব স্বল্প সময়ের মধ্যেই অনেক উদ্দীপনার সঞ্চার করে গেছেন। যে স্ত্রীশিক্ষার জন্য তিনি প্রাণপাত করলেন, অনেক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তার প্রসার হতে লাগলো ক্রমে ক্রমে। তাছাড়া, বেথুন সাহেব বার বার আর একটি বিষয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা না দিলে সে শিক্ষায় প্রকৃত মানুষ গড়া যায় না। যতই ইংরেজি বা সংস্কৃত শেখাবার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হোক না কেন, বাংলাদেশে বাংলা পড়াবার সুবন্দোবস্ত না হলে শিক্ষা বিস্তার প্রকৃত পক্ষে অসম্ভব। এবং শুধু শহরে নয়, শিক্ষা ব্যবস্থা ছড়িয়ে দিতে হবে গ্রামে গ্রামে। বেথুন সাহেব আরও বলে গেছেন যে, তিনি এ দেশের ছাত্রদের পরীক্ষা করে দেখেছেন, তাদের মেধায় কোনো ঘাটতি নেই, উপযুক্ত শিক্ষা পেলে তারা জগতের যে-কোনো জাতির সমকক্ষ হতে পারে।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও এ ব্যাপারে বেথুনের জীবদ্দশায় তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়েছিলেন। যারা পণ্ডিত হতে চায়, তারা সংস্কৃত শিখতে চায় শিখুক, কিন্তু দেশের আপামর জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে হবে মাতৃভাষায়। এজন্য হাজার হাজার বিদ্যালয় খোলা দরকার। এবং সরকারের সাহায্য না পেলে এতবড় একটা ব্যাপক কর্মসূচী নেওয়া সম্ভব নয়। কোম্পানির গভর্নমেণ্ট এ দেশ থেকে কোটি কোটি টাকা মুনাফা নিয়ে যাচ্ছে, তার থেকে ছিটেফোঁটা পেলেও এ দেশের বালক বালিকাদের জন্য অনেক কিছু করা যাবে।

বিদ্যাসাগর গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশদ পরিকল্পনা পেশ করলেন সরকারের কাছে। তা নিয়ে টালবাহানা চললো অনেকদিন, প্রচুর চিঠিপত্র ও মেমোরেণ্ডাম চালাচালি হলো। এর মধ্যে কাউন্সিল অব এডুকেশানের একজন সদস্য ফ্রেডারিক হ্যালিডে নিযুক্ত হলেন বাংলার ছোট লাট। হ্যালিডে সাহেব

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি তাঁর সমস্ত পরিকল্পনার কথা জানতেন। ছোটলাট তখন সেইসব পরিকল্পনা পেশ করলেন বড়লাটের কাছে, বড়লাট নীতিগত-ভাবে তা মঞ্জুর করে দিলেন।

কিন্তু প্রশ্ন উঠলো, এইসব স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য স্থান নির্বাচন, স্কুল স্থাপন এবং পরে সেগুলির পরিচালনার ব্যাপার তত্ত্বাবধানের জন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তি দরকার। কে করবেন সে কাজ? বিদ্যাসাগর নিজেই সে দায়িত্ব নিতে চান। বিদ্যাসাগরের যোগ্যতা বিষয়ে সরকারের কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু সংস্কৃত কলেজের মতন এত বড় একটি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যাঁর স্কন্ধে, তিনি কি আবার গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় খোলার জন্য এত পরিশ্রম করতে পারবেন? বিদ্যাসাগর এক বাক্যে রাজি, শুধু তাই নয়, এ কাজের জন্য তিনি আলাদা কোনো পারিশ্রমিকও চান না।

পায়ে হেঁটে ঘোরায় কোনো ক্লান্তি নেই বিদ্যাসাগরের। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হবার পরও কতবার নিজের মোট নিজেই মাথায় বহন করে নিয়ে দেশের বাড়িতে যাতায়াত করেছেন পদব্রজে। একটিই শুধু অসুবিধে, নতুন কোনো গ্রামে গিয়ে সেখানকার মুরুব্বিদের বিশ্বাস করাতেই অনেক সময় লেগে যায় যে পাল্কি বেহারাদের মতন চেহারার এই কদাকার পুরুষটিই বিদ্যাসাগর।

শিয়াখোলা, রাধানগর, কৃষ্ণনগর পর পর গ্রামগুলিতে ঘুরে বেশ ভালো সাড়া পাওয়া গেল। এক একটি গ্রামে উপস্থিত হয়ে তিনি সেখানকার চণ্ডীমণ্ডপে কিংবা বটতলায় গ্রামের গণ্যমান্যদের নিয়ে একটা বৈঠকে বসেন। লোক পাঠাবার বদলে তিনি নিজে তাঁদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ডেকে আনেন। তারপর তাঁদের কাছে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলেন, তাঁর উদ্দেশ্যের কথা। গ্রামের মানুষ যদি এক খণ্ড জমি দেয় এবং নিজেরাই চাঁদা তুলে একটি বাড়ি তুলে দেয়, তা হলে সে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হবে আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয়। শিক্ষকদের বেতন দেবেন সরকার।

সব জায়গাতেই তিনি সার্থক হতে লাগলেন। পরপর চললেন ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোনা, শ্রীপুর, কামারপুকুর, রামজীবনপুর, মায়াপুর, মলয়পুর, কেশবপুর, পাতিহাল। তাঁর খাওয়া দাওয়ার কোনো ঝামেলা নেই, তিনি অতিশয় স্বল্পাহারী, গ্রামের যে-কোনো বাড়িতে দুটি চাল-ডাল ফুটিয়ে নিলেই চলে, নইলে শুধু ফলাহারেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়ে যায়। রাত্রিবাসের জন্যও চিন্তা করতে হয় না। যে-কোনো গৃহস্থের বাড়িতেই মাথা গোঁজার ব্যবস্থা হতে পারে, কিংবা গাছতলায় শয়ন করলেও চলে। প্রখর রৌদ্র কিংবা প্রবল বৃষ্টিতেও এ ব্রাহ্মণ নিরস্ত হয় না।

রামজীবনপুরে একদিন বিশ্রাম নিচ্ছেন ঈশ্বরচন্দ্র। এখানকার বিদ্যালয়টি চালু হয়ে গেছে। বৃক্ষতলে ছায়ায় উপবেশন করে তিনি শুনছেন উচ্চকণ্ঠে ছাত্রদের পাঠাভ্যাস। পণ্ডিতমশাই নামতা ঘোষাচ্ছেন, আর ছাত্ররা পরস্পরের সঙ্গে প্রতি-যোগিতা করে গলা ফাটাচ্ছে একেবারে। ঈশ্বরচন্দ্রের ইচ্ছে হলো ছাত্রদের বিদ্যার উন্নতি পরীক্ষা করা।

তিনি চলে এলেন ক্লাস ঘরে। মেঝেতে পাটি বিছিয়ে বসে আছে ছেলের দল, অনেকেরই ঊর্ধ্বাঙ্গে কোনো বস্ত্র নেই, কেউ কেউ পরে আছে শুধু একটি গামছা। পণ্ডিতমশাইয়ের ধুতিখানি শতচ্ছিন্ন, সম্ভবত সেলাই করা বস্ত্র পরিধান করার বিষয়ে তাঁর সংস্কার আছে বলে তিনি ছেঁড়া ধুতিখানিও সেলাই না করে জায়গায় জায়গায় গিঁট বেঁধে রেখেছেন। তবে তাঁর লোমশ বুকে ধপধপে সাদা পৈতাখানিই শুধু অটুট। পণ্ডিতমশাই তাঁর বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে আসবার সময় প্রতিদিন একটি বালিশ ও একটি হাতপাখা নিয়ে আসেন। বালিশে মাথা রেখে তিনি লম্বা

হয়ে শুয়ে থাকেন দ্বারের কাছে, যাতে কোনো দুষ্ট ছাত্র হঠাৎ পলায়ন করতে না পারে। ছাত্ররা পালা করে করে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করে তাঁকে। যে ছাত্র একবারও তাঁর মাথায় পাখা না ঠুকে বাতাস করতে পারে, তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তাকে একটু আগে ছুটি দেন।

বিদ্যাসাগরকে দেখে পণ্ডিতমশাই ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে বসলেন। ইতিমধ্যেই এসব অঞ্চলে রটে গেছে যে, যে-ব্যক্তিকে দেখলে একেবারেই বিদ্যাসাগর বলে মনে হয় না, অথচ মুখচোখে একটা তেজী ভাব, সেই ব্যক্তিই বিদ্যাসাগর।

ঈশ্বরচন্দ্র পণ্ডিতমশায়ের পাশে বসে পড়ে বললেন, আপনার ছাত্রদের একটু দেখতে এলাম। কেমন চলছে, এদের পড়াশুনোর আগ্রহ আছে তো?

পণ্ডিত বললেন, বিলক্ষণ! এগুলানের পড়াশুনো না হলে আমার চাকরিটি যে যায়। তাই তেড়েফুঁড়ে পড়াই। এদের শুধিয়ে দেখুন না।

ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্রদের কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। খুব নৈরাশ্যব্যঞ্জক কিছু না। ছাত্ররা বাংলা ও সরল গণিত কিছু কিছু শিখেছে। কিন্তু এটুকুই তো যথেষ্ট নয়। তিনি একটি ছেলেকে প্রশ্ন করলেন, ওরে, দিন আর রাত কেমন করে হয়, তা বলতে পারিস?

এমন অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে ছেলেটি অবাক। এর উত্তর তো তাদের মা-ঠাকুমারাও জানে, এজন্য কি আর বিদ্যালয়ে আসতে হয়? সূর্য উঠলে দিন আর সূর্য অস্ত গিয়ে চাঁদ উঠলে রাত।

ঈশ্বরচন্দ্র আবার প্রশ্ন করলেন, সূর্য কী করে ওঠে আর কী করেই বা অস্ত যায়?

এর উত্তর পাছে ছাত্ররা না দিতে পারে, তাই পণ্ডিতমশাই নিজেই আগ বাড়িয়ে বললেন, কেন, সাত ঘোড়ার রথে চেপে সূর্যদেব পূবের আকাশে উঠলে দিন হয় আর সারাদিন পর সূর্যদেব পশ্চিম দিগন্তের পরপারে চলে যান।

ঈশ্বরচন্দ্র মৃদু হেসে বললেন, সে তো পুরাণের কথা। আপনি আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতির কথা কিছু শোনেননি?

পণ্ডিত ঘাড় নাড়লেন দু-দিকে।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, সূর্য ঘোরে না। পৃথিবী ঘোরে। সূর্য আকাশে স্থির। পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় একবার ঘোরে।

পণ্ডিতমশাই বললেন, পৃথিবী ঘোরে? আপনি বলেন কি মশাই? মস্করা করছেন, না সত্যি কথা বলছেন?

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, মস্করা নয়, সত্যি। ছাত্রদের ভুল শেখাবেন না। পৃথিবী দু'রকমভাবে ঘোরে।

পণ্ডিত বললেন, সে মশাই আপনি বলছেন যখন, তখন ঘোরে। তবে সে বোধহয় আপনাদের শহরের দিকের পৃথিবী ঘোরে। আমাদের এই পাড়াগাঁ দেশে পৃথিবী ঘোরে টোরে না। একেবারে স্থির হয়ে থাকে সব সময়। দেকছি তো!

অট্টহাস করে উঠলেন বিদ্যাসাগর। পণ্ডিত বলেছে ভালো!

তারপর তিনি ছাত্রদের সবিস্তারে আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি, ঋতুবদল ও দিন রাত্রি ছোট বড় হওয়ার কারণ বোঝাতে লাগলেন। অপ্রসন্ন মুখে শুনতে লাগলেন পণ্ডিত। বিদ্যাসাগরের কথা শেষ হবার পর পণ্ডিত বিড় বিড় করে বলে উঠলেন, আপনি বলছেন যখন, ঘুরুক তাহলে পৃথিবী। চিরকাল ঘুরুক। পৃথিবীর ঘোরাঘুরি নিয়ে কে মাথা ঘামায়?

সেদিন ঈশ্বরচন্দ্র উপলব্ধি করলেন, শুধু পরপর বিদ্যালয় স্থাপিত করে

গেলেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে না, উপযুক্ত শিক্ষকও দরকার। অশিক্ষার চেয়ে কুশিক্ষা আরও ভয়াবহ। ছাত্রদের মতন শিক্ষকদেরও আগে গড়ে পিটে নেওয়া দরকার, শিক্ষক তৈরির জন্যও একটা নর্মাল স্কুল খুলতে হবে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে এ সম্পর্কে তাঁর আগে কিছু আলোচনা হয়েছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত যেমন একজন কড়া ধাতের মানুষ, তেমনি সর্বপ্রকার সংস্কারমুক্ত, ওঁর ওপর নর্মাল স্কুলের ভার দেওয়া যায়, যদি উনি রাজি হন।

ছুটি ফুরিয়ে এসেছে, আবার কলকাতায় ফিরতে হবে, তার আগে পিতা-মাতাকে একবার দেখে যাবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র এলেন স্বগ্রামে।

বীরসিংহ গ্রামে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির রূপ এখন ফিরে গেছে। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র সরকারের কাছ থেকে দেড় শত টাকা বেতন পায়। দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে অঙ্গুলিগণ্য কয়েকজনই মাত্র এত অধিক বেতনের চাকরি করে। তা ছাড়াও গ্রন্থ রচনা করে ঈশ্বরচন্দ্রের এখন যথেষ্ট ধনোপার্জন হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের পরের ভাইও চাকুরিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। ঠাকুরদাস-ভগবতী এক সময় কত কষ্টে দিনাতিপাত করেছেন, আজ তাঁদের সুখের দিন এসেছে। গৃহের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চণ্ডীমণ্ডপ, নতুন চালাঘর উঠেছে কয়েকখানা। এখন গোয়ালে বাঁধা গরু, মড়াইয়ে ভরা ধান, পুকুরে দাপায় বড় মাছ। শুধু নিজেদের সাচ্ছল্য নয়, এ গ্রামের প্রত্যেকেই সাহায্য পায় ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামাতার কাছ থেকে।

ঈশ্বরচন্দ্রের পাড়া বেড়ানো অভ্যেস, গ্রামে এলেই তিনি বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ান, কোথাও কেউ অভুক্ত আছে কি না সে সন্ধান তিনি ঠিক সংগ্রহ করেন। যে-বাড়িতে গিয়ে দেখেন যে উনুনে হাঁড়ি চড়েনি, সে বাড়ির সকলকে জোর করে টেনে আনেন নিজের বাড়িতে। খুব গোপনে তিনি কয়েকটি পরিবারকে মাসোহারা দিতেও শুরু করেছেন।

তবু কয়েকজন অভুক্ত থেকেই যায়। ঈশ্বরচন্দ্রের সাধ্য নেই তাদের মুখে অন্ন তুলে দেবার। তিনি সাধারণত তিথি নক্ষত্রের হিসেব রাখেন না, কিন্তু প্রতিবার গ্রামে এসেই তিনি মনঃস্থির করেন, এর পরের বার তিথি গণনা না করে তিনি আর গ্রামের মাটিতে পা দেবেন না।

এবারও ঈশ্বরচন্দ্র যে সায়াহ্নে পৌঁছোলেন, তার পরদিনই একাদশী। এদিন সমস্ত বিধবাদের নির্জলা উপবাস। সেই ছাত্র বয়েসেই ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামে এসে এরকম এক একাদশীর দিনে কেঁদে ভাসিয়েছিলেন। ক্ষেত্রমণি নামে একটি বালিকা ছিল তাঁর বাল্যের ক্রীড়া সঙ্গিনী। তখন তাঁর তের চোদ্দ বছর বয়েস, বাড়িতে পা দিয়েই শুনলেন মাত্র তিন মাস আগে ক্ষেত্রমণির বিবাহ হয়েছিল আবার ইতিমধ্যে সে বিধবাও হয়ে গেছে। নিজের ভাতের থালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র, ক্ষেত্রমণি সারাদিন এক ফোঁটা জলও পান করবে না, আর তিনি পেট ভরে আহার করবেন? কেন, ক্ষেত্রমণি কী দোষ করেছে?

সেই ক্ষেত্রমণি অবশ্য মরে গিয়ে বেঁচেছে, তবু প্রতি বৎসরই একজন দুজন বিধবা হয়। এবারেও কুক্ষণে এসে পৌঁছোলেন বিদ্যাসাগর। পরপর দুটি হৃদয়-বিদারক ঘটনা শুনতে হলো। যে-গুরুর কাছে তিনি প্রথম বর্ণমালা শিক্ষা করেছিলেন, সেই কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি সর্বাগ্রেই দেখা করতে যেতেন। ইদানীং অভিমানবশতঃ আর যেতেন না। এবার শুনলেন, কালীকান্ত মারা গেছেন এবং বিধবা করে দিয়ে গিয়েছেন ছ'টি রমণীকে, তার মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠাটির

বয়েস নয়। তাছাড়া তাঁদের এক প্রতিবেশিনীর কন্যা, এগারো বৎসর বয়স্কা বালিকা সত্যভামাও মাত্র দেড় মাস আগে বিধবা হয়েছে।

সংবাদ দুটি শুনে ঈশ্বরচন্দ্রের মন বিষিয়ে গেল। এই সব কথা শুনলে তাঁর দুঃখ যতখানি হয়, রাগও ততটাই হয়। চোখে জল আসে, বুকটা জ্বলে। বিচার-বুদ্ধিহীন অন্ধ সংস্কারে দুধের বাচ্চাদের বিবাহ দেওয়া হয় বৃদ্ধদের সঙ্গে, বিবাহ জিনিসটা কি তা বুঝবার আগেই তাদের কপাল পুড়ে যায়।

অপরাহ্নে চণ্ডীমণ্ডপে বসে পিতার সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন ঈশ্বরচন্দ্র, এমন সময় ভগবতী দেবী এলেন সেখানে। আঁচলে চক্ষু চাপা দিয়ে বললেন, ওরে, মেয়েটার দিকে যে আর চোখ ফেলা যায় না। ওকে জন্মাতে দেখিছি, কোলে পিঠে নিয়িছি কতবার, সেই মেয়ে রাঢ়ী হলো! মেয়েটা ভূঁয়ে পড়ে কেঁদে কেঁদে গড়াচ্ছে।

ঈশ্বরচন্দ্র ক্রোধে নির্বাক হয়ে ঘাড় হেঁট করে রইলেন।

ঠাকুরদাস জিজ্ঞেস করলেন, কার কথা বলতেছ? সত্যভামা? আহা, বেটী আমারও বড় আদরের...আমিও ওর দিকে আর চাইতে পারি না।

ভগবতী বললেন, আগেই আমি বলিছিলুম, ঐ তেজবরের সঙ্গে বিয়ে দিয়োনি—

ঠাকুরদাস পুত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে ঈশ্বর, তুই তো অনেক শাস্ত্র পড়িছিস, তা সব শাস্ত্রে কি বিধবাদের এমন যাতনা দেবারই নির্দেশ রয়েছে? ওদের আর কোনো গত্যন্তর নাই?

ঈশ্বরচন্দ্র মুখ তুলে রাগত স্বরে বললেন, কেন থাকবে না? বিধবাদের পুনর্বিবাহ দেবারও ব্যবস্থা রয়েছে।

—পুনর্বিবাহ? তুই বলিস কি?

—বাবা, আমি নানা শাস্ত্র ঘেঁটে দেখেচি, মোট তিন প্রকার নির্দেশ আছে বিধবাদের জন্য। ব্রহ্মচর্য, অভাবে সহমরণ বা বিবাহ।

—রাজ আজ্ঞায় সহমরণ প্রথা নিবারিত। কলিযুগে ব্রহ্মচর্যই বা কতখানি সম্ভব? সুতরাং বিবাহই একমাত্র উপায়। তুই শাস্ত্রবচন উদ্ধার করে বিধবার পুনর্বিবাহ যে সিদ্ধ, তা প্রমাণ কত্তে পারবি?

ঈশ্বরচন্দ্রের চোখ জ্বলে উঠলো। তিনি পিতাকে বললেন, আপনি জানেন, কোনো কিছু যদি আমি একবার ধরি, তা হলে আর কিছুতে ছাড়ি না। প্রয়োজন হলে আমি সর্বশাস্ত্র মন্থন করে এর স্বপক্ষে যত নির্দেশ আছে সব তুলে আনবো। কিছুদিন ধরেই আমি একথা ভাবছি। যদি আপনি অনুমতি দেন এবং আশীর্বাদ করেন—

ঠাকুরদাস গাঢ় স্বরে বললেন, তুই যদি এ কাজ ভালো বুঝিস তা হলে আমরা নিষেধ কর্বো কেন? এমনকি আমরা নিবারণ করলেও তোর ক্ষান্ত হওয়া কর্তব্য হয় না। লোকের নিন্দাবাদে বা অপর কোনো কারণেও পশ্চাৎপদ হবি না তুই।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, আচ্ছা বেশ, আমি আগামী কল্য থেকেই এ কর্মে সর্বশক্তি নিয়োগ করবো।

সেদিন রাত্রে ঈশ্বরচন্দ্র জননীকে নিভৃতে আবার জিজ্ঞেস করলেন, মা, তখন পিতাঠাকুরের সঙ্গে আমার যেসব কথাবার্তা হলো, তুই তো সব শুনিছিলি, কিন্তু কোনো কথা বললি না কেন? তোর কি এ বিষয়ে মত নেই, মা?

ভগবতী বললেন, আমি ভেবেছিলুম উনি এসব কথা শুনে রাগ করবেন। উনি যখন মত দিলেন, তা হলে আর চিন্তা কি?

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, মা, তবু তোর মতটাও আমি শুনতে চাই।

ভগবতী বললেন, তুই ঠিক বুঝিছিস যে বেধবাদের বিয়ে দেওয়ায় শাস্তরে কোনো বাধা নেই?

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, হ্যাঁ মা, আমি ঠিক বুঝেছি। এ নিয়ে আমি বই রচনা করবো, আমি চেষ্টা করবো সরকারকে দিয়ে আইন পাশ করাবার। অনেক লোক বাধা দেবে আমি জানি, সে সব আমি গ্রাহ্য করি না, কিন্তু আমি তোর মতটা নিতে ইচ্ছা করি।

ভগবতী বললেন, তোকে আমি বারণ করি না, তুই এ কাজ করগে যা—যে যা বলে বলুক। যদি শেষ পর্যন্ত পারিস, আমি তোকে আশীর্বাদ কর্বো, লাখো লাখো দুখিনী মেয়ে তোকে দু-হাত তুলে আশীর্বাদ কর্বে।

কলকাতায় ফিরেই ঈশ্বরচন্দ্র এবার নিমগ্ন হলেন শাস্ত্র সমুদ্রে। তিনি জানেন, নৈতিকভাবে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে কোনো যুক্তিই থাকতে পারে না। যারা বালিকা নয়, না-বালিকা, যারা বিবাহের মর্মই কিছু বোঝেনি, তাদের সারা জীবন বঞ্চিত রাখার বিধান যদি শাস্ত্র দিয়েও থাকে, তবে সে শাস্ত্রই ভ্রান্ত। সে শাস্ত্র পরিত্যাজ্য, সেই লোকাচার, দেশাচারও পরিবর্তনীয়। কিন্তু এই সব কথা এ দেশের সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের বোঝানো মুশকিল। শাস্ত্র উদ্ধার করেই তাদের মুখ বন্ধ করতে হবে। ইংরেজ সরকারও এ দেশের ধর্মবিশ্বাসে সহজে হাত দিতে চায় না। এবং সরকার আইন প্রণয়ন না করলে কেউই এ মীমাংসা মানবে না। সুতরাং শাস্ত্র বচন তুলে প্রমাণাদি দেখিয়ে সরকারের সম্মতি আদায় করতে হবে।

আহার নিদ্রা এক রকম পরিত্যাগ করলেন ঈশ্বরচন্দ্র। সারাদিন সংস্কৃত কলেজের কাজের পর আর বাড়ি ফেরেন না, সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারেই সারারাত কাটিয়ে দেন। সারা রাত্রিই সেখানে বাতি জ্বলে। তিনি স্তূপাকার পুঁথিপত্রের মধ্যে ঠায় জেগে বসে থাকেন।

এক একদিন তাঁর বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় জোর করে তাঁকে টেনে নিয়ে যান নিজের গৃহে। সস্নেহ তিরস্কারে বলেন, তুমি এ কি করতেছ, ঈশ্বর? এমন ভাবে চললে যে অচিরেই ব্যারামে পড়বে!

ঈশ্বরচন্দ্র হেসে বলেন, আমার কিছু হবে না। তুমি তো জানো, যখন জেদ ধরেছি, তখন এর শেষ না দেখতে পেলেই আমার ব্যারাম হবে। দেও বাপু, কী খাবার দেবে, দেও!

রাজকৃষ্ণ বললেন, সে তুমি যাই বলো, দু' বেলা এখানে রোজ দুটি খেয়ে যেতেই হবে। সে কথা দেও! আর দিনের পর দিন না ঘুমালে কি মানুষ বাঁচে!

ঈশ্বরচন্দ্রের এসব কথার উত্তর দেবার সময় নেই। কোনো রকমে নাকে মুখে কিছু খাদ্য গুঁজেই তিনি আবার দৌড়োন সংস্কৃত কলেজের দিকে।

একদিন রাজকৃষ্ণ বললেন, তুমি এত পরিশ্রম যে কচ্চো, কিন্তু এতে লাভ হবে কি? বিধবার বিয়ে দেবার উদ্যোগ তো আগেও কেউ কেউ করেছিলেন। তেনারাও নানান শাস্ত্র বচন ঘেঁটেছিলেন শুনতে পাই। কিন্তু তাতে তো কোনো সুরাহা হয়নি!

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, জানি, আমি খুব ভালো রকমই জানি। ঢাকার রাজা রাজবল্লভ সেন থেকে আরম্ভ করে ডিরোজিও সাহেবের শিষ্যরা পর্যন্ত অনেকেই বিধবার বিয়ে দেবার স্বপক্ষে মত প্রচার করেছেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কেউই তা

কার্যে পরিণত করতে এগিয়ে আসেননি। কিন্তু আমাকে তো তুমি চেনো, আমি এক গোঁয়ার গোবিন্দ, আমার শুধু মুখের কথা নয় কিংবা নিউজ পেপারে প্রবন্ধ ফাঁদাই নয়, ধরেছি যখন তখন একে কার্যে পরিণত আমি করবোই। তার আগে আমার শান্তি নেই।

সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে সারা রাত পড়াশুনো করতে করতে এক এক সময় মাথা গরম হয়ে যায়। মস্তিষ্কের শুশ্রূষার জন্য এক সময় তিনি ভোরের দিকে পথে বেরিয়ে পড়েন। ভোরের শীতল বাতাস যেন স্নিগ্ধ প্রলেপের মতন কাজ করে।

একদিন তিনি সেই রকম অতি প্রত্যুষে পথে ভ্রমণ করতে করতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর আপন মনে বললেন, পেয়েছি!

শূন্য রাজপথে তিনি বিড়বিড় করে আবৃত্তি করে চললেন, কয়েকটি শ্লোকের পর শ্লোক। তারপর, সামনেই যেন তার প্রতিপক্ষরা সব সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের উদ্দেশ্য করে আঙুল উঁচিয়ে বললেন, এইগুলি দিয়েই আমি শুরু করবো আমার প্রস্তাব! দেখি, তোমাদের মধ্যে কোন্ পণ্ডিতের ক'টা মাথা আছে যার দ্বারা আমার এসকল যুক্তি ভঞ্জন করতে পারো!



এতকালের সুনামসম্পন্ন হিন্দু কলেজ বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলো। ছাত্র সংখ্যা কমতে কমতে এমন হলো যে কোনো কোনো শ্রেণীতে তিন-চারজনের বেশী ছাত্র থাকে না। তৃতীয় শ্রেণীতে শুধু চন্দ্রনাথ একা। সে প্রতিদিন বই খাতা নিয়ে যথাসময়ে এসে ক্লাস ঘরে চুপ করে বসে থাকে, হিন্দু শিক্ষকরা কেউ তাকে পড়াতে রাজি নন, ইংরেজ শিক্ষকরা এসে তার মেধাশক্তি দেখে চমৎকৃত হয়ে যান। এরকম সুদর্শন, সুশীল ও মেধাবী ছাত্র এ কলেজে খুব কমই এসেছে।

কিন্তু এভাবে আর কলেজ চালানো সম্ভব নয়। সরকারের শিক্ষাবিভাগ এ কলেজের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করছেন কিন্তু একজন বারবনিতার পুত্রকে কলেজে গ্রহণ করার পর থেকে শহরের উচ্চবংশীয় এবং ধনী হিন্দু সমাজ এ কলেজকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে চাইছে। ওদিকে প্রতিযোগী মেট্রোপলিটান কলেজ কয়েক মাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল, ছাত্র সংখ্যা হলো এক হাজারের বেশী। হিন্দু কলেজ থেকে বিতাড়িত ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন প্রতিশোধ স্পৃহায় নবপ্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান কলেজের জন্য খাটতে লাগলেন প্রাণপণে, শহরের মাথা মাথা ব্যক্তিরা সাহায্য করতে লাগলেন এই নতুন কলেজটিকে, দানশীলা রানী রাসমণি একাই দিলেন দশ হাজার টাকা।

হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ ছাত্র-বেতন কমিয়ে দিলেন, তবু ছাত্রদের আকৃষ্ট করা গেল না। কোনো ভদ্র বংশের ছেলেই আর ঐ বেশ্যাপুত্র চন্দ্রনাথের ছায়াও মাড়াবে না।

এ অবস্থায় আর বেশী দিন আদর্শ বজায় রাখা যায় না। চন্দ্রনাথকে কলেজে

গ্রহণ করার দিনটিতে যে বিপুল হুলস্থূল হয়েছিল, সে তুলনায় চন্দ্রনাথের বিতাড়ন পর্বটি হলো খুবই সংক্ষিপ্ত এবং আড়ম্বরহীন। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ একদিন হঠাৎ তৃতীয় শ্রেণীর কক্ষের দরজার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। তারপর চন্দ্রনাথকে ডেকে বললেন, বালক, এদিকে আইস।

একজন তরুণ ইংরেজ শিক্ষক তখন পড়াচ্ছিলেন চন্দ্রনাথকে। শিক্ষক ও ছাত্র দুজনেই অধ্যক্ষের কণ্ঠস্বর শুনে বিস্মিত। চন্দ্রনাথ ভয়ে ভয়ে উঠে এলো।

অধ্যক্ষ তর্জনী উঁচিয়ে চন্দ্রনাথকে বললেন, তুমি দূর হইয়া যাও! আর কোনো-দিন এ বিদ্যালয়ে আসিবে না। কোনোদিন ইহার দ্বার দিয়া প্রবেশের চেষ্টা করিবে না।

চন্দ্রনাথ বিমূঢ়ভাবে বললো, মহাশয়, আমি আর আসিব না?

—নাঃ!

চন্দ্রনাথ নির্বোধ নয়। সে বুঝেছিল যে তার জন্যই হিন্দু কলেজের ছাত্র সংখ্যা এত কমে যাচ্ছে। এর প্রতিকারের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ একটা কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করবেনই। তার নিজের পাঠতৃষ্ণা এত প্রবল যে সে কলেজ ছাড়ার কথা চিন্তাই করেনি। সে আশা করেছিল, তার জন্য পৃথক কোনো বন্দোবস্ত হবে। অধ্যক্ষ হঠাৎ এমন ক্রুদ্ধভাবে তাকে চলে যেতে বলবেন, এমন সে আশঙ্কা করেনি একবারও। আর এক সপ্তাহ পরেই তার পরীক্ষা শুরু হবার কথা।

সে কাতরভাবে জিজ্ঞেস করলো, মহাশয়, তাহা হইলে ইহার পর আমি কোথায় পাঠ লইতে যাইব?

অধ্যক্ষ হুঙ্কার দিয়ে বললেন, তোমার ইচ্ছা হয় তুমি জাহান্নমে যাইতে পারো। এ কলেজের সহিত তোমার আর কোনো সংশ্রব নাই!

তরুণ শিক্ষকটি উঠে এসে মৃদু প্রতিবাদ করতে গেলে অধ্যক্ষ তাকে থামিয়ে দিলেন। এবং চন্দ্রনাথ তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে অধ্যক্ষ দ্বারবানদের ডাকলেন।

বেশ্যা-পুত্রকে দ্বারবানরাও ঘৃণা করে। ইতিমধ্যে একদিন চন্দ্রনাথ জল খাবার ঘরের কলসী থেকে জল গড়িয়ে খেতে যাওয়ায় দ্বারবানরা তাকে 'আরে আরে জাত মারলে রে, ঘড়া মাৎ ছোঁও' বলে ধমকে উঠেছিল। এখন দ্বারবানরা খুব উপভোগ্য ভঙ্গিতে চন্দ্রনাথের ঘাড় ধরে কলেজ দ্বারের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

প্রথম প্রথম কিছুদিন রাইমোহন নিজে রোজ কলেজ ছুটির পর চন্দ্রনাথকে নিয়ে যাবার জন্য কলেজের বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে থাকতো। ইদানীং আর নিয়মিত আসে না। তা ছাড়া এখন কলেজ ছুটির সময়ও নয়। বেলা দ্বিপ্রহর। চন্দ্রনাথের ভয় হলো, পথে হয়তো আজও ভাড়াটে গুন্ডারা তাকে মারবে। সে একা একা বাড়ি ফিরবে কী করে? তারপর সে ভাবলো, মারে মারুক।

সে ধীর পায়ে হেঁটে প্রবেশ করলো গোলদীঘিতে, বসলো গিয়ে জলের ধারে। একটু পরেই সে আর নিজেকে সামলাতে পারলো না, দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজে সে কাঁদতে লাগলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। তার সর্বাঙ্গ মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। ঠিক কার বিরুদ্ধে যে তার রাগ বা দুঃখ তা সে ঠিক জানে না, কিন্তু তার কিশোর-হৃদয় যেন ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যাচ্ছে!

গোলদীঘিতে নিষ্কর্মা লোক ও বয়াটে ছোকরাদের কখনো অভাব হয় না। বিপরীত দিকের বাজার ফেরত ফড়ে আর ব্যাপারীরাও এখানে গাছতলায় ঘুমোতে আসে। কিন্তু দুপুর রৌদ্রে জলের ধারে বসে থাকা এক কিশোরের কান্নার দৃশ্য কারুকে আকৃষ্ট করে না। কেউ তার পাশে এসে প্রশ্ন করে না, তোমার কী হয়েছে

ভাই?

চন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলো। কান্নারও ক্লান্তি আছে। এক সময় থামতেই হয়। এক সময় চন্দ্রনাথ মুখ তুলে জলের দিকে চেয়ে রইলো। জলে তার মুখের প্রতিবিম্ব। অনেকেই তাকে রূপবান বলে, কিন্তু চন্দ্রনাথের মনে হলো তার মুখখানি যেন কোনো বীভৎস প্রেতের মতন। মানুষের সমাজে তার স্থান নেই। সে রামায়ণ, মহাভারত পড়েছে, মিলটন, বায়রন, শেক্সপীয়ারও পড়েছে কিছু কিছু, এসব কাব্যের জগতের সঙ্গে সে একাত্মতা বোধ করে, কাব্যের নারী-পুরুষদের সে মনে করে অতি আপনজন, কিন্তু তাকে কেউ আপনজন মনে করবে না। এই পৃথিবীতে সে কেন জন্মালো? সে তো স্বেচ্ছায় এ পৃথিবীতে আসেনি। এ পৃথিবীতে কেউই নিজের ইচ্ছেয় আসে না, তবু সে কেন একা অস্পৃশ্য!

প্রথমে সে একটা বই থেকে একটা একটা করে পাতা ছিঁড়ে ভাসাতে লাগলো জলে। তারপর এক সময় সমস্ত বই খাতাপত্র কুটি কুটি করে ছিঁড়ে নিক্ষেপ করলো দীঘিতে। এরপর তার কলেজে আসবার জন্য যে বিশেষ পিরানটি প্রস্তুত করানো হয়েছিল, সেটিও সে খুলে ফেললো গা থেকে। সেটিকেও ছেঁড়ার চেষ্টা করলো। শক্ত বনাতের কাপড়, সহজে ছেঁড়া যায় না, তবু ক্রোধের চোটে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে সে দু-হাতে টানতে লাগলো প্রাণপণে, শেষ পর্যন্ত কুর্তাটিকে ফালাফালা করে ফেলে সে তাতে এক তাল মাটি জড়িয়ে ডুবিয়ে দিল জলের মধ্যে। তারপর সে উঠে দাঁড়ালো। ধুতির কোচা খুলে কোমর বেড়া দিয়ে বাঁধলো শক্ত করে।

বাড়ির দিকে না গিয়ে চন্দ্রনাথ আচ্ছন্নের মতন ঘুরতে লাগলো পথে পথে। কোনোদিন সে একা এমনভাবে হাঁটেনি, সে এ শহরের রাস্তাঘাটও সব চেনে না। তবু যেদিকে দু'চোখ যায় সে যাবে।

এক জায়গায় দেখলো একজন সাহেবের তদারকিতে এক দঙ্গল মজুর গাছ-পালা কেটে সাফ করছে আর আরেক দঙ্গল মজুর একটা পুকুর ভরাট করছে। এ শহরের পথের দু পাশে দু পা অন্তর একটা করে পুকুর বা ডোবা। তার পাশে ঝোপঝাড়। সম্প্রতি সরকার বাহাদুর উদ্যোগ নিয়েছে ডোবাগুলি ভরাট করবে আর ঝোপঝাড় আগাছার নিকেশ করবে। সন্ধে হতে না হতেই মশার উৎপাতে টেঁকা যায় না, ওলাউঠোয় প্রতি বছরই বাড়িকে বাড়ি ছারখার করে দিচ্ছে। এইসব আগাছার জঙ্গল আর পচা জলের জন্যই নাকি রোগ ছড়ায়।

চন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো সেই কর্মকাণ্ড। কিন্তু একটু পরেই সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, আবার তার চোখে জল আসে। ধুতির খুঁট তুলে চোখ মুছে সে আবার হাঁটতে শুরু করে।

একটু পরে একটি বিরাট ধুমধামের শোভাযাত্রার মধ্যে পড়ে গেল সে। কিসের শোভাযাত্রা তা প্রথমটায় বোঝাই যায় না। একদল লোক খোল-করতাল বাজিয়ে ধেই ধেই করে নাচছে আর চিল্লাচিল্লি করে একটা গান গাইছে। শোভাযাত্রার অগ্রভাগে একটা রথের মতন জিনিস বয়ে নিয়ে যাচ্ছে কিছু লোক, দূর থেকে সেটিকে ভালো করে দেখতে পেল না চন্দ্রনাথ। লোকগুলি সকলেই যেন একেবারে ভাবে বিভোর। চন্দ্রনাথের একবার মনে হলো এ বুঝি কোনো খানদানি মানী লোকের মড়া নিয়ে শ্মশানযাত্রা হচ্ছে।

একটু মনোযোগ দিয়ে সে গানটা শুনলো।

যিনি গুরু তিনি কৃষ্ণ না ভাবিও আন্
গুরু তুষ্টে কৃষ্ণ তুষ্ট জানিবা প্রমাণ।

প্রেমারাধ্যা রাধাসমা তুমি লো যুবতী
রাখ লো গুরুর মান যা হয় যুকতি।

শ্মশানযাত্রায় কি এ গান হয়? তাছাড়া খোল করতালধারীরা গাইতে গাইতে এমন লাফাচ্ছে যে দেখলে হাসি পায়। এদের দেখবার জন্য ভিড় জমে গেছে পথের দু পাশে। বারান্দা থেকে উঁকি মারছে স্ত্রীলোকেরা। চৌমাথার বেনের দোকানের সামনে ভর্তি লোক, তাদের নানারকম বেশ, কারুর কফ্‌ ও কলারওয়ালা কামিজ, রুপোর বগলস্‌ আঁটা শাইনিং লেদার বা ইণ্ডিয়া রাবারের জুতো, কেউ পরেছে চায়না কোট, কাঁধে ক্রেপের চাদর, হাতে স্টিক। কেউবা খ্যাংরাগুঁপো, গামছা-কাঁধে। কেউ ছোট আদালতের উকিল। কেউ সেকশন রাইটার, টাকাওয়ালা গন্ধবেনে, কেউ তেলী বা কেউ কামার অথবা ফলারে যজমেনে বামুন, কোথাও বা চার-পাঁচজনের দল বাঁধা নারী, তাদের কোলে কাঁখে বাচ্চা।

যে-কোনো হুজুগেই শহরের পথে এমন ভিড় জমে যায়। কেউ ভক্তিভরে কীর্তনিয়াদের উদ্দেশে প্রণাম করলো, কেউ বা নানান টিটকিরির মন্তব্য ছুঁড়তে লাগলো। কেউ বললে, চোখে তেমন জল নেই ক্যান, বাপ? বেশ্মারা আরও বেশী কেঁদে ভাসায়। কেউ বললে, আহা-হা, জয় গুরু গুরু, এবার হলো কলির শুরু! কেউ বললো, হরি হে মাধব, চান করবো না গা ধোবো! কেউ আরও উচ্চস্বরে বৈষ্ণবদের চেয়ে শাক্তদের গলার জোর বেশী প্রমাণ করবার জন্য বললো, ব্যোম কালী কোলকেতাওয়ালি!

কীর্তনিয়ারা তাতে একটুও দমে না। একজন খোলধারী মিছিল থেকে বেরিয়ে এসে দর্শকদের উদ্দেশ্য করে চট চটাং চট চটাং করে খোল বাজিয়ে নাচতে নাচতে ঝুঁকে পড়ে গান ধরলো: "তাথইয়া তাথইয়া নাচত ফিরত গোপাল ননী চুরি করি খাঞীছে,/আরে আরে ননী চুরি করি খাঞীছে তাথইয়া তাথইয়া..."। অমনি দর্শকরা হরিবোল হরিবোল দিয়ে উঠলো।

চন্দ্রনাথ ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। রথটি দেখবার জন্য তার কৌতূহল।

রথটি নানারকম ফুল ও রাংতার ঝালর দিয়ে সাজানো। তার ওপর কোনো বিগ্রহ নেই, বসে আছেন এক জ্যান্ত গোঁসাই। আজ পর্যন্ত এ শহরে কেউ রোগা চেহারার গোঁসাই দেখেনি, ইনি আবার একাই তিনজনের সমান। জনা ছ'য়েক লোক রথটি ঠেলতে ঠেলতে একেবারে গলদ্‌ঘর্ম। গোঁসাইজীর শরীরটা প্রকাণ্ড, মুণ্ডিত মস্তক, মধ্যে তরমুজের বোঁটার মতন চৈতন ফক্কা। সর্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ। নাকে তিলক ও অদৃষ্টে (কপালে) এক ধ্যাবড়া চন্দন, ঠিক যেন মনে হয় কাকের অপকর্ম। পাছে পাপীতাপী এবং অবিদ্যাদের ওপর চোখ পড়ে সেইজন্য গোঁসাইজী চক্ষু বুজে নাম জপ করছেন।

ইনি মল্লিকবাড়ির কুলগুরু নদেরচাঁদ গোস্বামী জিউ বাবা। যত বড় ধনীর বাড়ির গুরু, তত বেশী জাঁকজমক, নইলে যজমানের ইজ্জৎ থাকে না। ভক্ত শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে সারা শহর কাঁপিয়ে আগমন ঘটালে লোকে বলে, হ্যাঁ, অমুক বাড়ির গুরুদেব এলেন বটে!

এত হই-চইয়ের মধ্যে মিশে গিয়ে খানিকক্ষণ হাঁটতে চন্দ্রনাথের মন্দ লাগলো না। কিন্তু কিছুতেই তার মনের ভার কাটে না। ঢেউয়ের মতন হঠাৎ হঠাৎ অভিমান এসে আছড়ে পড়ে বুকে। এত লোক আনন্দ ফুর্তি করে নাচতে নাচতে যাচ্ছে, ওরা তো কেউ জানে না ওদের মধ্যে বুক ভরা দুঃখ নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এক কিশোর। নিজের অজ্ঞাতসারেই চন্দ্রনাথ আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

চন্দ্রনাথকে কাঁদতে দেখে এক ভক্ত তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে বসিয়ে দিল রথের ওপরে, তারপর গদগদ স্বরে বলতে লাগলো, অহো, অহো, অহো! গুরো, তুমিই সত্য! ধন্য তোমার মহিমা! বালককেও তুমি তরালে। বল বাবা, বল, জয় গুরু, জয় গুরু!

চন্দ্রনাথ হাত পা মুচড়ে নেমে পড়লো। সে কুষ্ঠরোগীর মতন অস্পৃশ্য, যদি এরা সে কথা জেনে যায়? সে মিছিল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, সেই ভক্তপ্রবর তার হাত ধরে বললো, যাস কই, ওরে যাস কই? চল, আমাদের সঙ্গে চল, গুরুর প্রসাদ পাবি, তেমন জিনিস তোর বাপের জন্মে খাসনি।

হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে পালালো চন্দ্রনাথ। তার এখন বুক হালকা করা দরকার। সে একটি মসজিদের সিঁড়িতে বসে আবার কাঁদলো অনেকক্ষণ। তারপর সেখানেই কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

তার যখন ঘুম ভাঙলো, তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে, সন্ধ্যা সমাগত। সে দেখলো তার পাশে কয়েকটা পাই পয়সা ও আধলা পড়ে আছে। রমজানের মাস, ভক্ত মুসলমানরা নামাজ সেরে বেরুবার সময় ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে দেখে মনে করেছে কোনো অনাথ আতুর, তাই কেউ কেউ কিছু দান করে গেছে।

চন্দ্রনাথ সে পয়সা ছুঁলো না। ঘুম ভাঙার পর প্রথমে সে দিশাই করতে পারলো না, এখন ভোর না সন্ধ্যা। তারপর একটু ধাতস্থ হবার পর সে আবার এক বিড়ম্বনায় পড়লো। এটা কোন্ জায়গা? সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোয় সব কিছুই অচেনা মনে হয়। সে এখান থেকে বাড়ি ফিরবে কী উপায়ে? একবার তার মায়ের কথা মনে পড়লো। এই সময় তার মা বেশভূষা পরিবর্তন করে চোখে সুর্মা আঁকে, সারা অঙ্গে আতর ছিটিয়ে রাত্রের বাবুদের মনোরঞ্জনের জন্য তৈরি হয়। মায়ের প্রতি চন্দ্রনাথের কোনো রাগ হলো না, কিন্তু সে আর বাড়ি ফিরে যাবে না।

মসজিদের কাছে একটা কাবাবের দোকান। সেখানে কিছু লোক দাঁড়িয়ে জটলা করছে। কোনো একটা ব্যাপারে তাদের বেশ উত্তেজিত মনে হয়। চন্দ্রনাথ সেদিকে এগিয়ে গিয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলো, এ জাগাটার নাম কী?

লোকগুলো নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত, কেউ উত্তর দিল না। দোকানটিতে মস্ত বড় চুল্লিতে ঝলসানো হচ্ছে মাংস, সেই গন্ধে চনচনিয়ে উঠলো খিদে। কলেজ থেকে ফিরে এই সময় চন্দ্রনাথ রোজ তার খাবার খায়। আর কোনোদিন সে কলেজে যাবে না। সে বাড়ি ফিরে গিয়ে সব কথা বললেই রাইমোহনদাদা আবার তাকে নিয়ে উঠে পড়ে লাগবে। রাইমোহনদাদা অতি ধুরন্ধর, হয়তো নাম ভাঁড়িয়ে চন্দ্রনাথকে আবার অন্য কোনো জায়গায় ভর্তির ব্যবস্থা করবে। সেখানেও কিছুদিন পর চন্দ্রনাথ ধরা পড়ে যাবে নিশ্চিত, আবার সেখান থেকে তাকে বিতাড়িত করা হবে। না, চন্দ্রনাথ আর এই অপমান সহ্য করতে রাজি নয়। সে আর জীবনে কোনো বই ছোঁবে না।

সে এবার দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলো এই জায়গাটির নাম। এবং জানলো যে এটা গরানহাটা। আর ঠিক তখনই দূর থেকে তিন চারজন লোক ছুটে এলো এদিকে।

তাদের মধ্যে একজন ভয়ংকর চেহারার লোক হুংকার দিয়ে বললো, আরে কাল্লু! তারপরই তার হাতে ঝলসে উঠলো একটা ছুরি, সে ঝাঁপিয়ে পড়লো আগের জটলাটার মধ্যে।

চন্দ্রনাথ এমনই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল যে কী করবে তা বুঝতে পারার আগেই কিছু লোক তাকে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে ফেলে দিল। আচমকা পড়ে গিয়ে তার মাথায় বেশ চোট লাগলেও সে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দেখলো, এরই মধ্যে জায়গাটা একদম ফাঁকা হয়ে গেছে। সবাই পালিয়েছে, দোকানদারও ঝাঁপ ফেলে দিয়েছে, শুধু রাস্তার ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে একটা লোক, তার বুকে একটা আমূল ছুরি বেঁধা। লোকটার বুক ভেসে যাচ্ছে রক্তে, তখনও সদ্য মুণ্ডকাটা ছাগলের মতন কেঁপে কেঁপে উঠছে তার দেহ। একটুবাদেই একেবারে নিথর হয়ে গেল।

এরকম ভয়ংকর দৃশ্য চন্দ্রনাথ কখনো দেখেনি। তার চক্ষু দুটি যেন স্থানচ্যুত হতে চাইছে, তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে। লোকটি কি সত্যিই মরে গেল? একটু আগে এই লোকটিই চ্যাঁচাচ্ছিল তারস্বরে, এর মধ্যেই সব শেষ? একবার সে ভাবলো, কাছে গিয়ে দেখবে লোকটির নাক দিয়ে এখনো নিশ্বাস পড়ছে কি না। কিন্তু পর মুহূর্তেই তার ভেতরকার সহজাত আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি তাকে বলে দিল পলায়ন করতে। সে পিছন ফিরে অন্ধের মতন দৌড় লাগালো।

দৌড়োতে দৌড়োতে কত পথঘাট পেরিয়ে গেল চন্দ্রনাথ, তার কোনো হিসেব নেই। অনেক অন্ধকার পথ পেরিয়ে সে চলে এলো একটি আলো উজ্জ্বল পল্লীতে। এলাকায় অনেক বাড়ির দরজায় জাহাজীল্যাম্প হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাজ-গোজ করা স্ত্রীলোকেরা। পথে মাতালের হল্লা ও জুড়িগাড়ির ভিড়। এইসব স্ত্রীলোকরা কোন্ উদ্দেশ্যে রাত্রিবেলা এত বেশী প্রসাধন করেছে, তা বুঝতে চন্দ্রনাথের কোনো ভুল হলো না। এ পল্লীর নাম যদিও সোনাগাছী কিন্তু চন্দ্রনাথের ভ্রম হলো সে বুঝি নিজের বাড়ির কাছে এসে পড়েছে। সে আবার প্রাণপণে ছুটলো।

বেশ কিছুক্ষণ পর একটা অন্ধকার অঞ্চল দেখে চন্দ্রনাথ একটা অশ্বত্থ গাছের নীচে বসে জিরোতে লাগলো। চোখের সামনে ভেসে উঠছে সেই ছুরিবেঁধা লোকটির শরীর। লোকটার শরীর যেমনভাবে ছটফট করছিল, ঠিক সেইভাবেই যেন চন্দ্রনাথের শরীরও কাঁপছে। মৃত্যু এত সহজ? লোকটার নাম কাল্লু, ওর বাড়ির লোক নিশ্চয়ই এখনো কিছু জানে না। ওর মা হয়তো ওর জন্য রাত্তিরবেলা ভাত বেড়ে অপেক্ষা করে থাকবে। ওরা ভাত খায় না, রুটি খায়। রুটি আর কাবাব। কাল্লু আর কোনোদিন রুটি আর কাবাব খাবে না।

আজ চন্দ্রনাথ বাড়িতে না ফিরলেও তার মা হীরেমণি কোনো বাবুর বাড়িতে মুজরো গাইতে যাবে? রাইমোহনদাদা আজও একতলার সিঁড়ির নীচের ঘরে মদের আসর বসাবে? হীরেমণি নিজে হাতে রোজ বিকেলে ছেলেকে খাবার দেয়। আজ তো বিকেল কখন পেরিয়ে গেছে, মা এখন কী করছে? মা কি এতক্ষণে জড়ির চুমকি বসানো ঘাঘরাটা খুলে আবার আইপৌরে শাড়ি পরে এখন কাঁদতে বসেছে? কিংবা 'কতা দেওয়া আচে, যেতেই হবে গা, চাঁদু ফিরলে একটা খপর পাঠিয়ো' বলে মা উঠে বসেছে কোনো বাবুর জুড়িগাড়িতে? রাইমোহনদাদা খুঁজতে বেরিয়েছে তাকে?

চন্দ্রনাথ ভাবলো, সে যদি আজই মরে যায়, তা হলে তারপরও কি তার মা বাবুদের কাছে যাবে? চন্দ্রনাথের ধারণা হলো, সে মরে গেলে তার মা খুব কাঁদবে, শুধু কাঁদবে, আর কোনোদিন ঐ পাপের জীবনে যাবে না। তা হলে তো তার মরে যাওয়াই ভালো। কত সহজে মরে যাওয়া, কেউ তার বুকে একটা ছুরি বসিয়ে দিলেই হলো। কিংবা, সে নিজেই নিজের বুকে একটা ছুরি বসিয়ে দিতে পারে।

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে চন্দ্রনাথের পেছনে কেউ একটা লাথি কষিয়ে বলে উঠলো, এই শাল্লো! ভাগ!

চন্দ্রনাথ ধড়ফড় করে উঠে দেখলো মুখ ভর্তি দাড়িওয়ালা একজন লোক, খালি গা, পরনে একটা শতচ্ছিন্ন ধুতি, হাতে একটা বাঁশের লাঠি। মনে হয় কোনো পাগল!

লোকটি বললো, আমার জ্যায়গায় শুইচিস শাল্লো! কাঁচা খেয়ে ফেলবো! আমার সাত পুরুষের ভিটে, এখেনে যো আয়গা, ও মরে গা!

চন্দ্রনাথ এবার তাকিয়ে দেখলো, গাছের গোড়ায় একটা মাটির হাঁড়ি আর একটা পুঁটলি পাকানো কম্বল রয়েছে। এই লোকটি এখানে শোয়, চন্দ্রনাথ ভুল করে সে জায়গা দখল করেছিল।

লোকটা চন্দ্রনাথকে মারবার জন্য লাঠিটা তুলেছে, অমনি চন্দ্রনাথ হাতজোড় করে অনুনয় করে বললো, মেরো না, মেরো না, আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।

লোকটা বললো, যাবি না তো, তোর খাল খিঁচে দেবো, শাল্লো!

চন্দ্রনাথ সুরুত করে পালিয়ে গেল সেখান থেকে। ভয়ে তার বুকের মধ্যে দুমদাম শব্দ হচ্ছে। কাল্লুকে ছুরি-বেঁধা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে চন্দ্রনাথ ভয় পেয়েছিল, কিন্তু এই লোকটি লাঠি তুলে দাঁড়ানোতে চন্দ্রনাথ যে ভয় পেল, তা একেবারে অন্যরকম। এ তার নিজের মৃত্যুভয়। অথচ একটু আগেই তো চন্দ্রনাথ মরে যেতে চাইছিল।

না। এভাবে মরা চলবে না। চন্দ্রনাথ মরবেই, তবে অন্যের হাতে নয়, নিজের ইচ্ছায়। সবচেয়ে ভালো জলে ডুবে মরা। তাদের পাশের বাড়ির চপলা নামে এক বালিকা গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে ডুবে মরেছিল। চন্দ্রনাথও গঙ্গায় ঝাঁপ দেবে। সে সাঁতার জানে না। গঙ্গায় মরলে সব পাপী তাপীই উদ্ধার পেয়ে যায়। মা গঙ্গা সবাইকে বুকে আশ্রয় দেন। তিনি সকলের মা, তিনি জাতি বিচার করেন না, দীন দুঃখীদেরও তিনি বুকে টেনে নেন। এখন চন্দ্রনাথকে খুঁজে বার করতে হবে, কোথায় গঙ্গা।

কিছুটা দৌড়ে, কিছুটা হেঁটে চন্দ্রনাথ আবার পোঁছে গেল লোকালয়ে। এ পল্লীটির নাম বাগবাজার। এখানে অনেক ধনী মানুষদের অট্টালিকা রয়েছে। একটি বাড়ির সামনে অনেক মানুষের ভিড়। এই সব ধনীদের বাড়িতে বারো মাসে তের পার্বণ লেগেই থাকে। এই বাড়ির অন্দরে খুব খাওয়াদাওয়া চলছে বোঝা যায়। বড় বড় ঝুড়িতে করে এঁটো কলাপাতা আর মাটির গেলাস ফেলা হচ্ছে রাস্তায়। সিংহদ্বারের কাছে ভিড় জমিয়েছে কাঙালীর দল। চন্দ্রনাথও তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। তার পাকস্থলী যেন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে ক্ষিধের আগুনে, গলা একেবারে ফেটে যাচ্ছে তৃষ্ণায়। মৃত্যু চিন্তার চেয়েও তার খাদ্য চিন্তা অনেক বেশি প্রবল হয়ে উঠলো।

সে দেখলো একজন লোক বাড়ির ভেতর থেকে এক বৃহৎ চাঙ্গারি ভর্তি লুচি এনে কাঙালীদের উদ্দেশে হেঁকে বললো, সব সার দিয়ে বসে যা, গোলমাল করবিনি, সবাই পাবি, অনেক খাবার রয়েচে, মাংস মেঠাই সব পাবি, বসে যা—

কাঙালীরা হুড়মুড় করে বসে গেল রাস্তার ওপর সার বেঁধে। একজন পান্ডা গোছের কাঙালী হেঁকে বললো, জয় হোক, বোসবাবুদের খাওয়া যেন অমের্ত! আর কোনো বাবুদের এমন দরাজ দিল নেই!

চন্দ্রনাথও বসে পড়েছে তাদের মধ্যে। তার গৌর বর্ণ, সুঠাম শরীর। কাঙালীদের মধ্যে তাকে একেবারেই বেমানান লাগে। তার কখনো খাবার কষ্ট হয়নি, সে যখন যা ইচ্ছে হয়েছে পেয়েছে, কিন্তু আজ কাঙালীদের সঙ্গে বসতে তার একটুও দ্বিধা হলো না। তার দু-পাশে যারা বসেছে, তারা একটু অবাক হয়ে দেখলো তাকে।

চারখানা লুচি ও কুমড়োর ছক্কা খাওয়া হয়ে গেছে, এর পরেই আসছে মাংস। এইটুকু খেয়ে চন্দ্রনাথের ক্ষিধে যেন আরও বেড়ে গেছে, সে অধীর প্রতীক্ষায় আঙুল চাটছে। এমন সময় নিয়তি দেবী তার সঙ্গে আর একবার পরিহাস করলেন।

পরিবেশনকারী ব্যক্তিটি চন্দ্রনাথের সামনে এসে থমকে গেল। কালো কালো নোংরা চেহারার কাঙালীদের মধ্যে চন্দ্রনাথকে মনে হয় যেন কোনো দেবদূত। পরিবেশনকারীটি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, তুমি কে গা? এখেনে বসোচো? তুমি কাদের বাড়ির ছেলে?

আর তখনই চন্দ্রনাথেরই বয়েসী এক কিশোর, ঐ বাবুদের বাড়িরই ছেলে, এগিয়ে এসে চন্দ্রনাথকে দেখে ভূত দেখার মতন চমকে উঠলো। সে বললো, ওমা, এই তো সেই ছোঁড়া! ও ছোটকাকা, দেকবে এসো, দেকবে এসো!

পরিবেশন বন্ধ হয়ে গেছে। দেউড়ির ওপাশে এক প্রবীণ ব্যক্তি বিশিষ্ট অভ্যাগতদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি এগিয়ে এসে বললেন, কী হয়েচে? গোলমাল কিসের?

কিশোরটি বললো, ছোটকাকা, এই দ্যাকো, এই সেই ছোঁড়া। এর জন্যিই তো আমার হিন্দু কলেজে যাওয়া তোমরা বন্ধ করে দিয়েচো! এই সেই বেশ্যার ছেলেটা।

বেশ্যার ছেলে যেন একটা দারুণ দর্শনীয় বস্তু। এই হিসেবে অনেকেই ভিড় করে দেখতে এলো চন্দ্রনাথকে। এমন কি কাঙালীরাও এমন একজনের সঙ্গে পঙ্‌ক্তি ভোজনে বসাটা অসম্মানজনক মনে করে হই হই করে উঠলো। যেন তাদেরও জাত চলে যাবে।

বাবুদের বাড়ির কিশোরটি বললো, এ ছোঁড়া এসে আমাদের কেলাসে ভর্তি হলো, ওর মা-মাগীটা নিজে নিয়ে এয়েছেল ওকে, সবাই দেকেচে—!

তারপরই সে, হারামীর বাচ্চা, আমাদের সব্বোনাশ করে আবার আমাদের বাড়িতেই খেতে এয়েচে! এই বলে এক লাথিতে উলটে দিল চন্দ্রনাথের খাবারের পাতা। তার ছোটকাকা চন্দ্রনাথের কান ধরে বললো, দূর হ! বেজম্মা কাঁহিকা!

চন্দ্রনাথ একটা কথাও বললো না। দু-তিনজন মিলে তাকে তুলে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল খানিকটা। তারপর দ্বিপ্রহরে কলেজের দ্বারবানরা মিলে যেভাবে তাকে ছুঁড়ে দিয়েছিল এখন এরাও যেন তার চেয়েও বেশী প্রতিহিংসায় আরও জোরে ছুঁড়ে দিল তাকে।

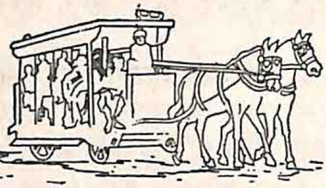
তবু এবার শরীরে কোনো রকম ব্যথা বোধ করলো না চন্দ্রনাথ। পড়ে গিয়েই সে তাকালো এদিক ওদিক। কাছেই একটা পাথরের চাঙ্গার দেখতে পেয়ে সেটা হাতে নিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো। যারা তাকে ছুঁড়ে দিয়েছিল, তাদের মধ্যে পরিবেশনকারী ব্যক্তিটিকে দেখে সে উন্মাদের মতন ছুটে এসে সেই পাথরের চাঙড় দিয়ে মারলো তার মাথায়। লোকটি বাপ রে, মলাম রে, বলে পড়ে গেল ধপাস করে। চন্দ্রনাথ পাথরটি জোরে ছুঁড়ে মারলো অন্যদের দিকে, তারপর প্রাণপণে ছুটলো।

পাইক বরকন্দাজ সমেত অনেকেই অনেক দূর পর্যন্ত তাড়া করে এসেছিল,

কিন্তু কিছুতেই তার নাগাল পেল না।

চন্দ্রনাথ ক্রমে এক সময় পৌঁছোলো গঙ্গার ধারে। কিন্তু জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যার কথা তখন আর তার মনে এলো না। তার হাত চটচট করছিল। প্রথমে সে ভেবেছিল এঁটো লেগে আছে, কিন্তু নদীতীরে জ্যোৎস্নায় সে ডান হাতের পাঞ্জাটি তুলে দেখলো, সেখানে লেগে আছে রক্ত। মানুষের রক্ত।

জলের কাছে নেমে গিয়ে সযত্নে হাত ধুতে লাগলো চন্দ্রনাথ। এক হিসেবে আজ তার আর একবার হাতেখড়ি হলো।



ভূকৈলাশের রাজবাড়িতে এক মহাপুরুষ এসেছেন। শহরের সকলের মুখে মুখে এখন শুধু সেই মহাপুরুষের কথা। কেউ বললো, ইনি সত্যযুগের মানুষ, সেই যে শ্রীরামচন্দ্রের আমলে ধ্যানে বসেছিলেন, তারপর আর খেয়ালই করেননি যে কত হাজার বছর কেটে গেছে। কেউ বললেন, ইনি বাল্মীকি মুনির ছোট ভাই, এনারও সারা গায়ে উইয়ের ঢিপি। কেউ বললো, শুধু উইয়ের ঢিপি নয়, তার ওপর আবার বড় বড় বট ও অশ্বত্থ গাছও গজিয়ে গেছে।

নবীনকুমার ঠিক করলো, সেই মহাপুরুষকে দেখতে যাবে।

বিবাহের পর নবীনকুমার অকস্মাৎ অনেকখানি বদলে গেছে। আর সে তার মায়ের নয়নের মণি, আদরের দুলালটি নেই। সে সদ্য ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রম করলেও এখন একজন বিবাহিত পুরুষ এবং সিংহ বাড়ির কর্তা। বিধুশেখর বহুমূত্র রোগে কাবু হয়ে পড়েছেন, আগেকার মতন আর প্রতিদিন তিনি এ গৃহে আসতে পারেন না, সম্প্রতি কিছুদিন তিনি একেবারেই শয্যাশায়ী। এদিকে গঙ্গানারায়ণও যে সেই মহাল পরিদর্শনে গেছে, তারপর সাড়ে পাঁচ মাস হয়ে গেল তার আর কোনো সংবাদ নেই।

বিম্ববতী গঙ্গানারায়ণের জন্য খুবই উৎকণ্ঠিত। গঙ্গানারায়ণ তো কখনো এমন করে না। অন্তত লোক পাঠিয়ে সে তো একটা খবর দিতে পারতো। বিম্ববতী বিধুশেখরকে বলেছিলেন গঙ্গানারায়ণের একটা খোঁজ নিতে, কিন্তু বিধুশেখর গা করেননি। তিনি বলেছিলেন, বজরা তো এখনো ফেরেনি, তাহলে দ্যাকো গে তোমার বড় পুত্তুর কোতায় না কোতায় হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্চে!

বিম্ববতী এরপর দিবাকরকে ডেকে স্বয়ং হুকুম দিয়েছিলেন গঙ্গানারায়ণের সংবাদ আনবার জন্য দ্রুতগামী ছিপে কোনো কর্মচারীকে প্রেরণ করতে। দিবাকর তৎক্ষণাৎ মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল। কিন্তু গঙ্গানারায়ণের খবর জানতে তো তার ভারী গরজ! গঙ্গানারায়ণ যতদিন দূরে দূরে থাকে, ততদিনই তার পোয়া বারো। তাছাড়া সে একটি বাংলা সংবাদপত্রে পাঠ করেছে যে ইব্রাহিমপুর পরগনায় নীলকর সাহেব ও স্থানীয় রায়তদের মধ্যে নাকি একটা হাঙ্গামা হয়ে গেছে। গঙ্গানারায়ণ সেই হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়লে তো আরোই মঙ্গল। সুতরাং, গঙ্গানারায়ণ গেছে নদীয়ায়, আর তার সংবাদ আনাবার জন্য দিবাকর একজন

পাইককে সত্বর পাঠিয়ে দিলে খুলনার দিকে। বিম্ববতী মাঝে মাঝে ডেকে প্রশ্ন করেন। দিবাকর নানাপ্রকার ভুজং ভাজুং দেয়।

বিয়ে দিলে ছেলে পর হয়ে যায়। নবীনকুমারের বিবাহের ছ' মাসের মধ্যেই বিম্ববতী অনুভব করলেন, তাঁর বুকের ধন ছোটকু আর তাঁর বাধ্য নেই। নবীন-কুমারের পত্নী কৃষ্ণভামিনীর বয়েস মাত্র আট বৎসর, ঐ বয়েসী বধূরা সাধারণত পিত্রালয়ে থাকে। কিন্তু কৃষ্ণভামিনী তার খেলার পুতুল, তাকে সর্বক্ষণ নবীন-কুমারের কাছে চাই। শুধু তাই নয়, এতকাল সে মায়ের পাশে শুয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়েছে। এখন নবীনকুমার বিবাহিত পুরুষ, সে অবিকল কোনো বয়স্ক ব্যক্তির মতন নিজেই ব্যবস্থা করে পৃথক কক্ষে তার খেলার সঙ্গিনীকে নিয়ে রাত্রিযাপন করে।

এখন প্রতি রাত্রে বিম্ববতীর বুক নিদারুণভাবে খালি খালি লাগে, তাঁর ঘুম আসে না।

নবীনকুমার অন্যান্য ব্যাপারেও স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে। সে মায়ের অনুমতি না নিয়েই এখন বাড়ির বাইরে যায়। বিম্ববতী তাকে নিষেধ করতে গিয়ে বার বার হার মেনেছেন। নবীনকুমার মুখের ওপর জানিয়ে দেয়, আমি তো আর দুধের বাছাটি নেই মা, যে কাবুলি মেওয়াওয়ালারা আমায় ঝোলায় পুরে নিয়ে যাবে আর গরম কড়ার ওপর উল্টো করে ঝুলিয়ে রেকে নাক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বার কর্বে!

নবীনকুমারকে এখন সর্ব ব্যাপারে তাল দিচ্ছে দিবাকর। মনে মনে সে মতলব এঁটে রেখেছে যে এই ছোটবাবুটিকে একবার খরচের হাত ধরিয়ে দিতে পারলেই হয়। অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক এই বালক, একবার এ খরচ শুরু করলে পারিষদরাই তো তার মোটা ভাগ পাবে। বাবু রামকমল সিংহ ছিলেন দিলদরিয়া মানুষ, তাঁর আমলে দিবাকরের বিলক্ষণ দশ টাকা উপরি রোজগার হতো। তিনি অকালে গত হওয়ায় দিবাকর বেশ অসুবিধার মধ্যে পড়েছে। বিধুশেখরের তীক্ষ্ন নজর হিসাব-পত্রের দিকে। আর গঙ্গানারায়ণ তো কলেজে-পড়া ম্লেচ্ছভাবাপন্ন ছোঁড়া। তার সেরকম বুনিয়াদি উঁচু নজরই নেই যে পাঁচ টাকার জায়গায় পঞ্চাশ টাকা ব্যয় করবে। আরে, কলকাতা শহরে বাবু সমাজে দু'হাতে টাকা না ওড়ালে যে মান থাকে না, লোকে আড়ালে ছ্যা ছ্যা করে, সে জ্ঞানই হলো না গঙ্গানারায়ণের। দিবাকরের খুব আশা নবীনকুমারের মতি এদিকে ফেরানো যাবে।

গত মাসে নবীনকুমার নিজে গিয়ে হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়ে এসেছে। বিম্ববতীর আপত্তিতে সে কর্ণপাত করেনি, এবং বিধুশেখরেরও আপত্তি জানাবার মতন আর কোনো যুক্তি নেই। হিন্দু কলেজে হীরা-বুলবুল পর্ব সমাপ্ত হয়েছে, বিতাড়িত হয়েছে চন্দ্রনাথ, এখন আর বেশ্যাপুত্রের সংসর্গে থাকার কোনো প্রশ্ন নেই। হিন্দু কলেজে আবার আস্তে আস্তে ফিরে আসছে প্রাক্তন ছাত্ররা, আসছে বড়ঘরের ছেলেরাও। ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন সাহেবের নতুন কলেজের যতই রবরবা হোক, তবু হিন্দু কলেজ কতদিনের ঐতিহ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। বাপ-কাকারা যেখানে পড়েছে, অনেক ছাত্র সেখানেই পড়তে চায়।

কলেজ থেকেই নবীনকুমার শুনে এসেছে মহাপুরুষের কাহিনী। ছাত্ররা সবাই বলাবলি করছিল ঐ কথা। ক্লাসে তো এইসব গল্পই হয়।

পুনর্গঠিত হিন্দু কলেজে আগেকার সেই শৃঙ্খলা আর নেই। কোনো কিছু একবার ভাঙলে ঠিক মতন জোড়া লাগানো শক্ত। আগে হিন্দু কলেজে ভর্তি হওয়াই ছিল একটি কঠিন ব্যাপার। বংশ পরিচয়, বিত্ত এবং মেধার পরিচয় না নিয়ে কোনো

ছাত্রকে গ্রহণ করা হতো না। হীরা-বুলবুল পর্ব চুকে যাবার পর কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তোষামোদ করে ছাত্রদের ডেকে এনেছেন। এই সুযোগে অনেক অগা বগা দুঃশীল বালকও ঢুকে পড়েছে ছাত্র সেজে। পড়াশুনোর বদলে ক্লাসের মধ্যে এখন হই হট্টগোলই হয় বেশী।

এই পরিবেশটি নবীনকুমারের বেশ পছন্দ। অতি অল্পদিনেই সে সর্দার গোছের হয়ে উঠেছে ক্লাসের মধ্যে। নানাপ্রকার দুষ্ট আমোদে সে উস্কানি দেয়। শিক্ষক যখন ক্লাসে থাকেন না তখন কক্ষটি হয়ে ওঠে একটি হট্টমেলা। ছেলেরা কেউ শ্যামা পাখির মতন শিস দেয়, কেউ পায়রার মতন বকম বকম করে, কেউ ঘোড়া সেজে চার পায়ে ছোটে, কেউ বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে শিক্ষকদের অঙ্গভঙ্গি অনুকরণ করে দেখায়, আর নবীনকুমার এইসব উপভোগ করে তীক্ষ্ন স্বরে হাসে।

এক একদিন এক একরকম হুজুগের গল্প শোনা যায়।

যেমন একদিন জলখাবার ছুটির সময় কাশীপুর অঞ্চল নিবাসী এক ছোকরা বললো, জানিস, কাল বৈকালে পাকপাড়ার লালাবাবুদের বাড়িতে কী হয়েচে? একদল মাতাল গোরা লালারাজাদের বাড়িতে এসে হামলে পড়ে চার পাঁচজন দ্বারোয়ানকে বর্শায় বিঁদে গিয়েচে!

অমনি অন্য ছাত্ররা রই রই করে উঠলো। একজন কিছু বললে অন্য কেউ তার প্রতিবাদ করবেই। একজন বললো, পাকপাড়ায় কী হয়েচে, তা তুই জানলি কী করে রে?

কাশীপুরের ছাত্র বললো, আমি সন্ধেবেলা ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম, নিজের চোকে দেকিচি!

আর একজন বললো, পাকপাড়ায় মাতাল গোরা আসবে কোতা থেকে? কাল সন্ধেবেলা চরস খেয়েচিলি নিশ্চয়?

অন্য একজন কাশীপুরীর সমর্থনে বললে, কেন দমদমা থেকে ময়দানের কেল্লায় তো গোরারা হরদমই যাতায়াত কর্চ্চে। আর তারা তো সর্বক্ষণই মাতাল হয়ে থাকে।

অন্য কয়েকজন একসঙ্গে কিছু বলতে যাচ্ছিল, নবীনকুমার তাদের থামিয়ে দিয়ে বললো, আঃ, দাঁড়া না, তারপর কী হলো শুনি। রাজারা কী কল্লেন?

কাশীপুরী বললো, রাজারা ভয় পেয়ে হাসন হোসেন বলতে বলতে বুক চাপড়ে দৌড়ে পুরোনো এক পাতকো'র মধ্যে সেঁদিয়ে প্রাণরক্ষা কল্লেন।

নবীনকুমার বললো, রাজারা পাতকো'র মধ্যে সেঁধুলো কী করে, গিরগিটি নাকি?

অমনি হাসির গর্‌রা পড়ে গেল।

আর একটি ছাত্র বললো, আরে তা নয়, তা নয়। আসল কতাটা আমি জানি, আমার বড়দাদার কাচে শুনিচি। রাজাদের বাড়ির সামনের গাচে একটা কাগ বসেছেল, এক সাহেব শিকারী বন্দুকের তাক্ ঠিক আছে কিনা দেকবার জন্য সেই কাগটাকে যেই মারলো অমনি রাজাদের দারোয়ান তেড়ে তাকে মাত্তে গেল...

তাকে থামিয়ে দিয়ে আর একজন বললো, ধেৎ, যতসব বাজে কতা! আমাদের পাশের বাড়ির কতা, আমি জানি না, তোরা জানিস!

নবীনকুমার সেই ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলো, তুই লালারাজাদের পাশের বাড়ি থাকিস? আগে তো কখনো শুনিনিকো!

সে ছেলেটিকে বললো, আলবত আমাদের পাশের বাড়ি। রাজাদের বাড়ির পেছনে যে বড় পগারটা রয়েচে জানো? তারই পাশে যে পচা পুকুর, সেখানেই আমাদের বাড়ির খিড়কি! তাহলে?

নবীনকুমার বললো, তাহলে তো পাশাপাশি বটেই। তুই তা হলে বল্—

সে বললো, রাজাদের এক আমলার মুখখানা ঠিক বানরের মতন। দেখলেই ভেংচি কাটতে ইচ্ছে করে। আমরা কতবার তাকে দেকে ভেংচি কেটে পালিয়িচি, কালকে হয়েচে কী, একজন সাহেব ঐ আমলার ভাইকে দেখে ভেংচেছিল, তাতে আমলার ভাইও ভেংচোয় আর চেঁচিয়ে বলে, তুইও তো একটা লালমুখো বানর রে! ব্যস, অমনি সাহেব গেল ক্ষেপে, আরও সাহেবরা দলবল মিলে এসে রাজবাড়ির ওপর গুলি চালালে!

ছেলেরা হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে। ফুর্তির চোটে কেউ এক একজন গল্পকারকে চ্যাংদোলা করে তুলে ফেললো।

আরও কেউ কেউ এই ঘটনার অন্য ভাষ্য দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় ঢং ঢং করে দুটোর ঘণ্টা বেজে গেল আর মাস্টারমশাইও তামাক খাবার ঘর থেকে চলে এলেন ক্লাস রুমে। তখনকার মতন গোলমাল চাপা পড়লো।

পরদিন কিন্তু দেখা গেল ঘটনাটা একেবারে অমূলক নয়। একটা কিছু ঘটেছে পাকপাড়ার রাজবাড়িতে। একটি বাংলা সংবাদপত্রে লিখলে, "একদল গোরা বাজনা বাজিয়ে যাইতেছিল, দলের মধ্যে একজনের জলের তৃষ্ণা পাইল, রাজাদের বাড়িতে যেমন জল খাইতে যাইবে জমাদার গলাধাক্কা মারিয়া বাহির করিয়া দেয়, তাহাতে সঙ্গের কর্নেল গুলি করিতে হুকুম দ্যান।"

কিন্তু ক্লাসের ছেলেরা কেউ খবরের কাগজের বিবরণ সত্য বলে মানতে রাজি নয়। পরদিন তারা আরো অনেকে একটা করে গল্প বানিয়ে এনেছে। কেউ বললে, লোক মারা গেছে দশ জন, কেউ বললে পঞ্চাশ। কেউ বললে, দৌড়ে পালাতে গিয়ে বড় রাজার ঠ্যাং ভেঙে গেছে। কেউ বললে, ছোট রাজা মুক্তকচ্ছ হয়ে এমন দৌড়েছিলেন যে গঙ্গার ধারে পেঁছেও থামতে ভুলে গিয়ে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন জলে। এদিকে তিনি আবার সাঁতার জানেন না।

সেদিন জল খাবার ছুটির সময় নবীনকুমার পালিয়েছিল কলেজ থেকে। তার কৌতূহল অপরিসীম, সে আসল ঘটনাটা জানতে চায়। কলেজের গেটের কাছে তার জুড়িগাড়ি সর্বক্ষণ অপেক্ষা করে, তাতে বসে থাকে দুলাল। নবীনকুমার গাড়ি হাঁকাতে বললো পাকপাড়ার দিকে।

এই বয়েসেই নবীনকুমার বংশমর্যাদা সম্পর্কে অতিশয় সচেতন। অনিমন্ত্রিত অবস্থায় কোনো বড় মানুষের গৃহে যাওয়া তার মানায় না। সে পাকপাড়ার রাজাদের বাড়ির সামনে এসে গাড়িতে বসেই তাকিয়ে দেখলো দেউড়ির দিকে। সেখানে অস্বাভাবিকতার কোনো চিহ্নই নেই। উর্দিপরা দারোয়ানরা দাঁড়িয়ে আছে বর্শা হাতে, লোকজন যাতায়াত করছে, এমনকি রাজাদের একজনকেও যেন দেখা গেল বার বাড়িতে বসে গড়গড়া টানছেন।

নবীনকুমার দুলালকে পাঠিয়ে বললো, যা, গিয়ে জেনে আয় তো সঠিক কী হয়েচে।

দুলাল দেউড়ির কাছে গিয়ে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ফিরে এলো। একটা কিছু ঘটেছে ঠিকই। তবে অতি সামান্য ব্যাপার। একজন নতুন গোছের ফিরিঙ্গি শিকারী এদিকে এসে ঘোরাঘুরি করছিল দু'দিন আগে। পাকপাড়ার দিকে প্রচুর শেয়াল, এমনকি দিনের বেলার দিকেও দেখা যায় শেয়ালদের ঘোরাঘুরি করতে। ফিরিঙ্গিরা অযথা শেয়াল মারতে ভালোবাসে, এক শেয়ালকে তাড়া করছিল সেই শিকারী, তারপর সে শেয়ালটি নাকি রাজবাড়ির বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়ে। শিকারীটিও যেই বাগানে ঢুকতে যাবে, তখন তাকে বাধা দেয় এক দ্বারবান। কিন্তু শিকারের ঝোঁক একবার মাথায় চাপলে তখন আর শাদা চামড়াদের কোনো জ্ঞান থাকে না। তর্কাতর্কির সুযোগে শেয়ালটা পালিয়ে যাচ্ছে ভেবে শিকারীটি তখন একজন দারোয়ানকেই গুলি করে মেরে দেয়।

তারপর রাজারা বেরিয়ে এসে শিকারীর কাছে ক্ষমা চান এবং শিকারীটিও মাথা ঠাণ্ডা হলে বলে যে লোকটিকে মেরে ফেলবার ইচ্ছে তার ছিল না, হঠাৎ হাত ফসকে গুলি বেরিয়ে যায়। সাহেবের হাত ফসকে গুলি বেরিয়েছে, তবে তো কোনো কথাই নেই। আসলে দ্বারবানটির আয়ু ফুরিয়ে গিয়েছিল বলেই না সে পঞ্চত্ব লাভ করেছে! ব্যস্, সেখানেই চুকে গেছে সব কিছু। রাজারা নিহত দারোয়ানের পরিবারকে দুশো টাকা দান করেছেন।

দুলালের মুখে সব বিবরণ শুনে নবীনকুমার বক্রভাবে হাসলো।

ভূকৈলাশের রাজবাড়িতে মহাপুরুষের আগমন ব্যাপারটাও নবীনকুমার নিজের চোখে যাচাই করতে চায়। সেদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে খাবার দাবার খেয়ে নবীনকুমার দুলালকে ডেকে বললো, আবার গাড়ি যুততে বল, চল ভূকৈলাশ থেকে ঘুরে আসি।

এখানেও প্রথমে নবীনকুমার গাড়ি থেকে না নেমে প্রথমে দুলালকে পাঠালো। দুলাল ঘুরে দেখে এসে বললো, হ্যাঁ, সত্যিই একজন জটাজুটধারী লোক রাজবাড়ির ঠাকুর দালানে বসে আছেন বটে, তাঁকে ঘিরে দারুণ ভিড়।

নবীনকুমার বললো, তেনাকে দেকতে কেমন?

দুলাল প্রথমে বললো, দেকলে ভয় করে।

তারপরই আবার বললো, ভক্তিও হয়। আমি পেন্নাম করিচি, দূর থেকে।

নবীনকুমার ধমকে বললো, তোর ভয় করে না ভক্তি হয়, সে কতা কে জানতে চাইচে? বলচি যে লোকটার চেহারা কেমন?

দুলাল বললো, ইয়া মোটা। সারা গায় মাটি ল্যাপা, তার ওপর ঘাস ঘাস মতন দেকলুম বটে, কিন্তু বট অশ্বথ গাছ দেকিনি। মাতায় দুটো অজগর সাপের মতন জটা, বুকের ওপর পড়ে আচে। চোক বোঁজা।

এমন মানুষকে স্বচক্ষে না দেখলে চলে না। এত লোকের ভিড় যখন, তখন এর মধ্যে মিশে গেলে কেউ তাকে চিনবে না। কৌতূহল সামলাতে না পেরে নবীনকুমার নেমে পড়লো গাড়ি থেকে।

বয়সের তুলনায়ও নবীনকুমারের শরীরটি ছোটখাটো, রোগা পাতলা। কিন্তু কুচোনো ধুতি, হলুদ রঙের রেশমী বেনিয়ান ও কাঁধে চীনা সিল্কের চাদর ও পায়ে চকচকে পালিশ করা কালো পাম্প শু—এবং তার মুখের গাম্ভীর্য ও ধীর পদক্ষেপ দেখে কোনো রাশভারী ব্যক্তি বলে ভ্রম হয়। এবং তার দৃষ্টি অত্যুজ্জ্বল।

দর্শনার্থীদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যাই বেশী। অবিদ্যা, ঘুসকি

ও গেরস্ত মেয়েদের ভিড় ঠেলে নবীনকুমার গিয়ে দাঁড়ালো একেবারে সামনে। মহাপুরুষের মূর্তি দেখলে সত্যিই প্রথমটায় বুক কেঁপে ওঠে। মনে হয় মানুষ না যেন ছোটখাটো একটি পাহাড়। চার পাশের লোক গুঞ্জন করে নানা কথা বলছে। দশদিন ধরে উনি এখানে আছেন, এর মধ্যে একবারও ওঠেননি, মলমূত্র ত্যাগ করেননি, কিছু খাননি, এমনকি চোখও খোলেননি। রাজবাড়ির লোকেরা ওঁকে পরীক্ষা করবার জন্য প্রথমে দু-একদিন কানের কাছে ঢাকঢোল বাজিয়েছেন, তবু কোনো সাড় দেখা যায়নি ওঁর শরীরে। এখন আর সে চেষ্টা কেউ করে না। উনি নাকি চোখ খুললেই সবাই ভস্ম হয়ে যাবে। সবাই ওঁর পায়ের কাছে ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম করছে আর ছুঁড়ে দিচ্ছে পয়সা।

বেশীক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না ভিড়ের চাপে। নবীনকুমার আর দুলালচন্দ্র আস্তে আস্তে সরে এলো সেখান থেকে। এর মধ্যে আরও অনেক খবর শোনা গেল। মহাপুরুষের গায়ের যে মাটির প্রলেপ, তা কেমন ভেজা ভেজা। দশদিন ধরে মাটি ওরকম ভেজা ভেজাই রয়েছে। গঙ্গার ধারে উনি মাটি ফুঁড়ে উঠেছেন, সেইজন্যই ওঁর গায়ে ভিজে গঙ্গামাটি।

ফেরার পথে নবীনকুমারের ওষ্ঠে মৃদু হাস্য লেগে রইলো। মহাপুরুষকে দেখে সে বেশ মজা পেয়েছে। বাড়ি ফিরেই সে কৃষ্ণভামিনীকে মহাপুরুষ দর্শনের অভিজ্ঞতা শোনাবার জন্য তাকে খুঁজতে গিয়ে দেখলো, কৃষ্ণভামিনী বসে আছে তার মায়ের কক্ষে। সেখানে তার জ্যেঠাইমা হেমাঙ্গিনী ও আরও কয়েকজন স্ত্রীলোক বসে গল্প করছিলেন। সবাই, নবীনকুমারকে দেখে নিজেদের কথা থামিয়ে বললো, আয় এখেনে বোস, কী দেকলি? কেমন দেকলি?

নবীনকুমার মহাপুরুষের চেহারার বর্ণনা দিয়ে বললো, এমন কতা কখনো শুনোচো যে দশদিন ধরে চোক খোলে না, পেচ্ছাপ বাহ্যি যায় না?

মহিলারা চোখ কপালে তুলে বললো, ওমা তাই নাকি? ইনি তো তা হলে খুব বড় মহাপুরুষ রে! দশদিন চোক খোলে না!

হেমাঙ্গিনী বললেন, দশদিন কি গো! শহরের লোকে তো দেকচে মোটে দশ দিন, মাটির নীচে কতদিন চোক বুঁজে আছেন তা কে জানে। ওনারা সব পারেন।

নবীনকুমার বললো, দিনের পর দিন না খেলে মানুষ বাঁচে?

বিম্ববতী বললেন, পুণ্যাত্মাদের খাওয়া লাগে না। ওঁয়ারা তো আর সাধারণ মানুষ নন।

নবীনকুমার বললো, আমার কী ইচ্ছে হচ্চিল, জানো, মা? ওঁর কানের পাশে তো অনেক ঢাক-ঢোল বাজানো হয়েছেল, একবার ওনার নাকের কাচে একটু নস্যি দিয়ে দেকলে কেমন হতো?

মহিলারা সমস্বরে বলে উঠলো, ছি ছি ছি, ও কতা বলতে নেই, ছোটকু! অমন কতা শুনলেও পাপ! মহাপুরুষদের কক্ষনো পরীক্ষা করেও দেকতে নেই।

হেমাঙ্গিনী বললেন, আমার বাপের বাড়িতে আমার সম্পর্কে এক পিসেমশাই একবার অমনি একজন মহাপুরুষ দেকেচিলেন। আমার পিসেমশাই নৌকোয় কাশী যাচ্চিলেন, গঙ্গার ধারে জঙ্গলের মধ্যে দেকলেন একজন ওরম মহাপুরুষ ধ্যানে অচৈতন্য হয়ে বসে আচেন। মাঝিরা তা দেখে বললো, বাবু, এ জঙ্গলে বড় বাঘ, এ সাধুরে তো আজই বাঘে খেয়ে ফেলবে। মাঝিরা ধরাধরি করে মহাপুরুষকে নৌকোয় তুলে আনলো। তিনি নৌকোয় বসে রইলেন পাতরের মূর্তির

মতন। তখনকার দিনে ছাপঘাটির মোহনায় জল থাকতো না বলে কাশীর যাত্রীরা বাদা বনের ভেতর দিয়ে যাওয়া আসা কত্তেন, একদিন আমাদের সেই পিসেমশাইয়ের নৌকো বাদাবনের মধ্যি দিয়ে মাঝিরা গুণ টেনে নিয়ে আসচে, মাঝি আর অন্য লোকেরা হঠাৎ দেকলো কি, জলের ধারে ঠিক ঐরকম একজন মহাপুরুষ দাঁড়িয়ে আচেন। দু'জনার চেহারা ঠিক এক রকম। এদিকে এ মহাপুরুষ তো নৌকোর গলুইয়ে তেমনি একই ভাবে ধ্যানে বসিচিলেন, ড্যাঙার মহাপুরুষকে যেই মাঝিরা দেকলো, অমনি উনি চোক মেলে চাইলেন। এরই মধ্যে ড্যাঙার মহাপুরুষ হাসতে হাসতে নৌকোর ওপরে এসে নৌকোর মহাপুরুষকে হাত ধরে তুলে দাঁড় করালেন, তারপর দু'জনায় তেমনি হাসতে হাসতে জলের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে গেলেন, আর তেনাদের দেকতে পাওয়া গেল না।

অন্য নারীরা বললো, বলো কি গো, দিদি! এ যে মহা আশ্চর্যি কথা!

হেমাঙ্গিনী বললেন, এই দ্যাকো না, তোমাদের বললুম তো, অমনি আমার লোমাঞ্চ হচ্চে, গা কাঁপচে। এনারা সব সে-কালের মুনি ঋষি, কেউ দশ হাজার, কেউ বিশ হাজার বছর ধরে তপিস্যে কচ্চেন, এঁরা মনে কল্লে সব কত্তে পারেন!

অন্য আর একজন স্ত্রীলোক বললেন, আমিও এরকম একজনের কথা শুনিচিলুম। একবার ঝিলিপুরের দত্তরা সোঁদরবন আবাদ কত্তে কত্তে ত্রিশ হাত মাটির ভিত্রে এক মহাপুরুষকে দেকেছেলেন। তাঁর শরীর শুকিয়ে চ্যালাকাট হয়ে গ্যাচে আর গা থেকে বেরিয়েছে বড় বড় শেকড়। দত্তরা অনেক করে সেই মহাপুরুষকে নিয়ে এলেন ঝিলিপুরে, সেখানে তিনি এক মাস থাকলেন, তারপর হঠাৎ একদিন অদৃশ্য হয়ে গ্যালেন।

বিম্ববতী বললেন, এঁরা যখন ইচ্ছে করেন দ্যাকা দ্যান আবার যখন ইচ্ছে করে সংসার ছেড়ে চলে যান।

হেমাঙ্গিনী বললেন, ভূকৈলেশের রাজাদের কত ভাগ্য, তাদের বাড়িতে ইনি দেকা দিয়েচেন, কবে আবার চলে যাবেন ঠিক কি! হ্যা লা, আমরা একবার দেকতে যাই না!

নবীনকুমার বললো, জ্যাঠাইমা, তোমরা সেখানে যেতে পারবে না, বড্ড পাঁচপেঁচি ধরনের লোকের ভিড় সেখানে।

পরদিন বিম্ববতী বাড়ির একজন ভৃত্যকে পাঠিয়ে মহাপুরুষের পায়ের ধুলো আনালেন খানিকটা। তা দুটো মাদুলিতে ভরে একটা বেঁধে দিলেন নবীনকুমারের বাহুতে, আর একটা রেখে দিলেন গঙ্গানারায়ণের জন্য। মহাপুরুষদের পূত রজঃ অঙ্গে রাখলে সন্তানদের সব বিপদ কেটে যাবে।

মায়ের অনুরোধ একেবারে ফেলতে পারলো না নবীনকুমার। তবে সেই জয়-ঢাকের মতন মাদুলিটা প্রায়ই সে খুলে নিয়ে লোফালুফি খেলা করে। মায়ের সামনে আবার ঠিকঠাক করে নেয়।

মহাপুরুষের নানা রকম অলৌকিক গুণাবলীর কথা কয়েকদিন ধরে খুব বাজার সরগরম করে রেখে আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে এলো। তারপর একদিন স্কুলের টিফিনে নবীনকুমার গোলদিঘিতে তার বন্ধুদের সঙ্গে ফড়িং ধরে খেলা করছে, এমন সময় ওদের ক্লাসের পণ্ডিতমশাই এলেন মাঠের মধ্যে। এই পণ্ডিত-মশাই এক সময় এক বড়মানুষের বাড়িতে রাঁধুনী বামুন ছিলেন, এখন এডুকেশান কাউনসিলে সুপারিশের জোরে পণ্ডিত হয়েছেন। ইনি পান খেতে খুব ভালো-

বাসেন, তাই এঁর হাতে যাতে কানমলা খেতে না হয় তাই ছেলেরা এঁকে দেখামাত্র পান কিনে দেয়। সবাই হুড়মুড়িয়ে দৌড়ে গিয়ে পান কিনে আনলো।

খুসী হয়ে পণ্ডিত বললেন, ওরে নবীন, ভূকৈলেশের সেই মহাপুরুষের কথা শুনিচিস? সে এক কাণ্ড হয়েচে!

কী হয়েচে, কী হয়েচে বলে সবাই পণ্ডিতকে ছেঁকে ধরলো।

তিনি বললেন, মহাপুরুষের নানা রকম কেরামতির কথা শুনে এক সাহেব গিয়েছিলেন তেনাকে পরীক্ষে করতে। বাবা, সাহেবদের কাচে অত জারিজুরি খাটে না। ভূকৈলেশের রাজারা নাকি মহাপুরুষের গায়ে গুল পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিয়েছিলেন, জলে ডুবিয়ে রেখেছিলেন, তাতেও কিছু হয়নি। কিন্তু সাহেব সেই মহাপুরুষের নাকের কাছে কী একটা আরক যেই একটু ধরলেন, অমনি মহাপুরুষ সাতবার হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো করে উঠলো আর চোখ মেলেই সাহেব দেখে কেঁদে বললো, ওরে বাপা, গারোদে দিওনি! গারোদে দিওনি!

নবীনকুমার আনন্দে ফেটে পড়ে লাফাতে লাফাতে বললো, নস্যি! নস্যি! আমি আগেই জানতুম!

পণ্ডিতমশাই বললেন, ভূকৈলেশের রাজারা তো ক্ষেপে আগুন! এতদিন কত মানী গুণী লোক ঐ বুজরুগটার পায়ের ধুলো নিয়েচে। তাই রাজারা এখন ঐ ব্যাটাকে দিয়ে নিজেদের পা টেপাচ্ছেন।

নবীনকুমার হেসে গড়াগড়ি দিল মাটিতে। তারপর হাতের মাদুলিটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিল জলে।

কৌতুক ও কৌতূহলের জন্য নবীনকুমার প্রায়ই এরকম নানা রকম অভিযানে বেরোয়। ইতিমধ্যেই তার একটা নিজস্ব মতামত তৈরী হয়েছে, সে আর অন্য কারুর কথা যাচাই না করে মেনে নেয় না।

ক্লাসের মধ্যে নবীনকুমারের দুরন্তপনা দিন দিনই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। পড়াশুনোয় একেবারেই মন নেই। প্রত্যেকটি শিক্ষক তাকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। অথচ সবাই জানেন, এ ছেলে একটু মন দিয়ে পড়লে সবার সেরা হতে পারতো, এমন স্মৃতিশক্তি খুব কম ছাত্রেরই দেখা যায়। কিন্তু সে পড়বে না।

একদিন একজন শিক্ষক মন দিয়ে পড়াচ্ছেন, সারা ক্লাস স্তব্ধ, এমন সময় হঠাৎ নবীনকুমার দুম করে তার এক সহপাঠীর পিঠে এক কিল বসিয়ে দিল সম্পূর্ণ বিনা কারণে। ছেলেটি আর্তনাদ করে তখুনি উঠে দাঁড়িয়ে নালিশ জানালো শিক্ষকের কাছে। শিক্ষক মহাশয় আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না, দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, স্ট্যান্ড আপ অন দা বেঞ্চ! ইউ! স্ট্যান্ড আপ অন দা বেঞ্চ!

নবীনকুমার হাসতে হাসতে বেঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়ালো।

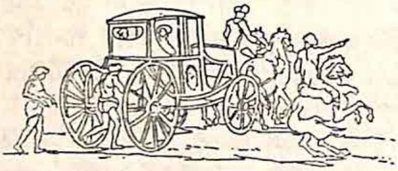
শিক্ষক বললেন, কান ধরো। সর্বক্ষণ কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, কার কান ধরবো স্যার?

সারা ক্লাস ফেটে পড়লো হাসিতে।

শিক্ষকমশাই ডায়াস থেকে নেমে এগিয়ে এলেন নবীনকুমারের কাছে। ব্যথাময় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন এমন করো বলো তো? কেন ওকে মারলে?

নবীনকুমার সগর্বে উত্তর দিল, মহাশয়, আমি সিংহ সন্তান। জাত-স্বভাব তো ছাড়তে পারি না!



একদিন কলেজ থেকে ফিরে নবীনকুমার দেখলো তার শয়নকক্ষে তার পত্নী কৃষ্ণভামিনীর সঙ্গে আর একটি বালিকা বসে খেলা করছে। দুজনেই সমবয়সিনী, দুজনেই রেশমী শাড়ি ও হাত ভর্তি সোনার চুড়ি পরিহিতা দুটি পুত্তলিকার মতন। ওরা খেলাও করছে কাচকড়ার বিলাতি পুতুল নিয়ে।

নবীনকুমার ঘরে ঢুকতেই মেয়েটি মাথায় ঘোমটা টেনে পিছন ফিরে বসলো।

নবীনকুমার কৃষ্ণভামিনীকে জিজ্ঞেস করলো, এ মেয়েটি কে গা?

কৃষ্ণভামিনী বললো, ও তো আমার মিতেনী, আমাদের বে'র সময় ওকে দ্যাকেননি? সব সময়ই তো আমার পাশে ঠায় বসেছেল!

বাসরঘরে এক সঙ্গে অনেক মেয়েই উপস্থিত থাকে বলে কারুকেই ঠিক মতন দেখা যায় না। এই মেয়েটিকেও নবীনকুমারের মনে নেই।

সে আবার জিজ্ঞেস করলো, তোমার মিতেনী? আমাদের এ পাড়ায় আবার তোমার মিতেনী কী করে হলো?

কৃষ্ণভামিনী বললো, এ পাড়ার কে বললো? ওর বে হয়েচে হাটখোলায়, আমার ঠিক এক মাস পরে। ওদের বাড়ির পাল্কিতে আজ আমার সঙ্গে দেখা করতে এয়েচে।

তারপর সে তার সখীকে বললো, আমার বরকে দেকে অত লজ্জা কিসের লা? তোর বরকে দেকে কি আমি ঘোমটা দিই?

মেয়েটি তবু যেন লজ্জায় একেবারে নুয়ে পড়েছে। কৃষ্ণভামিনী জোর করে তার ঘোমটা খুলে দিলো। মেয়েটির মুখখানি ফুটফুটে, অপরূপ সুন্দরী যাকে বলে। কৃষ্ণভামিনীও খুব ফর্সা, কিন্তু এ মেয়েটির রং যেন গোলাপ ফুলের পাপড়ির মতন, চোখের মণি দুটিতে নীলবর্ণ আভা।

কাঁধের উড়ুনিটা শয্যার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে নবীনকুমারও বসে পড়লো ওদের পাশে। তারপর জিজ্ঞেস করলো, এই মিতেনীটির নাম কি গো?

কৃষ্ণভামিনী তার সখীর গায়ে খোঁচা মেরে বললো, এই, নাম বল না!

মেয়েটি এখনো লজ্জা-কুণ্ঠিতা, মুখ খুলবে না। দু-তিনবার সাধাসাধিতেও সে নাম বললো না। কৃষ্ণভামিনী বললো, কী জানি ছাই, আমি ওর নাম ভুলেই গেচি! মিতেনী বলেই তো ডাকি! ও, মনে পড়েচে, মনে পড়েচে! কুসোম! তোর নাম কুসোম না রে?

মেয়েটি এবার অস্ফুট গলায় বললো, আমার নাম কুসুমকুমারী!

নবীনকুমার বললো, এঃ! কুসুমকুমারী! পচা নাম! একদম মানায়নিকো!

বলেই সে হেসে উঠলো হা-হা করে।

কৃষ্ণভামিনীর মনে হলো, তার সখীকে বুঝি যথোচিত সম্মান জানানো হচ্ছে না। সে রেগে গিয়ে বললো, পচা নাম! কে বলেচে আপনাকে? সবাই বলে আমার মিতেনীর নাম আমার চেয়েও সোন্দর!

নবীনকুমার বললো, এ তো কেষ্টযাত্রার সখীদের এরকম নাম হয়। কুসুমকুমারী, অবলাবালা, বিধুমুখী!

কৃষ্ণভামিনী চক্ষু কপালে তুলে বললো, ও মা! আমার পিসীমার নাম বিধুমুখী! সেটা বুঝি খারাপ নাম?

কুসুমকুমারী শাড়ির আঁচল গুছিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দু দিকে ঘাড় নেড়ে বললো, আমি ভাই এবার যাই? বেলা পড়ে এলো, মা এবার পুজোয় বসবেন।

নবীনকুমার তার হাত ধরে টেনে আবার বসিয়ে দিয়ে বললো, অমনি বুঝি রাগ হলো মিতেনীর। আমি তোমায় একটা সুন্দর নাম দিয়ে দিচ্চি!

কৃষ্ণভামিনী বললো, আপনি আপনার মায়ের সঙ্গে দেকা করে আসুন না। আমরা এখন এ ঘরে খেলচি, আমার ছেলের সঙ্গে ওর মেয়ের এখুনি বে হবে!

নবীনকুমার বললো, আমিও খেলবো! আমায় তোমরা খেলায় নেবে না কেন?

নবীনকুমার বাল্যকাল থেকেই দুলালের সঙ্গে কুরুক্ষেত্রের লড়াই, তেপান্তরের মাঠ, ভূত আমার পুত, নৃসিংহ অবতার—এই সব খেলা খেলতো। বিবাহের পর কৃষ্ণভামিনী পিত্রালয় থেকে তার সমস্ত মেয়েলি খেলনা সঙ্গে নিয়ে এসেছে, সে একা একাই সেগুলি নিয়ে খেলতে বসতো, তা দেখে নবীনকুমারও যোগ দিয়েছে সে খেলায়। পুতুলের সংসার নিয়ে খেলা করতে সে আমোদ পেতে শুরু করেছে ইদানীং।

কুসুমকুমারী বললো, ব্যাটাছেলেদের সঙ্গে আমাদের খেলতে নেই। তা হলে আমার মা রাগ করবেন।

নবীনকুমার অমনি বললো, বেশ তো, আমি মেয়েমানুষ হয়ে যাচ্চি। দেকবে, দেকবে, আমি কেমন মেয়েমানুষ হতে পারি!

পালঙ্কের মাথায় কৃষ্ণভামিনীর একটা শাড়ি ঝুলছিল, সেটা ফস করে টেনে নিয়ে নবীনকুমার শরীরে জড়িয়ে ফেললো, তারপর বাম হাতের কড়ে আঙুলটি মুখে পুরে, ঘাড় বেঁকিয়ে হেলে দুলে হেঁটে, কণ্ঠস্বর বদলে ফেলে বললো, হ্যাঁ গা মিতেনী, তুমি রাগ করেচো আমার ওপর!

বাল্যকাল থেকেই নবীনকুমার অনুকরণপটু, তার ভাবভঙ্গি অবিকল কোনো স্ত্রীলোকের মতনই দেখায়।

কৃষ্ণভামিনী বললো, ঢং! কত ঢংই যে আপনি কত্তে পারেন!

কুসুমকুমারী কিন্তু ফিক করে হেসে ফেললো।

নবীনকুমার সেই স্ত্রী সাজেই ওদের পাশে বসে পড়ে বললো, এই তো মুখে হাসি ফুটেচে। এবার থেকে ভাই আমরা তিনজনে মিলে খেলবো বেশ! তার আগে মিতেনীর একটা নাম দিয়ে দিই? তোমার নাম বনজ্যোৎস্না!

কৃষ্ণভামিনী বললো, ওমা, ও আবার কী নামের ছিরি! বনজোচ্ছনা! মেয়েমানুষের এমন নাম হয় সাতজন্মে শুনিনিকো।

নবীনকুমার বললো, তোমার সাত সাততে উনপঞ্চাশ জন্ম আগে এমন নাম হতো। কি গো, মিতেনী, তোমার পছন্দ হয়নি!

কুসুমকুমারী বললো, এ তো একটা লতানে ফুল গাচের নাম! মেয়েমানুষের নাম কেন হবে!

নবীনকুমার এবার সত্যিকারের বিস্ময়ে ভুরু উত্তোলিত করে বললো, ওমা, তুমি জানো? কী করে জানলে?

কুসুমকুমারী বললো, সেই যে শকুন্তলা বলে একটা গল্প আছে না? সেই গল্পের মধ্যে শুনিচি!

—সে গল্প তুমি কোতায় শুনলে?

—পোন্‌মশাই আমার দাদাদের পড়াতেন, তখন আমি পাশে বসে থাকতাম।

গল্পটা খুব দুঃখের।

নবীনকুমার তার স্ত্রী কৃষ্ণভামিনীর দিকে তাকিয়ে বললো, দেকোচো, তোমার মিতেনী তোমার চে কত বেশী জানে!

কৃষ্ণভামিনী বললো, আমার কি একটাও দাদা আচে নাকি যে পণ্ডিতমশাই এসে বাড়িতে পড়াবে?

নবীনকুমার কুসুমকুমারীকে বললো, শোনো ভাই, মিতেনী, তোমাকে তো একটা লতানে ফুল গাচের মতনই দেকতে, তাই তোমার বাপ মা তোমার নাম দিয়েছিলেন কুসুমকুমারী। আমি নাম দিলাম বনজ্যোৎস্না। একই তো!

কৃষ্ণভামিনী বললো, শুধু কতাই হবে, খেলা হবে না বুঝি?

নবীনকুমার বললো, হ্যাঁ, এবার খেলা হোক। তোমাদের ছেলেমেয়ের বিয়ে দেবে তো! তা ছেলেমেয়ের কী নাম রেকোচো?

দুই সখী মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। নামের কথা তাদের মনে আসেনি।

নবীনকুমার বললো, তা হলে মেয়েটার নাম শকুন্তলা, আর ছেলের নাম দুশমন!

কুসুমকুমারী বললো, না ভাই, আমি খেলবো না! তোর বর বড্ড খারাপ খারাপ কতা বলচে! দুশমন নাকি, রাজার নাম তো ছিল দুষ্যন্ত।

নবীনকুমার হাসতে হাসতে বললো, তোমার তাও মনে আচে? আচ্ছা বেশ, দুষ্যন্তই হলো।

কুসুমকুমারী বললো, না। ও নাম আমি দেবো না। ওটা বড্ড দুঃখের গল্প, আমি জানি।

নবীনকুমার বললো, শেষকালে সুখ আচে।

কৃষ্ণভামিনী আর একটি পুতুল বার করে বললো, উনি বড় বিরক্ত কচ্চেন রে, তাড়াতাড়ি বে দিয়ে দে, এই হলো গে পুরুতমশাই।

নবীনকুমার বললো, এ বিয়েতে পুরুত লাগবে না। এ তো বনের মধ্যে বিয়ে, ওরা নিজেরা নিজেরাই বিয়ে করবে।

কৃষ্ণভামিনী বললো, অমন বিচ্ছিরি বে আমি দেবো না!

নবীনকুমার এরপর সেই খেলায় এমন মত্ত হয়ে গেল যে এখন কে বলবে এই সেই হিন্দু কলেজের অতি দুরন্ত ছাত্র। সে কখনো পুরুষ, কখনো নারীর কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর মুখে সংলাপ বসাতে লাগলো। কৃষ্ণভামিনী সন্দেশ এনে রেখেছিল, বিয়ের শেষে পরিবেশন করা হবে বলে, নবীনকুমার আগেই সেই সন্দেশ কেড়ে নিয়ে খেয়ে ফেলে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি দিতে লাগলো মাটিতে।

খেলা শেষ হয়ে গেছে, এবার যেতে হবে কুসুমকুমারীকে। তার সঙ্গে এসেছে দুটি দাসী ও চার বেহারার পাল্কী। গোধূলিতে আকাশ ম্লান হয়ে এসেছে, এখুনি অন্ধকার হয়ে যাবে বলে নবীনকুমার সে পালকির সঙ্গে দুজন পাইক পাঠিয়ে দিল। বিদায় দেবার আগে কৃষ্ণভামিনী তার সখীর কাঁধ জড়িয়ে ধরে বললো, আবার কবে আসবি বল? কাল? পশ্যু?

কুসুমকুমারী বললো, আহা—হা, আমিই বার বার আসতে গেলুম রে! তুই বুঝি যেতে পারিস না?

কৃষ্ণভামিনী তার স্বামীর দিকে তাকালো।

নবীনকুমার বললো, যাবে না কেন, নিশ্চয়ই যাবে। তা মিতেনী, আমায় যেতে বললে না যে? আমি বুঝি তোমার মিতে নয়?

কুসুমকুমারী তার সারল্যমাখা নীলবর্ণ চোখ দুটি তুলে নবীনকুমারকে একবার অপাঙ্গে দেখলো শুধু। কোনো উত্তর দিল না। তার কোলে দুটি পুতুল, মেয়ে-জামাইকে সে নিজের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। কোনোক্রমে পুতুল দুটিকে সামলে সে উঠে পড়লো পালকিতে।

কুসুমকুমারী তার সখী কৃষ্ণভামিনীর চেয়ে বয়েসে একটু বড়, তার বয়েস এখন সাড়ে দশ, আর কৃষ্ণভামিনীর নয় ছুঁই ছুঁই। তাদের দুজনেরই পিত্রালয় বাগবাজারে পাশাপাশি গৃহে। দুজনে একসঙ্গে বড় হয়ে উঠেছে। এ দুই বালিকা পরস্পরকে ছেড়ে থাকতে এখনো অভ্যস্ত হয়নি। কৃষ্ণভামিনী বাপের বাড়িতে যাওয়ার বেশী সুযোগ পায়, তবু পালা-পার্বণে যখন দু-একদিনের জন্য যাওয়া হয়, তখন খবর পেয়ে কুসুমকুমারীও চলে আসে বাগবাজারে, দুজনে প্রায় সর্বক্ষণ একসঙ্গে কাটায়।

কুসুমকুমারীর স্বামী অঘোরনাথ, নবীনকুমারের চেয়ে বয়ঃজ্যেষ্ঠ। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর সে নাকি ব্রাহ্ম হতে গিয়েছিল, ঠিক সময়ে সে খবর পেয়ে তার মা গলার সামনে একটি বড় আঁশ বটি ধরে বলেছিলেন, আমার কথা শুনবিনি, তুই জোর করে যাবি? তো যা, ফিরে এসে আমার মরা মুখ দেকবি!

মাতৃহন্তা হতে হবে বলেই অঘোরনাথ শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্ম হয়নি কিন্তু সেই সময় থেকেই নাকি সর্বক্ষণ সে বিষণ্ন উদাসীন হয়ে দিন কাটায়। সে তাদের পৈতৃক জমিদারি কার্য দেখে না, কলকাতায় তাদের নিজস্ব হৌসেও যায় না। দ্বিতীয় বিবাহের পরও তার মানসিক ক্লৈব্য কাটেনি।

পত্নীর কাছ থেকে এই সব তথ্য জানলো নবীনকুমার। ব্রাহ্মদের সম্পর্কে তার সঠিক কোনো ধারণা এখনো গড়ে ওঠেনি। ব্রাহ্ম শুনলেই তার মনে পড়ে কিছু দাড়িওয়ালা গম্ভীর গম্ভীর মানুষ, যারা কদাচ হাসে না, এবং অনেকেই রুপোর ফ্রেমের চশমা চোখে দেয়। কুসুমকুমারীর স্বামী সে রকম মানুষ?

কৃষ্ণভামিনীর সঙ্গে ওপরে উঠে এসে নবীনকুমার বললো, তোমার যদি ছেলে হয় আর তোমার মিতেনীর যদি মেয়ে হয়, তা হলে তোমাদের ছেলেমেয়ের সত্যিকারের বিয়ে হলে বেশ হয়, তাই না?

কৃষ্ণভামিনী একটুও লজ্জিত না হয়ে বললো, আমি তো তাই ঠিক করে রেখিচি!

নবীনকুমার আড়চোখে তার বালিকা বধূর মুখের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণভাবে নজর করে দেখলো। একটি বিষয়ে নবীনকুমারের মনে খটকা আছে। সে জানে যে বিবাহিত নারী পুরুষদেরই শুধু সন্তানাদি হয়। যাদের বিবাহ হয়নি কিংবা যে স্ত্রীলোকেরা বিধবা এবং যে পুরুষরা একা থাকে, তাদের কখনো পুত্র কন্যা হয় না। কিন্তু বিবাহের পর ঠিক কখন, কীভাবে এবং কেন পুত্র কন্যা জন্মায়, সে সম্পর্কে তার সম্যক ধারণা নেই। প্রায়ই সে এই কৌতূহলে ছটফট করে কিন্তু কারুকেই জিজ্ঞেস করতে পারে না। সে যে-সব কেতাব পড়েছে, তার মধ্যেও এর কোনো উত্তর নেই। কলেজে ভর্তি হবার পর নবীনকুমারের মধ্যে একটা সবজান্তা ভাব এসেছে, কিন্তু এই একটি বিষয়ে অজ্ঞতা তাকে পীড়া দেয়। কৃষ্ণভামিনী তার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট হলেও এ ব্যাপারটা জানে নাকি?

লজ্জাবশত এ কথাটি সে নিজের স্ত্রীকেও জিজ্ঞেস করতে পারলো না।

কৃষ্ণভামিনী শয়ন কক্ষে ঢুকে মন দিয়ে তার পুতুলের সংসার গুছোতে লাগলো। এর মধ্যে একটি পুতুল পাওয়া যাচ্ছে না, সেটি কুসুমকুমারীরও নিয়ে যাওয়ার কথা নয়। এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজির পরও সেটি না পেয়ে সে নবীন-

কুমারকে চেপে ধরে বললো, আপনি নিশ্চয়ই লুকিয়েচেন! আমার পুতুল কোতায়?

নবীনকুমার নিরীহ মুখ করে বললো, কই, আমি তো দেকিনি।

কৃষ্ণভামিনী বললো, তা হলে কোতায় গেল? ওটা আমার মা কালীঘাট থেকে কিনে এনেছেলেন, ঐ পুতুলটা সবচে ভালো।

নবীনকুমার বললো, তা হলে বোধ হয় তোমার মিতেনীর খুব পছন্দ হয়েচে, সেই সেটা চুরি করে নিয়ে গ্যাচে!

কী, আপনি আমার মিতেনীকে চোর বললেন? এ কথা বলেই কৃষ্ণভামিনী সপাটে এক চড় কষিয়ে দিল নবীনকুমারের গালে।

কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে থেকেই নবীনকুমার লাফিয়ে গিয়ে কৃষ্ণভামিনীর চুলের মুঠি চেপে ধরলো এবং কণ্ঠস্বর বিকট করে বললো, রে, রে, হতভাগিনী, তোর এ দুর্মতি! আজ তোরে নরকে পাঠাইব! পরনিন্দা, অতি লোভ, স্বামী প্রহরণ, যেই নারী করে তার নরকে গমন!

খানিকক্ষণ ঝটাপটি করার পর কৃষ্ণভামিনী নবীনকুমারের পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইলো। হঠাৎ রাগ হলে তার মাথার ঠিক থাকে না। কিন্তু স্বামীর গায়ে হাত তোলা যে মহা পাপ, তা সে জানে। নবীনকুমারের কাছে অবশ্য এ সবই কৌতুক। সারা দিনের প্রতিটি ঘটনা থেকেই সে মজার উপাদান খোঁজে। কৃষ্ণভামিনী ক্ষমা চাইবার পর সে জাজিমের তলা থেকে বার করে দিল লুকোনো পুতুলটি।

এই দুই কিশোর-বালিকার খুনসুটি, বিবাদ ও রাগ ছাড়া এই অট্টালিকার দ্বিতল সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। আর কোনো কক্ষে প্রাণের সাড়া নেই। বিম্ববতী পুত্র-শোকে শয্যা নিয়েছেন।

ইব্রাহিমপুর থেকে বেশ কিছুদিন আগে ফিরে এসেছে বজরা। বৃদ্ধ খাজাঞ্চি সেনমশাই অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে সব কথা জানিয়েছেন বিম্ববতীকে। গঙ্গানারায়ণের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। সেনমশাই তার তল্লাশে লোক পাঠিয়েছিলেন নানা দিকে, কিন্তু গঙ্গানারায়ণ যেন কর্পূরের মত মিলিয়ে গেছে শূন্যে। গঙ্গানারায়ণকে বজরা থেকে বলপ্রয়োগ করে কেড়ে নিয়ে যাওয়া কারুর পক্ষে সম্ভব ছিল না, প্রহরীরা সে রকম একটি শব্দও শোনেনি। স্বেচ্ছায় সে রাত্রিবেলা বজরা ছেড়ে চলে যাবে, এও যে বড় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। সে বজরার মালিক, তার হুকুমেই বজরা যেখানে খুশী যেতে পারে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে যদি তার সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা না থাকতো, তবে সেই রাত্রেই তো নোঙর তুলে কলকাতার অভিমুখে রওনা হওয়া যেত। এমনকি একথা সেনমশাই অনেকবার বলেও ছিলেন গঙ্গানারায়ণকে। গঙ্গানারায়ণ এক বস্ত্রে চলে গেছে। এ বড় বিচিত্র ঘটনা, এমনটি আর কখনো শোনা যায়নি। গঙ্গানারায়ণ নিরুদ্দিষ্ট বা মৃত। মৃত বলেই বেশী সন্দেহ হয়।

নবীনকুমারের জন্মের পর থেকে গঙ্গানারায়ণের প্রতি বিম্ববতীর মনোযোগ অনেক কমে গিয়েছিল। কিন্তু এক সময় গঙ্গানারায়ণও তো ছিল তাঁর অতি আদরের। এখন নবীনকুমারও তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। গঙ্গানারায়ণের সংবাদ শুনে বিম্ববতীর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হয়েছিল, প্রথম পুত্রের প্রতি তাঁর সমস্ত স্নেহ ভালোবাসা ফিরে এলো শোক ও পরিতাপ হয়ে। গঙ্গানারায়ণ তাঁর আপন গর্ভের সন্তান নয়, তবু তার প্রতি বিম্ববতীর নাড়ির টান আছে যে সে কথা বিম্ববতী আবার অনুভব করলেন।

বিম্ববতী কয়েকদিন কেঁদে ভাসালেন। জনে জনে অনুরোধ করলেন, যত টাকাই লাগুক, গঙ্গানারায়ণের সন্ধানে আবার সারা দেশ তোলপাড় করে খুঁজে

দেখা হোক। কিন্তু কারুরই গরজ নেই সে ব্যাপারে। বিধুশেখর তাঁর মন থেকে গঙ্গানারায়ণকে মুছে ফেলতে চান। কর্মচারীরা শুধু টাকা খায়, কাজের কাজ কিছুই করে না।

অগ্রজের নিরুদ্দেশের সংবাদে নবীনকুমার খানিকটা বিস্মিত হয়েছিল বটে, কিন্তু খুব বেশী তাপ উত্তাপ বোধ করেনি। দাদা বজরা ছেড়ে কোথাও চলে গেছে, আবার নিশ্চয়ই একদিন ফিরে আসবে।

গঙ্গানারায়ণের পত্নী লীলাবতী প্রথমে সংবাদ শুনে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল। তারপর সে আর একদিনও এ বাড়িতে থাকতে চায়নি। তাকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক মাসের মধ্যেই যেন গঙ্গানারায়ণকে সবাই বিস্মৃত হয়ে গেল। তার কক্ষটি তালাবন্ধ, সারা বাড়িতে আর কোথাও তার কোনো চিহ্ন নেই। সাতাশ বছর যে এ গৃহে কাটিয়েছে, এক বৎসরের মধ্যে সে মুছে গেল। শুধু বিম্ববতী একা একা অশ্রুপাত করে বালিশ ভিজিয়ে দেন।

নবীনকুমারের যখন যে ঝোঁক চাপে, তখন সেটি নিয়ে মেতে ওঠে। একবার যেমন নীচতলা থেকে একটা ফুটফুটে সাদা বেড়াল একদিন উঠে এসেছিল ওপরে। বেড়ালটি দেখে তার এমন পছন্দ হলো যে তাকে সে সেদিন থেকে পুষতে লাগলো। বেড়ালটির নাম রেখেছিল মুঞ্জুরী। পোষা মানে কি, সর্বক্ষণ বেড়ালটিকে তার সঙ্গে রাখা চাই। তার খিদ্‌মদগার দুলাল পাহারা দিত, যেন মুঞ্জুরী আর কোনোক্রমেই নীচতলায় যেতে না পারে। মুঞ্জুরী দু-তিন বার অকারণে ম্যাও ম্যাও করলেই নবীনকুমারের সন্দেহ হতো ওর খিদে পেয়েছে আর দুলাল নিশ্চয়ই ওর বরাদ্দ দুধ চুরি করে খেয়েছে। সেই উপলক্ষে এক ডজন কানমলা পাওনা হতো দুলালের। রাত্রেও মুঞ্জুরীকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে থাকতো নবীনকুমার।

মুঞ্জুরী বেড়াল ছিল না, বেড়ালী। অত সংরক্ষণ সত্ত্বেও যে সে কোন্ ফাঁকে অভিসারে চলে যেত, তা জানা যায় না, একদিন দেখা গেল সে গর্ভবতী। তখন নবীনকুমার বিম্ববতীর সঙ্গে এক শয্যায় শুতো। বিম্ববতী বেড়াল পছন্দ করেন না, কিন্তু পুত্রের আবদারের জন্য তাঁকে মেনে নিতে হতো সবই। মুঞ্জুরীর সন্তান-সম্ভাবনা দেখে তিনি বলেছিলেন, ওরে এ সময় বেড়ালকে আঁকড়ে রাখতে নেই, ওরা এ সময়টা একা একা থাকতে চায়। ওকে এখন ছেড়ে দে, ছোটকু। নবীনকুমার তা শুনবে না। মুঞ্জুরীর বাচ্চা হবে শুনে তার মহা আনন্দ, সারা বাড়ি এরপর বেড়ালে ভরে যাবে।

একদিন ভোরে জেগে উঠে নবীনকুমার দেখলো তার আলিঙ্গনের মধ্যে মুঞ্জুরী মরে কাঠ হয়ে আছে। তারপর নবীনকুমারের সে কি কান্না! পরমাত্মীয় বিয়োগেও মানুষ বুঝি অমন মর্মবিদারী কান্না কাঁদতে পারে না। তিনদিন নবীন-কুমার মুখে অন্ন তুলতে পারেনি। এর পর থেকে অবশ্য সে আর অন্য কোনো বেড়াল দু' চক্ষে দেখতে পারে না, এ অট্টালিকার দ্বিতলে কোনো বেড়াল দৈবাৎ এসে পড়লে সে নিজে লাঠি নিয়ে তেড়ে যায়।

কৃষ্ণভামিনীর মিতেনীর সঙ্গে পুতুল খেলাতেও নবীনকুমারের সে রকম ঝোঁক চাপলো। পরদিনই সে জিজ্ঞেস করলো, কই, তোমার মিতেনী আর এলো না? তোমার ছেলেকে কতদিন শ্বশুর বাড়ি ফেলে রাকবে? এ বাড়ির পুরুষরা কক্ষনো শ্বশুর বাড়িতে থাকে না। সিংহ কি সিংহীর কাছে যায়, না সিংহীই আসে সিংহের গুহায়?

দু' তিন দিন পর নবীনকুমার অস্থির হয়ে উঠলো একেবারে। সে কৃষ্ণভামিনীকে

বললো, পত্তর পাঠাও! তোমার মিতেনীকে লেকো যেন তোমার ছেলে আর তার বউকে সে যেন কালই নিয়ে আসে!

নবীনকুমার নিজেই মুসাবিদা করে তার মুন্সোর মতন হস্তাক্ষরে লিখলো কৃষ্ণভামিনীর ব-কলমে চিঠি। এক পরাত সন্দেশ ও একটি বড় রোহিত মৎস্য সমেত একজন বাহক মারফত পাঠিয়ে দেওয়া হলো সেই পত্র। পরদিন কুসুমকুমারী নিজে এলো না, দ্বিগুণ তত্ত্বসমেত পাঠিয়ে দিলে পুতুল দুটিকে। সঙ্গে একটি ছোট চিঠি, বেশ গোটা গোটা অক্ষরে লেখা, কার্যাঞ্চে নিবেদন এই যে, আমি যাইতে পারিলাম না, কবে পারিব ঠিক নাই, পরমেশ্বরের কৃপায় ইহারা সুখে থাকুক। ভবদীয়া কুসুমকুমারী বনজ্যোৎস্না মিতেনী।

চিঠিখানা দেখে ভুরু কুঁচকে নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, এ চিঠি কে লিকে দিয়েচে? ওর বর?

কৃষ্ণভামিনী বললো, আমার মিতেনী নিজেই লিকতে পারে। সব জানে।

নবীনকুমার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো, যেমন বিচ্ছিরি হাতের লেকা, তেমন বদ স্বভাব মেয়েটার। আবার দেমাক করে লিকেচে, কবে পারিব ঠিক নাই!

কুসুমকুমারীর ব্রাহ্ম স্বামীকে দেখার খুবই কৌতূহল নবীনকুমারের। সে কৃষ্ণভামিনীকে বললো, তোমার মিতেনীর গোমড়ামুখো বর নিশ্চয়ই তার বউকে আর একলা পাঠাতে চায় না। একদিন ওদের এ বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাওয়াও না।

এবার নবীনকুমার নিজেই অঘোরনাথকে সম্বোধন করে এক লৌকিকতাপূর্ণ নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করলো। কিন্তু তার উত্তর অঘোরনাথের কাছ থেকে না এসে এলো কুসুমকুমারীর হস্তাক্ষরে। সে দুঃখ প্রকাশ করে জানিয়েছে যে নানা কারণে এখন তাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। তার বদলে একদিন কৃষ্ণভামিনীরা কি আসতে পারে না?

বাড়ির কর্তার কাছ থেকে নিমন্ত্রণ না এলে সেখানে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। নবীনকুমার একদিন বাড়ির ঘেরাটোপ পালকিতে কৃষ্ণভামিনীকে পাঠিয়ে দিতে পারে বটে, তার নিজের যাওয়া শোভা পায় না। কিন্তু কুসুমকুমারীর সঙ্গে তার পুতুল খেলা অসমাপ্ত রয়ে গেছে বলে সে খুবই অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে। সামাজিক নিয়ম উপেক্ষা করে সে একদিন কৃষ্ণভামিনীকে বললো, চলো আজ হাটখোলায়, তোমার মিতেনীর বাড়িটা দেকে আসি। পুতুলগুলোন সঙ্গে করে নাও—।

সে বাড়িতে গিয়ে বড় অপমানিত হতে হলো নবীনকুমারকে।



হাটখোলায় কৃষ্ণভামিনীর মিতেনীর শ্বশুরালয়টি তেমন বুনিয়াদী নয়। মাত্র দু' পুরুষে ধনী। অনেকেই এখনও বলে যে জগাই মল্লিক নাকি চিত্তেশ্বরীর মন্দিরের সামনে বসে ফুটকড়াই বেচতো। জগাই মল্লিকের আদি নিবাস ছিল পেনেটিতে। বৃদ্ধ বয়সে দেবী চিত্তেশ্বরী তাঁকে স্বপ্নে গুপ্তধনের সন্ধান দেন এবং তিনি এক পানা পুকুরের মাঝখানে ডুব দিয়ে এক সোনার ঘড়া ভর্তি মোহর পেয়ে যান। অবশ্য কেউ কেউ অন্য কাহিনীও বলে। এক ডাকাইত নাকি সেপাইদের

তাড়া খেয়ে জগাই মল্লিকের বসতবাটিতে এসে রাত্রে আশ্রয় নেয়। পরদিন সকালেই সে ডাকাইতকে সেপাইয়ের বদলে ধরে ফেলে মারাত্মক বিসূচিকা রোগে এবং সন্ধের আগেই সে মারা যায়। রাতারাতি সেই শবদেহ দাহ করে জগাই মল্লিক সে দস্যুর ধনরত্ন নিয়ে পেনেটি ছেড়ে পাকাপাকিভাবে আশ্রয় নেন কলকাতায়। প্রথম পক্ষের স্ত্রী-পুত্রদেরও পরিত্যাগ করে তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন এখানে। এই দ্বিতীয় কাহিনীর সত্যাসত্য ঠিক নির্ধারণ করা যায় না। তবে কলকাতার অধিকাংশ ধনীরই ভাগ্য পরিবর্তনের ব্যাপারে দু রকম কাহিনী প্রচলিত থাকে। সে যাই হোক, জগাই মল্লিকের তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ চিত্তপ্রসাদ বাণিজ্য ব্যাপারে নিদারুণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে অগাধ ধনসম্পদ উপার্জন করেন এবং তিনিই হাটখোলায় এই প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করেছেন।

চিত্তপ্রসাদ দীর্ঘজীবী হননি এবং আকস্মিক মৃত্যুর ফলে বিষয়াদির সুচারু ব্যবস্থা করে যেতে পারেননি। ভ্রাতৃবৎসল চিত্তপ্রসাদ সমুদয় সম্পত্তি তিন ভাইয়ের নামেই রেখেছিলেন, কনিষ্ঠভ্রাতা চণ্ডিকাপ্রসাদ তখন না-লায়েক বিধায় মধ্যম ভ্রাতা কালীপ্রসাদই অগ্রজের মৃত্যুর পর ট্রাস্টের অছি হয়। অতি বৃদ্ধ জগাই মল্লিক এখনো জীবিত, তাঁর সঠিক বয়সের হিসাব কেউ জানে না, তবে তিনি নিজে এক সময় বলতেন যে, যে সময় নবাব সিরাজদৌল্লার ফৌজের সঙ্গে ক্লাইভ সাহেব লড়াই দিয়েছিলেন পলাশীর মাঠে, সেই বৎসর তাঁর জন্ম। সেই হিসাব সঠিক ধরলে জগাই মল্লিকের বয়স এখন ছিয়ানব্বই তো বটেই। গত দশ বৎসর ধরে তিনি সম্পূর্ণ বধির এবং সম্পূর্ণ দন্তহীন হওয়ায় কথা যা বলেন তার কিছুই বোঝা যায় না। তাঁর হাঁটা চলার ক্ষমতা অবশ্য এখনো নষ্ট হয়নি। কয়েক বৎসর আগেও তিনি প্রত্যহ অপরাহ্ণে পদব্রজে একবার চিত্তেশ্বরীর মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করে আসতেন, এখন তাঁকে পালকিতে করে ঘুরিয়ে আনা হয়।

সম্পত্তি পরিচালনার ভার হাতে পেয়ে কালীপ্রসাদের মতিগতি সম্পূর্ণ পালটে যায়। দাদার অধীনে তিনি স্বল্পভাষী ও কর্মঠ মানুষ ছিলেন, তাঁর কোনো পৃথক ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়নি, স্বাধীন হবার পর তিনি ব্যবসায়-বাণিজ্যের চেয়েও নিজের ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে বেশী মন দিলেন। কালীপ্রসাদ সমাজে ঘোরাফেরা করে বুঝেছিলেন, অর্থোপার্জন বা বড় বড় অট্টালিকা হাঁকড়ানোই বড় কথা নয়, তার চেয়েও বড় কথা কৌলিন্য। লোকে কথায় কথায় এখনো বলে, ফুটকড়াই বেচা জগা মল্লিকের ছেলেরা এখন দুটো পয়সার মুখ দেখেচে! কেউ কেউ একথা কালী-প্রসাদের মুখের সামনে বলতেও দ্বিধা করে না।

কালীপ্রসাদ কলকাতার পথেঘাটে টাকা ছড়াতে লাগলেন। আমোদ আহ্লাদ কাকে বলে তিনি দেখিয়ে দিতে চান। পয়সা প্রচুর রোজগার করা গেছে। দু-তিন পুরুষ ধরে খোলামকুচির মতন ছিটোলেও ফুরোবে না, কিন্তু সুনাম অর্জন করতে হবে এই এক পুরুষেই। লোকে যাতে জগাই মল্লিকের কথা একেবারেই ভুলে গিয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, হ্যাঁ, বাবু তো বাবু, হাটখোলার কালী মল্লিক! দান-ধ্যানে কালীপ্রসাদ মল্লিক দরাজ দিল, কোথাও ইস্কুল কলেজ খোলা হোক, কালীপ্রসাদ মল্লিকের কাছে সাহায্য চাইতে এসে তারা কখনো বিমুখ হয় না। কালীপ্রসাদ আগে জিজ্ঞেস করেন, অমুক কত দিয়েছে, আর অমুক, আর তমুক? তারপর সর্বোচ্চ দাতার চেয়ে অন্তত একটাকা বেশী ধরে তিনি সগর্বে বলেন, লিখে নাও! খাজাঞ্চির কাচে যাও, এখুনি টাকা মিলবে, আমার সব নগদানগদি কারবার, ফতোবাবুদের মতন আমি শুধু প্রমিজ করি না। কারুর কন্যাদায়, কারুর বাপের শ্রাদ্ধ, একবার কালীপ্রসাদ মল্লিকের কাছে এলেই হলো। আবার চড়কের

সময় ছাতুবাবুদের মাঠে ম্যারাপ বেঁধে এক সঙ্গে একশো মেয়েমানুষ দিয়ে খ্যামটা নাচানো, এমনটি আগে কেউ পেরেছে! কী গান জমেছিল সেবার, "ফণীর মাথার মণি চুরি কল্লি, বুঝি বিদেশে বিঘোরে পরাণ হারালি"—এখনো লোকের কানে লেগে আছে।

কালীপ্রসাদের ছোট ভাই চণ্ডিকাপ্রসাদও মধ্যমাগ্রজের দৃষ্টান্তই অনুসরণ করছে সম্পূর্ণ মনপ্রাণ দিয়ে। এঁর আবার ইংরেজী কেতা ভাল লাগে না, নবাবী কায়দার দিকে বেশী ঝোঁক। সর্বদা এক বিচিত্র পোশাক পরে থাকেন। লক্ষ্মৌ ফ্যাসানের চুড়িদার পায়জামা, রামজামা, কোমরে দোপাট্টা আর পায়ে জড়ির চপ্পল। মাথার টুপিটি একদিকে এমনই হেলিয়ে পরা থাকে যে বাবুর ডান কান আছে কিনা তাতে হঠাৎ সন্দেহ জাগে। এ ছাড়া তাঁর হাতে থাকে সব সময়ই একটি টকটকে লাল রঙের রুমাল। এবং প্যাঁজ-রসুনের গন্ধ এঁর পছন্দ বলে যবনী তয়ফা-ওয়ালীর বাড়িতেই এঁর বেশী যাতায়াত।

চণ্ডিকাপ্রসাদ গোড়া থেকেই বিষয়কর্ম কিছু শেখেননি, তাঁর মেজদাদা তাঁকে সেদিকে ভিড়তেও দেননি। চণ্ডিকাপ্রসাদ মাসে হাতখরচ বাবদ যা পান, তাতে একটি তালুক কেনা যায়। কালীপ্রসাদ ছোট ভাইয়ের কোনো সাধেই বাদ সাধেন না, তাঁর মনোগত অভিপ্রায়টি যেন এই, দু' ভাই মিলে বাপের নামটি মুছে ফেলা হোক, কেউ যেন তাঁদের আর জগাই মল্লিকের ব্যাটা বলে সম্বোধন না করে। স্বনামে যার পরিচয় হয় না, সে আবার একটা মানুষ? ঠেঙো ধুতি, নিমে পরা সাতকেলে বুড়ো জগাই মল্লিককে বাপ বলে পরিচয় দিতে দু' ভাইয়েরই লজ্জা হয়। জগাই মল্লিক লোক-সমক্ষে বেরোক এটাও ওঁরা কেউ চান না, কিন্তু বৃদ্ধ একবার করে চিত্তেশ্বরীকে প্রণাম করতে যাবেনই।

অঘোরনাথ এ গৃহে সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের মানুষ। তার পিতা কিংবা পিতামহ কেউই রূপবান নন, জগাই মল্লিকের দোকানদারের মতন চেহারা তাঁর পুত্ররাও পেয়েছে। কিন্তু অঘোরনাথ মাতৃমুখী সন্ধান। সে দীর্ঘকায়, সুঠাম, গৌরবর্ণ, মুখশ্রী সুন্দর। অঘোরনাথের মা চিত্তপ্রসাদের তৃতীয়পক্ষ। প্রথম দু'পক্ষের কোনো পুত্রসন্তান না হওয়ায় গরীব ঘরের এই রূপসী কন্যাটিকে বিবাহ করে এনেছিলেন চিত্তপ্রসাদ। অঘোরনাথ তার মায়ের একমাত্র সন্তান, আবাল্য মাতৃ-ছায়ায় লালিত। তাই খুড়ামশাইদের বিলাসী জীবনের প্রভাব পড়েনি তার ওপর। পড়াশুনোয় আগ্রহ খুব, হিন্দু কলেজের ছাত্র হিসেবেও সুনাম কিনেছিল। যথা-রীতি ছাত্রাবস্থাতেই তার বিবাহ হয়, কিন্তু অলপকালের মধ্যে প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পরই তার মনে প্রবল ধর্মভাব দেখা দেয়। সে নিয়মিত জোড়াসাঁকোর দেবেন ঠাকুরের বাড়ি যাতায়াত শুরু করে। তারপর সে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণের জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়েও তার জননীর প্রতিবন্ধকে সংকল্প সিদ্ধ করতে পারলো না। মা তার দ্বিতীয় বিবাহ দিলেন হুড়োহুড়ি করে এবং পিতৃ-সম্পত্তি বুঝে নেবার জন্য এস্টেটের কাজে লাগিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু কোনোটিরই সুফল ফললো না। অঘোরনাথ মনোরোগী হয়ে গেল।

নবীনকুমার কৃষ্ণভামিনীকে নিয়ে হাটখোলার মল্লিক বাড়িতে আসার কিছুক্ষণ পরেই বুঝলো, তার না আসাই উচিত ছিল এখানে। কুসুমকুমারীর সঙ্গে তার

পুতুলখেলা অসমাপ্ত রয়ে গেছে। সে এসেছে সেই টানে। তার বাবার আমলের সবচেয়ে সুদৃশ্য জুড়িগাড়িটি নিয়ে সে এসেছে, সে আশা করেছিল দেউড়ির সামনেই এ বাড়ির কর্তারা সার বেঁধে অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে। নবীনকুমার বংশ-মর্যাদা সম্পর্কে অতি সচেতন, সে রামকমল সিংহের সন্তান, যে রামকমল সিংহ ছিলেন কলকাতার আট-দশজন প্রধান ধনীদের অন্যতম। জোড়াসাঁকোর সিংহবাড়ির নাম সবাই এক ডাকে চেনে। সেই সিংহদের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী এখন একমাত্র নবীনকুমার। তার স্ত্রী কৃষ্ণভামিনীও সামান্যা নয়, বাগবাজারের সুবিখ্যাত বসু পরিবারের কন্যা।

দেউড়ির সামনে অভ্যর্থনার জন্য কেউ নেই। জুড়িগাড়ির পিছনে যে দুজন ভৃত্য দাঁড়িয়ে আসে, তারাই তড়াক করে নেমে গাড়ির দরজা খুলে দিল। পুতুল খেলার সরঞ্জাম ভরা একটি কাশ্মীরী বাক্স বগলে নিয়ে নবীনকুমার নেমে দাঁড়িয়ে এদিকে ওদিকে তাকালো। একজন দ্বারবান শুধু অলসভাবে চেয়ে আছে এদিকে। নবীনকুমারের সন্দেহ হলো, তা হলে কি তারিখ ভুল হলো? না, আজই তো শনিবার, কুসুমকুমারী জানে না তাদের আসবার কথা?

একগলা ঘোমটা দেওয়া একজন দাসী স্থানীয়া স্ত্রীলোক শুধু এগিয়ে এসে বললো, আসুন, ভিতরে আসুন, নতুন বৌঠান আপনকারদের জন্য অপিক্ষে করে আচেন।

কৃষ্ণভামিনীও নেমে পড়েছে ততক্ষণে। তারও মুখে ঘোমটা, এমন একটা জমকালো ভারী শাড়ি পরে এসেছে সে যে ঠিক মতন সামলাতে না পারলে যখন তখন হোঁচট খেয়ে পড়তে পারে। দাসীটি তাকে ধরে ধরে নিয়ে চললো।

দেউড়ি থেকে মোরাম বিছানো খানিকটা পথ গম্ভীরভাবে হেঁটে নবীনকুমার উঠে এলো বারান্দায়। সেখানে দু'জন ভৃত্য দাঁড়িয়ে, কিন্তু তাদের ব্যবহারে কোনো ব্যস্ততা নেই, তাদের উভয়েরই দৃষ্টি অতি ধূর্ত ধরনের। যেন সেই মুহূর্তে তারা কিছু একটা ষড়যন্ত্র করছিল, নবীনকুমারকে দেখে থেমে গেল। একটি ঘরের খুব ভারী কাঠের দরজা ঠেলে খুলে তাদের একজন বললো, এখানে বসুন।

নবীনকুমার ও কৃষ্ণভামিনী দু'জনেই সে ঘরে ঢুকলো। তার অন্য দিকে আর একটি দরজা আছে, সেটি খোলা। দাসীটি কিছু না বলে কৃষ্ণভামিনীর হাত ধরে সেই দরজা দিয়ে ভিতর দিকে চলে গেল।

ঘরটিতে এলোমেলোভাবে অনেকগুলি গদি মোড়া চেয়ার ছড়ানো, একপাশে একটি বড় চৌকির ওপর ফরাস পাতা। চারটি দেয়ালে ঝুলছে চারখানি কোনো শীতের দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। খুব সম্ভবত ছবিগুলি কোনো নিলাম থেকে এক লটে কেনা।

নবীনকুমার তার ধুতির ফুলকোঁচাটি সাবধানে একটু তুলে একটি চেয়ারে বসলো। তারপর কামিজের জেব থেকে সোনার গার্ড চেন দেওয়া মেকাবি ঘড়িটি বার করে সময় দেখলো। ঠিক ছ'টা বাজে এখন এবং নবীনকুমারের ঘড়ির সমর্থনেই যেন গুপুস গুপুস করে ছ'বার শব্দ পাওয়া গেল কেল্লার তোপের। ঠিক ছ'টার সময়েই তো নবীনকুমারের সস্ত্রীক আসার কথা ছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে সে ঘরে কেউ এলো না আর। স্বভাব-চঞ্চল নবীনকুমার বেশীক্ষণ এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকতে পারে না। সে হাঁটু দোলাতে লাগলো ঘন ঘন, বিরক্তিতে তার ভুরু কুঞ্চিত হয়ে গেছে। সে ভাবতে লাগলো, এ বাড়ির কেউ কি কোনো সহবৎ জানে না নাকি? সামান্য উমেদারের মতন তাকে বার-বাড়ির একটা ঠেঙো ঘরে বসিয়ে রাখা হয়েছে। অনাত্মীয় বা কাজ-সম্বন্ধী লোকদের

তবু লোকে বৈঠকখানায় বসাতে পারে কিন্তু নবীনকুমাররা হলো এ বাড়ির বধূর বাপের বাড়ির সম্পর্কের, অর্থাৎ কুটুম, এমন কুটুমদের দ্বিতলের মজলিস কক্ষে বসানোই প্রথা। নবীনকুমার বাল্যকাল থেকে এমনই দেখে এসেছে। সে আশা করেছিল, কুসুমকুমারী এবং তার স্বামীর নিশ্চয়ই একটা আলাদা মহল আছে এ বাড়িতে, সেখানেই নিয়ে যাওয়া হবে তাকে।

একটুক্ষণের মধ্যেই অস্থির হয়ে উঠলো নবীনকুমার। ভৃত্য দুটিকে ডাকবার জন্য সে দু-একবার গলা খাঁকারি দিল, তবু তাদের আসবার নাম নেই। তখন সে উঠে গিয়ে বাইরের দিকের দরজাটি দিয়ে মুখ বাড়ালো। ভৃত্য দুটি কাছেই বসে আছে, এ ওর গা ঠেলাঠেলি করে কী নিয়ে যেন হাসাহাসি করছে।

নবীনকুমার একহাতে কোঁচাটি, কাঠের বাক্সটি সামলে ধরে অন্য হাত কোমরে রেখে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলো, এই, তোদের বাবু কোথায়?

একজন ভৃত্য মুখ তুলে বললো, কোন্ বাবু? আপনি কার কতা জিগ্যেস কচ্চেন?

আর একজন বললো, মেজোবাবু কখোন ফিরবেন জানি না। আর ছোটবাবু আজও ফিত্তে পারেন, কালও ফিত্তে পারেন আবার ফিত্তে নাও পারেন।

নবীনকুমারদের বাড়ির কোনো ভৃত্য এমনভাবে বসে বসে কথা বলে না বাবুদের সঙ্গে।

নবীনকুমার বললো, অঘোরনাথবাবুর কথা জিজ্ঞেস কচ্চি।

এবার ভৃত্যদ্বয় পরস্পরের মুখ তাকাতাকি করলো। তারপর একজন মুচকি হেসে বললো, তিনি তো ওপরেই আচেন।

নবীনকুমার বললো, তেনাকে একবার খপর দাও। বলোগে, নবীনকুমার সিংহ এশেচেন।

সেই ভৃত্যটি বললো, আজ্ঞে তেনাকে খপর দেবার এক্তিয়ার আমাদের নেই।

বলেই সে চিক করে থুতু ত্যাগ করলো বারান্দার নীচে।

নবীনকুমারদের বাড়ির কোনো ভৃত্য এমন অবাধ্য বেয়াড়াপনা করলে দিবাকরকে দিয়ে চাবকে তার পিঠের ছাল তুলে দেওয়া হতো। এ নেহাত অন্যের বাড়ি।

রাগে গসগস করে নবীনকুমার ফিরে এলো ঘরের মধ্যে। পরক্ষণেই তার একটি কথা মনে পড়লো। তারা আজকে তাদের পুতুল-ছেলে ও ছেলের বউকে নিয়ে যাবার জন্য এসেছে, খালি হাতে তো কুটুমবাড়িতে আসা যায় না, তাই দু' পরাত তত্ত্ব আনা হয়েছে। সেগুলি রয়ে গেছে জুড়ি গাড়ির মধ্যেই।

আবার সে ফিরে এসে ভৃত্য দুটিকে উদ্দেশ্য করে বললো, গাড়িতে তত্ত্ব রয়েচে, কারুকে বলো নামাবার ব্যবস্থা কত্তে।

ভৃত্য দুটি অমনি তড়াক করে ছুটে গেল এবং নিজেরাই পরাত দুটি নামিয়ে হই হই করে চলে গেল বাড়ির মধ্যে, যেন জন্মে তারা তত্ত্ব দেখেনি।

নবীনকুমার ঘরটির মধ্যে পায়চারি করতে লাগলো মুখ নীচু করে। এখুনি তার ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু কৃষ্ণভামিনীকে খবর পাঠানো যাবে কী করে? মিতেনীর স্বামী অঘোরনাথ বাড়িতে থেকেও যে একবারও তার সঙ্গে দেখা করতে এলো না, এই চিন্তাই তাকে সবচেয়ে বেশী পীড়া দিচ্ছে।

নবীনকুমার একবার গিয়ে অন্দর মহলের দরজায় উঁকি দিল। ভেতরে মস্ত বড় একটা উঠোন, সেখানে নানা রকম কাপড়চোপড় ছড়ানো, মনে হয় যেন ওপর থেকে উড়ে উড়ে পড়ছে। এ বাড়ির মতন একটা অপরিচ্ছন্ন বাড়ি নবীনকুমার আগে কখনো দেখেনি। বাইরে থেকে মনে হয় অট্টালিকাটি রীতিমতন বিশাল এবং তেমন পুরোনোও নয়, কিন্তু সদর থেকেই অযত্নের চিহ্ন, যেখানে সেখানে আবর্জনা জমে আছে। ঘরের আসবাবগুলি যে মূল্যবান তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় নিয়মিত ঝাড়াই সাফাই হয় না। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, অথচ নীচতলায় আলো জ্বালবার কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না।

এবার অন্য দুজন ভৃত্য একটি বড় পাথরের থালা ভর্তি নানাবিধ ফল ও মিষ্টদ্রব্য এবং এক গেলাস সরবত এনে একটি টিপয়ের ওপর রাখলো।

খাবার দেখেই গা জ্বলে উঠলো নবীনকুমারের। সে একা একা খাবে? আজ পর্যন্ত কখনো কেউ সাধাসাধি না করলে সে কোনো খাদ্য মুখেই তোলেনি।

সে ক্রোধ চাপা কণ্ঠে বললো, এ সবের প্রয়োজন নেই, নিয়ে যা।

একজন ভৃত্য বললো, নতুন বৌঠান আপনায় একটু মিষ্টি মুখ কত্তে বল্লেন।

নবীনকুমার বললো, ওপরে খপর দে, আমি এবার যাবো!

ভৃত্য দুটি বিনা বাক্যব্যয়ে ভেতরে চলে গেল। আবার বেশ কিছুক্ষণের মধ্যে কারুর কোনো সাড়া শব্দ নেই।

এবার নবীনকুমার বেরিয়ে এলো বারান্দায়। এই একা ঘরে অসহ্য অবস্থায় বসে থাকার বদলে সে নিজের গাড়ির মধ্যে বসে অপেক্ষা করবে বরং। কিংবা তার একজন ভৃত্যকে পাঠাবে কৃষ্ণভামিনীকে খবর দেবার জন্য।

নবীনকুমার বাইরে বেরিয়ে আসতেই গেটের সামনে প্রথমে একটি পালকি, তারপর একটি ফেটিং গাড়ি এসে থামলো।

পালকি-বেহারারা পালকি নামিয়ে রেখে ভেতর থেকে ধরে ধরে বার করলো জগাই মল্লিককে। চোখ দুটি ঘোলাটে রঙের, শত কুঞ্চিত চামড়ায় মোড়া কয়েকখানি হাড়, দু' পাশের দুই বেহারার কাঁধে হাত রেখে জগাই মল্লিক ঠিক শিশুর মতন দুলে দুলে হাঁটতে লাগলো। নবীনকুমার এ রকম চলন্ত মনুষ্যকঙ্কাল আগে দেখেনি। জগাই মল্লিকের গাল দুটি অনবরত নড়ছে, যেন অতি ব্যস্ত হয়ে তিনি কিছু চিবুচ্ছেন।

ফেটিং গাড়িটি থামা মাত্র সেই প্রথম দেখা ভৃত্য দুটি যেন ভোজবাজির মতন তৎক্ষণাৎ এসে উদয় হলো দেউড়ির কাছে। গাড়ির ভেতর থেকে একটা চিৎকার ভেসে এলো, মেদো! যেদো!

ভৃত্য দুটি বললো, এই যে হুজুর।

গাড়ি থেকে নামলেন এ বাড়ির ছোটবাবু চণ্ডিকাপ্রসাদ মল্লিক। মদের নেশায় একেবারে টপভুজঙ্গ হয়ে আছেন, পোশাকের নানা স্থানে পানের পিকের দাগ। তিনি দু-পা হেঁটেই বোঁ করে ঘুরে গেলেন একবার। তারপর পপাত ধরণীতল হবার আগে ভৃত্য দুটি ঝটিতি ধরে ফেললো তাঁকে।

চণ্ডিকাপ্রসাদ এ রকম অসময়ে কখনো বাড়ি ফেরেন না। তিনি দ্বিপ্রহর থেকে শ্যাম্পেন টানা শুরু করেন, এখন সবে তো কলির সন্ধে। নিশ্চিত কোনো জরুরী কারণে তাঁর নগদ টাকার প্রয়োজন হয়েছে—একমাত্র এই টানেই তাঁকে দু-একদিন অন্তর বাড়ি আসতে হয়।

চণ্ডিকাপ্রসাদ সব কথাই বলেন জোরে জোরে। ভৃত্যদের হুকুম করলেন, ব্যাটারা ভালো করে ধর না আমাকে, পায় জোর পাচ্ছিনি! তারপরই তারস্বরে জুড়ে দিলেন

একটা গান।

মাত্র হাত পাঁচেক তফাতে বিভিন্ন ভৃত্যেরা পিতা ও পুত্রকে ধরে ধরে এগিয়ে নিয়ে চললো। এর মধ্যে, চণ্ডিকাপ্রসাদ বার বার টলে পড়ে যাবার উপক্রম হলেও তাঁর গতিই খানিকটা দ্রুত, কারণ তাঁর ফেরার তাড়া আছে। সুতরাং তিনি ধরে ফেললেন জগাই মল্লিককে।

পিতা পুত্র তাকালেন পরস্পরের দিকে। কেউ কারুকে প্রথমে চিনতে পারলেন না সম্ভবত।

চণ্ডিকাপ্রসাদ ভুরু কুঁচকে দৃষ্টিতে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করে বললেন, তুমি কে বাওয়া? অ্যাঁ?

জগাই মল্লিকের থুতনিটা ধরে উঁচু করে দেখে অট্টহাস্য করে উঠলেন চণ্ডিকাপ্রসাদ। হাসির চোটে যেন তাঁর দম ফেটে যাবে।

সেই রকম হাসতে হাসতেই বললেন, অ, তুমি আমার বাওয়া? আমার নিজের বাওয়া! তুমি এখনো বেঁচে আচো বাওয়া? যেদিনই আসি দেখি তুমি বেঁচে রয়েচো, এ কেমন ধারা ব্যাভার তোমার মাইরি। দু একদিন তো মরে গ্যালেও পারো!

জগাই মল্লিকের গাল আরও জোরে জোরে নড়তে লাগলো, আর ঠোঁট দিয়ে শব্দ হতে লাগলো, ম-ম-ম-ম-ম!

চণ্ডিকাপ্রসাদ পিতার কেশহীন মাথায় একটি ছোট চাঁটি মেরে আবার বললো, তা বাঁচো বাওয়া, বাঁচো! আমরা সব্বাই মরে ফৌত হয়ে যাই, তারপরও তুমি বেঁচে থাকো! কত ধুমধাম করে তোমার ছেরাদ্দ করবো ভেবে রেকেচিলুম, তা তোমার প্রাণে সইলো না। হারামজাদা, আমাদের একটু হাত খুলে ছেরাদ্দ কত্তেও দেবে না। তবে কি নিজের ছেরাদ্দ তুমি কিপ্যুনের মতন নিজেই করবে? অ্যাঁ?

পালকি-বেহারারা জগাই মল্লিককে আগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই চণ্ডিকাপ্রসাদ তাদের একজনের কাঁধ খামচে ধরে বললেন, অ্যাই ও, চোপ। আমি আমার বাওয়ার সঙ্গে কথা বলচি, তাতে তোর বাওয়ার কী? চলে যাচ্চিস যে! জুতো মেরে মুখ ছিঁড়ে দোবো।

সত্যি সত্যি নীচু হয়ে পা থেকে জুতো খুলতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন চণ্ডিকাপ্রসাদ। সেই অবস্থাতেই গড়িয়ে গিয়ে পিতার পা জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি তোমার অধম সন্তান, বাওয়া, তোমার ছেরাদ্দটিও করতে পাল্লুমনি গো! ওফ!

এবার কান্না। যাই হোক এর মধ্যেই ভৃত্যদের তৎপরতায় পিতা-পুত্রকে বিযুক্ত করা হলো, পালকি-বেহারারা জগাই মল্লিককে নিয়ে গেল ভেতরে। চণ্ডিকাপ্রসাদকে তুলে দাঁড় করানো হলো, তিনিও অবিলম্বেই বাবার কথা ভুলে গিয়ে গান ধরলেন, 'পরেরো মনেরো ভাবো বুঝিতে কি পারে প—রে!'

হাত-পা ছুঁড়ে গান গাইতে গাইতে তিনি উঠতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে। নবীনকুমার তাড়াতাড়ি একটি থামের আড়ালে সরে গেল।

চণ্ডিকাপ্রসাদ তাকে এক নজর দেখে ফিক করে হেসে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আবার কে গা? ধিনি কাত্তিকের মতন চ্যায়রা!

নবীনকুমার এমন প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে রইলো। চণ্ডিকাপ্রসাদ তাকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে আবার জড়ানো গলায় গান গাইতে গাইতে

বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন।

পাশ দিয়ে যাবার সময় চণ্ডিকাপ্রসাদের গা থেকে যে বিকট গন্ধ ভেসে এলো তাতেই নবীনকুমারের নাড়িভুঁড়ি উলটে আসার উপক্রম। এ রকম দৃশ্য নবীন-কুমারের কাছে সম্পূর্ণ নতুন। নবীনকুমার তার পিতাকে অতি অল্প বয়েসে দেখেছে। রামকমল সিংহ বাড়িতে কোনো দিন এমন বেলেল্লা করেননি, শেষের দিকে তিনি প্রায় গৃহেই থাকতেন না বলতে গেলে। গঙ্গানারায়ণের আমলে সিংহ বাড়িতে কোনোদিন মদ্যপান করেনি কেউ। নবীনকুমারের কলেজের সহপাঠীরা কেউ কেউ এই বয়েসেই সুরাপান করে, ও সম্পর্কে নবীনকুমারেরও সামান্য একটু কৌতূহল জাগ্রত হয়েছিল সবে মাত্র। কিন্তু মাতাল চণ্ডিকাপ্রসাদকে দেখে মদের ওপর তার একটা দারুণ ঘৃণা জন্মে গেল, এবং সেইখানে দাঁড়িয়ে সেই মুহূর্তে সে মনে মনে শপথ নিলো যে, জীবনে সে কখনো সুরাপান করবে না।

নবীনকুমার গাড়ির মধ্যে বসে অপেক্ষা করার আরও প্রায় আধঘণ্টা পরে এলো কৃষ্ণভামিনী। তৎক্ষণাৎ গাড়ি ছাড়তে হুকুম দেওয়া হলো। পথের মধ্যে কোন রকম গোল করা ঠিক হবে না, নবীনকুমার বাড়ি ফিরেই কৃষ্ণভামিনীকে আচ্ছাসে মার লাগাবে, এই মনে করে গুম্ হয়ে রইলো।

কৃষ্ণভামিনীই ফিসফিস করে বললো, ওগো, আমার মিতেনীর দুঃখ দেকলে পাতরেরও বুক ফেটে যাবে! ওর বাপ মা কী দেকে বে দিলে, ওর সোয়ামী যে পাগল!

নবীনকুমার বললো, পাগল না শেয়ানা। একবার নীচে নামতে পারলেন না, অসভ্য, ইতর।

কৃষ্ণভামিনী বললো, হ্যাঁগো, সত্যি পাগল! কোথ্থাও বেরোয় না, শুধু একটা ঠাকুরের পটের সামনে বসে থাকে আর বিলকিচ ছিলকিচ কতা বলে, নয়তো একদম চুম্ মেরে থাকে। এই যে আমি এতক্ষণ রইলুম, একটা কতা বলেনি। মাঝে মাঝে অজ্ঞেন হয়ে যায়! এই এক মাস হলো বেশী বাড়াবাড়ি হয়েচে! আমার মিতেনী কেঁদে ভাসাচ্চে গো, কেঁদে ভাসাচ্চে!

নবীনকুমার বললো, আমাদের ছেলে-বউ এনেচো?

কৃষ্ণভামিনী বললো, না। সে কতা আর পাড়তে পারলুম কই! ওপরে গিয়ে দেকি, এই তো অবস্তা। মিতেনীর শাশুড়িও কাঁদচে, মিতেনীও কাঁদচে!

নবীনকুমার বললো, যত ইচ্ছে কাঁদুক, ওদের সঙ্গে আমাদের আর কোনো সম্পর্ক নেই। ছেলে-বউয়ের আর আশা করো না! ওটা উনপাঁজুরেদের বাড়ি, আমাদের মতন লোকের এখেনে আসা যাওয়া চলে না!

কৃষ্ণভামিনী বললো, কিন্তু মিতেনী যে অনেক করে বললে, আমার হাত ধরে কতা আদায় করে নিলে। ওর শাশুড়ি এখুন ওকে কোতাও যেতে দেবে না, তাই আমি যদি আসি।

নবীনকুমার কঠোর স্বরে বললো, না!

কৃষ্ণভামিনীকে অবশ্য আর কোনোদিন আসতে হলো না হাটখোলায়। এর দশদিনের মধ্যেই শুরু হলো তার ভেদ বমি, বড় বড় ডাক্তার বদ্যিরাও তাকে দেড়-দিনের বেশী ধরে রাখতে পারলো না, পুতুল খেলা ও স্বামী সোহাগের মায়া কাটিয়ে টুপ করে মরে গেল কৃষ্ণভামিনী।



চাকুরি উপলক্ষে রাধানাথ সুদীর্ঘকাল পশ্চিমাঞ্চলে কাটিয়ে কিছুদিন হলো কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছেন। গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার অফিসে তিনি বত্রিশ টাকা মাহিনায় চাকুরিতে ঢুকেছিলেন, তারপর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অংকশাস্ত্রে তীক্ষ্ন মেধার পরিচয় দিয়ে তিনি অনেক উন্নতি করেছেন। ডিরোজিও শিষ্য রাধানাথ শিকদারের ন্যায়-নীতি বোধ অতি প্রবল। উৎকোচ গ্রহণ এবং চাটুকারিতা, এই দুটিকেই তিনি প্রবলভাবে ঘৃণা করেন। তাঁর অফিসের বিভাগীয় দু'একজন কর্তা এইসব গুণের জন্য তাঁকে বিশেষ পছন্দ করেন। তাছাড়া উচ্চ-গণিতে রাধানাথের মতন জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ বিলাতেও বিশেষ নেই।

কলকাতা অফিসে রাধানাথ বদলি হয়ে এসেছেন চীফ কমপিউটার হিসেবে, বেতন ছয়শত টাকা। বহুকাল তিনি ঘুরেছেন পাহাড়ে পর্বতে, জরীপের লোকজন ও যন্ত্রপাতি নিয়ে গেছেন অনেক দুর্গম স্থানে। ছয় ফুটের বেশী লম্বা, দৈত্যের মতন স্বাস্থ্য, স্থানীয় ইংরেজরা তাঁকে আড়ালে লেভিয়াথান বলে ডাকতো। কলকাতায় তাঁর কাজ হলো খাতাপত্রে দুরূহ অঙ্কের হিসেব কষা।

হিন্দুস্থানে এখন তেমন যুদ্ধ বিগ্রহ নেই কোথাও, মোটামুটি শান্তিপূর্ণ অবস্থা, তাই ইংরেজ কর্মচারীরা এখন অন্য নানাবিধ কর্মে ব্যাপৃত। পাহাড় পর্বতের প্রতি সাহেব জাতির বরাবরেরই টান আছে, তাছাড়া গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে স্নিগ্ধ শীতল জলবায়ু অন্বেষণে তারা বারবার পাহাড়ে যেতে ভালোবাসে। হিমালয় পর্বতের নাম বহু প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীতে পরিচিত, কিন্তু ইংরেজরা দেরাদুনের দিক থেকে হিমালয়ের দিকে অগ্রসর হতে হতে প্রতিনিয়তই অগাধ বিস্ময়ের সম্মুখীন হতে লাগলো। এই নগাধিরাজ কী বিশাল, কী গহন, কী মহান! সমুদ্রের অন্তহীন ঢেউয়ের মতন দিগন্ত জুড়ে রয়েছে সংখ্যাহীন শৃঙ্গ। এখানে রয়েছে চক্ষুর সীমানা ছাড়ানো অরণ্য, যেখানে কত বিচিত্র মনোহারী অচেনা বৃক্ষ, অ-দৃশ্যপূর্ব কত পশু-প্রাণী-পতঙ্গ। গিরিকন্দরে অকস্মাৎ চোখে পড়ে কোনো সিদ্ধ পুরুষ বা তপস্যানিরত যোগী চক্ষু মুদে বসে আছেন। কতকাল তিনি সেই অবস্থায় আছেন কেউ জানে না। এখানে এলে হৃদয়ে অদ্ভুত প্রশান্তি আসে, আবার প্রতি পদক্ষেপে বিপদ। শান্ত ও ভয়ংকর রসের এমন আশ্চর্য সমাহার আর কোথাও দেখা যায় না।

সানুদেশের নিবিড় অরণ্য ক্রমশ উপরের দিকে বৃক্ষ-বিরল হতে থাকে। শিখর-গুলিতে শুভ্র চিরতুষারের বিহার। কত যে শিখর, তার ইয়ত্তা নেই। সেসব স্থলে মানুষ তো দূরের কথা পৃথিবীর কোনো প্রাণীই কখনো পদার্পণ করেনি। হিন্দু-গণের বিশ্বাস ঐ তুষারক্ষেত্র দেবতা ও অপ্সরাদের লীলাস্থল।

অসীমকে সীমা দিয়ে ঘেরার একটা চেষ্টা মনুষ্যজাতির মধ্যে সব সময়েই রয়েছে। এইরূপ চেষ্টাই সভ্যতার লক্ষণ হিসেবে গণ্য। যা অসীম, যা অনন্ত রহস্যময় তা মানুষের সহ্য হয় না, সেইজন্যই তো এই দেয়ালঘেরা সংকুচিত নগর সভ্যতা।

জরীপ বিভাগের কর্মীরা অত্যুৎসাহে হিমালয়ের শৃঙ্গগুলিকে পরিমাপের

সংখ্যাতত্ত্বে বেঁধে ফেলার জন্য নিয়মিত অভিযানে যায়। অবশ্য এজন্য চূড়ায় আরোহণ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, চূড়ার সঙ্গে সরলরেখায় কোনো একটি স্থান নির্দিষ্ট করতে হয়, তারপর থিওডোলাইট যন্ত্রের সাহায্যে চলে জ্যামিতিক হিসাব। তারপর সেইসব পরিসংখ্যান তারা প্রেরণ করে জরীপ বিভাগের সদর দফতর কলকাতায়।

যুগ যুগ ধরে ভারতীয়রা দূর থেকে হিমালয়কে প্রণাম জানিয়েছে। কিন্তু ইংরাজ জাতি জড় পদার্থকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করায় বিশ্বাস করে না। তারা চায় জীব ও জড়জগতকে পদানত করতে। ভারতীয়রা হিমালয়কে উদ্দেশ্য করে কাব্য রচেছে, কিন্তু হিমালয় যে একটি মাত্র পর্বত নয়, কতকগুলি বিচ্ছিন্ন পর্বতমালার সমষ্টি, এ সম্পর্কে কোনো কৌতূহল দেখায়নি। ইংরেজরা আরও আশ্চর্যান্বিত হয়ে যায় এই জন্য যে ভারতীয়রা হিমালয়ের শৃঙ্গগুলির নাম পর্যন্ত দেয়নি। স্থানীয় লোকেরা কাছাকাছি পরিদৃশ্যমান চূড়াগুলিকে কিছু একটা মনগড়া নামে ডাকে, দূরের দুঃসাধ্য-গমন শিখরগুলি নামহীন, গোত্রহীন, চির উদাসীন।

জরীপ বিভাগ এ পর্যন্ত বেছে বেছে প্রধান প্রধান উনআশীটি শিখরের উচ্চতা পর্যবেক্ষণ করেছেন কিন্তু তাদের পৃথক পৃথক নাম না থাকায় কাগজপত্রে হিসাব রাখার খুবই অসুবিধা হয়। তবু একত্রিশটির স্থানীয় নাম পাওয়া গেছে, বাকি-গুলি পীক নাম্বার ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর এইভাবে চিহ্নিত।

জরীপ বিভাগের কাজে অর্থের কোনো অনটন নেই। এ ব্যাপারে সরকার কোনো কার্পণ্য করেন না। অবশ্য ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণই ইংরেজ সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। এছাড়া আরও গূঢ় কারণ আছে। হিমালয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান সঞ্চয়ও বিশেষ প্রয়োজন। কারণ এই হিমালয়ের ওপারেই রুশ দেশ এবং রুশরাই এখন ইংরাজদের শত্রু। প্রায়ই শোনা যায় রুশরা ইংরাজদের কাছ থেকে ভারতবর্ষটা ছিনিয়ে নেবার জন্য আসছে। কোন্ কোন্ পথ ধরে রুশীয় বাহিনী আসতে পারে, তা কোম্পানির প্রতিরক্ষা দফতরের অবশ্যই জেনে রাখা দরকার। জরীপ বিভাগকে তাই প্রবল উদ্যমে হিমালয় অভিযানে নিযুক্ত করা হয়েছে।

মাঝখানে দু'একবার অল্পদিনের জন্য কলকাতা ঘুরে গেলেও রাধানাথ প্রায় বিশ বৎসর দেশছাড়া। তাঁর অবর্তমানে বাংলার সামাজিক জীবনে কত পরিবর্তন ঘটে গেছে, রাধানাথের সঙ্গে সেসব কিছুর যোগ ছিল না। এমন কি বাংলা ভাষাও তিনি ভালো করে বলতে পারেন না। রাধানাথের বন্ধু প্যারীচাঁদ প্রায়ই বলেন, রাধু, বাংলাটা শেখো। দেশের ভাষা না জানলে তুমি দেশের মানুষদের চিনবে কী করে? পাহাড় পর্বত নিয়েই কি তোমার সারা জীবন কাটবে? কথাটা রাধানাথের মনে লেগেছে। অফিস থেকে ফিরে প্রতি সন্ধেবেলাই তিনি প্যারীচাঁদের কাছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ নিতে যান। প্যারীচাঁদের ভাই কিশোরীচাঁদও অতিশয় বুদ্ধিমান ও কৃতবিদ্য পুরুষ, এই দু'জনের কাছ থেকে রাধানাথ অনেক বিষয়ে জানতে পারেন। পাহাড় ছেড়ে আস্তে আস্তে তাঁর মন মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সদ্য পরলোকগত বেথুন সাহেবের নামে একটি বেথুন সোসাইটি স্থাপিত হয়েছে, সেখানে দেশের শিক্ষিত সমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তিরা সমবেত হয়ে দেশের বিভিন্ন সমস্যা ও শিল্প সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করেন। রাধানাথকে সেই সোসাইটির সদস্য করে দিয়েছেন প্যারীচাঁদ। প্রথম প্রথম রাধানাথ সেখানে গিয়ে চুপ করে বসে থাকেন, তাঁর ইচ্ছে কোনো না কোনোদিন তিনিও সেখানে একটি প্রবন্ধ পাঠ করবেন। বাংলায়।

ইতিমধ্যেই রাধানাথ এক অত্যাশ্চর্য কাণ্ড করে ফেললেন।

অফিসে বসে তিনি কাজ করছেন। তাঁর সহকারীরা জরীপ বিভাগের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে সংগৃহীত পরিসংখ্যান তাঁর কাছে সাজিয়ে দিয়ে গেছে। চীফ কমপিউটার এবং প্রধান অঙ্কবিদ হিসেবে তিনি সেগুলি যাচাই করবেন। জটিল অঙ্কের মধ্যে তিনি গভীরভাবে ডুবে ছিলেন, হঠাৎ তাঁর মাথার মধ্যে যেন এক বিদ্যুচ্চমক হলো। তিনি অস্ফুটভাবে বলে উঠলেন, আরেঃ!

প্রথমটায় তিনি নিজেই যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাঁর চোখের সামনে টেবিলের ওপর ছড়ানো নানান কাগজপত্রে শুধু অঙ্কের সংখ্যা, কিন্তু তারই মধ্যে থেকে যেন মাথা তুলে দাঁড়াতে লাগলো এক পর্বতশৃঙ্গ। সেই শৃঙ্গটি উঁচু হতে হতে যেন একেবারে স্পর্শ করলো আকাশ। রাধানাথ বিস্ময়ে বিমোহিত হয়ে মানসনেত্রে দেখতে লাগলেন ধবল মুকুট পরা সেই সুমহান দিগন্ত বিস্তারী মূর্তিমান বিশালত্বকে।

একটু পরেই তাঁর ঘোর ভাঙলো, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে এক ঝটকায় কাগজপত্রগুলি জড়ো করে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন নিজের কামরা থেকে। অদূরেই আর একটি কামরায় বসেন কর্নেল অ্যান্ড্রু ওয়া। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের জরীপ বিভাগের প্রধান। আগে থেকে এত্তেলা না পাঠিয়ে বড় সাহেবের কামরায় প্রবেশ করা যায় না, কিন্তু রাধানাথের সে কথা মনে রইলো না। তিনি ঝড়ের বেগে দরজা ঠেলে ঢুকে এসে টেবিলের ওপর কাগজগুলি আছড়ে অতি উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, স্যার, দেখুন! দেখুন!

কর্নেল ওয়া তখন অন্য দু'একটি সাহেবের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি হতচকিত হয়ে বললেন, কী হইয়াছে, শিকদার? ব্যাপার কি? তুমি কাঁপিতেছ কেন?

রাধানাথ বললেন, স্যার, অদ্য একটি লাল অক্ষরের দিন। আমরা আজ এই বিশ্বের মধ্যে যাহা সর্ববৃহৎ তাহার সন্ধান পাইয়াছি।

কর্নেল ওয়া তবু বুঝতে না পেরে বললেন, শিকদার, অত উত্তেজিত হইয়ো না। আসন গ্রহণ করো। কী হইয়াছে, আমায় বিস্তারিত করিয়া বলো।

রাধানাথ বসলেন না। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন, স্যার দেখুন, এই পীক নাম্বার ফিফটিনের সর্বশেষ হিসাব।

কর্নেল ওয়া বললেন, তাহাতে কী হইল? পীক নাম্বার ফিফটিন তোমাকে এমত পাগল করিল কেন?

রাধানাথ বললেন, ছয়টি বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে এই পীক নাম্বার ফিফটিনকে পর্যবেক্ষণ করা হইয়াছে। এই দেখুন নিকলসনের প্রতিবেদন। নিকলসন কিছুই বোঝে নাই সে কি দেখিতেছে। তিন বৎসর ধরিয়া এই কাগজগুলি পড়িয়া আছে।

কর্নেল ওয়া একটু অধৈর্য হয়ে বললেন, আসল কথাটি কি তাহা তো আমি এখনো বুঝিলাম না।

রাধানাথ সগর্বে বললেন, আমি গণনা করিয়া দেখিয়াছি, ইহার উচ্চতা উনত্রিশ সহস্র দুই ফিট; এই বিশ্বে ইহা অপেক্ষা বড় আর কিছুই নাই। আমরা আবিষ্কার করিয়াছি পৃথিবীর চূড়া।

এবার কর্নেল ওয়া লাফিয়ে উঠে বললেন, বলো কী?

কর্নেল ওয়া রাধানাথের প্রতিভা বিষয়ে জানেন। তাঁর পূর্বতন সার্ভেয়ার জেনারেল রাধানাথের নামে অনেক প্রশস্তিবাণী লিখে রেখে গেছেন। সুতরাং তিনি রাধানাথের কথা সহসা অবিশ্বাস করতে পারেন না। তবু রাধানাথের সঙ্গে

বসে অঙ্কগুলি মিলিয়ে দেখলেন অনেকক্ষণ ধরে। তারপর তিনিও এক সময় বলে উঠলেন, হুররে।

এটা একটা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার মতন সংবাদ। ততক্ষণে জরীপ বিভাগের সকল কর্মী এসে জমায়েত হয়েছে সেখানে। এত বড় আবিষ্কারের কৃতিত্ব কলকাতা অফিসের। সকলের মধ্যে আনন্দ কোলাহল।

কর্নেল ওয়া সোল্লাসে রাধানাথের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বললেন, ধন্যবাদ, শিকদার, তুমি একটি বিস্ময়কর কার্য করিয়াছ।

তারপর কর্নেল ওয়া স্বগতভাবে বললেন, পুয়োর নিকলসন, হি ডিড্ নট সাসপেক্ট দ্যাট হি ওয়াজ ভিউয়িং থ্রু দা টেলিস্কোপ দা হাইয়েস্ট পয়েণ্ট অফ দা আর্থ।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা কর্নেল ওয়ার গৃহে শ্যাম্পেনের বোতল খুলে এই মহান উপলক্ষটি উদ্‌যাপিত করা হলো। গভর্নর জেনারেল এখন কলকাতায় নেই, এই সংবাদ-লেফাফা নিয়ে তাঁর কাছে চলে গেছে দূত। আজ স্থানীয় ইংরেজদের কাছে বড় আনন্দের দিন। নতুন কিছু আবিষ্কারের মর্ম ভারতীয়রা ঠিক বোঝে না, কিন্তু এই ঊনবিংশ শতাব্দীর নব জাগরণের সময় শ্বেতাঙ্গরা যখন নিত্য নতুন আবিষ্কারে মত্ত, তখন পৃথিবীর চূড়া আবিষ্কারের মতন ঘটনাও বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ। সারা বিশ্ব এজন্য কলকাতার জরীপ বিভাগের কৃতিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য।

কথায় কথায় প্রশ্ন উঠলো, পীক নাম্বার ফিফটিনের নতুন নাম কী হবে? দুনিয়ার সমস্ত পাহাড়ের যিনি রাজা, তিনি তো নামহীন থাকতে পারেন না। স্থানীয় লোকেরা এর কোনো নাম দিয়েছে কিনা, সে সম্পর্কে কি আর অনুসন্ধান করতে পাঠাতে হবে? এ দেশের পাহাড়ের যদি কোনো এ দেশীয় নাম থাকে তবে তা পরিবর্তন করার দরকার নেই।

রাধানাথ বললেন, স্যার, আমি নিজেও কয়েকবার নামহীন শিখরগুলির পর্য-বেক্ষণ অভিযানে বাহির হইয়াছি। আমি খুব ভালো করিয়াই জানি যে স্থানীয় লোকেরা এই উচ্চতম শৃঙ্গটির অস্তিত্ব সম্পর্কেই অবহিত নয়।

কর্নেল ওয়া বললেন, তাহা হইলে তো একটি নাম আমাদেরই দেওয়া কর্তব্য। বিশ্বের সকল দেশে এই আবিষ্কারের কাহিনী প্রচারিত হইবে, বিলাতে আগামী কল্যই ডেসপ্যাচ প্রেরণ করিবার কথা, সুতরাং একটি নাম তো আশু প্রয়োজন।

রাধানাথ দ্রুত চিন্তা করলেন। রাজভক্ত ইংরেজরা নিশ্চয়ই তাদের মহারানী ভিক্‌টোরিয়ার নাম প্রস্তাব করবে। রাধানাথ নিজ অভিজ্ঞতায় দেখেছেন যে হিমালয় যেমন পুরুষ, তেমনই হিমালয়ের পরিচিত বড় বড় শৃঙ্গগুলিকে পুরুষ হিসেবেই কল্পনা করে ভারতীয়রা। বেশ কয়েকটি নাম কোনো দেবতার নামে। সাহেবরা কোনো হিন্দু দেবতার নাম পছন্দ করবেন না। রাধানাথ নিজেও একেশ্বর-বাদী, হিন্দু দেব-দেবীদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ নেই। তিনি অন্য একটি নাম আগেই চিন্তা করে রেখেছেন।

অন্য কেউ কিছু বলবার আগেই রাধানাথ বললেন, ভদ্রমহোদয়বৃন্দ, আমার একটি প্রস্তাব পেশ করিতে পারি কি?

কর্নেল ওয়া উত্তর দিলেন, নিশ্চয়ই, শিকদার, বলো, তোমার কী অভিপ্রায়?

রাধানাথ বললেন, স্যার, জরীপ বিভাগের পূর্ববর্তী প্রধান পরিচালক জর্জ এভারেস্ট আমার গণিত শিক্ষার গুরু। ভারতীয় জরীপ বিভাগটি তিনি এমনভাবে ঢালিয়া সাজাইয়া ছিলেন যে বলিতে পারেন এই বিভাগ প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই সৃষ্টি। তিনি যে যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন সেই অনুযায়ীই

আজিও পর্যবেক্ষণ ও গণনা চলিতেছে। তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া এক্ষণে বিলাতে অবস্থান করিতেছেন। হিমালয়ের এই রাজশিখরটিকে তাঁহার নামে অভিষিক্ত করিলে তিনি এক পুলক-চমক পাইবেন। ভাবিয়া দেখুন, ইহাই হইবে সেই কর্মবীরের প্রতি আমাদের সমবেত উপহার। পীক নাম্বার ফিফটিনের নাম হউক জর্জ এভারেস্ট।

উপস্থিত সাহেববৃন্দ এই আলোচনার পক্ষে বিপক্ষে নানা প্রকার আলোচনা শুরু করে দিল। রাধানাথের মনে হলো নামের ব্যাপারটির দ্রুত নিষ্পত্তি করা দরকার। একবার কেউ মহারানীর নাম উত্থাপন করলেই বিপদ, কারণ, তাহলে আর তা প্রত্যাহার করা যাবে না। মহারানীর নামের বিপক্ষে কে যাবে?

কর্নেল অ্যান্ড্রু ওয়া বেশ কিছুদিন জর্জ এভারেস্টের অধীনে কাজ করেছেন, তাঁর সম্পর্কে ওয়ার শ্রদ্ধা আছে।

তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, উত্তম, শিকদার, তোমার প্রস্তাবই গ্রহণযোগ্য মনে হয়। এই নামে আমাদের দফতরটিই সম্মানিত হইবে। তবে আমি একটু সংশোধন করিতেছি, জর্জ এভারেস্ট নহে, শুধু এভারেস্ট। এই এভারেস্ট শব্দটির মধ্যেই এমন একটি ব্যঞ্জনা রহিয়াছে যাহা এই চিরকালের সর্ববৃহতের পক্ষে বেমানান হইবে না।

এরপর কয়েকদিন ধরেই বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই কাহিনী নানাভাবে প্রচারিত হওয়ায় দেশের লোক প্রথম রাধানাথ শিকদারের নাম জানলেন। ডিরোজিওর শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই এখন নানাপ্রকার কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত বলে দেশবাসী তাদের চেনে। কিন্তু রাধানাথ সেই সময়কার হিন্দু কলেজের উজ্জ্বল ছাত্র হয়েও জনসাধারণের অগোচরে ছিলেন, এবার প্রকাশ্যে এলেন।

অবশ্য ইংরাজী সংবাদপত্রগুলি একজন দেশীয় লোকের কৃতিত্বের কথা প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করলো যথারীতি। প্রায় কোনো ইংরাজী সংবাদপত্রেই রাধানাথের নাম উল্লেখ করা হলো না, কোথাও বলা হলো 'বেঙ্গলি চীফ কমপিউটার', কোথাও বা 'ক্লার্ক' আর কোথাও বা শুধু 'এ বাবু'।

রাধানাথের বন্ধুরা একদিন রামগোপাল ঘোষের আবাসে মিলিত হলেন রাধানাথকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য। এসেছেন বর্ধমানের ডেপুটি কালেক্টর রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এখন কলকাতার অ্যাসেসমেন্ট কালেক্টর। সুযোগ্য শিক্ষক রামতনু লাহিড়ী, কলকাতার প্রধান সরকারি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক প্যারীচাঁদ মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্তী বর্ধমান রাজের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে সদ্য চলে এসেছেন কলকাতায়, বাগ্মী ও সাংবাদিক হিসেবে তিনি সুপরিচিত, এছাড়া এসেছেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রমুখ আরও অনেকে।

ইয়ং বেঙ্গলের দল প্রবীণ হয়ে অনেকেই সুরাপান ত্যাগ করেছেন এখন। কিন্তু রামগোপাল করেননি, বরং তাঁর যেন কিঞ্চিৎ মাত্রা বেড়েছে। রামগোপালের মুখে অস্থিরতার ছাপ, তাঁর ভেতরে ভেতরে কিছু একটা জ্বালা রয়ে গেছে মনে হয়। রামগোপাল ব্র্যান্ডি ও শ্যাম্পেনের বোতল খুলে দিলেন, সুগন্ধ চা-ও প্রস্তুত হলো, যার যে-রকম অভিরুচি গ্রহণ করবেন।

রাধানাথ অতিশয় গো-মাংস ও সুরার ভক্ত, তাঁর বিশাল বলবান শরীরটি রক্ষার জন্যও এইসব জিনিসের প্রয়োজন। বন্ধুদের মধ্যে রাধানাথ প্রায়ই মত ব্যক্ত করেন যে, হিন্দুদের মধ্যে গো-মাংস আহারের প্রচলন করাতে না পারলে হিন্দু সমাজের

কোনোদিন উন্নতি হবে না। গোখাদকরা কক্ষনো অন্য কারুর চোখ রাঙানী সহ্য করে না। এবার কলকাতায় ফিরে এসে রাধানাথ অবশ্য বিস্মিত হয়ে দেখেছেন যে তাঁর বন্ধুরা অনেকেই এখন আর গো-মাংস ভক্ষণের ব্যাপারে উৎসাহী নয়। যারা একসময় প্রকাশ্যে গোরুর মাংস খেয়ে হাড় ছুঁড়ে দিত প্রতিবেশীদের বাড়ির ছাদে, তারা কেউ কেউ এখন আর গো-মাংসের নামও উচ্চারণ করে না। এমনকি প্যারীচাঁদ তাঁকে দু'একবার বলেছেন, না হে রাধু, ও নিয়ে আর বেশী বাড়াবাড়ি করো না, হিন্দুরা গো-মাংসের সংস্কার কিছুতে কাটিয়ে উঠতে পারবে না।

সেদিন অবশ্য রাধানাথের জন্য প্রচুর গো-মাংসের কাবাবও রাখা হয়েছে। ভোজনরসিক রাধানাথ তাতেই সন্তুষ্ট, ভণ্ড হিন্দুরা যত খুশী পাঁঠার মাংস খেয়ে ব্যা ব্যা করুক, তাঁর নিজের পছন্দ মতন খাদ্য পেলেই হলো।

আলাপচারি যখন বেশ জমে উঠেছে, তখন রামগোপাল একবার ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, কিন্তু আমাদের রাধা যে এতবড় একটা কাজ করলে, সরকার তার স্বীকৃতি দিলেন কোথায়? তাকে কি একদিন পাবলিক রিসেপশন দেওয়া উচিত কর্ম হতো না? যে কীর্তি ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবে তার জন্য কোম্পানির ডিরেকটারগণ তাকে কোনো পুরস্কার দিতে পারলে না? অন্য দেশ হলে ওকে মাথায় তুলে নাচতো।

রাধানাথের চেহারাটি বিশাল হলেও স্বভাবে বড় লাজুক। বিশেষত নিজের বিষয়ে কোনো আলোচনা শুনতে তিনি লজ্জা পান।

তিনি বললেন, না, না, তেমন কিছু নয়। তোমরা বেশী বাড়াচ্চো।

প্যারীচাঁদ বললেন, তেমন কিছু নয় কেন? তুমি সেদিনকে যে আমায় বোঝালে, ট্রিগোনোমেট্রির এমন জটিল গণনা করার ক্ষমতা ক'জন সাহেবের আছে? এদেশে কারুর নেই। তোমায় নিশ্চয়ই কোম্পানির তরফ থেকে শিরোপা দেওয়া ন্যায্য ছিল।

রাধানাথ বললেন, ঐ তো কোম্পানি আমায় আলিপুরের আবহাওয়া অফিসের সুপারিনটেণ্ডেন্ট-এর পদ দিয়েছে।

রামগোপাল বললেন, তাতে কী হলো, তাতে শুধু তোমার অতিরিক্ত কাজ বাড়লো। তাতে কী তোমার পদোন্নতি হলো?

এবার রসিককৃষ্ণ মল্লিক বললেন, ভায়া, ওর থেকে আর বেশী আশা করো না। কালো চামড়া কালো চামড়াই। সাহেবরা যে পদে কাজ করে, সে পদে কোনো-দিন কালো চামড়াদের বসাবে না। দ্যাকো না, আমি সেই যে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটিতে ঢুকেছিলাম, এখনো সেখানেই ঘষচি। আর নতুন চাকরে সাহেবরা টকাটক করে আমার মাথা টপকে যাচ্চে।

রামগোপাল বললেন, এ অবিচারের প্রতিবাদ হওয়া দরকার। এ বিষয়ে একটি সভা ডেকে রেজোলিউশান নিলে কেমন হয়?

রসিককৃষ্ণ বললেন, তাতে কোনো সুরাহা হবে বলে আমি মনে করি না। আমাদের চাকরি বাকরির উন্নতিকল্পে মিটিং না ডেকে আমরা বরং দেশের উন্নতি-কল্পে আরও কিছু কাজ করলে পারি। সবচে আগে প্রয়োজন দেশের মানুষের মধ্যে অবিচারবোধ জাগ্রত করা।

রাধানাথ বললেন, তুমি এই কথাটা বহোৎ বিলকুল সাচ্চা বলছো হে রসিক। এবার ফিরে এসে যেন দেকচি, জাত, ধম্মো, হিঁদুয়ানি নিয়ে ফিন হামেশা বাড়া-বাড়ি শুরু হয়েচে। লোকের মন আবার যেন পিছাড়ি হটচে!

দক্ষিণারঞ্জন বললেন, হীরা বুলবুল নামের বারাঙ্গনার ছেলেটিকে হিন্দু কালেজে ভর্তি করা উপলক্ষে রক্ষণশীলরা আবার নতুন করে ঘোঁট পাকাতে শুরু

করেচে।

প্যারীচাঁদ বললেন, সে ছেলেটিকে তো আবার তাড়িয়েও ছেড়েচে এর মধ্যে শুনচি।

রামগোপাল রাধানাথের বাহু চাপড়ে বললেন, রাধা, তুমি নেচারের মধ্যে ম্যাগনিফিসেন্টকে আবিষ্কার করেচো, আমাদের উচিত হবে আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে কত বৃহৎ, কত মহৎ রয়েচে, তা খুঁজে বার করা।

রাধানাথ বললো, ঠিক। আমায় তোমরা রাস্তা বাতাও, আমি সেদিকে কাজ করতে জরুর রাজি আছি।

প্যারীচাঁদ বললেন, অনেকে মাথা তোলার সুযোগই পাচ্ছে নাকো, সেইজন্যেই বোঝা যাচ্ছে না, তাদের আসল দৈর্ঘ্য কতখানি।

রামগোপাল বললেন, আমাদের এখন রাজনৈতিক অধিকারের জন্য আন্দোলন করা দরকার।

রসিককৃষ্ণ বললেন, ওপথে এখনো যাবার সময় হয়নি, এখনও সামাজিক আন্দোলনেই বেশী কাজ হবে। কী বলো হে, রামতনু?

স্বল্পভাষী রামতনু বললেন, তোমার কথাই ঠিক।

রাধানাথ রামগোপালকে বললেন, তুমি তো এ যুগের ডিমস্থিনিস, তুমি চেষ্টা করলে বোহুৎ কুছ করতে পারবে।

রামগোপাল বললেন, ডিমস্থিনিস-এর সঙ্গে যদি লেভিয়াথান যোগ দেয়, তাহলে ধুন্ধুমার হয়ে যাবে। কী বলো?

রাধানাথ বললেন, বোহুৎ খুব। ম্যায় তৈয়ার।

প্যারীচাঁদ বললেন, এই রাধুটাকে নিয়ে আর পারা গেল না। বোহুৎ কিছু আর বোহুৎ খুব ওর মুখ থেকে আর ছাড়ানো গেল না কিছুতেই।

হাসির রোলে হাওয়া একটু হালকা হয়ে গেল।

এক সময় রাধানাথ রামগোপালকে জিজ্ঞেস করলেন, ব্রাদার, আগেরবার যখন আসি, তখন তোমার বাড়ির সামনে একটা ইনসিডেন্ট হয়েছেল। সেই যে এক ছোট লেড়কিকে সেইভ করা হলো, তা সেই লেড়কিটির এখন কী অবস্থা?

রামগোপাল বললেন, সে রয়ে গ্যাচে আমারই বাড়িতে। তার আত্মীয় স্বজনরা কেউ তাকে ফেরৎ নিতে আসেনি। কে জানে, সবাই তো ভাবে আমি ম্লেচ্ছ, আমার বাড়িতে রাখায় তার বুঝি জাত গ্যাচে। আমার পত্নী মেয়েটার নাম দিয়েছিলেন কুড়ানী, আমি নাম রেখিচি নীপবালা। খানিকটা লেখা পড়া শিকিয়েওচি, কিন্তু কী হবে, সারা জীবন কষ্টই পাবে। আমার সাধ্য থাকলে আমি মেয়েটির বিয়ে দিতুম।

রাধানাথ উৎসাহের সঙ্গে বললেন, দেও না। আমরা সবাই থোড়া কুচ সাবক্রিপশান দিয়ে মেয়েটাকে উদ্ধার করে দিই।

রামগোপাল বললেন, টাকার জন্য কী আটকে আছে নাকি? টাকা থাকলেই বিয়ে দেওয়া যায়?

দক্ষিণারঞ্জন বললেন, কেষ্ট বলেচে, যদি মেয়েটিকে খৃষ্টান করতে রাজি হও, তবে ওর একটা হিল্লে হয়ে যেতে পারে।

রাধানাথ বললেন, বিয়ে-শাদীর জন্য আমাদের অবলাদের কেরেস্তান হতে হবে, ইয়ে বহুৎ তাজ্জব কী বাৎ!

রামগোপাল বললেন, হিন্দু বিধবার বিয়ে দেওয়া যায় না, সে অক্ষতযোনি হলেও একবার বিধবার বিধবা থাকাই নিয়তি। তোমাদের পশ্চিমে কী হয় জানি

না, এই বঙ্গে আর কিছু সম্ভব নয়।

প্যারীচাঁদ বললেন, শুনতে পাই যে সংস্কৃত কলেজের ঈশ্বর বিদ্যেসাগর নাকি বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেচেন।

রামগোপাল বললেন, সে ব্রাহ্মণ আর একলা কী করবেন? কতটুকু পারবেন দেশ সুদ্ধ মূঢ়ের দলের মন ফেরাতে?

মদনমোহন বললেন, সে বামনার জেদ তোমরা জানো না। একেবারে কচ্ছপের কামড়ের মতন, একবার কিছুতে লাগলে আর ছাড়ে না। শিকদের মশায়, এ ব্রাহ্মণও একখানা পাহাড়ের চূড়া, এখনো কেউ মেপে দেখেনি।

দক্ষিণারঞ্জন বললেন, আমার ভয় হয়, বিদ্যেসাগর মশাইয়ের ওপর কেউ হামলা না করে। অকাল কুষ্মাণ্ডের দল যদি ওনার কোনো শারীরিক ক্ষতি করে বসে?

প্যারীচাঁদ বললেন, সতীদাহ বিলের সময় রামমোহনকেও অনেকে মারবে বলে শাসিয়েছিল।

রামগোপাল খানিকটা আচ্ছন্নভাবে বললেন, সে সময় কিন্তু আমরাও রামমোহনের পাশে গিয়ে অনেকে দাঁড়াইনি। বাল্যের চাপল্যে আমরা রামমোহনের সুদূর প্রসারী আদর্শের মর্ম বুঝিনিকো, অনেক তুচ্ছ ব্যাপারে মত্ত ছিলুম।...

তারাচাঁদ বললেন, দেওয়ানজীর পর এই বিদ্যাসাগরই একা ভ্রম নিরসনের জন্য উঠে পড়ে লেগেচেন!

রাধানাথ বললেন, এই ঈশ্বর পণ্ডিতের কথা আমি আগেরবার এসেও শুনিচি। তাহলে ভাই আমরা এতজন রয়িচি, আমরাও ওনাকে মদৎ দিই না কেন?

তারাচাঁদ বললেন, রাধানাথ এটি বেশ কথা বলেচে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় আমাদেরও পূর্ণ সমর্থন জানানো দরকার।

রাধানাথ বললেন, তাহলে এসো না ভাই, এইক্ষণেই আমরা একটি শপথ লই, এই ঈশ্বর পণ্ডিত বিধবা বিবাহ দেবার চেষ্টা করলে আমরা ইয়াং বেঙ্গলের দল সকলে তেনার পাশে গিয়ে খাড়া হয়ে যাবো।

সকলেই হৈ হৈ করে যার যার হাতের সুরার পাত্র কিংবা চায়ের কাপ তুলে নিয়ে একসঙ্গে সেই মর্মে শপথ বাক্য উচ্চারণ করলেন।



মোগলসরাই নামক স্থান পার হয়ে এক অপরাহ্নে গঙ্গানারায়ণ বারাণসীর সমীপে এসে উপস্থিত হলো। গঙ্গার বাম কূলে অর্ধচন্দ্রাকৃতি নগরীটি তখন সদ্য দীপাবলীর আলোকমালায় ঝলমল করে উঠেছে। গঙ্গানারায়ণের হৃদয় কম্পিত হতে লাগলো। আর বেশী দেরি নেই। এবার বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

গঙ্গানারায়ণ তখনই অবশ্য নগরে প্রবেশ করলো না। তার মনের মধ্যে একটি বাধা আছে। তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে যে কয়েক মাস সে পরিভ্রমণে রত ছিল, ততদিন তার স্মৃতি যেন হয়েছিল অবশ। সে আহার করেছে, নিদ্রা গেছে এবং অন্যদের সঙ্গে পথ হেঁটেছে, অর্থাৎ তার শরীর ছিল সক্রিয়, কিন্তু মনের কোনো কার্য-কলাপ ছিল না। যে জীবন সে ছেড়ে চলে এসেছে, একবারও সে জীবনের ছায়া-পাত ঘটেনি মনে। তার দুঃখ ছিল না, পরিতাপ ছিল না, ভয় কিংবা সুখের

আকাঙ্ক্ষা ছিল না।

প্রয়াগ সঙ্গমে স্নান করার পর তার সেই মোহনিদ্রা ভেঙে গেছে। এখন সকলই তার কাছে স্পষ্ট। সে জানে, সে গঙ্গানারায়ণ সিংহ, সে ইব্রাহিমপুরের জমিদারি পরিদর্শনে এসেছিল, সে প্রজাদের পক্ষ নিয়ে অত্যাচারী নীলকরদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে নেমেও মধ্যপথে অকস্মাৎ সব ছেড়ে চলে এসেছে। কলকাতায় রয়েছে তার জননী, তার ভাই ও বিবাহিতা পত্নী, এ সব কথা গঙ্গানারায়ণের মনে পড়লেও এখন এ সমস্ত কিছুও তার কাছে তুচ্ছ। সে আর পিছন দিকে ফিরে যাবে না। বিন্দুবাসিনীকে নিয়ে সে পরিচিত জগত থেকে হারিয়ে গিয়ে মানুষের অগম্য কোনো স্থানে নীড় বাঁধবে। বিস্ময়ে বিমোহিতা বিন্দুবাসিনীর সামনে সে অকস্মাৎ উপস্থিত হয়ে বলবে, দ্যাখ বিন্দু, তোকে আমি ভুলিনি। আমি এসেছি, অনেক দূরের পথ পার হয়ে। আমরা দু'জনে আমাদের পরিচিত পৃথিবীকে পশ্চাতে ফেলে অজানা দেশে চলে যাবো।

কিন্তু গঙ্গানারায়ণের বাধাটি অন্য।

বিধুশেখরের নির্দেশে বউবাজারের কালীমন্দিরে গিয়ে দেবীমূর্তির পা ছুঁয়ে গঙ্গানারায়ণ শপথ করেছিল যে, সে আর কখনো বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করবে না। সেই শপথের কথা বিন্দুবাসিনীও জানে। সেই শপথের জন্যই যদি বিন্দুবাসিনী তাকে ফিরিয়ে দেয়? শপথভঙ্গকারীকে কেউ শ্রদ্ধা করে না, গঙ্গানারায়ণ নিজেও করে না। সে সময় গঙ্গানারায়ণের বয়স অল্প ছিল, বিধুশেখরের প্রতাপ অগ্রাহ্য করার মতন শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি, তা ছাড়া, বিন্দুবাসিনীর ওপর যাতে কোনো অত্যাচার না হয়, সেইজন্যই সে বাধ্য হয়ে নিয়েছিল শপথ। এখন সে সেই শপথের বাধা অতিক্রম করবে কী করে?

পথশ্রমে গঙ্গানারায়ণ ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, অবসন্ন। এখন তার শরীর চাইছে বিশ্রাম। সে অনায়াসেই রাত্রির জন্য কোনো সরাইখানায় আশ্রয় নিতে পারে। আসার পথে গঙ্গানারায়ণ তার দুটি অঙ্গুরীয় বিক্রয় করেছে, তার কাছে যথেষ্ট অর্থ আছে। তবু গঙ্গানারায়ণ ইতস্তত করতে লাগলো। বারাণসীতে সে যে বিন্দু-বাসিনীর সন্ধানেই এসেছে, এ ব্যাপারে সে তার মনের সঙ্গেও কারচুপি করতে পারবে না।

বারাণসী শহরের প্রবেশ পথে মস্ত বড় একটি লোহার ফটক। কাছেই একটি কোতোয়ালি। ফটকটির দু'পাশে দাউ দাউ করে জ্বলছে দুটি মশাল। অনেকগুলি গো-যান, অশ্ব শকট ও মানুষজনের ভিড় সেখানে।

সেখান থেকে একটু পিছিয়ে এসে একটি বৃক্ষতলে বসে গঙ্গানারায়ণ শ্রান্তিতে চোখ মুদলো। অমনি সে মানস নয়নে দেখতে পেল এক করাল কালীমূর্তি, এঁর জিহ্বাটি সোনার, চক্ষুদুটিতেও স্বর্ণ ফলক বসানো, অন্ধকারে সেই জিভ ও চোখ ঝকঝক করছে। এই সেই বউবাজারের কালীমূর্তি, যাঁর সামনে শপথ নিয়েছিল গঙ্গানারায়ণ। গঙ্গানারায়ণের সর্বাঙ্গে শিহরন হলো। সে যে ঠিক ভয় পেল তাও নয়, কলেজ জীবন থেকেই সে অলৌকিক বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছে আস্তে আস্তে। কিন্তু এ এক অন্যরকম অনুভূতি। সে চোখ বুজে এখন বিন্দুবাসিনীর মুখখানি মনে করতে চাইছে কিন্তু তার বদলে দেখা দিচ্ছে এই ধাতু-প্রস্তরের মূর্তির মুখ। অনেক চেষ্টা করেও গঙ্গানারায়ণ বিন্দুবাসিনীর মুখখানি মনে আনতে পারলো না।

গঙ্গানারায়ণ চোখ খোলা রেখে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে লাগলো। এই শপথের নিগড় তাকে ভাঙতেই হবে। এত দূর এসে সে তো আর ফিরে যেতে পারে না।

প্রয়াগ থেকে আসার পথে সে বারবার এই কথাই ভেবেছে। অতীত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত না হতে পারলে বিন্দুবাসিনীকে পাবার কোনো উপায় নেই তার।

এক সময় গঙ্গানারায়ণ আপন মনেই বলে উঠলো, আমি মানি না!

মাটির ওপর হাঁটু দুটি স্থাপন করে বসে হাত দুটি অঞ্জলিবন্ধ করে গঙ্গানারায়ণ বললো, আজ থেকে আমি তোমাদের নিকট হতে বিযুক্ত হলুম। আমি নতুন শপথ গ্রহণ করচি, আজ থেকে আমরণ আমি আর কোনো দেব-দেবীকে প্রণাম জানাবো না। এই সব দেব-দেবীরা ভ্রান্ত বিশ্বাসে গড়া কাষ্ঠ-লোষ্ট্রের পুত্তলি মাত্র, যারা ওদের নিয়ে পুতুল খেলা খেলতে চায় খেলুক, আমার কাচে ওরা সব মূল্যহীন।

গঙ্গানারায়ণ তার বন্ধু রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে যাতায়াত করেছে অনেকবার। রাজনারায়ণ যেদিন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে, সেদিন গঙ্গানারায়ণ উপস্থিত ছিল সেখানে। সংস্কারমুক্ত ব্রাহ্মধর্মের প্রতি সেও শ্রদ্ধাশীল হয়েছিল, সে বুঝেছিল যে, রাজার জাতি খৃষ্টানদের চাপে পড়ে দেশের মানুষের মধ্যে যে খৃষ্টধর্ম গ্রহণের জোয়ার এনেছে তা রোধ করার জন্য এই নতুন মত প্রচারই শ্রেষ্ঠ পন্থা এবং এর ফলে হিন্দুধর্মও একটা পরিচ্ছন্ন রূপ পাবে।

এই ব্রাহ্মধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও গঙ্গানারায়ণ নিজে তা গ্রহণ করতে পারেনি, তাদের গোঁড়া বৈষ্ণব পরিবারে এ এক দারুণ বিদ্রোহ, তার মা কিছুতেই মেনে নিতে পারতেন না। অনেক ধর্মপ্রাণা হিন্দু মহিলার ধারণা দেব-দেবীদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করলে অকাল মৃত্যু হয়। ধর্ম হিন্দুদের মধ্যে এনে দিয়েছে ভীরুতা। ধর্ম পালনের কারণ যেন নানাপ্রকার ভয়।

এখন গঙ্গানারায়ণ একা, তার কোনো পশ্চাৎটান নেই, সে বিশ্বাসের ব্যাপারে স্বাধীন।

গঙ্গানারায়ণ তখন সেইখানে নিজের বিবেককে সাক্ষী রেখে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করলো। সে উচ্চারণ করলো, ওঁ তৎ সৎ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা সেই সত্য।... একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম—একমাত্র অদ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী নিত্য ব্রহ্ম, আমি তাঁহার বন্দনা করিব।...তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তরূপ স্বরূপ ব্রহ্ম...যাঁহা হইতে সকল ভূত জন্ম লাভ করে, যাঁহাতে জীবিত থাকে এবং যাঁহাতেই সব লয়-প্রাপ্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম...আমি প্রতিদিন শুদ্ধ চিত্তে তাঁহারই বন্দনা করিব, তাঁহা বৈ আর কাহারও নয়।...

গঙ্গানারায়ণ এখন নতুন মানুষ, পুরাতন বিশ্বাস, শপথের আর কোনো মূল্যই নেই তার কাছে। সে যদি খৃষ্টান বা মুসলমান হতো, তার পরও কি সে হিন্দু দেব-দেবীর কাছে গ্রহণ করা শপথ মান্য করতো? বেশী কথা কি, বিন্দুবাসিনীর জন্য খৃষ্টান বা মুসলমান হতেও তার আপত্তি ছিল না, সকল ধর্মের ঈশ্বরই তো এক।

গঙ্গানারায়ণ আবার চোখ বুজলো। এবারেও অবশ্য সে বিন্দুবাসিনীর মুখ দেখতে পেল না, এবারও অন্ধকারে ভেসে উঠলো সেই স্বর্ণজিহবা ও স্বর্ণনয়না কালীমূর্তির মুখ। তবু গঙ্গানারায়ণের আর কোনো দায় নেই। সে ঠিক জানে, তার দৃষ্টি একদিন স্বচ্ছ হয়ে যাবে।

এবার গঙ্গানারায়ণ উঠে হাঁটতে হাঁটতে ফটক পেরিয়ে চলে এলো বারাণসী শহরের মধ্যে। পথে পথে মশাল জ্বলছে, দোকানপাটে চলছে কেনাবেচা। সে এক দোকান থেকে কিনলো এক প্রস্থ নতুন পোশাক, তীর্থযাত্রীর ধূলি-মলিন বেশ সে এবার ছাড়বে। অপর এক দোকান থেকে সে কচৌড়ি ও মালাই কিনে উদর

প্রতি করলো, তারপর আশ্রয় নিল কাছাকাছি এক সরাইখানায়। এই রাত্রে বিন্দুবাসিনীর খোঁজ করে কোনো লাভ নেই।

বারাণসী শহরটি সম্পর্কে গঙ্গানারায়ণের সম্যক কোনো ধারণা ছিল না। কলকাতার চেয়েও এর লোকসংখ্যা বেশী। কত রকমের মানুষ! সকাল বেলা পথে বেরিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গেল সে।

কতকালের প্রাচীন এই শহর, হিন্দুদের পরম পবিত্র তীর্থ। স্বয়ং শিব এখানে এসে ভিক্ষা নিয়েছিলেন অন্নপূর্ণার কাছ থেকে। আবার এই শহর মুসলমানদের অধীনেও থেকেছে, মন্দিরের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে মসজিদ। এক হিন্দু জমিদারের হাতে কাশীর জমিদারির স্বত্ব দিয়েছিলেন অযোধ্যার নবাব। আবার এই জমিদারি শাসনের অধিকার অযোধ্যার নবাব দিয়ে দিয়েছেন ইংরেজদের। ফলে এখানে হিন্দু, মুসলমান এবং ইংরাজ নারী-পুরুষ যত্রতত্র দেখা যায়। ভীরু তীর্থযাত্রীদের দলের পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায় সাহেব রাজপুরুষ। অথবা ঝমঝম করে তাঞ্জাম হাঁকিয়ে যেতে দেখা যায় কোনো অভিজাত মুসলমানকে। আবার এক সঙ্গে এক দঙ্গল সাধুর শোভাযাত্রায় রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন জায়গার রাজা মহারাজারাও জাঁকজমকের সঙ্গে আসেন পুণ্য অর্জনের জন্য। নানা বয়েসের বিধবা ও বৃদ্ধ ধর্মভীরু বাঙালীর সংখ্যাও ভিড়ের মধ্যে কম নয়।

গঙ্গানারায়ণ জানে, তার পিতা রামকমল সিংহ এক সময় বারাণসীতে একটি বাড়ি কিনেছিলেন। বিধুশেখরের নিজস্ব কোনো সম্পত্তি নেই এখানে। বিধুশেখর দূর দেশে ঘোরাঘুরি পছন্দ করেন না বলে তাঁর ভূসম্পত্তি তিনি কলকাতাতেই বাড়িয়ে চলেছেন। সুতরাং, বিন্দুবাসিনীকে কাশীতে রামকমল সিংহের বাড়িতেই রাখা হবে, এটাই গঙ্গানারায়ণ স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছিল। দলিলপত্র দেখে সে বাড়িটির ঠিকানাও জানা ছিল তার।

পথঘাট সে চেনে না, লোককে জিজ্ঞেস করতে করতে এগোলো গঙ্গানারায়ণ। তাকে যেতে হবে দশাশ্বমেধের ঘাটের কাছে। এখানে নাকি ঘাট আছে প্রায় আশিটি, তার মধ্যে যে পাঁচটি ঘাটকে বলে পঞ্চতীর্থ, তার মধ্যে দশাশ্বমেধ একটি, সুতরাং সবাই চেনে। পথের লোককে কিছু জিজ্ঞেস করলে তারা স্বেচ্ছায় অনেক কথা জানিয়ে দেয়। কাশীর মানুষ অচেনা লোকদের সঙ্গেও কথা বলতে ভালোবাসে, এরা কলকাতার লোকদের মতন নয়।

বেশ কিছু দূর যাবার পর গঙ্গানারায়ণের চোখে পড়লো একটি উচ্চ মন্দিরের চূড়া। রৌদ্রকিরণে মন্দিরের উপরিভাগ ঠিক সোনার মতন ঝকঝক করছে। এমন মন্দির সে আগে কখনো দেখেনি। পথের লোককে সেই মন্দিরের কথা জিজ্ঞেস করতে তারা সাঙ্ঘাতিক অবাক হয়ে গেল। কাশীতে এসেও বাবা বিশ্বনাথের মন্দির চেনে না, এ কোন্ পাপী?

গঙ্গানারায়ণ লোকের কথায় জানতে পারলো যে, মন্দিরের চূড়াটি সত্যিই সোনার। এ মন্দির কতকালের কেউ জানে না। তবে ঔরঙ্গজেবের আমলে এই মন্দির একবার ধ্বংস করা হয়েছিল। রানী অহল্যাবাঈ মন্দিরটি আবার গড়ে দিয়েছেন আর মহারাজা রণজিৎ সিংহ শিখরটি মুড়ে দিয়েছেন সোনায়। একজন পথের সাথী গঙ্গানারায়ণের হাত চেপে ধরে বললো, চলো, আমিও মন্দিরে যাচ্ছি, আমার সঙ্গে গিয়ে বিশ্বনাথ দর্শন করে আসবে। কাশীতে এসে আগে বিশ্বনাথকে প্রণাম করে তারপর অন্য কাজ শুরু করতে হয়।

গঙ্গানারায়ণ হাত ছাড়িয়ে নিল। দূর থেকে মন্দির দর্শন করাই তার পক্ষে যথেষ্ট। আর কোনোদিন সে পাথরের মূর্তিকে প্রণাম করবে না।

দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে সেই বাড়িটির সন্ধান পাওয়া গেল। সে বাড়ির চত্বরে কয়েকজন বলশালী হিন্দুস্থানী সারা গায়ে তেল মেখে কুস্তি লড়ছে। উরুতে চপাস চপাস করে চড় মেরে তারা পরস্পরের প্রতি হুংকার ছেড়ে বলছে, চলে আও, চলে আও পাঠ্যে! সে বড় মজার কুস্তি খেলা, একজন আর একজনের ওপর লাফিয়ে পড়ছে বটে, কিন্তু কেউ কারুকে ধরে রাখতে পারছে না, অত্যধিক তৈল মর্দনের জন্য তাদের শরীর দারুণ পিচ্ছিল, ধপাস ধপাস করে পড়ে যাচ্ছে মাটিতে এবং হাসছে।

তাদের খেলা দেখবার জন্য কিছু দর্শকও জমেছে। গঙ্গানারায়ণও দাঁড়িয়ে গেল। এই যুযুধানদের ভেদ করে বাড়ির সদরে যাওয়া যাবে না। বাড়িটি আগাগোড়া কঠিন পাথরের তৈরি, ত্রিতল, ভিতর দিকে কয়েকটি মহল আছে বলে মনে হয়। গঙ্গানারায়ণ যখন কলেজের ছাত্র, সেই সময় তার পিতা রামকমল সিংহ এখানে কিছু দিন ছিলেন কমলাসুন্দরীকে নিয়ে।

কুস্তি শেষ হবার পর ঐ পালোয়ানদেরই একজনকে গঙ্গানারায়ণ প্রশ্ন করলো যে, ঐ বাড়ির মধ্যে কে আছে? সে কলকাতা থেকে এসেছে, সে ঐ বাড়ির অন্দরমহলে একবার যেতে চায়।

পালোয়ানটি বিস্মিত হয়ে বললো যে, কুঠিটির অন্দরমহলে বাঙালীবাবুটি গিয়ে কী করবে? এই কুঠির মালিক তো রাজা চৈত সিং, তিনি কয়েকদিনের মধ্যে কাশী দর্শনে আসবেন বলে তাঁর কয়েকজন দেহরক্ষী অগ্রিম এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে, তা ছাড়া আর বাড়িতে কেউ নেই।

তবে কি ঠিকানা ভুল হলো? তাইবা কী করে হবে? গঙ্গানারায়ণ আর একবার বাড়িটির দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল যে, সদর দ্বারের পাশে দেওয়ালে একটি চৌকো শ্বেতপাথরে দেবনাগরী হরফে লেখা আছে, 'সিংহ মঞ্জিল'। গঙ্গানারায়ণ সেদিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললো, এ বাড়ি তো কলকাতার সিংহবাবুদের। এ বাড়ি আমাদের।

পালোয়ানরা এ বিষয়ে কিছু জানে না। তারা প্রত্যেক বছর একবার করে রাজা চৈত সিং-এর সঙ্গে কাশীধামে আসে আর এই বাড়িতেই ওঠে। চৈত সিং-এর কুঠির নাম যে সিংহ মঞ্জিল হবে, এই সাধারণ কথাটাও এই বাঙালীবাবুটি বোঝে না? তারা সরল লোক, তারা বললো, বাড়ির মালিকানা নিয়ে তো তাদের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই, আর এক সপ্তাহের মধ্যে রাজা সাহেব নিজে এসে যাবেন, তখন তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য যেন বাঙালীবাবুটি অপেক্ষা করেন।

গঙ্গানারায়ণের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সত্যিই তো, রাজা চৈত সিং-এর বাড়ির নামও তো সিংহ মঞ্জিল হতে পারে। তা হলে কী এ তল্লাটে আর কোনো সিংহ মঞ্জিল আছে? দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে সিংহ মঞ্জিল নামে বাড়ির কথাই তো সে জানে।

যে-কয়েকজন দর্শক উপস্থিত ছিল, তারা বললো যে না, এদিকে সিংহ মঞ্জিল নামে আর কোনো বাড়ির কথা তাদের জানা নেই। তবে বাঙালীবাবুটি এক কাজ করতে পারে। দশাশ্বমেধ ঘাটে মনসারাম নামে একজন ছড়িওয়ালা থাকে, যার পেশা সকলের কপালে চন্দনের ফোঁটা লাগানো, সেই মনসারাম ছড়িওয়ালা এ তল্লাটের সব কুঠির খবর রাখে। তার কাছে জিজ্ঞেস করলে সব জানা যাবে।

ঘাটে এসে মনসারামকে খুঁজে পেতে দেরি হলো না। দু' একজন উৎসাহী লোক গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে সঙ্গেই এলো। দর্মা দিয়ে তৈরি একটা বিরাট ছাতার নিচে বসে আছে মনসারাম। লম্বা, সিড়িঙ্গে চেহারা, দেখে মনে হয় বয়সের গাছ পাথর নেই।

মনসারাম সব বৃত্তান্ত শুনে বললো, হাঁ, কলকাত্তার বাবু রামকমল সিংজীর কথা তার খুব মনে আছে। বহুৎ রহিস আদমি ছিলেন, প্রতি রাতে এখানে বজরার ওপর বাঈজী নিয়ে খুব নাচা-গানা ফুর্তি করতেন। শুধু তাই নয়, বাবুর দিল ছিল খুব বড়, প্রতি মাসে একবার তিনি বারাণসীর সব পাণ্ডা আর ব্রাহ্মণদের পেট চুক্তি খাওয়াতেন। ওঃ সে কি জবর খাওয়া, মনসারাম ছড়িওয়ালার এখনো মনে আছে। হাঁ, ঐ যে কাছেই সিং মঞ্জিল, ঐটাই ছিল রামকমল সিং বাবুর কোঠি।

তাহলে ঐ বাড়ি এখন চৈত সিং-এর হলো কী করে? এ প্রশ্নের উত্তরে সে জানালো যে, পাঁচ ছ' বছর আগে ঐ কোঠি বিক্রি হয়ে গেছে, কলকাত্তা থেকে রামকমল সিং বাবুর দেওয়ান এসেছিল, তার কাছ থেকে রাজা চৈত সিং খুব মুফ্‌তে বাড়ি কিনে নিয়েছেন, মাত্র সাড়ে বারো শো রুপেয়াতে। অথচ রামকমল সিং-বাবুজী নিজে কিনেছিলেন পঁচিশ শো টাকা দিয়ে, সে সব জানে। এই তো নসীব, বড় মানুষ মারা গেলে তার সম্পত্তি ছারখার হয়ে যায়, মনসারাম এরকম কত দেখেছে।

উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় গঙ্গানারায়ণ ঘাটের এক প্রান্তে এসে জলের দিকে মুখ করে বসলো। এবার সে কোথায় বিন্দুবাসিনীর সন্ধান করবে? বারাণসী যে এত বৃহৎ জায়গা, সে আগে কল্পনাও করেনি। এর মধ্যে একটি অন্দরবাসিনী নারীকে সে খুঁজে পাবে কী ভাবে? নিজস্ব কোনো আশ্রয় নেই, তাহলে বিধুশেখর কোথায় পাঠালেন বিন্দুবাসিনীকে। বিধুশেখর নিজে আসেননি, কোনো কর্মচারী মারফৎ মেয়েকে বিদায় দিয়েছেন, সেই লোক কি বিড়াল পার করার মতন বিন্দুবাসিনীকে যে-কোনো জায়গায় অসহায়ভাবে ছেড়ে দিয়ে পালিয়েছে?

অথবা এমনও হতে পারে, বিধুশেখর বিন্দুবাসিনীকে আদৌ পাঠাননি কাশীতে। সে চতুর ব্রাহ্মণকে কিছু বিশ্বাস নেই। ভবিষ্যতেও যাতে কোনোদিন গঙ্গানারায়ণ তার সন্ধান না পায় সেইজন্য বিধুশেখর বিন্দুবাসিনীকে হয়তো অন্য কোথাও প্রেরণ করে রটিয়ে দিয়েছেন কাশীর কথা। কৃষ্ণনগরে বিধুশেখরের পৈতৃক বাড়ি আছে, সেখানে রেখে আসেননি তো! না, কৃষ্ণনগর বেশী দূর নয়, তাহলে জানাজানি হয়ে যেতই।

রাগে হতাশায় গঙ্গানারায়ণ অত্যন্ত অবসন্ন বোধ করলো। কিন্তু সে বুঝতে পারলো, তাকে ভেঙে পড়লে চলবে না। বিন্দুকে খুঁজে বার করতেই হবে। বিন্দুর জন্য সে সব কিছু ছেড়ে এসেছে। আর তার ফেরার পথ নেই। বিন্দুকে সে যদি খুঁজে নাও পায় তাহলেও সে চিরজীবনের মতন এই কাশীতেই থেকে যাবে।

এরপর বেশ কয়েকদিন সে কাশীর অলি গলিতে ঘুরে বেড়ালো সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা। ভোরে কিংবা অপরাহ্ণে স্নানের সময়ও সে ঘাটগুলি তন্ন তন্ন করে খোঁজে। কখনো দূর থেকে কোনো যুবতীকে দেখে বিন্দুবাসিনী বলে ভ্রম হয়। সে কাছে ছুটে যায়, সেই সব মুহূর্তে তাকে মনে হয় উন্মাদের মতন। কিন্তু বিন্দুবাসিনীর কোনো চিহ্ন নেই।

সারা বারাণসী ঘুরে গঙ্গানারায়ণের অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। যত বড় তীর্থ ক্ষেত্র, সেখানে ততবেশী পাপের আড্ডা। ইংরেজরা কাশীতে পুলিস চৌকি বসিয়েছে বটে, কিন্তু এখানে আইন শৃঙ্খলার প্রায় কোনো অস্তিত্ব নেই। একজন ইংরেজ

ম্যাজিস্ট্রেট আছে, আদালত-গারদ আছে। কিন্তু কেউ তা মান্য করে না। সাধু-পুণ্যার্থীদের মতনই প্রায় সমান সংখ্যক গুণ্ডা বদমাস গিসগিস করছে এখানে। গলিতে গলিতে অসংখ্য বাঈজী ও দেহ পসারিণী। একদিন সন্ধ্যার পর একটি গলিতে ঢুকে পড়ে সে হকচকিয়ে গিয়েছিল। প্রতি গৃহের দরজায় দরজায় রূপসী স্ত্রীলোকদের জেল্লা। তাকে দেখে খলখলিয়ে হেসে উঠেছিল তারা। দু' তিনজন এসে চেপে ধরেছিল তার হাত, অতি কষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে মান নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছে গঙ্গানারায়ণ।

আর একদিন গঙ্গানারায়ণের প্রায় চোখের সামনেই কয়েকজন দুর্বৃত্ত এক শেঠজীর মাথায় ডাণ্ডা মেরে তার সর্বস্ব অপহরণ করে নেয়। অল্প দূরত্বে গঙ্গানারায়ণ এক প্রাচীরের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিল, নইলে সেও বিপদে পড়তো। শেঠজীর সঙ্গের এক ভৃত্য ভয় পেয়ে তারস্বরে চিৎকার করে যাচ্ছিল, সে-ও বেশী দূর যেতে পারলো না, গুণ্ডারা তাড়া করে গিয়ে চুরমার করে দিল তার মাথা। আরও একদিন সে দেখেছিল, মধ্য গঙ্গার ওপরে একটি বজরায় হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠেছিল দাউ দাউ করে। তীরের লোকেরা বলাবলি করেছিল, দস্যুরাই নাকি বজরা লুণ্ঠন করে এমনভাবে আগুন লাগিয়ে দেয়। সন্ধ্যার পর বারাণসী অতি ভয়ংকর স্থান। গঙ্গানারায়ণ ধনী পরিবারের সন্তান, চিরকাল যত্নে লালিত, বাহির পৃথিবীতে একা একা ঘুরে তার নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হতে লাগলো। মাঝে মাঝেই সে ভাবে, কতখানি হৃদয়হীন মানুষ বিধুশেখর, কাশীর মতন এমন বিপদসঙ্কুল জায়গায় কন্যাকে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি সুস্থির থাকতে পারেন!

মনিকর্ণিকার ঘাটে গঙ্গানারায়ণ প্রতি অপরাহ্ণেই একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখে। এক বিশাল চেহারার সাধু ভেসে থাকেন গঙ্গার স্রোতে। এক ঘণ্টা, দু' ঘণ্টা, কখনো বা তিনি সারাদিনই থাকেন জলে এবং এমন নিস্পন্দভাবে ভেসে থাকেন যে মনে হয় যেন তিনি শয্যায় শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। এই সাধুকে পথ দিয়ে হাঁটতেও দেখেছে গঙ্গানারায়ণ, ইনি সব সময়েই সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে থাকেন এবং বপুটি যেন একটি পাহাড়ের মতন, থপথপ করে হাঁটার সময় একাই সমস্ত পথটা জুড়ে রাখেন।

এই সাধু সম্পর্কে কারুকে কিছু প্রশ্ন করলেই অমনি বহুরকম কাহিনী শোনা যায়। এই সাধুর আসল নাম কেউ জানে না, কেউ বলে ওঁর নাম আগে ছিল শিবরাম, কেউ বলে গণপতি সরস্বতী, কিন্তু তেলঙ্গ দেশ থেকে এসেছেন বলে সবাই তৈলঙ্গ স্বামী বলে ডাকে। এঁর বয়েস যে কত শো বছর তার কোনো হিসেব নেই, কাশীতেই নাকি উনি আছেন প্রায় দেড় শো বৎসর। ইনি ইচ্ছা মতন অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন। উলঙ্গ হয়ে ফেরেন বলে একবার এক ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট ওঁকে কারাদণ্ড দিয়েছিলেন, উনি সশরীরে বদ্ধ কারাগার থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে সেই ম্যাজিস্ট্রেটের পাশে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছিলেন। আর একবার এক সাহেব তাঁকে জোর করে ম্লেচ্ছ খাবার খাওয়াতে চেয়েছিলেন। সাধুজীর চন্দন ও বিষ্ঠায় সমজ্ঞান, তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে বলেছিলেন, "তুমকো খানা ম্যায় খা সকতা, লেকিন ইসকে পহলে মেরে খানা তুমকো খানা হোগা।" তারপর তিনি নিজ পশ্চাৎদেশে হাত দিয়ে খানিকটা পুরীষ এনে বলেছিলেন, সাহেব, এই আমার আজকের খানা। তিনি অম্লান বদনে খেয়েও নিয়েছিলেন সেটি। তারপর থেকে সাহেবরা হুকুম জারি করে দিয়েছে যে তৈলঙ্গস্বামী উলঙ্গ হয়েই যত্রতত্র ঘুরতে পারবেন, কেউ তাঁকে কোনপ্রকারে বাধা দিতে পারবে না।

আর একবার উজ্জয়িনীর রাজা মধ্য গঙ্গায় নৌকাবিলাস করছিলেন, তৈলঙ্গ স্বামী সেই নৌকায় উঠে রাজার কোমর থেকে একটি অতি মূল্যবান তরবারি হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ জলে ফেলে দিলেন। তরবারিটি নানাপ্রকার রত্নখচিত এবং মহারাজার মর্যাদাস্বরূপ ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে পাওয়া, তাই তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে এই উন্মাদ সাধুকে মারতে উঠলেন। তৈলঙ্গস্বামী নির্বিকার ভাবে গঙ্গার জলে হাত ডুবিয়ে তুলে আনলেন হুবহু একই রকম দুটি তরবারি, তারপর রাজাকে বললেন, এর মধ্যে কোনটি তোমার বেছে নাও। হতবুদ্ধি রাজা কিছুতেই বুঝতে পারলেন না ঐ দুটির মধ্যে কোনটি তাঁর। তখন সাধু রাজাকে ভর্ৎসনা করে বললেন, মূর্খ, নিজস্ব জিনিস ঠিক মতন চেনো না, অথচ এটা আমার, ওটা আমার বলে চেঁচিয়ে মরো।

তৈলঙ্গস্বামী ইদানীং মৌনী। গঙ্গানারায়ণ দেখে যে জল থেকে তিনি উঠে আসবার পর তাঁর এক মারাঠী ভক্ত তাঁর শরীর মুছিয়ে দেয়। আর দলে দলে নারী পুরুষ তখন ছুটে গিয়ে তৈলঙ্গস্বামীকে ঘিরে ধরে বিলাপ করতে করতে তাদের রোগ-ভোগ আপদ-বিপদের কথা জানিয়ে প্রতিকারের প্রার্থনা জানায়। সাধু যেন কিছুই শুনতে পান না। তিনি পাহাড়ের মতন বধির, অবিচল। একটু পরে তিনি ঘাট ছেড়ে চলে যান, সকলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম জানায় তাঁর উদ্দেশ্যে, কেউ কেউ চিৎকার করে বলে, চলন্ত শিব, চলন্ত শিব!

গঙ্গানারায়ণ দূরে বসে দেখে। বারাণসীতে পা দেবার পর থেকে সে কোনো দেবদেবীর মূর্তি কিংবা কোনো সাধু সন্ন্যাসীকে প্রণাম জানায়নি। ভোরবেলা গঙ্গাস্নান করার সময় সে এক অঞ্জলি জল নিয়ে পরম ব্রহ্মের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সে এখন ব্রাহ্ম, পৌত্তলিক হিন্দু ধর্মের সঙ্গে তার আর কোনো সংশ্রব নেই। তৈলঙ্গস্বামী ছাড়া আরও কত সাধু আছেন কাশীতে, তাঁদের ঘিরে ভক্ত দল, অনেক সাধু অনেক অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখান, নিরুদ্দিষ্ট লোকের সন্ধানও এঁরা বলে দিতে পারেন এমনও শোনা যায়, তবু গঙ্গানারায়ণের প্রবৃত্তি হয় না তাঁদের কাছে যাওয়ার।

একটি তরুণী বিধবার সঙ্গে বিন্দুবাসিনীর খুব সাদৃশ্য আছে, সেই যুবতীটি আর কয়েকজন বিধবার সঙ্গে স্নান করতে আসে মনিকর্ণিকার ঘাটে। এক এক সময় তাকে অবিকল বিন্দুবাসিনী বলেই মনে হয়, গঙ্গানারায়ণ 'বিন্দু' বলে ডেকে উঠতে যায়! আবার অন্য সময় মনে হয়, না, এ বিন্দুবাসিনী হতে পারে না। যুবতীটির সঙ্গিনীরা কেউ বাঙালী নয়, যুবতীটি তাদের সঙ্গে পরিষ্কার হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা বলে। অবশ্য এই কয় বৎসরে বিন্দুবাসিনী তো বারাণসীর ভাষা শিখে নিতেই পারে। মেয়েটি যেন বিন্দুবাসিনীর তুলনায় একটু বেশী লম্বা। যুবতীটির সঙ্গে গঙ্গানারায়ণের চোখাচোখিও হয়েছে, তাতে পরিচয়ের সামান্য চিহ্নও নেই। বিন্দু হঠাৎ গঙ্গানারায়ণকে দেখলে নিজে থেকেই ছুটে আসবে না?

পরপর কয়েকদিন দেখার পর গঙ্গানারায়ণ সেই যুবতীটির সঙ্গে বিন্দুর আরও দু' একটি বৈষম্য খুঁজে পেল। না, এই মেয়েটি বিন্দু নয়। তবু গঙ্গানারায়ণ ঠিক সময়ে এসে মনিকর্ণিকার ঘাটে বসে আছে। একদিন সে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলো। বিন্দু নয় জেনেও সে প্রতিদিন এই যুবতীকে দেখতে আসে কেন? বিন্দুবাসিনীর সন্ধান স্থগিত রেখে সে এখানে এসে ঐ যুবতীটির জন্য প্রতীক্ষা

করে। গঙ্গানারায়ণ মণিকর্ণিকা ঘাটে আসাই বন্ধ করে দিল।

মাসাধিক কাল কেটে গেছে, বিন্দুর অস্তিত্বের কোনো চিহ্নই সে পায়নি। একদিন গঙ্গানারায়ণ দশাশ্বমেধ ঘাটের পৈঠায় বসে সূর্যাস্ত দেখছে, এমন সময় ছড়িওয়ালা মনসারাম তার পাশে এসে দাঁড়ালো। অনেক বাঙালীর সঙ্গে সংসর্গের দরুণ মনসারাম কিছু কিছু বাংলা জানে। সে জিজ্ঞেস করলো, আপনি বাবু রামকমল সিং-এর কোঠির খোঁজ করছিলেন, আপনি তার কে হন?

গঙ্গানারায়ণ বললো, পরলোকগত রামকমল সিংহ আমার পিতা।

মনসারাম বললো, আপনি কাশীতে একা একা কী করছেন?

গঙ্গানারায়ণ বললো, আমি একটি রমণীকে খুঁজছি, আমার আত্মীয়া বলতে পারেন। আপনি তো অনেক কিছুর সন্ধান রাখেন, আপনি বলতে পারেন কি, একটি বিধবা মেয়ে, বাঙালী, তার নাম বিন্দুবাসিনী—

মনসারাম গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, হাঁ, তার কথা আমি জানি, বাবু রামকমলের দোস্ত বিধুবাবুর লেড়কি, সে এখানে থাকতো ঠিকই, কিন্তু আপনি তাকে খুঁজে পাবেন না, সে মারা গেছে, আপনি ফিরে যান। লালা হরদয়ালের কাছে ঐ লেড়কির নামে টাকা আসতো বিধুবাবুর কাছ থেকে। গত বৎসর লালা হরদয়াল সে টাকা ঘুরিয়ে দিয়েছেন।

গঙ্গানারায়ণ তীব্র চোখে মনসারামের দিকে তাকিয়ে বললো, সে মারা গেছে? হতেই পারে না! কবে মারা গেছে, কী করে মারা গেছে?

মনসারাম সস্নেহে গঙ্গানারায়ণের বাহু ছুঁয়ে বললো, সে সব কথা আর জেনে লাভ কী, তাতে আপনার কষ্ট বাড়বে, তাকে তো আর আপনি ফিরে পাবেন না। আপনার মতন জোয়ান ছোকরার পক্ষে কাশী জায়গা ভালো না। আপনি আপনার মুলুকে ফিরে যান। আমি বলছি, তাতেই আপনার ভালো হবে। এই বয়সে কি কেউ একা একা দুঃখী দুঃখী মুখ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়!

গঙ্গানারায়ণের দৃঢ়বিশ্বাস হলো, ছড়িওয়ালা বিন্দুর মৃত্যুর ব্যাপারটি সত্য বলেনি। মনসারাম অনেক কিছু জানে, তার কাছে গোপন করে যাচ্ছে। মনসারামকে আর সে ছাড়বে না।

অনেকদিন পর বিধুশেখর একটু সামলে উঠেছেন। ইতিমধ্যে কঠিন পীড়ায় তাঁর প্রাণাশঙ্কা হয়েছিল, কয়েকদিনের জন্য তাঁর কথা বলার শক্তিও চলে গিয়েছিল, তিনি শুধু তীব্র চোখ মেলে চেয়ে থাকতেন। বহুমূত্র বড় দুষ্ট ব্যাধি, কখন কাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে, তার কোনো ঠিক নেই। অসীম মানসিক বলেই আবার উঠে বসেছেন বিধুশেখর। কণ্ঠস্বরও ফিরে পেয়েছেন, কিন্তু সব ক'টি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ফিরে পাননি, তাঁর বাঁ পা ও বাঁ হাত প্রায় অসাড় হয়ে গেছে, বাঁ চোখের দৃষ্টিশক্তি একেবারেই নেই, তাঁর নিশ্বাসও এখন নাসিকার ডান ফুটো দিয়েই নিতে হয়। যে-কোনো কারণেই হোক, শরীরের বাম দিকটিই তাঁর অধিকতর প্রিয় ছিল।

প্রথম কিছুদিন অপরের স্কন্ধে ভর দিয়ে চলাফেরা করতে হতো। ক্রমে ক্রমে তিনি আবার নিজেই নিজের ভার বইতে সক্ষম হলেন। ডান হাতে একটি মোটা

লাঠি থাকে, বাঁ পা-টি সামান্য হেঁচড়ে হাঁটতে হয়, কিছু দূরে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ে বিশ্রাম নেন। এই ক্ষুদ্র অসুবিধেগুলি অগ্রাহ্য করা অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর অভ্যেস হয়ে গেল, এখনো তিনি তাঁর নিজস্ব পরিমণ্ডলে পূর্ণ আধিপত্য বজায় রাখতে চান।

ইতিমধ্যে স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে বিধুশেখরের। আদালতে যাওয়াও তিনি বন্ধ করেছেন। এখন গৃহই তাঁর বিশ্ব। একটি গৃহ নয়, দুটি।

তাঁর নিজগৃহে বর্তমানে কিছু অশান্তি চলছে। জ্যেষ্ঠা কন্যা নারায়ণীই এখন সংসারের কর্ত্রী। বিধবা হয়ে নারায়ণী তিনটি সন্তান সমেত চলে এসেছিল পিত্রালয়ে, তিনটিই মেয়ে। তাদের মধ্যে দুটির বিবাহ হয়ে গেছে, একটির এখনো বাকি। বিধুশেখরের কনিষ্ঠা কন্যা সুহাসিনীর মৃতপিতৃক পুত্রসন্তানটির বয়েস এখন পাঁচ বৎসর। এই নাতিটি বিধুশেখরের প্রাণাধিক প্রিয়, এর নামও তিনি রেখেছেন প্রাণগোপাল। অসুস্থ অবস্থায় এই প্রাণগোপালকে দেখেই তিনি শান্তি পেয়েছেন, এর জন্যই তিনি চেয়েছেন বেঁচে থাকতে। যেন তাঁদের গৃহদেবতাই মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েছেন এই বংশে, ওকে 'গোপাল' 'গোপাল' বলে ডাকলেই বিধুশেখরের হৃদয় জুড়িয়ে যায়, মৃত্যুকালেও তিনি এই নাম উচ্চারণ করতে করতেই শেষ নিশ্বাস ফেলবেন।

প্রাণগোপালকে তার পিতৃকুল নিজেদের কাছে নিয়ে যেতে চায়। অসুস্থ অবস্থাতেই এ সংবাদ শুনে বিধুশেখর ক্রোধে জ্বলে উঠেছিলেন। পূজারী ব্রাহ্মণদের এত দূর স্পর্ধা! অকৃতজ্ঞতা আর কাকে বলে! ঘরজামাই করবেন বলেই তিনি গরিব বংশ থেকে একটি সচ্চরিত্র মেধাবী যুবককে বেছে নিয়ে সুহাসিনীর সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। সে সময় তিনি পার্বতীচরণের সংসারে অর্থসাহায্যও করে-ছিলেন প্রচুর। আজ সেই পার্বতীচরণের বাপের এত সাহস যে প্রাণগোপালকে বিধুশেখরের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায়! পার্বতীচরণের ভাগ্যে নেই, তাই সে বেঁচে থেকে এ সংসারের সুখ ভোগ করে যেতে পারলো না। কিন্তু সে ছিল এই পরিবারের প্রতিশ্রুত ঘরজামাই, সুতরাং তার পুত্রসন্তানের ওপর তো বিধুশেখরেরই সম্পূর্ণ অধিকার।

এদিকে পার্বতীচরণের বাপ শিবলোচন বারবার এসে বলাবলি করছেন, নাতি তো তাঁরও, নাতিকে না দেখে তাঁরও প্রাণ পোড়ে। শিবলোচনের গৃহিণী এখনও পুত্রশোক ভুলতে পারেননি, এখনও প্রতিদিন কান্নাকাটি করেন, পার্বতীচরণের ছেলেকে বুকে টেনে নিয়ে তিনি তবু কিছুটা সান্ত্বনা পাবেন।

বিধুশেখর খুব ভালোভাবেই জানেন যে, এই প্রাণ পোড়া কিংবা কান্নাকাটির কথা সব মিথ্যে, এসবই স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভণ্ডামি। ঐ শিবলোচনটা একদিনের তরেও ছেলে-ছেলের বউকে ঘরে নেয়নি, পার্বতীচরণ মারা যাবার পর সুহাসিনীকে সান্ত্বনা জানাবার জন্য একবারও আসেনি, হঠাৎ এতদিন পর শুধু নাতির জন্য দরদ উথলে উঠেছে! কুলীনের ঘরে পুত্রসন্তানের দাম অনেক। প্রাণগোপাল আর একটু বড় হলেই শিবলোচন ওর পাঁচটা দশটা বিয়ে দিয়ে অর্থ উপার্জন করবে। নাতি যাতে পর না হয়ে যায়, তাই নিজের কাছে রাখতে চায়।

এমন কি বিধুশেখরের রাখা প্রাণগোপাল নামও শিবলোচনদের পছন্দ হয়নি। ওরা নাম রেখেছে কালিকাপ্রসাদ। শিবলোচন যখন এ বাড়িতে এসে ডাকেন, কই, দাদুভাই, কালিকাপ্রসাদ—তখন বিধুশেখরের আপাদমস্তক জ্বলে যায়। এ যেন ইচ্ছে করেই তাঁর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য তাঁর দেওয়া নামে ওরা কক্ষনো ডাকে না।

এক মাস আগে শিবলোচন এসে বলেছিলেন, অন্তত কিছুদিনের জন্য প্রাণগোপালকে তিনি নিজের কাছে রাখতে চান। বিধুশেখর তখন সদ্য রোগমুক্ত হয়ে সবেমাত্র শয্যায় উঠে বসতে পারছেন, বাইরে আসতে পারেন না। তিনি শিবলোচনের সঙ্গে দেখাও করলেন না, সোজা বলে পাঠালেন যে বিধুশেখর মুখুজ্যের নাতি একদিনের জন্যও এ বাড়ি ছেড়ে যাবে না। শিবলোচনের যতবার ইচ্ছে হয়, এ বাড়িতে এসে নাতির মুখ দেখে যেতে পারে।

শিবলোচন অপমানিত হয়ে শাসিয়ে গেছেন যে আদালতে গিয়ে তিনি মকদ্দমা রুজু করবেন। নাতির ওপরে ন্যায্য অধিকার তাঁর। বিধুশেখর ওষ্ঠ উল্টে হেসেছেন। যজমানী বামুন তাঁকে মকদ্দমার ভয় দেখায়! করুক একবার মকদ্দমা, শিবলোচনের ভিটেমাটি চাটি করে দেবেন তিনি!

অনেকদিন পর বারবাড়িতে এসে বৈঠকখানায় বসে বিধুশেখর গড়গড়ায় মৃদুমন্দ টান দিতে দিতে ইংরেজী কাগজ পড়ছিলেন। এমন সময় এক ভৃত্য এসে খবর দিল যে মুনশী আমীর আলী তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে এসেছেন। বিধুশেখর একটু বিস্মিত হলেন। মুনশী আমীর আলী দেওয়ানী আদালতে তাঁর সমসাময়িক প্রসিদ্ধ উকিল, হঠাৎ তিনি কোন্ প্রয়োজনে আসবেন তাঁর কাছে? মুনশী সাহেব খানদানী বংশের গণ্যমান্য লোক, তিনি তো বিনা কারণে আসবেন না।

বিধুশেখর খাতির করে মুনশী সাহেবকে ডেকে আনলেন। দীর্ঘকায় সুদর্শন মুনশী সাহেবের চুলে সদ্য রুপালী রঙের পাক ধরেছে, অঙ্গে জরিবসানো কালো রঙের কুর্তা, মাথায় ফেজ টুপি, দরজা থেকেই আদাব জানাতে জানাতে ঢুকলেন তিনি। বিধুশেখর সসম্মানে তাঁকে বসালেন কৌচে, ভৃত্যকে হুকুম দিলেন পৃথক আলবোলা এনে দেবার জন্য।

বিধুশেখর যৌবনে ফার্সী শিক্ষা করেছিলেন, তাই অনেক সময় তিনি মুনশী আমীর আলীর সঙ্গে ফার্সীতে বাক্যালাপ করতেন। মুনশী সাহেব অবশ্য বাংলাও খুব ভালো জানেন।

কৌচে বসে মুনশী সাহেব হাফেজের একটি পঙ্‌ক্তি বললেন, যার অর্থ হলো, প্রিয়তম কঠিন অসুখে পড়েছেন, তিনি কখন চলে যাবেন এই আশঙ্কায় আমার চিত্ত বেতবৃক্ষের মতন কম্পিত হচ্ছে।

বিধুশেখরও পাল্টা এক বয়েৎ বললেন, যার অর্থ হলো, এই পৃথিবীতে আকর্ষণীয় বস্তু তো তেমন কিছুই নেই, শুধু বন্ধুদের ভালোবাসা। একমাত্র তার টানেই মানুষ বেশীদিন বেঁচে থাকতে চায়!

মুনশী সাহেব এর পর বিধুশেখরের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিলেন এবং তাঁর অভাবে দেওয়ানী আদালত যে এখন সিংহহীন অরণ্যের মতন নিস্তেজ হয়ে আছে, সে কথাও জানালেন।

বিধুশেখর বললেন, কোকিলের সুস্বরে যখন বাতাস আমোদিত হয় তখন গত বসন্তের জন্য আর কারু খেদ থাকে না। আমীর আলীর মতন পিকরাজ যখন রয়েছেন, তখন আর দেওয়ানী আদালতের অভাব কিসের!

এসবই কথার খেলা। বিধুশেখর জানেন যে মুনশী সাহেব শুধু নিছক ছড়া কাটার জন্য এখানে আসেননি।

সেই আসল বিষয়টা এলো একটু পরে। মুনশী সাহেব বললেন, খোদাতাল্লার এবং আপনার মতন দোস্তদের শুভেচ্ছায় আমি জানবাজারে একটি অতি সামান্য কুটির এবং এক টুকরো বাগান খরিদ করেছি, বড় সাধ ছিল আমার এই গরিব-খানায় আপনার মতন একজন বিশিষ্ট অতিথিকে একদিন নিয়ে যাবো, কিন্তু

আপনার শরীরগতিকের যা অবস্থা দেখছি...।

বিধুশেখর বললেন, আমার আর যাওয়া হয়েচে! এবার পরপারের ডাক আসার সময় হয়ে এলো!

বিধুশেখর কথার ফাঁকে ফাঁকে মুনশীর মুখখানি প্রখরভাবে লক্ষ করতে লাগলেন। মুনশী আমীর আলী প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক, বোঝাই যাচ্ছে তিনি আর একটি বড় বাগানবাড়ি ক্রয় করেছেন, কিন্তু সেখানে বিধুশেখরকে নিয়ে যাওয়া তো তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য হতে পারে না। আরও কিছু গূঢ় ব্যাপার আছে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সম্পত্তিটা খরিদ করলেন কার কাছ থেকে?

মুনশী সাহেব জানালেন যে, বাগান ও বাড়িটি তিনি কিনেছেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদের কাছ থেকে।

বিধুশেখর জানেন যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদের অবস্থা খুবই পড়তির দিকে। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর বিশাল ঋণের বোঝা চেপেছিল তাঁর পুত্রদের ঘাড়ে। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্র জমি, বাড়ি, তালুক বিক্রয় করে করে সেই ঋণের অংশ শুধছেন।

মুনশী বললেন যে, জানবাজারের এই বাড়ির সংলগ্ন বাগানটি ক্ষুদ্র হলেও অপরূপ, বহুরকম ফলফুলের গাছ রয়েছে। কিন্তু এক জেনানার জন্য তা ঠিক-মতন ভোগ করার উপায় নেই। ঠাকুরদের সম্পত্তিটি অনেকদিন অযত্নে অবহেলায় পড়েছিল, ঐ জেনানা থাকে পাশের কুঠিতে, সে আর তার লোকজনই এতদিন সব লুটেপুটে খাচ্ছিল। এখনো তারা এই বাগানে এসে উৎপাত করে, তাদের গরু চলে আসে এই বাগানে, সে জেনানার নিজস্ব লোকজনও অতি বদ, তারা রাতবিরেতে এই বাগানে এসে হল্লা করে।

বিধুশেখর উকিলী ভাষায় তৎক্ষণাৎ মুনশী সাহেবের বক্তব্যটি অনুবাদ করে নিলেন। এর প্রাঞ্জল অর্থ হলো, মুনশী আমীর আলী তাঁর জানবাজারের সম্পত্তির পাশের বাড়ির জেনানার বাগানটিও গ্রাস করতে চান। কিন্তু এজন্য তাঁর কাছে আসা কেন?

মুনশী সাহেব বললেন, সে জেনানা এক কসবী!

বিধুশেখর শুকনোভাবে বললেন, অ!

মুনশী সাহেব বললেন, ঐ কসবীর নামে আমি মামলা দায়ের করতে যাচ্ছি, তাই সে বিষয়ে আপনার কাছে কিঞ্চিৎ পরামর্শ চাই।

বিধুশেখর আমোদহীন হাস্য করে বললেন, পরামর্শ, আমার কাছে? আপনি নিজে বিচক্ষণ ধুরন্ধর উকিল, আপনাকে পরামর্শ দেবো আমি?

মুনশী সাহেব বললেন, তোবা, তোবা, আপনার তুলনায় আমি? আপনার বুদ্ধির সামান্য এক কণা খরচ করলেই বড় বড় মামলার ফয়সালা হয়ে যায়। তা ছাড়া আর একটু কথা আছে। সে জেনানার হাল হকিকত আমি তল্লাশ করে দেখেছি। ঐ কসবীটা ঐ কুঠি আর বাগান জবরদখল করে আছে। ঐ সম্পত্তি মরহুম রামকমল সিংহের, বর্তমানে যাঁর এস্টেটের অন্যতম অছি আপনি!

বিধুশেখরের তৎক্ষণাৎ চকিতে সব মনে পড়লো। জানবাজারের সেই মাগীটা, সেই কমলি, যার বাড়িতে শেষ নিশ্বাস ফেলেছিল রামকমল সিংহ। হ্যাঁ, ঠিক, সে বাড়িতে ঐ মাগী জোর করে চেপে বসে আছে। বিধুশেখর তাকে উচ্ছেদের চেষ্টাও করেছিলেন এক সময়।

এবার উৎসাহিত হয়ে তিনি মুনশী সাহেবের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। অসুস্থ হয়ে শয্যায় পড়ে থাকা অবস্থায় বিধুশেখর অনেক দিন ও-বাড়ির কোনো

খোঁজ পাননি। জানবাজারের সম্পত্তিটি উদ্ধারের এই তো সুবর্ণসুযোগ। বাগান সমেত বাড়িটি মুনশী সাহেবকে বিক্রি করে দিলে তারপর মুনশী সাহেব ঠিকই উচ্ছেদ করতে পারবেন ঐ মাগীকে।

কিছুক্ষণ এই বিষয়ে শলা-পরামর্শ হলো। তারপর বিধুশেখর মুনশী সাহেবকে বললেন যে, রামকমল সিংহের বিধবা পত্নীর সঙ্গে আলোচনা করে তিনি তাঁকে পাকা সংবাদ জানাবেন।

মুনশী আমীর আলী চলে যাবার পর বিধুশেখর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তিনি আদালত ছাড়তে চাইলেও মামলা-মোকদ্দমা তাঁকে ছাড়তে চাইছে না।

সেদিন অপরাহ্ণে বিধুশেখর বাড়ি থেকে বার হলেন। এতদিন পর্যন্ত তিনি নিজগৃহ থেকে সিংহসদনে পদব্রজেই যাওয়া-আসা করতেন, সামান্যই তো পথ। কিন্তু পায়ে সেরকম আর জোর নেই, তিনি আজ জুড়িগাড়ি নিয়েই বেরুলেন, ইচ্ছে এই যে, ও-বাড়িতে একবার দেখা দিয়ে তিনি গড়ের মাঠ থেকে একটু হাওয়া খেয়ে আসবেন।

বিধুশেখরকে দেখে সিংহবাড়ির দ্বারবান-ভৃত্যরা ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বেশ কয়েক মাস পরে বিধুশেখরের এখানে আগমন, তিনি তো এখানকার দ্বিতীয় প্রভু। ইতিমধ্যে চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে তাঁর, শীর্ণ হয়েছেন, মুখে সেই তেজের আভা নেই, একটি চক্ষু ঘষা কাচের মতন। দিবাকর খবর পেয়ে ছুটে এসে সন্ত্রস্ত হয়ে বলতে লাগলো, আসুন বড়বাবু, আসুন, আপনাকে না পেয়ে আমরা এতকাল একেবারে অনাথ হয়ে রইচি! আহা, কত জমজমাট ছেল এই বাড়ি, এখুন একেবারে সব ফাঁকা।

কিছুক্ষণ একতলায় দাঁড়িয়ে বিধুশেখর কর্মচারীদের কাছ থেকে নানা বিষয়ে খবরাখবর নিতে লাগলেন। গঙ্গানারায়ণ অনেক কাল নিরুদ্দিষ্ট তিনি জানেন। তিনি নিজেও শয্যাশায়ী থাকায় এ-বাড়ির বিষয়সম্পত্তিতে যে নানাবিধ অনাচার হয়েছে, তাতে আর সন্দেহ কী! নবীনকুমার বালক আর বিম্ববতী স্ত্রীলোক, বিষয় পরিচালনার কোনো জ্ঞানই তাদের কিছুমাত্র নেই। আবার শক্ত হাতে বিধুশেখরকেই হাল ধরতে হবে। তিনি যতদিন জীবিত আছেন, রামকমল সিংহের সম্পত্তির কোনো অনিষ্ট হতে দেবেন না। তিনি হাতের লাঠিগাছা উঁচু করে দিবাকরের উদ্দেশে দাবড়ানি দিয়ে বললেন, সব হিসেবপত্তর কাল সকালে আমায় দেখাবি!

বিম্ববতীর কক্ষে খবর পাঠানো হয়েছে। এবার বিধুশেখর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে বিধুশেখরের কষ্ট হয়, তবু বিধুশেখর লাঠি ভর দিয়ে উঠতে লাগলেন পা হেঁচড়ে হেঁচড়ে। কয়েক ধাপ উঠেই দাঁড়িয়ে পড়ে দম নেন।

বিধুশেখর সিঁড়ির মধ্যপথ পর্যন্ত উঠেছেন, এমন সময় ওপর থেকে দুপদাপ করে নেমে এলো নবীনকুমার। তার যেন কিসের দারুণ ব্যস্ততা, সে বিধুশেখরকে দেখেও দেখলো না, পাশ কাটিয়ে নেমে গেল হুড়মুড়িয়ে।

অসীম বিস্ময়ে নবীনকুমারের দিকে তাকিয়ে থেকে বিধুশেখর ডাকলেন, ছোটকু!

নবীনকুমার ততক্ষণে নীচে পৌঁছে গেছে। সেখান থেকে বললো, কে, ও জ্যাঠাবাবু?

—ছোটকু, এদিকে শোন!

—জ্যাঠাবাবু, আপনি ওপরে বসুন। আমি একটু পরেই আসচি।

তারপরই সে দৌড়ে চলে গেল।

বিধুশেখর স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই কয়েক মাসেই ছোটকু এতখানি বড় হয়ে গেছে! এতদিন পরেও তাঁকে দেখে ছোটকু প্রণাম করলো না। কোনো কথা জিজ্ঞেস করলো না! তাঁর অসুখের সময় বিম্ববতী দু-তিনবার গিয়েছিলেন তাঁদের বাড়িতে। দূর থেকে একগলা ঘোমটা দিয়ে তাঁকে দেখেছেন। কোনো কথা বলেননি। অপরের সমক্ষে বিম্ববতী বিধুশেখরের সঙ্গে বাক্যালাপ করেন না। কিন্তু নবীনকুমার একদিনও দেখতে যায়নি তাঁকে।

বিধুশেখর তাঁর হৃদয়ে একটা সূক্ষ্ম কাঁটার ব্যথা বোধ করলেন। ছোটকু তাঁর এত আদরের, সেই ছোটকু তাঁর কাছে আসে না। তাঁর মৃত্যু হলে ছোটকুরই তো মুখাগ্নি করার কথা!

দম নিতে নিতে বিধুশেখর উঠে এলেন ওপরে। বাঁ পা, বাঁ হাতের শক্তি কি আর ফিরে আসবে না? আর কি কখনো তিনি দু পায়ে জুতো মশমশিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করবেন না সহজভাবে? সব হবে। কবিরাজ মশায় বলেছে, আবার তিনি পুরোপুরি সুস্থ জীবন ফিরে পাবেন।

সিঁড়ির সামনেই মজলিস-কক্ষ, সেটির দরজা খোলা। বিধুশেখর দেখলেন, সেখানে পাতা হয়েছে নতুন গালিচা, ঝোলানো হয়েছে অনেকগুলি নতুন ঝাড়-লণ্ঠন। বিধুশেখরের ভ্রূ কুঞ্চিত হলো। এ কক্ষ অনেকদিন খোলা হয়নি। এখানে কে এখন আসর বসায়।

ধীরে পায়ে হেঁটে তিনি গেলেন ভিতরমহলের দিকে।

বিম্ববতীর ঘরের সামনের টানা বারান্দায় আগে এলেই শোনা যেত নানারকম পাখির কলকাকলি। আজ এ গৃহ যেন বড় বেশী নিস্তব্ধ। খাঁচাগুলি সার বেঁধে এখনো ঝুলছে, কিন্তু অধিকাংশই শূন্য। পাখিগুলি হয় উড়ে গেছে কিংবা পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়েছে। পাখি পোষার শখ আর বুঝি নেই বিম্ববতীর। একটি কথা-বলা ময়নাকে এখনো একটি খাঁচার মধ্যে দেখতে পেলেন বিধুশেখর, আগে সে মানুষজন দেখলেই বলে উঠতো, ময়না, বলো, জয় রাধে। জয় কৃষ্ণ! সে পাখিটি তার লাল চক্ষু মেলে বিধুশেখরকে একবার দেখে আবার চক্ষু মুদলো। বৃদ্ধ হয়ে এ পক্ষীও বুঝি ভুলে গেছে কথা বলতে।

নির্দিষ্ট ঘরটির দরজার সামনে এসে বিধুশেখর ডাকলেন, বিম্ব!

একটি নতুন দাসী বেরিয়ে এসে বললো, কত্তামা আপনার জন্যে ভেতরে বসে আচেন।

বিধুশেখরের সঙ্গে সঙ্গে দাসীটিও প্রবেশ করলো ঘরে। আগেকার দাসী-বাঁদীরা সব জানতো, বিধুশেখর এখানে এলে কেউ আর কাছাকাছি থাকতো না।

দক্ষিণ দেয়ালে রামকমল সিংহের বৃহৎ তৈলচিত্রের নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিম্ববতী। অবগুণ্ঠন কপাল পর্যন্ত তোলা, পরনে ধপধপে শুভ্র বসন। কতই বা বয়েস বিম্ববতীর। বড় জোর চল্লিশ-বেয়াল্লিশ, কিন্তু যৌবন যেন এখনো মধ্য-গগনে, সেই দেবী ভগবতীর মতন রূপ এখনো ম্লান হয়নি।

পা টেনে টেনে ভেতরে গিয়ে বিধুশেখর পালঙ্কের বাজু ধরে দাঁড়ালেন, তারপর দাসীটিকে উদ্দেশ করে বললেন, পান নিয়ে আয়। পান রেখে চলে যাবি,

তোকে এখেনে থাকতে হবে না।

বিম্ববতী এগিয়ে এসে নীচু হয়ে বিধুশেখরের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। বিধুশেখর তাঁর দু কাঁধ ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছো, বিম্ব?

উত্তর না দিয়ে বিম্ববতী নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন।

বিধুশেখর বললেন, এক সময় মনে হয়েছেল, আর বুঝি কোনোদিন এখেনে আসতে পারবো না। আর বুঝি তোমাতে আমাতে এমন দেকা হবে না।

বিম্ববতীর ক্রন্দন এবার শব্দময় হলো।

—আর কেঁদো না, বিম্ব! এই তো আমি এসিচি।

পালঙ্কের ওপর বসে বিধুশেখর বিম্ববতীর চিবুকটি দু আঙুলে তুলে প্রশ্ন করলেন, বলো, কী তোমার দুঃখ?

বিম্ববতী হাতের তালুতে অশ্রু মার্জনা করে বললেন, আমি ভগবানের কাছে দিনরাত প্রার্থনা করিচি...আপনি সুস্থ না হলে আমিও মত্তুম।

বিধুশেখর নরমভাবে বললেন, সব আবার ঠিক হয়ে যাবে। আমি আরও দীর্ঘকাল বাঁচবো, তুমি দেকে নিও।

—আমার সব এমন ছারেখারে গেল।

—কেন, কিসের অভাব তোমার?

—এ-বাড়ি পূর্ণ ছিল, শূন্য হয়ে গেল...সব সময় মানুষজনে গমগম করতো, এখন যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।

দাসী পান নিয়ে এসেচে, বিম্ববতী একটু সরে গিয়ে একটি মোড়া টেনে নিয়ে বিধুশেখরের পায়ের কাছে বসলেন।

পান মুখে দিয়ে বিধুশেখর জিজ্ঞেস করলেন, ছোটকু অমন দৌড়ে দৌড়ে কোথায় গেল? আমায় দেকেও কাচে এলো না!

বিম্ববতী বললেন, কী জানি! বন্ধুরা এসেচে বুঝি! ওর কালেজের বন্ধুরা আসে, ও তাদের বাড়ি যায়। বউমা মারা যাবার পর ছোটকু যেন কেমন হয়ে গেসলো, কারুর সংগে কতা বলে না, কাঁদে না পর্যন্ত, শুধু গুম হয়ে থাকে, আমি কাঁদি, আমি ওকে আদর করে কাচে টানতে চাই, ও আসে না কো, কদিন ধরে আবার দেকচি ও বারমুখো হয়েচে, আমি কিছু বলি না আর।

বিধুশেখর বললেন, ওর আবার একটা বিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে!

বিম্ববতী বললেন, আর গংগা, তার কোনো খবরও কেউ নিলে না...

বিধুশেখর জানতেন এই প্রসংগটা উঠবেই। এ প্রসংগ তাঁর মনঃপূত নয়। গংগানারায়ণকে তিনি মন থেকে মুছে ফেলেছেন।

ঈষৎ ঝাঁঝের সংগে তিনি বললেন, সে জোয়ানমদ্দ মানুষ, সে যদি নিজে থেকে কোতাও চলে যায়, কে তার সন্ধান পাবে বলো? দিবাকর তো চতুদ্দিকে লোক পাঠিয়েছেল। অনেক চেষ্টা হয়েচে।

বিম্ববতী বললো, আপনি সুস্থ হয়েচেন, আপনি এবার সব ব্যবস্থা করতে পারেন। একটা কতা বলবো?

—বলো!

—গংগা কাশীতে যায়নি তো? আমার যেন মন বলচে।

—কাশী? কেন, সেখেনে যাবে কেন হঠাৎ?

—আপনি তখন আমায় সব খুলে বলেননি, কিন্তু আমি সব জেনেচি। কাশীতে আমার বিন্দুমা রয়েচে, গঙ্গা যদি তার জন্য কাশী যায়?

—যায় সে যেতে পারে। তার আবার মতিভ্রম হলে যা খুশি কত্তে পারে। কিন্তু ঈশ্বর আমায় কলঙ্ক থেকে রক্ষা করেছেন। কাশীতে বিন্দুবাসিনী নেই।

—নেই? কাশীতে নেই?

—কাল বড় করাল, বিম্ব। কে তার গতি রুক্‌তে পারে?

—তার মানে?

—কাশীতে ছেল, কিন্তু বিন্দু আর বেঁচে নেই!

—বেঁচে নেই? বিন্দু? ও মা!

—কাশীতে এক শেঠের কাচে প্রতি ছ' মাস অন্তর আমি বিন্দুর নাম করে টাকা পাঠাতুম। গত বছর সেই শেঠ জানিয়েচে যে বিন্দু মারা গ্যাচে।

—বিন্দু মারা গ্যাচে? আমরা অ্যাতদিন কেউ জানলাম না, শুনলাম না। কেউ তাকে দেকতে গেল না, তাকে দাহ করলো কে? বিন্দু, হতভাগিনী বিন্দু...

—কে যাবে বলো? আমি কি কখনো দূর দেশে গেচি? আমার বাড়িতে আর পুরুষ কোতায়? অন্য কোনো লোকজনকে বিশ্বাস নেই। কাশীর সেই শেঠ আমার মক্কেল ছেল, মানী লোক, সেই সব ব্যবস্থা করেচে।

বিম্ববতী চোখে আঁচল দিয়ে হু হু করে কাঁদতে লাগলেন। বিধুশেখরের চক্ষু শুষ্ক, তিনি কিছুক্ষণ সময় দিলেন বিম্ববতীর শোক ও অশ্রু মোচনের জন্য।

তারপর বিধুশেখর তাঁর এক চোখের দৃষ্টি বিম্ববতীর দুই চোখের ওপর পর্যায়ক্রমে ফেলে উদাত্ত স্বরে বললেন, নিয়তি! বৈধব্যই ছিল বিন্দুর নিয়তি, অল্প আয়ুই ছিল তার ভবিতব্য, স্বয়ং বিধাতাপুরুষ তার ললাটে লিকে দিয়েচেন, তুমি আমি খণ্ডাবার কে? গুরুবল এই যে, তোমার সুপুত্তুর তার ধর্ম নষ্ট কত্তে পারেনি।

বিম্ববতীর চক্ষু দিয়ে আবার জল গড়িয়ে পড়লো।

বিধুশেখর জিজ্ঞেস করলেন, মজলিস-ঘরটি দেকলুম আবার গোচগাচ করা হয়েচে। রামকমলের এই ছবিখানাও তো সেখেনে ছিল, এটা এ ঘরে কে আনালে!

উদাসীনভাবে বিম্ববতী বললেন, ছোটকু। মজলিস-ঘরে সে ক'দিন হলো থ্যাটারের আসর বসিয়েচে।

—থ্যাটার!

বিধুভূষণ আঁতকে উঠলেন। প্রথমে ব্যাপারটা তাঁর বোধগম্যই হলো না। তারপর আরও কিছু কথাবার্তা বলে জিনিসটা বুঝে তিনি বললেন, কী? ইতর লোকদের মতন সে যাত্রা করবে? সঙ্ সাজবে? ছ্যা ছ্যা ছ্যা ছ্যা। বিম্ব, রাশ টানো, এ বয়েস থেকেই এমন করলে ও ছেলে যে উৎসন্নে যাবে! কক্ষনো হবে না, আমি বেঁচে থাকতে ওসব কক্ষনো হবে না! ঠিক আচে, কাল থেকে আমিই ওর শিক্ষার ভার নেবো। কাল থেকে আমি এ-বাড়িতে আবার রোজ আসবো। নিয়মিত আসবো, আমার ব্যবস্থা অনুযায়ী সব চলবে। ছোটকুর আবার বিয়ে দিতে হবে, ওকে ঘরে বেঁধে রাকতে হবে, ও যেন রামকমলের ধারা না পায়। তুমি কিচ্ছু ভেবো না, আমি সব ঠিক করে দোবো!

বিধুশেখর তাঁর সক্ষম পা-টি তুলে দিলেন বিম্ববতীর কোলে।



জানবাজারের বিখ্যাত ধনী প্রীতিরাম মাড়ের পুত্রবধূ রাসমণি বিধবা হবার পর নিজেই তাঁদের বিপুল সম্পত্তি ও বৃহৎ সংসারের হাল ধরেন। মাহিষ্য বংশীয়া এই রমণীটি বিদ্যাশিক্ষা করেননি বটে, কিন্তু তাঁর জাগতিক জ্ঞান অতি প্রখর। তাঁর স্বামী রাজা ছিলেন না, কিন্তু স্বামীর নাম ছিল রাজচন্দ্র, সেই সুবাদে রাজচন্দ্রের পত্নীকে অনেকে রানী বলে অভিহিত করেন। এবং তিনি রানী নামের যোগ্যও বটে। শ্রীমতী রাসমণি যেমন রূপবতী, তেমন তেজস্বিনী।

রূপের জন্যই সামান্য দরিদ্র পরিবারের সন্তান হয়েও তিনি এত সম্পদশালী পরিবারের বধূ ও কর্ত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিতা হন। জন্মস্থান হালিশহরের কাছে গঙ্গাতীরে কিশোরী রাসমণি একদিন স্নান করতে এবং জল তুলতে এসেছিলেন। তখন তাঁর বয়েস এগারো। সেই সময় যুবক রাজচন্দ্র গঙ্গাবক্ষে বজরায় বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহরে যাচ্ছিলেন কোনো তীর্থে। রাজচন্দ্রের তখন হৃদয় ভগ্ন, জীবনে শান্তি নেই। পর পর দুটি স্ত্রী পরলোকগমন করায় রাজচন্দ্রের আর বিবাহে মতি নেই। কিন্তু নদীকূলে ঐ রূপলাবণ্যবতী কিশোরীটিকে তাঁর চোখে লেগে গেল। রাজচন্দ্রের বন্ধুবান্ধবরাও বললো, সত্যি, এমনটি আর হয় না। তারা অনুসন্ধান করে জানলো যে, জাতের অমিল নেই, কন্যাটি পালটি ঘরের। পুত্রের বন্ধুদের মুখে সব কথা জানতে পেরে প্রীতিরাম ঐ মেয়েটিকে পুত্রবধূ করে নিয়ে এলেন। বধূ সুলক্ষণা, তিনি আসবার পর এই পরিবারের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগলো।

রাজচন্দ্রের মৃত্যুর আগে রানী রাসমণির নাম সর্বসাধারণের মধ্যে বিশেষ পরিচিত ছিল না। স্বামীর শ্রাদ্ধের সময়ই তাঁর খানিকটা পরিচয় পাওয়া গেল। এমন দানশীলা রমণী কেউ আর আগে দেখেনি। দানসাগর শ্রাদ্ধে পর পর দুদিন ধরে তিনি মুঠো মুঠো ধন দান করতে লাগলেন। তাঁর নির্দেশ, কোনো প্রার্থীই যেন ফিরে না যায়। তৃতীয় দিনে তিনি করলেন তুলট। শুদ্ধ বস্ত্র পরে রানী রাসমণি বসলেন দাঁড়িপাল্লার একদিকে, অন্যদিকে চাপানো হলো শুধু রুপোর টাকা। তাঁর দেহের ওজন হলো ছ' হাজার সতেরোটি রৌপ্যমুদ্রা, সেগুলি সেই দণ্ডেই বিতরণ করা হলো পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের মধ্যে। তারপর থেকে যে কোনো মহৎ কর্মের উদ্দেশ্যে কেউ প্রার্থী হয়ে এলে রানীর কাছ থেকে আশাতীত দান পেয়ে যায়।

রানী রাসমণি যেমন একদিকে অকাতরে দান করেন তেমনি অন্যদিকে বিষয় সম্পত্তিও বাড়িয়ে চলেছেন। কী জমিদারি পরিচালনায়, কী ব্যবসায় কার্যে, তিনি পরিচয় দেন অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার। অর্থ উপার্জনে তাঁর যেমন আনন্দ, তেমনি ব্যয়ে। কলকাতার অন্য ধনীদের প্রায় সবার সঙ্গে রাসমণির একটি পরিষ্কার পার্থক্য চোখে পড়ে। অন্যরাও অনেক সময় দান ধ্যান করেন বটে, কিন্তু বিলাসে প্রমোদেও তাঁরা কম অর্থ ব্যয় করেন না। কিন্তু রানী রাসমণি শুদ্ধাচারিণী, বিশেষ বিশেষ তিথিতে তিনি ভূমিশয্যায় নিদ্রা যান।

কলকাতার ধনীদের মধ্যে একমাত্র ঠাকুর বাড়ির দেবেন্দ্রবাবু সমস্ত বিলাসিতা পরিত্যাগ করে ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছেন। এক হিসেবে দেবেন্দ্রবাবুও

রানী রাসমণির প্রতিপক্ষ। দেবেন্দ্রবাবু প্রচার করছেন, দেশবাসী পুতুল পূজা পরিত্যাগ করে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করুক। আর রানী রাসমণি পূজা করেন সাকার ঈশ্বরের। সমস্ত দেব-দেবীর প্রতি তাঁর অচলা ভক্তি। হিন্দু ধর্মের মহিমা বিস্তারের জন্য তাঁর ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত। প্রিন্স দ্বারকানাথ তাঁর স্বামীর কাছ থেকে এক সময় দু লক্ষ টাকা কর্জ নিয়েছিলেন, যথাসময়ে তা শোধ করতে পারেননি বলে ঠাকুরদের জমিদারির একটি পরগণা এখন রানী রাসমণির অধীনে। সুতরাং, প্রকারান্তরে দ্বারকানাথেরই জমিদারির টাকায় দেবেন্দ্রবাবু ও রানী রাসমণি পরস্পরবিরোধী দুই ধর্মকর্মে ব্যাপৃত।

আতুরালয় স্থাপন, গঙ্গায় ঘাট নির্মাণ, বিভিন্ন তীর্থের দেবদেবীর অলঙ্কার সজ্জা, এ সব তো আছেই, তা ছাড়া, এই নগরের উন্নতিকল্পেও তাঁর যত্নের অন্ত নেই। জানবাজারে রানী রাসমণির প্রকাণ্ড অট্টালিকায় দোল-দুর্গোৎসবের জাঁক-জমকও কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রবাদ-প্রসিদ্ধি পেয়ে গেল। দুর্গোৎসব করতেন বটে পোস্তার রাজা সুখময় রায়, তারপর এই রানী রাসমণি। এই সব উৎসবে সারা শহরের লোক ভেঙে পড়ে তাঁর বাড়িতে। রথের দিন পথে বেরোয় প্রাসাদতুল্য সম্পূর্ণ রুপোয় নির্মিত রথ, তার পিছনে প্রায় আধ ক্রোশব্যাপী শোভাযাত্রা, তাতে অবিরাম শোনা যায় গীত, বাদ্য আর 'হরি বোল' ধ্বনি।

দুর্গোৎসব উপলক্ষেই রানী রাসমণির অন্য একটি রূপ প্রকাশিত হলো একবার।

মহালয়ার দিনের বোধন থেকে শুরু হয় উৎসব। সপ্তমীর দিনে খুব ভোরে ব্রাহ্মণরা নব পত্রিকা নিয়ে গঙ্গায় স্নান করাতে যায়, তাদের পেছনে পেছনে বাজনদাররা ঢাক, ঢোল, সানাই, করতাল বাজাতে বাজাতে চলে।

সেই তুমুল বাদ্যরবে এক সাহেবের নিদ্রার খুব ব্যাঘাত হলো।

তিনি গবাক্ষ খুলে দেখলেন একদল অর্ধ উলঙ্গ নেটিভ বিকট শব্দ করে লাফাতে লাফাতে চলেছে। নেটিভদের অনেক প্রকার উদ্ভট মূর্খামির পরিচয় এর আগে পাওয়া গেছে, কিন্তু সূর্যোদয়ের আগে সকলকার ঘুম ভাঙিয়ে একি উৎকট আনন্দ!

মুখ রক্তবর্ণ করে সাহেব দারুণ চেঁচামেচি করতে লাগলেন এবং তখনই হুকুম দিলেন বাজনা বন্ধ করার। কিন্তু রানী রাসমণির লোকেরা শুনবে কেন? তারা কর্ণপাত না করে তেমনভাবেই ড্যাং ড্যাং করে চলে গেল।

ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে সাহেব খবর দিলেন কোতোয়ালিতে। পুলিসের সাহায্য চাইলেন, যাতে ফেরার পথে ঐ নেটিভরা তাঁর শান্তি ভঙ্গ করতে না পারে।

দু'-একজন অনুচর এ সংবাদ জানালো রানী রাসমণিকে। তিনিও দপ্ করে জ্বলে উঠলেন রাগে। তিনি বললেন, আমরা হিন্দু, আমাদের ধর্মকর্মে বাধা দেবার কী অধিকার আছে সাহেবের? সাহেবরা যে খৃষ্টীয় পরবে সারারাত্রব্যাপী হল্লা করে, তখন কি আমরা বাধা দিতে যাই? যা, আরও বেশী করে ঢাক ঢোল বাজা গে যা তোরা! শুধু তাই নয়, আজ সারাদিন ধরে এই পথ দিয়ে বাজাতে বাজাতে যাবি আর আসবি।

তিনি কয়েকজন পাইকও পাঠিয়ে দিলেন ওদের সঙ্গে।

দু'চারজন পুলিস সেই শোভাযাত্রাকে বাধা দিতে পারলো না। রাসমণির কর্মচারীরা বললো, আমাদের মা বলে দিয়েছেন, এ রাস্তা আমাদের, এখানে আমরা যা খুশী করবো। সাহেব হাত পা কামড়াতে লাগলেন, সারাদিন ধরে অসহ্য ঢাকের বাজনা তাঁর কান ঝালাপালা করে দিল।

সাহেব একটি মামলা ঠুকলেন রাসমণির নামে। ইংরেজের আদালতে ইংরেজ আনীত মামলার ফলাফল যা হবার তাই হলো, পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হলো রাসমণির। কিন্তু এ রমণী বড় জেদী, কিছুতেই হার স্বীকার করার পাত্রী নন। জরিমানার টাকা জমা দিয়ে রাসমণি বললেন, বেশ, এর পর থেকে যে রাস্তা আমি বানিয়েছি, সে রাস্তা দিয়ে অন্য কারুর হাঁটা চলার এক্তিয়ার থাকবে না। বড় বড় গরাণ কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তিনি জানবাজার থেকে বাবুঘাট পর্যন্ত রাস্তার দুদিকে শক্ত বেড়া দিয়ে দিলেন। সব যানবাহন বন্ধ হয়ে গেল, নগর পরিচালকরা পড়লেন মহা অসুবিধেয়। শেষ পর্যন্ত তাঁরা আপোস করলেন রাসমণির সঙ্গে, ক্ষমা চেয়ে তাঁরা জরিমানার টাকা ফেরত দিলেন। রাসমণিও তুলে নিলেন পথের বেড়া। এক স্ত্রীলোকের এই জয় কাহিনীতে খুব আমোদ পেল নগরবাসীরা।

রানী রাসমণি আর একবার কোম্পানী বাহাদুরকে জব্দ করেছিলেন।

সরকার থেকে হঠাৎ আদেশ জারি করা হলো, গঙ্গায় আর জেলেরা ইচ্ছে মতন মাছ ধরতে পারবে না। মাঘে সরস্বতী পূজার পর থেকে সেই আশ্বিন মাস পর্যন্ত গঙ্গা থাকে ইলিশ মাছে ভরা, তখন গঙ্গাবক্ষ জেলে ডিঙিতে ছেয়ে যায়। এর ফলে জাহাজ চলাচলে অসুবিধা হয় বলে ঠিক হলো যে যার খুশী সে আর এখানে মাছ ধরতে পারবে না। এজন্য কর দিতে হবে। কর দিতে হলেই জেলে ডিঙির সংখ্যা যাবে অনেক কমে।

মৎস্যজীবীরা গিয়ে কেঁদে পড়লো রানী রাসমণির পায়ে। অনেকের জীবিকা নষ্ট হবার উপক্রম। এখন রানী না বাঁচালে তাদের কে বাঁচাবে? তিনি ছাড়া তাদের জাতের দুঃখে আর কে সমব্যথী হবে?

রাসমণি তখন আবার এক চমকপ্রদ বুদ্ধির পরিচয় দিলেন। সরকার মাছ ধরার জন্য কর চেয়েছেন, ঠিক আছে, সেই কর তিনি একাই দেবেন। দশ হাজার টাকা দিয়ে তিনি ঘুষুড়ি থেকে মেটেবুরুজ পর্যন্ত গঙ্গা ইজারা নিয়ে নিলেন সরকারের কাছ থেকে। তারপর জাহাজ লঙ্গর করার মোটা দড়ি দিয়ে ঘিরে ফেললেন গঙ্গার সেই এলাকা, জেলেদের বলে দিলেন, এবার তোরা মাছ ধর, যত খুশী মাছ ধর।

দড়ি দিয়ে ঘেরার ফলে সব জাহাজ আটকে গেল। কলকাতার বন্দরে আর কোনো জাহাজ ভিড়তে পারে না, কলকাতার জীবন অচল হয়ে যাবার উপক্রম। কলকাতার লোক সবাই সেদিন গঙ্গার কূলে গিয়েছিল রানী রাসমণির কীর্তি দেখতে। দুলালচন্দ্রকে নিয়ে নবীনকুমারও গিয়েছিল। সে বড় অদ্ভুত দৃশ্য। মোটা দড়ির ওধারে সার বেঁধে থমকে আছে ইংরেজের জাহাজ, তার নাবিকরা সব হতভম্ব, আর এদিকে পতঙ্গের মতন অজস্র জেলে ডিঙি ভাসছে, জেলেরা উল্লাসে হো হো হা হা করছে। এই দৃশ্যে বড় মজা পেয়েছিল নবীনকুমার। সে তখন খুবই বালক, তবু ইঁচোড়ে পাকার ভঙ্গিতে সে দুলালকে বলেছিল, দ্যাক দ্যাক, জানবাজারের জমিদারণী ইংরেজের মুখে চুনকালি দিয়েচে।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে সরকার রাসমণির কাছ থেকে কৈফিয়ত তলব করলেন। রাসমণির উত্তর অতি সরল। মাছ ধরার জন্য তিনি গঙ্গার অংশ ইজারা নিয়েছেন, এখন সেই অংশ তিনি জেলেদের মধ্যে বিলি করতে পারেন, সে অধিকার তাঁর আছে। এখান দিয়ে জাহাজ চলাচল করলে মাছ ধরায় বিঘ্ন হবে। সরকার তাঁকে ইজারা দিয়েছেন। এখন তাঁর সুবিধে অসুবিধে দেখার দায়িত্ব তো সরকারের। পুকুর জমা নিয়ে যখন বেড়া জাল ফেলে মাছ ধরা হয়, তখন কি পাড়া-প্রতিবেশীরা সেই পুকুরে আর নাইতে আসে?

শেষ পর্যন্ত সরকারকে রফা করতে হলো। গঙ্গাবক্ষে জেলেদের আবার বিনা করে মাছ ধরার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হলো, রানীও দাঁড় কাছি গুটিয়ে নিলেন।

রানীর বয়েস এখন ষাট, কিন্তু স্বাস্থ্য অটুট, আর তেজও এক বিন্দু কমেনি। পরিণত বয়সে তাঁর রূপ আরও মহিমান্বিত হয়েছে, এখনো তিনি স্বয়ং জমিদারি পরিচালনা করেন, প্রজাদের দুঃখ দুর্দশার কথা শোনেন। তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত দুটি। প্রজাদের প্রতি অবিচার রোধ এবং সনাতন হিন্দু ধর্মের সংস্থাপন। খৃষ্টানী এবং নিরাকার ব্রহ্মের পূজা, তাঁর দুই নয়নের বিষ। হিন্দু ধর্মের গৌরব তিনি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে যাবেনই।

সম্প্রতি তিনি একটি অতি বৃহৎ কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং সেই ব্যাপারেই প্রবল আঘাত পেলেন দেশবাসীর কাছ থেকে।

রানী স্বাবলম্বিনী। বিধবা হবার পর তিনি প্রায়ই এক সঙ্গে অনেক বজরা সাজিয়ে, পাইক বরকন্দাজ সঙ্গে নিয়ে নানান তীর্থ ভ্রমণে গেছেন। একবার তিনি কাশীধামে গিয়ে বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দর্শন করে আসবেন মনস্থ করেছিলেন। কাশী অনেক দূরের পথ, দস্যু-তস্করের উপদ্রবের ভয় আছে, কিন্তু একবার কোনো কথা মনে এলে রানী আর নিরস্ত হন না। তিনি এক সঙ্গে পঁচিশখানা বজরা সাজালেন, তাতে নিলেন ছ' মাসের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য আর প্রচুর লোক-লস্কর ও অস্ত্রধারী প্রহরী।

মধ্য রাত্রে জোয়ারের পর বজরার বহর ছাড়বে। আত্মীয় পরিজনদের নিয়ে রানী আগেই নিজস্ব বজরায় উঠে শুয়ে পড়েছেন। ঘুমের মধ্যে কখন বজরা ছেড়েচে, তিনি খেয়াল করেননি। এমন সময় রানী একটি স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্ন নয়, রানীর মনে হলো দৈব দর্শন। স্বয়ং জগজ্জননী মা কালী তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে ভর্ৎসনার সুরে বলছেন, তোর সন্তানতুল্য ছেলেরা খেতে পরতে পাচ্ছে না, তাদের ছেড়ে তুই কোথায় চললি? কাশী? এদের সেবা কর, তাতেই আমাকে পূজা করা হবে। এখানে এই গঙ্গাতীরেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করে সেবার ব্যবস্থা কর, সেখানেই আমি তোর হাতের পূজা গ্রহণ করবো।

স্বপ্ন ভেঙে যেতেই রানী রাসমণি ধড়ফড় করে উঠে বসলেন। তাঁর সর্বাঙ্গ ঘামে সিক্ত। স্বপ্ন নয়, যেন একেবারে সত্য। মা তাঁকে আদেশ দিয়ে গেছেন। একটুক্ষণ আচ্ছন্ন ভাবে বসে রইলেন তিনি। তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে চিৎকার করে বললেন, ওরে, বজরা থামা, বজরা থামা!

পরদিন প্রভাতে সবগুলি বজরার অন্ন বস্ত্র স্থানীয় দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে রানী ফিরে এলেন জানবাজারে। তাঁর যাত্রা ভঙ্গের কারণ আর কারুর কাছে ব্যক্ত না করে তিনি ডেকে পাঠালেন মথুরকে।

রানীর পুত্র সন্তান নেই। চারটি কন্যা। এর মধ্যে তৃতীয়া কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন এই মথুরের সঙ্গে। সেই কন্যাটি অকালে মারা যায়। তারপর চতুর্থ কন্যাটির সঙ্গেও মথুরেরই বিবাহ দিয়ে তাঁকে তিনি ঘরজামাই করে রেখেছেন। এই মথুর বেশ বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, রানীর বিষয়কর্মের ডান হাত।

মথুরকে ডেকে তিনি বললেন, তুমি গঙ্গার কূলে জমি দেখো, আমি মন্দির প্রতিষ্ঠা করবো।

'গঙ্গার পশ্চিম কূল, বারানসী সমতুল', সুতরাং পশ্চিম পারে জমি পেলেই ভালো হয়। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সেদিকে পছন্দমতন এক লপ্তে অনেকখানি জমি পাওয়া গেল না, বরং পূর্বপারে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে জমি বিক্রয়

আছে। সুপ্রিম কোর্টের অ্যাটর্নী হেস্টি সাহেবের কুঠি, মুসলমানদের একটি পরিত্যক্ত কবরখানা ও এক গাজী সাহেবের পীরের আস্তানা, সব মিলিয়ে সাড়ে চুয়ান্ন বিঘা জমি, মূল্য সাড়ে বেয়াল্লিশ হাজার টাকা। সেখানে শুরু হলো একালের বৃহত্তম মন্দিরের নির্মাণের কাজ। গঙ্গার কূলে পোস্তা বেঁধে আগাগোড়া বাঁধিয়ে দেওয়া হলো, তৈরি হলো বৃহৎ স্নান ঘাট, তারপর দ্বাদশ শিব মন্দির, বিষ্ণু মন্দির, নবরত্ন চূড়াযুক্ত কালী মন্দির ও নাট মন্দির। যত লক্ষ টাকা লাগে লাগুক, তবু সব কিছু রানীর মনোমতন হওয়া চাই।

মন্দির গঠনের কাজে যাতে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে সেইজন্য রানী কঠোর কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করলেন। ত্রি-সন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন গ্রহণ, ভূমিতে শয়ন এবং নিশিদিন ইষ্টদেবতার কাছে প্রার্থনা। কয়েক বছর ধরে চললো মন্দির নির্মাণের কাজ, প্রতিদিন তিনি মথুরের কাছ থেকে খবরাখবর নেন এবং মাঝে মাঝে নিজে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে গিয়ে কাজের প্রগতি দেখে আসেন। আর বেশী বাকি নেই, বৎসরকালের মধ্যেই মূর্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে, রানী এর মধ্যেই দিনক্ষণ দেখতে শুরু করেছেন।

তবু বাধা এলো অন্য দিক থেকে।

একদিন মথুর এসে বিষণ্ণ মুখে জানালেন সেই দুঃসংবাদ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ফতোয়া দিয়েছেন, জানবাজারের জমিদার-পত্নী রাসমণি দাসী দক্ষিণেশ্বর গ্রামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করলে, সে কাজ হবে অশাস্ত্রীয়।

রানী একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। অশাস্ত্রীয়? তিনি শুদ্ধচিত্তে, ফলের প্রত্যাশী না হয়ে, তাঁর সমস্ত সম্পদ উজাড় করে মন্দির স্থাপন করতে চান, সে কাজ অশাস্ত্রীয় কেন হবে?

মথুর জানালেন যে, ব্রাহ্মণরা বলেছেন, শূদ্রের কোনো অধিকার নেই দেব-দেউল প্রতিষ্ঠার। শূদ্রের হাতের পূজা কোনো দেব-দেবী নেন না। টাকার গরম থাকলেই কি শাস্ত্র উল্টে যাবে! এই বলে পণ্ডিতরা ঘোঁট পাকাচ্ছে।

রানী হাহাকার করে বললেন, কিন্তু মা যে স্বয়ং আমায় দেকা দিয়ে বলেচেন যে তিনি আমার হাতের পূজা নেবেন!

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সে স্বপ্নের কথা বিশ্বাস করবে না। স্বপ্নের কথা বলে শাস্ত্র পাল্টানো যায় না।

রানী রাসমণি গুম হয়ে বসে রইলেন। তাঁর শ্রদ্ধাভক্তি, ধর্ম সংস্থাপনের জন্য তাঁর ব্যাকুলতা, এ সবই তুচ্ছ? তিনি শূদ্র বংশীয়া, এটাই বড় কথা? তা ছাড়া, কে বলেছে শূদ্র? মাহিষ্যরা মোটেই শূদ্র নয়। ব্রাহ্মণরা যে-কোনো একটা ফতোয়া দিয়ে দিলেই হলো! জমিদারির কাগজপত্রে তাঁর নামের শিলমোহরে লেখা থাকে, কালীপদ অভিলাষী শ্রীমতী রাসমণি দাসী। পণ্ডিতেরা তাঁর মায়ের পদ বন্দনা করতে দেবে না। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির বিগ্রহহীন শূন্য পড়ে থাকবে? ব্রাহ্মণরা অশাস্ত্রীয় বলে ঘোষণা করলে পাপের ভয়ে কেউ তো সে মন্দিরে যাবে না।

একটু পরে রানী চোখের জল মুছে বললেন, তা বলে তো ভেঙে পড়লে চলবে না, মথুর। হেরে যেতে আমি শিখিনি। কলকাতার পণ্ডিতরা বলেচে বলে সেটাই তো শেষ কতা নয়। তুমি লোক পাঠাও, কাশীতে, মারহাট্টাদের দেশে, দক্ষিণ ভারতে। সেখানেও বড় বড় পণ্ডিত থাকে, তেনাদের মত আনাও।

কিন্তু দূর দূর দেশ থেকেও নৈরাশ্যজনক সংবাদ আসতে লাগলো। শূদ্রের মন্দির প্রতিষ্ঠার অধিকার ভারতের ব্রাহ্মণ সমাজ মেনে নেবে না কিছুতেই। কলকাতার পণ্ডিতরা প্রকাশ্যে আন্দোলন শুরু করলো। তারা প্রচার করলো,

রাসমণি দাসীর এই স্পর্ধা কিছুতেই সহ্য করা হবে না। এই ঘোর অনাচার মেনে নিলে হিন্দু সমাজে প্রবল বিকার দেখা দেবে। টাকা দিয়ে আর সব কেনা যায়, ধর্ম কেনা যায় না। রাসমণি দাসী আবার সেখানে অন্নভোগ দিতে চায়! শূদ্রের অন্ন দেওয়া হবে দেবতাকে! এর মধ্যেই কি কলির পাঁচ পা বেরুলো!

ধর্মপ্রাণা রানী রাসমণি ইংরেজের বিরুদ্ধে কূট কৌশলে লড়েছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁর চোখে দেবতুল্য, সেই ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে তিনি লড়বেন কী ভাবে! তাঁর মন ভেঙে গেল। তিনি ভূমিশয্যায় শুয়ে অনবরত রোদন করেন আর মাঝে মাঝে কাতর ভাবে বলে ওঠেন, মা, মা, আমি শূদ্র বংশে জন্মে কী অপরাধ করেছি মা, যে তোমার সেবা করতে পারবো না? তুমি কি শূদ্রেরও মা নও?

রানীর এক এক সময় মনে পড়ে যায় নবদ্বীপের কথা। কয়েক বছর আগে তিনি নবদ্বীপে গিয়েছিলেন তীর্থ দর্শনে। চন্দ্রগ্রহণের রাতে নবদ্বীপের গঙ্গা-তীরে দাঁড়িয়ে তিনি কল্পতরু হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের তিনি রক্তবর্ণ পট্ট-বস্ত্র ও রৌপ্যমুদ্রা দান করেছেন। বিশিষ্ট সব শিরোমণি, তর্কসিদ্ধান্ত, ন্যায়রত্ন ও বিদ্যারত্নদের নিমন্ত্রণ করে তাঁদের প্রত্যেককে দিয়েছেন পঞ্চাশটি করে টাকা ও লাল রঙের বনাত। পণ্ডিতরা দু' হাত তুলে তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

সেই কথা মনে পড়ায় রানী দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। ব্রাহ্মণরা তাঁর দান গ্রহণ করতে পারেন, সেজন্য খুশী হয়ে আশীর্বাদ করতে পারেন, অথচ তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেই ব্রাহ্মণদের আপত্তি! এ কেমন কথা? এ যে স্বার্থপর, লোভীদের মতন মনোবৃত্তি! পর মুহূর্তেই রানী আবার তিরস্কার করেন নিজেকে। না, ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে এমন চিন্তা করাও যে পাপ!

রানীর মুশকিল এই যে, তিনি ব্রাহ্মণদের শত্রু বলে মনে করতে পারছেন না। নইলে তো লাঠি কিংবা বুদ্ধির জোরেই তিনি কলকাতার ব্রাহ্মণ সমাজকে শায়েস্তা করতে পারতেন। টাকা দিয়ে কিছু ব্রাহ্মণকে কিনেও ফেলা যায়। কিন্তু পণ্ডিতসমাজ পুরো ব্যাপারটিকেই অশাস্ত্রীয় বলে ঘোষণা করলে জনসাধারণ তাঁর দিকে আসবে না। তাঁর চাই শাস্ত্রের সমর্থন। ব্রাহ্মণ ছাড়া পূজা হয় না। দেবেন্দ্র ঠাকুরের দল পূজা আচ্চা তুলে দিয়ে অব্রাহ্মণকে দিয়ে বেদ পাঠ করাচ্ছে। সে সবের বিরুদ্ধেই তো রানী রাসমণি পূজার মহিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চান। অথচ ব্রাহ্মণরাই তাঁকে প্রতিহত করছেন!

মথুর মাঝে মাঝে সান্ত্বনা দিতে আসেন, কিন্তু রানী কিছুতেই প্রবোধ মানেন না। তিনি কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না। মা কালী নিজে এসে তাঁকে অন্নভোগ দিতে বলেছিলেন, আদেশ দিয়েছিলেন মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করতে, তা আর ইহজীবনে সম্পন্ন হবে না!

একদিন মথুর হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন, মা, মা, একটি সুসংবাদ আছে! এবার বুঝি একটা উপায় হয়েচে।

রানী বিশেষ গরজ করলেন না, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, কী বলো?

মথুর বললেন, মা, আপনি উঠে বসুন। অনেক কথা আচে।

রাসমণি উঠে মথুরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ঠাণ্ডাভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কী উপায় হয়েচে, আগে শুনি!

মথুর বললেন, এক চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত জানালেন যে, আপনি যদি মন্দিরের যাবতীয় সম্পত্তি কোনো ব্রাহ্মণকে আগে দান করেন আর সেই ব্রাহ্মণ যদি মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে অন্নভোগের ব্যবস্থা করেন, তা হলে আর শাস্ত্রের কোনো বাধা থাকে না।

রাসমণি বললেন, এ আর এমন কি কথা। আমার গুরুদেবের নামে ঐ সব সম্পত্তি ব্রহ্মোত্তর করে দেবো, আমি হবো তাঁর কর্মচারী। আমি তো নাম চাই না, মায়ের সেবার অধিকার পেলেই হলো।

মথুর বললেন, বেশ, এই তো উত্তম বন্দোবস্ত।

রানী জিজ্ঞেস করলেন, এই পণ্ডিতের বিধান সবাই মানবে? ইনি কে? কোথায় থাকেন?

মথুরবাবু বললেন, কেন মানবে না? ইনিও যে-সে পণ্ডিত নন। আমি নিজে এই মাত্র তেনার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে আসচি। তিনি আমায় শাস্ত্রের বচন উদ্ধার করে শোনালেন।

রাসমণি আবার প্রশ্ন করলেন, পণ্ডিতটি কে?

পণ্ডিতের নাম রামকুমার ভট্টাচার্য। হুগলীর কামারপুকুরে বাড়ি। কলকাতায় এসে ঝামাপুকুরে টোল খুলেছেন। তাঁর সঙ্গে থাকে তাঁর সতেরো বছর বয়সী এক ভাই, তার নাম গদাধর। ছেলেটি বেশ ভালো গান গায়।



রাইমোহন ও তার দলবল চন্দ্রনাথকে উদ্ধার করলো নিমতলার শ্মশানঘাট থেকে। তিনদিন ধরে ওরা সারা কলকাতা শহর চষে ফেলেছিল। হীরা বুলবুলের প্রায় অর্ধোন্মাদিনীর দশা। হিন্দু কলেজ থেকে চন্দ্রনাথ বিতাড়নের সংবাদ ছাপা হয়েছিল সংবাদপত্রে, এমনকি বাগবাজারের বোসেদের বাড়িতে চন্দ্রনাথই যে বাবুদের এক শ্যালককে পাথরের চাঙাড় ছুঁড়ে মেরে মাথা ফাটিয়েছে, সে খবরও গোপন থাকেনি।

রাইমোহন বুঝেছিল, বাবুদের পাইক বরকন্দাজরা চন্দ্রনাথকে একবার ধরতে পারলে হাতে নাতে মেরেই ফেলবে। কোতোয়ালির সাহায্য নিয়েও তারা ওকে ধরবার চেষ্টা করবে। তার আগেই চন্দ্রনাথকে কোথাও সরিয়ে ফেলা দরকার।

চন্দ্রনাথকে প্রথমে চিনতেই পারেনি রাইমোহন। শ্মশানে ডোমেদের পাশে সেও ডোম সেজে ছিল। পরনে শুধু মালকোচা মারা ধুতি, সারা গায়ে কালি-ঝুলি মাখা, মুখখানাতেও ছাই মেখেছে, চুলগুলো আঠার মতন। নিজের চেহারার চেয়েও বড় একটা বাঁশ নিয়ে সে চুল্লি খোঁচায়, আর শ্মশানযাত্রীরা যে ভিজে আতপ চাল ও কলা বাতাসা ফেলে যায়, সেইগুলি খেয়ে সে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে।

রাইমোহন চেনার আগেই চন্দ্রনাথ তাদের চিনতে পেরে হাতের বাঁশটি ফেলে মেরেছিল এক দৌড়। তখন হারাণচন্দ্র চেঁচিয়ে উঠেছিল, ঐ তো চাঁদু।

রাইমোহনের বয়েস হয়েছে, এক তাজা বয়েসী কিশোরের সঙ্গে সে দৌড়ে পারবে কী করে। তার সঙ্গীরাও মাতাল দাঁতাল মানুষ, দৌড় ঝাঁপে বিশেষ দড় নয়। তবু সবাই মিলে ধর্ ধর্, ছোঁড়াটাকে ধর, বলে ছুটেছিল। কলকাতার মানুষ বড় হুজুগে, একটা কোনো উপলক্ষ পেলেই হলো। শ্মশান-মশানে অনেক পরগাছা ধরনের মানুষ থাকে, মড়াদের ওপর নির্ভর করেই তারা জীবন কাটায়। তারা অধিকাংশ সময়ই শুয়ে থাকে অথবা ইটের টুকরো দিয়ে বাঘবন্দী খেলে, হরিধ্বনি দিয়ে কোনো মড়া দাহের দল এলে তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

এখন একটি জ্যান্ত ছেলেকে তাড়া করার দৃশ্য দেখে তারাও মজা পেল এবং অনুসরণকারীদের দলে যোগ দিল। নিশ্চয়ই কোনো চোর ধরার ব্যাপার, আর চোর ধরতে সকলেরই, এমনকি অন্য চোরেদেরও বিশেষ উৎসাহ থাকে।

এক সঙ্গে অনেকের তাড়া খেয়ে চন্দ্রনাথ প্রথমে কিছুক্ষণ ভীত ইঁদুরের মতন এদিক ওদিক করলো, তারপর দিশাহারা হয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো গঙ্গায়।

সে সাঁতার জানে না, কিন্তু ডুবে যাবার সুযোগ ঘটার আগেই শ্মশানের পরগাছারা কয়েকজন একসঙ্গে নেমে জল দাপিয়ে তুলে আনলো তাকে। এরা গঙ্গার জলের তলা থেকে শ্মশানবন্ধুদের ছুঁড়ে দেওয়া তামার পয়সা পর্যন্ত তুলে আনে, আর একজন মানুষকে তোলা তো এদের কাছে বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের যোগ্য কাজ।

ভিড় ঠেলে কাছে এগিয়ে এলো রাইমোহন, সে দারুণ ভাবে হাঁপাচ্ছে। চন্দ্রনাথকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে আকুলভাবে বললো, চাঁদু চাঁদু, বাপ আমার, একি কল্লি তুই! তোর মা যে কেঁদে অন্ধ হয়ে যাচ্চে রে!

নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য ছটফট করছে চন্দ্রনাথ। তার চোখ বোঁজা, মুখ-খানা কুঁকড়ে আছে।

রাইমোহন বললো, ডোম চাঁড়ালদের সঙ্গে ছিলি তুই, ওরে তোর কি একটু ঘেন্নাও নেই! সোনার বন্ন একেবারে কালি হয়ে গেচে! বাপ আমার চল, ঘরে চল।

এক ঝটকা মেরে রুক্ষ কণ্ঠে চন্দ্রনাথ বললো, ছাড়ো আমাকে। আমি যাবো না, বাড়ি যাবো না! আমি তোমাদের চিনি না!

তখন তিন চারজনে মিলে জোর করে চ্যাংদোলা করে তুলে ওকে চাপানো হলো একটি কেরাঞ্চি গাড়িতে। গাড়োয়ানকে রাইমোহন বললো, একটু শিগগির শিগগির চল বাবা! বখশিস পাবি! গাড়ির মধ্যে তারা চন্দ্রনাথকে চেপে ধরে রইলো। রাইমোহন পেছন ফিরে আড়াল করে রাখলো গাড়ির দরজাটি, যাতে পথের লোক কেউ দেখতে না পায়।

একখানা সাদা থান পরে দোতলার ঘরের মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল হীরা বুলবুল। এই তিনদিন সে এক কণা অন্ন মুখে তোলেনি। কেঁদে কেঁদে তার সুন্দর ডিমছাঁদের মুখটি এখন ফুলে যেন বাতাপি লেবুর মতন হয়ে গেছে।

রাইমোহন ঘরে ঢুকে বললো, ও হীরে, ওঠ্, চোখ মেলে দ্যাক কাকে এনিচি!

হীরা বুলবুল মুখ ফিরিয়েই চন্দ্রনাথকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পক্ষিমাতার মতন ঝাঁপিয়ে পড়লো চন্দ্রনাথের ওপর।

কিন্তু চন্দ্রনাথের কাছে মাতৃস্নেহের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। সে মায়ের আলিঙ্গনে ধরা দিল না, তার আগেই এমন এক ধাক্কা দিল যে হীরা বুলবুল ঘুরে গিয়ে পড়লো দেয়ালে, ঠক্ করে তার মাথা ঠুকে গেল।

তারপর চন্দ্রনাথ তীব্র গলায় বললো, তুই আমার মা না রাক্ষুসী? আমায় কেন গর্ভে ধারণ করিছিলি? আর যদি ধারণ করেইছিলি, আঁতুর ঘরে আমার গলা টিপে মেরে ফেলিসনি কেন?

মাত্র এই তিনদিনেই চন্দ্রনাথের শুধু যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে তাই-ই নয়, তার কণ্ঠস্বর পর্যন্ত বদলে গেছে। সে এখন বয়স্কদের ভঙ্গিতে বয়স্কদের ভাষায় কথা বলে।

হীরেমণি ভেউ ভেউ করে কান্না জুড়ে দিল।

রাইমোহন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, কাঁদিসনি হীরে, এই কি কাঁদবার সময়! ছেলে ফিরে পেয়েচিস, ভগবানকে পেন্নাম জানা। মায়ে-ছেলেতে এমন আথান্তর হয়ই, ছেলের কতা গায়ে মাকতে নেই।

তারপর সে চন্দ্রনাথের দিকে ফিরে বললো, চাঁদু সোনা, বাপ আমার, অমন কটু কতা বলিসনি! তোর অপমানে কি আমাদেরও কম অপমান হয়েচে? তোর মা একেবারে মরমে মরে আচে। কাটা ঘায়ে এখুন আর নুনের ছিটে দিসনি!

চন্দ্রনাথ বললো, তুমি আমায় বাপ বলবে না! তুমি কে? তুমি আমার কিসের বাপ? ক'দিনের বাপ? তুমি আমায় কেন জোর করে ধরে এনোচো?

রাইমোহন বললো, সব কতার উত্তর দেবো। এখুন একটু ঠাণ্ডা হ! হাত মুক ধুয়ে কিচু পেটে দে।

চন্দ্রনাথ বললো, না!

হীরা বুলবুল বললো, ওরে চাঁদু রে, আমায় তোর যত ইচ্ছে বকিস। আমি আর পাপ কর্বো না কক্ষণো। আমি প্রাচিত্তির কর্বো। তোকে নিয়ে আমি তীথে যাবো! পুরীর জগন্নাথের সোনার মুকুট গড়িয়ে দেবো। ব্রেন্দাবনে কৃষ্ণের হাতে সোনার বাঁশী তুলে দোবো। তাতেও আমার পাপ ধুয়ে যাবে না?

চন্দ্রনাথ বললো, তুই মর। তুই যা খুশী কর। আমি তোদের কেউ না।

চন্দ্রনাথকে জোরজার করে পাঠিয়ে দেওয়া হলো তার ঘরে। সেখানেও চন্দ্রনাথ ক্রুদ্ধ সজারুর মতন রইলো রোঁয়া ফুলিয়ে। ঘরে তার বইপত্র যা ছিল সব ছিঁড়ে একেবারে ধ্বংস করে ফেললো। খাবারের থালা সে ছুঁড়ে মারলো দেয়ালে। তার উগ্র উন্মাদের মতন মূর্তি দেখে কেউ ঘরে ঢুকতে সাহস পেল না।

সেই ভোর রাতেই চন্দ্রনাথ আবার পলায়ন করলো বাড়ি থেকে।

অনুসন্ধান পার্টি নিয়ে রাইমোহন আবার ঘুরতে লাগলো কলকাতার পথে পথে। সবক'টি শ্মশান ঘুরে দেখা হলো, চন্দ্রনাথ এবার ওসব দিকে যায়নি। কালীঘাটের মন্দিরের কাছে শয়ে শয়ে কাঙালী ঘুরে বেড়ায়। চন্দ্রনাথ সেখানে ওদের মধ্যে মিশে থাকতে পারে ভেবে রাইমোহন সারাদিন ওঁৎ পেতে রইলো, কিন্তু চন্দ্রনাথের সন্ধান মিললো না। বার সিমলেতে অষ্টপ্রহর হরি সংকীর্তন উপলক্ষে ভিখারীদের ফুটকড়াই ও আধলা বিলোনো হচ্ছে কিংবা পাথুরেঘাটার ঠাকুরদের বাড়িতে এক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী দরিদ্রনারায়ণ সেবা হচ্ছে, সেসব জায়গাতেও খোঁজ করে দেখলো রাইমোহন। চন্দ্রনাথ নেই।

পাঁচ দিনের মাথায় তাকে পাওয়া গেল মেটেবুরুজে। সেখানে পর পর কয়েকটি পুকুর ভরাট করে রাস্তা তৈরি হবে, জনা পঞ্চাশেক মজুর খাটছে, তাদের মধ্যে চন্দ্রনাথ একজন।

এবার রাইমোহনকে দেখে চন্দ্রনাথ পালাবার চেষ্টা করলো না; একখানা লোহার শাবল তুলে সে তাকে মারতে তেড়ে এলো। আঘাতটা ঠিক মতন লাগলে রাইমোহনের মাথাটা চৌচির হয়ে যেত। ঠিক সময় রাইমোহন শরীরটা বাঁকিয়ে নিয়েছিল। শাবলের ঘা লাগলো তার কাঁধে, তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে সে দু'হাতে চন্দ্রনাথকে জড়িয়ে ধরে বললো, আর তোকে ছাড়চিনি, বাপ আমার! এবার সর্বক্ষণ তোকে বুকে আগলে রাকবো।

এক ফিরিঙ্গি ঠিকাদার সেখানকার কুলিদের কাজ দেখাশোনা করছিল, সে এই বিচিত্র ঘটনায় আকৃষ্ট হয়ে কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, এসব কী হইতেছে?

রাইমোহন বললো, মাই চাইল্ড, স্যার! ভেরি ম্যাড, স্যার। পাগলা কুকুরে বাইট করেছেল স্যার। সেই থেকে মাথা ট্রাবলসাম, স্যার।

ফিরিঙ্গিটি আর কোনো বাক্য ব্যয় না করে ডান হাতের পাঞ্জাটি দুবার এমনভাবে নাড়ালো, যার অর্থ, নিয়ে যাও। শীঘ্র বিদায় হও।

আবার জোর করে চন্দ্রনাথকে তোলা হলো গাড়িতে। এবার বাড়িতে এনে তাকে একটি ঘরে বন্ধ করে শিকলি তুলে দেওয়া হলো।

হীরা বুলবুলকে রাইমোহন বললো, আমি বলি কী হীরে, এ পাড়া থেকে এবার বাস তুলে দে। তুই তো বাবু-বসানো ছেড়েই দিতে চাইচিস, তবে আর এ পাড়ায় থেকে লাভ কী। শহর ছেড়ে চল খিদিরপুরের দিকে চলে যাই। কিংবা রসাপাগলায় বন কেটে অনেক বসত বাড়ি হচ্চে, সেখেনে একটা বাড়ি কিনে তোতে আমাতে স্বোয়ামী স্ত্রী সেজে থাকবো। ছেলের মাতা গরম হয়েচে, ওকে নিয়মিত ক'দিন মকরধ্বজের সঙ্গে মধু-তুলসীপাতা মেড়ে খাওয়ালেই আবার ঠিক হয়ে যাবে।

হীরা বুলবুল বললো, আমার ওতে কাজ নেই। তুমি ব্যবস্থা দ্যাকো, আমি তিথ্যি যাত্রায় বেরুবো। আমার পাপের প্রাচিত্তির করতে হবে।

রাইমোহন বললো, পাপ আবার কী? তুই কোন পাপ করিচিস? মেয়ে মানুষে কখুনো একলা একলা পাপ করতে পারে না। তোর সঙ্গে যে-সব বড় মানুষরা পাপ করেচে, তারা কী তীর্থযাত্রা করে পাপ ধুতে যাচ্চে? প্রতিশোধ নিতে হবে, বুঝলি? যে বড়মানুষগুলোনের জন্য চাঁদুকে হিঁদু কালেজ থেকে তাড়ানো হয়েচে, সেই সব ব্যাটাদের দেকে নোবো। এর শোধ যদি না তুলি তাহলে আমার নাম রাইমোহন ঘোষাল নয়। না পারলে রূপী বাঁদরটার নামে আমার নাম রাকিস।

হীরা বুলবুল বললো, অত বড় বড় কতায় আমার কাজ নেই। ঐ ছেলে বৈ আমার আর কেউ নেই এ সংসারে।

রাইমোহন বললো, আর কেউ নেই? আমি তোর কেউ নই? এতদিন লাথি ঝ্যাঁটা খেয়ে তোর পায়ের কাচে রইলুম, এখুন বলচিস, আমি তোর কেউ নই!

—ওমা, সে কতা কখুন বল্লুম! আমি তিথ্যি কত্তে গেলে তুমিও তো আমার সঙ্গে যাবে। তবে আর এখেনে কখুনো ফিরচিনি। সে কতা আমি আগেই বলে দিলুম। ঘেন্না ধরে গ্যাচে এই কলকেতা শহরের ওপর।

—সে যে পালানো হবে রে। আমরা ভয় পেয়ে পালাবো কেন?

—তা হলে তুমি থাকো। আমরা মায়ে পোয়ে বেরিয়ে পড়বো।

—কোতায় যাবি?

—যেদিকে দু'চোক যায়।

—এই জন্যেই না বলে মেয়েমানুষের বুদ্ধি। বেরিয়ে পড়বো বললেই হলো। বেরুতে গ্যালে অনেক বন্দোবস্ত লাগে।

—আমার কিচু লাগবে না। ছেলের হাত ধরে আমি চলে যাবো, কে আমার কী কর্বে!

—অমনি বললেই হলো। ওরে তোর এখুনো গতর আচে, চাঁদপানা মুখ আচে, ঢলো ঢলো যৌবন আচে, তোকে কেউ নির্ঝঞ্ঝাটে যেতে দেবে? পথের বাঁকে বাঁকে বাঘ নেকড়েরা ওৎ পেতে রয়েচে, তোকে ছিঁড়ে খাবে।

—সেইজন্যিই তো বলচি, তুমি চলো। তুমি আমাদের চোকে চোকে রাকবে।

তোমায় ছেড়ে কি কোতাও যেতে পারি।

রাইমোহন নিজের প্রৌঢ় শরীরখানির দিকে তাকিয়ে ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আমার কি আর সে তাগদ আচে রে। কোনোদিন লাঠি বন্দুকও ধরতে শিকিনি!

তারপর নিজের ললাটে দুটি টোকা দিয়ে বললো, আমার জোর এখেনে। এই বুদ্ধির জোরে কলকেতার বাবুদের সঙ্গে টক্কর দিতে পারি, কিন্তু ঠ্যাঙাড়ে-বোম্বেটেদের কাচে সুবিধে করতে পারবো না। তাই তো বলচি, পালাবি কেন? আমরা এইখেনে থেকেই লড়বো।

এই সময় বাড়ির সম্মুখস্থ পথে কয়েকটি ভারি পায়ের লোহা বাঁধানো জুতোর শব্দ হলো। জানলার খড়খড়ি সামান্য ফাঁক করে উঁকি মেরে রাইমোহন দেখলো, কয়েকজন সেপাই এদিকেই আসছে। রাইমোহনের মুখ শুকিয়ে গেল।

সেপাইরা অবশ্য এ গৃহে প্রবেশ করলো না, তারা এগিয়ে গেল সামনের দিকে। খড়খড়ি বন্ধ করে হাঁপ ছেড়ে ফিরে এসে রাইমোহন বললো, বাপরে বাপ! পিলে চমকে গিয়েছেল একেবারে! আমি ভাবলুম বুঝি সেপাইরা চাঁদুকেই ধরতে আসচে!

হীরা বুলবুল বললো, ওমা, চাঁদুকে ধরবে কেন? চাঁদু তো কারুর পাকা ধানে মই দেয়নি!

—বাগবাজারের বোসবাবুদের এক শালার মাতা ফাটিয়ে দিয়েচে না চাঁদু? তারা সহজে ছাড়বে ভাবিস। পুলিশ ঠিক এ বাড়ি খুঁজে বার করবে একদিন না একদিন।

হীরা বুলবুল অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে বললো, ওগো আর এ বাড়িতে থেকে তবে কাজ নেই। তুমি আজই তীর্থযাত্রার ব্যবস্থা করো। ওগো বজরায় গেলে হয় না? যদি কয়েকজন পাইক ভাড়া করা যায়?

—তারপর রক্ষকই যদি ভক্ষক হয়? পাইকরাই যদি মাঝপথে মেরেকুটে সব কিছু নিয়ে চম্পট দেয়? ডাঁড়া, একটু চিন্তা করতে দে!

—তুমি যাই বলো, আমি তীত্থে যাবোই।

—কালীঘাটও তো তীর্থ, সেখেনে গিয়ে থাক তবে। একটা বাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে, দু'একদিনে হবে না।

—না, কালীঘাটে না, এমন জায়গায় যাবো, যেখেনে কেউ আমাদের চেনে না।

—আঃ ডাঁড়া না, একটু ভাবতে দে। ও, এক কাজ করলে হয়। আজই এ বাড়ি থেকে সরে পড়া দরকার। এই তো কাচেই কমলা থাকে, ওর সঙ্গে আমার বেশ চেনা আচে। আমি বললে সে কয়েক রাত খুব আহ্লাদের সঙ্গে তোদের থাকতে দেবে। তারপর ক'টা দিন কাটলে অন্য একটা ব্যবস্থা।

—কার বাড়ি?

—জানবাজারের কমলার।

আহত দলিতা ফণিনীর মতন ফোঁস করে উঠলো হীরা বুলবুল। সে এবং কমলাসুন্দরী দুজনেই এই শহরের দুই ডাকসাইটে বারাঙ্গনা। হীরা বুলবুলের খ্যাতি যেমন সংগীতে, কমলাসুন্দরীর তেমনি নৃত্যে। এরা পরস্পরের প্রতিপক্ষ। তার বাড়িতে আশ্রয়ের প্রস্তাব এনে রাইমোহন হীরা বুলবুলের আঁতে ঘা দিয়েছে।

হীরা বুলবুল বললো, কী, আমি কমলির বাড়িতে গিয়ে নুকোবো? তার আগে তুই আমায় থুতু ফেলে ডুবে মত্তে বললি না কেন? ড্যাকরা, খালভরা!

এই তোর মনে ছেল! হাতি পাঁকে পড়লে ব্যাঙেও নাতি মারে। আজ আমার এমন বিপদ বলেই তুই এমনধারা কতা বলতে পারলি। কমলি যদি তোর এত পেয়ারের নাঙী হয় তবে তুই যা না সেখেনে। এখুনি যা। বিদেয় হ। দূর হ। ডরপুক্ কাঁহিকা। এইজন্যই আমার সঙ্গে তিত্থ্যি কত্তে যেতে তোর এত ভয়। কমলি মাগীটা পাঁচজনের সামনে উলঙ্গ হয়, ছোট জাতের মেয়ে, তাকেই তোর মনে ধরেচে। নিমকহারাম, এতকাল আমি দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষেচি...

হীরা বুলবুল একবার গালাগালির স্রোত বহাতে শুরু করলে তাকে থামায় কার সাধ্যি। রাইমোহন দু'হাত তুলে অসহায়ের মতন তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলো, তারপর হাত জোড় করে ক্ষমা চাইলো, শেষ পর্যন্ত তার পায়ে পড়লো। তবু হীরা বুলবুল থামে না।

রাইমোহন সবলে হীরা বুলবুলের মুখ চেপে ধরে বললো, ওরে কমলি তোর অত শত্তুর বলেই তো তার কথাটা মনে এলো। সেখেনে তুই বা চাঁদু লুকোলে পুলিশ কেন, পুলিশের বাপের সাধ্যি নেই সন্দেহ করে। সব্বাই জানে, হীরে বুলবুল আর যে-জায়গাতেই লুকোক, মরে গেলেও সে কমলির কাচে আশ্রয় চাইবে নাকো। আমি বলি কি, ডাঁড়া, বলতে দে আগে আমাকে, তোর যাবার দরকার নেই, তুই কেন যাবি, পুলিশ তো তোকে ধরতে আসবে না। চাঁদু বরং দু'চারদিন ওখেনে থাক। পুলিশও ওর খোঁজ পাবে না। চাঁদুও ওখেন থেকে সহজে পালাতে পারবে না।

মুখখানা একটু ছাড়া পেতেই হীরা বুলবুল বললো, সে মাগী আমার ছেলেকে নুকিয়ে রাকবে? তোর মাতায় কি শোঁয়া পোঁকা ঢুকেচে! সে রাক্কুসী আরও সেপাই ডেকে চাঁদুকে ধরিয়ে দেবে।

রাইমোহন বললো, কক্ষণো না। তুই নিজের কতাই একবার ভেবে দ্যাক। কমলির যদি কোনো ছেলে থাকতো, আর সে যদি তোর কাচে আশ্রয় চাইতো, তুই থাকতে দিতিসনি? বিপদের দিনে নিজের জাতের লোকদের কি কেউ পায়ে ঠেলে দেয়?

—নিজের জাত? সে মাগীর জাতের কোনো ঠিক আচে? দ্যাগ গিয়ে, সে কোন্ মুদ্দোফরাসের মেয়ে। রঙের কী চেকনাই, কাঠ কয়লা বলে মরি মরি।

—আহা-হা, তোর থেকে তো সে নীচু জাতের বটেই। তবু বলচি, সেও তোর মতন পাঁচজন বড় মানুষের সঙ্গে ওঠা বসা করেচে, মনটা একটু খোলামেলা হয়েচে।

অনেক বোঝাবার পর এবং চন্দ্রনাথের আশু বিপদের সম্ভাবনায় শেষ পর্যন্ত রাজি হলো হীরা বুলবুল।

কিন্তু চন্দ্রনাথকে নিয়ে যাওয়া সহজ কাজ নয়। সে কারুকে কাছেই ঘেঁষতে দেয় না। কেউ তাকে ধরতে গেলেই ক্ষিপ্ত পশুর মতন দু'হাত চালায়। শেষ পর্যন্ত তিন চারজনে মিলে চন্দ্রনাথের হাত, পা ও মুখ বেঁধে মধ্যরাত্রে একটি গাড়িতে তোলা হলো।

নিশুতি রাত, পথে লোক নেই, যাবার পথে গাড়িতে চন্দ্রনাথকে অনবরত বোঝাতে লাগলো রাইমোহন। চন্দ্রনাথ যদি বাড়ির সঙ্গে কোনো সংশ্রব না রাখতে চায়, বেশ তো, কয়েকদিন পর তার যেখানে খুশী চলে যাবে। আগে হাঙ্গামাটা মিটুক। সবাই এসব কথা ভুলে যাক। এখন বোসবাবুদের লোকদের হাতে ধরা

পড়লে চন্দ্রনাথ যে আরও বিপদে পড়বে। তাছাড়া, হিন্দু কলেজ ছাড়া কি পড়াশুনো করা যায় না? রাইমোহন তার জন্য সাহেব শিক্ষক রেখে দেবে বাড়িতে। কিংবা এমনিতেই চন্দ্রনাথ ঢের লেখাপড়া শিখেছে, এখনি সে কোনো হৌসে চাকরি জুটিয়ে বাবু শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে পারে। চন্দ্রনাথ যদি রাইমোহনকে পিতা বলে মেনে নেয় তাহলে সে ঘোষাল পদবী নিতে পারে, তারপর এই সমাজে তাকে অবজ্ঞা করে কার সাধ্যি?

সেই রাত্রেও কমলাসুন্দরীর বাড়িতে একটি মজলিস বসেছিল। সুরার নেশায় কমলার নয়ন দুটি ঢুলুঢুলু। ঘাঘড়া ও কাঁচুলি পরা। বয়েসের ফলে কমলাসুন্দরী এখন অনেকটা পৃথুলা হয়েছে, কোমরে মেদের স্তর, তবু সে এখনো নাচের ঠমকে শহরের অনেক বাবুরই হৃদয় আন্দোলিত করতে পারে।

রাইমোহন মজলিস ঘর থেকে বাইরে ডেকে কমলাসুন্দরীকে সব বৃত্তান্তটি জানালো। কমলাসুন্দরী প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতেই পারে না। নেশায় মগজ আচ্ছন্ন, সে বারবার বলতে লাগলো, কার ছেলে? বাপের নাম কী? শুধু হীরের ছেলে, হি-হি-হি-হি! হি-হি-হি-হি! হীরের ছেলে! কী করেচে সে, ডাকাতি? ফেরেববাজি? তা থাকো না বাবা, থাকো! যতদিন ইচ্ছে থাকো! তুমি যখন বলচো, তাতে আর আপত্যি কি! তা এতদিন কেন আসোনি, নাগর? কতদিন তোমার চাঁদ মুখ দেকিনি।

এ বাড়ির ছাদে একটি চিলে-কোঠা আছে, অনেকদিন ব্যবহৃত হয়নি। কোনোরকমে সেটিই সাফ সুতরো করে সেখানে এনে শোয়ানো হলো চন্দ্রনাথকে। তার মুখ ও হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে রাইমোহন বললো, তুই আমায় মারতে চাস, মার, যত খুশী। এই আমি দোরগোড়ায় বসে রইলুম। আমাকে একেবারে মেরে না ফেলে তুই যেতে পারবিনি।

কোণঠাসা বিড়ালের মতন দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে চন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলো, তুমি কতক্ষণ, কতদিন আমায় পাহারা দেবে?

হাই তুলে রাইমোহন বললো, এই ধর, আট দিন, কি দশ দিন, তারপর সবাই তোর কথা ভুলে যাবে। তখন তুই যা খুশী করিস!

চন্দ্রনাথ বললো, আমি আর এক দন্ডও তোমাদের কাচে থাকতে চাই না! তোমাদের দেকলেই আমার গা জ্বালা করে!

—আমি পিঠ ফিরিয়ে বসি, আমায় দেকিসনি!

—তুমি দূর হয়ে যাও।

—কেন মিছে এত রাগ করচিস, চাঁদু? মহাভারত পড়িসনি? কর্ণ কি বলেছেল? দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং হি পৌরুষম্! মানুষ কোন কুলে, কোতায় জন্মায়, সেটা দৈব ঘটনা, তার ওপর তো কারুর নিজের হাত নেই। দ্যাক, সমাজের পাঁচজনের মধ্যে তুই যাতে মাতা তুলে দাঁড়াতে পারিস, তার জন্য আমরা কম চেষ্টা করিনি। একবার হারবি, পাঁচবার হারবি, তা বলে তো ভেঙে পড়লে চলবে না! আত্মোন্নতির চেষ্টা কক্ষণো ছাড়তে নেই।

—আঃ, চুপ করো, আমার বকবকানি ভালো লাগে না।

—শোন্ চাঁদু, তুই আমার ওপর রাগ করতে পারিস, তোর মায়ের ওপর রাগ করতে পারিস, কিন্তু আমরা কখনো তোর গায়ে কোনো ময়লা লাগতে দিইনিকো।

চন্দ্রনাথ একদলা থুতু থুঃ করে ছিটিয়ে দিল রাইমোহনের দিকে। সেই থুতু

রাইমোহনের গালে লেগে গড়িয়ে পড়লো ঘাড়ে, রাইমোহন মুছলো না, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো চন্দ্রনাথের দিকে। সে দৃষ্টিতে রাগ নেই, বরং একটু পরে তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো অশ্রু। কতদিন পর, বোধহয় পঁচিশ, তিরিশ, চল্লিশ বছরের মধ্যেও রাইমোহন কখনো কাঁদেনি। এ বোধহয় বার্ধক্যের ফল!

চন্দ্রনাথ খর চোখে চেয়ে রইলো, কারুর কান্না দেখে তার মন আর দুর্বল হবার নয়।

দোতলায় নাচ-গানের জড়িত হল্লা তখনো চলেছে, ওপরে দু'জন সম্পূর্ণ নীরব। এরকমভাবে আর কতক্ষণ বসে থাকা যায়। এক সময় চন্দ্রনাথ ঘুমে হেলে পড়লো। তারও পর অনেকক্ষণ জেগে বসে থেকে ভোর রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়লো রাইমোহন। দরজার চৌকাঠের কাছে আড়াআড়িভাবে শুয়ে।

রাইমোহনের ঘুম ভাঙলো বেশ বেলায়। ধড়ফড় করে উঠে বসেই সে দেখলো ঘর শূন্য। রাইমোহন একটা সশব্দ দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। চন্দ্রনাথকে আর খুঁজে লাভ নেই। তাকে আটকে রাখতে গেলে হাত পা বেঁধে রাখাই উচিত ছিল। মানুষকে মানুষ ডিঙিয়ে যায় না, চন্দ্রনাথ সেই সৌজন্যটুকুও মানেনি, সে নিশ্চয়ই রাইমোহনকে ডিঙিয়ে লাফিয়ে চলে গেছে। চন্দ্রনাথ সাবালক হয়েছে, বুদ্ধিবৃত্তি আছে, তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কী ভাবে আর আটকে রাখা যায়। চন্দ্রনাথের মধ্যে স্নেহ-ভালোবাসার চিহ্ন কখনোই তেমন দেখা যায়নি, এখন সে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করেছে। হীরেমণিকে এই বাস্তব সত্য মেনে নিতেই হবে। এখন ছেলেটা বেঘোরে মারা না যায়! রাইমোহন নিজে অনেক গলাধাক্কা, অপমান সহ্য করেছে, কিন্তু চন্দ্রনাথের মনের কোন্ তন্ত্রীতে ধাক্কা লাগায় সে এমন বিগড়ে গেল, তা সে বুঝতে পারলো না।

সারা বাড়ি এখনো প্রায় ঘুমন্ত। হীরা বুলবুল এবং কমলাসুন্দরী দু'জনেরই প্রতিপত্তি এখন পড়ন্ত। এর মধ্যে কমলাসুন্দরী আরও কয়েকটি যুবতীকে নিজের কাছে রেখে তালিম দিচ্ছে, যাতে তার পসার বজায় থাকে। সেই দু'-তিনটি মেয়ে স্নান সেরে ঘোরাঘুরি করছে অলিন্দে। রাইমোহন এদের চেনে না, এরাও চেনে না রাইমোহনকে। সে একবার ভাবলো ওদের কাছে চাঁদুর কথা জিজ্ঞেস করবে কি না। পরক্ষণেই মনে হলো, কোনো লাভ নেই। দ্বারবানদের প্রশ্ন করেও কোনো সুসার হবে না।

ভারাক্রান্ত মনে সে চলে এলো গৃহের পশ্চাদ্বর্তী বাগানে। এখন একটি কঠিন কাজ বাকি আছে, হীরা বুলবুলের কাছে সংবাদটি প্রকাশ করতে হবে। অবুঝ হীরা বুলবুলকে সামলানো যে কী প্রাণান্তকর ব্যাপার হবে, তা ভেবেই শিউড়ে উঠলো রাইমোহন। এক্ষুনি সে হীরার সম্মুখীন হতে চায় না। কোনো সন্দেহ নেই যে হীরা রাইমোহনকেই সম্পূর্ণ দায়ী করবে। এখানে চন্দ্রনাথকে নিয়ে এসে কি ভুল করলো সে? জীবনে এতবড় ভুল আর তার হয়নি। ঘরে শিকলি তুলে দিয়েই বা একটি সোমত্থ ছেলেকে ক'দিন আটকে রাখা যায়। তা ছাড়া পুলিশের হাতে পড়ার ভয়টি তো মিথ্যে নয়।

রাইমোহন আপনমনে বাগানে ঘুরছিল, এমন সময় কেউ একজন তাকে ডাকলো, ওহে এদিকে একবার শোনো তো!

রাইমোহন চমকিত হয়ে তাকিয়ে দেখলো, পার্শ্ববর্তী উদ্যানে ফেজ পরা খানদানী চেহারার একজন মুসলমানের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ধুতি চাদর পরা এক

বৃদ্ধ। সেই বৃদ্ধকে চিনতে পেরে রাইমোহন দ্বিতীয়বার চমকিত হলো। বিধুশেখর মুখুজ্যের এই চেহারা হয়েছে! বাঁ চোখের ওপরে একটা কালো ঢাকনা দেওয়া, শরীরটা শুকিয়ে গেছে, হাতের ছড়ির ওপর ভর দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে।

রাইমোহন কাছে আসতেই বিধুশেখর বললেন, তুমি রাইমোহন না?

রাইমোহন বিনয়ে গলে গিয়ে বিগলিত হাস্যে বললো, প্রণাম মুখুজ্যে মশাই। এতদিন পরেও ঠিক চিনেচেন। তা আপনি সর্বজ্ঞ ব্যক্তি, আপনার কখনো ভুল হতে পারে! আপনি এখেনে?

বিধুশেখর বললেন, তার আগে বলো, তুমি এখেনে কী করচো?

রাইমোহন শ্রদ্ধায় ভক্তিতে একেবারে নুয়ে গিয়ে বললো, আজ্ঞে, আমরা শখের পায়রা, যখন যেখানে দানা ছড়ানো থাকে সেখানে খুঁটে খেতে যাই।

—তা আপাতত কার দানা খাচ্চো?

—দানা পাচ্চি, খাচ্চি, মালিকের খোঁজ রাখি না। আর সেরকম মালিকই বা কোতায়? রামকমল সিংগী মশাই মারা গিয়ে আমাদের একেবারে অনাথ করে দিয়ে গ্যালেন। বড় বৃক্ষের ছায়ায় থাকা আমাদের অভ্যেস।

—শোনো, ঝড় উঠবার উপক্রম হলে পিঁপড়েরা নড়বড়ে বাড়ি ছেড়ে সার বেঁধে চলে যায়, দেকোচো? তুমিও ও বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও সটকাও। ও বাড়ির মাগীটার ভিটে মাটি চাঁটি করবো এবার। মামলা দায়ের হয়েচে!

মুনসী আমীর আলী বিধুশেখরকে ফার্সীতে প্রশ্ন করলেন, এই চিড়িয়াটি কে?

বিধুশেখর বললেন, আপনি ঠিক চিনতে পারবেন না। আমাদের শাস্ত্রে এই পাখির উল্লেখ আছে, তার নাম গরুড়। দেখছেন না সব সময় হাত জোড় করে আছে।

রাইমোহন সেই মুহূর্তে একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। হীরা বুলবুল তার পেশা ছেড়ে দিতে চাইছে, কিন্তু রাইমোহন তার পুরোনো পেশাটিকে আবার চালু করবে। তবে, এই বুড়োকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না, এ একেবারে ছিবড়ে হয়ে গেছে, নওজোয়ান ছোকরা চাই। চন্দ্রনাথের ওপর অবিচারের শোধ নিতে হবে তো!

বেড়া টপকে এদিকে এসে সে বললো, হুজুর, আপনি কমলিকে তাড়াবেন, সে তো বেশ ভালো কতা। আপনি ইচ্ছে করলে কী না পারেন! আমরা একটু আশ্রয় পেলেই হলো।

তারপর হেঁট হয়ে বিধুশেখরের পায়ের ধুলো নিয়ে সে আবার বললো, হুজুর, আশীর্বাদ করুন, কোনোরকমে যেন বেঁচে বর্তে থাকি। এই অধম আপনার সেবক, যখন যা হুকুম করবেন তা তামিল করবার জন্য আমি সব সময় তৈরি। যদি বলেন তো ঐ কমলী মাগীটার পেছুনে বিছুটে লাগিয়ে একেবারে দেশছাড়া করে দিই!

আশীর্বাদের ভঙ্গিতে ডান হাত তুলে বিধুশেখর বললেন, বেশ, বেশ!



কাশী শহরে হুলুস্থুলু পড়ে গেছে। সকাল থেকেই লোকের মুখে মুখে একটি কাহিনী নানানভাবে পল্লবিত হতে লাগলো। ত্রৈলঙ্গ স্বামী আর একটি কাণ্ড করেছেন। ভোরবেলা তিনি মণিকর্ণিকার ঘাটে নেমে ভুস্ করে এক ডুব দিয়ে বেশ খানিক পরে উঠেছেন আর এক ঘাটে, তারপর কী খেয়াল হয়েছে, জল থেকে উঠে এসে সামনের এক কালী মন্দিরে ঢুকে মূর্তির গায়ে প্রস্রাব করে দিয়েছেন।

কেউ বলে মন্দিরে তখন আর কেউ ছিল না, কেউ বলে পুরোহিত ছিল, আবার কেউ বলে সেখানে ছিল এক বাঙালী সাধক। সে যাই হোক, পুরোহিত বা বাঙালী সাধকটি এই কাণ্ড দেখে আঁতকে উঠে বলেছিল, আরে রাম রাম! স্বামীজী, ইয়ে আপ কেয়া করতা!

কয়েক বৎসর ধরে ত্রৈলঙ্গ স্বামী সম্পূর্ণ মৌনী, কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি সেই কার্যটি সমাপ্ত করলেন অনেকক্ষণ ধরে। তারপর মন্দিরের মেঝেতে গড়ানো প্রস্রাবের ধারার ওপরেই আঙুল দিয়ে লিখলেন, 'গঙ্গোদকং'।

বারাণসীর জনসাধারণ এই ঘটনায় দুটি দলে বিভক্ত হয়ে তর্ক বিতর্কে মেতে উঠলো। তবে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর পক্ষপাতীরাই দলে ভারী। তাদের মতে ত্রৈলঙ্গস্বামী স্বয়ং চলন্ত শিব, তিনি যা করবেন, সেটাই তাঁর পূজা। তিনি লোকাচারের অতীত, সর্বসমক্ষে উলঙ্গ থাকতেও তাঁর কোনো দ্বিধা নেই। তাঁর কাছে চন্দন আর বিষ্ঠা সমান, সুতরাং গঙ্গাজল ও স্বমূত্রেতেই বা প্রভেদ থাকবে কেন? গঙ্গা তাঁর শরীরের মধ্যে প্রবাহিত।

অন্য দল এতটা মানতে রাজি নয়। যোগীরাজ বা অবতারদেরও তো লোক-শিক্ষার জন্য কিছু করতে হয়। এ কেমনধারা লোকাচার বহির্ভূত উৎকট ব্যবহার!

দলে দলে লোক ছুটে চলেছে সেই কালী মন্দিরের দিকে।

গঙ্গানারায়ণ বসে ছিল দশাশ্বমেধ ঘাটের পৈঠায়, যথাসময়ে সেও সংবাদটি শুনলো। কালী মূর্তির গায়ে প্রস্রাব ছিটানোর কাহিনী শুনে সে কৌতুক বোধ করলো খুব। এখন আর সে চক্ষু মুদলে সেই স্বর্ণজিহ্ব, স্বর্ণনয়না মূর্তিটি দেখতে পায় না। শপথ ভঙ্গের কোনো গ্লানি তার নেই। এখন দেব দেবীর মূর্তি তার কাছে নিছকই প্রস্তর-দারু মূর্তি!

অবশ্য শপথ ভেঙেই বা কী লাভ হলো। বিন্দুবাসিনীর কোনো সন্ধান সে পায়নি। বোধকরি পাওয়ার আর কোনো আশাও নেই। ছড়িদার মনসারামের পিছন পিছন সে অনেক ঘুরেছে। যে লালাজীর কাছে বিধুশেখর টাকা পাঠাতেন, তাকেও সে খুঁজে বার করেছে, এরা দু'জনেই বলতে চায় যে, বিন্দুবাসিনী আর বেঁচে নেই। কিন্তু সে কথা গঙ্গানারায়ণ বিশ্বাস করতে পারেনি পুরোপুরি। বিন্দু-বাসিনী কোন্ রোগে মরলো, কোথায় তাকে দাহ করা হলো, সে বিষয়ে ঐ দু'জনেই অস্পষ্ট উত্তর দেয়। কেমন যেন এড়িয়ে যেতে চায়। উদাসীনভাবে বলে, আর সে সব কথা শুনে কী হবে, বাবুজী! যা হবার তা তো হয়েই গেছে। আপনি ঘরে ফিরে যান। কাশীতে একা একা এমন দেওয়ানা হয়ে ঘুরবেন কেন?

কিন্তু গঙ্গানারায়ণের ফিরে যাওয়ার কথা একবারও মনে আসে না। কাশীর জীবন-যাত্রায় সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

কোনোই কাজ নেই, তাই গঙ্গানারায়ণ ভিড়ের স্রোতের সঙ্গে মিশে দেখতে গেল ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে।

সেই কালী মন্দিরের চাতালে গঙ্গামুখী হয়ে স্থির ভাবে বসে আছেন সেই মানুষ-পাহাড়টি। শত শত লোক তাঁর কাছে গিয়ে গড় করছে, বহু লোক আকুল চিৎকার করে তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ প্রার্থনা করছে, কিন্তু স্বামীজীর কোনো হুঁশ বোধই নেই। তিনি যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না। সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি ভক্তি চটে গেছে গঙ্গানারায়ণের, কিন্তু ত্রৈলঙ্গ স্বামীর দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো, এই মানুষটি কিছুটা অসাধারণ নিশ্চিত। এত লোকের ব্যাকুলতার মধ্যে এমন অনড় অটল হয়ে বসে থাকা যে-সে লোকের কর্ম নয়। কিন্তু এই যে ভক্তের দলবল, এরা কি মানুষ, না পোকামাকড়? এদের কি নিজস্ব চিন্তাশক্তি বলে কিছু নেই? ওরই মধ্যে অনেক লোক আবার সেই প্রস্রাব হাতে মেখে সেই হাত জিভে ছোঁয়াচ্ছে। ঘৃণায় গঙ্গানারায়ণের মুখ কুঞ্চিত হলো।

গতকাল সন্ধ্যাতেই কাশীতে একটি ভয়াবহ কান্ড ঘটে গেছে। 'শিশমহল' নামে একটি বাড়িতে একদল দুর্বৃত্ত তলোয়ার বন্দুক নিয়ে হানা দিয়েছিল। সে বাড়ি ভর্তি অনেক লোক, এমনকি বাড়ির কর্তার একটি বন্দুকও ছিল, কিন্তু কেউ বাধা দিতে পারেনি, দুর্বৃত্তরা দুজনকে হত্যা করেছে, সব অর্থ-স্বর্ণালঙ্কার লুণ্ঠন করেছে এবং একজন সুন্দরী রমণীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। এতবড় একটা নৃশংস ঘটনা সম্পর্কেও কাশীর লোকদের তেমন মাথাব্যথা নেই। অথচ একজন সাধু কালীমূর্তির গায়ে অপকর্ম করেছে, তা নিয়েই সবাই উন্মত্ত।

সেদিন অপরাহ্ণে গঙ্গানারায়ণ নৌকাযোগে গঙ্গা পার হয়ে ওপারের রামনগরে গেল বেড়াতে। কাশী ও রামনগরের মধ্যে খেয়া আছে, কিন্তু সে আগে এদিকে আসেনি। রামনগরের দিকে ঠিক শহর গড়ে ওঠেনি, কাশীর রাজার প্রাসাদ এবং তাঁর লোকলস্করের বাসস্থান, আর খানিক দূরে দূরে এক একটি ধনী ব্যক্তির অট্টালিকা। এদিকে তেমন লোক চলাচল করে না। গঙ্গাতীরের বিস্তীর্ণ ফাঁকা জমিতে সে একা একা পরিভ্রমণ করতে লাগলো।

গঙ্গানারায়ণের এখন প্রায়ই কলকাতার কথা মনে পড়ে। একমাত্র জননী বিম্ববতীর জন্যই তার বক্ষে মোচড় লাগে। আর কারুর প্রতি তার টান নেই। নিজের স্ত্রীর কথা স্মরণে এলে তার একটুও মমতা জাগে না। তার স্ত্রীকে সে নিজের মনোমত গড়ে নেবার অনেক চেষ্টা করেছিল, পারেনি। লীলাবতী শুধু তার শয্যাসহচরী হতে পারে, তার জীবনসঙ্গিনী হবার ক্ষমতা তার নেই। অথচ গঙ্গানারায়ণের তো আর কেউ নেই, তার বুক ভরা নিঃসীম একাকিত্ব, সে একজন সঙ্গিনীকেই চেয়েছিল। লীলাবতী বিন্দুবাসিনীর স্থান নিতে পারলো না! এখন লীলাবতীর যা ঘটে ঘটুক, সেজন্য গঙ্গানারায়ণ দায়ী নয়!

আর মনে পড়ে কলেজ জীবনের বন্ধুদের কথা। কলেজ পরিত্যাগ করার পর থেকে আস্তে আস্তে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মধু, রাজনারায়ণ, ভূদেব, বঙ্কু, গৌর—সবাই এক একদিকে ছড়িয়ে গেছে। গঙ্গানারায়ণের মনে হয়, ঐসব বন্ধুরা সকলেই স্বেচ্ছামত নিজের জীবন গড়ে নিয়েছে, শুধু গঙ্গানারায়ণই কিছু পারলো না। তার জীবনের কোনো স্থির লক্ষ্য ছিল না। বৃথাই সে ঘোরাঘুরি করলো এদিক-ওদিক। বিধুশেখরের স্বৈরাচার দমন করতে গিয়েও ব্যর্থ হলো সে। এখন সে কোন্ মুখে আর ফিরে যাবে দেশে? ব্যর্থ, পরাজিত ভাবে তার

প্রত্যাগমনে সবাই উপহাস করবে না? ইব্রাহিমপুর পরগণা পরিদর্শন করতে গিয়ে অকস্মাৎ বজরা থেকে তার উধাও হয়ে যাওয়ার কোন্ কারণ সে দর্শাবে? কারণটি তো সে নিজেই এখনো জানে না। বিন্দুবাসিনী নেই, তবু এই বারাণসীতেই সে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে।

ফেরার জন্য গঙ্গানারায়ণ তীর ধরে ধরে খেয়াঘাটের দিকে আসছে, পথে অন্য একটি ঘাট পড়লো। তখন প্রায়ান্ধকার হয়ে এসেছে, আকাশে ফিকে জ্যোৎস্নার আভা, বাতাস বইছে মন্দ মন্দ। গঙ্গানারায়ণ দেখলো, নদী থেকে উঠে আসছে এক রমণী। সিক্ত বসন শরীরের সঙ্গে সাঁটা, পিঠের ওপর গুচ্ছ গুচ্ছ কেশভার, চক্ষু দুটি নিমীল।

তৎক্ষণাৎ গঙ্গানারায়ণের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল, তার হৃদয়ে সংশয়ের অবকাশ মাত্র হলো না। এক পলক দেখেই সে অস্ফুট কণ্ঠে বললো, বিন্দু!

ঘাটের কাছে দু'জন স্ত্রীলোক একটি লাল বনাত মেলে ধরে আছে, যাতে সম্মুখ থেকে অন্য কেউ স্নানরতাকে দেখতে না পায়। কিন্তু গঙ্গানারায়ণ আসছিল নদীর ধার ঘেঁষে, তার চোখ চলে গিয়েছিল হঠাৎ সেদিকে।

দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করেই গঙ্গানারায়ণ আবার জোর করে ডেকে উঠলো, বিন্দু! তারপরই দৌড়োলো সেদিকে।

গঙ্গানারায়ণ ঘাটের কাছে গিয়ে পৌঁছোতেই সেই বনাত ধরে থাকা স্ত্রীলোক দুটি চিৎকার করে উঠলো দুর্বোধ্য ভাষায়। অমনি কোথা থেকে দু'জন ভীমকায় প্রহরী এসে গঙ্গানারায়ণের হাত চেপে ধরে কর্কশ স্বরে বললো, বেওকুফ, বেহুদা কাঁহিকা—

গঙ্গানারায়ণ নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সেই যমদূত সদৃশ প্রহরীদের সঙ্গে শারীরিক শক্তিতে সে পারবে কেন? তারা তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল খানিক দূরে। গঙ্গানারায়ণ প্রবলভাবে ছটফটিয়ে বিন্দু, বিন্দু বলে চিৎকার করলে তারা তার ঘাড়ে ও উদরে দুটি কোঁৎকা কষালো সজোরে, তাতে তার যেন দম বন্ধ হয়ে এলো।

গঙ্গানারায়ণ দেখলো, পথের ওপরে নামানো রয়েছে একটি তাঞ্জাম, সেখানে আরও সাত আটটি প্রহরী মাটিতে উবু হয়ে বসে আছে। গোলমাল শুনে তারা কয়েকজন কাছে এগিয়ে এলো, তাদের হাতে বর্শা।

অনেকদিন চুল কাটেনি, দাড়ি মুণ্ডিত করেনি, তাই গঙ্গানারায়ণকে তারা পথের বেওয়ারিশ উন্মাদ বলেই ধরে নিল। নইলে হয়তো সেখানেই তার ভবলীলা সাঙ্গ হতো। প্রহরীরা তাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ দিয়ে ও মারতে মারতে টেনে হিঁচড়ে খানিক দূর নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল কাঁটা ঝোপ ভরা মাঠের মধ্যে।

গঙ্গানারায়ণ সংজ্ঞা হারায়নি। শারীরিক ব্যথা বেদনার চেয়েও অসম্ভব এক বিস্ময়বোধ তাকে বিমূঢ় করে দিল। তার চিনতে কিছুতেই ভুল হয়নি। কিন্তু বিন্দুর সঙ্গে এত সব প্রহরী কেন? বিন্দু কি তার ডাক শুনতে পায়নি? অথবা সত্যিই কি তার এতখানি দৃষ্টিবিভ্রম হলো? ঐ রমণী বিন্দু ছাড়া আর কে!

একটু পরেই হুম হাম শব্দে সে আবার সচকিত হলো। তাঞ্জামটি চলতে শুরু করেছে। গঙ্গানারায়ণও টলতে টলতে উঠে এলো পথের ওপর। তাঞ্জামের দু'পাশে পর্দা ফেলা, ভিতরের আরোহিণীকে দেখা যায় না। দু'জন মশালধারী ছুটছে তাঞ্জামের সঙ্গে সঙ্গে।

মরীয়া হয়ে ছুটে এসে গঙ্গানারায়ণ তাঞ্জামের পর্দা সরিয়ে ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে অসম্ভব আর্তকণ্ঠে বললো, বিন্দু! আমি গঙ্গা, চিনতে পারিস না? তুই

কোথায় চলেছিস?

কয়েক মুহূর্ত মাত্র, তার মধ্যেই একজন মশালধারী ধাক্কা মেরে ফেলে দিল তাকে। এবং পরপর কয়েকজন প্রহরী মাড়িয়ে চলে গেল তার দেহ। ভলকে ভলকে রক্ত বেরুতে লাগলো তার মুখ দিয়ে। তাঞ্জামটি মিলিয়ে গেল পথের বাঁকে।

সেই অবস্থায় সেখানেই বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে রইলো গঙ্গানারায়ণ। তার মস্তিষ্ক তখনো একেবারে স্বচ্ছ। প্রহরীরা নেহাৎ অবজ্ঞাবশেই তাকে হত্যা করেনি। কয়েকজন পদদলিত করে গেছে তাকে, মনে হয় যেন তার হাড়-পাঁজরাগুলি আর অটুট নেই। তখুনি উঠে দাঁড়াতে পারলো না গঙ্গানারায়ণ, তবু সেই অবস্থায় থেকেও তার মনে হলো, তার ভুল হয়নি। সে বিন্দুবাসিনীকেই দেখেছে। চক্ষু মুদে সে শুধু দেখতে লাগলো তাঞ্জামের মধ্যে দেখা কয়েক মুহূর্তের সেই দৃশ্যটি।

রাজরাজেন্দ্রাণীর ভঙ্গিতে বসে ছিল বিন্দুবাসিনী। তার সর্বাঙ্গে কত রকমের বহুমূল্য অলঙ্কার। তার রূপ যেন আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়েছিল বিন্দুবাসিনী, মুখের একটি রেখা কাঁপেনি, চোখের পলক পড়েনি। সকালে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর যেমন দৃষ্টি দেখেছিল গঙ্গানারায়ণ, বিন্দুবাসিনীর দৃষ্টিও যেন ঠিক সেই রকম। কোনো আর্ত রবেই ভ্রূক্ষেপ হয় না। ঠিক যেন প্রাচীন পাথরের মূর্তির জীবন্ত চক্ষু, কী কঠিন, কী অস্বাভাবিক!

প্রহরীদের প্রহারের জন্য নয়, বিন্দুবাসিনীর সেই দৃষ্টির জন্যই গঙ্গানারায়ণের ভয় করতে লাগলো। এ কোন্ বিন্দুকে দেখলো সে?

ছড়িদার মনসারাম পরিত্যক্ত ফুল বেলপাতা তৈজসপত্র ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করে সবেমাত্র বাড়ি ফেরার উপক্রম করছে, এমন সময় সেখানে ধুলি ধূসরিত, রক্তাক্ত, ছিন্ন-বসন গঙ্গানারায়ণ এসে উপস্থিত হলো তার সামনে। মনসারামের কাঁধ খামচে ধরে সে হিংস্র কণ্ঠে বললো, তুমি কেন আমায় মিথ্যে কথা বলেছিলে?

মনসারাম সচকিতে এদিকে ওদিকে তাকালো, তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, বাবুজী, আমার ডেরায় চলুন।

গঙ্গানারায়ণ আবার চিৎকার করে বললো, না, আগে বলো, কেন মিথ্যে কথা বলে আমায় ধোঁকা দিয়েছিলে?

মনসারাম হাত জোড় করে কাতর গলায় বললো, বাবুজী, আমি সব বলবো। তবে এখানে বলা যাবে না, হাওয়া বহুৎ খারাপ, আপনি আমার ডেরায় চলুন আগে।

মনসারাম প্রায় টানতে টানতে গঙ্গানারায়ণকে নিয়ে চললো। কাছেই তার বাড়ি। বারাণসীর বড় বড় পথরের বাড়ির একতলায় সাধারণত মানুষ থাকে না, সেরকমই একতলার দুটি ঘরে মনসারামের সংসার। তার দুই পত্নী ও তিনটি সন্তান। নিছক ফুল-বাতাসা বিক্রয় করে ও পুণ্যার্থীদের চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সে তার সংসারের অনটন ঘোচাতে পারেনি। মাঝে মাঝে দালালি করে কিছু উপরি জুটে যায়।

অতিশয় যত্নে সে গঙ্গানারায়ণের ক্ষতস্থান মুছে দিল। একটা নতুন কোড়া ধুতি এনে বললো, বাবুজী, আপনার পোষাক ছেড়ে এটা পরে নিন।

ঘরে জ্বলছে রেড়ির তেলের সেজবাতি। তার দুই পত্নী দ্বারের কাছে এসে কৌতূহলী হয়ে দেখছে আগন্তুককে। মনসারাম তাদের তাড়া দিয়ে বললো, এই যা, যা, উধার যা! বাবুজীর জন্য পানি লিয়ে আয়। আর এক বর্তন দহি আর

নিমক আন—

তারপর সে কোমলকণ্ঠে বললো, বাবুজী, একটু দহি খেয়ে নিন, শরীর ঠান্ডা হবে। আজ শুয়ে যান আমার এই গরীবখানায়।

গঙ্গানারায়ণের কোটরগত চক্ষু দুটি জ্বলছে। সে যেন মনসারামকে দগ্ধ করে ফেলতে চায়।

মনসারাম ধীর স্বরে বললো, বাবুজী, আমি গরিবলোক, সিংহ কিংবা শেরের সঙ্গে কি আমি বিবাদ করতে পারি! দেবী সিং-এর নামে এ তল্লাটে সবাই ডরে কাঁপে। তার যেমন ধনদৌলত, তেমন লাঠির জোর। তার সঙ্গে টক্কর দেওয়া, আমি তো দূরের কথা, আপনারও সাধ্য নয়। সেইজন্যই বলেছিলাম, আপনি মুলুকে ফিরে যান।

গঙ্গানারায়ণ বললো, তুমি কেন বলেছিলে যে মেয়েটি মরে গেছে? আমি আজ নিজে তাকে দেখলাম।

—ঠিকই তো বলেছিলাম, বাবুজী। হিন্দু ঘরের মেয়েকে যদি পরপুরুষে একবার নিয়ে যায়, তাহলে তাকে তো মরাই বলে। যমের হাত থেকে যেমন কারুকে ছিনিয়ে আনা যায় না, তেমনি হিন্দু রমণীকেও পরপুরুষের ঘর থেকে ফিরিয়ে আনা যায় না।

—উঃ, কী পাষণ্ড তোমরা! সে বেঁচে আছে জেনেও তার মৃত্যুর খবর রটিয়ে দিলে? তার বাড়িতেও সেই খবর পাঠিয়েছো, ঐ লালাজীও তোমার মতন চশমখোর।

—আরে সীয়া রাম, সীয়া রাম! লালাজী বড় ধরম প্রাণ মানুষ। কখনো অন্যায় করেন না। উনিই আপনাদের বাঁচাবার জন্য ঐ খবর ইচ্ছে করে রটিয়েছেন। নইলে, ভালো করে ভেবে দেখুন, আপনারা জাতে পতিত হয়ে যেতেন না? যে-বংশের মেয়েকে, তাও কিনা বিধবা, ভিন জাতের লোক লুঠ করে নিয়ে যায়, সে বংশই পতিত হয়ে যায় না? বিন্ধুবাবু ব্রাম্‌ভন, তাঁর বংশে কলঙ্ক লেগে যেত না এই কথা জানাজানি হলে? আমি জানি, বাবুজী, বঙ্গালদেশে মগ্‌-সংসর্গে কত ব্রাম্‌ভন বংশ পতিত হয়ে গেছে।

—কী হয়েছিল আমায় খুলে বলো।

—নতুন তো কিছু না। এখানে এমন হামেশা হয়। খাপসুরত জেনানা দেখলেই তার পেছনে লোক লেগে যায়। প্রথমে লোভ দেখিয়ে ভোলাতে চায়। সোজা পথে কাম হলে তো ভালোই, নইলে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। দিনের বেলা, সকলের সামনে দুশমনরা এসে তুলে নিয়ে যায় সুন্দর মেয়েদের। আপনাদের ঐ মেয়েটিকে যেদিন নিয়ে যায়, সেদিন আমি নিজে ঘাটে ছিলাম। সবাই হায় হায় করলো, ব্যস, আর কি, দশ পনেরো জন দুশমনকে কে আটকাবে?

—এ দেশে কি কোতোয়ালী নেই? পুলিশ নেই? আমি কালই পুলিশ নিয়ে গিয়ে ওকে উদ্ধার করে আনবো।

—বাবুজী, এখন রাবণের রাজত্ব, রামজীর দেখা নেই। আপনাদের কলকাতার মতন এখানে কথায় কথায় পুলিশ দৌড়য় না। পুলিশের সাধ্য কি, দেবী সিং-এর মহাল থেকে কোনো আওরৎকে বার করে আনে! আপনি কি ভাবছেন দেবী সিং নিজে ধরে নিয়ে গেছে! না, না, সে এমন নোংরা কাজে নিজে হাত লাগায় না। এখানে মেয়ে বিক্রির ব্যবসার ধুম চলছে। আপনারা বাঙালীরা বিধবাদের এই কাশীধামে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন, ব্যস। তার মধ্যে কতজন যে রেণ্ডি পাড়ায় যায় আর কতজন বিক্রি হয়ে চালান হয়ে যায় তার খবর কে রাখে। সুরাট

বন্দর দিয়ে আরব দেশেও কত লেড়কি চালান যায়।

—বিন্দুকে গুণ্ডারা বিক্রি করেছে?

—বিলকুল ঠিক ধরেছেন।

—তা বলে আমরা মেনে নেবো?

—তাছাড়া আর কী করবেন?

—আমি নিজের চোখে তাকে দেখেছি...দেবী সিং যদি তাকে আটকে রেখে থাকে, আমরা সেখান থেকে উদ্ধার করবোই। দেশ এখন অরাজক নয়, কোম্পানির আমলে আইন আছে, আইনের জোরে দেবী সিং-এর মতন গুণ্ডাদের শাস্তি দেওয়া যায়।

—বাবুজী, আজ রাতটায় ভালো করে নিদ যান, কাল মাথা ঠান্ডা হবে, তখন সব বুঝবেন। লেখনী পুস্তিকা ভার্যা পর হস্তং গতা গতাঃ—কলম কেতাব আর কামিনী একবার পরের হাতে গেলে আর ফিরে আসে না। সেইজন্যই তো বলছিলাম, মনে করে নিন, ও জেনানা পরলোকে চলে গেছে। ওকে ফিরিয়ে এনে আপনি কী করবেন?

—কী করবো মানে? কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।

—আপনার মাথা গরম হয়ে গেছে, তাই বুঝছেন না। লুঠ করার পর ক'টা জানোয়ার ঐ মাঈজীর ধরম নাশ করেছে কে জানে। তারপর পড়েছে দেবী সিং-এর খপ্পরে, শুনেছি, তার মহালে এমন বিশ ত্রিশটা জেনানা আছে। আপনি যদি ঐ মাঈজীকে বার করে আনতেও পারেন, তারপর কে তাকে স্থান দেবে? ওনার পিতাজী দেবেন? আপনি দেবেন? আপনি চাইলেও সমাজ দেবে না। কোনো উপায় নেই। ঐসব জেনানাদের শেষ পর্যন্ত স্থান হয় রেণ্ডি পাড়ায়। আপনি ওর কথা ভুলে যান। কেন শুধু শুধু এক ধরম ভ্রষ্টা, জাতি ভ্রষ্টা আওরতের জন্য নিজের বিপদ ডেকে আনবেন।

গঙ্গানারায়ণের মনে পড়লো ইব্রাহিমপুর পরগনায় মুসলমান চাষীটির বিবিকে নীলকর সাহেবরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তার সম্পর্কেও তার খাজাঞ্চি সেন মশাই ঠিক এই কথাই বলেছিলেন। এরা একই কথা বলে। অন্য পুরুষ একবার ছুঁলে সেইসব মেয়েদের আর ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করাও অর্থহীন। তাদের আর কেউ ঘরে স্থান দেবে না।

গঙ্গানারায়ণের চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগলো। বিন্দু তাকে কোনোদিন তার শরীর স্পর্শ করার অধিকার দেয়নি। সূক্ষ্ম, অনুভূতিপ্রবণ তার মন, ধর্মনীতি, শাস্ত্রনীতির ওপর অভিমান করে সে ভয়ঙ্কর, কঠোর ব্রতচারিণী হয়েছিল, সেই বিন্দুকে কয়েকটা নরপশু মিলে...। গঙ্গানারায়ণ আর ভাবতেও পারে না। বিন্দু কেন একটা কথাও বললো না তার সঙ্গে। কেন অমন হিমশীতল, নিস্পন্দ চোখে চেয়েছিল?

মনসারাম বললো, লুঠ করা লেড়কিদের ফিরিয়ে এনে আরও বেশী ঝঞ্ঝাটে পড়তে হয় বলে আংরেজ পুলিশও আর এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। কোথায় রাখবে সেই লেড়কিদের? একবার বে-ইজ্জত হলে হিন্দু ঘরের জেনানার মরণই ভালো।

কথা বলতে বলতে সে দেখলো, গঙ্গানারায়ণ অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়ছে। মেঝেতে মাথা ঠুকে যাবার আগেই সে ধরে ফেললো, তারপর শুইয়ে দিল যত্ন করে। মনসারাম অনেক কিছু দেখেছে, জীবন কত কঠোর, কত বিচিত্র, সে জানে। কিন্তু এই ছোকরাবাবুটি বড় ঘরের ছেলে, মন নরম, হয়তো জীবনে এই প্রথম

আঘাত পেল, তাই সহ্য করতে পারছে না।

এরপর কয়েকদিন গঙ্গানারায়ণ থেকে গেল মনসারামের বাড়িতে। মনসারামের দুই স্ত্রী পালা করে সেবা শুশ্রূষায় সুস্থ করে তুললো তাকে। মনসারামের স্ত্রী দুজন এক হিসেবে বড় অদ্ভুত। এরা পাশাপাশি দুটি ঘরে থাকে, এখন গঙ্গানারায়ণ একটা ঘর জুড়ে থাকায় ওরা দু'জনেই একঘরেই এক সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু ওদের কক্ষনো ঝগড়া বিবাদ করতে শোনা যায় না। পরস্পরের মধ্যে খুব ভাব, যেন দুই ভগিনী কিংবা দুই সখী।

একদিন ওদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নিল গঙ্গানারায়ণ। মনসারাম বারবার বলে দিল, গঙ্গানারায়ণ যেন কাশী ছেড়ে চলে যায়। এখানে থাকা তার পক্ষে বিপজ্জনক। দেবী সিং-এর অনুচররা চতুর্দিকে ঘোরাঘুরি করে, তারা যদি জানতে পারে যে, এই ছোকরাটি দেবী সিং-এর কেনা আওরতের দিকে নজর দিয়েছে, তাহলে তারা সেদিনই গঙ্গানারায়ণকে এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে।

গঙ্গানারায়ণ মনসারামের কথায় মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। কিন্তু বারাণসী ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছে তার একটুও নেই। সে সাধুদের এক আখড়ায় গিয়ে আশ্রয় নিল, মিশে রইলো চ্যালাদের মধ্যে। খঞ্জনী বাজিয়ে যখন গান হয়, সেও গান ধরে, অন্যরা তার দিকে গঞ্জিকার কল্কে এগিয়ে দিলে সেও দু-এক টান মারে। আর প্রায়ই সন্ধের দিকে একটা ছোট নৌকো ভাড়া নিয়ে সে রামনগরে যাতায়াত করে।

তারপর এলো বৈশাখী পূর্ণিমার রাত। এ রাতে গঙ্গাতীরবর্তী বারাণসী আর তীর্থক্ষেত্র থাকে না, হয়ে ওঠে একটি প্রমোদ নগরী। এ শহরে মন্দির, সাধুদের আখড়া যত আছে, সে তুলনায় সংগীত, নৃত্যের মজলিসও কিছু কম নেই। এই রাতে রেণ্ডিপাড়া খালি করে তারা সবাই চলে আসে গঙ্গার ধারে। লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ থেকেও বাঈজীরা আসে এখানে।

কথায় বলে, যদি ভোর দেখতে চাও তো যাও বারাণসীতে, সন্ধ্যা দেখতে চাও তো যাও লক্ষ্ণৌতে, আর যদি রাতের সুস্নিগ্ধ বাতাস উপভোগ করতে চাও তো চলে যাও মালবে। কিন্তু বৈশাখী আর কোজাগরী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় বারাণসী লক্ষ্ণৌকেও টেক্কা দেয়। গঙ্গাবক্ষে ভাসে শত শত বজরা, দূর থেকে মনে হয় যেন শত রাজহংসী, আলোকমালায় সজ্জিত। বজরার ছাদ থেকে ভেসে আসে সারেঙ্গি, তবলা বাদ্যের ধ্বনি আর নূপুরের নিক্কণ অথবা ঠুংরির সুমিষ্ট সুর। এই উপলক্ষে বড় বড় রইস ব্যক্তিদের মধ্যে চলে প্রতিযোগিতা। বিশাল বিশাল পাত্রে গোলা হয় সিদ্ধি, সুরার বোতলও কম থাকে না, যার যেমন রুচি।

উৎসব শুরু হয় সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই, উদ্দেশ্য থাকে একইভাবে নিশিভোর করে দেবার। কিন্তু বেশীর ভাগ বজরাতেই দেখা যায়, মধ্যরাত্রির পর নর্তকী নেচে চলেছে, বাঈজী গেয়ে চলেছে কিন্তু দর্শক বা শ্রোতারা নিঃশব্দ। বাবু তাঁর ইয়ারবক্সী নিয়ে সংজ্ঞাহীন। দাঁড়ি, মাঝি, প্রহরীরাও সিদ্ধির নেশায় বিভোর হয়ে পড়ে।

দেবী সিং-এর বজরা চারখানি একসঙ্গে বাঁধা। সন্ধে থেকেই দাপটে ফুর্তি শুরু করে দেবী সিং চালালো অনেকক্ষণ। পঞ্চাশোর্ধ বয়েস দেবী সিং-এর, টকটকে ফর্সা রং, গোলমরিচের রঙের মস্ত বড় গোঁফ, মুখখানি ঠিক যেন বাঘের মতন। এখনো সে নর্তকীদের সঙ্গে নিজে উঠে নাচতে পারে, তবে নেশার ঝোঁকে যখন তার চোখ দুটি ঘোলাটে হয়ে আসে, তখন তার পরিহিত বস্ত্রও খসে পড়ে।

শেষ রাতের দিকে যখন সব নিঃসাড় হয়ে এলো, তখন একটি ছোট ডিঙি এসে লাগলো দেবী সিং-এর একটি বজরার গায়ে। সেই ডিঙি থেকে গঙ্গানারায়ণ সঠিক গবাক্ষটিতে উঁকি দিল।

ধবল জ্যোৎস্নায় কামরার ভিতরটি দেখতে অসুবিধে হয় না। শয্যায় পাশ ফিরে, পা দুটি গুটিয়ে ঘুমিয়ে আছে বিন্দুবাসিনী। জড়ির চুমকি বসানো রক্ত-বর্ণের রেশমী শাড়ি পরে আছে সে, গলায় একটি গোড়ের মালা, সুগন্ধে ঘরটি আমোদিত।

গঙ্গানারায়ণ ফিসফিস করে দু-বার ডাকলো, বিন্দু, বিন্দু!

বিন্দুবাসিনী চোখ মেলে তাকালো। সিদ্ধির নেশায় তার চোখ দুটি টকটকে লাল। সে চমকে উঠলো না। মাথাটি সামান্য তুলে, একটুখানি বাঁকিয়ে কৌতূহলী ভাবে চেয়ে রইলো। গঙ্গানারায়ণের মাথায় সন্ন্যাসীদের মতন বড় বড় চুল, মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, তাকে সহজে চিনতে পারার কথা নয়।

বিন্দুবাসিনী শাড়ি-গয়নার শব্দ করে উঠে বসলো। তারপর হাত দুটি সামনের দিকে বাড়িয়ে খুব নরম গলায় বললো, কে, গঙ্গা? আয়—

যেন মাঝখানে বহু উত্তাল সময় বয়ে যায়নি, যেন নিয়তি তাদের নিয়ে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের খেলা খেলেনি, যেন কিছুই হয়নি, ঠিক যেন আগের দিনই দেখা হয়েছিল, এমনভাবে ডাকলো বিন্দু। রামনগরের ঘাটে বিন্দুর ভাবলেশহীন মুখ দেখে গঙ্গানারায়ণ যতখানি অবাক হয়েছিল, আজ রাতে তার অতি-স্বাভাবিক ব্যবহার দেখেও গঙ্গানারায়ণ প্রথমে হতচকিত হয়ে গেল।

বিন্দু আবার বললো, আয়, গঙ্গা, ভেতরে আয়!

গঙ্গানারায়ণ এক লম্ফে কামরার মধ্যে প্রবেশ করে ছুটে গিয়ে বিন্দুবাসিনীকে আলিঙ্গন করলো।

তারপর যেন কত যুগ যুগান্ত কেটে গেল। কেউ আর একটিও কথা বললো না। শুধু বাইরে জলের ছলছল মধুর শব্দ। দুটি তপ্ত প্রাণ অনেকদিন পর এক সঙ্গে জুড়োচ্ছে। গঙ্গানারায়ণের পিঠে বিন্দুবাসিনীর দুই হাত, শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে সে, যেন আর কিছুতেই ছাড়বে না।

গঙ্গানারায়ণই এক সময় ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। ব্যস্ত হয়ে বললো, আর একটুও দেরি নয়, আমি নৌকো এনিচি, তুই এক্ষুনি চল আমার সঙ্গে!

বিন্দু সারা মুখে চন্দ্রকিরণের মতন হাসি ফুটিয়ে বললো, কোতায়!

—চল, আমরা চলে যাবো, অনেক দূরে, বহু দূরে, যেখানে কেউ আমাদের চিনবে না—

বিন্দু আদুরে গলায় জিজ্ঞেস করলো, আগে বল, সেই জায়গা কোতায়?

গঙ্গানারায়ণ বললো, সে জায়গা আমরা খুঁজে নেবো, যেখানে আর কেউ নেই, কোনো বনের মধ্যে, নদীর ধারে, একটা কুঁড়েঘর বেঁধে, শুধু তুই আর আমি।

বিন্দুবাসিনী হঠাৎ যেন খুব উৎসাহিত হয়ে বললো, সে রকম জায়গা আচে? চল, এখুনি চলে যাই।

—চল, আমার হাত ধর।

—ওমা, আমার গয়নার বাক্স যে আনিনি!

—কী?

—গয়নার বাক্স আমার...একবার রামনগর ঘুরে যেতে হবে।

—গয়নার বাক্স দিয়ে কী হবে? ওসবের কিচ্ছু দরকার নেই।

—সে কি, আমার অত গয়না, সেগুলো ফেলে যাওয়া যায় নাকি।

গঙ্গানারায়ণ আহতভাবে বললো, বিন্দু, তুই গয়নার কথা ভাবচিস? গয়না দিয়ে আমাদের কী হবে?

বিন্দুবাসিনী যে নেশার ঝোঁকে কথা বলছে, তা বুঝতে পারলো না গঙ্গানারায়ণ। বিন্দুবাসিনী তার ঢুলঢুলে চক্ষু দুটি গঙ্গানারায়ণের মুখের দিকে স্থাপন করে ফিক করে হেসে বললো, তুই সত্যি গঙ্গা? আমার সেই ছেলেবেলার খেলুড়ি? যাঃ, আমি স্বপ্ন দেখচি! আমার স্বপ্ন দেখতে ভাল্লাগে না! একদম ভাল্লাগে না!

গঙ্গানারায়ণ ব্যাকুল হয়ে বললো, বিন্দু, আর একটুও দেরি করার সময় নেই। এক্ষুনি যদি কেউ জেগে ওঠে...

বিন্দুবাসিনী সঙ্গে সঙ্গে বললো, ওমা, তাই তো! তুই এলি কী করে? দেবী সিং-এর লোকরা যে তোকে দেখলে একেবারে কেটে ফেলবে! তুই শিগগির চলে যা—

—তুই আমার সঙ্গে যাবি না?

—আমি? আমি কোতায় যাবো?

—বিন্দু, দেরি করিসনি, এই পাপের জায়গায় আর এক মুহূর্ত থাকা নয়, আয় আমার সঙ্গে।

—কিন্তু আমার ছেলে?

—ছেলে!

দু'জনে দু'জনের দিকে নির্বাকভাবে চেয়ে রইলো। কেউ যেন একটা মুগুড় দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করেছে গঙ্গানারায়ণের মাথায়। বিন্দু আগে বললো গয়নার বাক্সের কথা, তারপর...তারপর...।

বিন্দুবাসিনী এবার গঙ্গানারায়ণের বুকে মাথা রেখে হু হু করে কেঁদে ফেললো। বিমূঢ় হয়ে বসে রইলো গঙ্গানারায়ণ। এ কী শুনলো সে বিন্দুবাসিনীর মুখে?

আবার মুখ তুলে বিন্দুবাসিনী একটু সামলে নিল নিজেকে। আঁচলে চোখ মুছে সে শান্ত গলায় বললো, তুই জিজ্ঞেস করলি না, আমি কেন এতদিনে মরিনি?

গঙ্গানারায়ণ বললো, আগে এখেন থেকে চলে যাই, তারপর সব কথা শুনবো।

—তুই আমার ছেলেকে এনে দিতে পারবি?

—তুই কি বলচিস, আমি বুঝতে পাচ্চি না, বিন্দু!

—ইস, আমায় বড্ড বেশী খাইয়ে দিয়েচে, আমি তোকে ভালো করে দেকতে পাচ্চি না। ইস্, এ কী চেহারা হয়েচে তোর, এত রোগা হয়ে গেচিস!

—বিন্দু, তুই আমার সঙ্গে যাবি না? আর দেরি করলে দুজনেই বিপদে পড়বো।

—শোন, মরা তো সহজ, আমি কি মরতে পারতুম না? ওরা আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল, মা মা বলে কত চ্যাঁচালুম, কেউ বাঁচাতে এল না...তার আগে কখনো পাপ করিনি, তবু দেবতারাও বাঁচালো না আমায়, দেবী সিং-এর বাড়িতে হাত পা বেঁধে রেকেচিল, খাবার খেতে চাইনি, জোর করে মুখে দুধ ঢেলে দিয়েচে...আমার ওপর কত অত্যোচার করেচে, তবু ঠাকুরকে ডেকেচি, ঠাকুর আমায় মরণ দাও! আমার ডাক শুনে ঠাকুর কী দিল জানিস? আমার পেটে বাচ্চা এলো। পেটে বাচ্চা নিয়ে কি কেউ মরতে পারে বল, তুই বল?

আবার ফিক করে হেসে ফেলে বিন্দুবাসিনী বললো, তুই আমায় চিনলি কী করে, গঙ্গা? বিধবা ছিলুম, এখন দ্যাখ আমার কেমন ঝলমলে রঙীন শাড়ি, গায়ে গয়না, দাসীরা দুধের সর আর হলুদ বাটা দিয়ে আমার গা মেজে দেয়।

গঙ্গানারায়ণ নিরসভাবে জিজ্ঞেস করলো, তোর ছেলে হয়েচিল?

বিন্দুবাসিনী বললো, হ্যাঁ রে, ফুটফুটে ছেলে, ঠিক যেন রাজপুত্তুর!... ঠাকুরের কী খেলা ভেবে দ্যাখ, বিধবার পেটে ছেলে! চাইলুম মরণ, দিল ছেলে! তারপর আবার ছেলেকে কেড়ে নিয়ে গেল!

—কে?

—ওরা! তিনমাসের বাচ্চা, তাকে কেড়ে নিয়ে গেল আমার কোল থেকে। কোতায় রেখেচে জানি না! ওদের কাচে ভিক্ষে চাই, ওগো, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও! সেইজন্যই তো ওদের সব কথা শুনি, ওরা নাচতে বললে নাচি, হ্যাঁ রে, আমি নাচতে শিখিচি, ওরা সিদ্ধি খেতে বললে সিদ্ধি খাই, যদি ছেলেকে ফিরিয়ে দেয়! আগে তো কখনো ভাবিনি যে আমি মা হবো। ওরে, মা হওয়া যে কী কষ্টের, কী সুখের!

গঙ্গানারায়ণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। জীবনে কোনো একটা ব্যাপারেও সার্থক হওয়া তার নিয়তিতে নেই। এত সাবধানতার সঙ্গে, এত পরিকল্পনা করে সে এসেছে বিন্দুবাসিনীর কাছে, তারপর যে এমন ঘটবে, তা সে দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি।

—তুই ফিরে যা গঙ্গা।

—তুই যাবি না?

—না রে, আমি কি যেতে পারি? আমি নষ্ট। আমার শরীর অপবিত্র। তুই যে বিন্দুবাসিনীকে চিনতিস, সে তো আমি নয়! আমি তো একটা কাশীর রেন্ডি।

—ছিঃ, বিন্দু! তুই এখনো যদি আমার সঙ্গে যেতে চাস, আমরা দুজনে কোনো দূর দেশে চলে যেতে পারি।

—আমি বিচ্ছিরি, পোকায় খাওয়া, আমায় নিয়ে তুই কী করবি, গঙ্গা! উঃ, বড্ড মাথার যন্ত্রণা, একটু মাথা টিপে দিবি!

—আয়।

—না, না, আমি কী পাগলের মতন কথা বলচি। আমি কি তেমন ভাগ্য করে জন্মিচি? তুই চলে যা, ওরা এক্ষুনি এসে পড়বে।

—আমি তোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে চাই, বিন্দু।

—ওরে, সে আর আমার ভাগ্যে নেই। তুই যা, আমার মাথার দিব্যি, তুই চলে যা, চলে যা, চলে যা।

বিন্দুবাসিনী এমন এক স্বরে চলে যাওয়ার কথা বলতে লাগলো যে গঙ্গানারায়ণ আর স্থির থাকতে পারলো না। সে চলে যাওয়াই ঠিক করলো। বিন্দু যাবে না, সে বুঝতে পেরেছে। ছেলেকে ছেড়ে কোন্ মা যায়? হোক না পাপের সন্তান, তবু তো নিজের গর্ভের ফুল।

কোনো রকম বিদায় না নিয়ে গঙ্গানারায়ণ আবার গবাক্ষ দিয়ে বেরিয়ে এসে ডিঙিগ নৌকোয় উঠলো। অন্য মাঝি আনেনি, সে নিজেই দাঁড় বাইবে। এত বড় একটা দুঃসাহসী কাজ সে জীবনে কখনো করেনি, তবু সব বৃথা গেল। দাঁড়টা তুলে নিয়ে সে দেখলো বিন্দু গবাক্ষ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ব্যাকুল ভাবে চেয়ে আছে। পরিপূর্ণ আলোয় এবার গঙ্গানারায়ণ বুঝতে পারলো, বিন্দুর মুখখানি অস্বাভাবিক নেশাগ্রস্ত।

বিন্দু প্রায় কেঁদে উঠে বললো, তুই চলে যাচ্ছিস গঙ্গা? আমায় নিয়ে যাবি না?

গঙ্গানারায়ণ এক হাত বাড়িয়ে বললো, আয়।

বিন্দু সঙ্গে সঙ্গে নৌকোয় নেমে এলো!

গঙ্গানারায়ণ রুদ্ধশ্বাসে বললো, মাথা নীচু করে বসে পড়, কেউ যেন দেখতে না পায়।

বজরা থেকে খানিকটা দূরে নৌকোটা সরে আসার পর বিন্দুবাসিনী খানিকটা জল মাথায় চাপড়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার চুল খোলা, জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে শরীরের অলঙ্কার। দু'দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে সে যেন আপন মনে বললো, আঃ, বড় সুন্দর, বড় সুন্দর এই পৃথিবী।

গঙ্গানারায়ণ বললো, বিন্দু, বসে পড়, কেউ দেখতে পাবে!

বিন্দুবাসিনী সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে হঠাৎ নিজের গলা চেপে ধরে অসম্ভব তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠলো, ওহ্ হো হো হো, আমায় দিলে না, আমায় কেউ দিলে না—

হঠাৎ আবার পরিষ্কার কণ্ঠে বললো, নীচে মা গঙ্গা, মাথার ওপরে আকাশে রয়েচেন দেবতারা, সবাইকে বলে গেলুম, যদি পরজন্ম থাকে, তবে পরজন্মে যেন তোকে আমি পাই। এ জন্মে আমার সব নষ্ট হয়ে গেল রে! সব নষ্ট হয়ে গেল! আমায় কেউ কিচু দিলে না...।

গঙ্গানারায়ণকে প্রস্তুত হবার কোনো সুযোগ না দিয়ে বিন্দুবাসিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। ডিঙি নৌকোটা প্রচণ্ডভাবে দুলে ওঠায় গঙ্গানারায়ণ একটুক্ষণের জন্য দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল। তারপর সেও ঝাঁপ দিল।

জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে সব দিক। গঙ্গানদীকে সেই জ্যোৎস্নায় মনে হয় যেন এক প্রশস্ত পথ। সেই পথ চলে গেছে কোন্ নিরুদ্দেশের দিকে।

একটু পরেই শুরু হলো ঝড়। সব বজরাগুলো একসঙ্গে দুলে উঠলো। তারপর ঝড় ও বৃষ্টি মাখামাখি হয়ে মুছে দিল বিশ্ব চরাচর।

॥ প্রথম পর্ব সমাপ্ত ॥